

# প্রবন্ধ

বার্ষিক সূচীপত্র : বৈশাখ—চৈত্র : ১৩৬৮

৫৫৮-৮৪৪৩৭-৪-২৪২৭৩।

ধক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী ॥ প্রঃ=প্রবন্ধ; নিঃ=নিবন্ধ; গঃ=গল্প; নঃ=নন্দা; উঃ=উপন্যাস;  
চিত্রঃ=চিত্র; কঃ=কবিতা; জীঃ=জীবনী; জীঃ চিঃ=জীবন-চিত্র; কাঃ কাঃ=কাব্য-কাহিনী; আঃ আঃ=  
আলাপ ও আলোচনা; আঃ=আলোচনা; ভঃ=ভ্রমণ; গীঃ আঃ=গীতি-আলেখ্য; নাঃ=নাটক;  
গীঃ নাঃ=গীতিনাট্য; সঃ=সমালোচনা; রঃ রঃ=রম্য রচনা; সঃ ঘঃ=মৃত্যু ঘটনা]

| বরণ ও র্কবেদান্তভীর্থ             | ইন্দু গুপ্ত                                |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ধদ ( নিঃ )                        | ৪, ৪৬, ৮২, ১১৮, ১৫৪, ২৪২,                  | ২০৭                                              |
|                                   | ২৭৮, ৩১৪, ৩৫০, ৩৮৬, ৪২২                    | ৩০১                                              |
| শ্রীমজ্জননী ( জীঃ )               | ৩৪১                                        | ৩৪১                                              |
| কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ    | অথ কবি কথা ( গঃ )                          | ৪৪১                                              |
| ত্র পথ-নির্দেশ ( পঃ )             | ১৮                                         | উমাপদ নাথ এম. এ.                                 |
| রতন বন্দ্যোপাধ্যায়               | নববেশে আয় বঙ্গে ( কঃ )                    | ২১৪                                              |
| রাণী ভিক্টোরিয়া ( গঃ )           | ১৩৬                                        | আমাকে ডুবাও ( কঃ )                               |
|                                   |                                            | ২২২                                              |
| চক্রবর্তী                         | জাতীয় পোষাক ( চিঃ )                       | ৪৩২                                              |
| জাগৃহী ( কঃ )                     | ১২১                                        | কৃতাস্তনাথ বাগচী                                 |
| গচন্দ্র দত্ত                      | প্রার্থনা ( কঃ )                           | ৩২                                               |
| আচার্য বিজয় মজুমদার ( জীঃ )      | ২২৬                                        | কুয়ান হুয়া                                     |
| জানা                              | গণ-বিচারক ( গঃ )                           | ১১১                                              |
| জঃ বীধন ( কঃ )                    | ২২৭                                        | কমলাকান্ত ভট্টাচার্য                             |
| মকুমার দত্ত                       | ভারতজননী ( সংস্কৃতানুবাদ : কঃ )            | ১৩৫                                              |
| তিহাস ( কঃ )                      | ২২০                                        | কালীপদ সমাদ্দার                                  |
| সিংহ                              | আদর্শ শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ( জীঃ ) | ১৭০                                              |
| লালাবাদের যুদ্ধ ( সঃ )            | ৩০২                                        | কুমুদরঞ্জন মল্লিক                                |
| চন্দ্র চক্রবর্তী                  | শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা ( কঃ )               | ২১৩                                              |
| হাভারত ( কঃ )                     | ৩১৬                                        | কালীকঙ্কর সেনগুপ্ত, ডাঃ                          |
| কুমার সমাজদ্বার                   | আর জালিব না আলো ( কঃ )                     | ২১৪                                              |
| গামাণিক ( গঃ )                    | ৪৩৬                                        | মন্দিরেব চাষি ও মন্ত্র ( কঃ )                    |
| কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী                  | ৪৩৬                                        | কাজললতা সর্বাধিকারী                              |
| গ্যায় জীবন ( নিঃ )               | ৪৪০                                        | পূজার আমোদ ( রঃ রঃ )                             |
| তোষ মুখোপাধ্যায়                  |                                            | ২২৩                                              |
| কর্ষবীর সতীন সেন ( জীঃ )          | ৫২, ১৪৩, ১৭০                               | খায়ের আহম্মদ কামরান, এম-এস-সি                   |
| হৃষণ রায়                         |                                            | একখানি পত্র ( পঃ )                               |
| শ্রীমজ্জগুরুজীর জীবনপঞ্জী ( জীঃ ) | ২৩, ৭২, ১০২,                               | ১৭৪                                              |
|                                   | ১৪৭, ১৭২, ২৬০, ৩৪৫, ৪০১, ৪৪৩               | খলিল আহমেদ                                       |
| মায়ী সর্দানন্দজী                 | ১৩৮                                        | কিষণ কবি রবীন্দ্র বার্মা ( প্রঃ )                |
|                                   |                                            | ৪২৩                                              |
|                                   |                                            | গোপেশচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক                        |
|                                   |                                            | সাহিত্যে মহৎ স্থিতি ও স্মরণের প্রতিষ্ঠা ( প্রঃ ) |
|                                   |                                            | ২০২                                              |
|                                   |                                            | ছেড়ে আসা বাড়ীকে ( কঃ )                         |
|                                   |                                            | ৪৩৫                                              |

|                                                 |                    |                                              |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| গণেশচন্দ্র সামন্ত                               |                    | নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়                     |               |
| বাণী ( ক: )                                     | ২৩৪                | কবি কুমুদরঞ্জন : যেমন দেখে এলায় ( জী: চি: ) |               |
| সেকালের বাগবিধবা : 'উস্তরা' ( ক: )              | ৪৪৬                | প্রত্যগা্যানন্দ সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী       |               |
| গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক                 |                    | প্রশস্তি ( ক: )                              |               |
| বাহিত্র আশ্রয় ( গ: )                           | ৪০৭                | ন শোভতে ন সহতে ( ক: )                        |               |
| চন্দ্রকুমার                                     |                    | জিনয়না ( ক: )                               |               |
| রায় ( গ: )                                     | ২২৫                | প্রেমানন্দ, মহর্ষি                           |               |
| জগদীশচন্দ্র রায়                                |                    | নববর্ষ ( ক: )                                |               |
| এস হে কেশব ( ক: )                               | ৩২১                | উপেক্ষা ( ক: )                               |               |
| তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী                            |                    | বিজ্ঞার বাণী ( ক: )                          |               |
| তিথি-স্মৃতি ( জী: )                             | ১৩৩                | শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্য প্রতিষ্ঠা ( প্র: )      |               |
| আওয়ারাজ ( গ: )                                 | ১২২                | দর্শন ও বিজ্ঞান ( প্র: )                     |               |
| মায়ের ডাক ( প্র: )                             | ৩৩২                | পঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ                     |               |
| তারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ                     |                    | বাংলার মন্দির ( প্র: )                       |               |
| নবরাত্র উৎসব ( প্র: )                           | ২০৮                | পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য                  |               |
| তারাপ্রসন্ন সরকার, ডাঃ পুরাণরত্ন                |                    | বেদগান                                       | ১১৮, ১৫৪, ২৭৮ |
| শ্রীশ্রীচণ্ডীর ক্রমবিকাশ ( প্র: )               | ২৩১                | প্রভাসচন্দ্র সেন                             |               |
| শ্রীমা পূজার একদিক ( প্র: )                     | ২৬৪                | গৌড়বঙ্গে পালরাজগণ ( প্র: )                  | ১৫৫, ৩৬৪, ৪০  |
| মৃত্যুঞ্জয় বিপ্রবীবীর ( জী: )                  | ৪৩১                | প্রবীর বিশ্বাস                               |               |
| দেবেশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক               |                    | অভিশপ্ত কাব্য ( কা: কা: )                    |               |
| ফরাসী ও ভারতীয় কৃষ্টি ও বাংলা সাহিত্য ( প্র: ) | ১২                 | প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী      |               |
| দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী                        |                    | শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী ( প্র: )               |               |
| প্রাচীন অর্কাচীন তথ্যে বরিশাল ( প্র: )          | ১২৬                | ফণিভূষণ বিশ্বাস, অধ্যক্ষ                     |               |
| দেবেশ্বচন্দ্র বসুমল্লিক                         |                    | পাশ্চাত্য নাটক-ইভদেন থেকে ইলিয়ট ( প্র: )    |               |
| পক্ষীতীর্থ ( প্র: )                             | ৩৭১                | কাব্য বনাম আধুনিক কৃষ্টি ( প্র: )            | ৩৫            |
| মহাবলীপুরম্ ( প্র: )                            | ৩২৪                | বঙ্কিমচন্দ্র সেন                             |               |
| দীপ্তোপল রায়                                   |                    | নববর্ষের প্রার্থনা ( শি: )                   |               |
| পূর্ণতা মেলেনি ( ক: )                           | ৩৬৩                | বিনয় চৌধুরী                                 |               |
| ধীরেন্দ্রকুমার সরকার                            |                    | প্রণাম তোমায় ( গী: না: )                    |               |
| সত্যের অভিযান ( ক: )                            | ১০১                | নামটি আমার বহা ( না: )                       | ১৮            |
| ঝাড়ো সঙ্কেত ( ক: )                             | ২০৭                | পূর্ব ও পশ্চিম ( না: )                       | ৩৬২           |
| যৌবন ( ক: )                                     | ৪২৭                | বংশী মণ্ডল                                   |               |
| ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, ঠাকুর                        |                    | পশ্চিমে বৈশাখ ( ক: )                         | ৩৪            |
| শ্রীমা বন্দনা ( ক: )                            | ২৭১                | বিভূতিভূষণ ঘোষ                               |               |
| নরেশ ঘোষ, এম-বি, ডাঃ                            |                    | বিশ্বকবি স্মরণে ( ক: )                       |               |
| রবীন্দ্রনাট্য-চিন্তা ( প্র: )                   | ২৪৮                | বীরেন নাথ                                    |               |
| নৈমিষারণ্যক                                     |                    | চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ ( প্র: )               |               |
| পাষণের ক্ষুধা ( চি: )                           | ২৮৭, ৩৬৭, ৩২৬, ৪২৮ | বিষ্ণুচরণ গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী            |               |
| নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা                           |                    | সরস্বতী ও নারস্বত ( প্র: )                   |               |
| 'স্পিরিচুয়ালিজম' ( প্র: )                      | ৩২৪                | বীরেন্দ্র মল্লিক                             |               |
|                                                 |                    | কবি ও মাছুষ সজ্ঞনীকান্ত ( প্র: )             |               |



| স্ক্রল ঘোষ                                  | শ্রীহংস                                           |                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| মেঘের আড়ালে ( গ: )                         | কলঙ্কিত ( উ: )                                    | ২৫, ৫৩, ৮৭, ১২১, ১৬২, ২৬২, ২৮২, ৩১৭, ৩৫৪, ৩৯০, ৪২৫ |
| তিলাল, শ্রীশ্রীসজ্জগুরু                     |                                                   |                                                    |
| আলোর পথ                                     | ১, ৪৫, ৮১, ১১৭, ১৫৩, ২৪১, ২৭৭, ৩১৩, ৩৪৯, ৩৮৫, ৪২১ | শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী                                 |
| বাঙালীর শক্তিপূজা ( প্র: )                  | ১৮৯                                               | অলৌকিক ( প্র: )                                    |
| মানসকমল                                     |                                                   | ১৬৬                                                |
| শতাব্দীর ডাক ( ক: )                         | ৩৩                                                | শ্রীমাদাস দে                                       |
| নারঞ্জন গুহঠাকুরতা, স্বর্গত:                |                                                   | স্বামী বিবেকানন্দ ( জী: )                          |
| উদাসী ( চি: )                               | ৫৮                                                | ৪৫২                                                |
| কুশাসন ও কলাপাতা ( নি: )                    | ৩৯৫                                               | সন্তোষকুমার কুণ্ড, অধ্যক্ষ                         |
| নিমোহন দাস                                  |                                                   | শিক্ষাপ্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ( প্র: )                 |
| জীবন ময় ( ক: )                             | ৭১                                                | ৭, ৪৭, ৯০                                          |
| হীতোষ বিশ্বাস                               |                                                   | সুবোধচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী                         |
| হরিচরণের গল্প ( ন: )                        | ২১৫                                               | বংশগতি ( গ: )                                      |
| হানামব্রত ব্রহ্মচারী, ড:                    |                                                   | ১২                                                 |
| শ্রীভগবানের মুখে যুদ্ধের কথা কেন ? ( প্র: ) | ২২১                                               | রাত্রি ও প্রভাতে ( গ: )                            |
| মাণিক সরকার                                 |                                                   | ২৪৯                                                |
| ‘মিস্ ও মা’ ( গ: )                          | ৩৭২                                               | শুশীলপ্রসাদ সর্বসাধিকারী, বার-এ্যাট্ট-ল            |
| মতিলাল দাস, ড:                              |                                                   | সতীরাণী ( জী: )                                    |
| কেবল একদিন ( প্র: )                         | ৩৭৬                                               | ২২, ৬১, ১০২                                        |
| সুদন চট্টোপাধ্যায়                          |                                                   | রবীন্দ্র প্রসঙ্গে ( প্র: )                         |
| কালোহাত ( ক: )                              | ৪০০                                               | ১১৯                                                |
| নিমোহন ঘোষ                                  |                                                   | সহমরণ ( গ: )                                       |
| স্বামীজী তোমার পুণ্য পরশে ( ক: )            | ৪৫৪                                               | আমার চ’থে দেখা পূজা ( প্র: )                       |
| গীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য                  |                                                   | এবারের পূজা ( প্র: )                               |
| জীবন ও সাহিত্য ( ক: )                       | ৯৫                                                | ১৫৮                                                |
| অনির্ভরচলিত ( ক: )                          | ২১৩                                               | মহুয়া মহিমায় মহান যারা                           |
| শ্রীমতিলাল স্মরণে ( ক: )                    | ৩৩৮                                               | ৩০৩, ৩৬০, ৪৪৬                                      |
| ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার ( ক: )                 | ৪০৩                                               | ক্রিকেটের জয়যাত্রা ( প্র: )                       |
| প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়                      |                                                   | ৩৩৭                                                |
| হায়রে মা ( গ: )                            | ৯৯                                                | মনীষী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ( জী: )                      |
| যোগানন্দ সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী             |                                                   | ৪১২                                                |
| নবপত্রিকা ( নি: )                           | ১২১                                               | আমার মা ( প্র: )                                   |
| চৌধুরী, ড:                                  |                                                   | ৪৩৪                                                |
| ‘ভারিণী’ ( প্র: )                           | ২২৪                                               | সহদেব মল্লিক                                       |
| খোরমণ চৌধুরী                                |                                                   | গীতি অর্ঘ্য ( ক: )                                 |
| সতীরাণীর শিল্পশৈলী ( প্র: )                 | ২২৯                                               | ৩৪                                                 |
| জিৎ ভট্টাচার্য্য                            |                                                   | সুখমা মৈত্র                                        |
| দিগন্ত ( গ: )                               | ২৩৫                                               | বিশ্বকবি ( ক: )                                    |
|                                             |                                                   | ৩৭                                                 |
|                                             |                                                   | একবারই ফুল ভ জনম ( ক: )                            |
|                                             |                                                   | ২১২                                                |
|                                             |                                                   | সার্থকতা ( ক: )                                    |
|                                             |                                                   | ৪৩৯                                                |
|                                             |                                                   | সমরেশ দাশগুপ্ত                                     |
|                                             |                                                   | বাস ( ক: )                                         |
|                                             |                                                   | ৫৭                                                 |
|                                             |                                                   | সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়                               |
|                                             |                                                   | দুটি প্রাণ ( গ: )                                  |
|                                             |                                                   | ৬৯                                                 |
|                                             |                                                   | সাহাজী, শ্রী                                       |
|                                             |                                                   | গীতার শিক্ষা ( প্র: )                              |
|                                             |                                                   | ৮৩                                                 |
|                                             |                                                   | সুধীর গুপ্ত                                        |
|                                             |                                                   | অভয় ( ক: )                                        |
|                                             |                                                   | ৯৮                                                 |
|                                             |                                                   | একী লীলা ( ক: )                                    |
|                                             |                                                   | ২২০                                                |
|                                             |                                                   | চন্দননগর-জগদ্বাত্রী ( ক: )                         |
|                                             |                                                   | ২৪৭                                                |

|                                      |     |                                            |                                                           |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| সুরেশচন্দ্র মজুমদার                  |     | শ্রুতিবিজ্ঞান রায় (জীঃ)                   | ২১                                                        |
| ভারত জননী (কঃ)                       | ১৩৫ | নরেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-লাভ (প্রঃ)           | ৩০০                                                       |
| সুধীরকুমার মিত্র                     |     | হরগোপাল বিশ্বাস, ডঃ                        |                                                           |
| গোঁস্বামী মালীপাড়া (প্রঃ)           | ২৭২ | বাঙালী পরিবারে মেয়েদের খাদ্য (আঃ)         | ২২                                                        |
| সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ   |     | ভাবনার কথা (আঃ)                            | ১৭                                                        |
| ভাগবতের কথা (প্রঃ)                   | ২২৩ | হীরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়                     |                                                           |
| সন্তোষকুমার দে, এম, এ                |     | কে ভূমি (নিঃ)                              | ২                                                         |
| মহাভারতীয় যুগে দারিদ্র্যসীতি (প্রঃ) | ৩১৫ | বিবিধ—                                     |                                                           |
| সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়           |     | সম্পাদকীয়                                 | ৩৮, ৭৭, ১১৩, ১৪২, ১৮২, ২০৭, ৩০৬, ৩৪৭, ৩৭২, ৪১৭,           |
| নীলকণ্ঠ (সঃ)                         | ৩৩১ | সমালোচনা                                   | ৪৩, ৩৮৩, ৪১৬, ৪১৭,                                        |
| সুনীল চৌধুরী                         |     | সাময়িকী                                   | ৪৪, ৭২, ১১৬, ১৫২, ১৮৮, ২৩২, ২৩৩, ৩১২, ৩৪৮, ৩৮৪, ৪২০, ৪২১, |
| একটি মৃত্যু (গঃ)                     | ৩৩৪ | রবীন্দ্র বাণী                              | ৮                                                         |
| সমরসিদ্ধি কর                         |     | ‘আমার জুগোৎসব’—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র            | ১২                                                        |
| সজ্জগৎরাজী (নিঃ)                     | ৩৭৪ | প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব (আশ্রমী) | ৭                                                         |
| একটি বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে (কঃ)    | ৪৫৪ | সজ্জ-সংবাদ                                 | ২০                                                        |
| হরিহর শেঠ                            |     | মাতৃ তিরোভাব উৎসব (আশ্রমী)                 | ৩৩                                                        |
| বিশ্বকবি অম্বুধ্যানে চন্দননগর (প্রঃ) | ১০৬ | নিবেদন                                     | ৪১                                                        |
| হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য                  |     |                                            |                                                           |
| নববঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র (প্রঃ) | ২৬  |                                            |                                                           |



## চিত্র-সূচী

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| বিশেষ :                  | প্রবণ :                          |
| রবীন্দ্রনাথ (লাইন-স্কেচ) | ৫ প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ       |
| রবীন্দ্রনাথ (স্কেচ)      | ৩৩ দেবীমাতা, শক্তিমাতা           |
| রবীন্দ্রনাথ ও সজ্জগৎরাজী | ৩৫ স্বামী সর্বানন্দ              |
| জ্যৈষ্ঠ :                |                                  |
| সতীন সেন                 | ৫২ ভাদ্র :                       |
| রিষড়া সেবা সদন          | ৭২ রবীন্দ্রনাথের মেঘ-রূপ (স্কেচ) |

## আশ্বিন :

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| শ্রীশ্রীজয়দুর্গা (কালনার নিত্য পূজিতা দেবী) |         |
| রেখাচিত্র ৫ খানি : অভিশপ্ত কাব্য             | ২০৫-২০৭ |
| রেখাচিত্র ৫ খানি : হরিচরণের গল্প             | ২১৫-২২০ |
| সতীরগীর শিল্পশৈলী ৩ খানি                     | ২২২-২৩০ |
| ৮হিমাশুকুমার রায়চৌধুরী                      | ২৩২     |





## আলোর পথ

আত্মবিশ্বাস আমাদের পথ। আমাদের আশ্রয়। ভ্রমেও যেন আমরা অন্ধ কিছুকে আমাদের সম্পদ বা ধর্ম বলে স্বীকার না করি। আমাদের বিশ্বাসই দেশ, জাতি ও ভগবানের কাজে নানা মুক্তিতে আহ্বানকৃত। এই বিশ্বাসের অগ্নিবীৰ্য্য ও ওজঃ মানুষের আধারে সত্যই ধরার বস্তু নয়। দেহ যদি ঈশ্বরানুগত না হয়, বিশ্বাস ধারণ করা রক্তমাংসের শরীরে সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের চরণতলেই জগতের মুক্তিমান বাধা উৰুড় হয়ে আছে। এই বিশ্বাসের চরণতলেই জগতের অন্ধতা মুচ্ছিত। এই বিশ্বাসই সর্বজয়ী। হে বিশ্বাসী নরনারী, আর একবার জীর্ণবস্ত্র কটিতটে জড়িয়ে, এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিয়ে বিশ্বাসের অগ্নিবর্ণ ধারণ কর। আমাদের বেদীতে আবার অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠুক। ঈশ্বরবিমুখ মানুষ ভ্রান্ত। তারা মুখে ভগবানের নাম নেয়, অন্তর শূন্য। কেননা তারা তো ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় করে পথে পা বাড়ায় না—যাহা নশ্বর, যাহা অনিত্য। এই যখন সম্পদরূপে সামনে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। এরা সাপের জাত, কখনও বিষের মঞ্চল করতে পারে। একটা নূতন জাতিকে সবখানি পরিপূর্ণতা, সবখানি সার্থকতা নিয়ে দাঁড়াবার জ্ঞান প্রস্তুত হতে হবে। সমাজ-আজ বিকৃত, দূষিত। স্বশিক্ষা নাই, সাধনা নাই, ঈশ্বরের প্রেম নাই, উচ্চভাব নাই। একেবারে পশুজীবনের তি। এই যে জাতির জীবন তা থেকে সম্পূর্ণ নূতন একটা জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। স্থির হও, সুস্থ হও, অবহিত হও। যেখানে যতটুকু আলুগা আছে, সব রোধ কর। নিজেকে নিরেট করে তোল। ভগবানের অনুগত হওয়ার জন্য যে দুঃখ ও দ্বন্দ্ব তা কেবল দোটানায় মন রাখার দায়েই। সে দায় থেকে মুক্তি লাভ কর। সেই দেখবে স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহে ভাগবত-বিকৃতি ফুটে উঠবে। হাল্কা হও, নিশ্চিন্ত হও, আনন্দময় হও। শ্রোতাস্থিনীর মতই তোমার জীবন-প্রবাহ শান্তিপূর্ণ হোক। তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের যন্ত্র, তুমি শুদ্ধ সত্য; তুমি নিরাময়, অহঙ্কার ও বাসনাশূন্য ভাগবত-বিগ্রহ। তোমার প্রাণশান্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ বাণে আপনার সবখানি চেতনাকে আগিয়েই টানি হোক। তোমার প্রবৃত্তি জয়শ্রীমণ্ডিত দেহখানি অমৃতময়। কেনে কেন গ্রানি ও বিষন্নতা ঘিরে থাকবে? মুক্ত হও, জাগ, ভোগের পবন তবুে অবগাহিত হও।

[ ১৯৬০ সালের দিনগণি হইতে সংকলিত ]

সজবগুরু শ্রীমতিলাল

## প্রশান্তি

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

সর্বস্বং মম বাসুদেব ইতি চেদাকৃতিরৈকাস্তিকী  
যদ্ যদ্ দৃষ্টিপথে ঞ্জতো বচসি বা তন্তুন্ধরে রোচনা ।  
পাদৈনু ত্যাতি সর্বতো নটবরো দোভিঃ স বীণাকরঃ  
কারাগারসমং তদা ভবগৃহং স্মাৎ প্রেষ্ঠ ! রঞ্জালয়ঃ ॥ ২

‘বাসুদেব! তুমি হও সর্বস্ব আমার’  
ঐকান্তিক রস যদি আকৃতিটি মোর ;  
যাহা কিছু আসে দৃষ্টিপাতে বচনে শ্রবণে,  
সকলি তো তোমারি রোচনা প্রাপ মানো ;

পদে পদে তোমারি নৃত্যছন্দ নটবর !  
করে করে মধুবীণা হর বীণকর !  
তাই যদি—কারাগার সম এ মম আলয়,  
প্রিয়তম ! ( তোমারি তো ) আমা ল’য়ে রাস র

## নববর্ষ

মহর্ষি প্রেমানন্দ

আকাশের নীল জলদ লিপ্ত—  
ইন্দুকান্তা রহে অদীপ্ত ।  
শম্পা বালকে জাগে বঙ্গার আবাহন—  
হরপুরে আজ স্বযম-লক্ষ্মী স্নান আনন ।  
মরণসিক্ত গণমন ॥

ভীত চঞ্চল স্রমর-গর্ভ ইন্দিবর —  
বিকশিত দলে জ্রাসে কাঁপে থর থর ।  
পশ্চিম দিকচক্রবালে ঐ অংগুলীর হ’লে বিলয়—  
নীরব চরণে ঘনাল ধরায় পাংস্ত বরণ তিমিরচয় ॥  
স্থিতি গভীর না হ’লে মোচন—  
ব্যথা রঞ্জিত অকণ লোচন,  
উষ্ণ অশ্রু ললামে শোভিবে ক্লিষ্টন কপোল অহুখন ।  
মরণযাত্রী জনগণ ।

ধরার সৌম্য প্রাণের সাম্য হয়েছে স্নান—  
নিপীড়িত ধরা নিয়ত মাগিছে পরিজ্ঞান ।  
নীল নভঃ তলে সিতকুঞ্জ জলে অহুর তনিমা ভাঙ্গিয়া  
স্বভাবের শোভা সমুখাতে ধ্বংসে দিয়াছে রাঙ্গিয়া ।  
ভেদেছে ধ্যান ধূর্জটির ।

নবীন বরষ দশন বিকশি’ হেলায় বিছাল রক্ত আঁচল  
হল স্বাক্ষি প্রাসাদ রুদ্ধ আগল ।

খেয়ালি অণু বিজ্ঞানীর —  
আধ চেতনায় পথের ইশারা, ইরায় পাশে করে ৩  
তার কি বন্ধু ধরিত্রীর ?  
ইন্দুর দেহ মাটির গন্ধে করায় স্নান—  
ভ্রাস্তি শীকরে দিক্ত করিয়া অভিজ্ঞান ।  
অহুর বিশাল আবরণ ভেদী শব্দীর গভীরে করি  
না জানি বা কত স্বজিবাছে ক্ষত হোথায় বাইতে  
হেথার র

শিব সুন্দর মহাকাশ তল  
প্রকৃতি অহুগ নীলা চঞ্চল—  
অহু বিভাজন জাগাল দহন মত্ত মারুতে হ’ল উ  
ক্লেশকুণ্ডিত হৃদকমল ।  
মানস উপ্ত হিংসা দৃষ্ট উন্মিতে—  
নীল নভঃতল কিন্তু চপল ভঙ্গিতে ।  
শাস্ত শিবের সমিত্যুর্ঘ্যে ঘনায় গহীন অন্ধকার—  
জাগায় নিতি অহুভূতি মোদের মরণ বন্দনার  
দিগন্তে আজ ঘনায় কাজল  
বাজে দুঃস্বপ্ন মত্ত মাদল ।

# নববর্ষের প্রার্থনা

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেন

বৈদিক ঋষিরা প্রতিদিন নব উষাকে আহ্বান করে করতেন। উষা হচ্ছে চিৎশক্তি, আনন্দঘন স্বরূপ। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমরা যে দর্শন-লাভ করলাম—তাহার নিকট বৈদিক ঋষিরা আমবাও প্রার্থনা করি—

উষা আ ভাহি ভাহুনা চন্দ্রেন হুহিতর্দিবঃ।

আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যাং সৌভগং ব্যাচুন্তী দিবষ্টিবুঃ।

হ উষাদেবি, তুমি আনন্দসঞ্চারী, জ্ঞানবান্ধি বিকীর্ণ সর্বত্র উদ্ভাসিত কর। সূর্য্যোব এষণা বহনকারী তসমূহ আমাদের জীবনে প্রভূত সৌভাগ্য ও সিদ্ধি-বকারী হউক।

বা যদন্য ভাহুনা বি দ্বারা বৃণবো দিবঃ।

নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথুঃ ছর্দিঃ প্র দেবি সোমতীরিষঃ।

হ উষাদেবি, তুমি আজ ভাতৃকে প্রকাশিত করে কের দ্বার উন্মোচিত করেছ। তুমি আমাদেরকে প্রাশ্রয় প্রদান কর। হে দেবি, তুমি আমাদেরকে প্রেরণাশক্তি প্রকটরূপে প্রদান কর।

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচণাদধিঃ।

বহন্বরূপস্ব উপ স্বা সোমিনো গৃহম্।

হ উষাদেবি, তুমি আমাদের কল্যাণের পথ উদ্ভাসিত প্রতিদিন আবিস্কৃত হও। অরুণবর্ণ জ্ঞানরশ্মি-অস্ত্রসমাহিত সাধকের মধ্যে তোমাকে বহন করে

উষো অদ্যেহ গোমিত্যস্বাবতি বিভাবরি।

রেবদশ্মে ব্যুচ্ছ স্ননুতাবতি।

হ উষাদেবি! তুমি চিৎরশ্মিযুক্তা। তুমি অসীম শক্তি ও অমিতপ্রভাসম্পন্ন, তুমি সত্যবাকযুক্তা। আমাদের অন্তরে তুমি দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত কর।

প্রতিদিন পূর্ব গগনে সূর্য্য উদিত হব কিন্তু আজিকার সন্ধ্যায় যেন একটা বিশেষত্ব আছে। আজ সূর্য্যো-সন্ধে সঙ্গে আমাদের অন্তরে যেন একটা নূতন ভাব তন আনন্দের আবির্ভাব হ'ল। আমাদের মন বলে—নূতন বর্ষ এসেছে নূতন বাণী বহন করে। হে , আমরা তোমাকে আগত জানাচ্ছি। হে বর্ষদেবতা, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

মানুষ যে তার জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করে, মানবজীবন যে এত ঋদ্ধি ও সিদ্ধির অধিকারী, মহাকালের প্রবাহে চলতে চলতে মানুষ যে এত সাধারণ করেছে—একদিন সবই ছিল মহাকালের উপহিত।

এমন একদিন ছিল—যখন মানুষের চেতনা ছিল একান্তভাবে দেহের স্তরে সীমাবদ্ধ, তার জীবনযাত্রা ছিল দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। তারপর খুলে গেল প্রাণের স্তর, জীবনে দেখা দিল ভোগস্পৃহা, বিচিত্র সৃষ্টির তাড়না। দেহ প্রাণের স্তরে মানুষের জীবন হল নানা বৈচিত্র্যে ভোগময়, ঐশ্বর্য্যময়। তারপর ক্রমে উদ্বোধিত হল মনের স্তর, মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হল মন ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নব নব সম্পদে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মানবজীবন। অনন্ত বাত্মপথে চলতে চলতে আবার একদিন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল—চক্ষু বর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে দর্শন ও শ্রবণাদি করে থাকে—কাব দ্বারা নিয়োজিত হয়ে প্রাণ নিজের ক্রিয়া সম্পন্ন করে—মন নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় আব মননকার্য্য করে? উত্তর এল—এই দেহে একজন দেহী আছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, মনাতীত। তিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর দ্বারা নিয়োজিত হয়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে, তাঁকে জ্ঞানলেই সবকিছু জানা যায়—তাঁকে জ্ঞানে পারলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। মহাকাল বুঝি এই সুনিশ্চিত পদম পরিণতির দিকেই মানবজীবনকে পরিচালিত ক'বেছেন।

বৈদিক ঋষি বলেছেন—চরৈবেতি চরৈবেতি, তুমি চল, শুধু চল, অন্তশ্চেতনায়—সেই চেতনায় তুমি ধাপের পর ধাপ, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে চল। তুমি কলি-দ্বাপর-ত্রেতাকে অতিক্রম করে সত্যযুগে উপনীত হও, সত্যকে দর্শনের জন্ত প্রার্থনা কর, তপস্শা কর। তাঁরা আরও বলেছেন—সত্যের মুখ হিবগম্য পাত্তের দ্বারা আবৃত। হে পৃথগ, হে জ্যোতির্ময়, তুমি এই আবরণ অপসৃত কর, আমরা যেন সত্যের দর্শন লাভ করতে পারি, তোমার কল্যাণতম রূপ যেন দৃষ্টিগোচর করতে পারি আর সেই তেজোরশ্মির অন্তরালে যিনি বিদ্যমান—তিনিই আমি—ইহা যেন উপলব্ধি করতে পারি। হে বর্ষদেবতা, ইহাই আজ আমাদের অন্তরের প্রার্থনা-মন্ত্র। আমাদের এই আকৃতি পূর্ণ কর।

সত্য লাভের জন্ত যে তপস্শা তাহাই চলা, তাহাই জীবন, বর্ষের পর বর্ষ, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করে মানুষকে অগ্রসর হতে হবে—ইহাই মহাকালের ইঙ্গিত। হে মহাকাল, সত্যের যত জ্যোতিঃ, ঋতের যত ঋদ্ধি এবং বৃহত্তের যত কল্যাণ অধিগত করে আমাদের জীবন ঋতময় অমৃতময় হোক—ইহাই আজ একান্ত প্রার্থনা।

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং ।) বক্ষী ঋক্

( সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাস্কর অমৃতসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

তিস্রো দ্যাবঃ সবিভূতঃ উপশ্বা একা যমস্ত ভুবনে বিরামাট ।

আগিং ন রথ্যামমৃতামি তস্মুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥ ৬ ॥

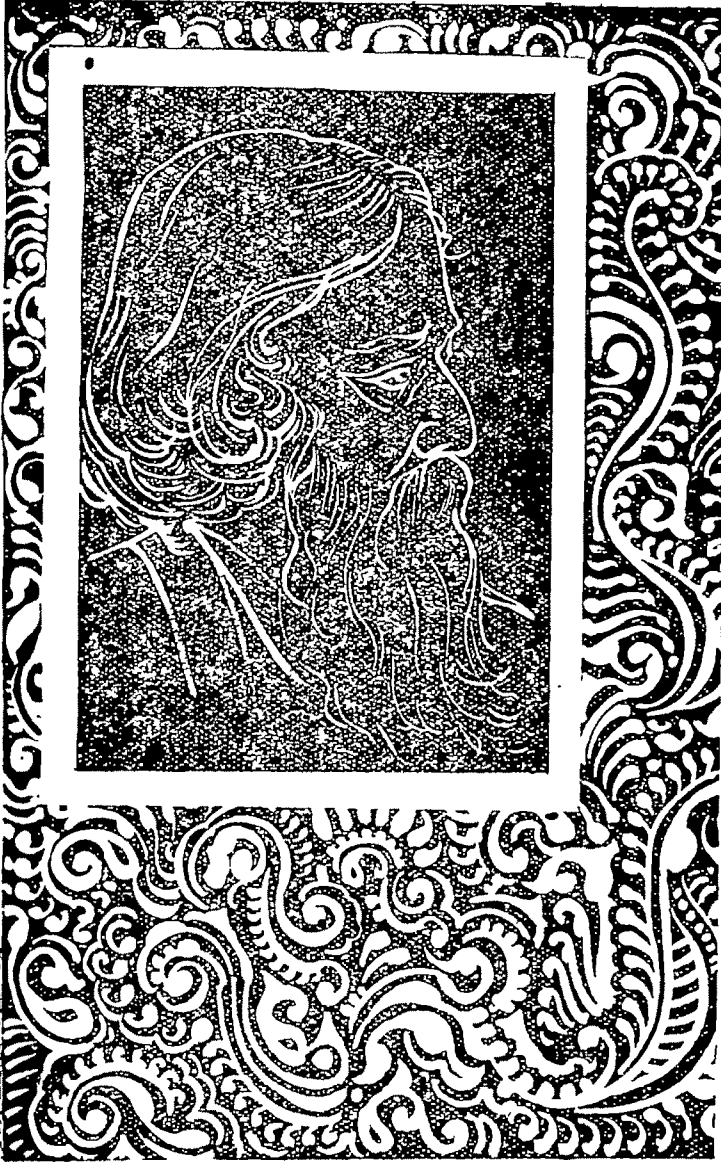
অর্থ—“দ্যাবঃ” ( দিন সম্বন্ধীয় ) “তিস্রঃ” ( ত্রিধা বিভক্ত—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ) [ তন্মধ্যে ] ( দুইটি ) “সবিভূতঃ” ( সবিতার ) “উপশ্বা” ( সমীপবর্তী স্থানে অবস্থিত ) “একা” ( অবশিষ্ট একটি ) “য” ( কালের, অন্ধকারের ) “ভুবনে” ( জগতে, স্থানে ) “বিরামাট” ( গন্তাকে অর্থাৎ সবিতাকে গমন করিতে সা দান করে ) “আগিং ন রথ্যাম্” ( যথ যেমন রথ সম্বন্ধী আগিকে আশ্রয় করিয়া থাকে ) [ সেইকপ ], “অমৃত” ( অমৃতবর্ষী চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ ) “অধিতস্মুঃ” ( সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ) “যঃ উ” ( যিনি ) [ এই সবিতার স্বরূপ ] “চিকেতৎ” ( অবগত আছেন ) “তৎ” ( তিনি ) “ব্রবীতু” ( বলুন ) ॥ ৬ ॥

সরলার্থ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ত্রিধা বিভক্ত দিবসের দুইটি ভাগ সবিতার সমীপবর্তী, অবশিষ্ট এক সবিতাকে অন্ধকারময় স্থানে গমনে সামর্থ্য দান করে। যথ সম্বন্ধী আগিকে আশ্রয় করিয়া রথ যেমন অবস্থান করে তেমনই অমৃতবর্ষী চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই বলুন।

বিশদার্থ—দ্যাবঃ শব্দের বহু বচনে দ্যাবঃ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দ্যাবঃ শব্দ যেমন আকাশবাচী, তেমনই বাচীও হয়—যেমন অস্ত্রোদয়, পরোদয়, দ্যামণি ( দিনমণি ) প্রভৃতি। তিস্রঃ পদটি এই দ্যাবঃ পদেরই বিশেষণ। ত্রি বিশেষণে এখানে দিনটি ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত যে কাল রজোগুণযুক্ত, যে কালে সূর্য্যরশ্মিতে স্বজনী শক্তি থাকে। দ্বিতীয়—মধ্যাহ্ন কাল হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত যে কাল গুণযুক্ত—যাহা স্থিতিশীল, যাহার উত্তাপই জীবজগতের প্রাণশক্তি এবং সেই উত্তাপ হইতেই জলকণিকার সৃষ্টি। তৃতীয়—সূর্য্যাস্ত হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। এই তৃতীয় কালটিকেই ঋকে “যমস্ত ভুবনে বিরামাট” বলিয়া বর্ণ করা হইয়াছে। আচার্য্য সায়নের মতে—“বিরাম্ গন্তুন সহতে সমর্থয়তি ইতি ‘বিরামাট’ অর্থাৎ গন্তাকে গমন করিতে সামর্থ্য দান করে। গন্তাকে কোথাও গমন করিতে সামর্থ্য দান করে? “যমস্ত ভুবনে”। যম অর্থে মৃত্যু অস্তক ইত্যাদি যেমন হয়, তেমনই কাল, সময়, কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার প্রভৃতিও বুঝায়। “যমস্ত ভুবনে”—অর্থাৎ কালে গতিতে কৃষ্ণবর্ণের স্থানে সবিতাকে গমন করিতে সামর্থ্য দান করে। “অমৃত” শব্দে আচার্য্য সায়ন চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণকে ধরিয়াছেন—ইহারা সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই “অধিতস্মুঃ” অবস্থিত থাকে। কিভাবে অবস্থিত থাকে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ঋষি। “আগিং ন রথ্যাম্”—আগিকে অবলম্বন করিয়া রথ যেমন অবস্থিত থাকে তক্রূপ। রথ্যাম্‌হিরক্ষচ্ছিত্রে প্রক্ষিপ্তঃ কীল বিশেষঃ আগিরিত্যুচ্যতে—রথবহিস্থিত অক্ষচ্ছিত্রে প্রক্ষিপ্ত কীল বিশেষকে আগি বলে। যথ যেমন রথ সম্বন্ধী আগিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই প্রকার চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান। চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কবর্গ দর্শন রাত্রিকালেই মিলে। কারণ অন্ধকার না হইলে চন্দ্রের স্থা করিত হয় না এবং চন্দ্র ক্ষরিত না হইলে অপেরও স্থিতি হয় না। অপ না হইলে অম্লের উদ্ভাও সম্ভব নয়। “যং কৃষ্ণং তৎ অম্লং”—সার্থক ক্ষতি প্রমাণ।

রাত্রির প্রয়োজনীয়তা একাধিক। ইহা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত জন্তু প্রাণীরই সমীচীন আনয়ন করে। তাই আরামদায়িনী রাত্রিকে এই সূক্তেই প্রথম ঋকে আবাহন করিয়া বলা হইয়াছে—“স্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং”। রাত্রির অন্ধকারেই তমো গুণের উৎপত্তি। তমোগুণ স্বয়ংকারী এই জন্তু ঋষি সূর্য্যের এই কৃষ্ণ বর্ণকে লয় আখ্যা দিয়াছেন। ঋষির মতে সূর্য্যের লোহিত বর্ণ স্থিতি, শুষ্ক বর্ণ স্থিতি এবং কৃষ্ণবর্ণ লয়প্রোতক।

এত বিশ্লেষণ করিয়াও সর্ব্বশেষে ঋষি বলিতেছেন—সূর্য্যের এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব, ইহা সত্যই দুস্তেয়। মানব ইহা অবগত আছেন, তিনিই কেবল ইহা বিশ্লেষণের অধিকারী, অপরে নহে। সূর্য্য-বিজ্ঞান জগতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সম্যকরূপে অধীত হইলে মানুষ রোগ, শোক, জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। হৃৎ-দারিদ্র্যের চিরতরে অবসান ঘটে। কিন্তু তা’ বয়সজন পারে? হয়ত বা কোটিতে গুটিকই ॥



“জন্মেব দিনে দিয়েছিল আলি তোমারে পরম মূল্য  
রূপসত্তায় এলে হবে সান্নিধ্য হৃদ্যতাবার তুল্য।  
দূর আকাশেব পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে  
নিমেবে নিমেবে চুনি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখে।”

## প্রণাম তোমায়

গীতি-আলেখ্য  
শ্রীবিনয় চৌধুরী

সূত্র

হে ভারতের বাণীমূর্তি—হে  
বাঙলার সৌভাগ্য-সূর্য—হে অখিল  
বিশ্বের গুরুদেব—ওগো বিশ্বকবি  
রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের প্রণাম  
গ্রহণ করো!

হে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ,  
আমরা মহাভাগ্যবান এই হেতু যে,  
আমাদের মাঝে তোমাকে আমরা  
পেয়েছিলুম। তুমি আমাদের গর্বের  
আধার। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মনীষী  
তুমি। তোমাকে আমরা নমস্কার  
কবি। তোমাকে নমস্কার করি আমরা  
সম্মুখ থেকে, পশ্চাৎ থেকে, সকল  
দিক থেকে।

হে মহাজীবন, হে মঙ্গলময় মহা-  
কবি, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ  
করো!

॥ গান ॥

প্রণাম তোমায় ওগো মহাকবি  
মহাজীবনের তুমি যে গো ছবি  
প্রণমি তোমায় প্রণমি আমরা  
আজিকে সকলে মিলি একধারা  
প্রণাম লহগো প্রণাম লহগো প্রভু!

॥ সূত্র ॥

হে ভারতের বাঙময় বিগ্রহ-মূর্তি, হে কবিগুরু  
রবীন্দ্রনাথ, তোমার হৃদয় জীবন-চরিত, তোমার গৌরবময়  
কীর্তিগাথা, তোমার অমৃতসম মহান কাব্য-কাহিনীর কথা  
কখনোই আমরা বিস্মৃত হবো না।

॥ গান ॥

বার্তা তোমার তুলিব না মোরা  
কীর্তি তোমার ঘোষিব আমরা  
কাব্য তোমার কাহিনী তোমার  
জগতের যত গরিমা সম্ভার

ভুলিব না যোরা ভুলিব না কভু  
তুমি যে মোদের চির আপনার

চির কল্যাণময় প্রভু !

প্রণাম তোমায় ওগো মহাকবি  
মহাজীবনের তুমি যে গো ছবি  
প্রণমি তোমায় প্রণমি আমরা  
আজিকে সকলে মিলি একধারা  
প্রণাম লহগো প্রণাম লহগো প্রভু !

॥ সূত্র ॥

ওগো মহাকবি, ওগো 'কবি-ঋষি রবীন্দ্রনাথ, তুমি  
যে ভারতের আত্মার আত্মীয় এ কথা আমরা জেনেছি।  
ইতিহাসের পাঠ থেকে আমরা বুঝেছি—উপনিষদের  
যুগের শেষ ঋষি তুমি, শেষ মুঘল, শেষ পদাবলীকার,  
রেনেসাঁ যুগের তুমি সর্বশেষ প্রতিনিধি। জ্ঞানের  
আলোকে জগতের যত অজ্ঞান-তমসা দূর করে এক নতুন  
যুগের তুমি পতন করলে।

ওগো বাণীর বরপুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আমাদের  
জীবনের প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তুমি আমাদের  
উৎসাহ দিয়েছ, আশীর্বাদ করেছ, অভয়-বাণী শুনিয়েছ।  
ঘরে যখন উৎসব সুরু হয়েছে, তখন তুমি সেই সুরে বাঁশী  
ধরেছ। আবার জীবনে যখন সঙ্কটের মুহূর্ত ঘনিষে  
এসেছে, তখন আর প্রেমের খেলা নয়, তখন তুমি স্বাকার  
ভুলেছ রক্ত-বীণায়।

॥ গান ॥

তুমি ওগো মহা ঋষিক  
চির-উন্নত চির নির্ভীক :  
নবযুগ তুমি আনিলে ধরায়  
ভাবের বহুয় মাতালে বসুধা  
মেটালে পৃথিবীর যত জ্ঞান-ক্ষুধা  
তুমিগো স্তন্য তুমিগো বাসায় বিশ্বপ্রভু !

॥ সূত্র ॥

হে কবিসম্রাট, হে মহাজীবন, হে বিশ্বপ্রেমিক, হে  
বিশ্ববাসী রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের দিয়েছ অনেক। তবে  
এইটেই বোধ করি তোমার সবচেয়ে সেরা দান যে তুমি  
আমাদের স্পষ্ট-চৈতন্যকে জাগ্রত করেছ। তুমিই প্রথম

শোনালে, 'বিশ্ব আমার ঘর। সারা বিশ্বের সঙ্গে মিতালি  
করতে হবে।'

॥ গান ॥

এ বিশ্বভুবনে ওগো অহুপম  
ডাক দিলে তুমি হতে এক মন  
হতে এক জাতি এক আত্মা এক প্রাণ  
হতে এক গৃহবাসী একান্ত আপন।  
বিশ্বমানবতার সেই সে পুঞ্জারী  
সেই সে দিশাবী তুমি যে ওগো  
প্রণাম তোমায় ওগো মহাকবি  
মহাজীবনের তুমি যে গো ছবি  
প্রণমি তোমায় প্রণমি আমরা  
আজিকে সকলে মিলি একধারা  
প্রণাম লহগো প্রণাম লহগো প্রভু !

॥ সূত্র ॥

ওগো আমাদের আত্মার আত্মীয় প্রাণের প্রাণ, ওগো  
মহাপুত্র, মহাপ্রভু, ওগো তুমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ,  
তোমার চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণিপাত। হে  
ত্রিকালদর্শী মহান ঋষি, তুমি আমাদের পুনঃ পুনঃ প্রণাম  
গ্রহণ করো।

॥ গান ॥

ওগো কবিশুঙ্ক ওগো গুরুদেব  
তুমিগো মোদের জাতীয় বিভব  
আত্মার আত্মীয় প্রাণের প্রাণ  
তুমি গো মোদের অমৃত সমান  
প্রণমি তোমায় প্রণমি আমরা  
কোটি প্রণিপাত রাখিগো তোমার  
চরণোপাস্তে প্রভু !

প্রণাম তোমায় ওগো মহাকবি  
মহাজীবনের তুমি যে গো ছবি  
প্রণমি তোমায় প্রণমি আমরা  
আজিকে সকলে মিলি একধারা  
প্রণাম লহগো প্রণাম লহগো প্রভু !!

॥ নমস্কার ॥



# শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

অধ্যক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ড এম. এ.

## সূচনা

ভারতবর্ষের শিক্ষা-আন্দোলনের পথিকৃৎ হলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। মুসলমান শাসনের শেষ পর্বে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মাৎস্ত জ্বায়ে যুগে এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সত্যকারের রূপ কিছু ছিল না। খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রাচীন পদ্ধতিতে কিছু সংস্কৃতি চর্চা যে হোত না তা নয়। কিন্তু সমগ্র সমাজের সম্মুখে আদর্শে সম্মত কোন শিক্ষাধারা বা সংস্কৃতি চর্চা ছিল না। লোক-সংস্কৃতির ধারাও অবলুপ্তপ্রায়, বেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও তব্জা, খেউড, ঝুমুর, কবি অধ্যাবিত প্রাকৃত আবহাওয়া পঙ্কিল। যাত্রা ও তব্জা গানে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব প্রকট।

ইংরাজী শাসনের প্রথম যুগেও এর বিশেষ উন্নতি হয় নি। তবে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এখানে সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা হলেও কোন সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় নি। ক্রমে কিছু কিছু লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় ও অপ্রচেষ্টায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হয়। ক্রমে ক্রমে দেশে ইংরাজী শিক্ষা চালু হয় ও নানা বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ইংরাজীভাষা প্রবল হয়ে উঠলো। প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারের বেড়া-জালে নিজেদের আটকে রাখলেন, অপর পক্ষে নতুন আলোকপ্রাপ্তরা উগ্র বিদেশীয়ানায় দেশের সব সংস্কার বর্জনে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির চেষ্টায় দেশের সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়।

## প্রাকুরবীন্দ্র যুগ

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই দেশে রেনেসাঁ এসে গেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ অগ্রণী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বরাজ আন্দোলন দানা বাঁধছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বাধীনতা বোধ জেগেছে। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের সুর প্রকট। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে দেশের মনোবীরা এ দেশকে নতুন কোরে ভালবাসলেন। নব নব চিন্তার সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে

উঠল। রাজা রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারণ হয়েছে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে। সাহিত্যে নব জাগরণ এসেছে। সমগ্র শিক্ষিত সমাজের মনে নতুন কিছু করার প্রেরণা এসেছে। একটা মহাভাবে একটা স্থিতি যন্ত্রণায় সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে।

এমনি এক যন্ত্রণামুখর দিনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হল। বঙ্গ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের দান নগণ্য নয়। সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধিতে তৎকালে ঠাকুর পরিবার বাংলার বিশিষ্ট। বাংলার নাট্য-আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে এঁদের ধরতে পারি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের একজন নেতা হিসাবে নতুন ভাবধারার বাহক। এ পরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মিলন ঘটেছে। সাহিত্য, শিল্প, নাট্যকলা, সংগীত এক কথায় সংস্কৃতির প্রকাশের প্রায় প্রতিটি দিকেই ঠাকুর পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য। তৎকালে দেশের প্রায় সবকটি গুণী জ্ঞানীর সমাবেশ ঘটতো ঠাকুরবাড়ীতে।

তা ছাড়া নব জাগ্রত স্বাধীনতা বোধ ঠাকুর পরিবারকে নাড়া দিয়েছিল। সংস্কৃতি আন্দোলনের মতোই প্রথম যুগে জাতীয়তা আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে ঠাকুর পরিবারকে ধরা চলে। হিন্দু মেলা ও হুদেদী আন্দোলনের ব্যক্তরূপ ছাড়াও ভাবের স্বাধীনতাকরণে এঁদের অবদান অসামান্য। সেই নবজাগ্রত স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অহুকুল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের দেহমন পুষ্ট হয়েছিল।

## জীবনকথা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর জন্মগ্রহণ করেন। বহু অভিজাত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানরূপে শৈশবে পিতামাতার স্নেহ বড় একটা পান-নি। কৃত্যরাজত্বের শাসনে তাঁর বালাজীবন অতিবাহিত হয়। এ সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন “আমরা ছিলাম চাকরদের শাসনের অধীনে”। (পৃষ্ঠা ৫)। “ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল স্বর্ধের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকলভাবেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবহার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই”। (পৃষ্ঠা ১৩)। বাড়ীর বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে যোগ ছিল না। না ছিল অন্তঃপুরের স্নেহের বন্ধন, না বহির্বিষয়ের উদার আমন্ত্রণ। সংকীর্ণ পরিবেশে সংকুচিত অবস্থায় তাঁর বাল্য অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কবিমন বাহিরের প্রকাশে বাধা পেয়ে বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য বন্ধনে বদ্ধ হয়েছে।

সেই বন্ধনদশা থেকে সাময়িক মুক্তি লাভের জন্ত কাম্বার জোরে অত্যন্ত বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হলেন। সেখানে বেশীদিন ছিলেন না; অতি বাল্যকাল থেকেই প্রচলিত শিক্ষার অসারতা তাঁর চোখে বিসদৃশ লেগেছিল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ছাত্রদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একটি কবিতা সমবেতভাবে আবৃত্তি করান হ’ত। থিয়োরীগত হিসাবে নিভূর্ল হ’লেও ‘বাস্তবতঃ পদ্ধতি প্রয়োগের যান্ত্রিকতা শিশু রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। অথচ ইঙ্গুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোন একটা থিয়োরী অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাহার ছেলেদের আনন্দ বিধান করিতেছেন;.....যেন তাঁহাদের থিয়োরী অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ।’ (জীবন স্মৃতি পৃ: ১৭)। তারপর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হলেন। ‘নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটনব হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোন অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।’ (ঐ পৃষ্ঠা ১৮)। এখানের পর্ক শেষ করে বেঙ্গল একাডেমীতে ভর্তি হলেন। এই স্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না; তবু হাজার হইলেও ইহা ইঙ্গুল। ইহার ঘরগুলো নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলো পাহাবাওয়ালার মত—ইহার

মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ীলা একটি বড় বাজ। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালমন্দ বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত” (জীবন স্মৃতি পৃ: ৩৪)। কিছুদিন পরে তাঁকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করা হোল। কিন্তু প্রচলিত বিদ্যালয়ের প্রাণহীন শিক্ষাপদ্ধতি তিনি কোনরূপেই গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেন। “আমি বেশ বুদ্ধিমান, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে—বিদ্যালয় চারদিকের জীবন ও মৌলিকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা; তাহার নিত্য আবাসিত ঘানির সঙ্গে কোন মতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।” (ঐ, পৃ: ৬০)

বিদ্যালয়ের পাঠ মাদ্ হইলেও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। বাল্যকাল থেকেই বাড়ীতে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যচর্চা চলত। সেজ্ঞ প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা শিক্ষার স্বযোগ পেয়েছিলেন। কিশোর বয়সেই তৎকালে প্রকাশিত প্রায় বইই তাঁর পড়া হয়েছিল। বাড়ীতে শবীরগঠনের জন্ত একদিকে যেমন নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করতে হত অন্যদিকে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পড়তে হোত।

এদেশের বিদ্যালয়ে বিদ্যার বিশেষ কিছু হোলনা দেখে ব্যারিস্টরী পড়ার জন্ত সত্তের বছর বয়সে তাঁকে বিলাত পাঠিয়ে দেওয়া হোল। সেখানে নিয়মিত ইংরাজী, ল্যাটিন, ইত্যাদি পাঠ শুরু করলেন। কিন্তু বেশিদিন এখানেও থাকা হোল না। সাধাবণ ভাবে হরত এখানেই তাঁর বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রসম্পর্কের ইতি।

ইতিমধ্যে তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন। বঙ্গ-ভারতীর ভাঙারে তিনি বিবিধ রসে পূর্ণ করে চলেছেন। কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ ছোটগল্প ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিকীর্ণ করে চলেছেন। তাঁর কাব্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি.....নোবেল পুরস্কার পেলেন। সমগ্র

বিশ্ববাসী তাঁকে বিশ্বকবি হিসাবে বরণ করে নিল। মহান মর্যাদায় তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোল।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ কীর্তি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। শিশুমনের বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষির জীবনাদর্শ এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সেইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রচলিত বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা নিয়মনিষ্ঠা ও শিশু-মনপীড়নায়ক কার্যকলাপ তাঁকে প্রথম থেকেই বিরূপ করে তুলেছিল। “আমি বাল্যকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনে বড় পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে বড় হয়েও সে অন্তায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র কোরে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে কেলা হয়। তাঁর অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিন্তা প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে।... প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যালয় করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না”। (শান্তিনিকেতন পৃ: ৫ ২৬)। তিনি ক্রশোর মত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষাকেই মুখ্য স্থান দিবেছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন “প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলাম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব”। (বিশ্বভারতী, পৃ: ৮৩)। গুটিপাঁচেক ছাত্র নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শে ছাত্রদের আশ্রমে রেখে বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক সম্বল, স্ত্রীর অলঙ্কার, আপন গ্রন্থস্বয় দিয়ে বহুকণ্ঠে আশ্রম পরিচালিত হোত। এ বিষয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন “রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং স্কুল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা এই গুরুভার গ্রহণের পক্ষে অসুকূল ছিল না... সুতরাং যথেষ্ট ত্যাগ

ও দুঃখ স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল।.....প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যানান করিয়া অর্থ লইত না। অপ্রতিগ্রহ ছিল তাহার আদর্শ। শান্তিনিকেতনে সেইরূপ করিবার চেষ্টা হইল, অর্থাৎ ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইবে না। কিন্তু অধ্যাপকদের টাকা যোগাইতে হইল রবীন্দ্রনাথকে” (রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮-২৯)। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, (১) “এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকণ্ঠে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্ব-স্বাস্থ হয়ে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈনন্দিন্যের অন্তরালে..... কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিষ নয়”।

—( বিশ্বভারতী, পৃ: ১২৬-১২৭ )

কেবল শিশুশিক্ষা নয়, বিচিত্র প্রকৃতির মতোই বিচিত্রতর সমৃদ্ধিতে মানব মন পরিপুষ্টি লাভ করুক, তিনি তাই চেয়েছিলেন। তিনি এখানে বিশ্বমানবের মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। সমস্ত বিশ্বের দরবারে হাজির হয়েছেন। বলেছেন ‘আমার ভাঙার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘবে ঘরে’। যেখানে যা ভাল জিনিষ পেয়েছেন তা দিবে বিদ্যালয়কে সাজিয়েছেন।

দেশের অনেক বিদগ্ধ গুণীজন এসে তাঁর চারপাশে ভিড় করলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন। সমস্ত বিশ্বজগতের তাবৎ জ্ঞান-ধারার স্পর্শে শান্তিনিকেতনের ভূমি উর্বর হয়ে উঠলো। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

(১) “তখন আমাব বাড়ি মস্ত একটা দেনা ছিল.....আমার এক গহসার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক ব্যয় অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধারণত সামগ্রীর কিছু কিছু সত্ত্বা করে অদায়া সাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছায় নি। কেবল ব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়াছিল।” (বিশ্বভারতী পৃ: ২৬)।

“আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রশাশীতে ডিগ্রী বানাবার কারখানা ঘর বসেছে। এই শিক্ষার স্বেচ্ছা নিয়ে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জ্ঞান কর্তৃক জ্ঞান নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি।... আমি সম্বল নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিন্তাচর্চার স্বাধীন বাহিরে তার লক্ষ্য ছিল না।..... আমাদের দেশের বিদ্যালয়কে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সঙ্কীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবল মাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাত্ত, নাট্যাভিনয় এবং পল্লী-হিত সাধনের জ্ঞান যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব।” (বিশ্বভারতী, পৃ: ১৩৮—১৪১)।

এই আদর্শে উৎসাহিত হয়ে দেশ বিদেশ থেকে অনেক পণ্ডিতের সমাগম ঘটলো। রবীন্দ্রনাথ পরম সমাদরে সকলকে গ্রহণ করলেন ও জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। আর্থিক দীনতা সত্ত্বেও অপরিমিত প্রত্যয় তাঁকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো। অধ্যাপকদের মনোবা এবং কর্মীদের নিষ্ঠা কবি-ঠাকুরের শক্তি বৃদ্ধি করল। এ সময় লিখেছেন :

“আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে : সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জ্ঞান বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির, ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত, আর আছেন ভীম শাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরাজী সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীম শাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নরুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বহু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূরদেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটেছে। তাছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সম্বল আসছেন। তিনি পারুলী ও

উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের চর্চা করবেন।” (বিশ্বভারতী পৃ: ১৮)।

১৩২৮ সালের ৭ই পৌষ তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের জিনিষ হলেও একে বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। “এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিষ হলেও একে সমস্ত মানবের ক্ষেত্র কোরতে হবে”। এজন্য হিন্দিভবন (১৯৩৩), চীনা ভবন (১৯৩৭) স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেক বিদেশী পণ্ডিত এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পিয়ান, সি. এফ. এণ্ড্রুজ, সিংহলের মহাস্থবির, সিলভা লেভি, মরিস ভিটারনিজ, স্টেনকেনো, ডি. লেজেনী, টেলি ক্রামরিয়া, কার্লো ফমিকি, জিটুচি, জেমস বি. প্রাট ইত্যাদি।

তিনি লোকসেবা ও গঠনমূলক কাজের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে শান্তিনিকেতনের নিকটে সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি, সমবায় পদ্ধতির প্রতি লোকের আগ্রহ সৃষ্টি ও শিক্ষা দেওয়া, বিভিন্ন শিল্প ধেমন— তাঁত, গালার কাজ, কাঁশ বেতের কাজ, কৃষি ও কুটির শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এখন বিশ্বভারতী একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ভারত সরকার এর সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন। এটি আবাসিক, তবে বোলপুরের নিকরবর্তী গ্রামের ছেলেমেয়েদের বাইরে থেকে আসার অসুবিধা দেওয়া হয়।

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট ১৯৪১) জোড়াসাঁকোর পুরাতন বাসভবনে কবিগুরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

### রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবন-দর্শনের অনুরূপ। মনে রাখা ভাল তখন ভারতবর্ষে কোন বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নব জাগ্রত ব্রাহ্মধর্ম ও ঔপনিষদিক মতবাদের প্রভাব কম নয়। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন

ভারতের স্বাধীন স্বরূপ। ঔপনিষদিক ধর্মে নিজের জীবন গঠন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতার প্রভাব অপরিণীম। রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধে ছিল উপনিষদের মর্মবাণী। সমস্ত অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক ঐক্য স্বত্বে বিধৃত। সেই ঐক্যেরই বিচিত্র প্রকাশ জগতের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে। খণ্ডের মধ্যে সত্য নেই, লোভের মধ্যে মহত্ত্ব নেই, গ্রহণের মধ্যে প্রাপ্তি ঘটে না। সমস্ত খণ্ডের ভিতর দিয়ে অখণ্ডের অমূল্যভূতি লাভ, ভূমার উপলব্ধি, আনন্দের উপলব্ধিই পরম প্রাপ্তি। তিনি এক সময় বলেছেন : “উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাঙ্কেব খলিম্যানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রমুখ্যাদিমং বিশস্তিঃ”। “আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে। ...যাহা কিছু সমস্তই আনন্দের দিকে চলিয়াছে”।

কবিব মতে সব কাজ চলে এক পরম সত্তার নামে একটি শক্তিতে। সে হোল শাস্ত্র, শিব, অদ্বৈত। ‘শাস্ত্রং শিবমদ্বৈতম্’ বিশ্বভারতীর আদর্শও তাই। কবি বলেছেন : “জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শাস্ত্রকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের ‘শাস্ত্রং শিবমদ্বৈতম্’ মন্ত্রে কেমন নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

“প্রথমে শাস্ত্রম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্র শক্তি মাহুঘের চোখে পড়ে।... শক্তির মধ্যে তিনি নিয়ম স্বরূপ, তিনি শাস্ত্রম্। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শাস্ত্রের মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মাহুঘের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ।

“পরে শিবম্। সংঘের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়।... তাঁহার শাস্ত্র স্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিব স্বরূপকে শুভ কর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইতে হইবে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য, প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ব হওয়া। প্রথমে শাস্ত্রং পরে শিবম্।

“তারপরে অদ্বৈতম্।... মঙ্গল কর্মের সাধনার যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্ম পরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নব্রতা দ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের

পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখনই অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান।

“আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শাস্ত্রকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি।”

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিন্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয় বোধের যোগ। ...অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে ইহা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।” (শিক্ষা, ১২৪ পৃঃ)

“ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়েছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি, আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদেরকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিন্তা যখন সমস্ত উপকরণকে জর করিয়া অবশেষে আপনাকে লাভ করে তখন সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে, নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্বতররূপে নিজেই উপলব্ধি করিতে হইবে।” (শিক্ষা, পৃঃ ৭২)।

জীবনের আদর্শ হোল আত্মোপলব্ধি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন শিক্ষকতার মাধ্যমে। স্নতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। জীবনের লক্ষ্যের দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্যও মহৎ। মহৎকে পরম দুঃখের মধ্য দিয়ে, চরম সাধনার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। শিক্ষা হোল সেই সাধনা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সত্তার বিকাশ ঘটে ও ক্রমে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। সেজন্ত বৃহত্তর প্রাপ্তির, মহৎ হবার আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী হিসাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করেছেন। এবং আদর্শবাদী হিসাবে শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তালোকের সমৃদ্ধি

# বংশগতি

শ্রীশ্রুবোধচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী

॥ এক ॥

সাদার্প এ্যাভেল্লার চারতলা সাদা বাড়ি। বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে, একটা অন্ধ গলির শেষে। ঠিকানা সাদার্প এ্যাভেল্লার। বাড়ির মালিক প্রশান্ত নাহিড়ী, এ্যাডভোকেট। চারতলার বারান্দায় পাঁচচারি করছে। সন্ধ্যার এই সময়টা তার পায়চারী করা অভ্যাস। একটু পূর্বে প্রতিদিনের মতো সে রেডিও রেফ্রিজারেটরকে চুমু খেয়ে এসেছে।

পায়চারি করতে করতে এখন সে লক্ষ্য করে কেউ তাকে দেখছে কিনা। তারপর সবার অলক্ষ্যে হঠাৎ দরজার কাছের দেয়ালটাকে জড়িয়ে ধরে বিড় বিড় করে বলে—বা—ড়ি—ই—বা—ড়ি—ই—ই— আমার বাড়ি—ই—ই।

এই আতিশয্যের একটু কারণ আছে। প্রশান্তদের আজ বহু পুরুষ ধরে কোন বাড়ি নেই। ওরা কুলীন। বাপ হয় ঘর-জামাই, আর ছেলেমেয়েরা মাহুষ হয় মামার বাড়িতে। ছেলেমেয়েরা আবার বিয়ে করে ঘর ঘর

ষণ্ডর বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। অতীতে যতদূর জানা যায়, এরা একনিষ্ঠ পরভূত। প্রশান্ত তাদের বংশে ক্ষণজন্মা পুরুষ; সে-ই প্রথম বাড়ি করেছে; এবং করেই ভাবছে— যেখানে যত পরিচিত আত্মীয়বন্ধু আছে, সবাই তাকে ঈর্ষা করে।

প্রশান্তর আরেকটা অভ্যাস,—এবং তাতে তার স্ত্রী বিরজাকে সাহায্য করতে হয়,—যে কেউ বাড়িতে এলেই তাকে রিক্রিজিডেয়ার্সহুলভ “ঠাণ্ডাজল” খাওয়ান। ‘জল’-এর পরে ‘ষোং’ নয়; কারণ তাতে পকেটে বিয়োগ হয়। ‘জল’-এর পূর্বে ‘ঠাণ্ডা’; কারণ তাতে পকেটের উষ্ণতা প্রকাশ পায়। সাক্কিস্ নয়, প্রেক্কিস্;—শুধু অতিথির জন্ত নয়, নিজের জন্ত, ছেলের জন্ত, বিয়ের জন্ত, জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই তার রীতি এবং নীতি।

ড্রয়িং-রুমটা সুন্দর করে সাজান। কয়েকটা বেতের মোড়া, এক কোণে সস্তা বেতের সোফায় দামী কাপড়ের ঢাকনি। না-বসলে মনে হবে—দামী সোফার সেট। বড়টার উপর রয়েছে একখানা স্বরোদ। ছেলে প্রদীপ

কামনা করেন এবং ‘সত্যম্ শিবম্ ও সুন্দরম্’এর উদ্বোধনের কথা বলেছেন :

“এই কৃতিত্ব শিক্ষায় অত্যাশ্চর্য্য হলেও এই যে যথেষ্ট নয়, এ কথা মানতে হবে। আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিষ কেমন করে স্থলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিন্তের ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা কবে আমরা জীবন-যাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধি লাভ কি কখনও যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।”

শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও রসলোকের উদ্বোধন ছাড়াও আর একটি দিকের কথাও ভেবেছেন। মানুষ আসলে সামাজিক জীব। সামাজিক হিসাবে সমাজের উপরেও তার কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিসত্তাব সঙ্গে সমাজ সত্তাব মঙ্গলও দেখতে হবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘বহুজনের চিন্তবৃত্তির উৎকর্ষ সহযোগে নিজের

চিন্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠ করা।’ শিক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্য সমাজ-রচনার মৌল উদ্দেশ্যটিও তাই। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন : “সংসারকে, সংসারের মুখ্যকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া জানাটা হইল সমাজ রচনার, জীবন নির্বাহের গোড়ার কথা। ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই এই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।” (ধর্ম, পৃষ্ঠা ১৪০)।

কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। সুতরাং তাঁর পরিকল্পিত সমাজের সামাজিক সৃষ্টিই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার সাধ্য মাত্র। “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনের দাসত্ব মোচন করা।” (১)

(১) রবীন্দ্র শিক্ষাধর্মন পৃঃ ৪২।



বাক্সায়। অস্ত্রটার উপর লোক এলে প্রশান্ত নিজে বসে। অতিথির জন্ত মোড়া। ঘরের আরেক কোণে আছে বই-ঠাসা মস্ত বুক-শেলফ্। এটা বাড়ির ‘লাইব্রেরী’ও বটে। সেখানে আছে পুরুষাত্মক সজ্জিত বর্ণমালা থেকে জ্বল কলেজের যাবতীয় জীর্ণ পুস্তক—সরিং ও থানপটিশেক গুপ্তপ্রেস পত্রিকা।

প্রশান্তর একমাত্র সন্তান প্রদীপ সম্প্রতি যুরোপ থেকে ফিরেছে। সারা অঙ্গে ও ব্যবহারে সেই পরিচয় St. Elmo's fire-এর মতো সে বহন কবে ফেরে। বাবা-মা-শুভ্রজনদের সম্মুখে সিগ্রেট ধায়, ছবেলা ‘ফাউল-কারি’ না হলে তার খাওয়া হয় না, ইংরেজী ও জার্মান সংগীত ভিন্ন ভাল লাগে না, ও কথায় কথায় মা-কে মূর্খ বলে গাল দেয়। বলে,—এসব পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ। আবার Indo-German Society-র সভ্য হয়েও সেখানে বেশি যায় না। কারণ সেখানে নাকি সব ‘স্বব’-দের আড্ডা।

পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে সে বেশে না—কারণ, তাদের মধ্যে নাকি ‘কলচর’ নেই। একমাত্র সীতানাথের সঙ্গেই তার এখনও খুব ভাব। সীতানাথের সাথে সে নাকি আত্মিক মিল অনুভব করে—সেই “ভাবস্থিরাণি জননাস্তর সৌন্দর্যানি”। সীতানাথের কাছে আছে তার সমস্ত শৃঙ্খলহীনতার আধুনিক প্রঞ্জয়। যেন প্রোটনকে ঘিরে ইলেকট্রনের সংলাপ।.....

এ হেন প্রদীপের বিষে হবে।.....

কিন্তু এই বিষে নিয়ে সম্প্রতি জট পেকেছে। প্রশান্তর পছন্দ করা পাত্রীকে প্রদীপ বিয়ে করবে না। সে প্রশান্তকে বলে,—আমার বিয়েব পাত্রী ঠিক করতে কেন তোমার আগ্রহ? এসব হোল বিকৃত মনের সরীসৃপ গমন। সে মেয়েকে তুমিই বিয়ে কর।

প্রশান্ত ক্ষেপে ওঠে। বলে,—তুমি শ্রবণকে বিয়ে না করলে সে যে অন্তর্পূর্ণ হয়ে যাবে।

—বেশ তো। অনন্ততা হবার চেয়ে অন্তর্পূর্ণ হওয়াই শ্রেয়ঃ। যে অনন্ততজ্জা, সেই অন্তর্পূর্ণ হতে পারে। তেমনি বধূই আমার ঠিক হয়ে আছে, যে হবে এই দেহাঙ্গির হবিঃ, ‘ফায়ার ব্রিগেড’ নয়।

এখানে কাহিনীর স্তর। কিন্তু এর পটভূমিকা তৈরী হয়েছিল চল্লিশ বছর পূর্বে। যেমন মাহুষের শ্রাদ্ধকামনার মর্মে থাকে বহু-বিবাহের স্বপ্ন।

প্রশান্তর বিয়ে ঠিক করেছিলেন তার পিতা প্রকাশ লাহিড়ী। মেয়েটি ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের—স্বস্ত্রী, শিক্ষিতা।

প্রশান্ত সে বিয়ে করে নি। সে তার এক বন্ধুর বোন, নরেন মৈত্রের মেয়ে বিরজাকে বিয়ে করে। নরেন মৈত্র বনৌ; কিন্তু তার বংশরক্তে ছিল এক কদর্ঘ ব্যাধির জীবাণু। প্রকাশ আপত্তি করেছিলেন এইজন্যই। কিন্তু প্রশান্তর ছিল বড়লোক হবার দুর্নিবাব আকাঙ্ক্ষা। এই নিয়ে বাপ-ছেলে পৃথক হয়ে গেল প্রচণ্ড কথাস্তরের পর। বহু অশ্লীলতা সেদিন তাদের প্রতিবেশীদের চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি সাধন করেছিল।

তারপর মুখ দেখা বন্ধ। ফের দেখা হয়েছিল প্রকাশের মৃত্যুশয্যায়। শয্যাকতে প্রকাশ তখন পুষ্টি-গন্ধের কস্তুরীনাভি হয়ে আছে। প্রশান্ত ঘরে ঢুকেছিল অত্যন্ত দামী সাহেবী পোশাকে, দামী আতরের গন্ধ ছড়িয়ে ও ঈজিপ্সিয়ান রেগু-এব সিগারেট মুখে দিয়ে। মুখে অবজ্ঞা ও তৃপ্তির হাসি।

এই অপরূপ আবির্ভাব ধরনীতে প্রকাশের উপস্থিতির জলন্ত উপহাস। উপস্থিত সবাই চেয়ে দেখেছিল। প্রকাশের চোখে দিবে জল গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ চোখ বুঁজে ধীরে ধীরে অল্পচ কণ্ঠে প্রকাশ উচ্চারণ করলে,— Judge not, that ye be not judged!

প্রশান্তর মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

এই ঘটনার ছ’বছরের মধ্যেই প্রশান্তর সারা মুখ ও দেহ কদর্ঘ দাগে কলঙ্কিত হয়ে উঠল। ডাক্তারেরা বললেন,—এ তার স্বেপাক্ষিত। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে।

প্রশান্তর সন্তানের মধ্যে এ রোগের প্রসার ঠিক ঐভাবে প্রকাশ পায় না! প্রদীপ দেখতে সুন্দর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M. Sc. পাশ করে প্রদীপ জার্মানীতে ছয় বৎসর ও লণ্ডনে দুই বৎসর উচ্চ শিক্ষায় জন্ম ছিল। এবং বহু ভারতীয়ের মতই

কোন কিছু পাশ না করেই বা না করতে পেয়েই দেশে ফিরে আসে।

আট বছর য়ুরোপে থাকার পর ফিরে এলে বিয়ের চেষ্টা হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রদীপ ফিরে দেখল—বিয়ে তার ঠিক হয়েই আছে।

ভিতরের কারণ কেউ জানে না। প্রশান্ত একবার অভাবে প'ড়ে এক মক্কেলের টাকা ভেঙ্গে বসে। জেল হয়ে যেত। কিন্তু এক ধনী বন্ধু উদ্ধার করলে। এই উপকারের প্রতিদানে শ্রীমন্ত খাঁ নিজেই চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ে শ্রবণার সঙ্গে প্রদীপের পরিণয়। শ্রীমন্ত ব্যবসায়ী, সহজেই জ্বর চিনলেন।

প্রশান্ত তার বাড়ির চারতলাটা করার জন্য শ্রীমন্ত খাঁর কাছ থেকে আরও পনের হাজার কর্ক নেয়। শ্রীমন্ত বলে শ্রবণার সঙ্গে বিয়ের পর এ টাকা সে ছেড়ে দেবে।

প্রদীপ ফিরে এসে বিয়েতে অমত জানাল। বিশেষ পীড়াপীড়িতে শেষে বললে যে, জার্মানীতে একটি মেয়ের সংগে তার ভাব হয়েছে—সেই তার জীবনের অ্যাক্রোভাই—

More bitter than the  
love of youth  
And inaccessible by the young.

জ্যানেট, মিস্ জ্যানেট্‌ই তার ভবিষ্যতের মিসেস্ লাহিড়ী।

॥ হুই ॥

প্রশান্ত বহুদর্শী। য়ুরোপ যাবার পূর্বে ছেলের বিয়ে দেন নি, কারণ তখন তার বাজার দর সামান্য। কলি ফিরিয়েই ববের face value বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিলেতে এখান থেকে ছেলের কাছে প্রতি ডাকে উপদেশ দেন—

“পশ্চাত্য দেশে নারীর মূল্য আমাদের মতো নয়। সেখানে তার অবাধ গতি। তাদের থেকে সাবধানে থেকে। দেহের ক্ষুধা রক্তে চাক্ষুশ্য আনলে সে ক্ষুধার নিবৃত্তিতে নিবৃত্ত হ'য়ে না। তবে কোন স্নেহের সম্পর্ক যেন গড়ে না ওঠে।

“তুমি সর্বদা মনে রাখবে—‘আমার যা আছে কাজ সে আমি সাধিব’। কচকে জীবনের আদর্শ করবে।

“Devil is in all women and that for a single moment of joy they burden you with a lifetime of sorrow. Never put your faith in them Daughters of Eve.”—Villon-র এই কথাগুলো মনে রাখবে। After a moment of joy আর যেন কারও সাথে দেখা না হয়। তোমার ভ্রত এদেশে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা হুই তৈরী হচ্ছে।”

প্রদীপ যে এমন বোকার মত কাজ করবে তা প্রশান্তর বুদ্ধির অগম্য ছিল। আর সবচেয়ে গণ্ডগোলে ব্যাপার যে, ত্যাজ্যপুত্র হবার ভয়কেও প্রদীপ গ্রাহ্য করছে না।

প্রশান্ত কাব্য করে বলে,—আমি শ্রবণাকে বাড়িটা লিখে দিয়ে যাব।.....প্রদীপ হেসে বলে,—খুব ভাল। আমি তাকে বলব আমাকে আমার শোবার ঘরটা শুধু ভাড়া দিতে।

বাড়িতে প্রদীপ টিকতে পারে না। রাত্রিদিন কান্নাকাটি ঝগড়া বিসম্বাদ। তার একমাত্র মানসিক আশ্রয় হোল সীতানাথের বাড়ি। সীতানাথ তার বাল্যবন্ধু। সীতানাথই বর্তমানে তার friend, philosopher and guide। তার বাড়িতেই আসে জ্যানেটের পত্র।

সীতানাথ বলে,—মেসোমশাই (প্রশান্ত) তিল তিল করে যে ঐশ্বর্যের দেউল গড়ে তুলেছেন তা' অসমাপ্ত রাখা কি ঠিক?

প্রদীপ জ্যানেটের চিঠিগুলি দেখায়। হাস্তে লাস্তে যেমন শ্রীমন্তিত চেহারা, তেমনি চিঠিগুলিতে সাহিত্যের ছন্দ। মেয়েটিও মস্ত ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে। সেখান থেকে সে যা পাবে তা' শ্রীমন্ত খাঁর দস্ত সামগ্রী ও প্রদীপের পৈত্রিক সম্পদের সম্মিলিত বিভবকেও হারিয়ে দেয়। সব চেয়ে বড় কথা য়ুরোপের মেয়ে যে ভালবাসতে জানে তার প্রমাণ জ্যানেট্‌। সে তো তার সমাজকে ছেড়ে আসছে। তবে প্রদীপই বা পারবে না কেন বাপকে পয়'দস্ত করতে!

এই টানাপোড়েনের মাঝখানে হঠাৎ প্রদীপ য়ুরোপীয় বণিক-সংস্থায় মোটা বেতনের চাকরি পেয়ে গেল। বিয়ের বাজারে প্রদীপের হ'ল চড়্‌তি ডাক। আর রাষ্ট্র হ'ল যে প্রদীপ জ্যানেটকে কলকাতায় আসতে লিখেছে।...

প্রশান্ত এবার এল সীতানাথের কাছে। বন্ধুকে দিয়ে



বন্ধুকে জ্বালে ফেলাই উদ্দেশ্য। সীতানাথকে সব সে বললে। বলাটা সহজ হয় নি। অনেক ভগিতা অনেক চৌক গিলতে হয়েছে। ছেলের বন্ধুর কাছে ছেলের প্রেম নিয়ে আলাপ তো সোজা নয়।

—আচ্ছা, প্রদীপ তোমায় কিছু বলেছে?

—কী বলবে?

—কিছু বলেনি! শুধু এখানে আসে, হা হা করে হাসে, আর কোন কথা বলে না?

—তাতে বলেই।

—(সাগ্রহে) কী? কী কথা বলে?

—এই চাকরির কথা। একটা ভাল কাজ পেয়েছে। বিলেত ফেরৎ হয়েও তবির ছাড়া কাজ পাওয়া যায় না। চাকরির কথা কাউকে বললেই এদেশে সবাই লেজ মোটা করে।

প্রশান্ত হতাশভাবে,—না না, ওসব নয়। তার বিয়ে সম্বন্ধে জ্যানেটের কথা।

—জ্যানেট! সে কে??

প্রশান্ত একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বলে গেল জ্যানেট-প্রদীপ সমাচার। শেষে বললে,—আমি বিশ্বাস করি আমার পূর্বপুরুষরা আমার\* বাড়িতে অধিষ্ঠিত। তাঁরা মঙ্গলময়। আমার হাতে তাঁরা জল পান। প্রদীপ মেম বিয়ে করলে আমাদের জল হবে শুষ্ক। শ্রাদ্ধ-তর্পণ পূর্বপুরুষরা গ্রহণ করবেন না। পরিবারের উপর নেমে আসবে প্রেতপুরুষের অভিশাপ। আমিও মৃত্যুর পর পিণ্ড পাব না। আমাদের বংশ লোপ পাবে। তার উপর আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধও হবে দেউলে। তুমি প্রদীপকে বুঝিয়ে দিও তাকে ত্যাগ করা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না, যদি সে জ্যানেটকে বিয়ে করে।

সীতানাথ নীরব শ্রোতা। মনে মনে ভাবে, আর পরে প্রদীপকে বলে, বিবেচনায় পূর্বজন্ম ও পরজন্ম দুই-ই এসেছে। বর্তমান-ই শুধু উহু।

সীতানাথ প্রশান্ত-সমাচার সবিস্তারে প্রদীপকে বলে বললো;—বিয়ে করেই ফেল শ্রবণাকে। বিদেশে গিয়ে কত লোক কত কাণ্ড করে, ‘মুরগীর মাংস পর্বত খায়’। আর এতো শুধু একটা মেয়ের সাথে প্রেম!

প্রদীপ বলে—আমি শ্রীকান্ত পড়েছি। ব্রহ্ম-ঔষাশিং দরকার হবে পরে। এখন নয়।

—মানে?

—মানে হোল বাড়িতে যখন কান ঝালাপালা করবে, তখন তোমার কাছে আসব brain washing-এর জন্ত, জ্যানেটের প্রতি আমার আস্থা ফিরিয়ে আনতে।

৥ তিন ৥

প্রদীপের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে—১৫ই বৈশাখ। আজ ৭ই।

সীতানাথ খবরটা পেল জ্যানেটের চিঠিতে। সে সত্য নির্ধারণের জন্ত লিখেছে। জ্যানেট জেনেছে প্রশান্তর পক্ষে। প্রশান্ত তাকে লেখে—

“একজন নাবালিকাকে ( কারণ তোমার বয়স এখনো একুশ হয়নি ) বিয়ের কথা দেবার বা তার কাছে কোনও-রূপ অঙ্গীকারের আইনগত মূল্য নেই। তুমি প্রদীপকে ভুলে যেও। ১৫ই বৈশাখ প্রদীপের বিয়ে। তোমাকে মূল্যবান কোন উপহার প্রদীপ দিয়ে থাকলে তা’ ফেরৎ পাঠাও।”

ইতোমধ্যে প্রদীপও তার শেষ চিঠিতে লিখেছে,— তুমি ভালবাসার কথা প্রতি পক্ষে কেন লেখ? ভালবাসা অন্তরের সম্পদ। তাকে বেশি ফলাও করে বললে তার ওজন কমে যায়।

জ্যানেট অল্পভব করে একটি তপ্ত হৃদয় ধীরে ধীরে তুষার হয়ে উঠছে। সে ব্যস্ত, সজ্জস্ত। কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান তাকে আরও ব্যাকুল করে। প্রদীপের কাছ থেকে চিঠির জবাব না পেয়ে সীতানাথকে লেখে সঠিক সংবাদ আহরণের জন্ত।

সীতানাথও চিঠি পড়ে বিস্মিত, মর্মান্বিত। কিছুদিন সে প্রদীপের দেখা পায় নি। জ্যানেটের চিঠি নিয়ে সীতানাথ চললো প্রদীপের খোঁজে।

জ্যানেটের চিঠির একটা কথা তা’কে ধঁধে। জ্যানেট লিখেছে:

“প্রদীপকে এখানে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয় নি। দেশে ফিরে কি দেশী-চরিত্র ফিরে পেল? এই কি ভারতীয় পুরুষের পবিচয়?”

প্রদীপকে দেখা গেল ঘর বন্ধ করে স্বরোদ বাজাচ্ছে।  
সীতানাথ চমকে যায় তার এত খুসী খুসী ভাব দেখে।  
তবে কি জ্যান্টের নন্দেহ সত্যি !!

—প্রদীপ, তোমার সাথে কথা ছিল।

—কী কথা বল না।

—চিঠি আছে। বাড়ির বাইরে চল।

—জ্যান্টের চিঠি তো? আর বাইরে গিয়ে কি হবে। নাও দেখি। বাড়িতে এখন কেউ নেই।

—শুধু তোমার চিঠি নয়। আমার কাছেও লিখেছে।

প্রদীপ মহা উল্লসিত হয়ে বলে—লিখেছে!! থাক বাঁচা গেল.....ও যে নিজে থেকেই আমাকে ছাড়ল।  
এ আমি জানতুম। তুমি ভাই জ্যান্টকে বিয়ে করে ফেল।

—প্রস্তাব মন্দ দিলে না। সকালে অফিসের ভাত বেড়ে দেবার বৌ হবে শ্রবণা; বিকেলের বউ হবে জ্যান্ট। আমাকে ছবি আঁকতে বা গান অভ্যাস করতে বলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। রাজের জন্ত আরেক বন্ধুর ঘরে আর এক বউ থাকলেই বেশ হয়।

—আমাকে কি অতই দুশ্চরিত্র বলে মনে হয়?

—থাক, ওসব আর বোল না। আমি সমারসেট মমের ছাত্র। ও সব বুঝি। ...এখন নাও চিঠিগুলি পড়।

চিঠি পড়তে পড়তে প্রদীপ গম্ভীর হয়,—না: সীতানাথ, আমি পাগল হয়ে যাব। এখন কী করি বলতো? ও যে আসতে চায়!!.....

—তোমার বিয়ে কি সত্যি ঠিক?

—হ্যাঁ।

—১৫ই বৈশাখ?

—হ্যাঁ, না স্বীকার করে উপায় ছিল না। বাড়িতে এমনি কান্নাকাতি....

—তুমি কি সত্যিই শ্রবণাকে বিয়ে করবে?

—পাগল। এ শুধু সাময়িক পাশ্চি নিয়ে আসা।...

—এ কিন্তু ভাল নয়। সবাইকে ঠকিও না। নিজের ইচ্ছা কি ঠিক কর।.....

In an age of passing loves and  
fading lusts

It is something to be sure of a desire.

নীচে মোটরের হর্ণ বাজল। সীতানাথ উঠে পড়ে।—  
এ মেসোমশাই এলেন। আমি চলি। আমি চিঠি এনেছি বোলে না।

সিঁড়িতে প্রশান্ত ও তার জ্বরী সাথে সীতানাথের দেখা। তারা বিয়ের বাজার করে ফিরছে। সীতানাথকে শাগ্রহে নিমন্ত্রণ করলে।...আর করবেই তো। সীতানাথ চেপে গেলেও উকিল প্রশান্তর বুকে দেরি হয় নি সীতানাথই নাটের গুরু।...

সীতানাথও হাসিমুখে আনন্দ জানায়,—এইবার সারাবড়ি মধুময় হয়ে উঠবে। মধুবাতা ঋতায়তে...

প্রশান্ত,—আরে, আরে, ও যে শ্রদ্ধের মন্ত্র!!

॥ চার ॥

বিয়ের রাত্রে খুব সেজেগুজে প্রদীপ সীতানাথকে বলে—সীতানাথ, দেখ একটা মর্কটের মুখ দেখ। আমার মত শয়তান আর ছুটি নেই। বাবাকে বলেছি, শ্রবণা হবে আমার দাসী, আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

সীতানাথ বলে—ছিঃ। ওসব বলতে নেই। Sublime-কে ludicrous করতে প্রতিভার প্রয়োজন নেই জানি; তাই বলে তোমার নিজের ক্রটির জন্ত নিরপরাধ একটি মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমার নেই। যা হবার হয়েছে। এখন অতীতকে ভুলে যাও।

—ভোলা কি এতই সহজ। জ্যান্ট আমার জীবনের কতখানি জুড়ে আছে তা' তোমরা বুঝবে না। বর্তমানের আমি কোথায় থাকতুম এ বিদেশী মেয়েটি না থাকলে!

—কেন, ভালবাসা ছাড়া সে তোমায় আর কী দিল?

—যুরোপে থাকা কালে বাবাতো ঠিকমত সব সময় টাকা পাঠাতে পারে নি। তখন এ জ্যান্ট তার গয়না ও মূল্যবান জামা বিক্রী কবে আমার খরচ চালিয়েছে। ওরা বড়লোক, কিন্তু ওর অভিভাবকদের তো বলতে পারে নি আমার সম্বন্ধে কোন কথা—যদি আমার সম্মান

লাগব হয়। আমি কত নিবেশ করেছি। তাতে বলতো, আমার নিজের স্বামীকেই তো দিচ্ছি।...Time cycle অল্পস্বামী আমিই নাকি জন্ম-জন্ম ধরে তার স্বামী।

সীতানাথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলে—এতটা অগ্রসর হয়ে পিছিয়ে আদারটা খুব অস্বস্তির হোল।

প্রদীপ ক্ষুব্ধ স্বরে বলে—কী করব! বাবা-মার জগ্রেই তো আমাকে এমন বেইজ্ঞ হতে হোল। বুঝবে ছুদিন পর। আমি শিগ্গিরই ঘুরোপে চলে যাচ্ছি।

বৌ-ভাতের পরদিন সীতানাথ মন্ডায় প্রদীপদের বাড়ি গেল। প্রদীপের বাবা-মা তখন সদ্য বিধেতে পাওয়া উপহার-মামগ্রী মিলিয়ে দেখছিল, বুঝে নিচ্ছিল তাদের মূল্য এবং দাতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের সম্প্রীতির পরিমাপ।

সীতানাথকে দেখে প্রশান্ত বললে—বোস। প্রদীপ বোমাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। এখুনি ফিরবে।

প্রদীপের মা বিরজা বললে—জান সীতানাথ, থোকা তো বিয়ে করবে না বলে কত ঢং করলো। এখন ছুদিনেই বউ-সন্ত-প্রাণ। নিজে বোকে শাঙ্কিয়ে নিয়ে বেড়াতে গেল। বলে—শিল্পীর স্ত্রী কি সাধারণভাবে বেরতে পারে! আমি কিছু মনে করিনি। নাবেকীয়ানা আমার একেবারে ভাল লাগে না। তবে ভয় হয়, সেই জ্যান্টের কথা না বোমা বা তার বাপের বাড়ির লোকের কানে ওঠে। তবেই এক অশান্তি।

সীতানাথ বললে—তা' সে ঘটনা তো বাইরের কেউ জানে না। সেটা প্রকাশ পাবে কেন?

—তা কি বলা যায়? প্রদীপের বন্ধুতো কেউ ভাল নয়। তুমি কিছু মনে কোরো না। সবাই স্বার্থাশ্রয়ী। হিংস্রক। সেদিক থেকেই প্রকাশ পেতে পারে।

প্রশান্ত বলে উঠল—প্রদীপের বন্ধু স্থানে শনি। ওর বন্ধুরাই ওর সর্বনাশ করবে। কতবার ওকে এটা আমি

বুঝিয়েছি। কিন্তু ওতো বেকুব, এটা বোঝে না। তুমি কী বল?

সীতানাথ উত্তর দেবে কি, তার তখন মনে হচ্ছিল কত তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়া যায়। ছু'চার কথার পর সে বললে—আজ আসি। আবেকদিন আসব।

প্রশান্ত ব্যস্ত হয়ে বললে—আবার আরেক দিন কেন। বশো, দেখি প্রদীপ এল কিনা।

চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে জানালে যে প্রদীপ একটু আগে এসে শুয়ে পড়েছে।...খোকাবাবুকে বলেছিল যে সীতানাথবাবু এসেছেন?

—হ্যাঁ বলেছি। তিনি কোন উত্তর করেন নি।

প্রশান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়ে বলে—চলো তোমায় প্রদীপের ঘরে পৌঁছে দিই।

সে এসেছে শুনেও প্রদীপ দেখা করতে এলো না শুনেই সীতানাথের আর সেখানে থাকার ইচ্ছা ছিল না। তবু প্রশান্তর ব্যাকুলতায় সে চললো প্রদীপের ঘরে।

প্রদীপের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। প্রশান্ত ও বিরজা সীতানাথ এসেছে বলে ডাকাডাকি করতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শ্রবণা—প্রদীপের নব পরিণীতা স্ত্রী। ভিতর থেকে প্রদীপ তার স্ত্রীকে ডেকে বললে—দরজাটা ভেজিয়ে দাও!...

দরজার বাইরে চার জোড়া বিস্ত্রিত হতচকিত চক্ষু পরস্পরকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। কয়েক সেকেন্ড!... সীতানাথ বললে—আচ্ছা মেনোমশাই, আজ আসি।

প্রশান্ত বা বিরজা 'আচ্ছা' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না।

সীতানাথ একতলা থেকে গুনতে পেলে হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসির শব্দ। হাসিটা কার সেটা বোঝবার মত মানসিক অবস্থা তার তখন নেই। সেখানে তখন আগাদিরের ভূকম্পন—বান্ধবতার বিবর্তন। Powers-কে শূন্য থেকে ঘন মাটিতে আনা হোল।



## পত্রে পথনির্দেশ

[জটনক অধ্যাপকপিতৃ প্রাঙ্গের উত্তরে লিখিত গৌরুপুত্র কলেশের ভূতপূর্ব অধ্যাপক দর্শনাচার্য্য নামমগ্ন মনীষী সিদ্ধদাধক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজের পত্র। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সৌজন্তে প্রাপ্ত]

আপনার চিঠি পেয়ে খ্রীত হলেম। কিন্তু আপনার কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু মনের কোন প্রশ্নেরই জবাব দেবার সামর্থ্য আমার নাই। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর নিকট আমার কি পরিচয় পেয়েছেন জানি না। তিনি আমাব প্রতি অহেতুক প্রেম পোষণ করেন, এবং তাঁব কাছে যা কিছু শুনেছেন, তা তাঁর সেই অহেতুক প্রেমেরই পরিচয়, আমার পবিচয় নয়। আমি কারো ভবিষ্যৎ দেখতে বা গণনা করতে জানি না, নিজের ভবিষ্যৎও কিছু জানি না। এসব জানবার জন্তে আমার কোন ঔংস্ক্যও নাই। কারো মনের ভিতরে প্রবেশ করবার বিদ্যাও আমি শিখি নাই। আমার নিজের অন্তরের সহিতও আমার পরিচয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ প্রথম জীবনেই সঙ্গুগুরুর অহেতুকী কৃপা লাভ করিয়াছি। তিনি আমাকে সহজ সরল সাধনারই উপদেশ করেছিলেন। যথাসম্ভব নিত্য নিরন্তর গুরুদত্ত নাম হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং জীবনের সকল ব্যাপারে শ্রীগুরু চরণে ঐকান্তিকভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া ও গুরুসেবা বুদ্ধিতে উপস্থিত সাংসারিক কর্তব্য-সমূহ সম্পাদন করতে চেষ্টা করা, ইহাই আমি গুরুকৃপা প্রাপ্ত সাধকদের সাধনা বলে মনে করি।

অহংকার ও মমতাই সংসার, অহংকার ও মমতাই রন্ধন, অহংকার ও মমত্ব সর্বতোভাবে ভগবানে বা শ্রীগুরু চরণে সমর্পণ কবে দিবে নিজেকে খালাস করতে পারলেই মুক্তি। সাধ্যসাধন বিষয়ও অহং-মম-শূন্য হওয়া আবশ্যক মনে করি। অহংকারযুক্ত হয়ে যত সাধনাই কবা যাক না কেন, যত ত্যাগ ও তপস্তারই অঙ্কশীলন করা যাক না কেন, তাতে ভগবান মেলে না; অভিমানই ভগবানের প্রধান বৈরী, সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণই অহংকার নাশের মূখ্য উপায়।

সঙ্গুগুরু শিষ্যের জীবন নিয়ে অনেক প্রকার খেলা খেলেন। এসব তাঁর কল্পনার বিধান। কাকে নিয়ে কি খেলা খেলবেন এবং কখন কাকে কি অবস্থার মধ্যে ফেলবেন, তার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। শরণাগত শিষ্যকে নিজের

জীবনের সব ব্যাপারই গুরু-ভগবানের খেলা বলে মনে নিতে হবে। সবই তাঁর কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ বলে শিরোধার্য্য করতে হবে। গুরু আমাকে এইরূপ কৃপা করুন, এই প্রকার দাবী বা প্রার্থনাও, যিনি যথার্থ আত্ম-সমর্পণ করেছেন, তিনি করেন না। গুরুর কৃপা কবে হবে, এ প্রশ্নও শরণাগত শিষ্যের পক্ষে সমীচীন নয়। গুরুকে আত্মনিবেদন করে দেওয়া হচ্ছে, তিনি তাঁর বস্ত্র নিয়ে যা খুসী তাই করবেন। আমার কিছু বলতে যাওয়াই খুটতা এবং অহংকারের নিদর্শন। তিনি শিষ্যকে সর্বতোভাবে শোধন করে আপনার চিন্ময় স্বরূপে মিলায়ে নেবার জন্তে, কখনো ব্যাধিপীড়া ভোগ করাতে পারেন, কখনো ধনদৌলত যশমানের প্রলোভনের মধ্যে ফেলতে পারেন, কখনো সাংসারিক বা সামাজিক গুরুতর দায়িত্ব মাথায় চাপাতে পারেন, কখনো সুন্দর স্থলব স্বপ্ন বা অলৌকিক দর্শন শ্রবণাদি বা অলৌকিক শক্তি সামর্থ্যাদিও দিতে পারেন, আরো কত কি খেলা খেলতে পারেন। শরণাগত শিষ্য এসব কোন দিকেই তাকায় না, কিছুতে ভয়ও পায় না বা প্রলুব্ধও হয় না, ভাল কিছু পেলেও অভিমানে ডুবে যায় না, খারাপ কিছু পেলেও দোষারোপ করে না। সব ব্যাপারেই সে গুরুর কল্পার খেলাই দেখে। এর পরে গুরুদেব কি করবেন, সে ভাবনাও সে ভাবে না, আগে থাকতে তা কিছু জানতেও চায় না। সে জানে, গুরুদেব যা করবেন, তার মধ্যেই তার মঙ্গল নিহিত, তার মধ্যে দিবেই তার মুক্তির দ্বার খুলে যাবে। সব চিন্তা ভাবনা, সব অস্থির কৌতূহল, সব আশা আপশোষ, গুরুচরণে সঁপে দিবে সে সব অবস্থার মধ্যেই আনন্দে বিচরণ করে। 'স্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'—এই মহাবাণীই সঙ্গুগুরুর আশ্রিত নিরভিমান শিষ্যের জীবনের নিয়ামক হয়। তার কার্য্য হয় গুরুদত্ত নামরূপ, গুরু দেওয়া কর্তব্য গুরুসেবাবোধে অনাসক্ত-ভাবে সম্পাদন, গুরু যখন যে অবস্থায় রাখেন. তাতেই সন্তোষ ও প্রসন্নতা।

# ফরাসী ও ভারতীয় কৃষ্টি ও বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীদেবেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ.

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন কেবল ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত আমাদের পরিচয়। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য বিশাল ও সমৃদ্ধ কিন্তু তাহাদের প্রভাব আমাদের দেশে এক প্রকার আকস্মিক বস্তু বলিয়া মনে হয়। ভারতকে যখন বৈদেশিক শক্তি লুণ্ঠপাট করিতেছিল ইংরাজ তখন বিজয়ী হইয়া তাহার সাহিত্য ও ভাষা ভারতীয়দের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজীর ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা হীন নহে, বহুলাংশে তাহা সমৃদ্ধতর। কিন্তু বাংলা দেশে তাহার যে প্রভাব তাহা অনেকাংশে ইংরাজীর মাধ্যমে আসিয়াছে। ফরাসীরা চন্দননগর, পণ্ডিতেরী, কারিকেল, মাহে ও ইয়াননে যে শিক্ষা-সংস্কৃতি রাখিয়াছে তাহাতেও কিছু কিছু দুই সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ।

ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির উপর ফরাসী মনীষীরা যতটুকু কাজ করিয়াছেন তাহা অতি উচ্চাঙ্গের ও তাহা নিঃস্বার্থ কৃষ্টির ক্ষেত্রেই আপনাকে সার্থক করিয়াছে।

ফরাসীরা ভারতীয় কৃষ্টির উপর কি কি কাজ করিয়াছেন তাহা দেখা দরকার। ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল লুপের চন্দননগরে আসিয়া ফরাসী সরকারের সাহায্যে সংস্কৃত শিখিয়া উপনিষদের এক ল্যাটিন অলুবাদ বাহির করেন; ইহার প্রভূত প্রভাব ইউরোপীয় চিন্তা-ধারায় দেখা যায়—সোপেনহাওয়ার ও ভল্‌তায়েরের মধ্যে। ১৮১৭ সালে কলেজ দে ফ্রাঁসে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয় ও ১৮২২ সালে ফ্রান্সে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। সেই সময়কার কবিদের মধ্যে ভিক্তি, ভিক্তর ছগো, লামার্তিন কবিতায় ভারতীয় বিষয়বস্তুর

আপনি সঙ্গুরর রূপা পেয়েছেন। প্রভুপাদ বিজয়-কৃষ্ণের প্রশিষ্য, গুরুগতপ্রাণ কুমুদবান্ধবের শিষ্য। আপনি অমূলক ভাবনা চিন্তায় আবল হয়েছেন কেন? সম্পূর্ণভাবে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করে' গুরুদত্ত নাম বুক করে', গুরুর দেওয়া কর্মক্ষেত্রে গুরুসেবা বুদ্ধিতে পবিত্র দেহমনে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করে' নিশ্চিন্ত থাকুন। যে সব অলৌকিক দর্শনাদি হয় বা স্বপ্নাদিতে যেসব অলুভূতি হয়, সেসব দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখবেন না, সে সবার গৃঢ়-রহস্য জানবার জন্তে মোটেই কোতুহলী হবেন না। মলমার থেকে নাতিমূল পর্যন্ত কি উঠল কিংবা ভ্র থেকে মস্তক পর্যন্ত কি উঠল, এসব মোটেই খেয়াল করতে নাই, এ সবার কার্যকারণ বিচার করে মনের ভিতর কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করতে নাই। এসব দিকে মন দিলে হয় অভিমান বাড়ে, নচেৎ মস্তিষ্ক বিকৃতিরও সম্ভাবনা থাকে। গুরুর খেলা গুরু খেলছেন; আপনার কাজ গুরুদত্ত নামে দৃঢ় থাকা, অথ কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিরভিमानে ও নিশ্চিন্ত চিন্তে জপ করতে থাকা। ছোট বড় সব সমস্ত গুরুর হাতে ছেড়ে দিবে গুরুপদটি মার্গে

চলুন। বিবাহ করতে মন চায় ত করবেন, না চায় ত করবেন না। যদি মুক্তিই 'জীবনের লক্ষ্য হয় এবং যথেষ্ট চরিত্রবল থাকে, তবে বিবাহ না করাই সমীচীন। এ বিষয়ে কারো কাছে কোন ভবিষ্যৎ গণনার জন্তে যাওয়া উচিত নয়, ওটা চারিত্রিক দুর্বলতার লক্ষণ। বড় ভাইএর সঙ্গে প্রীতি ও প্রেমে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে বসবাস করাই ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতাকে কখনো স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া উচিত নয়। মন যদি বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত থাকে ও অভিमानে মত্ত থাকে, তবে বাহ্যতঃ সংসার ছেড়ে বনে বা পাহাড়ে গিয়েও মুক্ত হয় না; আর মন যদি নির্লিপ্ত ও নিরভিমান হয়, তবে বাহ্যতঃ সংসারকর্মে নিযুক্ত থাকলেও মুক্তির পথে কোন ব্যাঘাত হয় না। বিচারের ভিতরেও যেন অভিমান ও আসক্তি না থাকে। আপনার অন্তর্ধ্যামী গুরু আপনাকে সং পথ দেখিয়ে পরম কল্যাণের দিকে নিয়ে চলুন, ইহাই প্রার্থনা করি। শুভাশীষ জানবেন।

গোরক্ষনাথ মন্দির  
গোরক্ষপুর, ৭।৪।৬১

আঃ  
অক্ষয়

উল্লেখ করেন, ঐতিহাসিকদের মধ্যে গিশেলে ও কুইনে বা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কুভিয়ে ও আম্প্যার তেমনি ভারতের কথা বলিয়াছেন। আবার শুধু কোঁতুহল দেখি তেওফিল গোঁতিয়ে প্রভৃতির মধ্যে। ১৮৬০ হইতে ফ্রান্সে পণ্ডিতদের ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ সংঘত হইয়া আসিয়াছে। ত্যান বা রেনঁর বৌদ্ধধর্ম বা ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ফুটিত লেখায় তাহার প্রমাণ মিলে। কবিদের মধ্যে লেকঁৎ দে লিল্ বা মালার্মের মধ্যে ভারতের প্রতি অমুরাগ লক্ষ্য করিবার বস্তু।

কাব্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে মিলন তাহা স্বরূপ হইয়াছে আইরিশ কবি ইথের্টসের রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করিবার পর। পূর্বে জার্মান, ইংরাজ ও ফরাসী পণ্ডিতরা বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, গীতা ও বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতির অমূল্যবোধকরিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাব একমাত্র গান্ধীজীর প্রভাবের সহিত তুলনীয়। মনীষী আন্দ্রে জিঁদ ও পিয়্যার জঁ জুঁভ রবীন্দ্র-প্রতিভার বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জিঁদ তাঁহার গীতাঞ্জলির অমূল্যবোধের ভূমিকা দেখাইয়াছেন, বৈদিক চিন্তাধারার কি প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের বহু মনীষী ভারতীয় কৃষ্টির নানাদিকে আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নাম করিবার মত সিলভ্যো লেভি, লুই বেগু। লেভির সংস্কৃত নাট্যশালায় উপর মৌলিক গবেষণা ও রেগুব সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর নানা গ্রন্থ বিশেষ করিয়া লেভির চৈনিক বৌদ্ধধর্মের উপর গবেষণা জগতে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু মহামনীষী রোমঁঁ রোলঁঁর মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারা নূতন করিয়া ইউরোপীয় মনে আসন পাইয়াছে। রোলঁঁর যুগান্তকারী চরিত্র-চিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। ভারতের নবজন্ম রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমদ্রবিন্দ্রের মাধ্যমে ইউরোপের চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন জাগাইয়াছে ও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে নূতন স্বর আনিয়াছে। ভারতের বহু গ্রন্থের অমূল্যবোধ হইতেছে। রোলঁঁর উৎসাহে দার্শনিক-

প্রবর বের্গস থুঁটান ও ভারতীয় মরমীয়াতন্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয়েরা ফরাসী-ভাষায় কিছু পাণ্ডিত্যের অবদান রাখিয়াছেন। ইহা প্রভাবের দিক দিয়া সার্থক না হইলেও, নবভারতের ফরাসী-ভারত-কৃষ্টির যোগসূত্ররূপে গণ্য হইবার যোগ্য। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ স্ববোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র, ডাঃ তারাপদ দাস প্রভৃতি পণ্ডিতের দান অরণ্যযোগ্য। বিশেষ করিয়া নাগমহাশয়ের দান সংস্কৃতির ব্যাপারে অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ ফরাসীতে অমূল্যবোধ করিয়াছেন। তিনি ফরাসী ও ভারতীয় চিন্তাধারার যোগসূত্র হইয়া মহামনীষী রোলঁঁকে ভারত সম্বন্ধে ভাবাইয়াছেন, প্রবেশ দিয়াছেন ও ইতিহাসের মসলা যোগাইয়াছেন। আবার ‘প্রবাসী’তে রোলঁঁ সম্বন্ধে প্রবন্ধও অমূল্যবোধ করিয়া বাঙালীর নিকট এই মনীষীকে পরিচিত করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার ব্যাপার যে, ডাঃ নাগ রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা ফরাসীতে অনূদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অমূল্য অমূল্যবোধও কিছু হইয়াছে। মানহা ও নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র চণ্ডীদাসের অমূল্যবোধ বাহির করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ও অনূদিত হইয়াছে। চন্দ্রনগর হইতে কিছু কিছু ফরাসী ভাষার চর্চা হইয়াছে। পণ্ডিতেরী বা কারিকাল প্রভৃতি স্থানে ফরাসী ভাষার চর্চা রীতিমত হইয়াছে। পণ্ডিতেরীর অধ্যাপক জুভো দ্বত্রেই ও গভর্নর জুভানো ভারতীয়-ইতিহাসে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিয়াছেন। সেখানে ইঙ্গ-ফরাসী-সংস্কৃতির রূপ সম্বন্ধে লিখিবার অবকাশ আছে। চন্দ্রনগরের শশাঙ্ক বড়াল, কালীচরণ কর্মকার, তারাপদ দাস, নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র ফরাসী ভাষার রীতিমত চর্চা করেন ও কিছু কিছু রচনা প্রকাশও করিয়াছেন। বহু-গ্রন্থ-গ্রণেতা কবি শ্রীমদীন্দ্র গুপ্ত দার্শনিক কবি ‘বুদ্ধদেব’র সার্থক কবিতার সন্মত অমূল্যবোধ তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা পুস্তক “আলোয়ার আলো”য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যের অমূল্যবোধ বাংলা ভাষায় কিছু কিছু হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে। এ অমূল্যবোধ

কিছুটা ইংরাজী হইতে কিছুটা বা মূল ফরাসী হইতে। প্রথম নাম করিবার মত অম্ববাদ বারনারদ্যা দে স্যা, পিয়ারের লেখা পল ও ভ্যারজিনির অম্ববাদ। রবীন্দ্রনাথ বাণ্যে বাংলা মাসিকপত্রে সে অম্ববাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ফরাসী-লেখক ফেনেলর অম্ববাদ 'টেলিমেকাস' অসম্পূর্ণ রচনা। ফরাসী অম্ববাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি ফরাসী গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ অতি অমুরাগ-সহকায়ে অম্ববাদ করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত অম্ববাদগুলির মধ্যে মোলিয়াবের অম্ববাদ 'হঠাৎ নবাব', পিয়ার লোতির 'ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' ও ভিক্তর কুজ্যার দার্শনিক গ্রন্থ 'মত্যু হুন্সর মঙ্গল' বিশেষ নাম করিবার মত। ইহা ছাড়া ছোট গল্প, কবিতা প্রভৃতি অল্প অম্ববাদ তিনি করিয়াছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের চর্চা করিতেন; কিছু অম্ববাদও করিয়াছেন। বীরবলের যে রসবোধ তাঁহার মধ্যে ফরাসীদের কৃষ্টির স্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয়। এই স্পর্শ চন্দননগরের চাকচন্দ্র রায় মহাশয়ের লেখায়ও প্রচুর পাওয়া যায়। মোলিয়াবের নাটকের অম্ববাদের ছায়া অমৃতলাল, অমর দত্ত, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে ও স্পষ্টভাবে প্রমথ বিনীরা নাটকে দেখিতে পাই।

মধুসূদনের উপর ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব বেশ খানিকটা দেখা যায়। মধুসূদন ফরাসী কবিতা লিখিয়া কবি ভিক্তর হুগোকে সম্মানিত করিয়াছেন। লা ফনত্যানের নীতিমূলক কবিতার অম্ববাদ তিনি স্তম্ভর ছন্দে করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহার নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' মোলিয়াবের 'তারতুক' নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী ভাষাধারা বাংলাদেশে আসিয়াছিল। রামমোহন বিপ্লবী ফ্রান্সকে শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্যে' রসোর *Le Contrat Sociale*-এর আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' আমরা ফরাসী দার্শনিক কৌতের মতবাদের আলোচনাও পাই। পঞ্জিটিভসমূহে লইয়া বাংলায় আন্দোলন হইয়াছে। এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ। আচার্য্য কৃষ্ণকমল

ভট্টাচার্য্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এই মতবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বিজয়রত্ন মজুমদার তাঁহার 'যজ্ঞভস্মে' নানা ধর্মমতের মধ্যে কৌতের মতকে 'নবহরি পূজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা জানি ঠাকুর-পরিবাবে ফরাসী-ভাষার চর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীতে ভিক্তর হুগো হইতে পাঁচটি কবিতার অম্ববাদ দেখিতে পাই। অবশ্য কবিতাগুলি রচনা হিসাবে সার্থক নয়; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ইহাদের মধ্যে কিছু পাই। ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন 'বাস্মীকি-প্রতিভা'র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফরাসী অপেক্ষার প্রভাব আছে। একথা কবিগুরু নিজ মুখেই তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহু যুগ ও বহু প্রভাবের মধ্য দিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছেন। স্ততরাং তাঁহার মধ্যে মেটারলিকের ও সিঙ্খোলিষ্ট কবিদের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয় যেমন বিচিত্র নয় তাঁহার ছোট-গল্পে মোপাসাঁর প্রভাব বা নাটকে ইবসেনের প্রভাব। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 'বলাকা' ও বের্গসঁর সৃষ্টিতে শক্তিশালী অভিব্যক্তিবাদের এক অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রোলঁকে প্রভাবিত করিয়াছেন তাঁহার কবিত্ব, সৌন্দর্য্য, ধর্মবোধ ও লোকোত্তর মানবত্ব দিয়া। তাঁহাদের বন্ধু গ্যেটে-স্টীলার বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ অম্ববাদ বিশেষ করেন নাই; কিন্তু বহু প্রভাব তাঁহার মানসলোকের রং পাটাইয়া দিয়াছে এবং ফরাসী সাহিত্যের বা চিন্তার প্রভাব তাঁহার কবি-জীবনে অসামান্যই রহিয়া গিয়াছে।

কবিতার অম্ববাদক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তুলনা নাই। তাঁহার তীর্থ-সলিলের বহু কবিতা ফরাসী কবিদের অম্ববাদ। এই কবিদের মধ্যে হুগো, বঁসদাঁ, শেনিয়ে, বের্রাঁজে, গোতিয়ে, ভিডি, লিল, বদল্যার, ভার্লেন, মালার্নে প্রভৃতির অম্ববাদ তিনি বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বুদ্ধদেব বহুও কিছু কিছু অম্ববাদ করিয়াছেন। চন্দননগরের প্রমোদরঞ্জন ভড় কিছু সিঙ্খোলিক কবিতার অম্ববাদ করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মোলিয়াবের কয়েকখানি নাটক

বাংলায় অম্লবাদ করিয়া অভিনয়ের বন্দোবস্তও করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুমারী তরু দত্তের ফরাসীতে লেখা উপন্যাস কুমারী আভে-রোয়্যার দিনলিপি একখানি অম্লবাদ তিনি বাহির করিয়াছেন। মনে পড়ে এডুকেশন গেজেট প্রেস হইতে বহুকাল পূর্বে একখানি অম্লবাদও বাহির হইয়াছিল। বাঙালীর লেখা ইংরাজী, বাংলা ও ফরাসী ভাষার Vocabulary বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার দুই একখানি ফরাসী পাঠ্যপুস্তকও বাঙালী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। পাদ্রী গেরান 'রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের একটি সংস্করণ বাহির করেন। আর এক পাদ্রী লুর্দের কর্ত্তী নামে একখানি ধর্মমূলক গল্পের বাংলা অম্লবাদ প্রকাশিত করেন।

স্বাধীনতার পূর্বে ফরাসী সাহিত্যের কিছু অম্লবাদ হইয়াছিল তাহার মধ্যে নলিনীকান্ত রায়চৌধুরীর হুমার 'কামিলের' অম্লবাদ উল্লেখযোগ্য; নৌরীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবাব'—দোদের উপন্যাসের অম্লবাদ। মেটারলিকের 'নীলপাখী'র একাধিক অম্লবাদ বাহির হইয়াছে; তাহার মধ্যে পবিত্রকুমার ও যামিনীকান্তের অম্লবাদ দেখিয়াছি। মনোমোহন রায়ের হুগোর ফিল্ম-সংস্করণের 'লা মিজারেবল' বহুদিন পূর্বে বাহির হইয়াছে। তাঁহারই অম্লবাদ 'নানা' ও গৌরাজ বহুর 'নানার মা' এমিল জোন্সার ইংরাজী হইতে অম্লবাদ। জোন্সাব কয়েকখানি উপন্যাসের সজ সজ অম্লবাদ বাহির হইয়াছে আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স কর্ত্তক—'বহি' অব্যাপক বুই-এর অম্লবাদ, 'বৈদেহী', 'রেণীর প্রেম' ও 'স্বপনচারিণী'। মোপাসাঁর বহু অম্লবাদ বাংলা মাসিকে বাহির হইয়াছে ফরাসী ও বিদেশী অম্লবাদের অম্লবাদস্বরূপ। নলিনীকান্ত গুপ্ত কিছু অম্লবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ও তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার রায়ের নিকট বহু ফরাসী মনীষীর বিশেষতঃ রোলান্‌র পরিচয়ের জন্ত বাঙালী পাঠক কৃতজ্ঞ থাকিবেন। রোমাঁ রোলান্‌র কয়েকখানি গ্রন্থের অম্লবাদ হইয়াছে ও হইতেছে—তাহার মধ্যে লেখক ঋষি দাসের অম্লবাদ 'মা ও ছেলে', 'দুই বোন', 'জাঁ ক্রিস্তোফ' প্রকাশিত হইয়াছে। মনোজ ভট্টাচার্যের ঋষি ছ তুলস

লোত্রেক-এর মূল্য। রুজ, বিমল রায়ের মোপাসাঁর গল্প 'শ্রীমতী ফি ফি ও পতিতা', ইন্দুভূষণ দাশের জুল ভ্যার্নের 'সাইবিরিয়ার প্রান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে। হুমার বহু উপন্যাসের সংক্ষেপিত অম্লবাদ দেখিয়াছি। ভ্যার্নেরও দুই একখানি পুস্তকের ইংরাজী হইতে অম্লবাদ বাহির হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি অম্লবাদ কিছু কিছু হইয়াছে ও স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে বেশ দ্রুত হইতেছে। কিন্তু এই অম্লবাদ আজও উপন্যাস ও কবিতার স্বরে রহিয়াছে। রুসোর *Le Contrat Sociale* বা কুজ্জার 'সত্য, স্বন্দর, মঙ্গল' প্রভৃতি চিন্তাশীল গ্রন্থের নামমাত্র অম্লবাদ দেখিয়াছি। কিন্তু পাসকাল, মনটাই, বের্গসঁর অম্লবাদে হাত দিবার সাহস কাহারও দেখিতেছি না। ফরাসী সাহিত্যের প্রত্যেকে কবি-প্রতিভাব দ্বারা আত্মস্থ করিয়া সার্থক সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র রবীন্দ্রনাথ আবার ফরাসী মনকে মুগ্ধ ও আনন্দমুগ্ধ করিয়াছেন তিনিই। রুসো, কৌং, ফরাসী বিপ্লব, কিছুটা ভলতায়র, ভিক্তর হুগো (আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের *New Essays in Criticism* দ্রষ্টব্য) ও অধুনা রোমাঁ রোলান্‌র প্রভাব বাংলা-সাহিত্যে কিছুটা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর নানা ভাষার চর্চায় সঙ্গে ইংরাজী-ভাষার মত প্রিয় হইবে ফরাসী ও রুশীয় ভাষা। বিশেষ করিয়া ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টির প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য্য বাঙালীর মনকে মুগ্ধ করিবে। কর্ণেই ও রাসিন, ভিক্তর হুগো, বঁসদাঁ, পাসকাল, ফ্লোব্যার (রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন), বোদল্যার, মালার্মে, ফ্রাস, বের্গসঁ, বেনাঁ, সঁৎ, ব্যোভ প্রভৃতি লেখকদের অম্লবাদ হইলে বাংলা-সাহিত্য নানা দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে ও সাহিত্যের অশেষবিধ দিক দিয়া আজও যে আমরা অন্ধতার্ধ্য তাহা আমরাই বুঝিতে পারিব। রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, সাহিত্যে কেবল উপন্যাস, ছোট গল্প ও কবিতায় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি; সাহিত্যেব যে আরও অজস্র দিক আছে যেখানে জ্ঞানব তপস্তার দ্বারা প্রবেশলাভ করা যায় তাহা আজও আমাদের অনায়ত্ত। বিদেশী ভাষার চর্চা বা অম্লবাদে সেই শূন্য দিকগুলি পূর্ণ, পুষ্ট ও সার্থক হইবে আশা করা যায়।



# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ (জানুয়ারী-এপ্রিল) ১৩৫৪-৫৫ বঙ্গাব্দ)

২১

শ্রীহিন্দুভূষণ রায়

- ৭ জানুয়ারী, ২২ পৌষ ১৩৫৩ বঃ—শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরু ৬৬তম আবির্ভাবোৎসব। প্রাতঃসম্মেলনে সঙ্ঘগুরুব আশীর্বাণী প্রদান, দীক্ষাদান। “আনন্দবাহার পত্রিকা”—সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অপরাহ্নে উৎসব-সভায় সঙ্ঘগুরুব আশীর্বাণ।
- ১১ জানুয়ারী—সঙ্ঘগুরুব আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষ্যে স্থায়ী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে চন্দননগর আশ্রমে অনুষ্ঠিত সভায় সঙ্ঘগুরুব ভাষণ প্রদান। রাজিতে ‘প্রবর্তক নারীমন্দির’ কর্তৃক সঙ্ঘগুরুব রচিত “স্বপ্ন ভঙ্গ” নাটিকাভিনয়।
- ১৬ জানুয়ারী—কলিকাতা, সিংখি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্বোধনে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টার পৌরোহিত্যে সঙ্ঘগুরুব আবির্ভাবোৎসব। পরিব্রাজক সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্ঘগুরুব দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ। গোবর্দ্ধন দাস, রমাশ্রমাদ ঘটক, রাধারমণ দাস প্রভৃতি কর্তৃক সঙ্ঘগুরুব অপূর্ব সাধনাব কথা আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান। সঙ্ঘগুরুব লিখিত ভাষণ প্রেরণ।
- ১৭ জানুয়ারী—কলিকাতায় প্রবর্তক ফার্মিসার’ সিং-এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সঙ্ঘগুরুব বক্তৃতা।
- ১৭ জানুয়ারী—সঙ্ঘগুরুব জলপাইগুড়ি গমন—  
ব্যবহারজীবী নলিনীবজ্জন ঘোষেব আতিথ্যগ্রহণ। স্থানীয় বহু লোকের সহিত আলাপ-আলোচনায় যোগদান। ১৯শে তারিখে এক বৈঠকে সহরের বহু গণমান্ত্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে আলোচনা-সভা। হিন্দুত্বের মর্ম-বিস্লেষণ করিয়া সঙ্ঘগুরুব ভাষণ প্রদান। সঙ্ঘের দৈনন্দিন উপাসনায় সহরের বিশিষ্ট জননেতৃগণের যোগদান। পরদিবসে সঙ্ঘগুরুব কাশিয়াং যাত্রা।
- ২৩ জানুয়ারী—সঙ্ঘ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মোৎসবে সঙ্ঘগুরুব ভাষণ প্রদান।
- ২৫ জানুয়ারী—সঙ্ঘে পূর্ণিমা-সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুব বাণী প্রদান।
- ২৫ জানুয়ারী—নৃত্যগোপাল শ্রুতিমন্দিরে অনুষ্ঠিত চন্দননগরের ভূতপূর্ব মেয়র সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের শ্রুতিসভায় সঙ্ঘগুরুব শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান।
- ৩০ জানুয়ারী—নয়াদিল্লী নগরীতে জনৈক আততায়ীর গুলীতে মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রাণ—সঙ্ঘগুরুব নিদারুণ মর্ষব্যথা প্রকাশ। পরদিন সঙ্ঘেব সকল সভ্যসভ্যার উপবাস ব্রতপালন ও চন্দননগরে গুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে সমবেত বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে সঙ্ঘগুরুব শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।
- ১২ ফেব্রুয়ারী—সঙ্ঘগুরুব উদ্বোধনে চন্দননগরে মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্ম বিসর্জন-পর্ব অনুষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়ার কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম রশ্মিলেপ ও তৎসঙ্গে একটি বাণী সঙ্ঘগুরুকে প্রেরণ। (১) মহাত্মাজীর

(১) পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়ার কর্তৃক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাজীর পবিত্র চিতাভস্মাচ্ছলেপ সহ সঙ্ঘগুরুকে বাণী-লিপি প্রেরণ।

“The ashes for Dacca came wrapped up in this paper. We could not possibly succeed in any kind of distribution of the Bhasma of Gandhiji's mortal remains among all those who loved him and could claim on the basis of that love to have and hold a part of the ashes. Even the minutest division could not cope with such a plan. In accordance with Sri Motilal Roy's wishes that I should send a message on paper that has come in contact with the holy ashes I send this greeting written on this paper, wishing, that the thoughts, words and deeds of Mahatmajī may inspire and support the courage and loyalty of all those who come under the influence of Sri Motilal Roy and his fellow-workers.

(Sd) C. RAJAGOPALACHARIAR”

7-2-48

শেষ মর্ত্য-স্পর্শটুকু লইয়া সজ্জের শ্রীমন্দির হইতে সজ্জগুরুসহ চন্দননগর সহরে বিপুল শোভাযাত্রা—  
প্রাতঃ ১০ ঘটিকায় আশ্রমের সম্মুখস্থ গঙ্গাতীরে উপস্থিতি। গান, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসীদাস রামায়ণ, সজ্জগুরু রচিত “অনশনে মহাত্মা” পুস্তকের অংশ বিশেষ পাঠ হইলে পর, সজ্জগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান—অতঃপর নৌকা সহযোগে ভাগীরথী বক্ষে গমন ও বাপুজীর বিদেহ আত্মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া গঙ্গাগর্ভে তাঁর চিত্তাভ্যাস বিসর্জন।

অপরাত্ন ৫।০ ঘটিকায় চন্দননগর জোড়াঘাটে সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে বিরাট প্রার্থনা-সভায় সজ্জগুরুর শ্রদ্ধানিবেদন। মহাত্মাজীর স্মৃতি-তর্পণোদ্দেশ্যে সজ্জগুরুর মুদ্রিত ‘শ্রদ্ধার্থ্য’ পাঠ। উপস্থিতি মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ, হরিহর শেঠ প্রভৃতি।

১৫ ফেব্রুয়ারী—বাণী পূজার দিনে সজ্জগুরুর ভাষণ প্রদান। অপরাত্নে সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে চন্দননগর হাটখোলার স্বয়ং সমিতির বার্ষিক আর্থিক-প্রতিযোগিতা ও সজ্জগুরু কর্তৃক সমিতির পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন।

২২ ফেব্রুয়ারী—আমেরিকার ভারতস্থ রাষ্ট্র-প্রতিনিধি মিঃ চার্লস টমসন্ ও তত্রস্থ বিখ্যাত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ‘ক্রেগ কুইক স্ট্রাংক’ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতির সম্মিলিত সজ্জ পরিদর্শনে চন্দননগরে আগমন। সজ্জগুরু সহিত সজ্জের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও সজ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। অভিনন্দন-সভায় সজ্জগুরুর ভাষণ।

২৪ ফেব্রুয়ারী—মাসী পূর্ণিমার রক্ত জ্যস্তী উৎসবোপলক্ষে আশ্রমে অস্থিত সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।

২৭ ফেব্রুয়ারী—সজ্জগুরুর চট্টগ্রাম আশ্রমে উপস্থিতি। এইদিন সান্ধ্যোপাসনাস্তে উপাসনা মন্দিরে সজ্জগুরুর ভাষণ।

৭ মার্চ—‘প্রবর্তক কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড’র চট্টগ্রাম শাখার উদ্বোধনোপলক্ষে প্রাতঃ ৯ ঘটিকায়

যাত্রামোহন সেন হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে অস্থিত সভায় সজ্জগুরুর বক্তৃতা প্রদান।

৭ মার্চ—চট্টগ্রাম প্রবর্তক আশ্রমে সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কেন্দ্রের ২ম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে সজ্জগুরুর ভাষণ।

৯ মার্চ—সজ্জ শিবচতুর্দশী ব্রতপালন—সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।

১৩ মার্চ—সজ্জগুরুর চট্টগ্রাম হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

২৫ মার্চ—দোল পূর্ণিমান্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।

২৮ মার্চ—চুঁচুড়া, দে-পাড়ায় ‘হরিসভা’ মণ্ডপে সজ্জগুরুর ভাষণ প্রদান।

২৯ মার্চ—সজ্জগুরুর ফ্রেজারগঞ্জ (সুন্দরবন) আশ্রম পরিদর্শনের জন্ত যাত্রা। আশ্রমে অবস্থানকালে প্রতিদিন উপাসনাস্তে স্থানীয় সমবেত কৃষকগণের প্রতি উপদেশ-বাণী।

৫ এপ্রিল—ফ্রেজারগঞ্জ বিষয়বাটীতে এক বৃহৎ কৃষক সভার অস্থাপন—সজ্জগুরুর উপদেশ-বাণী প্রদান।

১৩ এপ্রিল—হুগলী, ঘুটিয়াবাজার ‘স্মৃতি-মন্দিরে’ অস্থিত সভায় সজ্জগুরুর যোগদান ও ভাষণ প্রদান।

১৪ এপ্রিল, ১ বৈশাখ, ১৩৫৫ বঃ—চন্দননগর আশ্রমে নববর্ষোৎসব। সজ্জগুরু কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও উৎসব-সভায় তাঁহার বাণী প্রদান।

১৫ এপ্রিল—সজ্জের অমৃতগাঙ্গী পরলোকগত প্যারীমোহন ঘরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত আশ্রমে অস্থিত সভায় সজ্জগুরুর আশীর্বাদ।

১৭ এপ্রিল—সজ্জ সত্য যামিনীকান্ত দাসের পিতৃদেব অমূল্যরতন দাস ও প্রবর্তক বিজ্ঞাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র ও ভক্ত নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের পরলোকগমনে শোক-সভায় সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।

২৩ এপ্রিল—আসন্ন অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের সূচনা উপলক্ষে শ্রীমন্দিরে সজ্জাধিবেশন—সজ্জগুরুর ভাষণ প্রদান। সন্ধ্যায় পূর্ণিমা-সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী।

২৭ এপ্রিল—কানোড়া হইতে আগত হার্ডিঞ্জ ভার্নাকুলার স্কুল-এর আশ্রম পরিদর্শন ও সজ্জগুরুর সহিত সাক্ষাৎকার। (ক্রমশঃ)





[এ উপভাসের কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। রাজনীতি আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাহিনীর সঙ্গতি রক্ষার জন্য তবুও ঘটটুকু রাজনীতি এসে গেছে তা অপরিহার্য। কোন নেতা, কোন পার্টি, কোন ইজমকেই সমালোচনা করা অথবা কটাক্ষ করা এ উপভাসের উপলক্ষ্য নয়।—লেখক]

—শেষ পর্বন্ত মানুষ অজ্ঞাতই থেকে যায় রে। কেউ জানতে পারে না গোটা মানুষটাকে। তোরাই কি জেনেছিস আমার সবটুকু...চিনেছিস সম্পূর্ণ কালীকঙ্করকে?

মৃত্যুশয্যায় কালীকঙ্করের এই রহস্যময় প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য যেন দিশেহারা হয়ে পড়লুম। দীর্ঘদিন ধরে, বলতে গেলে আজন্ম আমি রয়েছি কালীকঙ্করের পাশে। আমি ওর সর্বকালের সহকর্মী, পার্শ্বচর, অদ্বিতীয় বন্ধু। ঠোঁট নাড়লে ওর কথা বুঝি। মুখ দেখে মন বুঝি। মোটের উপর কালীকঙ্করের কিছুতো জানতে বাকি আছে বলে মনে হয় নি কোনদিন। আজ এ কী প্রশ্ন করল কালীকঙ্কর? আমি ওর জীবনীকার, আমারও মর্মসহচর, আমিও চিনি নি সম্পূর্ণ কালীকঙ্করকে? বিকারের প্রলাপ নয়তো? আমি নীরবে শুধু মাথায় হাত বুলাতে লাগলুম।

—জানিস আত্মজীবনী—যাকে বলে অকপট কনফেশন, একেবারে নির্ভেজাল সত্যি কথা, কোনো রঙ না ফলিয়ে, কোনো কথা গোপন না করে—লিখতে পারে না কেউ। যে-ই যতো হলপ করে বলুক না কেন। পড়ে দেখেছি অনেক নামকরা আত্মজীবনী। সব অর্ধসত্য। শুধু আবরণ দেওয়া আর আভরণ বাড়ানো। জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলোকেই শুধু তুলে ধরা হয়, তার আড়ালে চাপা পড়ে থাকে আর একটা জীবন, ছোট ছোট ঘটনার জীবন, পরস্পরের জীবন, নিষ্ফলতার জীবন। সেখানেও দেখেছি শুধু সিম্প্যাথি ড় করবার প্রয়াস। অর্থাৎ ভুল করেছিলাম বটে, তবে অনিচ্ছাকৃত অথবা ভুল বুঝে ভুল করেছিলাম। না রে না, সজ্ঞানে মানুষ অনেক ভুল করে।

সেই জ্ঞানপাপের কথাটুকুই এড়িয়ে যান সবাই। ও হয় না রে, পারে না মানুষ .....। ক্রশোর কনফেশনই বলো আর মহাত্মার আত্মকথাই বল। সব ঐ একমুহুর। দুখে-জলে জলে-দুখে একাকার।

কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে কালীকঙ্করের। কিন্তু ওর চোখের ভাষা আমি জানি। ও যেন আরও কিছু বলতে চায়। যা গনে করেছিলুম তা নয়। প্রলাপ নয়। কি যেন গভীর কিছু, গোপন কিছু। কিন্তু এ সময়ে ওর কথা কওয়া বারণ। তাই কথা ক'য়ে ওর কথা বলার উৎসাহ বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি হল না। তেমনই নীরবে আইস্যাগটা মাথায় বুলিয়ে বুলিয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে সচেষ্ট হলুম।

—চুপ করে থেকে আমাকেও চুপ করাতে চাস রাজু। কিন্তু আর যে বেশী সময় নেই। একেবারেই চুপ করতে যাচ্ছি। সেই ভাল। আমি বলি তুই শুধু শুনে যা। কথা কাটাকাটিতে কথা খরচ হবে বেশী। জানিস রাজু, আর কটা দিন আমার বাঁচা খুব দরকার ছিল.....দেখে যেতুম নবীনের জয়যাত্রার কিছুটা...আমরা তো পুরাতন জীর্ণ...আমাদের পালা সাজ হ'ল, এবার স্বরূপ হবে নতুনের অভিযান। কিন্তু হল না রে.....তিতলী.....আমাদের সেই বোবা কালা পাহাড়ী মেয়েটা.....তার কিছু খবর রাখিস রাজু?

এই মুহূর্তে তিতলীর কথা নিয়েই ভাবছে কালি দা। আশ্চর্য!

—তুমিই তো তাকে তার স্বদেশে রেখে এলে এবার।

—তাই বলছিলাম বুঝি...হাঃ হাঃ হাঃ...নারে না তিতলী পাগল হয়ে গেছে। বড় অভিমানে পাগল হয়ে গেছে রে। আর তার সন্ধান হয়তো কেউ পাবে না কোনোদিন। তিতলী আমার ক্ষমা করবে না রে রাজু... বড় অভিমানী ও।... উঃ... একটু জল...

কালীকিঙ্করের মুমূর্ষু ম্লান চোখ বেবে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা অশ্রু। কী এক অব্যক্ত বেদনায় ওর কথা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ওকে আর কথা বলতে দেওয়া চলে না। মেয়েটা বোবা কালীই ছিল, না হয় হয়েছে পাগল। ওর কথা পরে শুনেও চলবে। কিন্তু কালীকিঙ্করের বুকের তিতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এ আওয়াজ। মুখে জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে ওর মুখে কোমল হাতে চাপা দিয়ে বল্লম,— এবার চুপ কর কালিদা, কথা কইতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার কথা কওয়া ডাক্তারের বারণ। ওসব শুনব পরে।

—পরে শুনবি? হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা বাজু, সুমিত্রাকে মনে আছে তোর? সেই আমাদের কলেজ-জীবনের সুমিত্রা... আর কল্যাণী, কল্যাণী মজুমদার... দুটি জমজ শিশুর জননী মিসেস কল্যাণী মজুমদার... হাঃ হাঃ হাঃ...

মিস কল্যাণী সোমের মিসেস কল্যাণী মজুমদার হতে বাধা কি। দীর্ঘদিন অবশ্য নিশ্চিত কোন সংবাদ পাই নি। কিন্তু ওর যে প্রবল কাসির দমকে দমকে বমি হচ্ছে। হায়, কি সর্বনাশ করতে চলেছে কালিদা। এ সময়ে কে শুনে চাইছে তোমার ঐ সব পুরাতন স্মৃতি-কাহিনী। মুখ ধুইয়ে এবার জোর করেই মুখ চেপে ধরলুম। আর কথা বলতে দেওয়া হবে না। সুমিত্রা তো মরেছে। মল্লক্কে কল্যাণীও। কিন্তু কালীকিঙ্কর মজুমদারকে তো এখন মরতে দেওয়া চলে না।

দীর্ঘক্ষণ চুপ করেই রইল।

এক সময়ে হাত সরিয়ে নিতেই দেখলুম ওর ঠোঁটে এক আশ্চর্য হাসি। এ হাসি যে কী ভয়ঙ্কর মধুর তা বোঝাবার সাধ্য নেই। শুধু পা থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে কেঁপে ওঠে ঐ হাসি যে দেখেছে তার।

শুধু আমি কেন, কালীকিঙ্করকে আজ না জানে কে?

অবশ্য অন্তরঙ্গদের মধ্যে আমি অন্ততম। আমিই জানি সম্পূর্ণ কালীকিঙ্করকে। ওকে ছাড়িয়ে আমি আরও কিছুদিন যদি বেঁচে যেতে পারি, আমিই হব ওর মূল জীবনীকার। সেজ্ঞা ওর কথা ও কাজের একটা দিনলিপি আমি নিয়ে যাচ্ছি বরাবর। সে ও জানেও। অবশ্য ওর অজ্ঞাতবাসের সাত বৎসরের কাহিনী ওর মুখ থেকে এবং বিভিন্ন ভাষণ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ভাবীকালে হয়তো আর কোন জীবনীলেখক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমার কাছেই আসবে প্রথম, এ সম্ভাবনায় আমার একটা গর্ববোধও আছে। দেশবাসী জানে গণনেতা, জনসেবক, আজীবন সত্যাত্মী সন্ন্যাসী কালীকিঙ্করকে। আমি ওসবের উর্ধ্বমাত্র—প্রতিদিনের সাধারণ মানুষ কালীকিঙ্করকেও জানি। আমি জানি ওর ভাললাগা-নালাগা, ওর পাওয়া-না পাওয়া, ওর হাসিকান্নার সব খুঁটিনাটি খবর। আজ এই জীবন-সায়াহে আমাকে কালীকিঙ্কর এ কী প্রশ্ন করে বলল! আর কি আছে ওর জানতে বাকি? একটি একটি করে দিন পার হয়ে মন চলে যাচ্ছে সুদূর অতীতে। কোথাও কোনো প্রচ্ছন্নতা কোনো অস্পষ্টতা তো খুঁজে পাচ্ছি না। তবে? কী নূতন কথা বলতে চায় আজ কালীকিঙ্কর?... অস্পষ্ট মুহূর্তে আবার কথা কয়ে উঠল কালীকিঙ্কর।

—একটা ছুঃখ রয়ে গেল রে...সাহিত্যিকদের কতো সুবিধা...আত্মজীবনী লিখে যায় কল্লিত এক নায়ক খাড়া করে। সেখানেও ফাঁকি আছে রে... ভেবে দেখ না শরৎ-বাবুর প্রীকান্ত, ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড। এমন কতো আছে। কিন্তু হয়না শেষ পর্যন্ত... শুধু ঐ ক্ষীরটুকু, জলের কথা নাই।

—কিন্তু তুমি তো মন্দ লেখ না কালিদা। তোমার কেন এ অনুতাপ। পৃথিবীকে নতুন কিছু যদি তোমার জানাবার থাকে সে তোমার নিজের কলম দিয়েই পারবে। তাছাড়া আমিও তো রয়েছি। তুমি বলে যাবে, আমি লিখে যাব। এমন তো অনেক লিখেছিও। ওসব এখন থাক কালিদা, তোমার ওষুধ খাবার সময় হল। খেয়ে চুপ করে ঘুমিয়ে পড়তে হবে কিন্তু। বেশী কথা বললে তোমার.....

—কতি হবে বলহিস? তাহা ফুটো নৌকাটাকে আরও কিছুদূর নাহয় টেনেই নিলি, কিন্তু তীরে ভিড়ান যে আর সম্ভব হলনা সেতো দেখতেই পাচ্ছি। বাধা দিসনে রাজু। ঐ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ প্রতিপদের চাঁদ। আর খানিক বাদেই ডুবে যাবে। ডুবে যাবে তোদের কালিদাও। ও আবার কাল উঠবে আরও জ্বল্লে দেখে কিন্তু কালীকিঙ্কর আর উঠবে নারে...এই তার শেষ কথা...চির অস্ত...এরপর শুধু অস্তহীন নিঃসীম নিবিড় অন্ধকার...ভুল ভুল...সব ভুল রাজু...জীবনটা আগাগোড়া একটা প্রতারণা...একটা বিরাট ভুল।...ভুলের হিমালয়...কিন্তু তুমিতো সবই জানতে স্বামিজী, তুমি কেন এত বড় ভুল করলে, কেন এত অযোগ্যের হাতে ন্যূন দিয়ে গেলে মহাতার? কেন ক্ষমা করলে কালীকিঙ্করকে...

—কার কথা বলছ কালিদা?

—সে এক আশ্চর্য দিন গেছে রে রাজু...তোরা চিনলি না তাঁকে—ভারতবাসী চিনল না সেই মহান ভারতবন্ধুকে!

কালীকিঙ্করের হৃৎচোখে অপার্থিব দ্যুতি। যেন কোন স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন নিয়েই ও থাকুক চূপ করে। আমি ধীরে ধীরে উঠে জানালাটা বন্ধ করতে গেলাম। বাইরের এ ঠাণ্ডা লাগান হয়তো ভাল নয়।

—থাক রাজু, থাক ওটা খোলা। আম্বক একটু আলো হাওয়া। দেখে নিই একবার ছুনিয়াটাকে। এতদিন বাস করলাম এই আকাশটার কোলে, অথচ ঐ মহান জ্বলন্ত, ঐ বিরাট শূন্যতাকে একবার প্রাণভরে দেখবারও ছুরসং হল না।...কী অকৃতজ্ঞ মানুষ...আজ আর কাউকে এ ঘরে আসতে দিবিবে রাজু...ভাস্করও নয়...শুধু তুই আর আমি...

আমি নীরব। বাধা আর দেব না। বলুক কথা। এ হয়তো ওর রোগেরই একটা লক্ষণ। কাল ভাস্করকে বলতে হবে।

—জানিস রাজু, আমরা শুধু বাইরের মানুষটাকেই জগতের কাছে বড় করে দেখাতে চাই। দেখে সবাই মুগ্ধ হয়, বাহবা দেয়। কিন্তু ভিতরের মানুষটাকে সবার

কাছে গোপন রাখতে কী চেষ্টাটাই না করে চলেছি আমরা। কতো ফাঁকি যে জন্মে ওঠে এক একটা জীবনে... শুধু প্রতারণা...শুধু অভিনয়...বুদ্ধি আমাদের বেশী, তাইতো ভাবি এই প্রতারণার খেলায় বুঝি খুব জিতে গেলুম। খুব বুঝি ঠকিয়ে গেলুম ছুনিয়াটাকে! কিন্তু ধরা একদিন পড়তে হয় রে...সে যে কী লজ্জা রাজু! জানিস আমিও ধরা পড়ে গেছি। তাইতো সেই তাপ-বিমোচন করুণাময় মরণদেবতার শরণ নিয়েছি, প্রভু, লাজ রাখ হামারি। হাঃ হাঃ হাঃ।...প্রতারণার সৌধের ভিত্তি এবার একেবারে ধ্বসে গেছে। এতদিন যে ধরা পড়িনি সেও শুধু তাদেরই সেই ঠকিয়ে যাবার চেষ্টায়... আমি যাদের ঠকিয়েছি তারাও যে ছুনিয়াটাকে আমারই মত ঠকাতে চেয়েছে। জানিস, ছুনিয়াময় চলেছে এই আত্মগোপনতার প্রতিযোগিতা, তাই মানুষের আসল রূপটা পরস্পরের চেষ্টায় গোপনই থেকে যাচ্ছে। হয়তো এইখানেই মানুষে পশুতে তফাৎ।

কালীকিঙ্করের কথাগুলো মনের গভীর গোপনতম স্থানটিতে গিয়ে এক অনহ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এতো প্রলাপ নয়। ও যেন কথা কইছে এক স্বচ্ছতর লোক থেকে, যেখানে বসে মানুষের অন্তর্লোকের সমস্ত নিহৃত গোপন ছবিগুলি আজও দেখতে পাচ্ছে। এ কি ওর দীর্ঘদিন সাধনায় লব্ধ কোন ঐশীশক্তি। আশঙ্কা হচ্ছে এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে ও হয়তো দেখতে পাচ্ছে আমার মনেরও ক্লেদাক্ত রূপটা। ও চোখ যেন এ মর্ত্য-বাসীর চোখ নয়, যেন ওকে মিডিয়াম করে কোন এক অজ্ঞাত শক্তি আজ কথা কইছে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় আমি চোখ তুলে তাকাতে পারছি না ওর দিকে।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কৃতিও পেলুম এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে একটু বাইরে যাবার স্বেচ্ছা পেয়ে।

কয়েকজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং মজুমদারী কয়েকজন এসেছেন তাঁদের পরম প্রিয় মহান নেতা কালীকিঙ্কর মজুমদারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ নিতে। সাক্ষাৎপ্রার্থী।

তাদের বাইরের ঘরে বসিবে ফিরে এলাম কালিদার কাছে। ওর চোখের দৃষ্টিটা ইতিমধ্যেই আশ্চর্য রকম নিপ্ৰভ হয়ে গেছে। ছ'মিনিট পূর্বের সেই কালীকিঙ্করই যেন নয়। ছুই হাতে সজোরে বুক চেপে ধরেছে নিজেই। ছুনিবার আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গ আমার। তবুও কানের কাছে মুখ নিয়ে দর্শনপ্রার্থীদের খবর দিলুম।

অত্যন্ত অবদমনভাবে মাথা নেড়ে ও জবাব দিলে,—আর নয় রাজু...বলে দে কালকের কাগজেই...আমার মৃত্যু... শোক প্রকাশ...

—কী বলছ কালিদা!

—ইঙ্গিত পাওয়া যায় বে...পেয়েছি...আর কেউ না বুঝলেও যার বুঝবার..। বুকের ঘড় ঘড় আওয়াজটা যেন ঝড়ের আওয়াজের মত শুনছি এবার।...ঝড় এসেছে রে...ঝড়...

বাইরে যারা বসেছিলেন তাঁদের সকালে আসতে বন্ধম। মিথ্যা কথাই বলতে হল, কালিদা ঘুমোচ্ছেন। সায়াদিন অসহ্য কষ্টের পর একটু শান্তির ঘুম।

কিন্তু এতখানি অপ্রকৃতিস্থ ভাবে যে মানুষটা এই ছ'মিনিট পূর্বেও আমার সাথে কথা বলেছে, ছ'মিনিটের মধ্যেই কোথা থেকে আসবে সেই মহা ঝটিকা, আর এই প্রজ্জলিত প্রদীপটাকে নিবিষে দেবে এক ফুৎকারে! এ কথাটা যেন কিছুতেই নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। কালিদা ছ'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেই ঝড়ের দেবতাকে আলিঙ্গন করতে। মুখে যেন একটা বিজ্ঞপের হাসি। চোখ জ্যোতিহান শাস্ত। যেন কোন সূদূর লোকের কোন এক অজ্ঞাত রহস্যের পানে ও তাকিয়ে আছে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে।

ইঙ্গিত কালিদা ঠিকই পেয়েছিল। দেই শেষ মুহুর্তে একমাত্র আমিই যে ওর পাশে থাকবার অধিকার পেয়েছিলুম, একমাত্র আমিই যে ওর শেষ কথার শ্রোতা, শেষ বাণীর বাহক সেই গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল

সেদিন...সকালে যারা এলেন তাঁরা শোক প্রকাশ করলেন, অশ্রু বর্ষণ করলেন। তারপর কতো মাল্যদান, শোভাযাত্রা, শোকসভা, সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা। নানা দেশ বিদেশ থেকে স্বর্গীয় কালীকিঙ্করের অমর আত্মার সঙ্গতি কামনা। সারা দেশটাই যেন শোকের বজ্রায় প্রাবিত হয়ে গেল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ যেন নিপ্ৰভ হয়ে গেল কালীকিঙ্কর মজুমদারের মৃত্যুতে। মৃত্যু নয় মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণের মহাপ্রাণ।

কালীকিঙ্করের শেষ কথাগুলি ছিল বড়ো অস্পষ্ট, দুর্বাগত। একটা হুবোধ্য সঙ্কেত দেখেছিলাম ওর প্রতিটি কথার প্রকাশভঙ্গীতে। যেন কিছুতেই বলতে পারছে না কি যেন, অথচ বুকের মধ্যে কথাগুলো গুমরে গুমরে উঠছে। মৃত্যুযজ্ঞণাব চেয়েও অনেক বড়ো এ যজ্ঞণ। এ অস্তর্দাহ। আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু নিরুপায়—চোখের জল ছাড়া আমি আর কি সাহসনা দিতে পারি। তবুও বলেছিলাম, যে কথা এ জীবনে বলা প্রয়োজন মনে করোনি কালিদা তা না হয় থাকুক অজ্ঞাত। তোমাকে আমরা যেভাবে জেনেছি তাই সত্য হয়ে থাকুক।

অসহ্য জ্বালায় সারা দেহ তার কুঞ্চিত হয়ে গেল যেন।

—ঐখানেই হুঁধ...কী লজ্জা...তোকেও বলতে পারলুম না নিজ মুখে...মরতে বসেও...পড়ে দেখিস...এই নে...নিজমুখে...হয় না...তুই...এই নে। ...পড়ে শেষ করতে পারি নি.....

কালিদার কম্পিত হাতখানা বালিশের নীচে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে—অকস্মাৎ স্থির হ'য়ে গেল। 'এই নে' বলে ওর অক্ষম হাত যা তুলে দিতে চেয়েছিল আমার হাতে তা ও খুঁজে না পেলেও আমি পেয়েছিলাম ওর বালিশের নীচেই। একখানা বাঁধান খাতা। আগাগোড়া এক-প্রকার সাঙ্কেতিক লেখায় ভরতি। এ লেখার সঙ্কেত একমাত্র আমিই জানতুম। পাঠোদ্ধার করলে এই দাঁড়ায়।

(ক্রমশঃ)



# সতীরাণী

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

8

## স্বাস্থ্যমিকেতনে

জামতাড়ায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অসুস্থ পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণ বেশ দেখা যায়। ইহা ঘটে স্থান-মাহাত্ম্যে বা স্থনিপুণ সেবা-যত্নের গুণে, বলা সহজ নয়। বোধহয় দুইটির সমষ্টিতেই সফল ঘটে সহজে। অনন্তমনা হইয়া পুত্রপ্রাণা জননীর পুত্রের স্বাস্থ্যের কল্যাণে সতত তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ভ্রাতৃবৎসল্য বিজলীর ঘরে বাহিরে ভ্রাতার চলাফেরার উপরও স্বেচ্ছা দৃষ্টি, একদা মরণ ছুয়ারে প্রায় উপনীতকে সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে ভুলিয়াও পশ্চাৎপদ কখনও হয় নাই। জামতাড়ায় মানসিক অবস্থান হইলেও অপরের সহিত মেলামেশার অবসরও তাঁহারা পান নাই।

ভ্রাতাকে লইয়া ভগিনী প্রত্যহ সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইত। হাসিধূসিতে দুর্বলদেহ ভ্রাতার মনের প্রফুল্লতার স্তম্ভ বিজলী তাহার সাধে সাধে আসিত হইত। আর কোনও বিষয়ে তাহার মন ছিল না। জামতাড়ায় সমাগত বাঙালী পথচারিরা প্রসঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত তাহাদের উপর। ক্রমে তাহারা এমন আকৃষ্ট হইল তাহাদের উপর যে, অবসর মত বাটীতে আসিয়া সকলের সহিত আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিল না। জানাশুনা হইবামাত্র তাহারা বুঝিল কেন ইহারা পাশের বাড়ীর লোকজনের সহিত মেলামেশা করিয়া সময় ক্ষেপ করেন না। ইহাদের উপর প্রভায়ে তাহাদের মন ভরিয়া উঠিল। প্রজ্ঞা ক্রমে পরিপত হইল নিবিড় বন্ধুত্বে।

বিকাসের ক্রমোন্নতি ক্রতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। গৃহস্থ একেবারে অজানা, অচেনা, জামতাড়ায় নহে। সেখানকার অনেকেই তাঁহাদের চিনিতে নামে। গৃহস্থের সহিত অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহারা মাথামাখি করিতে ইতস্ততঃ করে, গৃহিণী ও কন্ডার একমনে একপ্রাণে পীড়িতের সম্বন্ধে কর্তব্য পালন হেতু। তথাপি জামতাড়ার সর্বজনপ্রিয় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসু, এন্-ডি-ও ও তাঁহার পত্নী নীরা দেবী, মাতৃ আশ্রয়ের অধিনেত্রী, কলিকাতা ঠার

থিয়েটারের পরিচালক অপরেশবাবু প্রভৃতির ঘন ঘন যাওয়া আসা বন্ধ থাকে না সৌহার্দ্যবশতঃ। গৃহস্থের মানসিক চিন্তার কারণ দূর হইলে ‘ওয়েস্ট নুকে’ (West Nook বাটীর নাম) অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে থাকে ॥

বাড়িয়া যাইবার কারণ সতীরাণীর ধর্মকর্মে একনিষ্ঠার ভাব সম্বন্ধে সমাগত সকলকে জাতি-ধর্ম নির্বিশিষ্টারে সমান সমাদর, আদর আপ্যায়ন। চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে আপন করিয়া তাহাদের লইতে হয় নাই। সতীরাণীর আন্তরিকতা ও মিষ্টভাবিতা নিমেষে সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। স্নান-কণ্ঠী বিজলীর সঙ্গীত কলায় মাতোয়ারা হইয়াছে সমাগতেরা। আর গৃহকর্তার সরস আলাপনে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারে নাই। এইজন্য গৃহস্থের জন-প্রিয়তার অবধি থাকে নাই। অনটনের দিনেও, সতীরাণীর দাসদাসীর অভাব ঘটে নাই কখনও। জামতাড়ায় চৌদ্দমাস বসবাসের মধ্যে, মায়ের কাজে ঢুকিয়া কাজ করিয়াছে তাহারা শেষ দিন পর্যন্ত।

স্বাস্থ্যনিবাস জামতাড়ার যথাসম্ভব উন্নতিসাধন করাইয়াছেন সতীরাণী, সুরোগ পাইবামাত্র। দূষিত কুয়ার জলের কথা। লোকের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া এন্-ডি-ওর নিকট দরবার করাইতে দ্বিধাবোধ তিনি করিলেন না। জামতাড়া হইতে তিনি চলিয়া আসিবার বহু পূর্বে একটি কুয়াও সেখানে থাকে নাই যাহার সংস্কার হয় নাই।

জামতাড়ায় লোকের আহাৰ্য্য দ্রব্যাদি মিলার ঘোর অসুবিধা। অথচ হাট বসিতে না বসিতে ভারে ভারে জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া যায় বাহিরের ফোড়েরা। জামতাড়ার বহু বহু মহিলা সতীরাণীকে এ কথা জানান। মৌরাদেবীর সাহায্যে এ অভিযোগ যথাস্থানে অবিলম্বে পৌছায়। ইহার আশু প্রতিকার হয়। দিনের হাটের শেষে দ্রব্যাদি বিক্রীত হইতে পারে বাহিরের ফোড়ের, তৎপূর্বে নহে—ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের এই প্রকৃতি জারী হয়।

স্টার থিয়েটারের অপারেশনবাবু বার বার আসিয়া বলেন, “স্থানাভাবে জামতাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনা করাইবার স্বযোগ ঘটিতেছে না, স্থলীলবাবু আপনি একটু চেষ্টা করিলেই ইহা ঘটয়া যায়”। ‘স্থলীলবাবু’ ঘাড় পাতিবার দিকেও যায় না। সতীরাণী ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীকে বলেন, “সে কি! এত জমি, আর রামকৃষ্ণ মিশনের স্থান হবে না এখানে! শুকে কথা দাও চেষ্টা করা হবে।” সে কথা অপারেশনবাবু শুনিয়া হঠ হইলেন। চেষ্টা করা হইল, নিখুঁতভাবে। ফলে মিশন স্থাপনার্থে উপযুক্ত পরিমাণ জমি মিলিল।

এস্-ডি-ও স্বয়ং একদা স্থলীলপ্রসাদকে জানাইলেন, “স্থানীয় হাই স্কুলের জিমনাসিয়াম ভাঙ্গা চোরা, ছেলের খেলার মাঠ নাই, একটু দেখতে হবে যে।” উত্তর—দেখবেন তো আপনারা। প্রত্যুত্তর—আমাদের টাকা কোথায়! হাসিয়া স্থলীলপ্রসাদ বলিলেন, টাকা বুঝি ওয়েষ্টম্বকের মাটিতে পৌতা আছে! আচ্ছা দেখি লক্ষ্মী-দেবী আমার, কি রাখ দেন। রাখ-দাতার হুকুম হইল—দেখ না। দেখিতে স্তব্ধ হইল। পত্র প্রেরিত হইল, শ্রাব আর. এন. মুখার্জি, স্তার এন্. এন্. সরকার ও স্তার সি. সি. ঘোষ প্রভৃতির নিকট অর্থসাহায্যের জ্ঞাত। ইহাদের জামতাড়াতে বাটী রহিয়াছে। অর্থসাহায্য মিলিল। জিমনাসিয়াম ও পূর্ণাঙ্গ খেলার মাঠ প্রস্তুত হইল। কৃতজ্ঞতা জানাইতে স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্থাপনা করাইলেন ‘খেলার মাঠে, ‘সর্বস্বাধিকারী প্যাভেলিয়ন’—স্থলীলপ্রসাদের নামে। প্যাভেলিয়নের নাম ‘রাণী প্যাভেলিয়ন’ হওয়া উচিত ছিল। বলিবামাত্র, স্বাক্ষর রাখার দিয়া বলিলেন, থামো, থামো।

কৃষ্ণ পুত্রের নিরাময়ে স্বামী জী উভয়েই হঠচিহ্ন। উভয়েরই অভিমত, পুত্রের স্বাস্থ্যের জ্ঞাত এই মাটির কাছে ঋণ আমাদের অনেক। সেই মাটিতে সামান্য কিছু গজাইয়া, সে ঋণের কিছুই পরিশোধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বলিলেন সতীরাণীকে, জগতে আসিয়াছ তুমি পরার্থে। ঋণের প্রেত না থাকিলেও, এখানে তুমি যাহা কিছু করাইয়াছ, তাহা তুমি তোমার স্বভাবগুণে। হাসিতেছ আমার কথা শুনিয়া। হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া

সহজ নহে। আইনজীবী আমি। যা বলি সাক্ষ্য না রাখিয়া বলি না।

প্রথম সাক্ষ্য। এতো মহিলা ‘দিদি দিদি’ রবে দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা নিজেদের ঘর দোর ছেড়ে এখানে পড়ে থাকে কেন? দ্বিতীয় সাক্ষ্য—মীরা দেবী কখনও কখনও রাততুপুবে মোটরে আসিয়া দিদি-দিদি করে কেন? ব্যারিষ্টার কে. বি. দত্ত (পাটনার) বেনারসী ল্যাংড়া আনিয়া কেন বলেন বৌমার জন্ত এনেছি। তৃতীয় সাক্ষ্য—মেঘর ষতীন সেনগুপ্ত ও তাঁর পত্নী নেলী ডাক-বাংলো ছেড়ে কেন তোমার এখানে কদিন ইত্যাদি মিলেন? চতুর্থ সাক্ষ্য—দাসদাসীরা মা মা করে’ কেন পাগল? পঞ্চম সাক্ষ্য—মেছুনিরা সেরা সেরা মাছ সর্ব্বাগ্রে তোমার কাছে আনে কেন?

বাধা পড়িল অন্ত্যাত্ম সাক্ষ্যের নাম বলিতে। স্বাক্ষরী ক্ষেপেব সুরে বলিলেন, থামো থামো। লোকে শুনিবে বলিবে, স্ত্রীপুত্রেরও অধম তুমি। উত্তর শুনিলেন, সেটা লজ্জা না গৌরব।

এই স্ত্রীর সংসার ভাজিয়া শীঘ্রই কলিকাতা রওনা হইবার দিন সমাগত হইল। মোসাফেরখানা হইলেও সেখানে একটা সংসার গাঁড়। সেই সংসারের সকলেরই মুখ স্নান, যাত্রার কথা ভাবিয়া। যাত্রার দিনে সকলেই ষ্টেশনে অশ্রুমুখ। তাহাতে অশ্রুমুখ হইল যাত্রীরাও।

### কল্যাণশোকে

প্রাতঃস্মরণীয় অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠ পবিত্র খানাকুলের আদি ও অকৃত্রিম ইতিহাস লম্বা বঙ্গদেশের অমূল্য সম্পদ। সে সম্পদ উপভোগ না করিয়াছে যাহারা দুর্ভাগ্য তাহাদের। নূতন বাংলা গঠনে খানাকুলের অংশ গ্রহণ অপরিশোধ্য। দেশেব শিক্ষা ও সংস্কৃতিসাধনের কেন্দ্র হিসাবে খানাকুলের ঐতিহ্যের তুলনা মেলা দায়। মুন্সী রামনারায়ণের মুন্সীচালা হইতে কত ক্ষণজন্মা যে উদ্ভূত হইয়াছে তাহার দীর্ঘ তালিকা না দিয়াও ইহা উল্লেখ করিলেই চলিবে যে, রামমোহন এই চালারই অগ্রতম ছাত্র। কলিকাতার স্বপ্নীম কোর্টের প্রথম বাঙালী বিচারপতি এই রায়বংশেরই সন্তান। মুর্শিদাবাদের নবাব



নাজিয়েব প্রধান দেওয়ান ছিলেন, খানাকুলেবই রাজা সীতানাথ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রথম অত্রাঙ্গণ অধ্যক্ষ পদে ত্রতী হইয়াছিলেন খানাকুলের প্রসন্নকুমার। তাঁহার মধ্যম মহোদর ডাঃ সূর্যকুমার বাঙালী হইয়াও সম্মানিত হন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রূপে। তিনিই সতী-রাগীকে আনিয়া বংশে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা কবান। লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী বংশের মর্যাদা রক্ষা করেন কিভাবে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ও হইবে।

ঋতুরবংশের ধর্মপরায়ণতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা সুবিদিত। তাহা চির উজ্জ্বল রাখাই সতীরাগীর জীবনের ব্রত হয়। সঙ্গীতে স্বামীকুলের প্রগাঢ় অহুরাগের কথা তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি নিজে ছিলেন সুগায়িকা এবং আপন কন্ঠাকে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাদান করেন সঙ্গীতে। জামতাড়া মাতোয়ারা হইয়া যায় তাহার সঙ্গীতকলায়।

জামতাড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া সতী-রাগী দেখিলেন, তাঁর পিতৃদেবের শোকাবেগে ভীটা পড়িয়াছে। পুত্র ও পুত্রবধূদের লইয়া মনের প্রসন্নতায় আছেন বেশ। খুঁই সুখী হইলেন ইহাতে তিনি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জ্ঞাত ছেলেবা প্রস্তুত হইতে পূর্ববৎ তাগদের দেখাশুনা করিতে লাগিলেন, তাহাদের জননী। বিজলী বিবাহোপযুক্তা হইতেছে ক্ষতবেগে। তাহার পিতামাতা কিন্তু শাস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন মধ্য-জাত সুপুত্রের জ্ঞাত।

মনোমত পাত্র মিলিল একটু বিলম্বে। বিবাহ হইয়া গেল বহু সমারোহে। বিজলী নিজ গুণে নব গৃহের সকলের কর্তের হার হইল। হার কিন্তু ছিঁড়িয়া পড়িল গলদেশে শোভিত হইবার আট মাসের মধ্যে। সে করুণ কাহিনী এতকাল পরেও লিপিবদ্ধ করিতে হাত কাপিতেছে। পাঠক পাঠিকা ‘বিজলী’ পাঠ করিবেন দয়া করিয়া যদি সেই শোচনীয় ঘটনার কথা জানিতে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য থাকে।

এই ভীষণ পরীক্ষাতেও সতীরাগী উদ্ভীর্ণা হইলেন অপরাধরূপে। আকস্মিক বিপদে কন্ঠাগতপ্রাণ পিতার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। নব লোভনীয় পদে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা

তখন তাঁহার মুষ্টিগত। সব দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন তিনি এক মুহূর্ত্তে।

কন্ঠাহারা সতীরাগী চক্ষে আঁধার দেখিলেন। স্বামীকে প্রকৃতিস্থ কবেন তিনি কেমন করিয়া? বহু অল্পনয় করিয়া ৬পূরীধামে যাইবার জ্ঞাত সম্মত করাইলেন তিনি তাঁহাকে। কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ে শ্রীশ্রী ৬পূরীধামে গমন করিলেন। সঙ্গে লইলেন পুত্র বিকাশচন্দ্রকে।

সমুদ্রের ঘন গভীর গর্জন বা উত্তাল তরঙ্গমালার মারাত্মক মাৎসর্য্য, যে জ্বরই ভাসাইয়া আছক না কেন, সন্ত শোকাভূবের প্রাণে কোন অঙ্কই আকিতে পারিল না। শ্রীধামে দেবতা বসিয়া আছেন নির্বিকার হইয়া। জগতের নাথ তিনি। দেখিবার কথা ত’ তাঁহার সকলই। দেখিয়া করিবার যাহা তাহা কি তিনি করিতেছেন? বোধ হয় করিতেছেন। নতুবা সতীরাগীর বুক জুড়াইতে তিনি আসিলেন কেন, বিনা আহ্বানে। ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া বলাব প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীধামে পৌছাইবার কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীসহ সতীরাগী মহাপ্রভুর ও অন্ত্যাত্ম মন্দিরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ কবেন। দেবতা দর্শনান্তে মহাপ্রভুর প্রাঙ্গণে বাহির হইয়াছেন, অপরিচিত একজন স্বরিংগতিতে আসিয়া তাঁহার হাতে একটা কিছু দিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে বলিলেন, “মা, ইহাকে বৃকে করিয়া লইয়া যাও, অপার শাস্তিলাভ করিবে।” বৃকে লইলেন তিনি তাহাকে তৎক্ষণাত্। বৃক জুড়াইয়া গেল। যিনি এ রত্ন দিলেন তাঁহাকে প্রণাম করিবেন সতীরাগী, তিনি কিন্তু কোথাও নাই।

বৃকের ধন বাহির করিয়া সতীরাগী দেখিলেন, প্রাপ্ত রত্নটী দারুণনিম্নিত একটা ত্রিমূর্ত্তি, মহাপ্রভু, বলরামদেব ও সুভদ্রাদেবীর—মনোরম জ্যোতিঃ বিকুচিত। গৃহে আসিয়া ধূলা পায়ে ত্রিমূর্ত্তি সিংহাসনারূঢ় তিনি করাইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া প্রাণ ভরিয়া কাদিলেন তিনি। চোখ তুলিয়া দেখিলেন দেবতা সহাস্রবদন। জানাইতেছেন যেন তিনি, ‘কাদিস না মা, আমি ত’ আছি।’ রহিলেন তিনি তাঁহাব সঙ্গে জীবনভোর।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সতীরাগী নূতন মাধুষ হইয়া

গেলেন। স্বামীকে সহর্ষে বলিলেন, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন আমাদের কাছে, এসো প্রাণপণে আমরা তাঁর সেবা করি। স্বামী সন্তোষ লাভ করিলেন, ভক্তি-মতীর তনয়তায়—বড় জ্বালার হাত হইতে রক্ষা হইল তাঁহার হে ভগবান!

বিজলীর পিতা কন্ঠার স্বত্বার্থে গৃহপ্রাঙ্গণে স্বহস্তে ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিলেন—নাম দিলেন তাহার ‘বিজলী মন্দির’। মনে মনে বলিলেন তিনি—প্রসাদপুর (বাটীর নাম) ধন্ত হইল। আরও বলিলেন, এ মন্দির স্বেচ্ছায় কেহ ধ্বংস করিলে, প্রসাদপুর ধ্বংস হইবে—ইহা ব্যথিতের আন্তরিক নির্দেশ।

সহধর্মিনীকে স্বামী একদিন বিধাদস্বরে বলিলেন, বিজলীর “নবঘন শ্রাম, মুরতি মনোহর—হামারি হিয়া পর আওয়ে” যা তোমার বড় প্রিয় ছিল, সে মনোহর মূর্তি জগন্নাথদেবে.....। বাধা দিয়া সতী বলিলেন, আছে বৈকি। সেই সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরক্তিকের সময়ে শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়াইয়া দেবতা দর্শন করিতেন, নাট্য-মন্দিরের সেই অংশে দাঁড়াইয়া আছেন বিজলীর পিতা। আড়ম্বর সহকারে আরক্তিক হইতেছে। বিজলীর পিতা দেখিলেন, জগন্নাথ দেব কই, এ যে বিজলীর আরাধ্য দেবতা নবঘন শ্রাম, শ্রীরাধাকে লইয়া মধুর হাস্তে দণ্ডায়মান। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন তিনি। কি হ’ল কি হ’ল রব উঠিল জনতার মধ্যে। আপনাকে নামলাইয়া মুচ্ছিত

দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু না মানসিক অবসাদ একটু। দেবতার দিকে চাহিয়া দেখেন তিনি মহাপ্রভু, বলরাম ও সুভদ্রা সমুখে তাঁহার।

উদ্ধ্বাসে ছুটিদেন কণপূর্বে মুচ্ছিত জীবটি গৃহাভিমুখে, নবঘন শ্রামের ঘটনা সতীরগীকে জানাইতে। ঘাইয়া দেখেন রাজবাটী হইতে শ্রীকৃষ্ণবিলাস-এর প্রসাদ আসিয়াছে। গদ গদ স্বরে স্বামী বলিলেন, সতীরগী সার্থক জনম তোমার আর সার্থক জনম লাভ করিয়াছিল তোমার কন্ঠা। তার জন্ত শোক করে’ তাকে কাদাচ্ছি আমি।

রাজবাটী হইতে বিবিধ প্রকারের ভোগ আসিত প্রায়ই। রাজাবাহাদুর দুইটি হাতী পাঠাইতেন নিত্য প্রাতে শোকার্তদের মন হাল্কা করাইবার অভিপ্রায়ে। সোনার গৌরাদের আদি প্রতিষ্ঠাতার অলুকাপা বড় কম পাওয়া যায় নাই। আর সতীরগীর ‘ওই অবস্থাতেও পরার্থপরতার দিব্য নিদর্শনে, ঘুঁটেকুড়ানীও কাদিয়া ভাসিয়াছে তাঁহাকে বিদায় দিতে। প্রায় পাঁচ মাস অবস্থানের পরে পুরীর বাস উঠাইয়া কলিকাতায় ফিরেন সকলে।

প্রিয় কন্ঠা হারাইয়া জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ কিছু লাভ তাঁহার করেন কি না কে বলিবে! সতীরগীর অল্প দুই পুত্র ও স্ত্রীজাতা ও তন্তু পুত্র পুরীতে আসে তাঁহার কাছে, তবীকে ভুলাইবার প্রয়াসে। (ক্রমশঃ)



## প্রার্থনা

### শ্রীকৃতাঙ্গনাথ বাগচী

দেবতা! তোমার অমোঘ বজ্র আজ অকরণ হানো,  
গাণ্ডীবে ভোল টকার আর শানিত সায়ক আনো;  
সৃষ্টিরে তব বিজয় করে উদ্ধত অমানিশা,  
সেকি নিদারুণ লজ্জায় নারী কাদে অসহায় জানো।

দেবতা! যে হাত আগুন দিয়েছে শাস্ত স্রবের নীড়ে,  
রক্ত ছিটালে পশু-উল্লাসে ধোঁয়াপবীত ছিঁড়ে,  
মস্ত বলের খড়্গা আঘাতে মুক মানবতা বলি,  
নিঃশেষে তুমি শেষ করে দাও সেই অশুচির ভিড়ে।

দেবতা! তোমার দুয়ারে দাঁড়ায় নীরবে সর্বহারী;  
চমকি উঠিছে সকল আকাশ, শিহরি শুধায় “কারা”?  
এরা যে তোমার পূজা বয়ে শিরে এসেছিল মন্দিরে।  
তারপর জ্বাসে একে একে নিভে গেল বেদনায় তারা।

## শতাব্দীর ডাক

মানস কমল

শত সর্পিণ গতি আবর্তে  
বিশ্বের আলোড়ন,—  
শতাব্দীর আগে তারি বৃকে জাগে  
—বৈশাখী নন্দন!

অগ্নি-বীণার ঝঙ্কারে যার  
নূতন যুগের প্রবাহের ভার—  
মাতায় সবায়—গাথায় গাথায়  
‘কড়ি ও কোমল’ গানে,  
নীলিমের রবি জীবনের ছবি  
উজ্জয়িনীর ‘মেঘদূত’ কবি  
রূপ নেবে পুনঃ মাটির মায়ায়—  
বিশ্বের কল্যাণে!

বর্ষরতার বিরুদ্ধে যার  
উচ্ছল অভিযান,—  
ইতিহাস আজো সাক্ষ্য দিতেছে  
—মহতো মহীয়ান! .  
‘বিশ্ব-ভারতী’ সৃষ্টি বাহার,  
—সে কবি মরে কী,—বিশ্রাম তার,  
যৌগিক এক যোগনিজায়  
যোগাচ্ছন্ন সে,  
বিবর্তনের ঐ বেলাতটে—  
মানস-চক্ষে হেরি অলক্ষ্যে  
ভীতি-বিহ্বল রিক্ত বক্ষে  
—দাঁড়ায়ে রয়েছে কে!  
নমো নমো নমো দেদীপ্যময়  
ভাস্কর নমো নমঃ,  
—অজ্ঞান শত মহা-ভারতের  
কুল-অঙ্গারে ক্ষম।  
এবার তোমার কণ্ঠে বিযাণ  
শুনি আমি তাই প্রলয়ের গান,—



বোমে বোমে যার আণবিক ধ্বনি—  
স্পন্দিত শিহরণ,  
সপ্ত সাগর উবেল আজ  
অবগুণ্ঠনে আনত সলাজ—  
কুমারী চিত্ত বিস্ত বিহীন  
নীপিহীন বন্ধন!  
ফান্টানীরূপে এবার আসিও  
প্রাণময় বৈশাখ,  
এককের মুখে শোনো বাণীবর  
চিরন্তনের ডাক!  
কৃষ্ণকলির চূড়ায় চূড়ায়—  
পার্থ-সারথী যেন ফুকরায়  
নব ভারতের কুরুক্ষেত্রে ‘পাঞ্চজন্ম’ তার,  
সব্যসাচীর তুণীর ফলকে—  
ব্যভিচার নাশি পলকে পলকে  
কঠিন পুণ্য দৃষ্ট আলোকে—  
দেখা দাও আর বার,  
—শাস্ত দেবাধার!

## পাঁচিশে বৈশাখ

শ্রীবংশী মণ্ডল

কে তুমি দিগন্ত কবি নিজে আস পাঁচিশে বৈশাখ  
বাবে বারে এ জীবনে—আঁকিষা দে গানের তিয়ারা ?  
অমৃতের ষাত্রী ওগো আজি এসে ঘারে দিলে ডাক,  
দূর কর তমিস্রার অবিশ্রান্ত হিমেল কুয়াসা।  
অনন্তের অগোচরে প্রাণ তব জ্ঞান-বহুমান  
ছন্দের শাবিত্রী তীরে দীর্ঘ আয়ু কবে চলাচল,  
অবসন্ন দিনান্তেব এক ছন্দে গেয়ে গেলে গান  
খুঁজিয়া পেলে কি সেথা তপস্রার লক্ষ্য জলস্থল।  
নগ্ন প্রাণ তব কাঁদে অফুবন্ত ক্ষতির সৌম্য  
জীবন ও মরণের ছন্দ কহু হারাঘ যদিও  
আজন্ম সুরের ক্ষুধা ঘুমাইবে পাহাডেব গায়।  
হে কবি গানের সুরে চিরন্তন জ্বালায়ে রাখিও

দেহসৌর পক্ষ পবে আদিগন্ত তারার তিমিরে  
ছন্দের দীপালী তব। জলুক না সূর্য্যেব মতন  
এ জন্মেব ষত ঋণ পুঞ্জীভূত সমুদ্রের তীরে  
তোমার ষাত্রার কালে করেছে কি শেষ আয়োজন  
আমাকে বেঁধেছ তুণে নগ্ন পদে ছুংথের নিশীথে  
আমি ষা চেয়েছি বন্ধু তবু সেতো পাইনি এখনো।  
আমি পেয়েছি তবু সেথা হতে সব কেড়ে নিতে  
আজন্ম ব্যথার ঋণে মূল্য তার রাখনি কখনো।  
শব্দের প্রমুর্ভ তীরে অফুরাণ অমেয় আকাশে  
আলোকসন্ধানী কবি যদি পাও সপ্তর্ষি-বাসর  
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী প্রাণসূর্য্যে বাতাসে বাতাসে  
ছড়াক রহস্তগন্ধী অফুরন্ত আলোর নিঝর।

## গীতি-অর্থ্য

শ্রীসহদেব মল্লিক

শত বরষের তোমারে স্মরিয়া  
মনে মনে আঁকি ছবি  
প্রীতি ও প্রণতি করি নিবেদন  
লহগো বিশ্বকবি।  
বিদায় লভিয়া এ জগত হ'তে যদিও অসৌম্য সনে  
মিলিয়াছ হায়, তবুগো তোমায় নিরখি এ ভুবনে।

বিশ্বযে শুনি কঠোর বাণী  
(তব) কাব্য-কবিতা সবই  
কয় যেন হাসি—আছি ভালবাসি  
আমি তোমাদের 'রবি'।  
স্বন্দর তুমি স্বন্দর তব জীবনের অবদান  
মানব প্রেম-মৈত্রী আলোক শাস্ত তুমহান্।

বহাতে তুষিত ধরা-মরু বৃকে স্তম্ভর জাহ্নবী  
ষতনে ঝরালে সুর-রস ধারা কোটালে মধু-মাধবী।  
হে মোর বিশ্বকবি, মনপটে আঁক ছবি  
প্রণমি তোমারে রবি।

## বিশ্বকবি স্মরণে

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ

পাঁচিশে বৈশাখ! স্মরণীয় তুমি মর্ত্যভূমির মাঝে  
সেদিন তোমার রবির উদয়ে আঁধার লুকালো লাজে।  
সবাকার আগে গাহি তব জয়  
যুগে যুগে রহ চির অক্ষয়  
সেই শুভদিনে তোমার রবিরে জানাই নমস্কার  
তব পুতঃ স্মৃতি হউক চিন্তে মূর্ত্ত বারংবার।

# চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন নাথ

অধুনা পশ্চিম বংগাধীন এবং প্রাক্ ফরাসী শাসনাধীন ( ১৩৪৩ ) বিংশ বংগীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে ক্ষুদ্রাকার এই শহর চন্দননগরে কতো রথী-মহারথী যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিহর শেঠ প্রদত্ত ভাষণ এসেছেন এবং বাস ক'রেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এসেছেন থেকে উদ্ধৃত। ]

দীনেমার, ইংরেজ এবং ফরাসীরা।

ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন ক'রে

চলেছে। আজো শহরের দক্ষিণাঞ্চলস্থ

গোলন্দপাড়া পল্লীর একাংশ দিনেমার-

ডাংগা নামে খ্যাত। আর, সর্বশেষ

বিদেশী শাসক ফরাসীদের স্মৃতি তো

এখনো গণমানসে জাগ্রত। সে স্মৃতি

অত্যাচার জনিত সন্ত্রাসের নয়, পরন্তু

পরবশ্ততার কালিমার ফাঁকে রূপালী

রেখায় দাক্ষিণ্য প্রসারিত। সে-কথা

থাক। “কিসের আকর্ষণে জানি না।

এই চন্দননগরে বহু ঐসিদ্ধ লোকের

আগমন ও বসবাস ঘটিয়াছিল। এই

স্থান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,

ভারতচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী,

অক্ষয়কুমার বড়াল, নবীনচন্দ্র সেন,

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধা-

নাথ সিকদার, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি

মনোবিবুদ্ধের বসবাসে ধন্য। দর্পনারায়ণ

ঠাকুর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, লাল-

বিহারী দে, রাজা রামমোহন রায়,

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবাঙ্কব

উপাধ্যায়, স্মার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, দেবশঙ্কু চিত্তরঞ্জন দাশ, হরনাথ ঠাকুর, মহাত্মা

গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সিলভা

লেভি, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া

বহু দেশ-প্রেমিক, পণ্ডিত, চিন্তানায়কগণের শুভাগমনে

এ-স্থান গৌরবান্বিত হইয়াছে।” [ চন্দননগরে অহুষ্টিত



চন্দননগর প্রবর্তক আজমে রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীয়

প্রসংগত, যখন বিশ্বের আকাশ বাতাস রবীন্দ্রনাথ-  
গানে মুগ্ধব্রিত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসী কবির  
প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে ধন্য, তখন তাঁর কথাই বার বার  
মনে পড়ে। সেতো আজকে নয়। “মুহুরি হইতে ফিরিয়া  
আসিয়া ( ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ) রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র-  
নাথের সহিত চন্দননগরে বাস করিতে লাগিলেন।...

জ্যোতিরিন্দ্রনাথরা একবার বাড়িতে ছিলেন না, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সন্ধ্যা সঙ্গীতের’ কবিতা লিখিতে শুরু করেন—তখন বয়স উনিশ পূর্ণ।” (১) ‘সন্ধ্যা সঙ্গীত’-এর কবি সেকালে চন্দননগরে এসে কতোদিন বাস করেছিলেন, তার সঠিক হিসেব জানা যায়নি। তবে কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী ‘গান আরম্ভ হ’য়েছিলো এখানেই’। একথা তিনি বার বার উল্লেখ ক’রেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে ও অহুষ্ঠানে।

“গঙ্গাতীরে মোরান্ সাহেবের বাগানবাড়ী হইতে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রবাবুদেব সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও চৌরঙ্গি ঘাটঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাসা লইলেন।” এখানে আসিয়া বৌঠাকুরবাণীর হাট চলে ও সন্ধ্যায় সঙ্গীতের কবিতাও লেখেন।” (২)

এর পরে “বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কলিকাতায় গেলেন। কলিকাতা থাকিবার সময় চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ১৩৩৪, বৈশাখ ২১এ (1927, May 4) প্রাতে প্রবর্তক সঙ্ঘে প্রার্থনা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করেন।” (৩)

প্রবর্তক সংঘে অবস্থানকালে কবি এ কবিতাটি বচনা করেন বলে প্রকাশ :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।  
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে।  
ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশি চুকিয়ে এলাম কামাধাসি।  
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।  
ওপারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে  
আরতির শব্দ বাজে স্বপ্ন মন্দির ‘পরে  
এস এস আস্থিহরা এস এস স্থিতিভরা  
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে।

প্রবর্তক সংঘের অহুষ্ঠানান্তে “অপবাহে চন্দননগরের দানবীর শ্রীহরিহর শেঠ প্রতিষ্ঠিত ‘কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়’ দেখিতে যান (৪)।” সেখানে জনৈক শিক্ষিকার

অটোগ্রাফের খাতায় কবি স্বহস্তে স্বনামাংকিত এ বাণীটি লিখে দেন :

বসন্ত যে লেখা লেপে বনে বনান্তরে

নামুক তাহারি মন্ত্র লেখনীর ‘পবে। (৩)

“করাসী Administrator তাঁহাকে বৈকালে চা-এ নিমন্ত্রণ করেন; সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সবকারী উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় সময় প্রবর্তক সঙ্ঘেব শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের পৌরোহিত্য ও প্রদর্শনীর দ্বাব উন্মুক্ত করেন। এই উপলক্ষে সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্ম সম্বন্ধে একটি স্মার ভাষণ (৫) দেন।

অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব সভার পবে কবি ‘নিত্যাগোপাল স্মৃতি মন্দিরে’ যান। নাগবিকদের তরফ হইতে মেঘব শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে তাঁহাকে অভিনন্দন দেন।” (৭)

তদন্তরে কবি বলেন :—যখন ‘বালক ছিলাম তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনেব আর এক যুগ। সেদিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলাম প্রচ্ছন্ন; কোন ব্যক্তি, কোন দল আমাকে অভ্যর্থনা করেনি। কেবল আদব পেয়েছিলাম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে।...ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে সেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ী, বড় ঘরে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গী ছিল বিচित्र। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল; তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আগড়ালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চাবদিক থেকে দূরস্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ’ত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আড়িনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম—  
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর  
তোর তরে কবিতা আমার ॥

—সংকলিত। লেখক]

(১) রবীন্দ্র জীবনী। খণ্ড ১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(২) ঐ ঐ ঐ

(৩) প্রবর্তক, বৈশাখ ১৩৩৪। ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। পৃষ্ঠা ১১৩।

(৪) ঐ ঐ ঐ

(৫) রবীন্দ্রজীবনী। খণ্ড ২। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৬) প্রবর্তক। ২য় বর্ষ। ১ম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৩৩। ৫৫-৬০। পৃঃ

(৭) ঐ ঐ ঐ

“সভাস্থে মেঘর শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব-ভারতীর জন্ত হাজার টাকা দান করেন (New Empire, Calcutta, 6 May 1927 ও অষ্টাভ সাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য)।

“চন্দননগর হইতে কলিকাতায় ফিবিয়া আসিবার পব রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং যান।” ববীন্দ্র জীবনী। খণ্ড ২। পৃষ্ঠা ৩২৮।

এর পর: “প্রতিমা দেবী বিলাত গিয়াছেন। কবি স্থির করিলেন গ্রীষ্মকালটা নৌকায় থাকিবেন চন্দননগরেব কাছে। ঐ পৃ: ৪৬৪ ॥

তখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। ১৩৪২ মাল। ‘বীথিকা’ রচনা কাল। কবির তৎকালীন বাস ছিলো পর্যায়ক্রমে ‘পদ্মা’ গৃহতরঙ্গী এবং ‘পাতালবাড়ি’তে। সংগী ছিলেন অধুনা ভারত সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ এবং শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ।

যদিও সেটা ছিলো কবির নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামকাল। তবু রচনার বিরাম ছিলো না। ‘বীথিকা’-অন্তর্গত কবিতাবলী রচনা ছাড়াও তিনি ভাতৃশ্রুত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ‘চার অধ্যায়’-এর ইংরেজী অনুবাদ নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। সে-সময় বহিবাগত দর্শনার্থীর মধ্যে ‘রবি-রশ্মি’-গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সূধীন দত্ত, শহীদ সূহ্‌বাবদৌ, শ্রীযুক্ত অপরূপকুমার চন্দর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী বৎসরে চন্দননগরের গংগাতীরবর্তী ‘জাহ্নবী নিবাস’-এ অল্পকিট বিংশ বংগীয় সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন কল্পে কবি এখানে আসেন। উদ্বোধন ভাষণে কবি প্রসংগত বলেন: “উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ি ছিল; (অনেক অসুস্থকান ক’রেও এ-বাড়ির সন্ধান পাইনি। (লেখক)। সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হৃদ্যে আমাকে বিছু দীর্ঘকাল ষাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত: এই গংগা-তীরে, এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।...গঙ্গার তীরের উপর সেই হৃদ্যের অলিন্দে ও সর্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়ে-ছিলাম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করেছিলাম, যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনই আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হ’য়েছিল।...”

কবির স্মৃতিবিজড়িত চন্দননগরের অখ্যাত এই সাহিত্য-সেবক আজ তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সবার স্মরে স্মর মিলিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করাব অবকাশ পেয়ে ধন্য হলো।

## বিশ্বকবি

শ্রীসুখমা মৈত্র

হে বিশ্বকবি!

তোমার চরণ-পদে প্রণমি দিব্য জীবন লভি।

যুগে যুগে তুমি বরগীয় কবি স্মরণীয় ধরাতলে

তোমার মহিমা বিশ্বগগনে সূর্যের মত জলে।

শুভ-জন্মের লগ্নেব ফল পচিশে বোশেখ এল

শতাব্দী আগে জানি এই দিনে তোমাবে ভুবন পেল।

সেই শুভদিনে উদিত হইলে দীপ্ত বিভায় তুমি

জ্যোতির্ময়ের রূপ-সস্তায় আলোকি জন্মভূমি।

তোমার সৃজন প্রতিভারে স্মরি বিশ্বয় মানি সবে,

অবাক পৃথিবী, প্রকৃতি সুষমা জেগেছে সগৌরবে।

সত্যদ্রষ্টা মহাঋষি তুমি রচিয়াছ তপোবন

শাস্তির লাগি রচিয়াছো তুমি শাস্তির নিকেতন।

শুধু কবি নও—তুমি যেগো মহাকবি

বাংলার রবি তুমি শুধু নও—তুমি জগতের কবি।

আজি তব জন্মদিনে, শুভদিনে আশীর্বাদ মাগি

রহো তুমি অনির্বাক্য নিত্য মোর চিত্ততলে জাগি’।

# সম্মানার্থে

নববর্ষ :

বর্তমান বৈশাখ সংখ্যায় প্রবর্তক-এর ৪৬তম বর্ষ সূর্য হইল। পত্রিকাখানির বিশিষ্ট একটি আদর্শ আছে। আছে চিরকালের অর্থি ঋষি ভারতের নিজস্ব ভাবসম্মত সাধ্য ও সাধনা। এই সূর্যভীর ভাবটি বিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ—সনাতন, সার্বজনীন, বিশ্বমানুষেরই আলোক-দিশারী। ইহা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মতই সনাতন ও সত্য। সমগ্রের কথা এখন আমরা ভাবিব না। প্রবর্তক-এর গ্রাহক, অগ্রগ্রাহক, স্বেচ্ছামণ্ডলীর সীমিত ক্ষেত্রে যদি এই ভারত-তত্ত্বটি ব্যাপ্ত, অমূল্যলিত হয়, যদি এই পরিমণ্ডলের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন সত্যনিষ্ঠায়, ব্রতশীলতায় শুভ, সুন্দর মহৎ ও সম্পন্ন হইয়া উঠে তবে ইহার পরিব্যাপ্তিও অনিবার্য হইয়া উঠিবে। আমরা তাই নববর্ষের যাত্রারশ্বে বিশ্বদেবতার নিকট প্রার্থনা করিব, আমাদের সম্মিলিত সাধনা, সফল ও পথ যেন কল্যাণযুক্ত হইয়া পরার্থপর পরমকল্যাণে সার্থক হয়। আমরা যেন অমিশ্র অ-বিলাস সত্য ভারতবর্ষকেই আমাদের জীবন, কর্ম ও সাধনায় জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পাবি।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষ :

এ যুগের ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের চোখেই আমরা নববর্ষে ভারতবর্ষের চেহারা নিরীক্ষণ করিব, চিরকালের ভারতবর্ষকে চিনিয়া লইব। ভারতবর্ষের সাধনা ও সিদ্ধি, তার স্ব-ভাবগত আদর্শ হইতেছে কবীন্দ্রের কথায় ‘হৃৎ’, ‘উদার শাস্তি’, ‘সন্তোষ’, ‘বিশাল স্তব্ধতা’ আর ‘একাকী’। কবি বলিতেছেন : ‘সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া’ ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে : জ্ঞান করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংঘত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাত ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার

অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্য মাত্র।”

“অধুনা আমাদের কাছে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশী। হাতের কাছে হোক—দূরে হোক, দিনে হোক—দিনের অবসানে হোক, কর্ম করিতেই হইবে। কী করি, কী করি, —কোথায় মরিতে হইবে—কোথায় আব্রাবিসর্জন করিতে হইবে, ইহাই অশাস্ত চিন্তে আমরা খুঁজিতেছি। যুরোপে লাগাম পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া—মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে! এই কর্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন একটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শাস্তি থাকে না!...প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, কবাবটা নহে।”

“পূর্বে ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী অতি সহজ সরল, অতি প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না।...বিদেশের সংঘাতে ভারতের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকীর্ণ, আমাদের চিন্তা বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তব্ধতা আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শাস্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গান্ধীর্ঘ্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অহুঙ্কারে এখনও ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংঘের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মুহূর্ত্তা এবং মজ্জার মধ্যে কাটিয়া লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে। শাস্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অহুভব



করিতে হইবে, স্বকৃতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদের রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাভ্রিষ্ট শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আপন বরাভয় প্রসারিত করিবে,— তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রক্তরৌদ্রবিকীর বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কোপীনবস্ত্র পরিয়া ভূশাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহাব রূপপঙ্কজের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমায়ি এখনও জলিতেছে।...এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায়\* তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।”

“আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমার হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকীত্ব। এই একাকীত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুর্লভ। পিতামহগণ এই একাকীত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত রামায়ণের ছায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। এই একাকীত্বের মহত্ত্ব যাহার চিন্তা আকর্ষণ করে না, সে ঠিকমত ভারতবর্ষকে চিনিতে পারিবে না। বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্নত বরাহের গ্রাস ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দস্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকীত্ব দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে পারে নাই। সর্বপ্রকার বিরোধ বিপ্লবের

মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শাস্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে—তাই সে ভাঙ্গিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না—সে উন্নত ভীড়ের মধ্যে একাকী বিরাজ করে। যুরোপ ভোগে একাকী, কর্ম্মে দলবদ্ধ, ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম্ম করে একাকী। যুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম, স্বথ নিজেদের—কিন্তু তাব দান ধ্যান, স্কুল কলেজ, ধর্ম্মচর্চা, বাণিজ্য ব্যবসায় দল বাঁধিয়া। আমাদের স্বথ-সম্পত্তি একলার নহে, আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন কর্তব্য বলার।”

“যুরোপ বলে, এই সন্তোষই, জিগীষাব অভাবই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা যুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। ...সন্তোষ, সংঘম, শাস্তি এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চক্রমকিব ঠোকাঠুকি শব্দ ও ক্ষুলিঙ্গবর্ণন নাই, কিন্তু হীরকেব স্নিগ্ধ-নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও ক্ষুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতিব চেয়ে মূল্যবান মনে করা বর্বরতা মাত্র। যুরোপীয় সভ্যতার বিজ্ঞানলয় হইতেও যদি সে বর্বরতা প্রসৃত হয়, তবুও তাহা বর্বরতা।”

“আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন তিনি ফললোভুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান..তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মেব বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উদ্বেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভ্রমহীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। যুরোপ যাহাকে ‘ফ্রীডম’ বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীক; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর, তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। এই ‘ফ্রীডমের’ চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে-মহত্ত্ব যে-মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্কার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,

অস্তবের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুহূর্ত পবিত্র হইবে।”

“...পুরাতনই চির নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। নূতনত্বের মধ্যে চির পুরাতনকে অহুভব করিলে তবেই অমেয় ঘোবনসমূহে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পারে। আজিকাব এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহু সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাহুনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধারকরা ফুলপাতার গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচির প্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না।...কারণ তাহার পশ্চাতে স্মৃতির-কালের ইতিহাস নাই—তাহা অনলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিল। অন্ধকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চির-পুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব।... যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্ঝক তাহারই জন্ম হইবে,—আমরা যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, আশ্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে ‘মিলি মিলি যাওব নাগর লহবী সমানা’—তাহাতে নিস্তক সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুর্পাশে মুগ্ধচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুরুষকথাগণকে কোটিকক্ পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখন সে শান্তচিন্তে আমাদের পৌত্রদের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা বার্থ হইবে না, তাহারা এই সন্মানীর সামনে কবজোড়ে আসিয়া কহিবে - ‘পিতামহ, আমাদের মঙ্গ দাও।

তিনি কহিবেন—‘ও ইতি ব্রহ্ম।’

তিনি কহিবেন—‘ভূমিব স্তবঃ নামে স্তবমস্তি।’

তিনি কহিবেন—‘আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন

বিভেতি কদাচন।”

সত্যজ্ঞা ঋষিকবির ধ্যান-দর্শনের এই ভারতবর্ষ ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নহে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা মাত্রও নহে, পরন্তু একটা সনাতন স্বতন্ত্র চিন্ময়

সত্তা যাহাই যুগে যুগে নব নব বেশে পূণ্য ভাবতভূমির আধারাশ্রয়ে অভিব্যক্ত হইতে চাহিতেছে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জন্ম-জয়ন্তী :

‘ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন’-এর (এখানে ইংরাজী কথ ‘ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন’ ব্যবহার করিলাম এই জন্ত যে, আমাদের সংবিধানে ‘ভারত’ শব্দটি হিন্দুগণ্ঠী বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে) সর্বত্র বাহাতে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সাড়ম্ববে উদ্‌ঘাপিত হয় তার জন্ত নাকি কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে দশ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়াও, জনসাধারণের নিকট হইতে সরকারী প্রচেষ্টায় আরও দশ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সংগৃহীত অর্থের পবিমাণ সরকার অভিলষিত অঙ্কেও উল্লঙ্ঘন কবিয়া যাইবে, যেহেতু এই ‘জনসাধারণ’-এর মধ্যে বণিক এবং ধনিকরাও আছেন। তাঁহাদের একটা বৃহৎ অংশ যে রাষ্ট্রের আবেদনে সানন্দে সাড়া দিবেনই এইরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের অধিকাংশের পক্ষেই বিশেষ স্বাধীনোত্তর কালে রাষ্ট্রের সহায়ভূতি, সহায়তা ও বিশেষ অল্পগ্রহলাভ ব্যতিরেকে পুঞ্জিপতিত্বে উন্নীত হওয়া যে সম্ভব নহে তাহা কেতাবী অর্থনীতির বাহিরের কথা হইলেও, বাস্তব অর্থনীতির ভিতরের কথা, এমন কি গোড়ার কথাও বলা চলে। অবশ্য দাতা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই দান করুন না কেন, যে উপলক্ষে এই অর্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহা মহৎ এবং রাষ্ট্র ও জনসাধারণ প্রদত্ত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী-তহবিলের সমগ্র অর্থ যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মহাকবির ভাবনা ও আদর্শ জাতিকে অল্পপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, তদপেক্ষা প্রার্থনীয় হিন্দু-বাস্তবী আমবা, রবীন্দ্রনাথের জাতি আমরা, আমাদের আর কি থাকিতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী ‘মনোপলি’তে এই সুবিপুল অর্থের অপরিকল্পিত, স্ননিষজিত ও যথাযথ ব্যয় বিষয়ে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের দেণ হতভাগ্য, আমরা ও হতভাগ্য,—তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিব গড়িতে অগ্রসর হইয়া আমরা

বানর গড়িয়া বসি, জনস্বার্থ ও জাতীয় কল্যাণের দোহাই পাড়িয়া, স্বকোশলে সংগোপনে ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থকেই সর্বস্ব করিয়া থাকি এবং ঐ রকমপথে স্ববোণ ও স্ববিধা সৃষ্টি করিয়া আপনাপন পকেট ভর্তি করিতে আমাদের বিবেকে এতটুকুও বাধে না। লোকমাত্র তিলকের রাজনীতি আদর্শকে পদদলিত করিয়া 'তিলক ফাণ্ড'-এ জনগণের নিকট হইতে সংগৃহীত এক কোটি টাকার অপব্যয়েতিহাস ও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলনের জন্মেতিহাস ষাঁহাদের অবিলম্বে নয় তাঁহারা আমাদের এই আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তাহা উপলব্ধি করিবেন।

\*

এ জাতির জনক হইতে আজ রাষ্ট্রের ষাঁহারা কর্ণধার—চন্দ্র-সূর্য—জহর-মণি-মাণিক্য—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গুরুদেব। জ্ঞানী গুণী তাঁহারা, গুরুদেবের কাছে কৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞ নহেন। গুরুদেব রচিত “জন-গণ-মন” গানকে তাঁহারা স্বাধীন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দান করিয়াছেন। কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জলের মত অর্থব্যয় তাঁহারা অকুণ্ঠে করিতেছেন। আড়ম্বর উচ্ছ্বাসেরও অস্ত্র নাই। কিন্তু তথাপি ভাবনা জাগে, প্রোপাগান্ডা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা কি কাঁহাকেও বাঁচাইয়া রাখা যায়? পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের প্রতিটি রাজ্যে, এমনকি সেই সকল রাজ্যেও, যেখানে পুরুষায়ক্রমে অসংখ্য বাঙালী বাসিন্দা স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন সেখানকার বিদ্যালয়-সমূহেও রাষ্ট্রীয় নির্দেশে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, বাঙালী ভাষার পঠনপাঠন নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাঙালী বাসিন্দার আধিক্য সত্ত্বেও সেখানকার বিদ্যালয়সমূহে হিন্দী, ইংরাজী, তেলেগুকে বহাল রাখা হইয়াছে, অপরপক্ষে বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাংলার প্রতিবেশী বিহার, বিশেষ আশামে বাংলাভাষার লাজ্জনার কথা সুবিদিত। ষাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার, রাজনৈতিক ধুরন্ধর, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের কর্মকর্তা তাঁরা কি মনে করেন বাঙালী ও বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রনাথের একটা স্বতন্ত্র নির্বিশেষ অস্তিত্ব বর্জমান। বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সাধনের স্মরণ রবীন্দ্রনাথ। বাঙালীরাই রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে গৌরব দান করিয়াছেন, তাহাকে বিশ্বব্যাপী করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি দেশ-কাল পাত্র নির্বিশেষে আকস্মিক বিশ্ব-গগনে ফুটিয়া উঠেন নাই। ইতিহাস-নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক

ব্যক্তি কি কল্পনা করা যায়। কিন্তু এমনি একটা অবাস্তব কল্পনার প্রশংসাই বাংলার বাহিরে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী ও বাংলাভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার অন্তরালে একটা ‘কম্প্লেক্স’ কার্য করিতেছে। রবীন্দ্রনাথেরই মন্তব্য : “বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশকুসুমের মত শুভ্রে ফুটিয়া থাকে না; তাহা তো দেশ-কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নাম, রূপ আছে। যদি সকল প্রকার গণ্ডীকে, সকল প্রকার বিশিষ্টতাকে একবারে অস্বীকার করাকেই সার্বজনীনতা বলে তবে সার্বজনীনতা বস্তুতঃই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না কিন্তু ভাতৃভাবকে মানি, এ কথাও যেমন তেমনি সার্বজনীনকে বিশেষ বলিয়া মানি না, একটা নির্বিশেষ সার্বজনীনতা মানি, ইহাও সেইরূপ মাথা নেই তো মাথা ব্যথা।” বাঙালী, বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে এমনি একটা ‘মাথা ব্যথা’ লক্ষ্য করিয়াই সংশয় জাগে, এই সাড়ম্বর উৎসব অভিসন্ধিমূলক অভিনয় নয়তো? এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ টেটসম্যান পত্রিকা শত-বার্ষিকী সম্পর্কিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে অত্যন্ত সত্য কথা বলিয়াছেন : “Those who do not read Bengali are dishonest to claim full response to Tagore except perhaps to his paintings.”

ইদানীং কালে পণ্ডিত নেহেরুর উচ্ছ্বাসিত রবীন্দ্র-প্রশংসা সম্পর্কে প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হইয়াছে : “পণ্ডিত নেহেরুর বিগত কয়েক বৎসরের কার্যকলাপে আমাদের মনে হয় নাই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। তাঁহার স্বভাব বাংলা ও বাঙালীর স্ববিধা ও উন্নতির বিপরীত কার্য করা। আমরা বাঙালীরা সর্বদাই দেখিতে পাই ও বুঝি যে, পণ্ডিত নেহেরুর বাঙালীজাতি, বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও বাংলার কৃষ্টির প্রতি বিদ্বেষই পূর্ণ মাত্রায় আছে, প্রীতি কিছুমাত্র নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভাঙাইয়া জগতসভায় নিজের ও নিজ চাটুকারবর্গের স্থান সুরক্ষিত করার জন্য ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ‘বিশ্বমৈত্রী’ মাত্র পণ্ডিত নেহেরুর প্রাণে কোন প্রকার একটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অম্ময়গণের সৃষ্টি করে। তাহার কারণ নেহেরু বিশ্বসভায় একজন কেউকেটা হইয়া বিচরণ করিতে কামনা করেন।”

\*

শ্রমশানের চিতাশয্যা শুইয়া আজকের বাঙালী আমরা নৈরাশ্রে মরণের দিন গণিতেছি। কোথায়ও আলো নাই, অত্যাচারের সকল দরজা সব দিক হইতে অবরুদ্ধ। আপন বীর্ঘহীনতায় বাঙালী আজ দীন ও কোণঠাসা হইয়া

পড়িয়াছে। যে প্রতিভার দীপ্তি, চরিত্রবল, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, সত্য ও স্বধর্মনিষ্ঠা, আদর্শপরায়ণতা, নিকাম ত্যাগ-তপস্বী ও নির্ভীকপ্রাণতা থাকিলে একটা জাতি সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহার একান্ত অভাব শুধু সাধারণের মধ্যে নয়, নেতৃবৃন্দের মধ্যেও। অবশ্য ঠিক লোকনেতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আজকের বাঙালীর মধ্যে একজনও নাই বলিলে অতুক্তি হইবে না। এমনি অসহায় দুর্ববস্বার মধ্যে বাঙালীর পুনর্জাগরণের একটা স্বর্ণ স্বযোগ আসিয়াছে রবীন্দ্র-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে। বিগত স্মরণকালের মধ্যে এমন স্বযোগ আসে নাই, আগামী শতবর্ষের মধ্যে আর আসিবে কিনা সন্দেহ। শুধু বাংলা নয়, ভারত নয়, বিশ্বব্যাপী বর্তমান রবীন্দ্র-সমারোহ যদি বাঙালীর মুচ্ছা-ভয়ের হেতু হয় তবেই এই শতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হইবে, বাংলা ও বাঙালীও চরিতার্থ হইবে। বিশ্বব্যাপী ভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার এই মহোৎসব-মুহূর্ত্তটি কিন্তু আমরা রাজকীয় তামাসা ও তামাসিকতার মধ্যে যে হারাইতে বসিয়াছি তাহা উৎসবায়োজনের গতি-প্রকৃতির লক্ষণ দেখিলেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ আজ বহুশতাব্দীর নৃত্য-গীত-নাট্যের আবিলতার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলার স্বকীয় চিন্তা-চর্চা, ধ্যান-মনন, সাধ্য-সাধন, অল্পশীলনের সামগ্রিক রূপটির বিশ্লেষণে প্রতিফলনের তেমন কোন স্থায়ী ব্যবস্থা চোখে পড়িতেছে না। ইহা ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা ও জয় কি করিয়া সম্ভব? জয়ন্তী উৎসবের সমস্ত ব্যাপারটা সরকারী কৃষ্ণিগত। দেশের নং ও সাধুপ্রকৃতির অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী, প্রাজ্ঞ-মনীষীর দ্বারা গঠিত কোন স্বতন্ত্র সংস্থার হাতে এই ভারটি থাকিলে ভাল হইত। একটা জাতির আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সম্মত ও সুচলিত সুযোগকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির অহুকুলে অপব্যবহার অন্ধ অহুদার্যেরই পরিচায়ক। রবীন্দ্র-জীবন সামগ্রিকভাবে বাঙালী জাতির আত্মোপলব্ধির ব্যঞ্জনা ও চেতনার দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাঙালীরই গৌরব। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপ্তি সম্প্রসারিত বাঙালীদ্বেরই বিশ্বমানসে প্রতিফলন। বাঙালীর এই আত্মোপলব্ধি থাকিলে রবীন্দ্র-জয়জয়ন্তীতে তাঁর বীর্ঘ্য-বিক্রমকে বাদ দিয়া শুধু নাচ-গানের হালকা আমোদ-প্রমোদ প্রস্রিত হইত না, অথবা এখানে-সেখানে ‘রবীন্দ্র-ভবন’ আর রবীন্দ্র-জন্ম-ভিটার উপর ‘ড্যান্স-ড্রামা একাডেমি’র নাচ-গানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিলজ্জতা

আমল দেওয়া হইত না। ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিশ্বকবির পুণ্য জন্ম-ভিটার উপর মাকিন প্যাটারের নিরাভরণা উক্ত বাস-বাড়ী নিশ্চয়ই ‘শ্রামলী-কুটির-বিলাসী’ কবির আত্মাকে ভৃষ্টি দিবে না। বিনম্র বিনতিপূর্ণ সহজ স্তম্ভর অসীম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বাংলার বৈশিষ্ট্যোদ্দীপক স্থাপত্য-শিল্পগৌরবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীটি স্থিতি চিহ্নিত করা যাইতে পারিত—যাহাই হইত মহামানবের মিলন-তীর্থ—যাহা জগদ্বাসীর সজ্জ প্রণাম আকর্ষণ করিত। শতবর্ষ পরের বাঙালী সন্তান-সন্ততিরা বিমুগ্ধ বিস্মারিত নয়নে এই তীর্থ-মন্দির সন্দর্শন করিত। শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে তীর্থরঞ্জে গড়াগড়ি দিত আর কৃতজ্ঞ চিত্তে পূর্বপুরুষের অকুচিপূর্ণ কৃতিকে স্মরণ করিত। অথবা বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কারের চেয়েও ব্যাপকতর ও মহার্য্যতর রবীন্দ্র-পুরস্কার স্থাপ্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথকে অমর করিতে পারা যাইত।

\*

কিন্তু দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। অসম্মত কাল সমুদ্রে কত শত রাষ্ট্র, অগণিত রাজত্ব, কত অন্ধ-মদগবিত ক্ষমতালোভী আর তাদের অনাচার, দৌর্ব্যাস্ত্র জল বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতেছে ও যাইবে। কিন্তু মিলাইয়া যাইবে না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভাবলেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবেন। ব্যাস-বাগ্নিকী, কালিদাস-ভবভূতিকে বাঁচাইবার জন্ত তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি বা আধুনিক ‘হল’ কোথাও নির্মিত হয় নাই, তথাপি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতির চিত্তে তাঁহারা অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথও করিবেন। আমাদের বলিবার কথা এই যে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী যে ভুবড়ী পোড়াইবার আয়োজন হইয়াছে তাহার ক্ষণদীপ্তি ক্ষণিকেই মিলাইয়া যাইবে—শুধু পড়িয়া থাকিবে দম্ব বাকুদের শু পাকার ভস্মরাশি এবং উৎক্লিষ্ট শতধা বিক্লিষ্ট তাহার অঙ্গারগুলি। শতবার্ষিকী উৎসব ঘনঘটা শেষে আজিকার রবীন্দ্র-সমারোহও বিশ্বস্তির অতলে তলাইয়া যাইবে।

\*

কার্লাইল শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “Indian Empire or no Indian empire, we want Shakespeare, him we will not willingly let die.” রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও খাটি বাঙালীর সেই কথা। রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাইয়াই বাঙালী বিশ্ব জয় করিবে।

# স্বাস্থ্যমোচন

বায়ুরশ্মি বিজ্ঞান (নির্দেশ পুস্তিকাসহ; স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রকরণ নং ১)—যোগিবর শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

দেবীশক্তি তত্ত্বাবলী ॥ মাতৃকাক্রম প্রণব সজ্জ। সঙ্গলক শ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী।

প্রকাশ ও প্রাপ্তিস্থান—মাতৃকাক্রম প্রণব সজ্জ, ১৫বি দেশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের 'বায়ুরশ্মি বিজ্ঞান' পুস্তক হইতে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে আলোচ্য সারণি (Table) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সারণিখানি ২০" x ১৬" ডবল ডিমাই সাইজের প্রায় ৮০ পৃষ্ঠিত কাগজে লাল ও কালোতে ছাপা। বিষয়বস্তু এমন অস্থূল্যায় সজ্জিত হইয়াছে যে, নিজ-নিজ প্রয়োজনানুযায়ী দৃষ্টমাত্রে অন্যায়সেই জাতীয় বিষয় জানিতে পারা যাইবে। অধিকন্তু নির্দেশ-পুস্তিকায় সারণি পাঠের নিয়ম ও দৃষ্টদর্শন দেওয়া আছে। আলোচ্য এক নম্বর চার্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে নানা রঙের সূর্য্যরশ্মির মানব মনের উপর প্রতিক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাকৃতিক নিয়ম, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে রোগ উপশম, বিভিন্ন রঙের আধারস্থিত সূর্য্যরশ্মি সঞ্চিত জলের ঔষধে পরিণতি ও বিভিন্ন রোগারোগ্য, মনঃশক্তি বৃদ্ধি, জ্বর, চক্ষু, নাক, উপপ্কাশ বায়ুর পরিচয় ও প্রভাব, অকাল বার্তা নিবারণ, দীর্ঘজীবন লাভ প্রভৃতি বহু এবং বিচিত্র বিষয়। স্বামিজী মহারাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁরই প্রস্তুত মাতৃকাক্রম-প্রণবসজ্জে বোগবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই সব রোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আলোচ্য ১নং সারণিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রকাশিতব্য ২ ও ৩ নং সারণিতে ভৈরবজ, উপপ্কাশ বায়ুবিধি, শাস্ত্র-বস্তু ও ধাতুভস্মে রোগনাশিনী শক্তি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইবে। আমরা সাগ্রহে এই সারণির অপেক্ষা রাখিলাম।

প্রকাশ যে, ডঃ জামাপ্রদায় মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও প্রেরণায় স্বামিজী মহারাজ 'বায়ুরশ্মি বিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তক-খানি পাণ্ডুলিপি আকারে আছে অথবা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ঠিক জানা গেল না। ভারতীয় বৈদ্য ও বৈদ্যবিজ্ঞানের প্রাকৃতিক বাস্তব প্রয়োগমূলক এইরূপ গ্রন্থ ভারত সংস্কৃতির অঙ্গকার অধ্যায়ের পুনরুদ্ধারে যে মৌলিক অবদান হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। স্বামিজী মহারাজ সিদ্ধ গুরু (ত্বিকতের শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস) হুবোধ্য শিষ্য এবং নিজেও সিদ্ধ মহা-

পুরুষ। গুরুপরম্পরায় তিনি শুধু বোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন নাই, ইহাও প্রয়োগশিল্পও যে অধিগত করিয়াছেন তাহা তাঁহার এই গভীর ও বুদ্ধানপূর্ণ 'বায়ুরশ্মি বিজ্ঞান' হইতেই বুঝা যায়।

শব্দপ্রমাণ বৈদ্য। বৈদ্য বলিতে জ্ঞান—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির জ্ঞান। সত্যজ্ঞ। স্ববিরা এই ত্রিগুণের জ্ঞানলাভ করিয়াই ঋষি বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। ত্রিগুণ—স্রষ্টা, স্থিতি, লয় (Energy Trio)—অগ্নি, বায়ু, জল—রজ, সত্ত্ব, তম—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আর আয়ুর্বেদের পিতা, বায়ু, কফ—কালক্রমে বিভিন্ন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। বোগশাস্ত্রের মূখ্য প্রাণ বায়ুভূত হইয়া নিখিল স্থষ্টি ধারণ করিয়া আছে। অথচ প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছিন্ন ও স্রব্ধ হচ্ছে মানুষের জীবনচক্র ও চক্রিত। বর্তমানে নানা প্রকার কৃত্রিম ঔষধ ও অসম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাদের জীবন জটিল ও বহু গতিব্রষ্ট হইয়া কটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু দুর্ভোগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থায় স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ তাঁর মাতৃকাক্রম-প্রণবসজ্জে লোক-কল্যাণার্থে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া যে দুঃসাহসের পঙ্কির দ্বিরাছেন তাহাতে আমরা আশান্বিত, উৎসাহিত ও পুলকিত হইয়াছি।

শেখোক্ত সচিব পুস্তিকা ছইবাণিতে মাতৃকাক্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়, আদর্শ ও বাণী এবং আজন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে। মূল্যের কথা উল্লেখ নাই। তবে পুস্তিকাতুলি আরও সহজবোধ্য ও পারস্পর্য্যক্রমে অস্থূল্যায় সহিত লিখিত হইলে সাধারণের সুবিধার পক্ষে সুবিধা হইত।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ বুলেটিন (Bulletin)—২৯৯/৩/১  
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড, কলিকাতা-৯ হইতে কবিরাজ শ্রীহনুভূষণসেন ডি.এস্.সি. কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুবিধায় আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও হাসপাতাল 'জামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের' ত্রৈবার্ষিক মুখপত্র। এই মুখপত্রের কয়েকখানি সংখ্যা দেখিলাম। এখানকার গবেষণা বিভাগের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ এই বুলেটিনে লিপিবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে রোগী (নারী-পুরুষ), রোগ, চিকিৎসা, ঔষধ, আরোগ্য, মৃত্যু ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ রোগ-চিকিৎসা বিষয়ে সম্ভব্য ও পাস্চাত্য চিকিৎসা সহিত তুলনামূলক সিদ্ধান্ত বুলেটিনকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সম্ভবতঃ এরূপ ধরনের বুলেটিন আর কোমণ্ড আয়ুর্বেদ কলেজ বা হাসপাতালে নাই। কিন্তু থাকা বাঞ্ছনীয়। আয়ুর্বেদকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা করিতে ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে এইরূপ বুলেটিনের গুরুত্ব বৃদ্ধি। কোন মূল্য লেখা নাই। বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ এই সচিব বুলেটিন প্রকাশ করিয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণ।

**কারিকাপেপটল**

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

# সামগ্রিক

শতবর্ষ : ১৩৬৮ আর ১২৬৮ :

বর্তমান ১৩৬৮, ইং ১৯৬১ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষ যে ইতিহাসের পর্ধ্যায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তার ভিত্তি রচিত হয় ঠিক একশো বছর পূর্বে ১২৬৮, ইং ১৮৬১ সালে কয়েকজন অলোকসামান্য প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক ব্যক্তির জন্মগ্রহণের ফলে। বিশেষ বাংলার ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদপূত এই শতবর্ষ পূর্বের হুফলম্ব ১২৬৮ (ইং ১৮৬১) সালটি। এই একই সনে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কর্ণেল হুবেশ বিশ্বাস প্রমুখ দিকপাল বাংলার কোল আলো করিয়া আবির্ভূত হন। বাংলার বাহিরে এই একই বছরে ভাবতমাতার অঙ্ক উজ্জ্বল করিয়াছিলেন মতিলাল নেহেরু আর মোক্ষগুপ্ত বিশ্বেরায়া। এই বয়সী পুরুষদের মধ্যে একমাত্র স্ত্রীর বিবেচনাও এখনও শতাব্দী হইয়া জীবিত আছেন। ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁকে বিস্কর্মা বলিলেও অত্যাড়ি হইবে না। ১৯৬১ সনের এই কৃতী পুরুষশ্রেষ্ঠদের শেষ নিঃশ্বাস স্ত্রীর বিবেচনায়া বাধীন ভারতের 'ভারতরত্ন' উপাধিবিভূষিত হওয়ায় অন্ততঃ খেতাবটির মান রক্ষা হইয়াছে। অন্তর্ধায় ভারতরত্নের ধরপটী বর্তমানের ভারতবাসীর বুকেরবাই উপায় ছিল না এবং বিংশ শতকে যে হইবে, এমনও মনে হয় না।

‘জাতীয় হৃগলী-শ্রী’ :

গত ৩০শে এপ্রিল '৬১ হৃগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যাল ভবনে হৃগলী জিলা শারীর শিক্ষা সংঘ সংহতির পরিচালনায় পশ্চিম বংগ জাতীয় জ্যোতিষ্মান ও দেহ গঠন সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত “জাতীয় হৃগলী-শ্রী” শ্রেষ্ঠ দেহী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং হৃগলী, খরাজ সংঘের সদস্য শ্রীহেমচন্দ্র সাহা শ্রেষ্ঠ দেহীরূপে নির্বাচিত হইয়া ‘জাতীয় হৃগলী-শ্রী’ (১৯৬১) আখ্যা লাভ করেন। প্রায় সহস্রাধিক ব্যায়ামায়ুরাগী দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন, হৃগলীর অতিরিক্ত জিলা-শাসক শ্রীতরুণ দত্ত ও সভাপতির কার্য পরিচালনা অন্তে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন নিখিল ভারত জাতীয় দেহ গঠন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রতিযোগিতাটির বিচারকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী নীলমণি দাস (আয়রণ মান), মনোজ রায় (বিশ্বশ্রী), হরেন্দ্রনাথ কাবানী, বামচরণ কুজু ও হৃগলীর শারীর শিক্ষা অধিকারিক এস এন. ঘোষ প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিদগণ। বিরতিয় সময় নিম্ন নিম্ন দেহমৌল্য প্রদর্শন দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করেন যথাক্রমে শ্রীজলালকান্তি দত্ত (এশিয়া-শ্রী) ও শ্রীবিদ্যনাথ দত্ত।

বুলগেরিয়ার গড়পড়তা হিসাবে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি :

দেশের জাতীয় অর্থনীতির ক্লাান্তর, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নযোগ্য উন্নতি, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বর্ধনশীলভাবে যত্ন গ্রহণ প্রভৃতির ফলে বুলগেরিয়ার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে ১৯৪৭ সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল ১৩৪ সেখানে ১৯৬০ সালে মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৮ পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বুলগেরিয়ার বর্তমানে গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ৬৬ বৎসর—স্ত্রীলোকদের ৬৮ বৎসর এবং পুরুষদের ৬৪ বৎসর। ১৯৩৫-১৯৩৯-এর মধ্যে বুলগেরিয়ায়

গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ছিল বৎসরক্বে ৫১.৫, ৫২ এবং ৫১। এই তথ্যদুই বৎসর ব্যয় যে, বুলগেরিয়ায় গড়পড়তা আয়ুষ্কালের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই অনেক দেশকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের রেকর্ড :

ইউ. এন-এর বর্ষপঞ্জী হইতে জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যে খাদ্য গ্রহণ করে তার গড়পড়তা ব্যক্তিগতভাবে ক্যালোরী মূল্য এইরূপ : আইরিশ ৩,৫০০, নিউজিল্যান্ড ৩,৪০০, ডাচ ৩,৩৫০, ব্রিটিশ ৩,২০০। এইভাবে ক্রমে কমিতে কমিতে তালিকার সর্বশেষে ভারত ১,৮০০। আরও দেখা যায়, প্রায় সব বিষয়েরই সর্বনিম্ন রেকর্ড করার কৃতিত্ব ভারতবর্ষের।

সমাজতান্ত্রিক গ্যাটারের সমাজগঠনের আদর্শবিভাগ পণ্ডিত নেহেরুর কংগ্রেস-শাসনে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৭০০০ কোটি টাকা ব্যয় করার ফলে কাগজ-কলনে জাতীয় আর ৪২% বৃদ্ধি পাইলেও সাধারণের আর্থিক অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হয় নাই। কেন হয় নাই, ভারতের ভাগ্যবিধাতারা ইহা ভাবিয়া পান না। ইহাও এক রেকর্ড।

আর একটি রেকর্ড। আন্তর্জাতিক লেবার অফিসের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতে প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের পথ ১৯৬১ সালেও ভারতের তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে এই দেশে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ৭০ লক্ষেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন গণী ও শিল্প অঞ্চলে বহু কর্মহীন শ্রমিক আছে বাহারা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

শ্রীসমরজিৎ কর

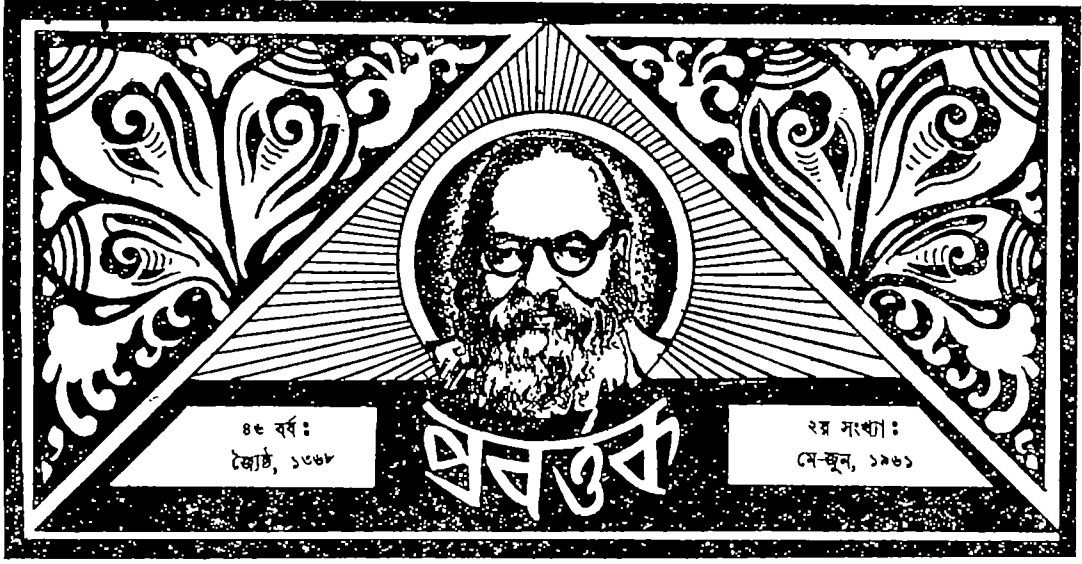
পুর্নাতন আমাশয়

মৃতন এবং পুর্নাতন আমাশয়ের নির্ভরযোগ্য ঔষধ।

DIAGEO

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীবাধারমণ চৌধুরী বি-এ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত  
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাউসটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকিশোর রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

সত্যকে আশ্রয় কর। কলি যুগে নিছক সত্য নাকি এ দেহ বহন করিতে পারে না। যদি ইহা সত্য হয়, তবুও কি দেহের মমতায় পরম ধন যাহা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। সব সাধনার বড় কথা সত্য। নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য সত্য্যভিষিক্ত হওয়াই একমাত্র উপায়। যদি সত্যকে হত্যা কর তুমি সত্যই হত হইবে। তোমার ইহকাল থাকিতে পারে, কিন্তু এই জগৎবিশ্বের মত অনিত্য, এই কম বংসরের পরমায়ুর শেষে যে অশান্তি ও অন্ধকার তাহা স্মরণ করিও। যে সত্যকে বরণ করে, সে নির্ভীক। যে অনন্তাশ্রয়ে নির্বিকার সেই জীবনের বড় জয় অধিকার করে। কি তুচ্ছ মোহে তুমি ভাগবত ধর্মকে উপেক্ষা কর। মন দৃঢ় কর। সর্বভাগী হও। এক কোটি লোকের মধ্যে তুমি একটি হও। ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু রাখিও না। অসত্য ও মায়া আশ্রয় করিয়া যুগ যুগ তো কাটাইলে। ভগবানের পথে খাঁটি হইয়া একটি বংসরও চলিয়া দেখ না, ইহাতে কত অমৃত। নিজের মনের মত হওয়া বা করার দিকে ঝোঁক রাখিও না। ইহাতে শুধু ভগবানের স্বজনকে বাধা দেওয়া হয় না, নিজেও ক্ষতবিক্ষত হইতে হয়। অকূলে যদি তরী ডোবে তবুও তাঁর প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখিতে হয়। এ পথে স্বপ্ন-দুঃখের বিচার নাই, ধর্ম-কর্মের বিচার নাই, গুণ-অগুণের হিসাব নাই। দেহকে উপাধি জানিয়া, সত্য ভগবানের সঙ্গে যুক্তি রাখিয়া গুণাতীত, কর্মবন্ধনের অতীত হইয়া থাকিতে হয়। কোন স্বার্থ সিদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি যদি থাকে তবে আবার দৃষ্টি কোথায় পাবে বাহা দিয়া ভগবানকে দেখিবে। যদি অন্য দিকে মন থাকে তবে প্রবঞ্চক হইবে, কেননা আবার মন কোথায় পাইবে বাহা দিয়া ভগবানকে ভালবাসিবে। যে সত্যসত্যই ভগবানকে চাহে, ভালবাসে তার এক মুহূর্তে পরিবর্তন আসে। আর ভগবানের নামে আত্মস্বার্থ পূর্ণ করার স্বভাব যার, সে ভগবানের অনন্ত স্বার্থ হইতে মুক্তি পায় না। বত চায় তত পায়। কিন্তু ঈশ্বরের আশ্বাদ থেকে সে যে বঞ্চিত, এইটুকু জ্ঞানও হারায়। জ্ঞানহারা যে সে অন্ধ। অন্ধ পরমকে ছাড়িয়া কুত্রকে আঁকড়াইয়া থাকে। এ মোহ ত্যাগ কর, আলোর পথ পাইবে।

[ ১৯৬০ সালের দিনলিপি হইতে সংকলিত ]

সত্যগুরু শ্রীমতিলাল

## আবেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং ।) ষষ্ঠী ঋক্

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

বিসুপর্ণো অস্তরিক্ষাণ্যখ্যদগভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ ।

ক্লেদানীং সূর্য্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাম্ রশ্মিরস্তাততান্ ॥ ৩ ॥

অর্থ—“গভীর বেগাঃ” (গভীর কম্পনশালী) “সুপর্ণো” (শোভন পতন গতিশীল কিরণরাশি) “অস্তরিক্ষাণি” (অস্তরীক্ষ সকল) বি-অখ্যদ (বিশেষরূপে প্রকাশ করে) “অসুরঃ” (সকলের প্রাণদাতা) সুনীথঃ (সুপথ প্রদর্শক) সূর্য্যঃ (সবিতৃদেব) “ইদানীং” (এই রাজ্যে) “কঃ” (কোথায়) “কঃ চিকেতঃ” (কে জানে) “অস্ত” (সূর্য্যের) “রশ্মিঃ” (রশ্মি, কিরণ) “কতমাং” (কোন) “জ্যাম্” (দ্যুলোককে) “জাততান্” (ব্যাপ্ত করিয়া আছেন) ॥ ৭ ॥

সরলার্থ—গভীর কম্পনশালী শোভন পতন গতিশীল কিরণরাশি অস্তরীক্ষ সকল বিশেষরূপে প্রকাশ করে । সর্বজীবের প্রাণদাতা সুপথ প্রদর্শক সূর্য্যদেব এই রাজ্যে কোথায় কোন দ্যুলোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন ।

বিশদার্থ—অনন্ত সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ বীচিমালার অবিরত তরঙ্গাঘাতে যেমন একটি অনাহত জিজ্ঞাসা জাগিয়া থাকে—তেমনই সাগরতুল্য অতলস্পর্শী জ্ঞানবন ধ্যানগম্ভীর ঋষিমনেও অনন্ত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা নানা ভাষায়, নানা ছন্দে প্রকাশিত হয় । এই ঋক্মন্ত্রেও সেই একই স্বর ধনিয়া উঠিয়াছে “কঃ ইদানীং সূর্য্যঃ কশ্চিকেত কতমাং জ্যাম্ রশ্মিরস্তাততান্” । সত্যই তো ! যে সূর্য্য-রশ্মি দিবসে সর্বজীবের জীবন, যাহার দূরপ্রসারী কিরণরাশি “গভীর বেপাঃ”—গভীর কম্পনশীল, যাহার কম্পন অর্থাৎ চলন কেহই দেখিতে পায় না—এত দ্রুত যার গতি—যে গতির দ্বারা সে কেবলমাত্র যে ভুলোককে প্রাণবন্ত করিত, তাহা নহে—ভুলোক, দ্যুলোক, অস্তরীক্ষ লোক—ত্রিলোককেই সমভাবে উদ্ভাসিত করিত—সেই দ্যুতিমান সূর্য্যদেব রাজ্যে কোথায় কোন লোকে অবস্থান করেন ? ঋষিদের মনে এ অনুসন্ধিৎসা শাশ্বত কালের ।

“কেনেবিতং পততি প্রেবিতং মনঃ ।

কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ ॥

কেনেবিতাং বাচয়িমাং বদন্তি ।

চক্ষুশ্রোত্রং ক উ দেবো ন যুনক্তি ॥”

বলিয়া যে অনুসন্ধিৎসা একদিন অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে উঠিয়াছিল, সেই একই বিচিকিৎসা আজ জাগতিক জড়বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও জাগিয়াছে । এ সংশয়ের নিরসন তাঁহারাই করিয়াছেন । পরবর্তী ঋকে তাহার উত্তর মিলিবে ।



## ন শোভতে ন সহতে

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যর্গাশ্রানন্দ সরস্বতী

তে ভাষ্যায়জ্ঞভার ভূ ভূতমপি স্বকৃশ্চিরং স্বস্তুতে  
কিং মূর্ছার্চনপুষ্পমেকমধুনা বোচুং করে শোভতে ।  
দৃষ্টাশ্চ মৃষা শুচোহক্ষিযুগলে তে লজ্জতে নিব্বারঃ  
কার্পণ্যং সহতে ন বন্দ্যচরণে নেত্রস্থতে সৈকতম্ ॥ ১ ॥

দারাহত ভার, মৈনাকের গুরুভার—

সে ভার বহিতে স্বল্প চির আছে দূঢ় আর ক্ষম,  
তীর অর্চনার, নির্মাল্যের এক পুষ্প,  
কর পাতি নিতে—যেন মূর্ছা যাবে হেন সর্বগ্রাসী শ্রম।  
মিছে দুঃখ শোকে  
তব অশ্রুধার দেখি লজ্জা বুঝি পেল ক্ষীত মুখর নিব্বার,  
ও বন্দ্য চরণে  
এক ফোটা অশ্রুতে রূপণ জাঁখি, সহিতে না পারে শুষ্ক  
সৈকত প্রান্তর।

## শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

( ২ )

অধ্যক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু, এম. এ.

### রবীন্দ্র শিক্ষা-পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও শিক্ষক। কবি হিসাবে তিনি নতুন চিন্তা ও দর্শনের প্রবর্তক। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে নিজস্ব দর্শনের সূত্র প্রয়োগ ব্যবস্থাও করেছেন। বিদ্যালয় স্থাপন করে বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন কোরতে পেরেছেন। এ তাঁর অলৌকিক মনোবার পরিচায়ক।

সাম্প্রতিক কালের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশু-মনোবিজ্ঞানের স্থান কম নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে আছে শিশু, শিক্ষক তার সাহায্যকারী মাত্র। স্বাভাবিক উপায়ে শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলির স্বেচ্ছাসিদ্ধ বিকাশ সাধন করাই শিক্ষা। এবং পদ্ধতি হবে শিশু মনবৃত্ত্যানুসারী।

মনস্তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথের শিশু, শিশু ভোলানাথ ইত্যাদি

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে শিশুমন সম্পর্কে তাঁর ধারণা পাওয়া যায়। অত্যন্ত বাল্যকাল থেকেই শিশুমন কল্পনাগ্রন্থণ এবং কল্পনায় সে যতকিছু সৃষ্টি করে। তাঁর বড় হবার সাধ বড় বেশী তাই বড়দের অনুকরণ করে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কৃত্রিম করার বিরোধী ছিলেন। প্রকৃতির কোলে ধূলামাটি মেখে স্বাভাবিকভাবে সে বেড়ে উঠবে। ইন্দ্রিয় দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে। তিনি বলেছেন “শিশুর সাত বৎসর পর্যন্ত তার জীবনের সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অভ্যাবশ্যক-শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীর মাগের কোলে গড়াইয়া ধূলামাটি না

মাথিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে”। ( শিক্ষা পৃ: ৮৪ )।

শিশুরা খেলা ভালবাসে, ছড়া ভালবাসে, অসম্ভব কল্পনা ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথ তাই শিশুদের উপযোগী অনেক ছড়া রচনা করলেন। তাছাড়া নাটক, গান, গল্প ইত্যাদির দ্বারা তাদের স্বপ্নের আনন্দলোকে নিয়ে গেলেন। পাঠ হিসাবেও এই খেলার উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক রচনা করলেন। কেবল তত্ত্বগত নয়, শিশুমনো-বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগও তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে করেছেন।

### শাসন ও শৃঙ্খলা

বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলায় তিনি নীতি নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যালয়ের নির্মমতায় বালক রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হয়েছিলেন এবং পরিণত বয়সে সেজন্য বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলেন নি। পূর্বকালের মত শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাবে শিশুরা বাল্যকাল থেকেই আদর্শবান ও সংযমী হয়ে উঠবে। একজন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সহজ ও মধুর হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের সঙ্গে সহজ-ভাবে মেলামেশা করতে হবে। বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছাত্রদের হাতে দিলে সবচেয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায় এক কথা তিনি বলেছেন।

তিনি বলেছেন “লোকহিত ও স্বায়ত্ত্ব শাসনের যে দায়িত্ব বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্ত্ব শাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।”

“আমাদের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন অহুত্ব করে, আশ্রমের সব সমস্তা তার নিজেরই সমস্তা ... আমাদের যা-কিছু হৃৎ-হৃদগা, এমন কি, ক্ষুদ্র শিশুটির কাছেও যেন আমরা তা গোপন না রাখি। আশ্রমের দায়িত্ব বহনে তাদেরও অংশ আছে, একথা মনে করেই তাঁরা যাতে গৌরব বোধ করে, আমাদের তাই দেখা উচিত।” তিনি শাসনের বাঁধকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কেবল বিদ্যালয় সংক্রান্তই নয় খেলাধুলা, হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য সভা, গানের জলসা, চিত্র প্রদর্শনী, দরিদ্রভাণ্ডার, লোকসেবা ও নানাবিধ অহুতান ইত্যাদির পরিচালনা ও

ব্যবস্থাদিতে ছাত্রদের স্বয়ংক্রিয় নেতৃত্ব ও সহযোগিতা থাকতো। তিনি রাশিয়ার বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাশিয়ার চিঠিতে এক ভায়গায় লিখেছেন, “একটি মেয়ে বললে, আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয়: সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।”

...আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম ‘এখানে কেউ কোন অপরাধ করলে তার বিধান কি?’

একটি মেয়ে বললে,—‘আমাদের কোন শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।’

...আমি বললুম ‘মনে কর কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অথবা দোষারোপ হচ্ছে তাহলে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে?’

ছেলেটি বললে ‘তখন আমরা ভোট নিই। অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তাহলে তার উপরে আর কথা চলে না।’

...আমি বললুম ‘যে একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছেন সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।’

এই আদর্শে অহুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের ও শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কেবল স্বাধীনতা নয় বিভিন্ন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের স্বায়ত্ত্ব শাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের বহু কথিত গণতান্ত্রিক অভ্যাস, সহযোগিতা এবং স্বর্ধ সামুদায়িক জীবন ধাপনের অভ্যাসের নীতি পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

### শিক্ষার মাধ্যম

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা সর্বপ্রথম এবং সুউচ্চে ঘোষণা করেছেন। বাল্যকালে মাতৃভাষার ভ্রাতৃ মাতৃভাষাও সহজলভ্য এবং কাজে কাজেই প্রিয়। সেজন্য বাল্যকালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার অহুতম কারণ এর বিদেশী ভাষার উপর অতিরিক্ত পুরুষ আরোপ। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, “আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতি জননীর উপর সহসা দৌরাড্যা করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উজ্জ্বল এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজী শিখিতে গিয়া না হইল খেলা, না হইল খেলা; প্রকৃতির সত্য রাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার বন্ধ রহিল”। (শিক্ষা, পৃঃ ৫)।

মাতৃভাষা শিক্ষায় কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন : যেমন “(১) ছড়া আবৃত্তি করানো, (২) নানারকম খেলা ও কাজ, (৩) গল্প শোনা ও গল্প বলা, (৪) রামায়ণ মহাভারতের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, (৫) কবিতা শোনা ও আবৃত্তি করানো, (৬) শিশুদের নানা বিষয় সম্পর্কে মনের ভাব প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া, (৭) অভিনয় ও গান করানো, (৮) বই পড়া ও বইএর বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা ইত্যাদি”।

এজন্য তিনি নিজে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। ভাষা শিক্ষার পর ব্যাকরণ শিক্ষার কথা বলেছেন। এবং এ সম্পর্কে পুস্তকাদিও রচনা করেছেন। মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য রামায়ণ মহাভারতের জ্ঞান তাঁর মতে অপরিহার্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এ দুটি গ্রন্থের প্রভাব সর্বাধিক। সেজন্য তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ পাঠ নির্দিষ্ট করেছিলেন।

পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ পদ্ধতির স্বপক্ষে ছিলেন না; কারণ তিনি মনে করিতেন কোন একটি পদ্ধতি সমস্ত দেশের সব ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এজন্য তিনি বিচিত্র পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে পদ্ধতির পরিবর্তন করা চলতো। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলির মতোই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। যেমন “প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যতীত জ্ঞানই বলা, ভাবই বলা, চরিত্রই বলা, নিষ্কর্ষ ও নিষ্ফল হইতে থাকে।”

(শিক্ষা, পৃষ্ঠা ২৩); ফ্রোয়েল, মন্টসরীর মত প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে তা যান্ত্রিক ভাবে নয়, শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তার ভিতর দিয়ে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকশিত হবে এবং তার মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করবে। দেখার বিষয় তাঁর প্রদর্শিত কাজগুলিও শিক্ষার অঙ্গ ও শিশুর চিত্ত-বিকাশের উপযোগী। এই সমস্ত কাজ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। তাঁর প্রবর্তিত কাজগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে (২) যেমন :

### কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

(১) বাস্তবতা মূলক : বস্তু সংগ্রহ, জীবজন্তু পালন, বৃক্ষরোপণ, উদ্যান রচনা, ভ্রমণ, যাত্নের দর্শন, পিকনিক ইত্যাদি। শিশুরা খেলার ছলে নানাবিধ জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে ভালবাসে। সেগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন পাথরের হুড়ি সংগ্রহ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, ঝিহুক সংগ্রহ ইত্যাদি। জীব জন্তু পালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুদের হৃদয়ে কোমল অহঙ্কৃতির উদ্বোধন ঘটেবে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে। বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষের পরিচর্যা ও উদ্যান রচনার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে একদিকে যেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে অপর দিকে স্বকুমার বৃন্তির জাগরণ ঘটে। দেশ-ভ্রমণ এবং যাত্নের প্রদর্শন শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। খেলার যাত্নের নির্মাণও এদিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) বৌদ্ধিক কাজ : নাটক রচনা, অভিনয়, রামায়ণ মহাভারত পাঠ, গল্প বলা ও গল্প শোনা, সঙ্গীত ও নৃত্য, উৎসব অহুষ্ঠান। এগুলির মাধ্যমে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রসার হয় এবং আনন্দের অভিব্যক্তি সহজ হয়। আনন্দের সঙ্গে শিশুর মন হৃদয় হয়—তার চিত্তের সহজ বিকাশ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও সহজতর হয়।

(৩) সামাজিক গঠনমূলক কাজ : পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ, সেবা শ্রমের কাজ, ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ইত্যাদি। শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক দিকের বিকাশের বিষয় চিন্তা করতে হবে।

সমাজের হিতকর কাজের মাধ্যমে তার এই সকল বৃত্তির পুষ্টি ঘটে ও সে স্বার্থ সামাজিক রূপে নিজেকে গড়ে তোলে।

(৪) ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের উপযোগী কাজ : বিভিন্ন খেলা, কারুকার্য রচনা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, সাহিত্য রচনা, পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ ইত্যাদি। বাশিয়ায় হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা সর্বপ্রথম তার মনকে আকর্ষণ করে। ফলে তিনি নিজের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় একে সার্থকভাবে গ্রহণ করেন।

### ধর্ম ও নীতি শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বলে

মনে করেছিলেন। প্রাচীনকালে ঋষিবালাকরা যথার্থ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নির্মলীকৃত শরীর মনে বিদ্যাভ্যাস করতো। ফলে ইঙ্গিত ফললাভ সহজ হতো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রত যাপনের কাল।—“মহুগুহ লাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মহুগুহ লাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য ব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্ত করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে, সংসারের দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা সংসারাত্মকের জন্ম এবং সংসারাত্মকের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগসাধনের জন্ম প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।”—(শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পৃ: ২৯)।

## বাংলার মন্দির

( মন্দিরশিল্পে নবযুগ )

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যাতীর্থ, জ্যোতির্বিদ্যোদ

স্মরণীয় কাল হইতে বাংলার মন্দির-শিল্পে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল ইংরাজ শাসনের শেষভাগে তাহা ক্ষত বিলুপ্তির পথে ষাইতে থাকে। উৎসাহের অভাবে শিল্পীকুল নিশ্চিরুপ্রায় হইয়া পড়ে। তাহাদের বংশধরগণ পৈত্রিক পেশা ত্যাগ করে। এইভাবে মন্দিরের গঠনরীতি, অলংকরণ ও পুস্তলিকা সন্নিবেশ প্রভৃতি বিশ্বস্তির গহ্বরে চলিয়া ষাইবার উপক্রম হয়। নগণ্য দুই একজন স্বত্বধরই কেবল বিভিন্ন অবস্থার সহিত ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পল্লীর নিভৃত কোণে জীবন যাপন করিতে থাকে। বৃহৎ মন্দিরসমূহের নির্মাণ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়া ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চ সমূহ কিংবা সমাধি মন্দিরাবলীর নির্মাণ সময়েই উহাদের আস্থান আসিত।

বাং ১৩০৯ সাল হইতে পুনরায় মন্দির নির্মাণের একটু প্রবণতা লক্ষিত হয়। ঐ সময় কলিকাতা ও আগ্রাতে যে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারা বাংলার নিজস্ব শৈলীতে গঠিত নহে। ঐ সময় কলিকাতা মাধাঘরা গলি ওরফে শিকদার পাড়া স্ট্রীটের বিখ্যাত দেবতা

৩তারামন্দিরী যে মন্দিরটি নির্মিত হয়, উহা উত্তর ভারতীয় রীতির বহুচূড় দেবালয়। উহাতে সেই সময় যে লিপি সন্নিবিষ্ট হয় তাহা খ্রীষ্টীয়সাম্রাজ্যের সেবাইং খ্রীষ্টানুতায় চক্রবর্তীর উৎসাহে নির্মিত। ১৬ই চৈত্র সন ১৩০৯ সাল। উহাতে বারোটি কোণযুক্ত দুইটি পূর্ণ ও দুইটি অর্দ্ধ খাম আছে। মন্দিরে সতরটি চূড়া। পরবর্তী কালে ইহার আরও উন্নতি হয়। ঠিক ঐ সালে মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার জ্যোতেশ্বর গ্রামে শ্রীতলা-মাতার মন্দির এবং আদিধররা গ্রামের শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির দুইটি উৎকলীয় রীতির দেউল। প্রথমটির সম্মুখে ক্ষুদ্রাকার জগমোহন। দুইটিই লিপিস্কৃত। শেষেরটির দাতা গ্রামবাসী ব্যবসায়ী শ্রীনিমাই জানা। এই আদিধররা গ্রাম শ্রীতলামন্দিরের কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর জন্মস্থান। তিনি কাশীষোড়ার রামতুল্য রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। কংসাবতীর উভয় তীরে এই গ্রাম অবস্থিত।

দাসপুরের সন্নিকটবর্তী লাওদা গ্রামে ষাঁটাল বিষ্ণুপুর

পথের চার-মাইল-স্তরের নিকট বাং- ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে বোম্বাই প্রবাসী বিখ্যাত বঙ্গ ব্যবসায়ী ৬নদীয়ারচাঁদ শুই দুইটা আটচালা শিবালয় ও মধ্যবর্তী চাঁদনী বিশ্রামাগার স্থাপন করেন। মন্দির দুইটির চূড়ায় বহুমূল্য কলস সন্নিবেশিত ছিল। মন্দিরে কারু নাই। স্থানীয় শ্রদ্ধধরই উহাদের নির্মাতা। দাতা নিকটবর্তী পদমপুর গ্রামের অধিবাসী।

বাং ১৩২২ সালে মহাপ্রাণ ললিতমোহন ঘোষ চাঁদপুর গ্রামের বিখ্যাত চাঁদনী শীতলা মন্দির স্থাপন করেন। উহাতে কলাগেছে থাম, হাঁসগলা খিলান ও বিভিন্ন প্রকার কারুখচিত হইয়াছে। স্থানীয় শ্রদ্ধধর রাজারাম মিস্ত্রী উহার নির্মাতা। উক্ত শ্রদ্ধধর কর্তৃক বাং ১৩২৪ সালে বাহুদেবপুর শঙ্করবিক দত্ত বংশের গৃহদেবতা ৬বৃন্দাবন-চন্দ্রের চাঁদনী মন্দিরও রতনমণি দত্তের ব্যয়ে নির্মিত হয়। উহাতেও কলাগেছে থাম, হাঁস গলা খিলান ও কারুকার্য বহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা গ্রামে মহারাজ ষোড়শনারায়ণ রাও বহু গৌরবাময় ৬গত্যনারায়ণের চাঁদনী মন্দির মুসলমান মিস্ত্রী দ্বারা নির্মাণ করান। ঐ স্থানে ৬জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত নাগর লিপিস্থ ৬কালী মন্দিরও আধুনিক। মেদিনীপুর দাসপুরের রাধা-কৃষ্ণপুর গ্রামের শীতলার চাঁদনীও বাং ১৩৩৪ সালে মুসলমান মিস্ত্রীর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

বাঁটাল থানার হরিদাসপুরের হড়বংশের সংস্কৃত লিপিস্থ চাঁদনী বাং ১৩৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। হুগলী ঘোষপুর গ্রামের ভট্টাচার্য বংশের চাঁদনীও নূতন। সাম্প্রতিক কালে কেশপুর থানার ধলপুরায় গৌরীমাতার হুউচ্চ পঞ্চরত্ন নির্মিত হইয়াছে।

কলিকাতার বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে ৬শ্রীমহেশ্বর জীউর চাঁদনী দেবালয় বাং ১৩৩২ সালে নির্মিত হয়। ইহাতে তিনটা লিপি আছে। প্রধান লিপিটি—শ্রীশ্রী ৬শ্রীমহেশ্বর-জীউ। স্বর্গীয় ৬গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপত্নী শ্রীমত্যা শীতলদাসী দেবীর বাসনা পূরণার্থে তন্তু ভ্রাতৃপুত্র শ্রীহর্গা-চরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ১২ আষাঢ়, সন ১৩৩২ সাল।

অপর লিপির তাং ১৩৩২।৩০ কার্তিক। তৃতীয় লিপিতে তারিখাদি নাই। মন্দিরে রাধার সহিত শ্রীশ্রীমহেশ্বর বিগ্রহ, গোপাল প্রভৃতি দেবতা আছেন। থামগুলি লৌহ নির্মিত ৬ গোলাকার।

সিমলা ষ্ট্রীটে ৬প্রতাপ দে প্রতিষ্ঠিত একটি গোপাল মন্দির আছে। পূর্বভাগে উর্দ্ধে ইহার উত্তর ভারতীয় রীতির চূড়া। সম্মুখে দ্বিতল নাট্যমন্দির। কোন কারু নাই। মন্দিরে প্রস্তরের গোপাল মূর্তি।

মানিকতলার ৬টবক্ষবচরণ পালের প্রতিষ্ঠিত ৬কালী-চাঁদের মন্দির বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মন্দিরটি নব-রত্নের সহিত উত্তর ভারতীয় রীতির মিশ্রণ। উত্তরে মূল মন্দির, দক্ষিণে সম্মুখে দ্বিতল নাট্যমন্দির। দ্বিতলের অলিন্দের রেলিংগুলি মর্মর নির্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগ প্রস্তরমণ্ডিত। ভিতরে ইষ্টক। প্রধান দ্বারের দুই পাশে ও উপরে তেতাল্লিশটা খোপে কৃষ্ণগোলায় বিভিন্ন পুস্তলিকা। নিম্নে বক্ষাকরে প্রত্যেক পুস্তলিকার পরিচয় লিখিত। ত্রিবেণীর লুপ্ত প্রাচীন মন্দির ছাড়া পুস্তলিকার এইরূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ অল্প কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। দ্বারশীর্ষে তিনটা বৃহৎ রঙীন মূর্তির খোপ। মধ্যো বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, পশ্চিমে সীতা-রামের বিবাহ, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের যুগলমিলন। দেওয়াল গায়ে অঙ্কিত ছবিও আছে। চারিটা মর্মর হস্তীর পৃষ্ঠে বিচিত্র মর্মর স্তম্ভের উপর সিংহাসনের ছাদ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়।

বাগবাজার রামকান্ত বঙ্গ ষ্ট্রীটে নব বৃন্দাবন নামক বিরাট নবরত্ন মন্দির ও নাট্যমন্দিরটি শ্রীনন্দলাল কড়ুরী ও তৎপত্নী সহাসিনী কর্তৃক সন ১৩৪৭।৪ জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিন প্রতিষ্ঠিত। ইহা স্বাক্ষরগ্রন্থ আধুনিক নবরত্ন। চারি-দিকের অলিন্দে ষোলটা পূর্ণ ও চারি কোণে চারিটা অর্দ্ধ বারো ধাঙ্গা কলাগেছে থাম। খিলানগুলি দরুণ শ্রেণীর। গায়ে বহু স্থানে মর্মরমণ্ডিত। দক্ষিণে মর্মরমণ্ডিত মণ্ডপ চামচিকা খিলানযুক্ত। মন্দিরের উপরে উঠিবার সোপান নাই। দেবতার নাম শ্রীশ্রী ৬রাসেশ্বরী রাসবিহারী জীউ ও ৬রাজরাজেশ্বর জীউ। দাতার বংশাবলী—নবনীকান্ত কড়ুরী (কোড়ী), স্বত লালচাঁদ, স্বত রাসবিহারী, স্বত

নন্দলাল। হাওড়া জেলার মাকড়দহের নিকটে ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল। যুত ব্যবসায় ইহার ধনী হইবাছিলেন।

বাগবাঁজারের বিখ্যাত শুদ্ধ ভক্ত সজ্ঞারাম ওরফে গোড়ীয় মঠ সন ১৩৩৭ সালেব ১৭ই আশ্বিন (৪৪৪ গোড়াব্দে) বরিশাল বানরীপাড়া নিবাসী মঙ্গলদাস দস্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠাধ্যা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ জে. বি. ডি. কালীর বড়ির ব্যবসাবে ধনী হইয়া বিরাট নগরস্থ মন্দির ও সংলগ্ন নাট্যমন্দির স্থাপনে ইনি অর্থের সম্ব্যবহার করেন। শ্রীধা সহিত প্রধান বিগ্রহের নাম বিনোদানন্দ। গোরাজ মূর্তিও আছেন। মন্দির ও নাট্যমন্দির নব বৃন্দাবনের অনুরূপ কিন্তু বহু মর্ম্মরলিপি মণ্ডিত ঠাকুরবাড়ী। নবদ্বীপ মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দির ও শ্রীবাস অঙ্কন মন্দিরদ্বয় অনুরূপ শ্রেণীর সহিত উত্তর ভারতীয় রীতির মিশ্রণ।

আধুনিক যুগে কলিকাতায় দুইটি খাটি উৎকলীয় দেউল-রীতির মন্দির নির্মিত হইবাছে। একটি পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, অপরটি নিমতলা ঘোড়াবাগান ধানার সম্মুখে। শেষেরটি শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কীৰ্ত্তি। মন্দিরের শীর্ষে বৃহৎ আমলককে উপর কলস। প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিটের মোড়ের প্রাচীন আটচালা শিবালয়টিকে অলিন্দযুক্ত উৎকলীয় দেউলে রূপান্তরিত করা হইবাছে। ইহার গাজের চারি কোণে চারিটি বৃহৎ গোলাকাব বন্ধনী। উপরে একটি বৃহৎ আমলক। মধ্যে চারিটি অর্ধ ও চারি কোণে চব্বিশটি আংশিক আমলক। মন্দিরে লিপি :—স্থাপিত ৩০শে চৈত্র ১২৭১ সাল। শ্রীশ্রী/ ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবজীউ। সেবায়েৎ ৮রাজকৃষ্ণ দাস। সংস্কার ১লা বৈশাখ সন ১৩৬৩ সাল।

যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের সংযোগে একটি বৃহৎ চারচালা মন্দিরের উপরে তিনটি আটচালা মন্দির স্থাপন করিয়া এক বিচিত্র দেবালয়ের সৃষ্টি হইবাছে। ইহার দেবতা শিব ও কালী। চারি কোণে চারিটি ও সম্মুখে দুইটি চুমকী থাম। মন্দিরে ইংরাজী লিপি : The temple was erected at the

oast of the Calcutta Improvement Trust in 1936 it being a public place of worship.

মেদিনীপুর ডেবরা ধানার বাকলসা গ্রামের ৮রাধারমণের চাঁদনী মন্দিরে ও খড়দহের রাসমঞ্চে এইরূপ ইংরাজী লিপি আছে।

পাঁশকুড়া ধানায় গোপালনগর গ্রামে পশ্চিম বাংলা পুলিশের প্রধান শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরী স্বীয় বংশের দেবতা ৮রাধাবল্লভের যে চাঁদনী মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন উহার চূড়ায় বিষ্ণুচক্রের সহিত বংশীও শোভা পাইতেছে।

কলিকাতা বিবেকানন্দ রোড ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট সংযোগের নিকট পূর্ব দক্ষিণ দিকের একটি চাঁদনী মন্দিরের উপরে দুইটি আটচালা মন্দির চূড়ারূপে অবস্থিত। উহাতে লিপি : শ্রীশ্রী/ভগবান্নমির। আনন্দ বিবির স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত সন ১৩৪৩ সাল। পরে অছিগণের নাম। নাগরাক্ষরেও আর একটি লিপি আছে। নিকটে মাপিকতলা ষ্ট্রিটের (৭৭ নং) উপর ৮জনর্দন সাহার স্বর্ণ ছুর্গার মন্দির এবং নিমতলা ঘোড়াবাগানের মথুর সেনের ঠাকুরবাড়ী দুইটিও নূতন ভাবে নির্মিত। ইহার প্রাচীন কোন রীতির অনুরূপ নহে।

রামকৃষ্ণ মঠের কাঁকড়াগাছির সমাধি মন্দির দেউল-রীতির ও প্রস্তরমণ্ডিত। বেলুড়ের ইং ১২৩৬ সালে নির্মিত রামকৃষ্ণদেবের মণ্ডপ সহিত বিরাট মন্দির বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত। ইহার চূড়া দেউলরীতির সহিত বাংলা চারচালা রীতির সমন্বয়। পরমহংসদেবের জন্মস্থান হুগলীর কামারপুকুরে ইং ১২৫১ সালে নির্মিত মন্দিরটীর রীতিও অভিনব। বাঁকুড়া জয়রামবাটীতে সারদাদেবীর মন্দিরও মণ্ডপসহ যুক্ত বাংলার সহিত রোমক রীতির মিশ্রণ।

কলিকাতার মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ও কয়েকটি মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ঐগুলি :—আমহাষ্ট্র ষ্ট্রিটে বিশুদ্ধানন্দ নরস্বতীর আরোগ্যশালায় তিতরের দেউল, চোরবাগানে সুরমমল নাগরমল স্মৃতিভবনের নিম্নে ৮রামসীতার মন্দির, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ মন্দির—সংস্থাপক ভুলসীরাম দৌলতা দেবী। ইহার

# কালীকঙ্কর

শ্রী হংস

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

মৃত্যুর পরে আমার জীবনী লেখা হবে।

দেশবাসী সাগ্রহে সশ্রদ্ধ চিত্তে পাঠ করবে।

তারা আবার নতুন করে চিনবে “একনিষ্ঠ সাধক মহান নেতা” কালীকঙ্করকে। ঐ হেভিও দিয়েই আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। হিরো ওয়ার্লিপিপ শিখেছে ভারতবর্ষ, তাই ইতিমধ্যে অনেক বৃহৎ বিশেষণ আমার নামের সঙ্গে জুড়ে গেছে। মৃত্যুর পরে হয়তো আরও অনেক যুক্ত হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সে কালীকঙ্করের সাথে এ কালীকঙ্করের কোন সাদৃশ্যই থাকবে না। না থাকুক, সে জীবনী আমার বহির্জীবনের কথা। সে ছাড়াও আর একটা অন্তর্জীবনী আছে আমার। যে জীবনের কথা দেশবাসী জানে না। আমিই যে সবটুকু জেনেছি তা-ই বা বলি কি করে। আমাকে আমি যে চোখে দেখেছি—সেই দেখাই যে সত্যিকারের দেখা, সেই পরিচয়ই যে কালীকঙ্করের আসল পরিচয় তেমন কথা বলবার সাহস আজ আব আমার

নেই। আত্মবিচারে মানুষ মাঝে মাঝে ভুল হয়ে পড়ে।

সেই যোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিদোষে আমার দর্শনও ছুট হয়নি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি কৈ। তবুও এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি জীবনী লেখকের কালীকঙ্করের সাথে আসল কালীকঙ্করের অনেক তফাৎ

এই দুই কালীকঙ্করের সংঘাতের কি যে প্রতিক্রিয়া হবে আর কি হবে তার পরিণতি তা দেখবার জন্য আমি যখন বেঁচে থাকব না তখন সে গবেষণার ভার ভাবীকালের মানুষের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি লিখতে বসেছি আমার জীবনের সেই অংশটুকুর কথা, যেটুকু আমার জীবনীকারের জানবার কথা নয়। অথবা আভাসে ইঙ্গিতে একটু আধটু জানলেও যা তিনি নিশ্চয় বর্জন করে যাবেন।

জীবনে যে কাহিনী গোপন রয়ে গেল, মরণের পর তা প্রকাশিত হলে মৃত কালীকঙ্করের তাতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু অমর কালীকঙ্করকে মানুষ জানতে পারবে

তিনতলার উপরে উত্তর ভারতীয় রীতির চূড়া। মন্দিরে অস্ত্রাশ্র দেবদেবীর সহিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজী, শ্রীরামচন্দ্রজী ও শ্রীস্বাধ সদাশিবজী বর্তমান রহিয়াছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের লুপ্ত ও হস্তান্তরিত প্রাগদেব বাস্তুভূমিতে বাজড় বংশের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতির সুরম্য মন্দিরমণ্ডিত শ্রীবেঙ্কটেশ মন্দির নিঃসংশয়ে বর্তমান যুগের মহতী কীৰ্ত্তি। সম্মুখে সপ্ততল পৌরাণিক ঘটনার মন্দির-পুতলিকাবলী খচিত গোপুরম। পবে প্রাঙ্গণের উত্তরে মন্দিরসমূহবাস্তি শোভিত মণ্ডপ। অনন্তর মূল মন্দির মধ্যে

শ্রীবেঙ্কটেশ, ভূমি ও শ্রীর প্রস্তরমূর্ত্তি। সম্মুখে অহরূপ ধাতুমূর্ত্তি। মণ্ডপের দক্ষিণে স্তম্ভ ও ইন্দ্রবজ্র। শাস্ত্রীয় বিধানেন বিভূষিত নানা দেবতা। ঘরপাল ও কারুকলার অপূর্ব সুরম্য বর্ণনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে।

এই সকল দেবালয় ছাড়া, কেওড়াতলা অংশানে দেশ-বন্ধুর স্মৃতিমন্দিরটি দেউল-রীতির উপর চার চালা। চিত্তরঞ্জন রাজপথে মহাজাতি সদনের সম্মুখভাগের উপরেও দুইটা আটচালা মন্দির বর্তমান।

স্বাধীনোত্তর বঙ্গে শিল্পশৈলীর প্রকৃত গতিপথ নির্ণয় করার সময় এখনও আসে নাই।

পূর্ণভাবে। কালের কষ্টিপাথরে তার বিচারে গলদ থাকবে না।

মৃত্যুর পূর্বে এ জীবনী প্রকাশের প্রয়াস আমি করব না। সে দুর্মতিও আমার হবে না। আমার এ সাক্ষাতিক লেখা আমি শিখেছি একজনের কাছে, শিখিয়েছিও একজনকে। তারও অধিকার আছে একজনকে শেখাবার। তাদেরই কারও হাতে পড়বে এ লেখা একদিন, এ বিশ্বাস আমার আছে। পাঠোদ্ধারও হবে আমার এই নব-জীবনীর।

জীবনীকারের লেখা আমার জীবনীর পরিপূরকরূপে রেখে গেলুম আমার আর এক জীবনী ভাবীকালের মাহুশের জন্ত।

এইটুকুই আমার ভূমিকা।

জন্মের দিনক্ষণ, স্থান কাল, বাল্যলীলা, বংশ-পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির কথা পাওয়া যাবে আমার জীবনীতেই। ভারতীয় দর্শনে আমার দান, সমাজে আমার মান, রাজনীতিতে আমার স্থান এসব নির্ধারণ করবার লোকের অভাব হবে না। সারা দেশে আমার যে অগণিত ভক্ত বন্ধু, তারাই প্রমাণ দেবে আমার একনিষ্ঠতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ইত্যাদি মন্ত মন্ত গুণের।

আমি যে আত্মজীবনী লিখতে বসি নি। আমার এ জীবনের স্মৃতিপাত হয় এক কঠিন সঙ্কল্পে। লিখব সেই কথাই।

লিখতে পারবে তো কালীকিস্বর? তুমিইতো বলেছ অকপট নির্ভেজাল সত্য কথা নাকি পাওয়া যায় না কোন আত্মজীবনীতেই। তোমার আত্মজীবনীতেও থাকবে না তো কোন কপটতা?

না, অকপটেই বলব আমি। জীবিত কালীকিস্বরের যদিও সে সাহস নেই, কিন্তু মৃত কালীকিস্বরের নিঃশঙ্ক নির্ভর। তাইতো আমার মৃত্যুর পরেই আত্মপ্রকাশ করবে এ কালীকিস্বর।

কলেজে শুভবয় বলে প্রফেসরদের অকৃত্রিম স্নেহ, ছাত্রবন্ধুদের অকুণ্ঠ প্রীতি আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অকুপণ ঈর্ষা ইতিমধ্যেই লাভ করেছি। সহপাঠিনীদের কাছে আমি

দুর্লভ পুরুষ। নিজেকে বিবে এই দুর্লভতার প্রাচীর রচনা করবার দক্ষতা ছিল আমার সহজাত। বন্ধু বান্ধবী মহলে এই প্রাচীরটা যতোই দুর্লভ্য বোধ হতে থাকল, ততোই তারা সে বেড়া ভেঙ্গে দেবার জন্ত তৎপরতর হতে লাগল। অল্প অল্প মাহুশকে ছদ্মবেশ ধারণ করবার যে সুযোগ দেয়, সেই সুযোগ দৈবাহুগ্রহে আমি পেয়েছি শৈশব থেকেই। নিয়েছিও দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে। এ এক নিষ্ঠুর খেলা। এ খেলার রসাস্বাদন যে একবার করেছে সে আর ছাড়তে চায় না।

তারা চেয়েছে অসাধারণকে সাধারণ করে ফেলতে, আমি চেয়েছি সাধারণ হয়েও অসাধারণ থাকতে। এ প্রতিযোগিতায় আমি হার মানিনি কোনদিন। আমার অসাধারণত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আজও অটুট আছে। তাইতো আমি দেশবাসীর কাছে “একনিষ্ঠ সাধক মহান নেতা”। তাইতো সাধারণ থেকে আমি রয়ে গেছি দুর্গম দূরত্বের দূস্তর ব্যবধানে।

এই প্রাচীরের এক হিঙ্গুপথে প্রথম যিনি প্রবেশ করলেন তিনি এক নারী। তাঁর কথাই বলব প্রথম।

প্রফেসর মহলে যখন আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার জ্ঞানবৃক্ষের কোন শাখায় ঝোলান ঠিক হবে তাই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, ছাত্রমহলে যখন উনিভার্সিটিতে আমি কোন ষ্ট্যাণ্ড করব তাই নিয়ে বৈঠক হচ্ছে, তখন একদিন অকস্মাৎ কলেজ ছেড়ে দিলুম।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ তখন।

পথে ঘাটে পিকেটিং, মাঠে মাঠে মিটিং। দলে দলে ছাত্র মাঠার জেলে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে ঝুড়ি ঝুড়ি আদর্শ বিতরণ করছে তরুণ দেশসেবীর দল। এই ঝাঁকে পড়া ছেড়েছে অনেকে। ছাড়বার সুযোগ পেয়েছে আরও অনেকে। কিন্তু আমি কেন পড়া ছাড়লুম সেইটুকুই বলব আজ।

এইখানেই আমার রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিপাত করে আমার জীবনীকার হয় তো লিখবেন,—“এতবড় একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা করিয়া বঙ্গজননীর এই সুযোগ্য সন্তান দেশমাতৃকার আহ্বানে মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সংসারের কোন আকর্ষণ,



কোন প্রলোভনই এই সর্বভাগী সন্ন্যাসীকে শাস্ত সিন্ধু স্বখনীড় রচনার স্বপ্ন দেখাইতে পারিল না।...ইত্যাদি।

ইয়া, রাজনৈতিক জীবনের স্বত্বপাত তো বটেই।

কিন্তু দেশমাতৃকার আস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ জীবন আমি বরণ করিনি। এ জীবন আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে কালীকিঙ্করের অসাধারণতঃ বজ্রায় রাখতে। কালীকিঙ্করের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে যে তখন ছিদ্র দেখা দিয়েছে। সে ছিদ্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেই হবে। তাই এ অভিনয়-জীবনের স্বত্বপাত। জীবনটাই যে অভিনয়। কিন্তু হায়, টাজেডি নাটকের হিরো হয়েই যে যবনিকা টানতে হবে এ কথা সেদিন কে ভেবেছিল।

একটি বৎসর বাদ দিয়েই শুরু করা যাক। এ বৎসরটা একান্ত ভাবেই মানসিক প্রস্তুতির। আমি আর সুমিত্রা এক অনিবার্ণ পরিণতির পানে এগিয়ে চলেছি তখন। অথচ কোন একশান, কোন প্রকাশই ছিল না আমাদের এই মানসচারণার।

ওর আর্টস্ আমার সায়ান্স্।

ওর রূপ আমার খ্যাতি।

খ্যাতি ছাত্রনেতা হিসেবে। চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস্‌ম্যান হিসেবে। ইন্টারমিডিয়েটে রেকর্ড স্রষ্টা হিসেবে। ধুবছর ডিবেটর হিসেবে। কলেজের প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকেই যে ছেলেটিকে চিনত সে কালীকিঙ্কর, আর যে মেয়েটিকে চিনত সে সুমিত্রা। আমরা স্নতরাং পরস্পরকে না-চেনার অভিনয়ই করে চলেছি এক বৎসর। ওর অভিনয়টা ছিল প্রতিভাকে অস্বীকার করবার, আর আমার ছিল রূপকে উপেক্ষা করবার। আসলে কিন্তু আমরা চেয়েছি পরস্পরকে আকর্ষণ করতে। আমি খ্যাতি দিয়ে, ও রূপ দিয়ে। এই জনাস্তিক আকর্ষণ-বজ্রায় অভিনয় মঞ্চ থেকে ভেসে এসে একদিন মুখোমুখী দাঁড়ালুম দু'জনে। কথা অনেক হল। যেটুকু বল্ল বাকিটুকু অনুমান করে নেওয়া যাবে তাই বলি :

—আমার বোন দীপালিকে চেনেন? অত্যন্ত আকস্মিক প্রশ্ন।

—তিনিও কি আপনার মত রূপসী? তেমনি অপ্রত্যাশিত জবাব।

সুমিত্রা কিন্তু লাল হয়ে উঠল না। ক্রুদ্ধও হল না।

তরল হাসি ছড়িয়ে পাঁটা প্রশ্ন করল, রূপসী না হলে বুঝি মেয়েদের চিনতেও চান না?

হাসির স্বস্তরালে ছিল কি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের শাবিত ছুরিকা? ভ্রুটা যেন একটু বক্র, একটু আক্রমণাত্মক।

সুযোগ ছাড়লুম না,—তাছাড়া আরও কিছু আছে নাকি আপনাদেব?

—রূপ যাগের নেই?

—তাদের চেনে না কেউ।

—চেনে তো। আপনাকে চেনে কি করে সবাই?

—সুমিত্রার আক্রমণটা যেমন নগ্ন তেমনি নির্মম। কিন্তু পরাক্রম স্বীকার করবে না কালীকিঙ্কর—আমি পুরুষ। আমার পরিচয় শুণে।

—আর নারীর বুঝি রূপে?

—একমাত্র। আর সেইজন্যই আপনাকে চিনি, কিন্তু আপনার বোনকে চিনি না।

সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে পড়ল। হাসল তার ঝকঝকে দাঁত, চক্চকে চোখ। হাসির চেউ ছড়িয়ে পড়ল দেহের রেখায় রেখায়। এ হাসি বিজয়িনীর হাসি।

—আমার রূপ তাহলে আপনাকেও.....

ভিতরে লাল হয়ে উঠলেও মুখের অভিনয়-মুখোশ খুলবে না কালীকিঙ্কর।

অসকোচ দৃঢ়তায় বল্লুম—ই্যা আমাকেও..... কিন্তু আপনার বোনকে কেন চিনতে হবে তাতো বলেন না।

—কাস্ট ইয়ারে পড়ে। সায়ান্স্। তাকে পড়াতে হবে।

—বিদ্যানান আমার পেশা নয়। আমি গম্ভীর।

—নেশা যদি বলি। দু'দিন পড়ালেই নেশা ধরে যাবে। সুমিত্রার ঠোঁটের কোণে স্বপ্ন হাসির ঝিলিক।

—আরও একটু খুলে বলুন।

—129 K, Southern Avenue. কাল যাবেন সন্ধ্যায়। খুলে বলব। চ্যারিটি শো'র টিকেট কেনা রয়েছে। সময় নেই। নমস্কার। যাবেন কিন্তু।

খুলে আর বলতে হল না। খুলে গেল আপনিই। খুলে গেল প্রস্তর প্রাচীরের লৌহ কপাট। খুলে গেল শতদল। নবাহুবাগের রক্ত-রাঙান শতদল।

129 K, Southern Avenue-এ ফাষ্ট ইয়ারে পড়া দীপালির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন সুমিত্রার মামাবাবু। রিটার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ। তাঁর বাঁ হাত ধরে রুলে আছে একটি নৃত্যপরা প্রজ্ঞাপতি। মামাবাবুই পরিচয় দিলেন, সুমিত্রার ছোট বোন দীপালি। রুলে ক্লাস ফোরের ছাত্রী আর বাড়ীতে আমার গার্জেন। হাঃ হাঃ হাঃ...

দীপালি ছুম করে এক কিল বসাল মামাবাবুর পিঠে।

খুব দিলখোলা মাহুষ মামাবাবু। সাহিত্যরসিক। রাজনীতি চর্চার হবি আছে। হাত ধরে নিয়ে সোফায় বসালেন। পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করলেন।

—ত্রেভো বয়! অনেক শুনেছি তোমার কথা সুমিত্রার কাছে। বই মুখস্থ করে রেকর্ড মার্কস পাওয়া বড় কথা নয়। খেলার মাঠে তুমি অদ্বিতীয়, রাজনীতিতে অনমনীয়। এইতো চাই। মুন্ডা জননীর আঁচল-ধরা বাঙালী নও তুমি। তুমি মাহুষ। এমনি মাহুষ-বাঙালীরাই একদিন সারা বিশ্বকে লিডু করেছে। আশা করি, আশীর্বাদ করি তোমার নেতৃত্বেও বাংলাদেশ ভরে উঠুক মাহুষে। মাহুষের মত মাহুষে। ... আরও অনেক বড় বড় কথা বলেন সেদিন মামাবাবু উচ্ছ্বাস ভরে।

বুঝলাম সত্যিকারের কালীকিঙ্করের চেয়ে অনেক বেশী উচুদরের এক কালীকিঙ্করের পরিচয় সুমিত্রাই দিয়ে রেখেছে তার মামাবাবুকে। সুতরাং ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডটি বেশ সন্দেহভাবেরই রচনা করে রেখেছে সুমিত্রা। কিন্তু সাত বছরের দীপালিকে কেন ফাষ্ট ইয়ার সায়েন্সে তুলে দিল সুমিত্রা? এও কি ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড রচনার প্রয়োজনে?

মোটকথা সুমিত্রা স্বকৌশলে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিল তার মামাবাবুর বৈঠকখানায়। সুতরাং সন্দেহাতীত বিশ্বাস, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম বাৎসল্য ইত্যাদি কিছুই অভাব হয় না। দীপালি প্রসঙ্গের এখানেই ইতি।

আমার অভিনয়দক্ষতা, সুমিত্রার স্বকৌশল-রচিত চাতুরী আর সর্বোপরি মামাবাবুর অন্ধ স্নেহ আমাদের প্রেম-সৌধের চারিদিকে গড়ে তুলুল দ্বৈতদ্য দেয়াল।

আমাদের অগ্রগতি হল নির্বাহ নির্ভয়। খুলে গেল হৃদয়-দুর্গের সব বাতায়ন। ফুরফুরে দখিনা মলয়ের আনাগোনা চলতে থাকল অহরহ। উন্নত আবেগে আমরা এগিয়ে চল্লম কোন্‌ দুর্গম অভিযানে কে জানে।

আশ্চর্য কালীকিঙ্করের বহিরাবরণ। ইম্পাত-কঠিন ব্যক্তিত্বের বর্মাচ্ছাদিত কালীকিঙ্কর।

129 K-তে পদার্পণের পর কেটে গেছে প্রায় এক বৎসর। একটি সন্দেশের কণ্টক স্পর্শ করে নি কালীকিঙ্করের কঠিন বর্ম। একটি বক্র কটাক্ষ বিস্তৃত করে নি সুমিত্রা কালীকিঙ্করের নেপথ্য অভিযান। নেতাজীর পাশে যেমন লক্ষ্মীবাঈ কালীকিঙ্করের পাশে তেমনি সুমিত্রা। অবিচ্ছেদ্য আহুগতা।

কালীকিঙ্কর যদি অদ্বিতীয়, সুমিত্রাও অদ্বিতীয়া।

ছাত্রনেতা কালীকিঙ্কর, সুরোগ্যা নেত্রী সুমিত্রা।

এমন একটা আশুনের শিখাকে পাশে নিয়ে যে মাহুষ এমনি নির্বিকার কাঠিন্বে অটুট রয়েছে এক বৎসর, জৈব অর্থে সে পুরুষ কিনা এমন সন্দেহও দেখা দিয়েছে কারও কারও মনে। কেউ ভেবেছে কালীকিঙ্কর অতিমানব!

কিন্তু আমি কি ভেবেছি, আর কি ভেবেছে সুমিত্রা?

সুমিত্রা কি ধন্বদী দিয়েছে তার ভাগ্যদেবতাকে? নাকি আপন মনেই হেসেছে তার ব্যুহ রচনার দক্ষতা দেখে? ভেবেছে কি শুধু কালীকিঙ্করই নয়, অভিনয়ে সুমিত্রাও অভিনব?

কলেজ কেন ছাড়লুম সেইটুকুই বলি:

—সর্বনাশ হয়েছে কালিদা! সুমিত্রার চোখে মুখে ভয়-চকিত উৎকর্ষা। শিকারী তাড়িত বনহরিণী যেন।

—কি হল আবার?

—আমার ছেলে হবে।

একটা বজ্রপাতে যেন এতদিনের সুনির্মিত সৌধ অকস্মাৎ ধ্বংস পড়ল ধুলোয়। কালীকিঙ্কর স্তব্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল।

—জেনেছে কেউ?

—না। তোমাকে জানালুম আজ।

—ভেবে দেখি।

—কী আর ভাববে? হয় মরতে হবে, নয় বাঁচতে হবে মা হয়ে। আর মা হয়ে বাঁচতে হলে.....ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এটা রাশিয়াও নয়, মহাভারতের যুগও নয়। তুমি আমাকে বাঁচাও কালিদা।

—আমি কী সাহায্য করতে পারি?

—কি করতে পার তা তো জানি না, কিন্তু কিছু তো করতেই হবে। তাহঁতো ছুটে এলুম।

—আচ্ছা দূরে কোথাও ...

—ইলোপ করবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সোসাইটিতে মুখ দেখাব কি করে? আর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার? সব যে ধুয়ে মুছে যাবে। ভেবে দেখো। আমি যে আর ভাবতে পারছি না কালিদা। সময়ও নেই বেশী।

—তুমি ভেবো না। শুধু কয়েকটা দিন সময় আমাকে দাও। আচ্ছা তোমার মাঁমাবাবুর মত হবে তো? আর তোমার পিতা মাতা? তাঁদের কথা তো এতদিন জিজ্ঞাসাই করি নি। তাঁরা মত দেবেন তো?

—কিসের মত? বিয়ে? ই্যা, আর বিয়ের দু'মাস পরেই ছেলে। আমি মুখ দেখাব কি করে? সোসাইটিতে আমার পজিসান.....

ই্যা পজিসান স্কিমিয়ার ঠিকই রেখেছিলুম সেবার। আর সেই পজিসান রাখতে আমি যা পেলুম আর আমি যা হারালুম—এ জগৎ তা জানে না আজও।

পুলিশের লাঠিতে আহত হয়ে স্কিমিরা গেল হাসপাতালে, এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই নিমন্তলা। দেশবাসী স্কিমিয়ার মত একজন স্বযোগ্য কর্মীকে হারিয়ে হাহাকার করল কিছুদিন। পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে

দেশব্যাপী ধর্মঘট হল। তেমন সাক্ষেসফুল ধর্মঘট এদেশে খুব বেশী হয় নি। আর সেই বিরাট ধর্মঘটের একমাত্র পরিচালক কালীকিঙ্কর। দেশবাসীর প্রিয় নেতা কালিদা। দক্ষ ছাত্রনেতা, দেশবরেণ্য গণনেতা কালীকিঙ্কর মজুমদার।

দেশপ্রাণী কান্নার আড়ালে অভিনেতা কালীকিঙ্কর কি একটু হেসে নিয়েছিল তার ভাগ্যদেবতার এই অভাবনীয় প্রদর্শনতায়। ধর্মঘট পরিচালক কালীকিঙ্করের বশঃস্তম্ভ তখন কতোটা উঁচু হল তার পরিমাপ করতেই মাহুষ ব্যস্ত। হাসপাতালের ওষুধে কে কখন কি মিশিয়ে কোন সম্ভাবিত আশঙ্কার হাত থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করল সেদিকে আর নজর দেবে কে?

দুঃখ এই যে স্কিমিরাও বুঝতে পারে নি। যদি জানতে পারত স্কিমিরা, যদি হঠকারী কালীকিঙ্করকে তুলে ধরতে পারত জগতের সামনে, যদি অনিবার্ণ অভিশাপে জর্জরিত করে তার সর্বাঙ্গে ছবপনের কলঙ্ক কালিদা লেপন করে যেতে পারত, তাহলে হয়তো এমনি অমৃত্যুপ দহনে দগ্ধ হতে হত না কালীকিঙ্করকে। হত না কলেজ ছাড়তে।

এহঁতো এই বেদনাময় পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাবার জন্তই কলেজ ছাড়া আর অকারণ একটা আন্দোলন সৃষ্টি করে জ্বলে যাওয়া। জ্বলে যাওয়া যে তখন আমার প্রয়োজন। প্রয়োজন একটু নিরালায় বসে মনের উপরের কালো দাগটুকু বিশ্বতির ইরেজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলা।

(ক্রমশঃ)

## ঘাস

শ্রীসমরেশ দাশগুপ্ত

তুমি কি শ্যামল শুধু রামাদের?

কমল লোচন, আরও কি কোমল ছিল?

অমিত লাবণ্য অমিতাকে ধার দিতে পার।

চৈতন্তের মুখে দিয়েছ চিন্ময় বাণী।

পদধূলি শিশিরে সিক্ত ক'রে

তুমি কর অমৃত সঞ্চয়।

# উদাসী

স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

সে আজ দশ বৎসরের কথা একদিন গিরিডিতে চারিজন আচারী বৈষ্ণব আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবার উত্তোগ করিলাম। তাঁহারা লুচি, ডাল, তরকারী, ভাজা প্রভৃতি রান্না করিলেন। দোকান হইতে দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, রস-গোল্লা প্রভৃতি আনা হইল। বৈষ্ণবেরা যথারীতি ঠাকুরের ভোগ লাগাইলেন। বিগ্রহ তাঁহাদের সঙ্গেই ছিল। ভোগ লাগান হইলে তাঁহারা শিলাধ্বনি করিলেন। চারিখানা আসন করা হইয়াছে, চারিজনের পাতা ও চারিটি গ্লাস জল দেওয়া হইয়াছে, তখনও পাতে লুচি পড়ে নাই। হঠাৎ একটি আধ-বয়স্ক উদাসী রাস্তা হইতে আসিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাব বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক হইবে না, বর্ণ উজ্জ্বল শ্রাম, শরীরটি সুগঠিত এবং সমুন্নত। গৌফের রেখা মাত্র দেখা দিয়াছে। মস্তকের কেশ দীর্ঘ রক্ষ কিন্তু এখনও সেগুলি জটা বাঁধে নাই। পরিচ্ছদ নানকসাহী সম্প্রদায়ের দ্বার। সর্ব শরীর ঘর্মাক্ত, কপোল বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঘাম পড়িতেছিল, সময়টি বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নকাল।

সাধুটি যখন কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে বাবাজিদিগের আসনে বসিয়া গেলেন তখন আমার মনে মনে ভয় হইল, কেননা পূর্বোক্ত বৈষ্ণবেরা আচারী, তাঁহারা অন্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজে মিশেন না, না জানি কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু বাবাজিরা বিনা বাক্যব্যয়ে সর্বাগ্রে এই অভ্যাগতকে পরিবেশন করিলেন এবং অনাহত ব্যক্তির এইরূপ অমায়িক আচরণ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি একটা আতঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। সাধুটি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন। তিনি আগ্রহ সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। আমি হাতপাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। আমাব পূত্রগণ এবং অন্যান্য পুরুষগণ বড়ই তৃপ্তির সহিত এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। চারি পাঁচখানা ছোট ছোট লুচি ও ২১খানা বেগুন ভাজা খাইয়া সাধুটি পেট ভরিয়া জল পান করিলেন। তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিবাব উত্তোগ করিতেছেন দেখিয়া আমরা

বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া আরও আহ্বারের জন্ত অমুরোধ করিলাম। তিনি সে অমুরোধ বন্ধ না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, “পুরন ভয়া” অর্থাৎ পেট ভরিয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমাদের একটা কথাও না বলিয়া আপনার গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিলেন। আমি ব্যস্ত হইয়া অনেক দূর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম, তিনি কিন্তু একবারও পিছন পানে তাকাইলেন না। আমি বলিলাম “বাবা, টাকা, লোটা কি কখন কোন বস্তুর আপনার আবশ্যক আছে কি?” আমার দিকে একটু মাথা ফিরাইয়া দুইবার মাথা নাড়িয়া আমাকে জানানাইলেন যে, কিছুই প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম ততক্ষণ আমি বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। মনে হইল কি যেন পাইয়া হারাইলাম।

বাড়ী ফিরাই দেখিলাম, বাবাজীরা সেইভাবেই বসিয়া এই অপূর্ব সাধুর কথা আলোচনা করিতেছেন।

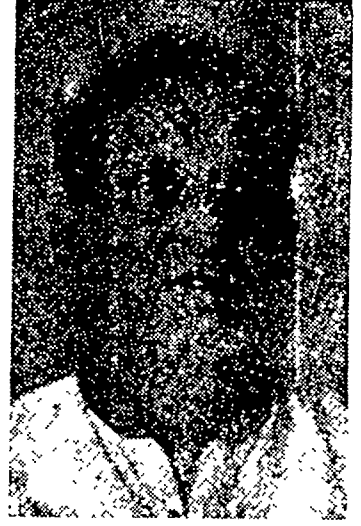
কি দেখিলাম? সাধু কোন তীর্থস্থানে যাওয়ার জন্ত পথ চলিয়াছেন, তাঁহার ক্ষুধা হইয়াছে, সম্মুখের বাড়ীতে ভোগ সরাবার শিলাধ্বনি শুনিলেন। সেখানে প্রবেশ করিলেন। আসন পাঁতা ছিল তাহাতে বসিয়া গেলেন, যেটুকু খাদ্যবস্তুতে শুধু ক্ষুধিবৃত্তি হয় ততটুকু খাইলেন। উৎকৃষ্ট খাদ্যগুলি স্পর্শও করিলেন না, কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য—জিহ্বাকে পরিতৃপ্ত করা উদ্দেশ্য নহে। অল্প খাইলেন কিন্তু ভাল জিনিষগুলি দ্বারা উদর পূর্ণ করিলেন না, হাতের কাছে যাহা পাইলেন তাহাই খাইলেন। প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা, দেওয়ার জন্ত প্রার্থনা জানাইলেও তাহা গ্রহণ করিলেন না, অথচ তাঁহার লোটা কখন বা পাণ্ডের মতল কিছুই নাই।

আমাদের রামরতন পাঁড়ে বলিল “বাবু, নিশ্চয়ই ভগবান্ অতিথি হয়ে এসেছিলেন।”

সেদিন আমার অতিশয় শুভদিন ছিল। সেই নিম্পৃহ অতি নির্বাক উপদেষ্টা আমাদের প্রাণের উপর এমন একটি অপূর্ব ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন যে জীবনে কখনও তাহা মুছিব না। [ ‘বিজয়’ আশ্বিন ১৩২০ হইতে উদ্ধৃত ]

# কর্নবীর সতীন সেন

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়



[বক্ষ্যমান প্রবন্ধের লেখক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন্দ্রনাথ সেনের একজন সহকর্মী ও রাষ্ট্রনৈতিক মন্ত্রিস্থ। লেখকের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রায় সময়ই অতিবাহিত হয়েছে—একই পটুয়াখালী সহরে সতীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এবং ১৯২৬-১৯২৭ সনের ভারত বিখ্যাত “পটুয়াখালী সত্যগ্রহ” আন্দোলনের ছিলেন অন্যতম সহকর্মী। সম্প্রতি ইনি “মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন” নামে সতীন্দ্রনাথের এক প্রামাণ্য জীবনচরিত ও রচনা করিয়াছেন।—প্রঃ সঃ]

ঋষি বস্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠের’ প্রস্তাবনায় ইঙ্গিত করে বলেছেন—“জীবন, সেতো তুচ্ছ, সবাই দিতে পারে—চাই ভক্তি।”

মহৎ আদর্শকে নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত জীবনের প্রতি কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে শৌর্য ও বীর্যবন্তার আবশ্যক হয়। এইরূপ সার্থক চরিত্র দেশকে ধন্য করে, জাতীয় চরিত্র উদ্ভূত করে।

এই প্রকারের আদর্শবোধের পরিপূর্ণতা দেখতে পাই সতীন সেনের জীবনে। জীবনের মূহুর্তম আদর্শ গ্রহণ করে উহাকে সার্থকতার করার প্রয়াসে প্রতিদিনের প্রতি-কণের অন্তরের বাহিরের দুর্বলতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বিধা-বিষেধ-হিংসাকে পরাজয় করে’ অজ্ঞাত অত্যাচার, অবিচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে’, জীবনে বিজয়ী হওয়া একটি বিশেষ দুর্লভ ক্ষমতা সন্দেহ নেই। সতীন সেনের জীবনের প্রারম্ভ ও তার শেষ পরিণতির মধ্যে সেই বিজয়ী চরিত্রের পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই। সুতরাং এই প্রকারের চরিত্রের আলোচনা ও গুণকীর্তন জাতীয় জীবনকে অলুপ্রাণিত ও উন্নতই করে থাকে।

দেশ তথা জনগণের সেবাই ছিল সতীন সেনের জীবনের সর্বকর্মের মূল উৎস। অস্বাভ-অনটন, দুঃখ-বেদনা, রোগাক্রান্তের কাতরধ্বনি, অত্যাচার উৎপীড়িত-দের আতঙ্ক-বিহ্বলতা এবং জাতিগত মেরুদণ্ডহীন ভীষণ কাপুরুষতা—সতীন সেনের তরুণ মনকে বিজ্রোহী করে

দিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীনতার মুক্ত প্রাণেই সম্ভব উহার পূর্ণ সমাধান। জীবনের অনিশ্চিত বৈশ্ববিক পথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ সতীন সেন স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্ত, বয়স তখন ছিল তাঁর মাত্র ১২ বৎসর।

এই আদর্শ উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তাঁর ৬১ বৎসর জীবনের মধ্যে প্রায় ২৫ বৎসরারধিক কাল বিভিন্ন প্রকারের কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯ বৎসর বয়সে প্রথম কারাগ্রবেশ থেকে স্বস্তি করে’ ১৯৫৫ সনের মার্চ মাসে ৬১ বৎসর বয়সে পাকিস্তান কারাগারে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত, পরিণত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বলতে গেলে মাত্র পনের বৎসর তিনি বাহিরের মুক্ত আলো-বাতাস গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

১৮৯৪ সনে ফরিদপুর জেলার বাগান-উত্তরপাড়া গ্রামে সতীন সেনের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই মাতৃহারা হ’লেন। পিতা ৮নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন বরিশাল জিলার পটুয়াখালী মহকুমার লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। তাঁরই তৃতীয় পুত্র ছিলেন সতীন সেন। এই ক্ষুদ্র পটুয়াখালী সহরেই সতীন সেনের বাল্যাবস্থার পাঠাভ্যাস শেষ হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জনসাধারণের চিত্তে ব্রিটিশ ভীতি ছিল এত গভীর যে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কি মহকুমা হাকিম বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকেও পথচারী বালক-বৃদ্ধদের নত মস্তকে সেলাম দেখাতে হত। এ প্রথাকে অস্বীকার করলেন সতীন সেন যখন তাঁর বয়স

ছিল মাত্র ১২ বৎসর। শুধু তাই নয়, পত্র দিয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিলেন যে জাতীয় পোষাক রূপে এখন থেকে তাঁরা পাঞ্জাবী ও মস্তকে উষ্ণীয় ব্যবহার করবেন। বয়স্কদের নিস্তরঙ্গ সামাজিক পরিবেশে আতঙ্ক বিভীষিকা দেখা দিল—কী সর্বনাশ, হাকিমের অপমান, সরকারের বিরুদ্ধে কথা! কিন্তু জাগ্রত বিপ্লবেব শিশু সেদিন মিথ্যা জুজুর ভয় ভেঙ্গে দিলেন।

তখনকার দিনে সচরিত্র, নিষ্ঠাবান থাকা গীতা বা শাস্ত্রাদি পাঠ ও অহুশীলন ছিল পুলিশের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক। সুতরাং সরকারী নির্দেশে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হকুম দিলেন যে, মিলিতভাবে গীতা পাঠাদি বন্ধ করতে হবে।

ক্রুদ্ধ সতীন সেন অস্বীকার করলেন এই হকুমনামা। অজ্ঞানা ভয়ে ভীত ও ব্যাকুল আত্মীয়-পরিজনদের কোন উপদেশ তিনি গ্রাহ্য করলেন না। এখানেও জুজুর ভয় যে কত মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গেল।

সতীন সেনকে বিপ্লবী হতে হবে; সে তো আর মুখের কথা নয়। তাকে শুদ্ধাচারী হতে হবে, সাধক-সন্ন্যাসী হতে হবে। অতি প্রত্যাষে শয্যাत्याগ করে আসন প্রাণায়াম—ধ্যান ধারণা ও গীতাপাঠ করতে হোত অতি গোপনে।

স্কুল হোল নিরামিষ আহার, নির্গিষ্ঠ আচার ও সংযত ব্যবহার। রোগীর পরিচর্যায়, আর্ন্তের সহায়তায় দুঃখীর দুঃখ মোচনাদি ছিল বাহিরের কর্ম। মহা-শ্মশানে একেলা রাজিবাস করে ভয়কে করা হোল পরাজয়। উদ্ভাল তরঙ্গায়িত প্রশস্ত নদীবক্ষে বা পথ-ঘাটহীন দীর্ঘায়িত প্রান্তরে পদত্রজে চলে চলে অসম্ভবকে করা হত সম্ভবপর। অন্তর বাহিরে চলেছিল এক্রপ প্রস্তুতি।

১৯১২ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন হাকারীবাগ মিশনারী কলেজে। এখানকার ইংরেজী আদব-কায়দার পরিবেশ উপেক্ষা করে নগ্নপদ ও ধূতিচাদর

পরিহিত ছাত্র স্বপাকে নিরামিষ আহার চালালেন। নাগিশ এল অধ্যক্ষ মিঃ টমসনের নিকট। অবাক বিশ্বয়ে তিনি বলে বসলেন—‘The boy is a true Christian’—এ বালকটি তো খাঁটি খৃষ্টান।

এই বিচ্ছিন্ন জীবন ভাল লাগল না। চলে এলেন কলিকাতায়। ভর্তি হলেন প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে, পরে রিপন কলেজে।

কিছুদিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক কার্যে মেতে উঠলেন। কাজেই কলেজে প্রায়ই অমুপস্থিত থাকতে হত। I. A. পরীক্ষার সময়ে দেখা গেল রেজিষ্টারে ন্যূনতম উপস্থিতি নেই। জনৈক সতীর্থ বন্ধু কোশলে উহা পূর্ণ করে দিয়েছেন শুনে ক্ষিপ্ত হলেন সতীন সেন। মিথ্যাকে আশ্রয় করে পরীক্ষা তো দিলেনই না বরং এই অত্যাচার কন্ঠের বিরুদ্ধে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন। প্রমাদ গণলেন আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন। অবশেষে Non-Collegiate ছাত্র হিসাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা হোল।

কৃষ্ণনগরের শিবপুর ডাকাতি মামলায় ধৃত হয়ে দীর্ঘ দিবস বিচারাদীন থাকেন। সন্দেহের অবকাশে মুক্ত হয়েই পুনরায় আটক হলেন ভারত-রক্ষা আইনের বলে। বিভিন্ন থানায় অন্তরীণ আটক থাকতে হলো। সংঘর্ষ বাধলো পুলিশ সুপারের মাঝে, ক্রুদ্ধ সুপার বলে বসলেন— I shall kick you out. স্বরিতে উত্তর দিলেন সতীন্দ্রনাথ—I shall give you three kicks in return. সুপরিচিত পুলিশকর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত চলেছিল সংঘাত। ফলে, ভূটান সীমান্তের অগম্য ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে অন্তরীণের ব্যবস্থা করে শাস্তি দেওয়া হলো। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অন্তরীণ ভঙ্গ করবার মনস্থ করলেন। শাস্তি বা কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা যখন দমন করা গেল না তখন চাকুরীর প্রলোভন দেখান হোল। স্থগাভরে এ প্রস্তাবকে উপেক্ষা করলেন—জয় করলেন দুর্বলতাকে। (ক্রমশঃ)



## সতীরাগী

শ্রীমুখীল প্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

৫

শ্রীধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিবার দিন, আমাদের পাণ্ডা (মন্দিরেব সর্বপ্রধান পাণ্ডা তখন) মহাপ্রভুর গলদেশের মালা আনেন আশীর্বাদীরূপে। সতীরাগীকে পাণ্ডাঠাকুর সে আশীর্বাদী দিতে যান। সন্ধ্যা হইয়া তিনি বলেন (আমাকে দেখাইয়া) ঠুকে দিন। নিমেষে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আশীর্বাদী মন্তকে ধারণ করিয়া, পরক্ষণেই সেটা স্বামীর মস্তক স্পর্শ করান। পুত্রকে আশীর্বাদী স্পর্শ করান তার জননী। সে দৃশ্যে বিমোহিত হ'ন পাণ্ডাঠাকুর। বলেন তিনি গদগদভাবে আমি গর্ভ বোধ করছি, তোমাদের মত বজ্রমানের পাণ্ডা ব'লে। সতীরাগী সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার পদধূলি নেন।

স্বচ্ছামত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শেষ পূজার্চনার বিধিসম্মত আয়োজন ভক্তিমতী করান সোৎসাহে। নিখাস ফেলিয়া বলেন তিনি, বিজলী মা, আপশোষ তোমাকে নিয়া এঁর সেবা ক'রতে পেলুম না। বংশের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর আলোকচিহ্ন পূজাকক্ষ তাঁহার শোভা করিয়া আছে, স্বামী যেদিন ঘাইয়া চিত্র তুলিয়া আনিয়া দেন সেইদিন হইতে। সে চিত্রের আশেপাশে কালী, কাল, শিবরাম ও শ্রীহর্গার চিত্রাদি লঙ্ঘমান। প্রস্তর মঞ্চোপরি সিদ্ধিদাতা গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি বিবাজিত। শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাও ষথাস্থানে রক্ষিত। মহাপ্রভুর বিশেষ স্থান করিয়া দেন সতীরাগী মঞ্চোপরি। পূজার্চনা হয় সকলেরই নিত্য ধূপুনা ও পুষ্পাবরণসহ। চিরজীবন দেবদেবীর সেবা করিয়া কৃতার্থ তিনি হইয়াছেন। পূজাশ্রমে সত্যি তিনি ইহাদের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। যেন প্রাণবন্ত তাঁহার দেবদেবী। স্বামী সে দৃশ্যে আনন্দে শিহরিত হইয়াছেন। পুত্রেরা ভক্তিতে নতশির হইয়াছে।

মানসিক বলের অভাব তাঁহার ছিল না স্বভাবতঃ। ঐকান্তিক দেবার্চনা ও ভগবানে অটুট বিশ্বাস সে বল তাঁহার বাড়াইয়া দেয় অপরিমিতভাবে। সেই বল-প্রভাবেই নিজের কণ্ডাশোক দমন করিয়া স্বামীর

শোকাপনোদনে সফলকাম হ'ন। অর্দ্ধাঙ্গিনীর তেজ-প্রভাবে স্বামী প্রকৃতিস্থ হইবার পথে অগ্রগত হন যাহা কিছু। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় নীরব রহিলেন সতী।

কর্তব্য সম্মুখে উভয়ের পুত্র সম্মুখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাদির জ্ঞান তিনজনই প্রস্তুত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয় সম্মুখে। ছেলেদের জ্ঞান বদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জননী গর্ভভরে বলিলেন, কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হল সত্যি। ষথাসময়ে পরীক্ষাদিতে সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ তাহারা হইল, তাহাদের মাতার আশীর্ষচনে।

মাতামহের সাধ বিমান ডাক্তার হয়। জামাতাকে আহ্বান করিলেন তিনি পরামর্শ করিতে। জামাতা বলিল, আপনি বুঝেন, ও ডাক্তারী পড়ুক। তবে প'ড়বে আপনার তত্ত্বাবধানে। মাতামহ বলিলেন, বেশ তাই হবে। হইল ও তাই। বিকাশ এম. এ. পড়িতেছে, তপন আর বিজু পড়িতেছে বি. এ.। খেলাধুলায় বিজুর ভারী বোঁক। পিতা সাবধান করিয়া দিলেন তাহাকে। বাড়াবাড়ি করিয়া লেখাপড়া গোলায় যেন না যায়।

ঘাতপ্রতিঘাত সম্মুখে সতীরাগীর সংসার চলিতে লাগিল সুখে দুঃখে কাহারও সম্মুখে কোন অভিযোগ না করিয়া। অচিরে বিদ্র ঘটিল তাহাতে। সংবাদ আসিল সতীরাগীর পিতা বেশ অসুস্থ। মাত্র সংবাদ আসাই নহে, মোটর আসিল কন্ডাকে পিজালয়ে লইয়া ঘাইতে। দেখা গেল কেদারনাথ ভীতিজনকরূপে অসুস্থ, শয্যালীন। কন্ডাকে পিতা বলিলেন, মা কি হয় বলা সহজ নহে। কন্ডার মুখে বাক্য সরিল না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা সমবেত রোগীর চিকিৎসার্থে। চারি পাঁচ-দিন কাটিয়া গেল, ভয় ভাবনার অন্ত নাই। কন্ডা বিমর্ষ। পিতার শয্যা একবারও ছাড়ে না। পিতা ছাড়িয়া ঘাইতে দেয় না। পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেও, পিতার মুহুমুহ আহ্বান রাণী, রাণী, রাণী।

কেদারনাথের অকৃত্রিম বন্ধু প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশ কদিন হইতে নিজালয় যান মুহূর্তের জন্য। বন্ধুবরের বাড়ীতেই কাল কাটাইয়া দেন অষ্ট প্রহর। একদিন বড়ই বিষন্ন দৃষ্টিতে বলেন তিনি সুশীলপ্রসাদকে, বলত' বাবা, ডাক্তারের (কেদারনাথের) কি হবে? তাঁর আগ্রহাতিশয্যে বলিতেই হইল সুশীলপ্রসাদকে নিজেই অভিমত। নীলরতনবাবু বা ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছেন বুঝি! ছোটবাবু (প্রবোধচন্দ্র) ভয়ের কিছুই নাই। দেখিবেন এবার উনি রক্ষা পাইবেন। আপনাদের রাগীকেও ইহা আমি বলিবাছি। রাগী বলিলেন, তোমার কথা ফলে আমি জানি। জানি না কেন ফলে, তবে ফলে। কথা এবারও ফলিল। কয়েক দিনের মধ্যে মুমূর্ষুর অবস্থার উন্নতি ঘটিল। ধীরে ধীরে নিরাময় তিনি হইলেন।

পরমানন্দে সতীরাণী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথা ঠিক ঠিক হয় কেন? উত্তর—কেন? জান না তুমি? আমি লক্ষ্মীর আশ্রিত বলিয়া। ঠাকুরাণী ঘরছয়ার যে সব ভাসিয়ে গেল। ঘুরিয়া আইস একবার। ঘুরিয়া আসা হইল না বিশেষ কারণে। পিতাকে চ'খ ছাড়া করিতে প্রাণ তাঁহার চাহিল না। আরও কথা ছিল। 'কারমাইকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য আকুলতার তাঁর সীমা নাই লক্ষ্য করিয়াছেন সতী। সে সবেই ভাবনা এখন ভাবিতে দিবেন না পিতাকে সতী-রাণী দৃঢ়চরিত্র করিল। সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন, 'এমনি ক'রে বেঁধে রাখতে পারবি?'

সতীরাণীর পুত্রেরা আসে যায়, কণ্ঠা কাছেই থাকে। দাদাকে গান শুনায়ে সে, তিনি যে গান ভালবাসেন।

শয্যালীন ডাক্তার থাকেন বেশীর ভাগই। দেহের সাধারণ অবস্থা তাঁহার মন্দ বলা যায় না। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্ব স্বাস্থ্যের রূপ অন্ততঃ আরও কতকটা শীঘ্র ফিরিয়া পান। মনে কাহারও কাহারও আশঙ্কা রোগের জোর এখনও কতকটা আছে।

এইভাবে প্রায় দুই মাস কাটিল। অকস্মাতঃ রোগের জোর জোয় করিল আবার। চিকিৎসকেরাও কম জোর দেখালেন না। ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতে লাগিল উভয়ের মধ্যে। ডাঃ নীলরতনকে হাসিখুসি করিয়া কেদারনাথ

একদিন বলেন, 'হালে পানি পাওয়া যাবে না, না? বুঝতে সবই পারছি। পারলে কি হবে! আমি যে রুগী জালাত' ওইখানেই।'

আর কন্ঠার হৃদয়জালা বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল শ্রীভগবানের পদে। প্রাণ তাঁহার বড় অশান্ত। পিতার সেবাযত্নে কন্ঠা আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। কন্ঠার কন্ঠা সত্যত মাতার পাশে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছে। সব দেখিতেছেন, অল্পভব করিতেছেন কন্ঠার ও দৌহিত্রীর সেবা নিষ্ঠা। নীরবে কন্ঠাকে বলেন পিতা—অতো মেহনত করিস নি। আমি চাই সব সময়ে কাছে থাক তুই। কন্ঠা বলে আছিই বাবা, ভায়েরা, ভায়েরা... বাধা দিয়া পিতা তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না এত ভিড় লক্ষ হবে না।

রোগভোগের দিন বড় কম হইল না। রোগী যুদ্ধ করিতে কল্প করিলেন না। অবশেষে পরাজয় হইল তাঁহার। কন্ঠা ভূমিতে কানিয়া-লুটাইয়া পড়িল। মৃতের শয্যা ভিড় জমিল। 'না না' বলিবার ব্যক্তি তখন বাকরুদ্ধ। তাঁর 'রাগী, রাজ্যরাণী মহারাণী'কে আহ্বান আর শুনা গেল না।

একটা দিকপাল চলিয়া গেল নীববে। যশঃ, মান, খ্যাতির কথা তাঁহার লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল গুণবানের বিয়োগে। বিয়োগ ব্যথা তাহাদের সাময়িক। মর্মান্তিক ব্যথায যাহারা ব্যথিত তাহাদের ব্যথা কয়জন বুঝিল! হে ভগবান!

### পরের কথা

সতীরাণীকে এবার নিজালয়ে আসিতে হইল স্বর্গতঃ পিতার চতুর্থী সম্পাদনার্থে। পিতার বন্ধের ধন সম্পাদন তাহা করিলেন কায়মনোবাক্যে। স্বর্গতঃ পিতার আত্মার তৃপ্ত্যর্থ। সতীরাণীর নয়নে বদনে কি অপূর্ব জ্যোতিঃ। চক্ৰবর্তী মুদিত। তন্ময়তায় হৃদয় মন প্রশান্ত। দেহ মুক্ত আত্মার সন্ধানে উৎকণ্ঠিত।

বিধিসম্মত কার্য সম্পাদন করিয়া সতীরাণী স্বামীর সাম্রিধ্যে উপস্থিত হইলে স্বাধীর উদ্দেশ্যে একটি কথাও স্বামীর মুখে বাহির হইল না। তাঁহার মনে পড়িল পিতৃ-



মাতৃহারা তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনী তাঁহার ঐকান্তিক সমবেদনায় তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। কষ্টা-শোকাভুরা জননী আপনার ব্যথা বেদনা সংগোপনে রাখিয়া কেমন করিয়া শোকাভুর পিতার শোকাপনোদনে ব্রতী হইয়াছিল। কোন শক্তিতে তাঁহার সেই শক্তিময়ীকে বাক্যের শ্রোতে প্রবোধ দানের পরিহাস করেন ?

কয়টা কথা কিন্তু অজ্ঞাতদারে মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। স্বামী বলিলেন, মহারাগী তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলসাধন না করিলে কে করিবে ? দেখ সতীরাগী, তোমার ছেলের মুখপানে চাহিয়া। তোমার শোকাবস্থায় তাহারা দিশেহারা। অভয় দাও তাদের। সতীরাগীর মুখে কথা নাই। নতমস্তক তাঁহার তিনি তুলিলেন না।

স্বামী পুনরায় বলিলেন, তোমার রাধাবল্লভজীউ, তোমার মহাপ্রভু স্কুল গঙ্গাজল পান নাই তোমার হাতে কয়দিন যাবৎ ...। ইহা শুনিবামাত্র সতীরাগী চলিলেন পূজা-কক্ষাভিমুখে। কক্ষ হইতে বাহির যখন হইলেন তিনি, তখন তাঁহার মুখাবয়ব ধীর, স্থির, প্রশান্ত। ছেলের কাছে ডাকিলেন তিনি।

কাছে আসিয়া বলিল তাহারা। তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া স্নেহভাবে বলিলেন তাঁহাদের জননী, 'এক পরীক্ষা হ'য়ে গেল তোমাদের মায়ের। তোমাদের মুখ চাহিয়া উত্তীর্ণা তাহাতে হইতে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কি তোমাদের সন্নিকটবর্তী ? কোন বিষয়ে কোন ভাবনা তোমাদের নাই। পিতামাতার কথা মনে রাখিয়া পরীক্ষা তোমরা দাও সহজভাবে। সফলতা লাভ করিবেই করিবে।

মাতৃ-আশীর্বাদ বর্ষে বর্ষে ফলিল। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসুর স্নেহ-তত্ত্বাবধানে, ডাক্তারী শিক্ষায় বিমানের খুবই সুবিধা হইতে লাগিল। শেষ পরীক্ষা হইয়া যাইলে বিমান কারমাইকেল হাসপাতালের হাউস সার্জন নিযুক্ত হইল। বিকাশ এম. এ. পরীক্ষায় অনাস লাভ করিল। বিজয় বি. এ.তে সাফল্য লাভ করিল। ইহা ঘটিল অবশ্য একই সময়ে নহে। স্ব স্ব পরীক্ষাদিতে যথাসময়ে তাহা ঘটিল।

বিমানের হাউস সার্জন হওয়া, বিকাশের সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াতে নিযুক্ত হওয়া এবং বিজয়ের এদিক-ওদিক চাহিয়া অবশেষে খেলাধুলার গণ্ডিতে চৌমুড়ী মাত করিয়া বেড়ানও ঘটিল ক্রমে ক্রমে। সংসারে সতীরাগীর স্থিতি-লাভ করিতে বিলম্ব বড় ঘটিল না। এই উচ্চতম পরীক্ষায় গর্বভরে সাফল্য লাভ করিল সতীরাগী নিজগুণে।

পুণ্যময়ীর সংসার-সাগরে নতন স্রোত প্রবাহিত হইল।

পিতামহ বা পিতামহীর আশ্বাদন পৌত্রদের ভাগ্যে ঘটে নাই। মাতামহী ও মাতামহের স্নেহ ভালবাসার সম্পূর্ণ অবিকারী হইয়াছিল কিন্তু দৌহিত্রেরা। উভয় দিকই গৌরবময়। একদিক কাণে শোনা। অল্পদিক চ'খে দেখা ও মনে আঁকা। তথাপি দুই দুই ভাবের চিত্র ফুটাইবার অবসর কাহারও মিলে নাই। স্কুল বা কলেজে তাহাদের স্বাভাবিক বিনয় বিনম্রতা ও নিয়মাত্মবর্তিতার দৃষ্টান্তে শিক্ষকেরা বলাবলি করিয়াছে, হবে না ? কত বড় বংশের ছেলে ! সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আদি প্রতিষ্ঠাতার সহিত বিকাশচন্দ্র সর্বাধিকার মিলিবার সুযোগ পাইলে প্রতিষ্ঠাতা স্নেহভরে তাহাকে বলেন, "সর্বাধিকারী, তুমি বেশ বেশ !" ক্রীড়াবিদেরা বিজয়ের ক্রীড়ানৈপুণ্যে বলাবলি করিয়াছে, 'আগাছা নয় ও, ও ওত'রাবে না !'

কর্মকুশলী খ্যাতনামা সুশীলপ্রসাদ কণ্ডাবিয়োগে ঔদাসীন্ম সহকারে জীবন যাপন করিলেও লোকচক্ষে তাঁর গুরুত্ব হ্রাস পায় নাই কিছুমাত্র বরং নতন কবিতা সাহিত্য ও সম্পাদনা ক্ষেত্রে সম্মানভাবে অবতরণে, তাঁহার সম্বন্ধে একটা নতন সাড়ার সৃষ্টি হয়। বরেন্দ্র ও তিনি হন গুণী সংবাদসেবীদের ও সুসাহিত্যিকদের চক্ষে। দেখা যায় তাঁরই অনুপ্রেরণায় বিজয়চন্দ্র খেলাধুলা সাহিত্যের সেবা করিতে মনোযোগী হইয়াছে।

তখন পর্য্যন্ত ছেলেপুলেরা হাতজোড়া না হইলেও বিয়ের বাজারে তাহাদের কৃতি দেখা গেল না। জামাতা-প্রার্থীদের প্রতিভূ বেশ আনাগোনা করিতে লাগিল। সতীরাগীর নিকটেও কোন কোন আত্মীয়া সম্বন্ধের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলাবলিই সার হইল, পিতা বা মাতা কেহই ঘাড় পাতিলেন না সম্বন্ধাদি সম্বন্ধে। বিজলীর বিবাহও পরবর্তী করুণ চিত্রের কথা তখনও

বিস্মৃত হন নাই তাঁহারা। তথাপি ধরপাকড়ের বিরাম ঘটিল না।

বহু ব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হইলেও প্রতিজ্ঞা না পাঠাইয়া কলিকাতার সিটি আর্কিটেক্টে কন্ঠাকর্তারূপে স্বয়ং হামলা করিলেন তাঁহার কন্ঠার তরফে, ঠেকাইয়া রাখা তাঁহাকে দায় হইল। দিবা দ্বিপ্রহরের কিছু পরে গলদর্শন হইয়া তিনি আসিয়া গৃহকর্তার দুই হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, আমার মেয়েটিকে নিতে হবে, আপনার বিমানের জন্ত। আকস্মিক প্রস্তাবে গৃহকর্তা ত্বরিত বলিলেন না কিছু। একটু সামলাইয়া জানাইলেন, “কিন্তু এখন—” কথা শেষ করিতে না দিয়া অহুনয় করিয়া কন্ঠাকর্তা বলিলেন “বিমান ডাক্তার হইয়াছে, কর্ম করিতেছে, তবে আর এখন তখন কেন? মেয়ে গেছে। ঘর খালি, মেয়ে আহুন। চলুন মেয়ে দেখতে।”

ভদ্রলোক জেনাজেদি খুব বেশী ক’রতে আরম্ভ করিতে গৃহকর্তা জানালেন গৃহিণী ব সঙ্গে কথা না ক’য়ে কিছু ক’রতে পারেন না। মুখিয়েছিলেন তিনি। বললেন তৎক্ষণাৎ ‘হাঁ হাঁ বলুন তাঁকে।’ বলতে যাচ্ছেন। পাছু পাছু ভদ্রলোকও চললেন। গিয়েই সাঁটাজে তাঁকে প্রণিপাত। গৃহিণী শুধালেন, ব্যাপার কি? ভদ্রলোক বললেন, উঠব না আমি মত না নিয়ে—কন্ঠাদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে আপনাদের।

বিনয় বিনম্রতার সহিত মিষ্ট কথা তুট করিল সতীরাণীকে। গৃহকর্তার মারফতে জানালেন মেয়ে না দেখে পাকা কথা দেওয়া ত’ যায় না। উত্তর শুনিলেন তিনি, নিশ্চয়ই চলুন না এখনি মেয়ে দেখতে। ‘এখনি’ হল না অবশ্য। মেয়ে দেখার দিন ধার্য হ’ল, আগাম পরশু।

মেয়ে দেখা হ’ল। অপছন্দ হ’ল না মেয়ে। বিমান তখন কলিকাতার বাহিরে। তার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ তাপস বসু ( ডাঃ, এখন মৃত ) মেয়ে পছন্দ করিল। বিমান তাপসের পক্ষে শুনিল সব। শুনিয়া তাপসের মারফতে সম্মতি জানাইল। কথা পাকাপাকি হইল। বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিনে অপরাহ্নে গৃহকর্তা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ায় সতীরাণীর বিষণ্ণতার সীমা রহিল না। একি দুর্লক্ষণ।

পরে স্ব স্ব একটু হইলে গৃহকর্তাকে ডাক্তারেরা পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণেব পরামর্শ দিল এবং বিবাহ দেওয়াইতে যাওয়া নিষিদ্ধ করিল। গৃহিণী বন্দোবস্ত করিলেন বড়-ঠাকুর বা মেজঠাকুরের সঙ্গে গণেশ ( বিমানের মামা ) যাইলেই যথেষ্ট হইবে, ঠর ( স্বামীর ) যাওয়া ঠিক হবে না। সময়কালে কিন্তু পিতার মন কেমন করিতে লাগিল। না যাইয়া থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে অবশ্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল বাটীতে।

বিমানের বিবাহের দিন ধার্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চিওয়াড়ে বিমানকে জানান হইল, তাহার ও বিজুর বিবাহ দেওয়াইবার অভিপ্রায় আমাদের উভয়ের। যত শীঘ্র সম্ভব ইহা করাইবার আয়োজন করাইতেছি। পিতার পত্রাভিযায়ী বিমান কলিকাতায় আসিল। ইতিমধ্যে দুইজনের জন্ত দুইটা কন্ঠা নির্মাণিত হইয়াছিল। বিকাশের বিবাহে কিন্তু বাধা পড়িল। কন্ঠাপক্ষকে বাক্যদান হেতু বিজয়ের বিবাহ সম্পন্ন করাইতে হইল।

দুইটি পুত্রবধূ লইয়া সতীরাণী প্রফুল্লিতা রহিলেন, কন্ঠা সম তাহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শ্বশুরালয়ে বধূদের কন্ঠাসদৃশা স্বাধীনতা দেওয়ার জন্ত আশ্বীয়রা সতীরাণীর কাণে শ্রাবধানবাণী শুনাইলেন। সতীরাণী বলিলেন, আমাদের বিজলী নাই। আমরা যে বিজলী চাই। ঘোমটা-টানা বউ যে আমাদের ভাল লাগে না। ব’য়েরা বিজলী যদি না হয়, তাদের ভাগ্য। শ্বশুরবাড়ীতে স্বাধীনতা আমিও ত’ বড় কম পাইনি। এখনও সকলের কাছে ‘ছুটকী’ আদরের, স্নেহের।

দুই বৎসরের অধিক হইল বিমানের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিমানের একটি কন্ঠাসন্তানও হইয়াছে। বিকাশ কাঞ্চিওয়াড় হইতে দিল্লীতে এবং তাহার পরে কাটিহারে বদলী হইয়াছে। বিজয় কর্মব্যাপদেশে সঙ্গীক দিল্লী বওনা হইয়াছে। কেমন একটা অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলেন সতীরাণী। পত্রাদি হইতে অহুমিত হইল, কাটিহারে বিকাশের চাকল্যও কম নহে। বিকাশ অবশেষে জানাইল, কাটিহারে সে পিতামাতা উভয়কেই চায়। সতীরাণীর চিন্তার অবধি নাই। আকাশপাতাল ভাবিয়া কাটিহারে তিনি যাইবেন, বিকাশকে জানাইলেন।

আরও জানাইলেন, উনিও খুব চঞ্চলচিত্ত। তোমার নতুন জ্যাঠা (নগেন্দ্রপ্রসাদ) মারা যাইবার পর হইতে কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছেন।

সকলেই জানে হিতবাদী, চুঁচুড়া-বার্তা ঠর লেখায় বাঁচিয়া আছে। প্রবর্তক নবরূপ ধারণ করিয়াছে। ‘অবতার’-এর অমূল্যবাবু ও বাঘাবাবু ঠকে পাইয়া বসিয়াছে। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান ঠর রচনাটিতে বেশ একটু মোরগোল উঠিয়াছে। তথাপি ঠর মনে শাস্তি নাই। শৈলেন্দ্রবাবু (প্যারীচরণ সরকারের পুত্র) ঠকে ঘিরিয়া আছেন। অতি সং ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই শৈলেন্দ্রবাবু। ঠর কর্মপ্রবণতাও এই সব লোককে ছাড়িয়া যাওয়া ঠর পক্ষে স্বকঠিন। তবে আমার কথা ঠেলাও ঠর স্বভাব-বিরুদ্ধ। বিজলী প্রমাণের পরে কোনও দিক হইতে কোনও প্রকারের আঘাত সহ্য করা ঠর পক্ষে অসম্ভব। কাছে আমি আছি, তাই রক্ষা, নতুবা উনি পাগল হইয়া যাইতেন। কঠিন ও কোমল উনি। তিনি যে আমি ঠকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে।

সতীরাগীর এক কথায় হুশীলপ্রসাদ সভাই কাটিহারে যাইতে সম্মত হইলেন। হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলেন সতীরাগী। পোড়ী খুঁ যখন সাত মাসের, প্রতিপালিতা সেই শিশুকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কাঁদিল তাঁহার। বৃকে করিয়া একা তিনি ওকে এত বড় করিয়াছেন যে।

মহুজ (নগেন্দ্রপ্রসাদের পুত্র) একা একশত হইয়া ছোটকাকিমা ও ছোটকাকার কাটিহারে যাইবার সুব্যবস্থা করাইল। রাজি প্রায় নটার সময় কলিকাতা ছাড়িয়া পরদিন প্রাতে প্রায় ন’টার সময়ে কাটিহারে পৌঁছাইলেন উভয়ে। ষ্টেশন হইতে বাসায় লইয়া গেল বিকাশ।

গাড়ী হইতে নাবিমামাত্র বাসাবাটীর মালিক হরদয়াল-বাবু পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন নবাগতদিগকে। সতীরাগীকে ‘লক্ষ্মীমাই’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। প্রীতিপ্রদ হইল প্রথম আলাপ উভয় পক্ষে।

বাসভবনটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। দ্বিতলের সম্পূর্ণ অংশ সেটি। নীচতলের ক্ষুদ্রাংশে থাকেন হরদয়ালবাবু স্বয়ং। অপর্যাংশে স্থানীয় হাই স্কুলের

বোর্ডিং অবস্থিত। কোনও অংশের সহিত অস্ত্র কোনও অংশের ধরা-ছেঁয়া নাই।

প্রয়োজনীয় আয়োজনাদি হইয়া থাকাতে বিশ্রামাদির কোনও অসুবিধা হইল না। লোক পাঠাইয়া হরদয়াল-বাবু খবরাখবর করাইলেন। দেখা গেল, দ্বিতলে প্রকাণ্ড এক হলঘর লইয়া চারিখানি ঘর। সিঁড়িতে উঠিয়াই ছাত ও বারান্দা। হলঘরের আর একটি মনোরম আবৃত বারান্দা। হলঘরের লাগোয়া ঘরটির সংলগ্ন প্রকাণ্ড একটি ছাত। সমুখের বারান্দা ও ছাত হইয়া পৃথক পায়খানা, বাথরুম প্রভৃতি অবস্থিত। ছাত হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দেখা যায় বেশ।

সতীরাগী সংসারের সব কিছু গোছগাছ করাইয়া লইলেন দুই দণ্ডে। সন্দের সাথী তাঁহার নিত্যপুজার দেবদেবীরা। তাঁহার মনোমত কক্ষ নির্বাচিত হইল পৃথক কক্ষরূপে। এ কক্ষের বিশেষত্ব ঘটিল এইভাবে। কক্ষের একাংশ জুড়িয়া রহিল দেবদেবীরা, অপর্যাংশ পরিণত হইল গৃহ-ভাণ্ডারে। ধূপ-ধূনা, গন্ধাজলে কক্ষের উভয়প্রান্তেরই শুদ্ধতা রক্ষা হইতে লাগিল। পূজাপাঠের জন্ত সময়ের অভাব কোনদিনই তাঁহার ঘটে নাই। সংসারের সকল কাজ ও স্বামীপুত্রের তত্ত্বাবধান এবং দাসদাসীদের সম্বন্ধে সদা সচেতন ভাব রক্ষা করিয়াও, হাতে তাঁহার সময় থাকিয়া যায় কত। দেবদেবীর জন্ত অহস্তে বসন, ভূষণ প্রস্তুত ও সঙ্গ্রহাদি পাঠে ব্যয়িত হয় তাহার কতকাংশ। কতকাংশ ব্যয়িত হয়, বংশের ও স্বদেশের কীর্তিমানদের স্মরণ মননে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোটামুটি হালচালও অজানা থাকিতে দেন না। কাটিহারে আর একটা কাজ তাঁহার মন জুড়িয়া বসিল। হরদয়াল-বাবুর অনাথ আশ্রম তাঁহাকে পাইয়া বসিল। অনাথ সনাথ তাঁহার একার চেষ্ঠায় হইবে না, তিনি বেশ জানেন। তথাপি এ সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্যপালনে, ত্রুটি তিনি হইলেন মহানন্দে। অনাথ-এরা লক্ষ্মীমায়ির অন্তরঙ্গতা লাভ করিতে লাগিল পদে পদে।

বাবু হরদয়াল লক্ষ্মী-এর রৈয়স ঘরের সন্তান। হুশিক্ষিত। উচ্চুতে বিশেষ অভিজ্ঞ। কাটিহারে তাঁহার অনেক সম্পত্তি, জমিজমা। পুজার জন্ত প্রায়ই লক্ষ্মী-

মায়ীকে ফল ফুলারী পাঠাইতে লাগিলেন, বহু নিবেদন  
সঙ্গেও। জনে জনে তিনি বলিয়া বেড়ান, আমার ভাগ্যে  
আমার বাড়ীতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। লক্ষ্মীমায়ির  
আগমনে আমার মরা টাকার সুরাহা হইয়াছে। বয়স  
তাঁহার সন্তরের কাছাকাছি। স্বপাক ছাড়া খান না।  
নিজের জন্ম খরচপত্র, দৈনিক এক টাকায় বেশী হইতে  
দেন না। খাটে তাঁহার কাছে অনেক লোক। তাহাদের  
প্রাপ্য ব্যতীত তাহাদের বিপদে আপদে তাঁহার দুয়ার  
সদা উন্মুক্ত।

কাটিহারে হরদয়ালবাবুর আর এক বিশেষ সম্পত্তি  
হইল, 'হরদয়াল টকি'। সম্পত্তির আর অপেক্ষা ব্যয়  
বেশি। কাঁদিয়া কাটিয়া, জোর করিয়া টকির ভার অর্পিত  
হয় স্থানীয় প্রদাদেবের উপর পরিচালনার জন্ত। টকি ধাতে  
আসে সেই পরিচালনাতে। জয় জয়কার হয় তাহাতেও  
লক্ষ্মীমায়ির। টকিতে লক্ষ্মীমায়ির পদধূলি না দেওয়াইয়া  
মালিক ছাড়েন নাই।

কাটিহার বিহারীদের। বাঙালীদের সংখ্যা অল্প  
সেখানে নহে। তবে সকল ক্ষেত্রেই বাঙালী তখন পর্যন্ত  
ভাজে নাই, স্তবরাং মচকাইবারও প্রয়োজনীয়তা ঘটে  
নাই। বিকাশের নূতন ব্যাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে  
অন্যায়সে। স্থানীয় প্রদাদ চলাফেরা করিতেছিল মর্যাদা  
সহকায়ে। সতীরাণীর ধর্মপ্রবণতা ও সদাশয়তার কথা  
জনে জনের মুখে ফিরিতেছিল।

ফলতঃ উকিল, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী প্রভৃতি  
স্থানীয় গণ্যমান্যেরা আপনা হইতে এই জনপ্রিয় নবাগত-  
দের সহিত পরিচিত হন অল্পকালের মধ্যে। ম্যাজিস্ট্রেট  
মাংসেও ঘনিষ্ঠতা রাখেন। কথাবার্তায় চালচলনে  
নবাগতেরা ষোল আনা বাঙালীকে বজায় রাখিয়াও বাঙালী  
অবাঙালী সকলেরই শ্রদ্ধালাভ করেন। বাঙালার  
বাহিরে বাঙালীর এই ধারাই সর্বভারতে বাঙালীকে  
শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

পরিচিতদের স্ত্রী কন্যাও আসিতে থাকেন সতীরাণীর  
সংসারে। সংসারের স্ত্রী দেখিয়া তাঁহারা বিমোহিত হন।  
বাহিরে বাহ্যাদৃশ্যের লেশমাত্র কোথাও নাই। গৃহিণীর  
সুনিপুণতার সহিত সংসার পরিচালনার গুণপনা কিন্তু

দৃষ্টমান চরিত্র। পূজাক্ষেত্রের রূপ দেখিয়া তাঁহারা পরম  
আহ্লাদিত। গৃহিণীর ঐকান্তিক সরলতায় ও নিরহঙ্কার  
আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হইয়াছেন সকলে এত যে, যিনি  
একবার আসিয়াছেন, তিনি বার বার না আসিয়া থাকিতে  
পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সতীরাণীকে পাইয়া তাঁহাদের  
মধ্যে এক নূতন সংসার গড়িয়া উঠে। ঘরে বাহিরের  
হুই সংসারের ভার বহন করেন সতীরাণী অবহেলা।  
কাটিহারে সতীরাণীর জীবনযাত্রা স্তবরাং মধুময় হইয়া  
উঠে। কাটিহারের সর্বজনপ্রিয় ধর্মপ্রাণ কাটিহারের  
জ্যোতির্ময় মিত্র মহাশয় সপরিবারে এই পরিবারের সহিত  
একাত্ম হইয়া যান।

মিত্রমহাশয়ের সৌজন্যে দুর্গাবাড়ী, জমিদার বংশের  
দোনার দুর্গা ও বড়বাজারের শ্বেতপ্রস্তরের যুগল মন্দির  
কথা শুনিয়া সতীরাণী সে সকল দর্শনে ও পূজনে বার বার  
যাত্রা করিয়াছেন। পূজকেরা ভক্তিমতীর নিষ্ঠায় পুলকিত  
হইয়া দেবতার আশীর্বাদ যাত্রা করিয়াছেন তাঁহার  
উপর। মহাষ্টমীতে গঙ্গাস্নান তিনি করিবেনই, গঙ্গা  
বহুদূরে প্রবাহিতা জানিয়াও। ক্রেশকে ক্রেশ না মনে  
করিয়া রেলযোগে গঙ্গাস্নান তিনি করিয়া আসিলেন স্বামী  
সহ। স্নান সারিয়া ট্রেন হইতে সরাসরি চলিলেন তিনি  
সার্কজনীন দুর্গামণ্ডপে ষষ্টমী পূজা করিতে। পূজা  
সমাপনে বাসাবাটীতে ফিরিলেন তিনি অপরাহ্নে  
আনন্দোৎফুল্ল হইয়া। বায়ো মাসে তের পার্বণের  
কোনটিই বাদ দিবেন না তিনি যেখানেই থাকুন না কেন।  
ক্রেশ ত হয় খুবই, এসব করিতে নিবেদন কেহ করিয়াছে  
যদি, সতীরাণী হাসিয়াছেন প্রাণ ভরিয়া।

এই সময়ে সতীরাণীর নয়নে বদনে পূর্ব প্রফুল্লতার  
রেখা পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়, চিন্তা-মলিনতার ছায়াও  
হয় অন্তর্হিত। চিন্তার কারণ ঘটিল আবার, কলিকাতায়  
বোমা পড়ার সংবাদে। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল,  
বিমানরা কাটিহারে আসিতেছে।

একটা মাঝের কথা বলা হয় নি। কাটিহারে স্থিতবিত  
হবার কিছু পরেই কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে অন্তঃস্বস্তা অবস্থায়  
নিষে এসে রেখে যায় বিজয় প্রসব হবার জন্ত। তার  
মাস দেড়েক অবস্থানের পরে ডাক্তারদের পরামর্শে

কলিকাতাতেই তার প্রসব হওয়া বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহাকে সেখানে গাঠান হয়। সন্তান হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হয়।

বিমান, বোমা ও তাহাদের দুই কন্যা (খুকু, বাবলু) আসিল বোমাতক্ষে। কাটিহারে পিতামাতা আসিবার কালে ইহাদের কেহই উপস্থিত ছিল না। ইহাদের আসিবার কয়েকদিনের ব্যবধানে আবার আসিল ছোট পুত্রবধু। বোমার ভয় না কাটা পর্য্যন্ত পিতামাতা বিমানদেব ফিরিয়া যাইতে দিল না। ছোট রহিয়া গেল।

এই সময়ের আর একটা কথা। যুদ্ধাত্তে বাবু হরদয়াল লক্ষ্মী রওনা হইলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। সতীরাগী ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদের একজন বিশিষ্ট হিতৈষীকে হারাইলেন।

কাটিহারেব বাড়ী বদল করিতে হইল যুদ্ধেরই কারণে। বাটীর অতি নিকটবর্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে সারি সারি সাময়িক বাসস্থান নির্মিত হইল সিলোনের পলাতকদের আশ্রয়স্থান স্বরূপ। নৈশবাস শ্রেমে শত্রুর বোমা সেখানে পড়িতে কতক্ষণ। সেই কারণে এবং বর্তমান বাসস্থানটা গভর্ণমেণ্টের আশু জোরদখল হইবার সম্ভাবনা থাকায় নিরাপদ স্থানে আবাস স্থিরীকৃত হইল। সেটিও বড় বাড়ী, বেশ কিছু জমিজমা সহ।

নূতন বাড়ীর লাগোয়া জমির স্বেযোগ গ্রহণ করিয়া তরী-তরকারী, কল-ফুলের ফলোয়া, আয়োজন করা হইল সাফল্যতার সহিত। স্বয়ং লক্ষ্মীর আত্মকুল্যে বাসস্থানের রূপ লক্ষ্মীমন্ত হইল। প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল—পড়ো জমিতে সোনা ফলাইতেছেন ইহারা। সদ্যজাত কাজলকে লইয়া বিমান যখন বোমা ও খুকু, বাবলু সহ নূতন বাড়ীতে উঠিল বাগানের অবস্থা তখন ভরপুর। ফুলের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে, তুলসীর বন জন্মিয়াছে। কত রকমের তরী-তরকারী। কি বৃহদাকার লাউ, কুমড়া। দেখিয়া বোমার আনন্দ ধরে না। বোমা কি গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ তরীতরকারীর বীজ সংগ্রহার্থে লক্ষ্মীমায়ির হুয়ারে হত্যা দিয়াছে।

দাহু দাদির সঙ্গ করিবার মত বড় খুকু তখন হইয়াছে। বাটীর মধ্যে দাদি ও মাঠে মাঠে দাহুর সঙ্গ সে ছাড়ে না।

বেড়াইতেও যাইবে সে দাহুর সঙ্গে। আর সব আবদারই দাহু দাদির উপর। বাবলু চলিতে জানে তবে কোলে থাকিবার লোভে চলিতে বড় চায় না। কাজল দুই তিন মাসের মাত্র হইলেও, চঞ্চলতার তার সীমা নাই। দাদির নেওটা হইল বাবলু খুব। কাজলকে ছুঁড়িয়া লোফালুফি করিতে আরম্ভ করিল দাহু। হাসির লহর তুলে তাহাতে শিশু।

বোমার শরীর ভাল নয়। তাই তাহার কাটিহারে আসা, শরীর সারাইতে। ছেলেগুলের ধকল পোহাইতে ঘটটা সম্ভব কম হয় তাহার ব্যবস্থা করাইলেন স্বশ্র-ঠাকুরাণী। আহাঙ্গারির উপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিল। বেডান স্বল্প করাইলেন নিত্য নিয়মিত ভাবে। কয়েকদিনে বোমাব শারীরিক মানি হ্রাস পাইতে লাগিল। অনিয়ম হেতু ও অস্বাস্থ্য রকমে রোদে পুড়িয়া বিমান কিছু শীঘ্র জরাজীর্ণ হইয়া বেশ কয়েকদিন ভুগিল। সেবাস্থ্যে ও সূচিকিংসায় নিরাময় হইতে তাহার বিলম্ব হইল না অবশ্য। গৃহিণী সংসারের সবদিক সামলাইয়াও অসুস্থ পুত্র সম্বন্ধে ষথাকর্তব্য পালনের এতটুকু এদিক-ওদিক হইল না। সুস্থ হইয়া বিমান কলিকাতায় ফিরিল অনতিবিলম্বে। বোমা সন্তান সহ থাকিয়া গেল। ছোট বধুও রহিল।

ঘবেব সংসারে এত গুণগোল। তাহাতেও গৃহিণীর নূতন সংসারের প্রতি অমনোযোগিতা একদিনের জন্তও ঘটে নাই। নূতন সংসারের সকলেরই তাই গৃহিণীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আরও বাড়িয়া যায়। তাহারা মনে প্রাণে চায় তিনি তাহাদের চিরদাখী যেন থাকেন।

বোমার থাকিতে থাকিতেই বিকাশ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইল ভীষণভাবে। অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িবার উপক্রম। দিনে রাতে গৃহস্থর হাঁফ ফেলিবার অবসরেরও অভাব। অসুস্থ পুত্র একদিকে। অপরিদিকে অপগণ্ড শিশুত্রয়। এই অবস্থাতেও সবদিক মানাইয়া লইতে সক্ষম তিনি হইয়াছেন অম্মাচাসে। ইহার জ্ঞা জয়ভেরী বাজাইয়াছেন নূতন সংসারের সংসারীরাও। সকলের শুভেচ্ছায় ও ভগবানের কৃপায় বিকাশ রোগমুক্ত হয় বেশ কয়েকদিন ভুগিবার পরে।

পুত্র সুস্থ হইল কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে স্বামী পড়িলেন ওই রোগে—অজ্ঞান অচেতনপ্রায়, পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া। চিকিৎসক বলিলেন, ছেলের পাশে রাতের পর রাত বসে মশার কামড় খেয়ে বাধিয়েছেন এই রোগ। সাবধানে থাকতে হবে। রোগী কিন্তু খাড়া হ'য়ে উঠলেন অতি শীঘ্র। ডাক্তার বলিল লোহার শরীর। খুকুর মাঠ ঘোরা হয় না, দাহু শুয়ে। বড় আনমনা সে। বাবলু কিন্তু সোয়াস্তিতে আছে, চলাফেরা করিতে হয় না, দাহু বেড়াবার সঙ্গে থাকে না বলে।

বৌমা বেশ সুস্থ হবার পরে, তার কলিকাতায় যাইবার কথা হয়। খুকু তাহা শুনিয়া বলে যে যায় যাক, আমি যাব না। শুধু বলা নয় কারাকাটি জুড়িয়া দেয়। বাস্তবিক সেই কারণে বৌমার রওনা হবার কিছু বিলম্ব ঘটে। রওনার দিনে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে শাস্ত রাখিতে হয়। দাহু প্রবোধ দেন, আমি ত' নিয়ে যাচ্ছি। চল আমি তোমাকে নিয়ে আসব। যাইবার গোল ইহাতে মিটিয়া যায়।

বাবলু বাড়ী হইতে রওনা হইবার সঙ্গে দাদি দাদি বলিয়া কাদিতে আরম্ভ করে সে, এবং সে কান্না চলে সারা রেলপথ। কলিকাতায় পৌছাইয়াও তাহা বন্ধ হয় নাই। কয়েকদিনের স্নেহ-স্নেহে দাদির পক্ষপাতিনী হয় এতে। পৌছাইয়া দিয়া 'দাহু' ফিরিবার সময়ে খুকু, বাবলু এমন কি কাজল বিদায় দেয় দাহুকে অশ্রুজলে। বৌমারও বয়স্কার সীমা থাকে না। স্নেহের টান এমন। ছোট বোকে রওনা করিয়া দেওয়া হয় ইহার পনের কুড়ি দিনের

মধ্যে। ইতিমধ্যে ভাতুপুত্র মমুজ্ঞ কাটিহারে আসে কাকা-কাকির কাছে। আনন্দে থাকে দুই সপ্তাহের অধিক। অল্প এক ভাতুপুত্রও চুঁ মাঝিয়া যায়।

কাটিহারের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নাম বশ লাভ করিতে থাকে ব্যাঙ্ক স্থাপনার অল্পদিনের মধ্য হইতে। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ইহার প্রসারলাভে কালবিলম্ব বড় হয় না। ইহা স্থাপিত হইবার তিন বৎসরের মধ্যে বিমান চীফ্ এক্সেক্‌টরূপে নারায়ণগঞ্জে বদলী হইবার সংবাদ আসে। এ সংবাদ জানাজানি হইবামাত্র জানাশুনাদের ক্রোড়ের অন্ত থাকে না।

সতীরাগীর নূতন সংসার কাঁদিয়া আকুল। এমন আনন্দ এত সৌহার্দ্য আমাদের ভাগ্যে যে কখন ঘটে নি। কোন প্রাণে বিদায় দিব তোমাকে দিদি। এমন করিয়া কাদিতে হইবে বলিয়াই কি আমরা সকলে এত আপনার হইয়া-ছিলাম। দিন যাবে সত্য কিন্তু এত আনন্দে আর যাবে না। কাদিয়া কাদাইয়া বিদায়পর্ক শেষ হইল। রেল-কামরায় বসিয়া সতীরাগী কাটিহারের দিকে দেখেন আর নিশ্বাস ফেলেন। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালীও তাঁহাকে বিদায় দিতে কাদিয়াছে। বিহারীও কাদিল।

মহিমময়ীর মুমতা মাধুর্যের অবশুজ্ঞাবী পরিণতি এ। তাহাতে সাঁওতালী, বিহারী, বাঙালী সব এক করিয়া দেয়।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনও বিমর্ষ হয় ইহাদের বিদায়ে। মিশন সম্বন্ধে দীর্ঘ বিহারী-বিদ্রোহ মুছিয়া যায় যে ইহাদের সদাচরণে। (ক্রমশঃ)



## দু'টা প্রাণ

শ্রীমুখা বন্দ্যোপাধ্যায়

“আমায় মাপ করবেন বাবুজী, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না”—মিনতিভরা চোখে চেয়ে দু’হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় ছোট্টুলাল।

হো হো করে হেসে উঠলেন বাঙালী ইন্সপেক্টরসাহেব, “পুলিশে কাজ করতে এসেছিস, একটু লাঠিচালনা করতে পারবি না? তা ছাড়া এ কাজ কি আগে কোনদিনও করিসনি?”—জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সাহেব।

“না বাবুজী, একটা প্রাণকে নিষ্পেষিত হাতে মারবে। কেমন করে, হায় রাম”—দু’হাতে মাথা টিপে ধরে ইন্সপেক্টরের পায়ের কাছে বসে পড়ে ছোট্টুলাল।

“প্রাণ?” হাসলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

“আপনার দরদ লাগে না বাবুজী?” ছোট্টুলালের চোখে কাতর মিনতি বারে পড়তে থাকে।

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে চাইলেন সাহেব ছোট্টুলালের দিকে—“দরদ লাগলে চলবে কেন ছোট্টুলাল, শুনলাম ঐ পাগল কুকুরটার জন্তে বস্তীর লোকেদের নাওয়া-খাওয়া সব বন্ধ হয়েছে। রাস্তার কুকুর একটা, বস্তীর বউ একটা আদর করে খেতে দিত। স্থঠাং নাকি কুকুরটা পাগল হয়ে গ্যাছে, আর যা অভ্যাসচার করছে, ওঃ...”—ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন সাহেব।

“পাগল? পাগল হয়ে গ্যাছে?” চমকে উঠল ছোট্টুলাল। চোখের সামনে ভেসে উঠল অসহায় একটা মুখ, ভাষাহীন দু’টো চোখ। সে মুখ তার ছেলের। ছোট্টুলালের ছেলে সজ্জন। ই্যা, সজ্জন পাগল!

ছোট্টুলালের নীরবতার স্বযোগ নিলেন সাহেব: “বুঝি না একটা পাগল কুকুরের জন্তে সাতটা মাসের প্রাণ কেন যায় বল? শুনলাম এর মধ্যে নাকি দু’তিনজনকে কামড়ে দিয়েছে। ও পাগলের ওপর মায়া করে লাভ কি? ওর মৃত্যুই এখন সমাজের মঙ্গল, নয় কি রে, তুই বল না”—নীচু হয়ে ছোট্টুলালের ঘাড়ে হাত রাখলেন সাহেব।

পাগলের মৃত্যুই মঙ্গল? শিউরে উঠল ছোট্টুলাল। না না একী ভাবছে সে।

কিন্তু যেতে হ’ল শেষ পর্যন্ত ছোট্টুলালকেই। পাড়া কাঁপিয়ে তেলীপাড়া বস্তীর সামনে এসে থেমে গেল বান্দারী রংএর পুলিশ ড্যানটা। দূর থেকে কুকুরটার একটানা “ঘেউ ঘেউ” শুনতে শুনতে এসেছে ছোট্টুলাল। এতক্ষণে চোখে দেখা গেল তা’কে—শীর্ণ, ক্ষীণ গাঢ় হলুদ বর্ণের কুকুর একটা, চোখ চেয়ে ইঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে কুকুরটা।

দূর থেকে একটা ভারী বস্তু ফেলে দিলেন ইন্সপেক্টর সাহেব কুকুরটার গায়ের ওপর। ঠকাস্ ঠকাস্ করে ছোট্টুলালের মোটা লাঠি পড়তে লাগল শীর্ণ হাড়-বের করা কুকুরটার ওপর। ঘেউ...ঘেউ—ঘক্ ঘক্ ডাকতে লাগল অসহায় জীবটা। বেশ কিছুক্ষণ লাঠি চালনার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ছোট্টুলাল।

“কিরে খুব দরদ লাগছে বুঝি?” ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে ছোট্টুলালের ঘাড়ে আলতোভাবে হাত রাখলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

সজোরে মাথা নাড়লে ছোট্টুলাল, “না বাবুজী, আপনি ঠিক বাত্‌ই বলেছেন, শ্যাটা এক নম্বরের দুষ্মন আছে।”

বছর পাঁচ ছ’য়ের ছোট্ট একটা মেয়ের জ্বাকড়া জড়ান পা দেখিয়ে একটা মেয়ে বললে, “দেখুন বাবু, আমার মেয়ের পা কামড়িয়ে দিয়েছে কুকুরটা।”

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে ছোট্টুলাল মেয়েটির দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা, মুখ দিয়ে লাল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

“যাক্ আধমরা হয়েছে তা হলে”—আশ্বস্ত হলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

ভীড় ঠেলে মাটির ভাঁড়ে পোষাটাক্‌ দুধ নিয়ে এসে দাঁড়াল পাঁচু গয়লা। দুধে বিষ মিশিয়ে কুকুরটাকে খাওয়ানো হবে, এ নির্দেশ আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন সাহেব।

পকেটে হাত দিলেন ইন্সপেক্টর সাহেব—“কত দাম. তোরা দুধের?”

“না বাবু দামের জন্তে কি আছে, এ দুষ্মনটা মলে

হুধ বেচে বহুত পয়সা আসবে”—সাবধানে মাটির ভাঁড় নামিয়ে রাখলে পাঁচু গয়লা।

“তা বটে—” পয়সার বদলে পকেট থেকে দামী সিগারেট কেস বের করলেন সাহেব।

“আর দেবী করিস নি ছোট্টুলাল, বিষ মিশিয়ে হুধটা খাওয়া দিকি ব্যাটাকে। তারপর, ব্যস, একদম সাবাড়...” লাইটারটাকে পকেটে পুবে রেখে হু’ চৌটার ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। তাই দিলে ছোট্টুলাল। বীভৎসভাবে চীৎকার করছে যুতাপথযাত্রী কুকুরটা। সারাদিন কিছুই পেটে পড়ে নি, সাদা ধবধবে হুধ দেখে ক্ষণেকের জন্তে জ্বলে উঠল ক্ষুধিত চোখ হু’টো।

“লে ব্যাটা খা”—পা দিয়ে হুধের ভাঁড়টা ঠেলে দিলে ছোট্টুলাল। জিভ দিয়ে চেটে চেটে হুধের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত খেলে কুকুরটা। নাঃ, বেইমানি করে নি পাঁচু গয়লা। হুধটা খাঁটিই দিয়েছে। একেবারে খাঁটি।

মুহূর্তে নীল হয়ে গ্যালো কুকুরটা। শুকনো কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল সাদা সাদা ফেনা। বিষ রাখা কাগজের টুকরোটা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে থুতু ফেললে ছোট্টুলাল। ভাষাহীন হু’টো চোখ শেষবারের মত ওপর দিকে তুলে ধরল কুকুরটা। চমকে উঠল ছোট্টুলাল—এমনি চোখ, ইয়া ঠিক এই চোখ কোথায় দেখেছে সে!

আজ আর রাত্রে ডিউটি নেই। ক্লাস্ত দেহটাকে তক্তায় এলিয়ে দিলে ছোট্টুলাল। আঃ বড় ক্লাস্তি সারা শরীরে।

“ভাইয়া আমার চোখে কামড়ে দিয়েছে বাবা”,—ছোট্ট মেয়ে মুন্নি এসে দাঁড়াল কাছে।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মী—“বললুম ছেলেটাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও, কোনদিন আমার মেয়েকে মেয়ে শেষ করে দেবে, এই আমি বলে রাখলুম—” হারিকেনটা ঠক করে বসিয়ে রেখে হুম্ হুম্ পা ফেলে চলে গেল লক্ষ্মী। স্বপ্নের মা মারা যাওয়ার পর লক্ষ্মীকে বিয়ে করে এনেছে ছোট্টুলাল।

না, লক্ষ্মী মিথ্যে বলেনি। মুন্নির ডান চোখটা অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে উঠেছে, হু’ তিনটে বড় বড়

দাঁতের দাগ, শুকনো রক্ত এখনো লেগে রয়েছে। হু’হাতে মুন্নিকে জড়িয়ে ধরলে ছোট্টুলাল—“মুন্নি, আমার মুন্নি!”

আদরে গলে যায় মুন্নি, ছোট্টুলালের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, “ভাইয়াকে তুমি বকবে না তো বাবা!”

“এ্যা, ভাইয়াকে বকবো না?” কানের কাছে এখনো ভাসছে ইন্সপেক্টর সাহেবের কথা, “পাগলের যত্ন্যই সমাজের মঙ্গল, ওকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বল?” না, না ছোট্টুলাল কি পাগল হয়ে যাবে? স্বপ্নের অত্যাচার লক্ষ্মী আর সহ্য করবে না। স্বপ্নকে না সরালে লক্ষ্মী নিজেই সরে যাবে মুন্নিকে নিয়ে—একথা আজই বলেছে লক্ষ্মী। বাইরে কান্দো আকাশ, বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলো ছোট্টুলাল। ঢং ঢং। মিত্র সাহেবের ঘড়ি রাত্রি হু’টো ঘোষণা করছে। মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমছে লক্ষ্মী। ছোট্টুলালের চোখে ঘুম নেই। অস্থির-ভাবে পাগলারী করে বেড়াচ্ছে সে। হাতটা একবার ধুয়ে আসবে নাকি ছোট্টুলাল? তীব্র আসনিকের কথা লেগে আছে কি আজুলের ফাঁকে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল ছোট্টুলাল ডান হাতখানা। এই হাতে আজ স্বপ্নকে খাইয়ে দিয়েছে ছোট্টুলাল। ছোট্টুলালের কাছ ছাড়া খেতে চায়না স্বপ্ন। স্বপ্ন, ছোট্টুলালের ছেলে। ছোট্টুলালের স্বপ্ন। কিন্তু সেই সোনার স্বপ্ন আজ হুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোট্টুলালের জীবনে। বন্ধ পাগল স্বপ্নে আজ পনেরো বছর ঘরে বন্দী। হু’বছর বয়স পর্যন্ত কোন লক্ষণই দেখা দেয়নি ওর দেহে। স্বন্দর, সবল শিশু, ‘মিঠাই’ ‘মিঠাই’ বলে বায়না ধরত। অল্প খাবার দিলে মুখ ফিরিয়ে নিত।

“ঘেউ ঘেউ—” দূরে রাস্তায় কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। শিউরে উঠল ছোট্টুলাল। চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল সাদা সাদা ফেনা আর ফেনা। হু’হাতে কান ঢেকে দিল ছোট্টুলাল। ই্যা, রিপোর্টে পাওয়া গেছে কুকুরটা বন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল।

ভোর পাঁচটা থেকে আবার ডিউটি ছোট্টুলালের। লাল গামছার পুটলীতে খাবার বেঁধে রেখে দিয়েছে লক্ষ্মী। পা টিপে টিপে পুটলী খুলে মিঠাই হু’টো বের করে নিলে ছোট্টুলাল। অনেক কষ্টে মুন্নিকে লুকিয়ে এই মিঠি



আনিয়ে রেখেছে লক্ষ্মী। বড় পরিশ্রম করে ছোট্টুলাল। একটু রকমফের খাবার না দিলে শরীর টিকবে কেন? লক্ষ্মী সে কথা জানে, তাই মুগ্ধিকে লুকিয়ে এমনি মিষ্টি মাঝে মাঝে এনে বেঁধে রাখে ছোট্টুলালের খাবারের পুঁটলীতে। হারিকেন হাতে উঠোন পেরিয়ে তেতরের ছোট ঘরে এসে ঢোকে ছোট্টুলাল। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর, কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ চারিদিকে। উঁচু করে হ্যারিকেনটা তুলে ধরলে ছোট্টুলাল। ঘুমচ্ছে স্বপ্ন। ছোট্টুলালের পাগল ছেলে। একেবারে পাগল। মুখ দিয়ে আঠার মত লালা গড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথার খানিকটা ভিজে গেছে। কেমন একটা ঘড়ঘড়ে আওষাঙ্গ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। হাঁ ক'রে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে স্বপ্ন। উঃ, কষ্ট হচ্ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে ছেলেটার। কাছে বসে পড়ে ছেলের বুকে হাত রাখে ছোট্টুলাল—“স্বপ্ন, স্বপ্ন রে।” ধড়মড় করে উঠে বসে স্বপ্ন। ছোট্টুলালের দিকে চেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করে।

হাতের মিষ্টি ছুঁটো তুলে ধরে হেসে বলে ছোট্টুলাল—  
“আও স্বপ্ন, মিঠাই খাওগে?”

কি বুঝল কে জানে পাগল ছেলেটা। ছোট্টুলালের হাত থেকে মিঠাই তুলে নিয়ে শব্দ করে হাসতে আরম্ভ

করে দিলে। বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলো ছোট্টুলাল। অস্পষ্ট হারিকেনের আলোয় শুধু ছোট্টুলাল আর স্বপ্ন। পিতা আর পুত্র। ছুঁহাতে জড়িয়ে ধরে ছোট্টুলাল ছেলেকে বুকের ওপর। সতেরোটা বছর নয়, ঘন ছ'বছরের ছোট্ট স্বপ্ন ধরা দিয়েছে ছোট্টুলালের হাতের মুঠায়।

“ঘেউ ঘেউ...উ...খক্ খক্—” রাজির নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিশ্রীভাবে কোথায় কুকুর ডেকে উঠল।

স্বপ্নের জটা ধরা মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরলে ছোট্টুলাল। না, না, স্বপ্নকে ছাড়তে পারবে না ছোট্টুলাল, কোথাও পাঠাতে পারবে না তা'কে। মুগ্ধ ছুঁচোখ অন্ধ হয়ে থাক, লক্ষ্মী চলে থাক ছোট্টুলালকে ছেড়ে—শুধু স্বপ্ন থাক এমনি হাসি নিয়ে চিরদিন, চির রাত্তির। ছোট্টুলালের চোখের জলে ভিজে যেতে লাগল স্বপ্নের বিশ্রী জটপাকানো চুলগুলো।

যে হাতে একটা প্রাণ নিয়েছে ছোট্টুলাল, সেই হাতেই তুলে ধরলে নরম সাদা সন্দেশ ছুঁটো স্বপ্নের মুখে—সেই ছোট্টবেলার মত—“খাও স্বপ্ন, মিঠাই। খা লেও বেটা!”\*

\* অগ্রবৃত্ত (আন্দুল মোড়ী) পরিচালিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প।

## জীবন-মন্ত্র

শ্রীমণিমোহন দাস

কুরু-কঙ্কা সিঙ্কুসম

পিশাচের অগ্নিকরা

যদি আসে প্রাণে,

উষেল প্রবাহ শ্রোতে

দিনভ্রান্তি যদি ঘটে

বলি আমি ডাক ভগবানে।

থাক না সে যেথা থাকে, তবু সর্ব্ব চোখে রাখে

পুণ্য কুপা দিতে পারে করে না বঞ্চিত,

বলহীনে দেয় বল, ভূষিত হৃদয়ে জল

ভক্ত দিতে রাখে সর্ব্বসম্পদ সঞ্চিত।

তোমার আমার 'পরে যত কর্মভার আছে

স্থিতি কভু করো না পালিতে

মনে রেখ এ তাহার

পালিতে হইবে জীব জীবেরে পালিতে।

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসম্ভবগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ (মে—ডিসেম্বর)। ১৩৫৪-৫৫ বঙ্গাব্দ)

২২

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

২ মে—প্রবর্তক বিজ্ঞানী তবনের শিক্ষক সম্মেলনে সম্ভবগুরুর ভাষণ।

৪ মে—প্রবর্তক সম্ভব কর্তৃক কলিকাতায় আগত জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে (Japanese Trade Mission) ‘কিরপো’ হোটেলে সম্বর্দ্ধনা। উপস্থিতি—শরৎচন্দ্র বসু, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, স্ত্রীর বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, পুলিশ কমিশনার এস. এন. চাটার্জি, নবাব ফরোজি, এস. এন. মোদক আই. সি. এস. সেরিক ডি. এন. সেন, দৈনন্দিন জালান, চণ্ডীকাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি।

৭ মে—অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবোপলক্ষে সম্ভবের শ্রীমন্দিরে সম্ভবগুরুর নির্দেশে এই দিন হইতে চারি দিবস ব্রহ্ম-মন্ডের পূরশ্চরণাঘুষ্ঠান। প্রতিদিন ত্রিগণের উদ্দেশ্যে সম্ভবগুরুর বাণী-নির্দেশ।

১০ মে—অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের পূর্বদিনে সম্ভবের শ্রীমন্দিরে সাক্ষ্যোপাসনাস্থে অধিবেশন—সম্ভবগুরুর আবাহন-বাণী।

১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৫৫ বঃ—বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ২৬ বর্ষীয় প্রবর্তক সম্ভব অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন। ২৩ মে পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস ব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান। প্রাতঃকালে সম্ভবগুরুর কর্তৃক সম্ভবের সাংস্কৃতিক পতাকোত্তোলন। ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ।

উদ্বোধন-দিবসে ও বিভিন্ন দিবসে সম্ভবগুরুর বক্তৃতা। বিভিন্ন দিবসের সভাপতি ও বক্তা—অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ সাম্যাল, সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওহুদ, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুমারী

লতিকা ঘোষ, অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, প্রবীণ বিপ্লবী জৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, নলিনী-কিশোর গুহ, কংগ্রেসনেতা স্বরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, রায় বাহাদুর বিজয়-বিহারী মুখোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ির রাণী অশ্রমতী দেবীর পৌরোহিত্যে সমাপ্তি দিবসে পূর্ণিমা সম্মেলন।

পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সম্ভবগুরুর কর্তৃক মণীন্দ্র-নাথ ঘোষকে আত্মজীবনীক সম্মান-ধর্ম্মে দীক্ষাদান ও স্বামী নির্মলানন্দ নামকরণ।

১১ মে—পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির (সম্ভবের ভোজনালয়) প্রতিষ্ঠাকল্পে নবনির্মিত গৃহ-প্রবেশোপলক্ষে রাণী অশ্রমতী দেবীর উপস্থিতিতে ও পণ্ডিত স্বর্ধানারায়ণ তর্কতীর্থের পৌরোহিত্যে বাস্তব-পূজা, হোম, ষাগের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে সম্ভবগুরুর বাণীপ্রদান (১)।

(১) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে সম্ভবগুরুর বাণী :

“আজ ২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৫ বঃ, ১১ই মে মঙ্গলবার, ১৯৪৮ সালের অক্ষয় তৃতীয়া। ১৯১৪ খৃঃ অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ব সংসার রচনা হয়। ১২, টাকার ভিখারিণী সম্ভবজননী যে সংসার রচনা করেন, তাহাই আজ সম্ভব-সংসাররূপে পরিণত হইয়াছে। এই সংসার-রক্ষার দায়িত্ব তিনি বাহার হস্তে স্তম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সূত্র অথবা অব্যবহিত তাহাকে এই কর্ম হইতে বিরত করিতে পারে না। আমি পরলোকগতা সম্ভব-জননীর সম্মান-সংরক্ষণের কথাই বলিতেছি।

তাহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য বাহার মধ্য দিয়া অমূল্য দান উৎসর্গিত হইয়াছে, সেও চির আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে আমার সংশয় নাই। হৃকটোর তপস্তার পর এই কর্ম বাহাদের শ্রমে সম্পূর্ণ হইতেছে, তাহাদের প্রতিও সম্ভবজননীর আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। যে সকল সম্ভব-সম্ভবদের নিষ্ঠার ও উত্তোষে আজ সম্ভবমন্দিরে সম্ভবজননীর স্মৃতিতীর্থ-রূপে অন্নপূর্ণার মন্দির সংস্থাপিত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়-বুদ্ধি শ্রীভগবানের অমৃতভাষিকের স্তম্ভ হউক—ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।”

- ২১ মে—পূর্ণিমা-সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণীপ্রদান।
- ২৩ মে—প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব-প্রাঙ্গণে অমুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ বাস্তুত্যাগী সম্মেলনে সজ্জগুরুর উদ্বোধন-বাণী।
- ২২ মে—সজ্জের সহযোগী সভ্য, ভক্তপ্রাণ অরুণচন্দ্র সোমের বাটীতে উপাসনা-বার্ষিকী উৎসবে সজ্জ-সম্মেলন ও সজ্জগুরুর আশীর্বাণী প্রদান।
- ৩০ মে—সজ্জের গভর্নিং বডির অধিবেশনে সজ্জগুরুর নির্দেশ বাণী।
- ২০ জুন, ৬ আষাঢ়, ১৩১৫ বঃ—শ্রীশ্রীসজ্জজননী ৫৮তম আবিস্কারোৎসব। উপাসনা, পূজা, হোম, ভোগারতি। অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা—সজ্জগুরুর ভাষণ।
- ২০ জুলাই—গুরু-পূর্ণিমা সম্মেলন—সজ্জ চাতুর্দশ-ব্রতারণ। সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।
- ৩১ জুলাই—সজ্জের গভর্নিং বডির সভায় সজ্জগুরুর বক্তৃতা।
- ১০ আগষ্ট—কলিকাতা ‘ভারত সভা হল’-এ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে ‘প্রবর্তক সেবা সজ্জের’ প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সজ্জগুরুর বক্তৃতা।
- ১৫ আগষ্ট—স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে সজ্জ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সভাধিবেশন—সজ্জগুরুর ভাষণ প্রদান।
- ১৯ আগষ্ট—কলিকাতা ‘ভারত সভা হল’-এ সজ্জের উদ্যোগে প্রথম পূর্ণিমা সম্মেলন—সজ্জগুরুর ভাষণ।
- ১৯ আগষ্ট—চন্দননগরে পূর্ণিমা-সম্মেলন—চাতুর্দশ ব্রতের প্রথম মাসিক অমুষ্ঠান।
- ২৭ আগষ্ট—শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সজ্জগুরুর বাণী।
- ৪ অক্টোবর—১২—১টা ধ্যান করাও নির্দেশ।
- ৪ সেপ্টেম্বর—সজ্জগুরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় প্রবর্তক ট্রাষ্ট লিঃ-এর ১৫শ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন। এইদিনেই তাঁহার সভাপতিত্বে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভাধিবেশন।
- ৪ সেপ্টেম্বর—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে স্বামী চিদানন্দজীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি সজ্জগুরু ও অন্যান্য কর্মীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।
- ৭ সেপ্টেম্বর—চন্দননগর রাজভবনে করাসী ভারতের গভর্নর মসিমে ব্যায়োর সহিত সজ্জগুরুর সাক্ষাৎ-কার ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।
- ১৭ সেপ্টেম্বর—সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা প্রবর্তক ফার্নিশার লিঃ-এর ৪০ নং ট্যাংরা রোডস্থিত কারখানা-বাটীতে পূর্ণিমা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন। সজ্জগুরুর ভাষণ প্রদান।
- ১৮ সেপ্টেম্বর—পূর্ণিমা সম্মেলনে চাতুর্দশ ব্রতের দ্বিতীয় মাসিক অমুষ্ঠানে সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।
- ১৯ সেপ্টেম্বর—‘প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার’-এর নবম বার্ষিক উদ্বোধন ও অপরাহ্নে চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অষ্টম বার্ষিক সমাবর্তন-সভায় নবাগত ও প্রাক্তন ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে সজ্জগুরুর আশীর্বাণী।
- ২৬ সেপ্টেম্বর—সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে নিখিল প্রবর্তক সজ্জের (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ ধারা অনুসারে সমিতি-আইনভুক্ত হওয়ার পর) প্রথম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সজ্জগুরুর ভাষণ।
- ১ অক্টোবর—সজ্জগুরুর সভাপতিত্বে প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিঃ-এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা।
- ২ অক্টোবর—মহালয়ার স্মৃতি-তর্পণোৎসব—সজ্জগুরুর ভাষণ।
- ২ অক্টোবর—আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন। মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে সজ্জগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান।
- ৯ অক্টোবর—১২ অক্টোবর—সজ্জ শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—বিভিন্ন দিবসে সজ্জগুরুর বাণী প্রদান। সজ্জের স্বল্পদূর্বর্গের নিকট সজ্জগুরুর বিদ্যার বাণী প্রেরণ।
- ১১ অক্টোবর—ভদ্রেশ্বর আশ্রমপ্রার্থী শিবিরে সজ্জগুরুর গমন ও বাণী প্রদান।
- ১৭ অক্টোবর—কোজাগর পূর্ণিমা—চাতুর্দশ ব্রতের তৃতীয় মাসিক অমুষ্ঠান—সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।
- ২৬ অক্টোবর—কলিকাতা, প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন

লিঃ-এর বাটীতে পূর্ণিমা-সম্মেলনের তৃতীয় অধি-  
বেশন। সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান।

৩০ অক্টোবর—সজ্জের গভর্ণিং বডি অধিবেশনে সজ্জগুরু ভাষণ।

১৬ নভেম্বর—রাস-পূর্ণিমায় চাতুর্মাশ্য ব্রতের উদ্‌ঘাপন।  
পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জগুরু আশীর্বাণী।

১৯ নভেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানে নবনিযুক্ত ডিগুটী হাই  
কমিশনার সন্তোষকুমার বহুকে কলিকাতা 'ভারত  
সভা হল'-এ সজ্জ কর্তৃক সঞ্চর্চনা। সজ্জগুরু  
বক্তৃতা প্রদান।

১৯ নভেম্বর—'ভারত সভা হল'-এ কলিকাতায় পূর্ণিমা  
সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে প্রবর্তক অর্থ-  
প্রতিষ্ঠানের কর্মসিগের নিকট সজ্জগুরু ভাষণ।

১ ডিসেম্বর—সজ্জের প্রবীণ অন্তরঙ্গ সভ্য ও চট্টল প্রবর্তক  
সজ্জের সহ-সভাপতি রোগাক্রান্ত বক্ষিমচন্দ্র সেনকে  
দেখার জন্য সজ্জগুরু কলিকাতায় আগমন।  
রোগশয্যায়ও একমাত্র ঈশ্বর-চেতনায় থাকার  
নির্দেশ প্রদান।

৮ ডিসেম্বর, ২২ অগ্রহায়ণ—শ্রীশ্রীসজ্জজননীর উনবিংশ  
বর্ষীয় তিরোভাব উৎসব। পঞ্চ দিবসব্যাপী অমুষ্ঠান।  
প্রথম দিনে উপবাস পালন, উপাসনা, সূর্যাস্ত  
পর্যন্ত হোম, মাতৃনাম জপ, সজ্জগুরু বাণীপাঠ,  
চণ্ডী ও গীতাপাঠ, বোড়শোপচারে মাতৃ-পূজা  
প্রভৃতি। হোমাস্ত্রে সজ্জগুরু আশীর্বাণী (২)।

## (২) সজ্জগুরু আশীর্বাণী :

'মন্তঃ পরভরঃ নাশ্চৎ'-আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তোমাদের আর কেহ  
নাই। যেহেতু আমি তোমাদের গুরু। আমার জন্ম ও কর্তৃক দিয়া।  
এখানে বিচার কিছু নাই। গীতার ভগবানের মত আমিও বলব—  
"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাংসং শরণং ব্রজ। অহং বাং সর্বপাপেভ্যো  
মোক্শয়িষ্যমি মা স্তচঃ ॥"

মহুতজীবনে পাপ তিনটি। কাম, ক্রোধ এবং লোভ। গীতাইহাকে  
বলিয়াছেন—'ত্রিবিধং মরকতম্'—কিন্তু আমি বলব, এই তিনকেও  
রূপান্তরিত করা যায়। কাম—পরমকে পাওয়ার জন্য প্রেরণা। ক্রোধ—  
এই উর্দ্ধগতি বাহাতে ব্যাহত না হয়, তাহার জন্য সতত সতর্কতা।  
লোভ—পরমের প্রতি আসক, শ্রীবুদ্ধকে দেখার আকুলতা। কাম,  
ক্রোধ ও লোভকে রূপান্তরিত করার জন্য বজ্র, দান ও তপস্কারণ কর্তৃকে  
আশ্রয় করতে হবে। ঈশ্বর শ্রীত্যাগে কর্তৃক করাই ভারতের ধর্ম। বজ্র,

সাম্রোপাসনার পর নবান্ন প্রসাদ বিতরণ।  
ক্ষিতীশচন্দ্র ভাগবতরত্নের কথকতা ও বরেন্দ্রকৃষ্ণ  
বহুর লীলাকীর্তন।

১২ ডিসেম্বর—মা তৃ - তি রো ভা বো ৭ স ব উপলক্ষে  
আন্তর্জাতিক বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পালের  
পৌরোহিত্যে জনসভা—সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান।

১৬ ডিসেম্বর—রোগগীড়িত বক্ষিমচন্দ্র সেনকে দেখার জন্য  
সজ্জগুরু দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমন।

১৭ ডিসেম্বর—সজ্জগুরু সভাপতিত্বে প্রবর্তক ফার্নিশাস  
লিঃ-এর ৮ম বার্ষিক ও প্রবর্তক কমার্শিয়েল  
কর্পোরেশন-এর ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা—  
সজ্জগুরু বক্তৃতা।

১৮ ডিসেম্বর—প্রবর্তক ফার্নিশাস লিঃ-এর ট্যাংরাস্থিত  
কারখানা-গৃহে পূর্ণিমা সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন—  
সজ্জের সভ্য, প্রবর্তকের বিভিন্ন কর্ম-প্রতিষ্ঠানের  
কর্মসিগ ও অমুরাগী নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতি।  
গান ও গীতাপাঠের পর সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান।

২৪ ডিসেম্বর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের  
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চিহ্নস্বামী  
পৌরোহিত্যে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে 'অখিল  
ভারত . দেবভাষা পরিষদ'-এর ১৭শ বার্ষিক  
অধিবেশন—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে  
সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান—সংস্কৃতভাষার পুনঃ প্রচলন  
ও সংস্কৃতকে আন্তঃ-প্রাদেশিক ভাষারূপে গ্রহণ  
করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ও প্রস্তাবাকারে  
ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অমুরোধ জ্ঞাপন।  
বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃতভাষাকে বাধ্যতামূলক করার  
জন্য প্রস্তাব গ্রহণ।

২৬ ডিসেম্বর—সজ্জের গভর্ণিং বডি সভায় সজ্জগুরু  
ভাষণ।

৩০ ডিসেম্বর—রোগাক্রান্ত বক্ষিমচন্দ্র সেনকে দেখার জন্য  
সজ্জগুরু তৃতীয় বার কলিকাতায় আগমন।

(ক্রমশঃ)

দান ও তপস্কারণ আশ্রয় করে তোমরা ভারতের জয় দাও। তোমরা  
'মদ্রনা' হও। আমার ধর্ম তোমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কে  
আমি? আমি ভারতের সংস্কৃতি। যেখানে তোমাতে আমাতে দ্বন্দ্বি,  
সেইখানেই শ্রী, বিজয় প্রভৃতি। ভারতকে জয়শ্রীমণ্ডিত করার জন্য  
তোমার আমার অর্থাৎ ভগবান ও ভক্তের যোগযুক্ত অবস্তাবোধী।



# উনচল্লিশ বর্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

[ আশ্রমী ]

সুদীর্ঘ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রবর্তক-সম্মত অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব। এবারকার উনচল্লিশ বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই বৈশাখ শেষ হল। আরম্ভ হয়েছিল গত ৫ই বৈশাখ। প্রতি বৎসরেই শুক্লা তৃতীয়া থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব অহুষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ একটি মাস ধরে চলে এই উৎসব-প্রবাহ। চৈত্র পূর্ণিমায় শুরু, বৈশাখী পূর্ণিমায় শেষ।

গত ১৮ই চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্দিরে সমবেত প্রাতঃপাশনার পরই সজ্জাচার্য্য শ্রীস্বর্নানারায়ণ তর্কভট্ট কৰ্ত্তৃক ষষ্ঠাবিধানে গৈরিক পতাকা পূজাস্ত্রে একাদশ চূড়বিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ে পতাকাটি উত্তোলিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ইহাই সূচনা-পর্ক। অত্রভেদী মন্দিরচূড়ে বাত্যান্বলিত গৈরিক পতাকাখানি আত্মান জ্ঞানায় উৎসবের উৎসবদেবতাকে। পরদিন ১৯শে চৈত্র হ'তে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত প্রতিদিন সাক্ষ্যোপাসনাস্ত্রে সজ্জাচার্য্য কৰ্ত্তৃক পুরাণ পাঠের দ্বারা উৎসবের অগমনবার্তা ঘোষিত হয় জনসাধারণের মধ্যে। উৎসব-সূচনাপর্বের শেষ ৪ দিন প্রাতে গুরুদত্ত ব্রহ্মমন্ডের পুরস্চরণ ও সন্ধ্যায় অপরাহ্নিতা স্তোত্র পাঠিত হয়।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব মুখ্যতঃ শ্রীমন্দির-দেবতার বার্ষিক উৎসব। তাই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য প্রভাতে সন্ধ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সঙ্গীতে পল্লীপথ মুখরিত করে নগর পরিভ্রমণ করেন। তারপর প্রাতঃ ৬টায় শ্রীমন্দিরে সমবেত উপাসনা, শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও সাংস্কৃতিক পতাকা উত্তোলিত হয়। সাংস্কৃতিক পতাকা উত্তোলন করেন সম্ম-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত। তৎপরে ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা ও হোম হয়। পূজা করেন প্রবর্তক চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমনিবরণ তর্কবেদান্তভট্ট। পূজাস্ত্রে প্রেসাদ বিতরিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সমবেত উপাসনাস্ত্রে উৎসব সভা। সভা অহুষ্ঠিত হয় প্রবর্তক বিজ্ঞার্থী ভবনে নব নিশ্চিত বিতল গৃহে। সভাপতি প্রখ্যাত মনীষী ডক্টর শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি মহোদয়। তিনিই জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এবারকার প্রদর্শনী মুখ্যতঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিষয়

লইয়া। এই মাসটিত বিশ্বকবিকে পূজা দেবার আয়োজন জগৎ জুড়ে হয়েছে—প্রবর্তক সন্ধ্যের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবও তা' থেকে বাদ পড়েনি। এবারে মেলার মূর্ত্তি বিভাগে তাই প্রদর্শিত হয়েছে—‘চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ’।

চৌদ্দটি দৃশ্য ও লিপিরোগে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে পল্লীতরুণের অঙ্কিত প্রমাণাকৃতি রবীন্দ্র প্রতিকৃতি সকলকেই আনন্দ দিয়েছে। কবির চন্দননগরে অবস্থান কালের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে কবির জাতীয়তার স্বপ্ন ও রূপায়িত করা হয়েছিল তাঁরই রচিত “শিবাজী” ও “গুরু গোবিন্দ” কবিতা হ'তে। এই বৎসর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্যবেরও জন্ম-জয়ন্তী বর্ষ—তাই তাঁদের কথাও চিত্রে ও লিপিপটে সজ্জায় স্মরণ করা হয়। এই প্রদর্শনী বিভাগে কবির দুইটি অমূল্য উপদেশবাণীও জ্ঞাতিকে উপহার দেওয়া হয়। এবং যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রমহিমাও কবিগুরু ভাষায় প্রদর্শিত হয়।

মেলার চিত্র বিভাগে আরও একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল—রবীন্দ্রবাণী ও চিত্রাবলী। এই অনগ্রজ দুপ্রাপ্য চিত্রাবলী ও তথ্যগুলি প্রাক্তন শিলাইদহ নিবাসী রবীন্দ্র-স্নেহভাজন শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শ্রীঅধিকারীর এই সংগ্রহ অল্পময় অপূর্ণ। ইহা এবারকার মেলার প্রধানতম আকর্ষণই শুধু ছিল না, দর্শকেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছে। এই বৎসরে মেলায় প্রবর্তক বুনিন্দাদী বিদ্যালয়ের শিশু-শিল্প ও প্রবর্তক মহিলা সদনের কারুশিল্পও উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় অল্প হইলেও যে কয়টি দোকান এই জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী উপলক্ষে এসেছিল তা' রুচিসম্মত ও মনোহারী।

এই বৎসর অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের দৈনিক উৎসব-সূচির মধ্যে দেখা যায়—প্রথম উদ্বোধন দিবস ও শেষ সমাপ্তি দিবস বাদ দিলে মোট এগার দিনের মধ্যে পাঁচ-দিনই “রবীন্দ্র দিবস” অহুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি বিষয়ে এক একটি স্বতন্ত্র বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীরাঙ্গেশ্বর মিত্র “রবীন্দ্র সঙ্গীতের

ধারা", শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কৃষ্টি", শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার "ঋষি রবীন্দ্রনাথ", এবং শ্রীদেবজ্যোতি: বর্ধন "রবীন্দ্র মনীষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেকেই বক্তৃতা চিন্তায়, ভাষায় এবং বাচনভঙ্গীতে অল্পম। আর একদিন রবীন্দ্রনাথেরই রচিত কবিতা, গান এবং গানের সঙ্গে নৃত্য ও প্রদর্শন করেন ছাত্রছাত্রীরা। বাকী ছয় দিনের মধ্যে মহিলা সভা, সজ্জগুরু দিবস, শিশু দিবস, আয়ুর্বেদ দিবস এবং একদিন "নন্দাঘুষ্টি বিজয়" অভিযাত্রী কাহিনী এবং আর একদিন "মহাকাশে অভিযান" ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয়।

মহিলা সভা পরিচালিত করেন প্রবর্তক নারীমন্দিরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য। এই সভায় সভানেত্রী করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের শ্রীমতী প্রতিমা মজুমদার এম. এ.। শ্রীমতী মজুমদারের অনাড়ম্বর আন্তরিকতা ও বিনয়ময় ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে। শ্রীমতী মজুমদার প্রবর্তক সম্মুখে ভারতীয়ভাবে মেয়েদের জীবনগঠনের আদর্শকে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এইরূপ নারীই পরিবার, দেশ ও দশের কল্যাণ করিতে পারে।

সজ্জগুরু-দিবসে সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া-জগতের স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীহুশীলপ্রসাদ সর্কাসিকারী। সভায় চন্দননগরের অনেকেই পূজ্যপাদ সজ্জগুরুদেবকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ও সজ্জগুরুদেবের সহিত তাঁর গভীর কর্মময় পরিচয়ের কথা বড় আন্তরিকতা ও দরদের সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

আয়ুর্বেদ দিবসের নিষ্ঠারিত সভাপতি কবিরাজ বিমলাকান্ত তর্কতীর্থ মহোদয় শারীরিক অস্থস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না। তিনি লিখিত যে একটি চিন্তাগর্ভ অভিভাষণ পাঠান তাহা সভায় পাঠিত হয়। এইদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। আয়ুর্বেদ মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুটিই উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে কবিরাজ মহাশয়দের কণ্ঠে ক্ষুণ্ণতার অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায়। সর্বশ্রী কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইন্দুভূষণ সেন,

কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, জ্যোতি:প্রসন্ন সেন আয়ুর্বেদের বিভিন্ন দিকের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সকলেই আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানকল্পে সজ্জগুরুর সক্রিয় প্রচেষ্টার বিষয় সশ্রদ্ধায় শ্রবণ করেন।

শিশুদিবসে শিশুদেরই আধিপত্য, তারাই তাদের স্বপনবুড়ো শ্রীঅবিল নিয়োগী মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করেন। শিশু কণ্ঠের আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্যাদি দর্শনে সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনিও শিশুমনের উপযোগী ভাষায় শিশু রবীন্দ্রনাথের গল্প বলে সকলকে আনন্দ দান করেন।

এবারের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'নন্দাঘুষ্টি অভিযান' ও 'মহাকাশে অভিযান'। নন্দাঘুষ্টিবিজয়ী বীরদের ছয়জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুঃসাহসিক দুর্গম যাত্রার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। মহাকাশ অভিযান ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয় বলিয়া বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। তরুণ বৈজ্ঞানিক শ্রীদিলীপ বসু ও শক্তিকুমার মুখার্জির বাচনভঙ্গীও সহজ-সুন্দর।

পরিশেষে সমাপ্তি দিবস। বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণা-প্রভাতে সকলে সমবেত হন শ্রীমন্দিরে। প্রাতঃরূপাঙ্গনাস্ত্রে স্বামী বিনয়ানন্দ গিরি মহারাজকে পুরোভাগে নিয়ে সংকীর্্তন সহযোগে শোভাযাত্রা করে আশ্রমের ঘাটে পুত গঙ্গাতীরে সকলে স্নান সমাপন করেন। এই স্নানকে অবতুথ স্নান বলা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার রজত জয়ন্তী বর্ষে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য এই অবতুথ স্নানের প্রবর্তন করে যান। অবতুথ স্নান অর্থে যজ্ঞাস্তে স্নান। অক্ষয় তৃতীয়া মহাবিজ্ঞ শেখ। এই স্নানপর্বও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইদিন সন্ধ্যায় সমাপ্তি সভা ও পূর্ণিমা সন্মেলন। সমাপ্তি সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলীব অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীতরণচন্দ্র দত্ত। উৎসবের বিবরণী ও মেলায় পরিচয় প্রদান করেন উৎসব সম্পাদক স্বামী প্রদ্বানন্দজী। অতঃপর পূর্ণিমা সন্মেলন স্বামী বিনয়ানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে অহুষ্ঠিত হয়। গিরি মহারাজজী পাতঞ্জল যোগসূত্র-ভিত্তিক যৌগিক তষ ও সাধন-ক্রমটি সর্বজনবোধ্য ভাষায় বিশদ আলোচনা করেন। রাজি প্রায় দশ ঘটিকায় পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। যে মন্দিরদেবতার ষোড়শোচারে পূজার দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়েছিল সেই দেবতারই প্রসাদ গ্রহণে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হয় উনচল্লিশ বৎসরের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব।

# সম্মাদকীয়

স্বাধীনোত্তর সারা ভারতের কথা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতেছি না। ইহা গবেষণা করিবার প্রয়োজন হয় না যে, বিগত এক যুগে স্বাধীনতা ভারতের অনেক প্রান্তিক রাজ্যে আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছে, স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করার ছিল না, তাহা সেখানে হইয়াছে এবং হইতেছে। জীবনের নূতন আনন্দ প্রাণচঞ্চল্য আনিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই অপর পক্ষে বাংলা ও বাঙালীর জীবনে অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের। মাথা গণিয়া এখানে সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হয়। গণভোটের জোরে ক্ষমতা লাভ আর স্বথ-স্ববিধা আদায় করা চলে। চরিত্র, মেধা, স্বয়ংবস্তা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, সত্য, শীল, সদাচার, কোনরূপ মহুছোচিং উৎকর্ষের আদর নাই, উহা গণনীয়ও নহে। এই সংখ্যার দিক দিয়াও সারা ভারতের কেন্দ্রে বাঙালী নগণ্য ও লঘু। সেদিনের সপ্ত কোটি বাঙালীর বিতুল আজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পীড়নপর বিবদমান। স্বাধীনতার বেনীমূলে বাঙালী বলী পড়িয়াছে। নির্ভীক নেতৃত্বের দিশারীও তার নাই। সর্বোপরি বাঙালী আত্মসম্মিৎ হারাইয়াছে, আত্মবিশ্বস্ত হইয়াছে। আলো-হীন, আশাহীন বর্তমানের গোটা বাঙালী জাতিটা একটা সার্বিক অধঃপতনের পঙ্কশয্যায় শুইয়া কেবল কলঙ্ক কালিমার কর্দম সর্কাজে মাখিয়া বাঁচিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। এমনটি চলিলে অনতিদূর ভবিষ্যতে বাঙালী অবধারিত নিশ্চিহ্ন হইতে বাধ্য। তেল-মুন-লকড়ী বাদের জীবনের ভিত্তি এমন জৈব-ধর্ম-সর্বস্ব বাঙালী জনসংখ্যার কথা আমরা ভাবিতেছি না। পরিবর্তিত পরিবেশকে মানাইয়া এই সব শারীরধর্মীরা বেশ ও ভাবান্তরে বাঁচিয়া অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু অনাশ্রয়ী হইয়া মরিবে বাঙালী। বাঙালী গুণগত একটা বিশেষ ঐতিহ্য, একটা বিশিষ্ট মননশীলতা যাহা চণ্ডীদাস-চৈতন্য হইতে অরবিন্দ রবীন্দ্রে প্রকটিত হইয়াছে,

দানা বাঁধিয়াছে—যাহা বিশ্বমাতৃষকে মুক্তির উদার আলো দেখাইবার সম্ভাবনাপূর্ণ।

\*

একটা বিপর্যয়মূলক ছরবছার মধ্যে যে বাঙালী পড়িয়াছে ইহা বাঙালীমাত্রেই যে বুঝিতেছে না, এমন নয়। কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। পথের সন্ধানের প্রবৃত্তিও যেন লোপ পাইয়াছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক এই যে, “আমার জীবনে লতিয়া জনম জাগরে সকল দেশ” এমন তপঃপুত আপনভোলা দেশপ্রাণ জীবন-দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। আপন চরিত্র-বলের প্রভাব-সঞ্চারী ব্যক্তি বর্তমান বাংলায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ‘আমার জীবনই বাণী’—এমন কথা বলিবার মত বীর্ঘবান মাতৃষ কোথায়? বাণী আছে কিন্তু বাণীবৃত্তি নাই। তাই তথাকথিত নেতাদের বড় বড় আশাভরসার বুলি অসার বলিয়াই শূন্যে উবিয়া যাইতেছে। বাক্য যেখানে আন্তরিক নিষ্ঠায় ও কর্ণে মহিমাষিত নয়, সেখানে তাহা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। বিগত শতাব্দীতে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ জাতির অভ্যুদয়ের মূলে ছিল এই নিষ্ঠাদ্রুড়ি চরিত্র। একটা গোটা জাতিকে বর্তমান নিবীৰ্যতা ও নীতিহীনতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারিত সমাজ আর সরকার। সমাজ ভাঙিয়াছে। সমাজ-শাসনও নাই। যে দীর্ঘায়িত সংস্কারসমূহ সমাজের সংহতি বজায় রাখিত তাহা আমরা মিথ্যা বলিয়া অবজ্ঞায় ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশের অহুকূলে নূতন কোন সংস্কার সৃষ্টি করিতে পারি নাই। বিদেশী শাসকের বুটের তলায় পিষ্ট হইয়া আমাদের যে কৃত্রিম ঐক্যবোধ জাগিয়াছিল তাহাও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার দ্বারা তারাও দিগ্‌লান্ত ও ব্যর্থ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপন জীবন-দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারিয়া তাঁহারা শুধু স্তোকবাক্যে মাতৃষকে ভুলাইয়া রাখিতে সচেষ্ট। বাঙালী আজ যেন জোট বাঁধিয়া আপাততঃ প্রেয়ঃপথমুগমনে উন্নাদ উদ্ভাস্ত। প্রেয়ঃপথ দেখাইবার ব্যক্তি ও বাণী যেন অবলুপ্ত। এই অভাবই আত্মিকার দিনের বড় অভাব।

- \*

কিন্তু কেন বাঙালীর জাতীয় জীবনে এমনটি ঘটিল, কেন তার ভাগ্যবিধাতার এই বৈরাগ্য! বাঙালীর দীর্ঘ সাধনার এই শোচনীয় ব্যর্থতার হেতু কি? প্রবর্তক সম্বন্ধে সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত আজীবন ত্যাগব্রতী গান্ধীনিষ্ঠ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অঙ্কিত সম্বন্ধনীর আবির্ভাব উৎসব সভায় সেদিন এই হেতুর একটি নির্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীদত্ত বলিয়াছিলেন, ‘বাঙালী মুক্তিসংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা-সাধনায় প্রেমিকের সঙ্কল্প গ্রহণ করে নাই। ‘বন্দেমাতরম্’-এর উদ্ভূত উদ্বেজনার মাতিয়া সেদিনের বাঙালী তরুণেরা হাসিমুখে প্রাণ বলি দিয়াছে, দুঃসহ পীড়ন ও কারাবন্দন ভোগ করিয়াছে, যার ফলে খণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতাও আসিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে বাঙালী ‘মা’-কে হারাইয়াছে, অথও মাতৃত্ব তার নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছে। শ্রীদত্ত এই সঙ্কল্প সিদ্ধির পথের ইঙ্গিত দিতে গিয়া বলিয়াছেন, আজকের বাঙালীমাত্রেই কর্তব্য প্রতিদিন প্রাতে শয্যাভ্যাগের সঙ্গে এই প্রেমিক্যমূলক সঙ্কল্প-মন্ত্রের স্মরণ-মনন করা আর অথও ভারতমাতার চিরমুখীকে অমুখান করা। ব্যক্তিগত ও চক্রে চক্রে সমষ্টিগতভাবে এই সংকল্প ধ্যানের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে একদিন এই ভাবমন্ত্রই বিগ্রহাঙ্কিত হইয়া বাঙালীর জাতি-সাধনা সিদ্ধ করিবে। শ্রীদত্ত এই আশাও পোষণ করেন যে, বাঙালীর ধ্যানের জাতি বিবর্তন দ্বারায় বর্তমানে যে আবর্তের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাইতেছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে ঋজুপতি নিশ্চয়ই পাইবে। সভাপতি শ্রীচট্টোপাধ্যায় উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতার স্বীকার করেন যে, তিনি অঙ্ককারের মধ্যে একটা কণি আলোর দিশা যেন পাইয়াছেন। শ্রীদত্তের ইঙ্গিতটি আজকের দিনে নিশ্চয়ই অমুখাবনযোগ্যই শুধু নয়, অমুসরণীয়ও বটে।

কিন্তু বর্তমান ভারতে সামগ্রিক প্রেমিক্য সাধনের পথে একটা দুর্লভ্যনীয় অন্তরায় আছে—যাহা বহির্ভারতীয় আত্মগত্যে এমনি দৃঢ়নিষ্ঠ যে, কোনরূপ ভাবের আদান-প্রদান বা বোকাপড়ার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বা ঐক্যসাধন সম্ভবপর নয়। বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে। বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের দুর্বল ও কৃত্রিম আপোষনীতির ব্যর্থতা ভারতের স্বাভাবিক ঐক্যবোধকেও আজ সন্ধী করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য ভারত-রাষ্ট্রসৌধ কোন স্বগতীর জাতীয়তার চেতন-ভিত্তিতে রচিত হইতে পারে নাই। এই আধুনিক কালেও পাকিস্তান যে ক্ষেত্রে শরীয়ত শাসন-ভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র প্রবর্তনের বীর্ঘ দেখাইতে পারিয়াছে, মুসলমানের জনসংখ্যাকে নিধন-নিপীড়নের মধ্য দিয়া হয় বিভাডন নয়তো উৎসাদনেও পরাভূত হয় নাই, সে ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র বিচিহ্নকে সমাহার করিতে গিয়া যুরোপের জড়বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও কুল পাইতেছে না। একটা গোটা জীবনের আপাতঃ বাহ্য প্রয়োজন গ্রাসাচ্ছাদন ও জীবনযাত্রার একান্ত বস্তুগত মানোন্নয়নের উপর সমস্ত সমাধানের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অগভীর, অসঙ্গত, সনাতন ভারতীয় ভাব-বিচ্ছিন্ন। ইহাকে গালভরা বৈজ্ঞানিক মানবতা, গণতন্ত্র ও সমাজ-তত্ত্ববাদ বলিয়া চালাইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত অসারতা সারময় হয় না। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের কথা: “পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুরিধার খাতিরে বড় দল বাধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দেয় না। চাপা দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাদক পদার্থ, তাহা কোন না কোন সময়ে ধাক্কা খাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে।” এই অন্তর্বিপ্লব বর্তমান ভারত রাষ্ট্র আসন্ন করিয়া তুলিতেছে। বিচিহ্ন ধর্মী ও ভাবী ভারতের ঐক্যের সনাতন পথটি আজিকার নেতৃবৃন্দের কাছে এখনও অনাবিষ্কৃত, বলা যায়।

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কারিকা পেপটল**

দ্বি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এন্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।



# সাধারিকা

## রিসেড়া সেবা সদন :

গত ২০শে মে রবিবার সকাল ৯টার সময়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন উপমন্ত্রী শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর নন্দর রিসেড়া সেবা সদনের নূতন ব্লকের উদ্বোধন করেন। পুনর্বাসন দপ্তর হইতে ৩৬,০০০ টাকা অর্থ সাহায্যে এই নূতন ব্লকটি নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। সেবা সদনের সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক জানান যে, ১৯৫৬ সনে একটি ভাড়াটে গৃহে শিশুদের জন্য একটি নগণ্য



শ্রীনন্দর প্রদীপ আলিখা নূতন ব্লকের উদ্বোধন করিতেছেন

দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে উক্ত সেবা সদন বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। সেবা সদনের নিজস্ব জমির উপর মিজব ভবনে গত বৎসর প্রায় ১০,৭১১টি শিশু ও ১০৩৩ জন প্রসূতি বহির্বিভাগে এবং অন্তর্বিভাগে ২৪০ জন প্রসূতির চিকিৎসা হইয়াছে। শিশু বহির্বিভাগ এই নূতন ব্লকে স্থানান্তরিত হইলে মাতৃসদনের আরও ১০টি শয্যা বৃদ্ধি পাইবে। উদ্বাস্ত অধ্যুষিত এই অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি "চেষ্ট ক্লিনিক" স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীনন্দর একটি প্রদীপ আলিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন ব্লকের উদ্বোধন করেন।

## সুরি ইঞ্জিন :

শ্রী এম এম হরি নামক জনৈক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিজেল চালিত এক প্রকার রেলওয়ে ইঞ্জিন পশ্চিম আফ্রানীর অন্তর্গত

কিরেলের 'মাক' নামক একটি আর্মিড এন্ডিটান নির্মাণ করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, ইহার পেটেন্ট নামকরণ হইয়াছে : 'সুরি ট্র্যাপশিশন ইঞ্জিন' এবং রেলওয়ে বানবাহনে ইহা খুবই লাভজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি এই মডেলের কয়েকটি ইঞ্জিন ইহার মধ্যেই ভারত সরকার আর্মিড সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। হায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। আজ যদি ভারত এই পেটেন্টকে কাজে লাগাইত, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিদেশী কর্তৃক ক্রীত হইত না এবং দেশের বহু বিদেশী মুদ্রাও বাঁচিত।

## মহিলা পঞ্চায়ত প্রদান :

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ছাত্রী কুমারী শিশিরা দেবী সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হেতমপুর অঞ্চলপঞ্চায়তের একমাত্র মহিলা প্রধান নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বিপুল ভোটাধিকার জয়লাভ করেন। তিনি এ বৎসর বি.এ পরীক্ষা দিয়াছেন। কুমারী শিশিরা হেতমপুর রাজবংশের সন্তান এবং মহারাজকুমার স্বর্গত রাধিকারঞ্জন চন্দ্রবস্তীর কন্যা। তিনি নদীয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীকোণীশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী। 'পঞ্চায়ত পার্কের' উদ্বোধনপূর্ব কালে তাঁহার এই কৃতিত্ব অভিনন্দনীয়।  
মুকার্জ্জুন

পশ্চিম বঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল মুক বধিরদের প্রদর্শিত জব্যাদি। টেলের পরিচালন, বিক্রয় প্রভৃতিও ইহারাই করিতেছে। মুক-বধিররা পরস্পরে মধ্যে অন্তস্ত সহজভাবে আলাপ আলাচিনাও করিতেছে। ইহাদের বহুত প্রস্তুত জব্যবৈচিত্র্যও নিখুঁত ও প্রশংসনীয়। একটি টেলে বিজ্ঞাপন

দেখিয়া অনুসন্ধানমে জানিলাম, ৫০ নং বড়ল রোডে (বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১২) মুক-শিক্ষার একটি আধুনিক ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সহজ ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ভোৎসামি সারানো হয়। এই টিকানার শ্রীনলিনীমোহন মজুমদারের নিকট বিশদ বিবরণ জ্ঞাতব্য। এইরূপ সংস্থা বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহাতে সহজেই এই চিকিৎসার সুযোগ লাভ করা যুগম হয়।

## 'লোটা পার্ক'—জিয়াগঞ্জ :

জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সুপরিচিত বাগানবাড়ী 'লোটা পার্ক'টি ঐতিহাসিক মর্যাদামণ্ডিত। ভারত ও বহির্ভারতের বহু বরোধ্য দেশ ও ধর্ম্মনৈতার পুণ্য পাদম্পর্শ এই স্থানটি পবিত্র ও ধন্য। একদা এই পার্কের ক্ষুদ্র একোটে বসিয়া স্থানীয় বহু পুণ্ডবনারী বেশ ও সমাজসেবার প্রেরণা পাইয়াছেন এবং জাতীয়

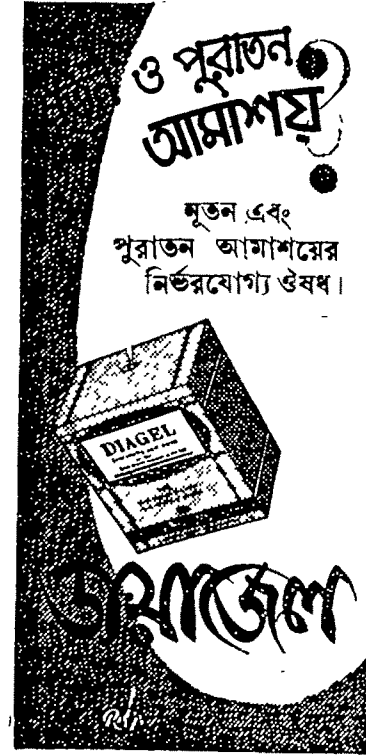
মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়া হুঁসিধুখে নির্যাতন, কারাবাস ও অন্তরীণ সহ্য করিয়াছেন। আমরা জানিরা হুঁদী হইলাম যে, সম্প্রতি এই পার্কের অন্ততম মালিক প্রবর্তক সম্বন্ধে দীক্ষিত সম্মান মহৎ-প্রাণ শ্রীজগৎসিং লোটা তাঁর নিজাংশ প্রায় সাড়ে সাত কাঠা পরিমাণ জমি গৃহনসমত সমাজকল্যাণের জন্য একটি টাউ বোর্ডের হাতে দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি পার্ক, লাইব্রেরী, ক্লাব ও আধুনিক ব্যায়ামাগার স্থাপন। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসিবৃন্দ দেশবাসীর নিকট সর্বপ্রকারের সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইরাছেন। আমরা আশা করিব, দেশবাসী তাঁহাদের এই কল্যাণ ও সেবামূলক কর্মে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন।

### নলহাটির শ্রীশ্রীললার্টেম্বরী :

ভারতের একান্ত মহাপীঠের অন্ততম নলহাটি। শ্রীশ্রীললার্টেম্বরী পার্কবর্তী মাতা এখানকার অধীশ্বরী। ভৈরব যোগেশের মন্দিরও সন্নিকটেই বর্তমান। চমৎকার নিরিখিলা ষটবৃক্ষের ছায়াশীতল স্থানটি। এখানকার মন্দির তত্ত্বাবধায়কের অমায়িক বিনয়নম্র ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সুদূর অতীতকালে বহু অর্থব্যয়ে যাতীমিবাস সহ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। দীর্ঘকাল সংস্কারভাবে মন্দিরগুলির বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইরাছে। ইহা অনিশ্চিত যে, মন্দিরগুলি একবার মঠ হইয়া গেলে আর পুনর্নির্মিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুপ্রাচীন ভারতের ঐক্য ও ঐতিহ্যের স্মৃতি এখনও ইহা বহন করিয়া চলিরাছে। ইহার বাহক যারা তাঁরা যুগ-প্রত্যাব-প্রলোভনের মধ্যেও দারিদ্র্য জেতঃ করিয়া এই ঐতিহ্যকে ধরিয়া রাখার তপস্বী করিয়া চলিরাছেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছে "এ বিবরে সাহায্যের আশা কম। রয়দী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কিছু কিছু সাহায্য করিলেও মন্দিরগুলি পুনরায় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। এই সংস্কারকাণ্ড সাধনের জন্য একটি স্থানীয় কমিটিও গঠিত হইরাছে।

কমিটির পক্ষে শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী (পোঃ নলহাটি, বীরভূম) দেশবাসীর নিকট সাহায্যের জন্য আকুল আবেদনও জানাইরাছেন। আমরা আশা করিব, যে যেখানেই থাকুন এই আবেদনে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইয়া এই মহৎ কার্য সাধনের ও স্থাচীন ঐতিহ্য রক্ষার সহায়ক হইবেন।

শ্রীসমরজিৎ কর



**নিবেদন :** প্রেমের আভ্যন্তরীণ অপরিহার্য অঙ্গবিধার জন্য প্রবর্তক প্রকাশে ও উহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য দুঃখিত। পত্রিকাখানিকে নিয়মিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে।

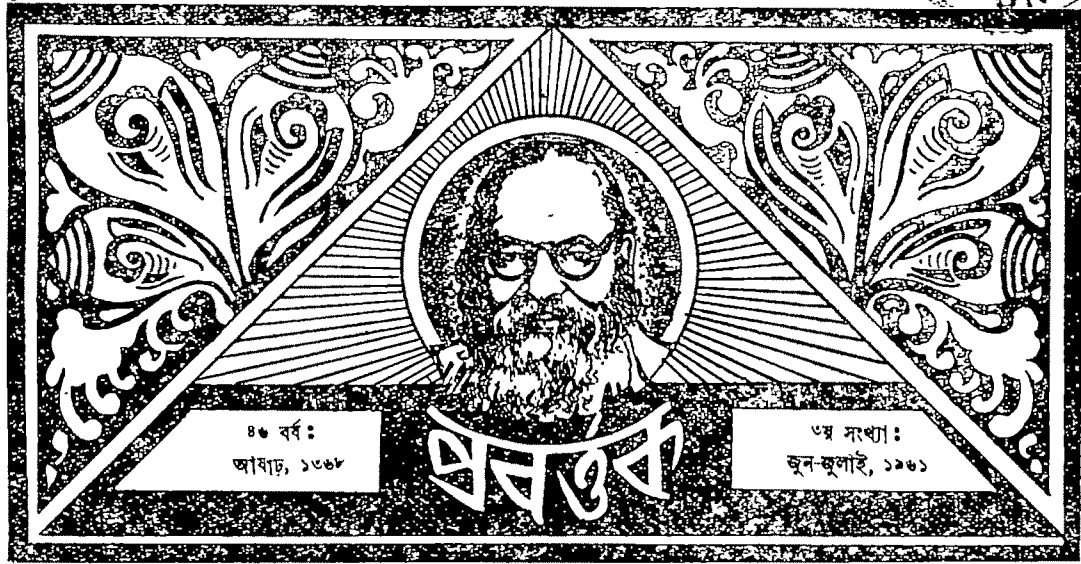
- গ্রাহকগণের মধ্যে যাদের নিকট প্রবর্তকের দক্ষিণা এখনও অনাদায়ী আছে, আমরা আশা করিব, তাঁহারা উহা যথাসীত্র এক বা একাধিক কিস্তিতে পাঠাইয়া দিয়া পত্রিকা পরিচালনে সহযোগিতা করিবেন।



**সম্পাদক :** শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২১৩, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকপিলকৃষ্ণ রাধ কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

স্বভাবের সহজ গতির জ্ঞান করার কিছু নেই। মানুষ পেট থেকে পড়ে যা চায়, তা পেয়ে গর্ক করার তো কিছুই নেই। জীবনে পেতে হবে অসাধারণকে। জগতের উজ্জ্বল পথে চলেই জীবনকে অসামান্য করে তুলতে হবে। মানুষের ধর্ম ঈশ্বরের দিকে চেয়ে চলা। জীবন-মরণের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর পথেই নিয়ে যাচ্ছেন, ঈশ্বরে এমনি বুদ্ধি স্থাপন করতে হয়। বার বার জগতের মায়া সংশয় সৃজন করে, বার বার তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অতীতেও যেমন চিন্তা ক'রে, তাবনা ক'রে, কোণাল ক'রে অবশুস্তাবীকে নিবারণ করতে পার নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। এজ্ঞত একান্ত নির্ভর কর ভগবানে, ভগবানের নামে। ভাগবত-কর্মে আত্মদান কর। এ ছাড়া আর পথ নেই। যারা তাঁর নাম করে তন্ময় হয়ে আব তাঁরই কাজ করে প্রেমের দায়ে ফলাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিবে তাদের বিনাশ নেই। 'প্রতিজ্ঞানিহি'—ভগবান গলা উচু করেই এ আশ্বাস দিয়েছেন। ঈশ্বর-বাক্যে বিশ্বাস কর। ঈশ্বরমুখী হও। মনটা ছ'মুখো সাপের মত। কিন্তু এই ছ'মুখো সাপও দুটো মুখ একসঙ্গে ব্যবহার করে না। একটা মুখ যখন খোলে অচুটা বন্ধ থাকে। তোমরা কি এই বৃকে-হাঁটা সাপের মত হবে? একদিক অনন্ত যুগের জ্ঞান বন্ধ কর। মনটার স্বভাব ও আকার পরিবর্তন করে একটা অভিনব চরিত্র লাভ কর। মনের ছ' দিকে ছুটে চলার স্বভাব আমাদের সাপের মতই খল ও প্রতারক করে তোলে। কেবল আকারে নয় স্বভাবেও মানুষের মত মানুষ হও। মানুষ ভগবানের বিগ্রহ মূর্তি। সচ্চিদানন্দ ভগবান বাক্য মনের অগোচর, কিন্তু মানুষকে আশ্রয় করেই তিনি মূর্ত হন। মর্ত্যের জীবনে যদি এই সত্য স্বপ্ন হয় তবে এই অনীশ জীবনের সার্থকতা কি? মানুষ জীবনের গৌরব যা, তা এই পশু জন্মের সংস্কারে হারিও না। ইহাই তো মানুষের ধর্ম। ধর্ম তো দেবতার চরণে মান্য করা নয়। ঐ, জন্মজন্মান্তরের বন্ধন ছাড়। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, মায়া দ্রাস্ত। ছ'মুখো সাপের মত এক মুখে ঈশ্বরের নাম, অগ্র মুখে বিষ্ঠা ভোজন করে না। একনিষ্ঠ হও। ইহাই আলোর পথ।

[ ১৯৩০ সালের দিনলিপি হইতে সংকলিত ]

সঙ্কলন শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং । ) অষ্টমী ঋক্

( সপ্তমগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

অষ্টৌ ব্যধ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাজ্ঞী ধম্ব যোজনা সপ্ত সিদ্ধূন ।

হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবঃ আগাদধদ্রত্না দান্তুষে বার্য্যানি ॥ ৮ ॥

অর্থ—“সবিতা” (সবিতৃদেব) “পৃথিব্যাজ্ঞী” (পৃথিবীর) “অষ্টৌ” (আট) “ককুভঃ” (দিক সকল) “যোজনা” (প্রাণিগণকে স্ব স্ব ভোগে যোজনাকারীগণকে) “ত্রিধম্ব” (ত্রিলোক—ভূলোক, ত্বলোক ও অস্তরীক্ষ লোক) “সপ্ত সিদ্ধূন” (সপ্ত সমুদ্রকে) “বি-অধ্যৎ” (বিশেষরূপে প্রকাশিত কবেন) “হিরণ্যাক্ষঃ দেবঃ” (হিরণ্ময় চক্ষুবিশিষ্ট দেব সবিতা) “আগাৎ” (আগমন করুন) “দান্তুষে” (হবি প্রদানকারী যজমানকে) “বার্য্যানি” (বরণীয়) “রত্না” (রত্ন সকল) “দধৎ” (প্রদান করুন) ॥ ৮ ॥

সরলার্থ—সবিতৃদেব পৃথিবীর অষ্ট দিক, যোক্তৃগণ, ত্রিলোক এবং সপ্ত সমুদ্রকে প্রকাশিত করেন। হিরণ্ময় চক্ষুবিশিষ্ট সবিতৃদেব আগমন করুন—হবি প্রদানকারী যজমানকে বরণীয় রত্নসকল প্রদান করুন।

বিশদার্থ—পূর্বে ঋকে ঋষি প্রস্তুতুলিয়াছেন—রাত্রিকালে সূর্য্য কিরণসমূহ কোথায় অবস্থান করে? ঋতিতে ইহার যোগ্য উত্তর মিলিবে। “মরীচষোহর্কস্তাপ্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিন্ভ্রোহ্মণ্ডলে একীভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি”—অন্তগামী সূর্য্যের কিরণরাশি সূর্য্যমণ্ডলে একীভূত হয় ও পুনরায় সূর্য্য উদযোন্মুখ হইলে সেই কিরণসমূহ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়। এই ঋকমন্ত্রেও ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণরূপে নিত্য উদয়াস্তমান্ যে সবিতাকে দেখা যায়, তাহা মূল আদিত্য বা সবিতা নহে। কারণ মূল সবিতা যিনি সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্তী দেবতা—তাঁর উদয়ও নাই, অস্তও নাই, উহা নিত্য, শাশ্বত ও চির ভাস্বব। লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণ এই তিনটি রূপ হইতেছে তেজের গুণ। দিবালোক ও অন্ধকার এই গুণেরই খেলা এবং ইহা বায়ুমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। মূল সবিতা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধে অবস্থিত। ঋতির ভাষায় যাহা ভ্রোহ্মণ্ডল বা জ্যোতিষ্মণ্ডল, বেদ-মন্ত্রে তাহাই সবিতা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সবিতা হইতে ক্রমনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত সাতটি বায়ু স্তর আছে—জীব-জগৎ সর্ব্বনিম্ন বায়ুস্তরে বর্ত্তমান। ইহারই অপর নাম পরিবহন্তর। দৃশ্যমান জিহ্বা ও জিহ্বাযুক্ত সূর্য্য এই পরিবহন্তরেই অবস্থিত। প্রাকৃতিক নিয়মাত্ম্যায়ী দিবা ও রাত্রির মাধ্যমে পরিবহন্তরের সূর্য্য মূল সবিতার মধ্যেই পর্য্যায়ক্রমে একীভূত হইয়া যায়, আবার অপর দিকে বিচ্ছুরিতও হয়। দিবারাত্রির প্রাকৃতিক ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মূল সবিতা চিরোজ্জ্বল। তাহার দীপ্ত আলোকে সপ্ত সিদ্ধু পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর প্রাচ্যাতি চারিটি দিক এবং আগ্নেয় চারিটি বিদিক—ত্রিলোক এবং যোক্তৃগণ সমস্তই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইনিই হিরণ্ময় চক্ষুবিশিষ্ট। ঋষিবৃন্দ ইহাকেই যজ্ঞক্ষেত্রে আবাহন করিতেছেন। ইহারই নিকট সর্ব্বসম্পদ প্রার্থনা করিতেছেন।

# গীতার শিক্ষা

ত্রীসাহাজী

অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ কবিয়াছি বলিয়া প্রতীচ্য মনীষীরা আমাদের কতই না বাহবা দিতেছেন, এইরূপ ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার দিন আজিও আইসে নাই। জগতে কে কী বলিতেছে, না বলিতেছে, তদ্বারা প্রভাবিত হওয়া দাসমনোবৃত্তির কার্য। কোনও স্বাধীন জাতিরই ঐরূপ মনোবৃত্তির দ্বারা অস্থপ্রাণিত হওয়া উচিত নয়। অহিংসার ক্ষেত্রে অহিংসা করুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া হিংসার ক্ষেত্রে অহিংসা করিতে যাওয়া, আর জাতির মৃত্যুর পথ সুপ্রশস্ত করা দুইই একই কথা, ইহা ভুলিয়া যাওয়া বস্তুতই অজ্ঞায়।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ক্ষাত্র সভ্যতার পতন হয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 'পোয়াবারো' তাহারই ফল; বৌদ্ধধর্ম ঐ ধর্মের সর্বশেষ পরিণাম। বুদ্ধের ধর্ম আমাদের জাতীয় সত্তার মূলে যে নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে, পূর্বাণ পাঠকমাত্রেরই সে কথা আশা করি জানা আছে। চক্রপ্রবর্তক অশোকের আমরা যতই প্রশংসা করি, বস্তুত কিন্তু হিন্দুধর্মেরই অবদান। চণ্ডাশোকের সৃষ্টি না হইলে ধর্মশোকের অভ্যুদয় ঘটিত না, ইহা ঐক্য সত্য। সূতরাং বৌদ্ধদের দ্বারা ঐ প্রকার ভুল আমরা পুনরায় যেন না করিয়া বসি, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা আমাদের একান্ত আবশ্যক। যে জাতি ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না করে বা না করিতে পারে, তাহার দুঃখ কোনওদিনই ঘুচিবার নয়। এ বিষয়ে মহামতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গীতার ৩য় অধ্যায়ে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন:—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেষ্টহং।

সংকরস্ত চ কর্তা শ্রাম উপহৃত্য ইমাঃ প্রজাঃ ॥

এখানে, কর্ম (১) = ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য অর্থাৎ স্বকর্ম বা স্বধর্ম।

সংকর = বর্ণসংকর অর্থাৎ নিম্ন বর্ণের নির্দিষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যে অশ্র বর্ণের নির্দিষ্ট কর্ম গ্রহণ করে, সে। বলা বাহুল্য, বর্ণসংকর জাতিজন্মের দ্বারা হয় না, হয় গুণকর্মের দ্বারা। 'চাতুর্বর্ণ্যঃ মন্যাস্থঃ শ্রাকর্ম-

বিভাগশঃ' ইহা গীতারই উক্তি। সূতরাং বর্ণের সৃষ্টি যদি গুণকর্মের দ্বারা হইয়া থাকে; বর্ণসংকরের সৃষ্টিই বা তাহা হইলে গুণকর্মের দ্বারা না হইয়া জাতিজন্মের দ্বারা কেন হইবে?

সূতরাং শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহজ নির্গলিতার্থ এই যে, হে অর্জুন! অহিংসা পরম ধর্ম, সে কথা আমি বিলক্ষণ বুঝি, কিন্তু তথাপি যেহেতু আমি বর্ণত ক্ষত্রিয়, সেই হেতু ছুটির দমন আর শিষ্টের পালন রূপ ক্ষত্রোচিত কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজ রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। এরূপ অবস্থায়, আমি যদি ব্রাহ্মণের আচরণীয় অহিংসাধর্মের মাহাত্ম্যে বিভ্রান্ত হইয়া আমার নিজ বর্ণোচিত ধর্মযুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয় কর্ম পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি যে শুধু নিজেই বর্ণসংকর হইব, তাহা নয়, পরন্তু আবও সহস্র সহস্র বর্ণসংকর সৃষ্টিরও কারণ হইব। কেননা, যেহেতু আমি সমাজের নেতা, সেই হেতু আমার দেবাদেখি অন্তান্ত ক্ষত্রিয়েরাও তখন ক্ষত্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অহিংসক ব্রাহ্মণের বৃত্তিই অবলম্বন করিবে এবং বলিতে কী তাহা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ,

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তং তদ্ এবৈতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ্ অনুবর্ততে ॥

যাহা হোক, ইহার ফলে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে শুধু যে সমাজই তখন অরক্ষিত হইয়া পড়িবে, তাহা নয়, পরন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে তাহার ফলে উক্ত বর্ণের জীবিকারও তখন হানি ঘটিবে। রামায়ণে দেবী ও যাম, শূদ্রকরাজ শম্বকের চেষ্টার ফলে দক্ষিণ ভারতের শূদ্রেরা ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করায় তদ্রূপে কোনও ব্রাহ্মণ পুত্রকে জীবিকার অভাবে সে সময়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল। ফলে, উত্তর রামকে তখন বাধ্য হইয়াই উক্ত শূদ্রকরাজের প্রাণদণ্ড বিধান করিতে হইয়াছিল। বলিতে কী, ঐ প্রকার বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে শ্রেণী: সংঘর্ষের উৎপত্তি হইলে সমাজ কি তখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে না? সূতরাং আমিই কি তখনকার সেই লোকক্ষয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইব না?

সেইজন্ম আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অহিংসা ধর্মের সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াও ইচ্ছা করিয়াই উহা গ্রহণ করি নাই এবং নিজের ক্ষত্রিয়বৃত্তিতেই অবিচলিত রহিয়াছি। প্রকৃত কথা এই যে, অকাবণ যুদ্ধ অবশ্য পরিত্যজ্য এবং অকাবণ যুদ্ধই অন্তায় যুদ্ধ; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মযুদ্ধ কদাচ পরিত্যজ্য নয়, সমাজরক্ষার্থে উহা অবশ্য কর্তব্য। মনস্বিনী শ্রীপদ্মী পর্যন্ত বলিয়াছেন : ‘অবধ্যকে বধ করিলে যেরূপ পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও ঠিক সেইরূপ পাপই হইয়া থাকে।’ পাণ্ডবমহিষীর এই বিচক্ষণতা বস্তুতই লক্ষ্য করিবার মতন।

বলিতে কী, পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পড়িয়া রাজচক্রবর্তী অশোক সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই, যে ভুল শ্রীকৃষ্ণ অতি সহজেই এড়াইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি তাহা কোন মতেই এড়াইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। ফলে, বৌদ্ধপূর্ববর্তী যুগে যেখানে আমরা শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মহামানবগণকে সমাজের নেতৃত্বরূপে আবির্ভূত দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে সেইখানে আমরা শংকর এবং চৈতন্যের ছায় সংসারবিমুখ সন্ন্যাসিগণকেই তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত দেখি। রাষ্ট্রে এবং সমাজে ইহার যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার বিষময় ফল আজিও আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। শ্রীমদ্বাথপ্রভু তাঁহার অসামান্য ধীশক্তিবলে সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্ম শ্রীকৃষ্ণকেই সমাজের সম্মুখে আদর্শ খাড়া করিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ বামাচাবে দেশ তখনও সমাচ্ছন্ন; কাজেই, স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া বড় দুঃখেই দরদী নিতাইকে তিনি কাদিয়া বলিয়াছিলেন :

আমায় ধর নিতাই।

আমায় সঞ্চিত ধন ফুরাইল,

জীব উদ্ধার না হইল,

শুণের দায়ে আমি এখন

বিকাইয়া যাই।

অধিক কী, তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যরাও তাঁহার সেই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিত্যানন্দের সংসারবীণ আদর্শ বৈষ্ণবসমাজে যে প্রাধিক

লাভ করিতে পারে নাই, উহাই সে কথার প্রমাণ। তথাপি বৌদ্ধ ইজ্ঞাজালে সম্মোহিত সমাজে তখনকার দিনে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই অদ্বৈতপূর্ব।

যাহা হোক, এক্ষণে কথা এই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের বৃত্তি সমধিক লাভজনক, সেই বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্ত বৈশ্বকর্ম ভাগ লোকেবই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বর্ণসংকর সৃষ্টির আশংকা সমাজে সর্বদাই বিद्यমান। সমাজপতিরা সেইজন্মই তখন—‘যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাকে সেই বর্ণের বৃত্তিই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিলে চলিবে না’—এইরূপ আইন করিয়াছেন। গীতাব ১৮শ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোক—

[ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরম্পর। কর্মণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু নৈঃ ॥] হইতে ৪৮ শ্লোক [শ্রেয়ান্ স্বধর্মো-বিগুণঃ পরধর্মাং সমুত্তিতাং। স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥] পর্যন্ত সে কথার প্রমাণ।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উক্ত আইনের দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, ব্রাহ্মণকূলে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকূলে জন্মিলে শুধু ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকারটুকু মাত্রই পাওয়া যায়, এই মাত্র। পরে অবশ্য সাধনার দ্বারা সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হয় এবং তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। নতুবা, জন্মের দ্বারা বর্ণক লাভ হয়, এমন কথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা কোথাও বলেন নাই। জাতি বলিতে ইদানীং আমরা যাহা বুঝি—ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিখিরাম সিং—তেমন জাতি আমাদের দেশে কোনওদিনই ছিল না, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন, আজিও নাই। সুতরাং মিছামিছি ছুঁৎ-ছুঁৎ খুঁৎ-খুঁৎ করিয়া লাভ কী?

মালিকমজুরের সমস্তাই বলুন, আর খেত-কৃষকের সমস্তাই বলুন, সবগুলিরই মূল জীবিকার্জনের সমস্তা; সুতরাং বর্ণ বা বৃত্তিসমস্তা সবগুলিরই গোড়ার কথা। কাজেই, উহা নিবারণ করিতে হইলে বর্ণকে জাতিজন্মগত করা ছাড়া তখন আর উপায় কী? ইহার দ্বারা আর কিছু না হউক, শ্রেণী সংঘর্ষ যে তখন নিবারণিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত ঐ আইনের মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে উহার দ্বারা আদৌ আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয় নাই। মনে করুন, কোনও ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় পত্নী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান পিতার দিক দিয়া ব্রাহ্মণ হইলেও মাতার দিক দিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তিগ্রহণেও দাবী করিতে পারে এবং করিলে তাহাকে তখন বাধা দিবার উপায় নাই। যেমন, পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও মাতা ক্ষত্রিয়ানী বলিয়া পরশুরামেরা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণপূর্বক দুই একবার নয়, একুশ-একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইনে ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে কোনও বারই তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সংঘর্ষের সেই শোচনীয় কাহিনীর পুরাণপাঠ করিলে কাহার না হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে! মহর্ষি কশ্যপ ঠিকই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা যদি পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে স্নেহের প্রবল হইয়া উঠে। ফলে, বেদপাঠ, দধিমন্ধান ও সুপ্রজ্ঞনাদি জনহিতকর আধিক্যগুলিও তাহা হইলে সমাজ হইতে এককালীন উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

গীতার ১ম অধ্যায়ে অর্জুনকে সেইজন্যই আমরা বলিতে শুনি : হে কৃষ্ণ! কোরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যদি যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হওয়া অবশ্যস্বাবী এবং সেক্ষণে হইলে ক্ষত্রিয়সমাজে পুরুষের একান্ত অভাব ঘটবে। কাজেই, ক্ষত্রিয়রমণীগণকে তখন বাধ্য হইয়াই তিন বর্ষের পতি গ্রহণ করিতে হইবে; উহার অবশ্যস্বাবী ফল বর্গসংকরের ব্যাপক উৎপত্তি।

কুলক্ষয়ে প্রণশাস্তি কুলধর্মঃ সনাতনঃ।

ধর্মে নষ্টে কুল ক্লেশমধর্মোভিভবত্যত

অধর্মাভিভব্যাং কৃষ্ণ! প্রত্যাশ্চি কুলপ্রিয়ঃ।

জীবী দুষ্টাস্থ বাঞ্ছ্যে! জ্ঞানতে বর্গসংকবঃ॥

ক্ষত্রিয়ানী ক্ষত্রিয় পতি গ্রহণ করিবেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের চিরচিরিত কুলধর্ম। এরূপ অবস্থায়, ক্ষত্রিয়ক্ষয়হেতু তাঁহাকে যদি অসবর্ণ পতি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তদ্বারা কি ক্ষত্রিয়ের কুলধর্মেরই ব্যতিক্রম হয় না?

কুলধর্মের ঐরূপ ব্যাপক ব্যতিক্রম হওয়া, আর সমস্ত কুল অভিভূত হইয়া পড়া, দুইটিই একই কথা। ‘প্রত্যাশ্চি’ পদটির অর্থ এখানে অসবর্ণ বিবাহজনিত দোষে দূষিতা হওয়া। সেইরূপ ‘দুষ্টাস্থ’ পদটির অর্থও এখানে ব্যভিচারিণী হওয়া নয়, পরন্তু অসবর্ণ বিবাহহেতু মর্ধ্যদাপ্রাপ্ত হওয়া, এইমাত্র (২)।

বাহা হোক, পূর্বোক্ত আইনের ঐ ফাঁক বন্ধ করিবার জন্যই সমাজপতিগণকে সে সময়ে ‘ন জী স্বাতন্ত্র্যম্ চার্হতি’ এইরূপ নির্দেশ জারি করিতে হয়। জীজ্ঞাতির স্বাতন্ত্র্য লুপ্তির উহাই গোড়ার কথা। এইরূপে সমাজে জীজ্ঞাতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গেলে তখন যে পিতৃকর্তৃত্ব-প্রধান সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অস্তায় নয়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পরশুরামেরাই জীজ্ঞাতির বর্তমান অধোগতির জন্ত সর্বাধিক দায়ী। পুরাণে সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, পরশুরাম মাতৃহত্যা করেন, কিন্তু মাতা মরেন না, পিতার বরে পুনরায় বাঁচিয়া উঠেন। অর্থাৎ মাতৃকর্তৃত্বপ্রধান সমাজের তাঁহারা অবসান ঘটান, এইমাত্র। তবে, একথা অবশ্য সত্য যে, ঐ অপকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাদেবকে ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কার ভার গ্রহণ করিতে হয়।

সে বাহাই হউক, ইহার দ্বারা স্পষ্ট হয় এই যে, অতঃপর কোনও পুরুষ যে বর্ষের জীই গ্রহণ করুন না কেন, ঐ জীই নিজের কোনও স্বাতন্ত্র্য না থাকাতে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান তখন পিতার বর্ণমাত্রই পাইবার অধিকারী হয়। এইরূপে বর্গসংকর সৃষ্টির সকল আশংকাই তখন তিরোহিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহা অল্প লাভের কথাও নয় (৩)।

ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান যদি ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যে ব্রাহ্মণের দাবী করিতে পারেন নাই, উহাই তাহার কারণ। সর্বশেষ পরশুরাম ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিলে উত্তররাম যে তখন তাঁহার দর্পচূর্ণ করিতে, পক্ষান্তরে, শূত্রকরাজ ব্রাহ্মণ শূত্র সংঘর্ষ বাধাইবার উপক্রম করিলে তখনও যে তিনি তাঁহাকে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও এই আইনেরই জোরে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রেণীসংঘর্ষ অর্থাৎ বর্গসাংকর্য

নিবারণের জন্য জীজ্ঞাতিকে সে সময়ে বড় অল্প মূল্য দিতে হয় নাই। ঐরূপ স্বার্থভাগ জীজ্ঞাতি ভিন্ন পুরুষ জাতির দ্বারা সে সময়ে হইত কিনা সন্দেহ।

### কুংচিকা

(১) বলা বাহুল্য, গীতোক্ত ঐ কর্ম নিত্যকর্ম নয়। কেননা, নিত্যকর্ম যে পরিত্যাগ করা যায় না, গীতাকার তাহা বিলক্ষণ জানেন। তাহার ‘নহি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকুং’ এবং ‘শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রযিধ্যোদ্ অকর্মণঃ’ ইত্যাদি উক্তিই সে কথার প্রমাণ। অতএব ঐ প্রকার কর্ম সম্বন্ধে ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য করার কোনও কথাই উঠিতে পারে না। গীতোক্ত ঐ কর্ম যে সামাজিক কর্ম, ইহা হইতেই সে কথা বুঝিতে পারা যায়। স্বকর্ম বা স্বধর্ম বলিতে অধ্যাত্মবাদীরা আমাদেরকে আত্মার ধর্ম বা আত্মার কর্ম বুঝাইয়া আসিয়াছেন। ফলে ঐ দুটিই শব্দের স্থূল সহজ অর্থ ইদানীং আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। ‘স্ব’ বলিতে তাহারা আমাদেরকে আমাদের প্রত্যক্ষ স্থূল সম্ভার পরিবর্তে পরোক্ষ যে স্বপ্ন সম্ভা, তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এইমাত্র। গীতা সামান্ত গ্রন্থ নয়, অধ্যাত্ম গ্রন্থ, এইরূপ ধারণা জন্মিলে ঐরূপ too far fetched অর্থই যে তখন হৃদয়গ্রাহী হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃত কথা এই যে, গীতা মূলত রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানের অত্যাংকুষ্ঠ গ্রন্থ। এবং যাহা রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানের অত্যাংকুষ্ঠ বিষয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে তাহার তুল্য উপযোগিতা দৃষ্ট হইবে, তাহাও অসম্ভব নয়। গীতোক্ত বিষয়গুলিকে সহজ দৃষ্টিতে অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা এক্ষণে যে অত্যন্ত আবশ্যক, সে কথা আশা করি বলাই বাহুল্য।

(২) অথচ, গীতার ভাষ্যকারেরা কিন্তু দেখা যায় ঐ প্রকার ‘ব্যভিচারিণী হওয়া’ অর্থই করিয়াছেন। জননী, জামা, ভগিনী ও কন্যাজাতীয়াদের সম্পর্কে তাহাদের ঐ প্রকার হীন ধারণা অত্যন্ত আপত্তিকর। বিশেষ, যে ক্ষত্রিয় রমণীরা রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতির দ্বায় মহাপুরুষগণের প্রসবিদ্রী, তাহাদেরই সম্পর্কে ঐ প্রকার হীন ধারণা পোষণ করা আমরা শুদ্ধাক্ষরিক বলিয়াই মনে করি।

(৩) পূর্বে জীজ্ঞাতির স্বাতন্ত্র্য ছিল। মহাত্মারতে সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী পরশুরামেরা পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে ক্ষত্রিয়রমণীবা তখন বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকটে অভিগমন করিতেন এবং সমাজে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল বলিয়া তাহাদের গর্ভজাত ঐ সকল সম্ভান তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য না হইয়া মাতার বর্ণাঙ্কধারী ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়জাতির পুনরুত্থান সে সময়ে সম্ভব হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ঐরূপ হওয়া আর সম্ভব হয় নাই। কেননা, ‘ন জী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি’ আইন জারির ফলে অতঃপর ক্ষত্রিয়রমণীদের গর্ভে তাহাদের অসবর্ণ পতিগণের ঔরসে যে সকল সম্ভান সম্ভতি জন্মিয়াছিলেন, তাহাদের আর তখন ক্ষত্রিয় হওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারতে ক্ষত্রিয় জাতির অসম্ভাবের উহাই সর্বপ্রধান কারণ। অনন্তর বৌদ্ধধর্মের ঋপরে পড়িয়া উহাদের যে সমূলে বিনাশ হয়, তাহাও অসম্ভব নয়। একথা অবশ্য সত্য নয় যে, অসবর্ণ পিতামাতার ঔরসে জন্মিলেই বর্ণসংকর হইতে হয়; নিজের পৈত্রিক বৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে বর্ণসংকর বলা যাইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্ণ জাতিজন্মগত নয়, গুণকর্মগত, এই মাত্র। তবে, এ কথাও অবশ্য খুবই সত্য যে, বর্ণসংকর সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, ইহাই অসবর্ণ বিবাহের সর্বপ্রধান দোষ। কিন্তু ‘ন জী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি’ আইনের বলে জীজ্ঞাতির স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গেলে তখন যে জীপুরুষের অসবর্ণ বিবাহের পথ সুপ্রশস্ত হইয়া যায়, তাহাও স্বাভাবিক। কেননা, পূর্বে বর্ণসংকর সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বলিয়া অসবর্ণ বিবাহের বিরোধিতাই করা হইত বেশী। উক্ত আইনের এই ভাল দিকটিও লক্ষ্য করিবার মতন।

### উপসংহার

সমাজ রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় জাতির প্রয়োজন যদি স্বীকৃত হয়, যুদ্ধেব প্রয়োজনও তাহা হইলে অনস্বীকার্য। নীতি হিসাবে যুদ্ধ অবশ্যই পরিত্যজ্য; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মযুদ্ধ কদাপি পরিত্যজ্য নয়। ছুটির দমন আর শিষ্টের



# কালীকঙ্কর

(পূর্বানুবৃত্তি)

জেলেও থাকতে পারলুম না বেশীদিন।

দেশব্যাপী আন্দোলনের চাপে খুলে গেল জেলের দরজা। খুলতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ এক বৎসর যেতে না যেতেই। এই এক বৎসরের একদিকের ইতিহাস পাওয়া যাবে “কালীকঙ্করের কারাবাসের ডাইরী” থেকে। — ডাইরী আমার লেখা নয়। লিখেছিল আমার কারা-বন্ধু রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী। আমার একনিষ্ঠ সহ-কর্মী রাজু। আমার নাম দিয়েও ওটা প্রকাশ হয়ে গেল রাজুর একান্ত অহুরোধে।

ও-কালীকঙ্কর রাজুর দেখা। রাজুর মন-গড়া এক কালীকঙ্কর।

...মনে পড়ে সেদিনের কথাগুলি। কালিদার কারা-জীবনের দিনলিপি প্রায় শ'খানেক পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছি গোপনে। একদিন অকস্মাৎ ধরা পড়ে গেলুম।

—এসব কি হচ্ছে? কালিদার চোখে শাসনের কাটিছ।

—কালীকঙ্করের কারাবাসের ডাইরী। আমি সহজ জুরে বল্লুম।

—ছিঁড়ে ফেলে দে। ও-সব মিথ্যে।

—আমার চোখ দুটো তো মিথ্যে নয়। চোখে যা দেখছি তাই লিখে যাচ্ছি।

—চোখের দেখাটাই শেষ দেখা নয় রে রাজু!

কালিদার চোখে একটা সঙ্কল্প বেদনার ছায়া। কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে মুখ নীচু করে।

পরিস্থিতিটা পরিহাস তরল করবার জন্তই বল্লুম,— চোখের অগোচর যা সেতো আমার দেখবার কথা নয়। সেটুকু তোমার। ইচ্ছা হলে পরে সংযোজন করে দিও। কিন্তু দয়া করে বাধা দিও না এখন।

দীর্ঘ পদে চলে গেলেন কালিদা আমার ঘর থেকে। যেতে যেতে শুনলুম তাঁর আশ্রয় কঠোর আবৃত্তি :

এই করেছ ভাল নির্ভর এই করেছ ভাল

এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বাল।

সেবার দেখেছিলুম কালিদার গভীর রাত অবধি গীতা উপনিষদ নিয়ে কসবৎ। আসন প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের মহড়া। উপবাস, লজ্জন, বাক্‌সংযম, আরও কত কি। মোটের উপর এই বৎসরটা ছিল কালিদার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতির কাল। আত্মশোধন,

পালন, ইহাই রাজধর্ম। কুশাসনের ফলে রাজ্যে দুইটির সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায়, যুদ্ধের সম্ভাবনাও তাহা হইলে বাড়িয়াই যায়। কিন্তু কুশাসনের ফলে শিষ্টের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও তখন কমিয়াই যাইবার কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও আমরা দেখিতে পাই, অশ্রায় পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন এগার অকোহিণী, কিন্তু গ্রায পক্ষে এক্ষণে বুদ্ধিমানের কার্য। গীতার মহতী শিক্ষা আমরা কদাচ ভুলিয়া না যাই।

গ্রাযের পক্ষে দাঁড়াইতে পারিতেন, যুদ্ধ তাহা হইলে নাও বাধিতে পারিত। বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ সম্মেলন রাষ্ট্রসংঘের দিকে তাকাইলেও আমরা দেখিতে পাই, সেখানেও ভণ্ডের সংখ্যা বেশী। একরূপ অগ্ন্যায়, অলীক আদর্শবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া বাস্তব বুদ্ধি খাটাইয়া চলাই এক্ষণে বুদ্ধিমানের কার্য। গীতার মহতী শিক্ষা আমরা কদাচ ভুলিয়া না যাই।

আত্মগঠনের কাল। এই প্রস্তুতিব ফলেই তো কালিদাস নেতৃত্ব।

“কালীকঙ্করের কাব্যজীবন” যখন প্রকাশিত হল তাব প্রথম কপিটা আমি নিজহাতে শুঁকে পৌছে দিতে গিয়েছিলুম। আশা ছিল ও হয়তো খুশি হবে। ধন্যবাদ দেবে আমাব সাধু প্রচেষ্টাকে।

কিন্তু কালিদা বইখানা হাতে করে একটু হাসল। সে এক দুর্বোধ্য হাসি। সে হাসি তখনও যেমন দুর্বোধ্য ছিল আজও তেমনই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। অবজ্ঞাভরে একটু নাড়াচাড়া করল বইটা, তারপর ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। আমি মর্গাহত হলুম। ক্ষুদ্র অভিমানে কালো হাষে গেল সারামুখ।

ও কিন্তু তেমনই হেসে বলল,—ও-কালীকঙ্কর আমি নই। ও অন্য কেউ। হাসল আবার সেই হাসি। সে হাসি আমি ভুলিনি আজও।

দেখতে দেখতে কালীকঙ্করের খ্যাতি হল ইন্টার নাশনাল। কতো মালা, কতো চন্দন তিলক, কতো অভিনন্দন। কাগজে কাগজে কতো স্তব স্তুতি। মালা খুলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গেই। চন্দন মুছে ফেলে পথে নেমেই। অভিনন্দন পত্রগুলি জড়ো হয় আলমারীর মাথায়, পরে একদিন উই আর ইউরুর খাণ্ডে পরিণত হয়, কাগজগুলিও উন্টে দেখল না কোনদিন।

আমরা কালীকঙ্করের মাঝে দেখলুম গীতার সেই নিকাম কর্মযোগীকে, যিনি স্নেহে দুঃখে, লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে নির্গিপ্ত নির্বিকার। যিনি যুদ্ধের প্রয়োজনেই যোদ্ধা। যিনি কর্তৃত্বাভিমান বিবহিত, ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জিত সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মুক্ত পুরুষ।

এই মাছুষের উপর অভিমান থাকে না। যা থাকে তা শ্রদ্ধা। শুধু অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

সেই কালীকঙ্করের আত্মকাহিনীতে এ আমি কোন কালীকঙ্করের কাহিনী পড়ছি।

...স্বমিজার স্বতিটুকু মুছে ফেলতে পারলুম না এক বৎসরের আশ্রাণ চেষ্টাতেও। লজ্জা হল নিজের এ দুর্বলতায। গোপনে একবার গিয়ে ফুলের মালা দিয়ে এলুম স্বমিজার সমাধিপরে। ভাবলুম স্বমিজাব প্রতি

আমার শেষ কর্তব্য সমাপ্ত হল। আর কেন? স্বমিজাকে আমি বিজয়িনী করেছি, করেছি দেশপূজ্যা। সর্বোপরি তার আত্মার কল্যাণ কামনায কালীকঙ্করের মত ব্যক্তিও চোখের জল ফেলল। এইতো বথেষ্ট।

জেল থেকে ফিরে এসেছি। সম্বর্ধনার চূড়ান্ত হাষে গেছে। নিরালস্য নিজের গৃহকোণে বসে যে একটু বিশ্রাম করব সে সুযোগ বুঝি আর আসবে না জীবনে।

গোপন পরামর্শ বৈকি, প্রকাশ্য সভা, পরিকল্পনা চলেইছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন একটা মস্ত দল গড়ে উঠছে আমাকে কেন্দ্র করে। আমার ইচ্ছায় তারা ওঠে বসে। এ নেতগিরির একটা নেশা আছে বৈকি। আছে বৈকি একটা দুর্বীর মোহ।

দেশজোড়া সম্মানের দুর্ভেজ প্রাচীরে আমি এবার সুরক্ষিত। আমার স্থান যেন অবিদ্বাস্ত। পদ্মপদ্মে লাগে না জলের দাগ, হস্তী দেহে লাগে না মশক দংশন তেমনি কালীকঙ্করে লাগে না কলঙ্কের স্পর্শ। পুরুষ আমায় দূর থেকে প্রণাম জানায, কপালে বিজয় তিলক পবিষে দিতেও হাত কেঁপে ওঠে নারীর।

বত্ৰগর্ভা বলে ইতিমধ্যেই মাতৃদেবী আমার জন-জননী হয়ে উঠেছেন। একা আমাব মান আর। সর্বজনীন তিনি।

আমার কারাবাস কালে আমাব মায়ের কষ্ট ঘুচোবার জন্ত বার। অশেষ কষ্ট বরণ করেছেন, এমন কি পুলিশের সন্দেহভাজন হয়ে নানাভাবে নাস্তানাবুদ হয়েও মায়ের সেবার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখনি, কল্যাণী সোম তাদের অন্ততম। অদ্বিতীয়াও বলা চলে। অস্তুতঃ মায়ের সেই মত।

মা ওকে ডাকতেন কলু বলে। কখনও বলতেন কলি।

আমাদের প্রথম পরিচয়টা যেমন কোঁতুককর তেমনি অবিস্মরণীয় মাধুর্ষে ভরা।

—জানিস কালি, এই কলু-মা না থাকলে এবার আর আমাব দেখতে পেতিন না।

—মেয়েদের পুরুষালী নাম অনেক শুনেছি মা, কিন্তু কলু-টা বড্ড কানে লাগে। পুরো নামটা বোলো। কলিকা না কল্লনা?

খিলখিলিয়ে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। জেল থেকে ফিরে আসা অবধি দেখে আসছি শুধু গম্ভীর মুখ, গম্ভীর পরিবেশ। মাল্য চন্দন, ধূপ ধূনা, গম্ভীর বক্তৃতা আর শ্রদ্ধার ছড়াছড়ি। হাসির কলিকাটুকুও ছিল না তাতে। অতবড় একটা গণ্যমান্ন মানুষের সামনে বুঝি হাসতে মানা, কাশতে মানা। বুঝি যে কোন চাপলাই অমার্জনীয় অপরাধ।

তবে কি এই হাসির বরণার উৎসটি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অনবহিত? না কি ও আমাকে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরূপে মানতেই চায় না? হাসি থেকেই বুঝতে পারছি প্রাণ-বন্তায় চঞ্চলা কোন নারী। কে এই নারী?

হাসি থামতেই মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করল। হুঁহাতে ছ' কাপ চা।

আমার এবং মায়ের সামনে চাষের কাপ রাখতে-রাখতেই বলছে, কল্পনাও নই কলিকাও নই, আমি কল্যাণী। কল্যাণীকে কলু বলে কান লাগে, কলি বলেও লাগতে পারে। আমি কিন্তু মায়ের মুখে কলু হয়েই বেশ আছি। ভারি মিষ্টি লাগে।

বুঝলাম কল্পনা কলিকা নয়, কল্যাণী। প্রথম পরিচয়ের এ মধুর কৌশলটুকু বড় ভাল লাগল। অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে কল্যাণী। শ্রদ্ধানত অসংখ্য মানুষের ভীড় থেকে এসে এমনি একটি হাসিখুশি মানুষের সঙ্গেই যেন এতক্ষণ কামনা করেছিলুম।

মাকেই প্রশ্ন করলুম, একে তো চিনতে পারছিনে মা? কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?

—খুঁজতে হযনি। ও আপনিই ধরা দিয়েছে। তুই জেলে যাবার পর আমার সেবার জন্ত কতো ছেলেমেয়ে যে এল। আমার এইটুকু ঘরে বুঝি আর ধরে না। কোনো দুঃখ আর রইল না আমার। রইল না কোন অভাব। একে একে সবাই আবার ফিরেও গেল আমি সুস্থ হতেই। কিন্তু কলু-মা আমার হয়েই রয়ে গেল এখানে। ও আমার জন্মজন্মান্তরের মা!

—এবার দেখছি তুমি আমায় তাড়িয়েই ছাড়বে। কল্যাণীর মুখে বিব্রত রক্তাভা। অভিমানে টেঁট ফুলিয়ে বলে, অবশ্য ছেলে ফিরে এসেছে এবার তো মেয়ের আদর ফুরোবেই।

কল্যাণী চলে গেল। বুঝি অভিমান ভরেই চলে গেল।

মায়ের মুখে কিন্তু প্রসন্ন হাসি। বড় ভাল মেয়ে রে!

মায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মাঝ থেকে ওর যেটুকু পরিচয় পেলুম তাতে জানা গেল ও আমাদের কলেজেরই একজন ছাত্রী। আমার যখন খার্ড ইয়ার ছিল ওর ছিল ফাষ্ট ইয়ার। থাকত বোর্ডিং-এ। আমি জেলে যেতে স্বেচ্ছায় এসে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হয়েছি। বাড়ী থেকে যে মাসোহারাটা আসে তা দিয়েই দুজনের চলে গেছে বেশ। অবস্থাপন্ন পিতা। থাকেন কোন দূর দেশে, সেই রাওয়ালপিণ্ডি না পণ্ডিচেরী। মা বলেন, ও নাকি ষাছু জানে! ষাছু করেছে মাকে।

ও-ই মাকে ষাছু করেছে না মা ষাছু করেছে ওকে তা নিয়ে গবেষণা করা বুধা। কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবার এমন সুযোগ যদি ভগবান দিলেন তাকে উপেক্ষা করা তো চলে না।

বোর্ডিং-এ ফিরে যাওয়া হল না কল্যাণীর।

—পার্টির কাজে আমাকে আবার কিছুদিন বাংলার বাইরে যেতে হবে মা।

—এইতো জেল থেকে ফিরলি। ক'দিন একটু জিরিয়েও নিবি না।

—বিশ্রাম নেব সেইদিন মা, যেদিন দেখব সমস্ত দেশবাসী আমার স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করে উঠেছে। যুচে গেছে দেশজননীর দুশো বছরের বন্ধন।

এসব বড় বড় কথা শুনলে মায়ের ছ' চোখ জল জল করে ওঠে এক অপূর্ব জ্যোতিতে।

কল্যাণীই সমাধান করলে : সারা দেশটা ঘর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে ঘরে বন্দী করে রাখা তো যাবে না মা। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি যাবো না বোর্ডিং-এ।

—লক্ষ্মী মা আমাব। তুই কাছে থাকলে আমার আর...

—হতভাগা কালুটার কথা মনেই পড়ে না। সহাস্তে বলুম আমি।

—এমন কথা তুই বলতে পারলি কালু? মায়ের চোখে জল।

কল্যাণী হেসে পড়ল আবার খিল খিল করে : মায়ের ছেলে মেয়ের নামকরণ চমৎকার হয়েছে, কালু আর কলু। হাসলেন মাও। নিশ্চিত হলুম আমি।

কল্যাণী যেন কৃতার্থ হয়ে গেল একটা উচু দরের কাজ পেয়ে।

(ক্রমশঃ)

# শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

( ৩ )

অধ্যক্ষ শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ড, এম. এ.

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের নিম্নলিখিত ত্রত পালনের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন :

(১) সত্যব্রত—ছাত্ররা সব সময় সত্য কথা বলবে, সত্য পথে চলবে।

“আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমতঃ সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তারপরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণা করবে।” ( শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পৃঃ ১৩ )।

“মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,

জয় জয় সত্যের জয়।

মোরা বুঝিব সত্য, পুঞ্জিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন।

জয় জয় সত্যের জয়।

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।

যদি দৈন্ত্য বহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয়।

যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়।

জয় জয় সত্যের জয় ॥”

(২) মঙ্গলব্রত—পারম্পরিক মঙ্গল চিন্তা ও কার্যে তাদের মনেব কালিমা দূর হবে, নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন করতে শিখবে এবং বিরোধের পরিবর্তে শান্তি আসবে। “আজ থেকে তোমাদের মঙ্গল ব্রত। যাতে পরম্পরের ভাল হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন।” ( ঐ, পৃঃ ১৪ )।

মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ, আজি করিব সকলে দান

জয় জয় মঙ্গলময়।

মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে গাহিব পুণ্য গান।

জয় জয় মঙ্গলময়।

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভ চিন্তা নয়।

যদি দৈন্ত্য বহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয়।

যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয়।

জয় জয় মঙ্গলময় ॥”

(৩) অভয় ব্রত—বিপদে অর্ধৈর্ষ্য হবে না। ধর্মপথে চললে কোন বিপদ থাকে না। এ সম্পর্কে ছাত্রদের

বলেছেন “তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ত্রিষ্ণু হব না, ধনের গর্বে ক্ষীণ হব না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে; সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন—এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দ মনে সকল দুঃখ থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্য-কর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জল হয়ে উঠবে।” ( শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পৃঃ ১১ )।

“আজ থেকে তোমাদের অভয় ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না, কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রকল্পচিত্তে, প্রসন্ন মুখে প্রজ্ঞার সঙ্গে সত্য লাভে নিঃশঙ্ক থাকবে।” ( ঐ, পৃষ্ঠা ১৩ )।

“সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সব লইলাম—  
যিনি সকল ভয়ের ভয়।

মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম  
জয় জয় ব্রহ্মের জয় ॥

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

যদি দৈন্ত্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

জয় জয় ব্রহ্মের জয় ॥”

(৪) আনন্দ ব্রত—

মোরা আনন্দ মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন

জয় জয় আনন্দময়।

সকল দৃষ্টে সকল বিশ্বে আনন্দ নিকেতন

জয় জয় আনন্দময় ॥

আনন্দ চিত্ত মাঝে আনন্দ সর্বকাজে

আনন্দ সর্বকালে দুঃখ বিপদজালে,

আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যু বিরহ শোকে—

জয় জয় আনন্দময় ॥”

(৫) পুণ্যব্রত—“দেহমনকে সর্বদা পুত ও পবিত্র রাখবে। আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ কোরতে লজ্জাবোধ হয়, তা সর্বপ্রথমে প্রাপণে শরীর মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে”। (ঐ, পৃষ্ঠা ১৩-১৪)।

(৬) স্বদেশব্রত—“পিতামাতায় যেরূপ দেবতার আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশ, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা স্বদেশও তেমনি দেবতা। ছাত্ররা স্বদেশকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।”

(৭) ব্রহ্মচর্য ব্রত—ছাত্রদের ছাত্রাবস্থা ব্রহ্মচর্যের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। এজ্ঞ কতকগুলি আত্মশাসনিক কাজ ও অভ্যাসের কথা বলেছেন। যেমন প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক প্রার্থনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রার্থনা আবশ্যিক। তিনি বলেছেন:

“একই ব্রহ্ম সকলের অন্তরে বাহিবে সর্বদা সকল স্থানেই অবস্থান করছেন। আমাদের সর্বদে তাঁর স্পর্শ রয়েছে। তিনিই সকলের একমাত্র ভয় এবং তিনিই সকলের একমাত্র অভয়। ছাত্রদের উচিত প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে চিন্তা করা।”

“.....আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিবে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমাব সর্বদে তাঁর স্পর্শ রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়”। (ঐ, পৃষ্ঠা ১৪)।

**পাঠ্যক্রম**—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি সম্পর্কে জানতে হলে বিশ্বভারতীকে জানতে হয়। কোন বিশেষ নীতি ও পদ্ধতির প্রচারক ছিলেন না। নিজের আদর্শগত একটি

বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে অল্পস্বত কার্যক্রমই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বলে ধরা যেতে পারে।

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পাঠদান পদ্ধতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। কারণ পূর্বেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র পাঠ্য-বিষয়গুলি আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক। তাঁর কার্য-কলাপ, আচার আচরণ সবকিছুতেই মহান বিশ্ববোধের সুর ধ্বনিত। বিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তু নির্বাচন ও প্রয়োগ-পদ্ধতিতেও এর সুর দেখি। শিশুদের মনে চিরন্তন সংস্কৃতিবোধ জাগ্রত করা, চিন্তকে মার্জিত করে বিশ্ব-মানবের মহাক্ষেত্রে উন্নীত করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

“ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অশুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে দেব শাস্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষা ও চর্চাব প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিন্তের পুনর্বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনেব প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রম-সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।” (বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১৪২)।

রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। প্রয়োজনভিত্তিক পাঠ্যক্রমকে সমর্থন করেছেন, তবে সর্বদা ঐ প্রাণীন পদার্থকে মনে রাখতে হবে। এজ্ঞ তিনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজকে স্থান দিয়েছেন।

তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে সাহিত্য পাঠের ব্যাপকভাবে আয়োজন করেছিলেন। সাহিত্যই অতীতেব সঙ্গে

বর্তমানের, একজনের সঙ্গে অন্তর মেলবন্ধন ঘটায়। মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী, উর্দু, ইংরাজী, ফরাসী, চৈনিক, তিব্বতী, সিংহলী, সংস্কৃত, পালি, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। নিম্ন-শ্রেণী থেকেই গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানের মূল নীতির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

তার প্রবর্তিত শিক্ষাধারার আর একটি বিশেষ দান কলাবিদ্যার সম্যক চর্চা। পূর্বে কেন এখনও স্নাত্ত বিদ্যালয়ে শিল্প সংগীতচর্চার বিশেষ অভাব। তিনি বিদ্যালয়ে চাকর ও কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যালয়ে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষার কথাও বলেছেন। “মাহুদ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করে নি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে ‘মাহুদের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ব। পূর্ণতার আবির্ভাব মাহুদ যেখানেই দেখেছে কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানব সম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে সাক্ষরিত করেছে; শিক্ষার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই কাননা করি; শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ করে সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালবেসেছি ভালবাসার ধনকে, এই কথাটি মাহুদকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার স্বযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের স্বপ্ন দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত অভিষিক্ত গীতলোকে অমবদ্য লাভ করুক”। (শিক্ষার দারা, পৃষ্ঠা ৫৯)।

### আশ্রমিক শিক্ষা

মহামতি রুশো বলেছিলেন শিশুরা আসলে মহৎ, এই অসৎ সমাজেব প্রভাবে পড়ে সেও অসৎ হয়ে যায়। সেজন্ত তিনি লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে এমিলের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আশ্রমিক। আশ্রম-দ্বিজরা সপরিবারে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। কিন্তু সমৃদ্ধি ছিল জ্ঞানে, চিন্তের ঐশ্বর্যে আশ্রম পবিত্র উজ্জল ছিল।

বিদ্যার্থীরা এই সব আশ্রমে সমাগত হ’ত, কায়মনোপ্রাণে আশ্রমিক হয়ে যেত। আশ্রমের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে গুরুসাহচর্যে বিবিধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত, স্বভাব-ঋদ্ধ প্রকৃতির উদার সাহচর্যে বিদ্যাত্রীতীদের চিত্ত সহজে ভরে উঠতো।

বর্তমানের আইন শৃঙ্খলে বাঁধা স্কুলের যান্ত্রিকতাব মধ্যে না আছে ঐরূপ উদার আহ্বান, না বিকাশের মহিমাময় মহত্ব। এখানে বিদ্যা আসে, তত্ত্ব আসে, তথ্যও আসে কিন্তু প্রাণের সাড়া মিলে কম। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বাল্যকাল থেকেই প্রচলিত বিদ্যালয়ের নিকরূপ পরিবেশের প্রতি বিরূপ ছিলেন। “অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মাহুদ করে তোলাবার জন্তে যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইন্সকুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্ত আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সমগ্র ভূমিকা।” (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ৬)। তিনি বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিদ্যাবিপণি বলে অভিহিত করেছেন। যার যেমন প্রয়োজন অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা নিয়ে যাচ্ছে। একে বলে ব্যবসাদারী। “এখানে শিক্ষকরাও বৃহৎ স্বল্পের নাট বন্টু মাত্র। তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর বিরোধী। তিনি বলেন ‘মনের সঙ্গে মিল থাকলে আপনি জাগে খুশী। সেই খুশী স্বজন-শক্তিগীল।’ আশ্রমিক শিক্ষায় আছেন গুরু। ‘তিনি যন্ত্র নন, তিনি মাহুদ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মাহুদ নন, সক্রিয়-ভাবে; কেননা মাহুদেবের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত।’

আশ্রমিক শিক্ষার বড় কথা এটা কেবল বিদ্যালয় নয় একটি ছোট সমাজ। স্বয়ংক্রিয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। দিনযাপনের, প্রয়োজন সিদ্ধির সব কাজই ক’রতে হয়, কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির বন্ধন আছে। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ আছে। চিন্তা নেই আড়ম্বরের, বিকৃতির বাধা। “তারপর আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গরু চড়ানো, গো দোহন, সমিধ আহরণ, অভিষি পরিচর্চা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই

# জীবন ও সাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’—  
কবির এ-কথা ভুলিবে না কেহ, ভেবে আনন্দ পাই।  
কত স্বন্দর, কত বিচিত্র শিশু যুবা নরনারী।  
যত দেখি তত বেড়ে যায় রুচি, বিশ্বয় জাগে ভারী।  
এই মানুষের ব্যক্তিসত্তা সমাজে বিকাশ লভে,  
এই যে সমাজ, মানবজীবন, এদের কে ভোলে কবে ?  
এই ছুটি নিয়ে সাহিত্য করে অদ্ভুত কারবার ;  
শিল্প সৃষ্টি করে তাবুকেরা অতীব চমৎকার !

বহু জীবনের একতাস্বত্রে সমাজ বাঁধিয়া রাখে,  
বহু হৃদয়ের নিবিড় ঐক্য সাহিত্যে ফুটে থাকে।  
মধ্যসমাজের মানসমুষ্টি সাহিত্যে পায় রূপ,  
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয় শাস্ত্রত শক্তিতে অপরূপ।  
মানবমৈত্রী আনে সাহিত্য, ঘুচে যায় ব্যবধান ;  
সমাজ স্বজাতি স্বদেশ তুলিয়া হয় সবে একপ্রাণ।  
অখণ্ড এক বিশ্বসমাজ সাহিত্যে গুঠে গড়ি ;  
পর যারা থাকে, হয় আপনার আত্মার রূপ ধরি’।

মানুষে মানুষে আছে ব্যবধান, হৃদয়বৃত্তি এক ;  
স্নেহ প্রীতি প্রেম করে একভাবে, চোখ মেলে চেয়ে তাক।  
সহৃদয় লোক স্বরূপে সমান, কেহই ভিন্ন নয় ;  
একভাবে হাসে, কাঁদে ভালবাসে, প্রেম করে, পায় ভয়।  
মানবহৃদয় এক অভিন্ন সব দেশে, সব কালে ;  
হৃদয়ের এই মৌলিক গুণ আজো আছে সেই হালে।  
জগদ্ব্যপ্ত মহামানবতা মহামিলনের গান।  
শোনায় কাব্য-সাহিত্য মাঝে, শিল্পীর বাড়ে মান।

সাহিত্য এক শিল্পসৃষ্টি, ধ্যান-ধারণার ধন ;  
মানব জীবন উপাদান তার, কাজ করে শুধু মন।  
স্বপ্ন-তুংগের হাসি-কান্নার, কামনার লীলা খেলা  
কবি-মন সব রূপায়িত করে, জানে না করিতে হেলা।  
যে-সমাজের মানুষ যে হয়, সেই লেখকের ভাব  
সেই সমাজের মতন হবেই, তাতেই তাহার লাত।  
সার্বজনীন প্রতিভা হলেও, দেশ সমাজের ছাপ  
পড়িবে তাহার লেখার মাঝারে, এটা নহে অভিশাপ।

বাস্তবতার ঝুললিপি হওয়া শিল্পের গুণ নয়,  
সাহিত্য সে-ই মানস চক্ষে অপরূপ যাহা হয়।  
স্রষ্টা রচিছে সাহিত্য তার বাস্তবতাকে পিষে’,  
অদৃষ্টকে করে সে দৃষ্ট, ছড়ায় তা দিশে দিশে।  
বাস্তবতার তথ্য-তথ্য তা শুধু প্রতিচ্ছবি,  
সমৃদ্ধ ভাব-কল্পনা দিয়া কবিতা রচিছে কবি ॥  
‘কাল নীমাহীন, পৃথিবী বিপুল’, কবিরা তুচ্ছ নহ্ন ;  
রসোত্তীর্ণ হয় যদি লেখা, সম্মান অক্ষয়।

সাহিত্য নরজীবনের এক স্বগভীর অল্পভূতি ;  
জীবনের গুঢ় আলোচনা মাঝে প্রজ্ঞার জলে ছাতি।  
স্বাস্তবের স্বপ্নভুবনে পালায়ে থাকে না কবি ;  
জীবনের মহা-উপলব্ধির আঁকে তারা ছায়া-ছবি।  
সাহিত্যিকের সমাজের সাথে থাকে সদা সংযোগ ;  
রচনার মাঝে ধরা পড়ে কবি-জীবনের সম্ভোগ।  
শুধু সামাজিক মানুষ তো নহে, শিল্পীও তারা বটে ;  
তাদের সৃষ্টি রচনার গুণে কত অঘটন ঘটে।

জীবন-জগৎ বিষয়ে যাহারা সদা সচেতন থাকে,  
তাদের স্বজনীপ্রতিভা কখনো পড়ে না দুর্ভিক্ষপাকে।  
সৃষ্টির মহাসম্মান পেয়ে জগতে ধন্য তারা,  
অমরতা লভি’ হয় গৌরবী, বহায় অমিয়ধারা।  
তবুও কবিরে অবহেলা করে ধনগর্ভিত লোক,  
তাতে শিল্পীর কোনো ক্ষতি নাই, বোঝে না আহাম্যক !  
সত্যেব প্রিয় পূজারী এসব কবি ও সাহিত্যিক ,  
তাঁরা উজ্জল করিয়া রেখেছে দুনিয়ার দশ দিক।

স্বপ্নবিহার ভাববিলাসিতা শিল্পীর মহাদোষ,  
কবি-লেখকের হৃদয়হীনতা বাড়ায় অসন্তোষ।  
স্বাধীনতাযোদ্ধা সহস্রভূতিতে কবি হয় মহীয়ান,  
যুগ যুগান্ত অরণীয় হয়ে থাকে সেই অবদান।  
বড় সাহিত্য হয় না রচিত জীবনের ফাঁকি দিয়ে ;  
মহান কাব্য হয় না লিখিত শুধু আপনারে নিয়ে।  
সত্য যেথায় পূজা নাহি পায়, মিথ্যার বোঝে জয়,  
সে দেশে কবি ও সাহিত্যিকের জীবন ব্যর্থ হয়।

## নব-বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

[ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের এখন আষাঢ় মাস। আজ হইতে ঠিক একশত তেইশ বৎসর পূর্বে ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অল্পতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য-রূপে বিশ্বসভায় আজ গৌরবান্বিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পথিকৃৎ ও অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ রথী। নব-বঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা, জাতীয়তাবোধের পুরোহিত, ‘বন্দে মাতরম্’ মহামন্ত্রের উদ্ভাতা, সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শুধু বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণই নহে, সমগ্র জাতি এক অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। উনবিংশ শতকের বিশ্বতপ্রায় সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে “নব-বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র” শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল। ইতি—প্রঃ সঃ ]

যেদিন ‘Rajmohan’s wife’-কে পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ‘দুর্গেশনন্দিনী’-কে বরণ করিলেন, সেইদিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এক পরমতম স্মরণীয় দিন—তাহা নব-বঙ্গসাহিত্যের শুভ জন্মদিন।

বিদেশিনী-রূপমুখ বাঙ্গালী আপন ঘরের এই অসামান্য রূপবতী মেয়েটিকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোথায় লুকাইয়াছিল ‘ভিলোসফা’ এই মেয়েটি এতদিন! কই তাহাকে ত’ কোনও দিন তাহার দেখিতে পায় নাই। এই মেয়েটির রূপে আকৃষ্ট হইয়াই পরমুখো বাঙ্গালী একে একে ঘরমুখো হইতে আরম্ভ করিল।

হলক্ষণা এই মেয়েটিই গৃহবিমুখ বাঙ্গালীর অবলম্বিত অসংখ্যকে সর্বপ্রথম রক্ষি-সংহত করিল। ষষ্ঠীয় উনবিংশ শতকের বিস্ময়কর বঙ্গদেশ যাহা মূলতঃ বঙ্কিম-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া সর্বদিক দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—‘দুর্গেশনন্দিনী’-র শুভ আবির্ভাবেই তাহার প্রথম সূচনা।

ইহার পর কাপালিক-কবলিতা কপালকুণ্ডলাকে নব-কুমার যখন হাত ধরিয়া বাঙ্গলার অন্তঃপুরে আনিয়া দাঁড় করাইল, তখন বাঙ্গালীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। প্রতীচ্যের অল্পতম শ্রেষ্ঠ কবি সেক্ষপীয়রের মানস-কন্ডা মিরান্দা—যাহার চরিত্র-বিকাশ-মাধুর্য্য বাঙ্গালী এতদিন অতুল্য বলিয়া জানিয়াছিল—এ যে তাহা অপেক্ষাও জ্যোতির্ধরী! মহাকবি কালিদাসের সর্বোত্তমা মানস-কন্ডা, কাব্য-জগতের শ্রেষ্ঠা-নাবীচরিত্র শকুন্তলা অতুলনীয় হইলেও, তাহারই পার্শ্বে এই কপালকুণ্ডলার আসন নির্দেশ করিতে বাঙ্গালী ভীত হইল না।

ক্রমে ক্রমে ‘মৃণালিনী’ ‘মনোরমা’ প্রভৃতি আসিয়া যখন আমাদের অন্তঃপুরে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, তখন—

“আত্মকুস্তলা, আরক্তকপোলা, দুষ্কফেশুভা, হরিণলঘু-গামিনী” ‘রক্ত’-রক্তাধরোষ্ঠি বিড়ালাক্ষী বিদেশিনীর স্থতী মাদকতামস্ত বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল—এত আদরে, এত স্নেহে, এতকাল ধরিয়া সে যাহার মন যোগাইয়া আসিল, তাহার গর্ভে কিন্তু একটি সন্তানও তাহার জন্মগ্রহণ করিল না। তাই আজ স্নিগ্ধভ্রামা, ঘনকৃষ্ণকুস্তলা, পঙ্কবিষাধরোষ্ঠি, চকিত হরিণী-প্রেক্ষণার লাজ-জড়িত মুদ্র-চরণক্ষেপে তাহার হৃদযন্ত্রী বদ্ধ হইয়া উঠিল। এতদিন পরে বাঙ্গালী সত্যসত্যই ভাবিল, “আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিছু হায়!” মধুহৃদনের যে বেদনার গান বাঙ্গালী সেদিন শুনিয়াও শুনে নাই, যাহা দুরাগত অশ্রুত ধ্বনির মত তাহার কর্ণে মাত্র প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাই আজ একেবারে তাহার মর্মে গিয়া বাজিল। ‘পরধন-লোভমস্ত’ বাঙ্গালী আপন ‘মাতৃকোষে রতনরাজি’-র সন্ধান পাইল।

তাহার পর আসিল ‘বিষবৃক্ষ’। বঙ্কিম দূচর তপঃ-সাধন দ্বারা অমরাবতী হইতে যে ভাব-মন্দাকিনীধারা অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, এইবার তাহার গতিমুখ পরি-বর্তিত হইল। তাহা একেবারে আমাদের গৃহকে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্বে দূর হইতে যাহার শোভা সন্দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখন আমরা তাহার তীরবাসী হওয়ায়, তাহা প্রতিদিনের প্রবেশজনে আমাদের দৈনন্দিন স্নানে ও পানে, আমাদের নিত্যসঙ্গিনী হইয়া উঠিল। এতদিনে সত্যসত্যই তাহার সহিত আমাদের নাড়ীর যোগ স্থাপিত হইল।

‘বিষবৃক্ষ’-মুকুরে যেদিন বাঙ্গালী-গৃহ ও সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, সেদিন সমগ্র বঙ্গে যে নবযৌবন-সমাগম হর্ষোৎসব দেখা দিয়াছিল, যে অপরিমিত



বিশ্বয়ের আনন্দ-হিল্লোল বাঙ্গালী হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াছিল—তাহা অদ্বিতীয়। বঙ্কিম-করুণত স্নানপূর্ণ তুলিকাপাতে সামাজিক আবেষ্টনীর মাঝে, পরিবার-পরিজন দাসদাসী পরিবৃত্ত আমাদের দাম্পত্য-জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখে, বিরহ-মিলনে, আনন্দ ও বেদনায় আশা ও নৈরাশ্রে, স্বপ্ন-পতন ও ক্রটি-বিচ্যুতিতে সমগ্র হৃদয় যে অতি পরিচিত ছবি, তাহাই রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

বিশ্ববৃক্ষের যবনিকা যেই প্রথম উন্মোচিত হইল, বাঙ্গালী বহুদয়ও সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। ভাষা স্বর্ধ্যমুখী মাধার দিব্য দিয়া বলিলেন “দেখিও, ঝড় উঠিলে নৌকা কিনারায় লাগাইও।” অপরিজ্ঞাত অনিশ্চিত অস্তরের আশঙ্কায় স্বামীর শুভ কামনা করিয়া স্বর্ধ্যমুখীর এই যে ব্যাকুলতা, ইহাতেই এক মুহূর্ত্তে বাঙ্গালী বহুদয় ধরা পড়িয়া গেল। স্বর্ধ্যমুখীর এই স্বল্পভাষণের মধ্য দিয়াই হিন্দু-দাম্পত্য-জীবনের সুগভীর প্রণয়-মাধুর্য্য স্বর্য়ালোকের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রেমের সহিত মঙ্গলের আবিচ্ছিন্ন একাত্ম রূপটিকে আমরা একই সঙ্গে দেখিতে পাইলাম।

বঙ্গসাহিত্যে যথার্থ সামাজিক-গার্হস্থ্য উপন্যাসের সর্বাবয়ব রূপ আমরা প্রথম দেখিতে পাইলাম এই বিশ্ববৃক্ষ উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যভূমিতে স্বতন্ত্রে এই যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—পরবর্ত্তিকালে ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গলার তাবৎ উপন্যাস-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহাব পর ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রজনী’, ‘ইন্দিরা’ প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালীর এই সামাজিক গার্হস্থ্য জীবনকে আমরা বিভিন্ন আবেষ্টনী ও নব নব সংঘাতের মাঝে দেখিতে পাইলাম। বিশ্ববৃক্ষে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবন-চিত্রের যে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তিকালে ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এ নিপুণতর তুলিকাপাতে অধিকতর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘রাজসিংহ’ এক অল্পময় সৃষ্টি। ভারতবাস্তবগণের অন্তাচলগামী মোগল সাম্রাজ্য-স্বর্ঘ্যের বিদায়-গোধূলি আলোকে, মোগল-রাজপুত

ঐতিহাসিকের একটি অল্পময় পৃষ্ঠা বীরকেশরী রাজসিংহকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাহা যথার্থ ধর্ম, তাহা বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র রাজসিংহ উপন্যাসেই সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকপ্রধান ঘটনাসমূহকে অক্ষত রাখিয়া, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম মানব-হৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণের দ্বারা অক্ষুণ্ণ রস-পরিবেশন-রূপ উপন্যাস-ধর্ম রক্ষার অপূর্বতায়—রাজসিংহ অদ্বিত-পূর্ব। ইতিহাসের প্রবাহের সহিত মানব-হৃদয়প্রবাহ সমান্তরাল সমতাল গতিতে এমনি পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে যে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইতিহাস ও উপন্যাস-ধর্মের এইরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়, রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যাধিক হয় না।

‘আনন্দমঠ’, ‘দেবীচৌধুরাণী’ ও ‘সীতারাম’—এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে, আমরা দেশাত্মবোধের জনক, স্বদেশপ্রেমের পুরোহিত, মাতৃমন্ত্র-প্রচারকারী বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম। প্রচারমূলক উপন্যাস সৃষ্টির মূলে—অক্ষুণ্ণ পারিপার্শ্বিকতা চরিত্রের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি ও অক্ষুণ্ণ রস-পরিবেশনের প্রতি যে একটি সামঞ্জস্য-পূর্ণ সংযত সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা অনন্তসাধারণ প্রতিভাবানেই সম্ভব। বর্তমান প্রচারমূলক উপন্যাসসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তন্মধ্যস্থ চরিত্রগুলি তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশ বিচ্যুত হইয়া জড়যন্ত্রের মত কতকগুলি theoryর বুলি আওড়াইয়া চলিয়াছে; তাহাদের না আছে রূপ, না জীবনের স্পন্দন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রচারমূলক উপন্যাসের চরিত্রসমূহ মানবের স্বাভাবিক কোন বৃত্তিকেই অস্বীকার করে নাই; তাহারা সকলেই প্রাণবান্ ও স্বাস্থ্যের লাভণ্যে রূপবান্ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশ ও কালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পারিপার্শ্বিকতার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রগুলি স্বচ্ছন্দে গড়িয়া উঠিয়াছে। একটা স্নানিষ্ঠ পথ ধরিয়া সংযত গতিতে আপনাপন লক্ষ্যপথে তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। সেই পথে তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই। কেহই আমাদের অলক্ষ্যে আপন আদর্শের উজ্জ্বলতায় হঠাৎ আসিয়া

দেখা দেয় নাই—তাহাদের সাধনলব্ধ ক্রমবিকাশের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা স্পষ্টতর্যক।

তাই, ভবানী পাঠকের নিকট নিকায় কর্মযোগের আদর্শ সুদীর্ঘ বৎসরের ক্রমদীক্ষায় প্রকৃষ্টরূপে আমরা সহস্রের কর্তৃরূপিনী দেবীরাক্ষরূপে পাইয়াছি। জীবানন্দ, ভবানন্দ, শাস্তি, কল্যাণী, মহেন্দ্র ও সন্তানদলের সকলকেই স্বদেশসেবার অধিকারী হইবার নিমিত্ত কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। শুধু সন্তানদের দেশমাতৃকার পুঞ্জের আদর্শে প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট সন্তানবর্ধে দীক্ষিত হইতে হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কোন চরিত্রকেই নিরুৎসাহ ইন্দ্রিয় অতিমানবতায় অভিষিক্ত করেন নাই। মর্ত্য সংস্পর্শযুক্ত রক্তমাংসগঠিত দেহধর্মী মানবের সকল বৃত্তির স্বীকৃতিতে অশুণ্য সমগ্র বলিয়া, তাহাদিগকে আমাদের অব্যবহিত আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারি। দোষে গুণে, উত্থান পতনে, স্থলন পতন, ভুল ভ্রান্তি ও ক্রটি বিচ্যুতিতে তাহারা একান্তই মানব—অপরিচয়ের অক্ষুটতায় বা অনাবিকৃতিতে তাহারা কোথাও রহস্যময় হইয়া উঠে নাই। তাই জীবানন্দের মত অমিত পরাক্রম শ্রেষ্ঠ সন্তানও আলোক-শিখালোলুপ মৃত পতঙ্গের মত কল্যাণীর রূপধোঁবন

প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়াছে। সন্তানগুণ সন্তানদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সন্তানাগ্রগণ্য জীবানন্দের জীবনও শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া দৌর্জাল্য-বিচলিত হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি।

যে সীতারাম আপন বাহুবল ও চরিত্রবলের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই মহাক্রান্ত ত্রায়পরায়ণ সীতারাম দ্বায়-কেও—পিতৃ-আজ্ঞায় পরিত্যক্তা, অপরিণীত রূপবতী, বহুদিন অদর্শন প্রথমা জ্বর কুলপরিধাবী যৌবন-সান্নিধ্য বঞ্চিত, বিবেকবিহীন হিংস্র পশুতে পরিণত হইয়া, পরিণতিতে বিগত রাজকুমারী ও কৃতসর্কষ হইতে হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ আদর্শবাদী ছিলেন, কিন্তু আদর্শের অমুরোধে মানবীয় স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অপমৃত্যু ঘটাইয়া, মানুষের জীবনকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদর্শবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদ (Realism), উভয়ের সংঘাত ও সমন্বয় বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্বত্র সুপরিষ্কৃত। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিম-সাহিত্য অদ্ভুতভাবে Humanist, বদসাহিত্য-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রেব মত অশুণ্য-মানবতার বলিষ্ঠ পূজারী আমরা আর দ্বিতীয় দেখি নাই।

## অভয়

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পথে ভয় নাই, পাশ্ব,  
উত্তরীয়ে প্রান্ত  
সে জেনো লয়েছে ভুলে,—  
স্বর্গ সহসা গড়ে যে ধরার ধুলে।  
ভুল পথে যাবে সাধ্য কি আছে !  
সেই দিশারিণী রয়েছে যে কাছে ;  
স্বরে সুরে তা'র দিশা পায় দিক্ ভ্রান্ত ;  
পথে ভয় নাই, পাশ্ব।

অনাদ্যন্তে পথের নিশানা  
তুমি ভালো জানো—নাই তব জানা ;

চোখে না দেখিলে—কানে না শুনিলে  
চলার ছন্দে তবুতো নিখিলে  
নাসায় পশিবে তা'রই যে অঙ্গ-গন্ধ।  
গরজ বাহার—সে জনই ঘূচাবে বন্দ।

পথে পথে শেষে চলিতে চলিতে,  
তা'রই প্রেমে প্রাণ বলিতে বলিতে,  
চির-চলমান বাসরে বাসরে  
মর্ম্ম রাখিয়া মর্ম্মের 'পরে  
দেবিয়া পথের কাস্তি  
পথের লীলায় পথেই লভিবে পথে চলিবার শাস্তি।

ভয় নাই—ওগো পাশ্ব,  
ভয় নাই উদ্ভ্রান্ত।

## হায়রে মা !

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘৪২ খৃঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব বা পরের কথা। তখন দুর্ভিক্ষের জোর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একটা নতুন কিছু প্রেরণায় কলকাতা ছেড়ে স্বগ্রামের অপ্রতিষ্ঠিত একটা ছোট স্থানের হেডমাষ্টার সেজে, কয়েক বছর কতিপয় শিক্ষক নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। সকলেরই মুখ বিষন্ন—বিশেষ করে মাষ্টারদের।

চারটির ছুটির পর সকলে মিলে অফিসঘরে বসে গল্প করছি, এমন সময় একজন শিক্ষক বলে উঠলো, শুনেছেন? চালের মণ দশ টাকায় উঠেছে। তাও পাওয়া যাচ্ছে না।” দ্বিতীয় একজন একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “আর খেতে হবে না।” তৃতীয় একজন বললে, “দেখবেন, পনের টাকা কুড়ি টাকায় উঠবে।” চতুর্থ একজন বললে, “তাও পাওয়া যাবে না। সব চাল কালোবাজারে চলে যাচ্ছে।”

সকলেরই মুখে একটা বিবাদের ছায়াপাত হ’ল। আমারও মুখ বিষন্ন হ’ল বটে তবে ওদের মত নয়। এর একটা কারণ ছিল, যা সকলেই জানত। আমি আমার এক মামাতো ভাইকে কলকাতার স্থলে পড়িয়ে ‘মাহুঘ’ করেছিলুম। ঐ সময়টার কাছাকাছি সে দিব্যি ‘মাহুঘ’ হয়ে উঠেছিল। যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি তো করেছিলই, তার সঙ্গে বিস্তর জায়গা-জমি কিনেছিল। সে এই হুমুল্যের সময় প্রতি মাসে আধমণ তিরিশ সের করে চাল আমার সংসার খরচের জন্য পাঠিয়ে দিত। সুতরাং বাকী আধমণ দশসের জোগাড় করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও অসাধ্য ছিল না। এইভাবে তখন আমার সংসার কাটত।

আমার সংসার বলতে তখন ছিল চারটি নাবালক ছেলেমেয়ে, আর তাদের গর্ভবাগিনী মা। যখনকার কথা বলছি তখন স্ত্রী বয়সে প্রাচীন না হলেও, প্রাচীন আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ছিল। ‘মুড়িঘন্ট’ রাঁধতে জানত না বটে, কিন্তু শাকের ঘন্ট বা মোচার ঘন্ট বেশ রাঁধতে পারত। আর সে ছিল অতি সাধাসিধা ধরনের মেয়ে-

মাহুঘ। একটিমাত্র ‘সেমিজকে’ ঘোল বছর ধরে ব্যবহার করেছিল—রুপণতার জন্য নয়, প্রয়োজনের অভাব।

চালের দর চড়তে লাগল—কুড়ি পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ সাড়ে বিয়ান্নিশ—পয়তান্নিশ। সর্বোচ্চ বিডার (bidder) হল লীগ সরকার। তবে আমি যে সময়ের গল্পটি পাঠকদের শোনাবো, সে সময় দর ছিল বোধ হয় চল্লিশ। কী দুর্ভিক্ষের অবস্থা! আনন্দমঠের দুর্ভিক্ষ এর কাছে মান হয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারলুম দুর্ভিক্ষের বেড়াঙ্কালে পড়েছি। চালের দিক দিয়ে কতকটা নিরাপদে থাকলেও তো অপর সব দিক আছে। আমার তখন প্রতিজ্ঞা হ’ল, খাওয়া পরার দিক দিয়ে কোনভাবে সংসারে বিলাসিতা ঢুকতে দেব না। ছেলেদের লেখাপড়া হোক বা না হোক, পেটভরে ছ’মুঠো খেয়ে হেসে-খেলে বেড়াতে পারলেই হ’ল। মাহ-ঘি-চুধ-সন্দেশ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। আর নিষেধ—পোষাকী জামাকাপড়, আর তার সঙ্গে পেটেন্ট শুধু। মানে, ছেলেমেয়ের পা ছেঁচে গেলে তার জন্য ‘বোরোলীন’ না কিনে গাছের পাতার রস দিয়ে কাটা-ছেঁচা সারাতে লাগলুম। তবে মাহ আর সন্দেশ যে একেবারে বাড়ীতে প্রবেশ করা বন্ধ হয়েছিল তা নয়, ছাত্রদের আর পাড়াপড়শীদের নিকট হতে মধ্যো মধ্যে উপহার রূপেও আসত, তবে তা সব ছেলে-মেয়েদের ভোগে চলে, যেত—স্ত্রীকে এইসব বাড়ীতে-আসা মাহ, সন্দেশ দীতে কাটতে দেখি নি।

আমি একদিন শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম।

—আচ্ছা তিন বছরে আমি ক’বার সন্দেশ খেয়েছি? জনাই আমার জন্মগ্রাম—সন্দেশ-মনোহরার জন্য বিখ্যাত। সন্দেশের দাম তখন আট টাকা দের হলেও আমার প্রতি-বাসীরা অনেকেই খায়, কারণ সেই সময়ে একদল লোক যেমন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, আর একদল লোক—অবশ্য সংখ্যালঘু—তেমনি ছিল বড় বড় চাকরে, বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় জমিদার বা ধানজমির মালিক। সুতরাং অতিবড় দুর্ভিক্ষের দিনেও সন্দেশ রসগোল্লা-পান্ডুরার

দোকান বন্ধ থাকত না—বরঞ্চ আগেকার চেয়ে আরো ভালভাবেই চলত।

আমি হিসাব করে দেখলাম, তিন বছরে বড়জোর চার বার সন্দেশ খেয়েছি—একবার বিবাহ উপলক্ষে, একবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আর একবার উপনয়ন উপলক্ষে। কিন্তু এই গোটা তিন বছর আমার জী ক'বার সন্দেশ ইত্যাদি খেয়েছে? ভেবে দেখলাম একবারও নয়। পাড়ায় তিন বছরের মধ্যে কারোর বাড়ীতে এমন কোন ভূরি-ভোজের স্রবোগ হয়নি যাতে করে সে সন্দেশ খাবার স্রবোগ পাবে। আর তখন ভূরিভোজ আইনে নিষিদ্ধ। পাড়ায় দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ খেতে যায় বটে, কিন্তু সে নিমন্ত্রণে মিষ্টান্ন বলতে বঁদে বা জিলিপী। অতএব একেবারে নিভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে আমার জী জনাইএ বাস করেও গোটা তিন চার বছর সন্দেশ বা ছানাজাত কোন দ্রব্য দাঁতে কাটে নি।

মনটা কেমন দমে গেল। জী বড় হয়েছে, পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছে, কিন্তু তবুও সে তো মানুষ—পাঁচটা ভাল জিনিষ খেতে কার না সাধ যায়? তার প্রতি নিশ্চয় আমার একটা কর্তব্য আছে, তাতকাপড় দিয়ে পোষণ করব বলেই তো আমি তার তর্জী, কিন্তু কই! আমি তো সে দায়িত্ব পালন করতে পারি নি? হৃৎকেন্দ্র বাজার। ওটা বুধা ওজোর। অপর সব পাড়ার বৌ-ঝি যখন মাঝে মাঝে সন্দেশ মনোহরা খেয়ে থাকে, তখন এই গোটা তিন বছরে অন্ততঃ একবার আমার তো উচিত ছিল তাকে মিষ্টমুখ করে আপ্যায়িত করা। মনটা অহুশোচনায় তরে গেল। এইরূপ অহুশোচনার বশবর্তী হয়ে একদিন দোকান হতে আট আনা দিয়ে একজোড়া ভাল মনোহরা কিনে এনে অতি সম্বরণে জীর শোবার ঘরে এক ড্রয়ারের মধ্যে রেখে রাত্রির জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলুম। অতি যত্নে আর অতি গোপনে—পাছে কাছাকাছারা টের পায়। সেদিন নিষ্ঠুরভাবে 'পিতার' কর্তব্য ভুলে গেলুম, কারণ স্বামীর কর্তব্য তখন মনটা জুড়ে বসেছে।

রাত প্রায় দশটার সময় আমার ছেলেমেয়েদের মা সকলকে খাইয়ে এবং সকল কাজ সেরে চারটি সন্তানকেই ঘুম পাড়িয়ে নিজের ঘরে বসে আছে। তখনো মশারী

ফেলে নি, একখানা পাখা নিয়ে পালা করে এ-ছেলে ও-মেয়ের গায়ে বাতাস করছে। এমন সময় আমি পা টিপে টিপে তার ঘরে প্রবেশ করলুম—পাছে কাছাকাছারা উঠে পড়ে আর আমার সাথে বাধ সাধে। জীর কাছে গিয়ে বসতে সে একটু বিস্মিত হল এবং বুঝতে পারলে আমি যেন তাকে কিছু বলতে চাইছি। আমিই আগে কথাটা পাড়লুম: “দেখ, আজ একটা বাসনা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। সেই বাসনাটি তোমায় আজ পূরণ করতেই হবে। পড়েছি হৃৎকেন্দ্র কবলে, কোন রকমে কাছাকাছাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আর কি। আমি আজ ক'দিন ধরে ভাবছি কি জানো? ছেলেমেয়েরা বরঞ্চ মাঝে মাঝে একটু-আধটু সন্দেশ খেতে পায়, আর এই তিন বছরের মধ্যে আমিও তিন চারবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দু'টো চারটে সন্দেশ রসগোল্লা পানতুয়া মুখে পুরে দিয়েছি। কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, তুমি এই গোটা তিন বছরে, হয়তো-বা চার পাঁচ বছরে একটুকরাও সন্দেশ মুখে দাও নি। তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য তো আছে, সে কর্তব্য পালন করতে পারছি কই।”

কতকটা বিস্মিত হয়ে আর কতকটা কৌতুকের বশে জী জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, কি হয়েছে।”

আমি বলতে লাগলাম, “কিছু হয়নি। তবে খাওয়া-পরা ব্যাপারে তোমার যে কষ্ট হচ্ছে তা দেখতে তো পাচ্ছি। এই পাড়ায় আরো কত গৃহস্থ রয়েছে, তাদের বাড়ী ঠোঁয়া-ঠোঁয়া সন্দেশ আসছে। তাদের বাড়ীর ছেলেরা তো খাচ্ছেই, ছেলেদের মায়েরাও সন্দেশ খেতে কষ্ট করছে না, অথচ আমি এমন দুর্ভাগা যে, তোমাকে কখনো কোন ভাল খাদ্য খাওয়াতে পারছি না। আর যেহেতু তুমি আমার জী সেইজন্য আমার দুর্ভাগ্যই তোমার দুর্ভাগ্য।

আমি তার দুর্ভাগ্যটা ছুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে তার দুর্ভাগ্যকে দুর্ভাগ্য বলেই বুঝতে পারলে না। ঘুমন্ত ছোট ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে বসল—যদিও তখন কোলে করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, “তাতে কি হয়েছে? ভগবান থাকে যা খেতে দেবে সে তাই খাবে।”

আমি আর কোন বক্তৃতা না দিয়ে একবারে উঠে ড্রয়ার

খুলে, শালপাতাস্থিত জোড়া মনোহারা হাতে করে নিয়ে তার সমুখে রেখে বললুম, “আজ তোমায় এইটুকু খেতেই হবে, স্বামীর অহরোধ রক্ষা করা জীবন কৰ্তব্য।”

ঠোটের কোণে সামান্য একটু হাসি। তারপর আমার দিকে একটু চেয়ে আমার তিরস্কার করে বললে, “এই মাগিয়ার বাজারে যিছিযিছি আট আনা খরচ করতে গেলে কেন? ঐ পয়সায় আধসের চাল আসতে পারত। রেখে দাও, কাল সকালে ছেলেমেয়েরা খাবে।”

অভিমান করে বললুম, “ছেলেরা তো খায়ই। এই সেদিন ছান্দের ছোলা-সন্দেশ দিয়ে গেল, ওরা সব খেয়ে ফেললে। আজ এদের জন্ম আনি নি, তোমার জন্ম এনেছি। ছেলেরা যুচ্ছে। ছুটো না খাও, একটা খাও।”

জী একটু অধীরভাবে বললে, “কি যে বল। আমি বুকের ধনদের চোখে খুলো দিয়ে পেটুকের মত নিজেকে খেতে যাবোঁ! আর তুমিইবা কত সন্দেশ খেয়েছ, তুমি একটা খাও, আর কাল এরা একটা ভাগাভাগি করে খাবে।”

আমি অভিমানের মাত্রা আরো চড়িয়ে বললুম, “তুমি কখনো স্বামীর খাতির রাখো না। স্বামীর প্রতিও জীবন কৰ্তব্য আছে। স্বামী যদি এক শিল্পি তরল আলতা এনে প্রোচা বা বুদ্ধা জীকে বলে, এই আলতা তোমায় পরতে হবে। তবে জীকে পরতেই হবে। আচ্ছা, একটা না খাও, আধখানা খাও। আমার মাথা খাও, খাও।” এই

বলে একটা মনোহরাকে দু’ভাগ করে একভাগ তার হাতে দিতে গেলাম, হাত পাতলেই না। তারপর প্রোচ বয়সেও দাম্পত্য জীবনের অভিনয় করে, জোর করে তার মুখে শুঁজে দিতে গেলুম, মুখ সরিয়ে নিলে, আর আমার হাতটা এমন নাড়া দিলে যে, মনোহরা শালপাতায় পড়ে গেল। আবেগরুদ্ধ গলায় জী বললে, “পেটের সম্ভানকে না খাইয়ে তোমাকে না খাইয়ে খাওয়া যায়।”

বললুম, “সেটা তোমার দ্বারা প্রস্তুত বা সংগ্রহ করা খাদ্য। কিন্তু আমি যদি এনে দিই, আর বলি তোমায় খেতেই হবে, তখন খাওয়া কেন যাবে না।”

আমাদের গলার আওয়াজ বুঝি একটু চড়া হয়েছিল। হঠাৎ চেয়ে দেখি চার ছেলেমেয়ে জেগে উঠে নড়ন-চড়ন-বিহীন শায়িত অবস্থাতেই মনোহরার দিকে প্যাট-প্যাট করে চেয়ে আছে।

তাদের মাও তাদের জাগ্রত অবস্থা লক্ষ্য করে আর মন-চোখ সন্দেশে সংলগ্ন দেখে, এই দুঃসাপ্য বস্তু ভবিষ্যতের জন্ম তুলে না রেখে সকলকে ডেকে বলে উঠলো, “নে, খা।” তারাও ধড়মড় করে উঠে বলে হাত পেতে সন্দেশ নিয়ে—কেহ চেটে, কেহ চুষে, কেহ চিবিয়ে আর কেহ একগ্রাসে খেয়ে ফেললে। ভয়দূতের মত নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ফেরবার সময় ডি. এল. রায় না কার বইএতে পড়া কথাটা মনে পড়ে গেল—হায় রে মা!

## সত্যের অভিযান

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

মানব সভ্যতা আজ হারিয়েছে শীলতা  
অসত্য ও নর অশীলতার মিছিলে ভিড়তে—  
সত্য ও সত্যতা নীড়খানি বেঁধেছে:

উদার উন্মুক্ত মরুতীরে।

এ-মরুতীরের তীর্থবাসী যারা  
অতি ক্ষীণ অতি দীন—নহে কহু হীন গোষ্ঠী তারা।  
বালু বজ্রায়, তীব্র শীতাতপে, তাপদাহে হাসে ও খেলে  
দূরদূরান্তের কামান্ন বিরাট বিবাক্ত সমাজের  
কি স্তম্ভর সভ্যতার অসত্য সংলাপ  
প্রাণ ভরে শোনে—শুধু শোনে আর মনে দেয় বেড়া

উল্লেখ্যোয়াটে আকাশ অপার,  
নিম্নে নীরস পৃথিবী বালুকার।

আপনার রসে সবে সাধনায় রত সাবধানে—  
যেথা সত্যের কঙ্কালে আর ধমনীতে বাঁধা আশ্রয়,  
সংঘমে বাঁধা যেথা স্বস্তিকা পতাকা,  
বারে বারে সেথা এসে ফেরে মৃত্যু ভয়ে ছম্ ছম্।

দুঃসাপ্য মিথ্যা করেছে কায়ম মানব বিগ্রহ  
আছে যে দাওয়াই তার রূঢ় মরুতলে,  
তারই সন্ধানে এই মরুতীরে বাস,  
সত্যের ক্ষীণ গোষ্ঠী! কিবা ভয় বাধা বিদ্যাচলে।

## সতীরাগী

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

৬

### নারায়ণগঞ্জে যাইবার প্রাক্কালে

কলিকাতা হইয়া বিকাশচন্দ্র নারায়ণগঞ্জ রওনা হয় অতি সত্বর। তাহার জননী কলিকাতায় থাকিয়া যান। আর পিতা যক্ষের ধন আগলাইয়া কাটিহারে বসিয়া থাকেন। বিকাশ বলিয়া আসে, মালপত্র সব ব্যাঙ্কের লোকজন সুব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবে। অপেক্ষা করা উচিত, মাল না পাঠান পর্য্যন্ত।

মাল পাঠানর জন্ত অপেক্ষা যক্ষ আর করিতে পাইল না, কারণ সতীরাগী ভগবতপরায়ণ জ্যোতির্ময় মিত্রের মৃত্যুসংবাদে স্বামীকে কাটিহার হইতে চলিয়া আসিতে লিখিলেন। মিত্র মহাশয় শ্রীশুশীলপ্রসাদের পরম বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে নবাগতদের সুখ সুবিধার জন্ত নানাভাবে সাহায্য করিয়া। সতীরাগীর কাটিহার হইতে আসিবার সময়ে সন্ধ্যাপন্ন রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। সতীরাগী তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে যাইলে, গদগদভাবে মিত্র মহাশয় বলেন, ‘যাচ্চ মা, কাটিহার ধন্ত হইয়াছিল তোমার মত পুণ্যবতীকে পাইয়া। আমরা তোমার অশেষ কল্পনা লাভ করেছি। পুত পবিত্র হয়েছি তোমার সাহচর্য্যে। প্রণাম জানাচ্ছি। আশীর্বাদ কর আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, আমাদের দয়া করতে। আমি জানি মা তোমার প্রার্থনায় আমি তরে যাব। তোমার কোণ্ঠী দেখিয়েছিলে আমাকে। সন্ধ্যে তা’ দেখেছিলাম। বিছাসাধ্যমত’ ফলাফলও জানিয়েছিলাম। মৃত্যুর ছয়ারে ঠাঁড়িয়ে শেষবারের মত বলছি এবং জোর করে বলছি, তুমি মা মহাভাগ্যবতী! স্বামী পুত্র রেখে গর্ভভরে চলে যাবে তুমি।’

সেই জ্যোতির্ময়বাবুর পরলোকগমনের সংবাদে স্বামীকে তাগিদ করিয়া তিনি লিখিলেন, ‘চলিয়া আইন, আর ওখানে থাকা হবে না।’ দেবীবাক্য অতৃপ্ত করা স্বামীর সাধ্যাতীত। পত্রপাঠ কলিকাতায় তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

স্বামী ফিরিলে স্বাক্ষরী বলিলেন, কোনও মতেই যাইব

না, রাখানগরের মাটি মাথায় না ছুঁয়াইয়া। তাঁর ইচ্ছামত আয়োজন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না স্বামী। রাখানগর হইতে সংবাদ আসিল, এখনই না আসা শ্রেয়ঃ। কিছু বিলম্ব করিতে হইবে। সতীরাগী বলিলেন, ভাল কথা।

দিন যায় সতীরাগীর বেশীর ভাগ সময় যাইতে লাগিল গঙ্গাস্নানে ও মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর পূজাদানে। বাটীতে নিত্যপূজা ত’ আছেই। তছুপরি চলিতে লাগিল শিশুপূজা। খুঁকু দাদিকে পাইয়া বসিল। আর কাজল গ্রাস করিল দাছকে। বাবলু মাতুলালয়েই থাকে বেশী, তার মাতার কায়িক পরিশ্রম বাঁচাইতে। কলিকাতায় বোমার স্বাস্থ্য সম্ভোষজনক বোধ হইল না।

বিকাশ হঠাৎ জানাইল তাহাকে জলপাইগুড়িতে গুপ্ত এজেন্টরূপে যাইতে হইবে। স্ততয়াং সকলের জলপাই-গুড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সামান্য মহাশয়কে জলপাইগুড়ির বাড়ী ঠিক করাইবার জন্ত পিতাকেও লিখিয়া বুড়ীর জন্ত অনুরোধ পত্রও প্রেরিত হইল। পরবর্ত্তী পত্রে বিকাশ জানাইল তাহার নারায়ণগঞ্জে থাকাই আবার স্থির হইয়াছে। আরও সে লিখিল তাহার একটা কোণ্ঠী পাঠাইতে, বোধে অফিসের জন্ত।

কিছুদিন আর কোনও চিঠিপত্র নাই। সংবাদ পাওয়া গেল কিছু অল্প স্ত্রে, বিকাশের স্বাস্থ্য ভাল নয়। সংবাদে জননী অতিষ্ঠ। স্বামীকে বলিলেন, নারায়ণগঞ্জে যাইবার সত্তা ব্যবস্থা কর।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া হ’একদিনের মধ্যে সতীরাগী স্বামীসহ রওনা হইলেন নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে। বধুমাতা বিমর্ষ। লোকজন বিশেষ দুঃখিত। কদিন ধরিয়া তাহাদের ভাবনা গোলমাল কত হবে সংসারে, মা যাইলে। খুঁকু কাজলকে দাছ-দাদি বুকে করিয়া রেখে-ছিলেন। সংসারের ব্যবস্থা চক্ষের নিমিষে হ’য়ে যাচ্ছিল মা যতদিন এসেছেন। হাঁক ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমরা। হবে আর কি। আবার পূর্বাবস্থা হবে।

দিন থাকতে দাদি খুঁকুর কাণে মন্ত্র দেন, যাবার সময়

কাজলকে ভাই সামলো তুমি। বেচারী খুব এই মন্তব্যে দাঁড় দাঁড়িকে ছেড়ে সে নিজে কি করে থাকবে ভুলিয়া গেল, কাজলকে সামলাইবার ধোঁগাড় করিতে ব্যস্ত রহিল। মোক্ষ কালে করিলও সে তাহা। পেন চলাচল ঢাকা-কলিকাতার মধ্যে তখনও হয় নাই। ট্রেন, ষ্টীমারই বাহন। রাজি নটার ট্রেনে শিয়ালদহ হইতে রওনা হইয়া পরদিন বৈকাল পাঁচটার পরে নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমার ঘাটে উভয়ে পৌঁছাইলেন। তথা হইতে বিকাশ পিতা মাতাকে সন্নিহিতবর্তী বাগা বাটিতে লইয়া গেল।

যাত্রাপথে যুদ্ধের দিনে অশ্রুবিধার অস্ত না থাকিলেও ট্রেনের কামরাতে কোনও অশ্রুবিধা তাঁহাদের হয় নাই। ষ্টীমারেও অবস্থান কষ্টদায়ক হয় নাই। সঙ্গে ঠাকুর রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া রেল বা ষ্টীমারে একবিন্দু জলও স্পর্শ করিলেন না সতীরাণী, যতক্ষণ স্নান ছপ মস্ত কার্য সমাধা না হইল। তাহা করিতে হইল বেলা দুইটা।

ষ্টীমার পরিচালনার দায়িত্ব তখনও পুরাতন ধারাতে। বিলি ব্যবস্থার সামান্য ইতর বিশেষ ঘটিলেও, মোটের উপর ব্যবস্থাদি বিশেষ সন্তোষজনক বোধ হইল। তবে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্ন বিলাসিতার স্রোতে নিমজ্জমান কয়েকজন যাত্রীর আচরণ ইতরোচিত হইবার উপক্রম করিলে, অস্ত্রাস্ত্র যাত্রীরা তাহাদিগকে এমনভাবে একঘরে করিল যে, তাহারা স্ব স্ব কামদাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। আপদ ঘুচিল।

সতীরাণী ষ্টীমারে বসিয়া মগ্ন রহিলেন পৌত্রীজন্ম, বোমা ও বিকাশের চিন্তায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টীমারের কিছু দেখিবার ইচ্ছাও তাঁহার হইল না। কয়েকবার ক্যাবিনের সম্মুখস্থ বারান্দায় পায়চারি করিলেন তিনি। মুখে দিলেন সঙ্গে লইয়া যাওয়া দুইটা সন্দেশ মাত্র। পান করিলেন লইয়া যাওয়া গঙ্গাজলের অংশ। ক্যাবিন ষ্টুয়ার্ড বার বার আসিয়া তন্মাস করিল, কি চাই, কি অশ্রুবিধা? উত্তর মিলিল—কিছু না, কোনও অশ্রুবিধা নাই।

একবার মাত্র ক্যাবিন ষ্টুয়ার্ডকে সতীরাণী বলিলেন, স্নান করিব। ব্যবস্থা হতে পারে? উত্তর পাইলেন, নিশ্চয়ই। দেখো, বাথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাব তো?

কেন পাবেন না। আমরা সব ঠিক ঠাক করে খবর দেব। স্নান করে আসবেন। ঝরঝরে বাথে স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। পরে ষ্টুয়ার্ড আসিয়া বলিল, ও বাথ আপনারই জন্ত রহিল। এখন ইচ্ছা যাবেন। চাবি খুলে দেবে।

ষ্টীমার হইতে অবতরণ করার পূর্বে ষ্টুয়ার্ড বলিল, আপনাদের মালপত্র সব ঠিকঠাক নামিয়ে দেওয়া, ভাববেন না কিছু। নিরুজ্জ্বল হইল তাহাই। সতীরাণী তাহাকে বখ্শিশ দেওয়ার সময়ে সে বলিল, কিছু করাইলেন না, বখ্শিশ কিসের! যা দিচ্ছেন, মাথাঘ তুলে নেব।

স্বস্তি স্বরে স্বামী বলিলেন, শুনেছি ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, দেখলাম ভগবতীর বোঝা ব'য়ে বাহক আপনাকে কত ভাগ্যবান, কত ধন্য মনে করে।

বাসাতে পৌঁছাতেই তৃত্য মিষ্টান্নাদি ও হুন্ড লইয়া উপস্থিত। তাহাতে বিকাশের মা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভৃত্যকে বলিলেন তিনি, ওসব এখন রাখ, পরে যা হয় হবে। লক্ষ্য করিলেন কিন্তু বাসনকোষণের প্রতি। বিকাশকে বলিলেন, ওসব কি বাসন, আমার বাসনপত্র...? পুত্র বলিল, চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন—সব? উত্তর—হ্যাঁ। হয়েছে আমার অশ্রুধের সময়ে। আরও চুরি হয়েছে। ভাল ভাল অনেক কাপড়চোপড় তোমাদের জন্ত এনে রেখেছিলাম, তাও গেছে। সাবধানে রেখো সব জিনিষপত্র। মাতা বলিলেন—চুটিয়ে সংসার চলছে তা হলে। ভাল!

ঘরহুয়ারে পোত পড়া। গৃহভৃত্য দ্বারা সুরাহা তাহার করা গেল না। গৃহিণী ঝকঝকে করাইলেন সব অল্প লোক আনাইয়া। ঘরের সংখ্যা ছোটবড় ছয়খানি। ঘরগুলির লাগোয়া একটি অপ্রশস্ত বারান্দা। বাটীর মধ্যে লোভনীয় স্থান, দক্ষিণদিকের নাভিদীর্ঘ চৌকো একটি বারান্দা। বিকাশের, তার পিতার ও মাতার নির্দিষ্ট বাসকক্ষের লাগোয়া। জলের চৌবাচ্চা আছে কিন্তু জলের অভাব। ইলেকট্রিক আছে কিন্তু নিয়মিতভাবে তাহা চালু থাকা সমস্তার বিষয়।

অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ভাবিত হইলেন গৃহিণী

খুবই, কিন্তু নিরাশ হইলেন না। হারিকেনের বন্দোবস্ত হইল। রাস্তার কল হইতে জল আনইবার ব্যবস্থা হইল। জল সরবরাহ নিয়মিতভাবে করানর লোক পাওয়া বড়ই কঠিন। তালিঝুলি দিয়া কোনও প্রকারে চলিতে লাগিল। অবশেষে বর্ধমানের একটি ছোকরা জুটিল। কেতাদোরস্ত, কাজ বড় জানে না, তবে অসম্ভব খাটিয়ে। কাজে লাগিয়াই গৃহিণীর কাছে কাছে সে সর্বদা থাকিতে অভ্যস্ত হয়। তারই ফলে সব রকমের কাজ শিখিতে কিছুমাত্র বিলম্ব তার হয় না। আর জলে বাড়ী ভাঙ্গাইয়া দিতে লাগিল। মায়ের কথায় সে উঠে বসে।

গৃহিণীর চালনায় ও চৃত্যের পরিশ্রমে বাটীর শ্রী ফিরিয়া গেল। বালিমাটির দেশে বাসস্থান খিতলে হওয়া হেতু সহজে তাহা হইতে লাগিল। বাটীর মালিক সপরিবারে নীচের তলায় থাকেন।

বাড়ীঘর শুছান শেষ হইলে পাড়াপ্রতিবেশীর দিকে নজর দিবার অবসব মিলিল। অবশু পল্লীর কস্তারা কেহ কেহ প্রথম হইতেই আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাশের বাটীর রায় ও তাঁহার পত্নী আসিবা আলাপ করিয়া যান নবাগতেরা আসিবার কয়েকদিনের মধ্যে। আর আসেন ডাক্তার...সতীরাণীব পিতার একজন প্রিয় ছাত্র বলিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন। বিকাশ জানায় যে, তাহার অসুস্থতার সময়ে ডাক্তারবাবুই তাহার দেখাশুনা করেন। এই পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা তাঁহার বড় পরিচয় অহুমিত হয়।

স্বামীর অক্লান্ত সহযোগিতায় সতীরাণীর সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। স্বামীর কাছে দূরের ও নিকটের অনেক লোক আসিতে আরম্ভ করে। তাহাদের অধিকাংশই আইনজীবী। আগন্তকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন তাঁহাদের মধ্যে। তাহাতে সুবিধা হয় না। তবে এই আশ্বাস তাঁহারা লইয়া যান যে, তাঁহাদের প্রয়োজন পড়িলে সাহায্য করিবেন তিনি সাধ্যমত।

পত্নী খুবই ছোট-কিন্তু পরশ্রীকাতরতার পরিচর্যা সেখানে বিস্তৃত। আশ্চর্যের কথা এই যে, এখানেও সতীরাণীর সুখ্যাতি জনে জনের মুখে শুনা গিয়াছে তাঁর

আগমনের কাল স্বল্প হইলেও, সম্ভবতঃ তাহাদের মহিলা মহলের প্রেরণা ইহাতে ছিল।

আগন্তকদের সর্বাপেক্ষা শুভার্থী শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন আসেন সর্বপ্রথম এবং আসিতে থাকেন নিত্য কোন-না-কোন সময়ে। সতীরাণীর পাদবন্দনা করিয়া তাঁহার প্রথম কথা, আমার সঙ্গে লজ্জায় ইতস্ততঃ করলে অনর্থ ক'রব। আমি কে জানেন? আপনাদের ছেলে। প্রাণ-খোলা কথায় মুগ্ধ হ'ন সতীরাণী। মায়ের প্রাণ! স্নেহরসে তার সম্বন্ধনা চিরদিনই হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবুর পরিবার-বর্গের আত্মীয়তা ও সতীরাণীর উদারতায় অনায়াসলভ্য হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জে এই পরিবার ও গীতার মা (রায় মহাশয়ের স্ত্রী) সতীরাণীর মুখের কথা শুনিবামাত্র তাহা করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের সব কাজ ফেলিয়া। পল্লীর বয়স্ক কস্তা জাপানী, কমলা মাসিমা বলিতে অজ্ঞান। গায়িকা স্বেচ্ছায় আসিয়াছে মহারাণীকে গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইতে। আর কালীবাড়ীর যোগীতুল্য বুদ্ধ ব্রাহ্মণ মা মা রবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন যখনই সতীরাণী উপস্থিত হইয়াছেন দেবীস্থানে। যোগীবর মা কালীরই আরাধনা করিতেছেন বলিয়া ভ্রম হইয়াছে কাহারও কাহারও সেই মা মা রবে। ভ্রমের কথা শুনিয়া যোগীবর বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, “ভ্রম নয়রে ভ্রম, নয়। মাকে চাস ত’ মা মা ব’লে ওই মাকে ডাক আগে। করালবদনী উনি নন, উনি স্নেহপীযুষদায়িনী।”

নীরবে ভগবানের সাধনপূজনই সতীরাণীর আবহমান নীতি। উদ্ভেজনা উদ্দীপনার পক্ষপাতিত্ব তিনি নহেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মপ্রাণ অধ্যক্ষ বোধহয় তাহা লক্ষ্য করেন এবং ভক্তিমতীর ভগবত সেবার প্রকরণে পরম সন্তোষলাভ করেন। স্বচ্ছ দর্পণে তিনি যেন দেখিতে পান, প্রত্যক্ষ অসুভূতি ইহার আসিবেই আসিবে। একদিন সে কথা তিনি বলিয়া ফেলেন একটি ব্যাপারে।

মহাপূজার মহাষ্টমীতে অঞ্জলী দিতে যাইতে সতীরাণী স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা ভীতিপ্রদ—রক্তচাপাধিক্যে তিনি সম্পূর্ণ অসুস্থ। চিকিৎসকের নির্দেশে নড়াচড়া তাঁর একেবারে নিষিদ্ধ। সেই অবস্থাতে চলিলেন তিনি আশ্রমে অঞ্জলী দিতে।



আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহার সেই অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'মা, আপনার অঞ্জলি মাতৃপদে বহু পূর্বে পৌছাইয়াছে। লৌকিকভাবে অঞ্জলি দিতে চান, আসুন দিন।' শুক হইয়া সতীরাণী সে কথা শুনিলেন। দেবীপদে প্রণাম করিলেন, স্বামীকে প্রণাম করাইলেন।

বলিলেন আপন মনে, জানি আমি এ দেবী প্রাণবন্ত, পূজামহিমায়। প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি!

কিরিয়া গেলেন গৃহে, প্রফুল্ল হৃদয়ে। পথ যাওয়া-আসাতে রোগ বাড়ে নাই। শারীরিক কোন অঘটনও ঘটে নাই।

পাকিস্তান হইবার পূর্বে নারায়ণগঞ্জে আমরা যাই। যাইয়া দেখি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আদা-কাঁচকলার মনোভাব। রেঘারেঘি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বঙ্গ-বিভাগ হইল। গান্ধীহত্যা ঘটিল।

গান্ধীহত্যা সংবাদে সজে সজে খবর আসিল, বোমা মাদ্রাজে মারা গিয়াছে। তার দৈহিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে, সতীরাণী কলিকাতা হইতে আসিবার পর হইতেই। বাড়াবাড়ি অবস্থা জানিয়া শতর বধুমাতাকে দেখিয়া আসিয়া জানাইলেন, অবস্থা ভীতিপ্রদ। চিকিৎসার্থে মাদ্রাজে যাওয়া স্থির হইয়াছে। মাদ্রাজে যাওয়াও হয়, কিন্তু চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় নাই।

বোমার মৃত্যুসংবাদ তৎক্ষণাৎ সতীরাণীকে জানান প্রেয়ঃ মনে হইল না। দু'তিন দিনের মধ্যে স্বামীকে সতী বলিলেন, বোমা নেই। ব'লে গেছে সে নিজে এসে। থুঁকুদের কি হবে? উত্তরের অপেক্ষা ক'রলেন না তিনি। বলিলেন থুঁকু আমাদের কাছে এসে থাকুক। কয়েক মাস বাদে থুঁকুর বাবাও জানান, থুঁকু যেতে চায়।

থুঁকু এলো। রইল মনের আনন্দে কতদিন। তাতে বাধা প'ড়ল সহরে মহামারী আরম্ভ হওয়াতে।

তখন তাকে নারায়ণগঞ্জে রাখা ঠিক মনে হ'ল না। যেতে হবে শুনেই কেঁদে ভাসাল থুঁকু। সুর ক'বে দিল, 'যাব না আমি'। বহু সাধ্যসাধনায় রাজী হ'ল সে যেতে, এক শর্তে। আসবে আবার সে শিগ'গির। দাদি তার, বুকে ক'রে তাকে আশ্বাস দিলেন। পাসপোর্টের দৌরাস্তায়ে আবার আসতে বিলম্ব হ'ল। সে পরের কথা।

স্থানীয় রামকৃষ্ণাশ্রম মন্দিরে ভগবন্তাবের প্রবাহে সতীরাণী পুলকিতা হন। আশ্রমাধ্যক্ষ পরম ভক্তিবান্, আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তিনি সতত একমন, একপ্রাণ। বাহ্যডম্বর কিছুমাত্র নাই। তেজস্বী, কিন্তু বিনয়ী। মন্দির সম্বন্ধে কঠোর নিয়মাহুযর্তী হইয়া পরম লোকপ্রিয় তিনি। সাধনায় তন্ময়, আরাধনায় ভাবময়। ইষ্টদেবের চরণে গীত-গাথার অঞ্জলি দানে বাহুজ্ঞান থাকে না তাঁহার। জ্ঞান অর্জনে দীনের দীন হইয়া ভিক্ষা করেন তিনি যিনি যাহা কিছু দিতে চান।

মিশনের পাঠাগারস্থ ধর্মগ্রন্থরাজি পরিপাক তিনি করেন, স্নানপ্রসাদের সহিত বহুদিন যাবৎ একত্র অধ্যয়ন করিয়া। সে সকলের আলোচনায় সৃষ্টি হয় হস্তলিখিত একাধিক স্রবুহৎ সারবান টীকাগ্রন্থ। বলেন তিনি, ইহা হইল আশ্রমের মূল্যবান সম্পদ।

সতীরাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শোভাপযোগী চাক্ষুশি স্রবুহে তৈয়ারী করিয়া দিতেছিলেন ধীরে ধীরে, শ্রীপদে তাঁহার ভক্তি অঞ্জলিরূপে। সে সকল দেখিয়া এবং কোথা হইতে আসিয়াছে জানিয়া, স্থানীয় শিল্পী ধর্ণা দিয়াছে সতীরাণীর দ্বারা, তাঁহার শিগ্রহ গ্রহণ করিতে। সূচী-শিল্পাদিতে প্রতিভাশা পূর্ববঙ্গে সতীরাণীর এভাবে সম্মানিত হওয়া সূচিশিল্পাদিতে সতীরাণীর স্থান কত উচ্চে, আনন্দজ করা কাহারও পক্ষে কঠিন হইবে না।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢাকার এজেন্ট নির্ধারিত হয়। বিকাশ। নারায়ণগঞ্জে তিন বৎসরাধিক কাটাইয়া প্রতরাং ঢাকা রওনা হইতে হয় যথাসময়ে। বিদায় দান ও গ্রহণ মর্ম্মস্পর্শী বিলাপে সমাপ্ত হয়।

'বার' প্রেসিডেন্ট মজুমদার মহাশয় কাদিয়া ফেলেন। মিশন ও আশ্রম অধ্যক্ষ বিশেষ এক নিভৃত অস্থানে স্নানপ্রসাদকে বিদায় অভিনন্দন জানান স্নকরণ গীতমাল্যে।

কর্তার খামখেয়ালীতে বঙ্গভঙ্গ হইলেও, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ মিলিত থাকে এইভাবে। মজুমদার মহাশয় সতীরাণীকে দেখাইয়া তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বলেন, "দেখ কত মহৎ, কত বিনয়ী!"

(ক্রমশঃ)

# বিশ্বকবির অনুধ্যানে চন্দননগর

শ্রীহরিহর শেঠ

( “ ” চিহ্নিত অংশগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত )

১

নব প্রকাশিত ‘প্রবাসী—ষষ্টিবাষিকী’ গ্রন্থখানি দেখিতে দেখিতে কবিশঙ্কর ও চন্দননগরের কথায় পূর্ণ শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয়েব ‘২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭’ প্রবন্ধটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে একস্থানে দেখিলাম—“চন্দননগর কত দর্শনীয় ভরা ফরাসীদের রাজত্ব। আমি শুধু জেনেছি, একটি রেল স্টেশন মাত্র। আর কিছু দেখিনি সেখানকার। তারপর দেখলাম ছগলী নদীর ঘাট। যে ঘাটে রবীন্দ্রনাথের হাউস-বোট বাঁধা আছে। অধ্যাপক গল্পের নায়ক চন্দননগরের যে ঘাটে তার শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং যে শকুন্তলার তপোবন কুটীরটি গঙ্গার ধারেই ছিল, সেটি ঠিক কথের কুটীরের মতো ছিল না। গঙ্গা থেকে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দায় উঠে গেছে। বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদে ছায়ায়।”

আমি ত সামান্য, চন্দননগরের এমন সম্ভান কে আছেন, যিনি এইটুকু পাঠের পর ‘অধ্যাপক’ গল্পটি না পড়িয়া পারেন! আমি সম্ভান করিয়া রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ দ্বিতীয় খণ্ডে গল্পটি পাইলাম। যদিও কবিশঙ্কর রচিত কোন-কোন গল্পে নায়কের কোন নামের পরিবর্তে উত্তম পুরুষ আমিই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, সাধারণতঃ লেখকেরা কোন-না-কোন একটি কাল্পনিক নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গল্পেও প্রকৃত নাম অপ্ৰকাশ রাখিয়া, ঐরূপ যাহা হয় পছন্দমত একটি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে নাম নাই, তৎপরিবর্তে উত্তম পুরুষই ব্যবহৃত হইয়াছে।

নায়ক একস্থানে বলিতেছেন,—“মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্ত আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক, পদ্যে হউক, খুব ‘সার্লাইম’-গোছের একটা-কিছু লিখিব; বাঙালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক যোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। \* \* \*

বন্ধু অমূল্যকে ডাকিয়া তাহার প্লান বলিলেন। সে গম্ভীর মুখে নায়কের হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র তাহার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মুহূর্তেরে কহিল, “যাও তাই, অমর কীর্তি, অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।”

ইহা শ্রবণে নায়কের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তাহার মনে হইল, “যেন আসন্ন গৌরব গবিত ভক্তি-বিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল। \* \* \* সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসিভাঙার বাগানে অমর কীর্তি, অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।”

এই গল্পের সাধে বাগানবাড়ীর যে সামান্য-সামান্য বর্ণনা গল্পটিতে যুড়িয়া আছে তাহাতে এই স্থানটির প্রতি নায়কের একটা অকৃত্রিম অনুরাগের মতই প্রকাশ পায়। বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে দেখা যায় বাড়ীটির সম্মুখে গঙ্গা, পরপারে নৈহাটি, পশ্চাতে রাজপথ, উত্তর দিকে বকুলবীধি। সংলগ্ন বাড়ীর কথায় গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ীর বারান্দার উপর উঠিয়াছে, এই একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়।

অন্যদিকে নায়কের সম্পর্কে জানা যায়—বয়স একশ প্রায় উত্তীর্ণ। দেহের বাহ্যিক কোন বর্ণনা না থাকিলেও, আভ্যন্তরীণ যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে নায়ক নিজেকে যে শুধু একজন শক্তিসম্পন্ন স্নেহলব্ধই মনে করেন তাহাই নহে, এজন্য যেন একটা আত্মগরিমায় তাঁর মন সমাচ্ছন্ন।

গল্প, আত্মবিশ্লেষণ, উপজ্ঞানের প্রধান কথা যে নায়ক নায়িকার প্রেম-ভালবাসা তাহা হইতে এ গল্পটি যে মুক্ত তাহা নহে; সে বিষয়ের আলোচনা বা গবেষণার এখানে আবশ্যকতা নাই। নায়িকা কিরণবালা, বি. এ. পরীক্ষার

ফল প্রকাশিত হইলে পরীক্ষায় নায়কের নিজের অকৃত-  
কার্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অন্য  
সহীদাছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন  
জানিয়া তাঁহার “ভ্রাম্মচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া  
কহিলেন, হয় হউক—আমার রচনাবলী আমার  
জয়স্তুত।” এই বলিয়া খাতা হাতে সবলে পা ফেলিয়া,  
মাথা পূর্বাঙ্গের উচ্চ তুলিয়া কিরণবালার পিতা ভবনাথ-  
বাবু বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নৈরাশ্র, অহংকার,  
আত্মমর্বাদাত্মভূতি প্রভৃতিতে তখন তাঁহার মনের এমন  
একটা অবস্থা হইল যে, তিনি তাঁহাব বাড়ীতে আদিয়া  
বচনাবলীর খাতাবানা পুড়াইয়া ফেলিলেন। তৎপরে  
তিনি দেশে ফিরিয়া যাইলেন এবং তথায় গিয়া বিবাহ  
করিলেন। “গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা  
ছিল, তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা  
লাভ করিলাম।” নায়কের এই উক্তি দিয়া আখ্যায়িকার  
শেষ করা হইয়াছে।

## ২

সমগ্র গল্পটি হইতে পাওয়া যাইতেছে, নায়কের চন্দন-  
নগরের প্রতি যে প্রীতি ও অমুরাগ তাহা অতুলনীয়।  
গল্পের মধ্যে ঠিক চন্দননগর কথাটি নাই, আছে ফরাস-  
ডাঙ্গা। নৈহাটীর পরপারে ফরাসডাঙ্গা বলিতে চন্দননগর  
ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

সান্নাইম্ গোছের কিছু লিখিবার জন্ত, জীবনের  
সর্বপ্রধান কীর্তির সৃষ্টিকার্য সমাধার জন্ত; অমর কীর্তি,  
অক্ষয় গৌরব উপার্জনের জন্ত গল্পের নায়ক চন্দননগরের  
গঙ্গার ধারের বাগানকেই উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া  
তথায় আসিলেন।—আসিবার প্রাক্কালে বন্ধুর অমূল্য  
কাছে যখন তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন সে  
একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। নায়কের কথা “সে  
যেন তখনই আমার লগাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্তী ভাবী  
মহিমার প্রথম অরুণজ্যোতিঃ দেখিতে পাইল।” বন্ধু  
যখন বলিল “যাও ভাই, অমর কীর্তি, অক্ষয় গৌরব  
অর্জন করিয়া আইস”, তখন নায়কের শরীর বোম্বাঙ্কিত

হইয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, যেন আসন্ন গৌরব-  
গর্বিত ভক্তিবিশ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য  
এই কথাগুলি তাঁহাকে বলিল।

বলা বাহুল্য, সাধারণ কোন যুবকের বা লেখকের পক্ষে  
এবমুখ্যকার বড় বড় কথা বা ভাব মনে হওয়া সম্ভব নহে।  
সুতরাং এই কল্পিত নায়ক একবিংশতি বর্ষীয় নবীন  
যুবকটিকে কতকটা অসাধারণ করিয়াই বর্ণিত করা  
হইয়াছে। ইহার চন্দননগর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, চন্দন-  
নগব-প্রীতি, নিজের মনে অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যেন  
কতকটা বিশ্বাস কর। আমবা চন্দননগরবাসী, এই আমাদের  
জন্মস্থান কর্মস্থান। সত্যই এখানে দীর্ঘদিন হইতে বহু  
মহাপুরুষের আগমন ও বসবাসে এই স্থান ধন্য হইয়াছে,  
কিন্তু কেন এ মহিমা তাহাও বুঝি না।

এই গল্পের লেখক বর্তমানের বিশ্ববন্দিত মহামানব  
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এমনই উদাস্ত কণ্ঠে এই স্থানের কথা,  
এখানকার গঙ্গার কথা, একটি বাগানবাড়ীর কথা তাঁহার  
স্মৃতি-কথায়, ভাষণে ও যখনই কোন উপলক্ষ আসিয়াছে,  
তখনই বলিয়াছেন। আখ্যায়িকায় বর্ণিত বাগানবাড়ীর  
কথায় স্বতঃই যেন তাঁহার সেই একবিংশতি বর্ষ বয়সের  
এখানকার বাসভবন মোরান সাহেবের বাগানবাড়ীর  
কথা মনে আনিয়া দেয়। কবির নিজের কথা “আমার  
কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে  
সকলের চেয়ে স্মরণীয়।”

কবি লিখিত আর কোথায় কি আছে জানি না,  
‘আপদ’\* শীর্ষক আর একটি ছোট গল্পে চন্দননগরের  
বাগানবাড়ীর উল্লেখ দেখা যায়। এখানে এই স্থানকে  
নষ্ট-স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের উপযুক্ত স্থান রূপে উল্লিখিত  
হইয়াছে। এ গল্পের নায়িকারও নাম কিরণ। সুতরাং  
দেখা যাইতেছে—গল্প বচনাকালেও এত সব স্মন্দর  
স্বাস্থ্যকর সহর থাকিতে যে নগরে তাঁহার কবিজীবনের  
উদ্বোধন হইয়াছিল বলিয়া কবিগুরু বার বার বলিয়াছেন,  
সেই চন্দননগরের কথা মনে আসিয়াছে। চন্দননগরের  
পক্ষে ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের কথা মনে করি না।

\* গল্পসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে গল্পটি আছে।

## উপেক্ষা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

ভুলের কালোয় আলোঢাকা প্রাণ  
আধারে চালায় জীবন-রথ  
খুঁজিয়া না দেখে ক্ষণিকের তরে  
থমণি শোভিত চলার পথ ।  
ক্ষুধিত পাষণ ভোগলালসায়  
ভান্ননের পথে ভাবনাহীন  
কামনা-কুহুমে পুঞ্জিছে পরাস  
পর্যণ পর্যগ ধূলি মলিন ।  
দৈবী লুকায়ে দানব জেগেছে উজ্জানে  
জৈবী জাগরী মরণ বরণ উচ্ছাদে ॥  
শোণিত-সায়রে স্বসিছে নিয়ত  
অজগর সম অসীম রোষ,  
হৃদয়-আকাশে ঘনাইয়া আসে  
ঘন তমিস্রার স্নান প্রদোষ ।  
নীলিমার বৃকে জলভরা মেঘে  
মরম মথিয়া বিজুরীমালা  
জানায় সবারে ধরণীর পারে  
নামিয়া আলিছে দহন জ্বালা ।  
পশুর কামনা পাবকে পুড়িয়া আজ  
সোনার দেউল পরিছে দৌনের সাজ ॥  
লুকাইছে লাঞ্জে মাতুষী মরম  
গুহার গহীন ঐধার তলে  
তাম্রসী তপতী শৈলুয়া নিতি  
শ্মশানে শবরী নাচিয়া চলে ।  
মরণের গান গাহিছে সমনা  
পুলকে পড়িয়া পলাল বেশ  
মনের মদিরা মাতুষে লুকায়  
মধুজা হারায় মাধুরী লেশ ।  
লাঙ্ঘিত হ'ল মহীর মহান মমতা  
বঞ্চিত বৃকে বেদনাবিধুর বারতা ॥

খেলিছে চপল চলচঞ্চল—  
হারান ক্ষণে ও চেতনাহীন  
শত অভিমান ফেনায়িত বৃকে  
ছলনায় ভরা বাক্ প্রবীণ ।  
প্রীতি ও প্রেমের পরম বাণীর  
লিপিকা পাঠায় ললিত ছন্দে—  
শাস্তির অররে নিজেই অবরি  
সারণ লোলুপ মরণে বন্দে ।  
বিষাইছে বায়ু বিলোম বিলাস ধ্যানে ;  
নিভাইছে আলো অন্তত পরাধি জ্ঞানে ॥  
জ্বরের খেয়ায় বিঘোষিছে বাণী  
ব্যথার গাথায় চির উত্তল  
মরমে পোষিছে অস্থির তৃষা  
মানবের ভানে দানবের দল ।  
আশীবিবভরা ফুলদলে ঢাকি'  
মিলনের রাশী বাঁধিছে হাতে  
অশনি লুকায়ে জ্বলদ আড়ালে  
প্রেতের কাকলি নিশীথ রাতে ।  
ঘরে ঘরে তা'র রণ-তৃষ্ণায় তৃষিত,  
হৃদয় নিরঞ্জন সমরায়োজনে ভূষিত ॥  
মহামানবতার মহান মঞ্চে  
কাজল কালিমা দিতেছে ঢালি—  
হেরিছে মৃত্যুতা পরিতাপহীন  
অশিব বোধন প্রদীপ জালি' ।  
প্রকৃতির স্নেহ শীতলতা নাশি'  
গরবে ভরিছে আকাশতল  
কেতন উড়াষ, দূর নীলিমায়  
শাসনের ত্রাসে নভঃ চপল ।  
অণুর তনিমা ভাঙ্গে বিজ্ঞানী-বাসনা  
ধরণীর বৃকে ফুটাতে ছন্দ অসম ॥

পুত অবদান ভরা বিজ্ঞান  
ধরায় আনিতে আশীষধারা—  
অজ্ঞান ঘন অপুত পর্যাণে  
উষর মরুতে হ'ল সে হারা ।  
পূজাবেদীতল শোণিত পিছল  
দানবী দৃশান জেগেছে আজ  
বাজায়ে প্রলয় বিঘের বিষণ  
দৈশান পরেছে বিষাদ তাজ ।  
পথের দিশারী মরমী কবির বাণী  
মাটির মানসে পায় পরিহাসখানি ॥

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসম্ভবগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

(পূর্ক প্রকাশিতের পর : ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ (জামুয়ারী-জুন)। ১৩৫৫-৫৬ বঙ্গাব্দ)

২৩

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

২ জামুয়ারী—মৈমনসিংহের মহারাজকুমার সিতাংশুকাশ  
আচার্যের পৌরোহিত্যে “প্রবর্তক মহিলা সদন”  
(ছঃস্থা নারী প্রতিষ্ঠান)-এর পারিতোষিক  
বিতরণোৎসবে সম্ভবগুরু ভাষণ।

৬ জামুয়ারী, ২২ পৌষ, ১৩৫৫ বঃ—শ্রীশ্রীসম্ভবগুর ৬৭তম  
আবির্ভাবোৎসব। এতদুপলক্ষে চন্দননগর আশ্রমে  
উপাসনা, ধ্যান, দীক্ষা-ক্ষেত্রে দীপদান। প্রথম  
আত্মনিক দীক্ষার্থীগণের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়  
পুনরায় দীক্ষার্থীগণসহ সম্ভবগুর দীক্ষা-ক্ষেত্রে  
হোমাত্মন কার্যে যোগদান ও হোমাত্মে আশীর্বাণী  
প্রদান। ৮ই জামুয়ারী মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জির  
সভাপতিত্বে উৎসব-সভায় সম্ভবগুর ভাষণ। ২ই  
জামুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-  
চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভা-  
পতিত্বে উৎসব-সভা—সম্ভবগুর ভাষণ।  
এতদুপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র  
রায় ও অধ্যাপ্ত হৃদয়বর্গের শুভবাণী প্রেরণ। (১)

৬ জামুয়ারী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. কলেজের  
প্রায় ৫০জন ছাত্রছাত্রীর চন্দননগর আশ্রমে উৎসব-  
দিবসে আগমন ও সম্ভবপরিদর্শন ও তাঁহাদের প্রতি  
সম্ভবগুর উপদেশ-বাণী।

১৩ জামুয়ারী—হজরত মহম্মদের জন্মতিথি উপলক্ষে চন্দন-  
নগর কুটিঘাটে মুসলমানদের অহুষ্ঠিত সভায়  
সম্ভবগুর বক্তৃতা।

১৪ জামুয়ারী—চন্দননগর সম্ভবকেলে পূর্ণিমা সম্মেলন—  
সম্ভবগুর বাণী প্রদান।

(১) সম্ভবগুর আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের  
মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের শুভ-বাণী :

“মতিযাবু ভো সারা ভাবতের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার জন্মদিনে আমরা  
ভগবানকে স্মরণ করি এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি জনোত্তরিত পথে  
আমাদের দেশকে লইয়া যান।”—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৮ জামুয়ারী ১৯৪৮ খঃ ডিসেম্বর মাসে প্রবর্তক আশ্রমে  
অহুষ্ঠিত ‘অখিল ভারত দেবভাষা পরিষদে’র অধি-  
বেশনে সংস্কৃতভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান,  
আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা ও  
কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য-পাঠ্য করার  
প্রস্তাবাবলী একটি “স্মারক লিপি”-তে সন্নিবেশিত  
করিয়া ইউনিভারসিটি কমিশনের নিকট দাখিল।  
সম্ভবগুর, মহামহোপাধ্যায় চিত্তস্বামী শাস্ত্রী, মহা-  
মহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, শ্রীজীব জায়তীর্থ  
প্রভৃতি সদস্যগণ কর্তৃক স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর।

২২ জামুয়ারী—বেলঘরিয়া প্রবর্তক জুট মিল প্রাঙ্গণে  
কলিকাতা-কেন্দ্রের পূর্ণিমা সম্মেলনের ষষ্ঠ  
অধিবেশন—সম্ভবগুর ভাষণ।

২৩ জামুয়ারী—সম্ভবগুর পৌরোহিত্যে চন্দননগর  
লক্ষ্মীগঞ্জে নেতাজী হত্যাকাণ্ডের ৫৩তম জন্মোৎসব  
সভায় সম্ভবগুর শ্রদ্ধা নিবেদন।

২৩শে জামুয়ারী—সম্ভবের গভর্নিং বডির অধিবেশনে সম্ভব-  
গুর বক্তৃতা।

৩০ জামুয়ারী—সম্ভবের শ্রীমন্দিরে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম  
মৃত্যু-বার্ষিকীর অহুষ্ঠান—সম্ভবগুর শ্রদ্ধাঞ্জলি  
প্রদান। অপরাহ্নে জনসভায় সম্ভবগুর বক্তৃতা।

৩ ফেব্রুয়ারী—শ্রীশ্রীসরস্বতী পুণ্ড্রোপলক্ষে সম্ভবগুর বাণী।

১২ ফেব্রুয়ারী—সম্ভবগুর পৌরোহিত্যে প্রবর্তক সম্ভব  
অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ২৬শ বার্ষিক সাধারণ সভা।

১৩ ফেব্রুয়ারী—মাঘী পূর্ণিমোপলক্ষে অহুষ্ঠিত সম্ভব-  
সম্মেলনে সম্ভবগুর ভাষণ।

১৩ ফেব্রুয়ারী—প্রবর্তক আশ্রমে চন্দননগরের নব  
নির্ধারিত পৌর-সভার সদস্যবৃন্দের প্রীতি-সম্মেলনে  
সম্ভবগুর আশীর্বাণী।

১৮ ফেব্রুয়ারী—সম্ভবগুর পৌরোহিত্যে কলিকাতায়  
প্রবর্তক প্রিটিং এণ্ড হাকটোন লিঃ-এর বাটীতে  
পূর্ণিমা সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অহুষ্ঠিত।

- ২০ ফেব্রুয়ারী—তারকেশ্বরের মোহন মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ আশ্রম মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৈহাটি পালবাগানে পরলোকগত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যভূষণের ১১০ বার্ষিক জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান। সজ্জগুরু প্রদ্বা-ভাষণ।
- ২৫ ফেব্রুয়ারী—সজ্জ শিবরাত্রি ব্রতপালন, সজ্জগুরু বাণী।
- ৬ মার্চ—২৮ ফেব্রুয়ারী যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর দেশনায়িকা সরোজিনী নাইডু বৃত্তান্তে আশ্রমে শোকসভা।
- ১৩ মার্চ—চুঁচুড়া দে পাড়ায় “ত্রিতাপ শাস্তিনিকেতন” হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে সজ্জগুরু বক্তৃতা।
- ১৪ মার্চ—দোল-পূর্ণিমায় সজ্জ-সম্মেলনে সজ্জগুরু বাণী।
- ১৬ মার্চ—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন।
- ১৯ মার্চ—নব-বঙ্গ-সমিতির উদ্যোগে ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গ-বিহারের সীমানা পুনর্নির্ধারণের দাবীতে সজ্জগুরু সভাপতিত্বে কলিকাতা ‘মহাবোধি সোসাইটি হল’-এ সর্বদলীয় জনসভা—বাংলাভাষাভাষীদের লইয়া। প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য সজ্জগুরু আবেদন। সভায় অস্ত্রান্ত বক্তাগণ—বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এন্. কে. গাঙ্গুলী।
- ১৯ মার্চ—সজ্জগুরু সহিত সেচ-মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের সাক্ষাৎকার ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনা।
- ৩ এপ্রিল—সজ্জের গভর্ণিং বডির অধিবেশনে সজ্জগুরু বক্তৃতা।
- ১৩ এপ্রিল—সজ্জ পূর্ণিমা সম্মিলনীতে সজ্জগুরু ভাষণ।
- ১৪ এপ্রিল, ১লা বৈশাখ ১৩৫৬ বঃ—নব বর্ষারম্ভ, সজ্জ বর্ষ-বন্দনা-উৎসব — সজ্জগুরু আশীর্বাণী ও জ্যোতিষের দৃষ্টিতে ভারতের ভাগ্যপাঠমূলক ভাষণ।
- এই বৎসরে বৈশাখ মাস হইতে “প্রবর্তক” পত্রিকায় সজ্জগুরু “শ্রীশ্রীচণ্ডী” রচনারম্ভ।

১৭ এপ্রিল—সজ্জের অন্তরঙ্গ সভা স্বামী পরমানন্দজীর পরলোক-গমনে ( ৭ই এপ্রিল, ২৪ চৈত্র, ১৩৫৫ বাং ) সজ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণাসর—সজ্জগুরু মর্মবাণী। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সজ্জের শ্রীমন্দিরে স্মরণ-সভায় নলিনচন্দ্র দত্ত, স্বামী বোধানন্দ, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র দত্ত ও রেণুকা ঘোষ কর্তৃক এই ষাঁটি সজ্জধর্ম্মী, গুরুনিষ্ঠ ও প্রেমিকের পুণ্য জীবন-চরিত্র আলোচনা। স্বামীজির বিদেহী আত্মাব স্মরণে সজ্জগুরু আবেগময়ী বাণীপ্রদান।

২২ এপ্রিল—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জের অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ ও মহানগরীর সজ্জ-সুহৃদগণের যোগদান। সজ্জগুরু ভাষণ।

১ মে, ১৮ বৈশাখ, ১৩৫৬ :—ঐতিহাসিক-শিরোমণি ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৭ বর্ষীয় প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ২৮শে এপ্রিল হইতে তিন দিবস শ্রীমন্দিরে সজ্জগুরু নির্দেশে মন্ত্রেব পুরস্চরণানুষ্ঠান। পূর্ণিমা পর্যন্ত দ্বাদশ দিবসব্যাপী উৎসবে বিভিন্ন দিবসের সভাপতি ও বক্তাগণ—ডাঃ স্বরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যক্ষ হরিন্দাস ভট্টাচার্য, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, কপিল দেবশর্মা, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ স্ববোধকুমার গাঙ্গুলী, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক পঞ্চানন সিংহ প্রভৃতি। পূর্ণিমা দিবসে আশ্রম সালগ্রহ গঙ্গার ঘাটে অবত্থ স্নানের অনুষ্ঠান।

১৮ মে—সজ্জের অমুবাণী গৃহীত ভক্ত অকণচন্দ্র সোমের বাটতে উপাসনা-বার্ষিকী উৎসবে সজ্জগুরু যোগদান ও আশীর্বাণী।

২০ মে—সজ্জগুরু পৌরোহিত্যে প্রবর্তক ফাগুশাসি-লিঃ-এর কলিকাতা, ৪০ নং ট্যাংরা রোডস্থ ফ্যাক্টরীতে পূর্ণিমা সম্মেলনেব দশম অধিবেশন। সজ্জগুরু বাণী।

১০ জুন—কেন্দ্রতীর্থ চন্দননগরে পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জ-গুরু ভাষণ।

১১ জুন—চন্দননগরে আর. ডি. জি. এণ্ড কোং-র কাঠের কারখানায় পূর্ণিমা সম্মেলন। কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, সজ্জ-সত্য-সভ্যার যোগদান—সজ্জগুরু ভাষণ।

১৫ জুন—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে সজ্জগুরু ভাষণ।

১৯ জুন—আন্তর্জাতিক আদালতের পর্যবেক্ষকদ্বয়ের (Neutral observer) উপস্থিতিতে ফরাসী চন্দননগর ভারতরাষ্ট্রে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে গণভোট (Referendum) গ্রহণ—গণভোটের সাফল্যে সজ্জগুরু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ও সজ্জের সাপ্তাহিক মুখপত্র সবসঙ্গে “জয়ন্ত চন্দননগর” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ। (২)

২০ জুন, ৬ আষাঢ়—শ্রীশ্রীসম্মজননীর ৫৯তম আবির্ভাব-

(২) চন্দননগরে ১২শে জুনের গণভোটের ফলাফল।

ভারতরাষ্ট্রে সংযুক্ত হওয়ার পক্ষে ৭৪৭৩ জন ও ফরাসী ইউনিয়নের পক্ষে ১১৪ জন ভোট দিয়াছিল।

উৎসব—এতদুপলক্ষে সমবেত উপাসনা, সজ্জবাণী পাঠ, মায়ের অল্পাধ্যান, পূজা, হোম, ভোগাবতি।

কংগ্রেসের বৈদেশিক পররাষ্ট্রীয় সম্পাদক এন. ভি. রাজকুমারের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা। সজ্জগুরু ভাষণ।

২১ জুন—সজ্জগুরু সভাপতিত্বে চন্দননগর হিন্দুস্থানী এসো সিয়েশনের উদ্বোধন: এন. ভি. রাজকুমারের উদ্দেশ্যে প্রীতি সম্মেলন। সজ্জগুরু বক্তৃতা।

২৩ জুন—চন্দননগর গণভোটের আন্তর্জাতিক ট্রাই-বুনের পর্যবেক্ষক মি: ক্যাস্ট্রো ও মি: এণ্ডার্সনের ফরাসী এডমিনিষ্ট্রেটর মি: তাইয়ে সহ সজ্জগুরু সহিত সাক্ষাৎকার ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা।

২৭ জুন—ডা: এন. ভি. রাজকুমারের সম্বর্ধনার্থে চন্দননগরে প্রবর্তক মহিলা সদনে সভাধিবেশন। ডা: রাজকুমারের কর্মসাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইয়া সজ্জগুরু বক্তৃতা।

(ক্রমশঃ)



## গণ-বিচারক

(চীনা ছোট গল্প)

কুয়ান জুয়া

“সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের আদালতগুলোও আগের চেয়ে অনেক সভ্য। দেখলে না আসামী কেমন বিচারকদের ঠিক উল্টো দিকে টেবিলের ধারে বসে বসে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো ঠিকই অতিথির মতো!”

“ভা হ’লে তুমি বলছো ঐ যে সাতজন লোক এক সারিতে বসেছিলো তারা সবাই বিচারক?”

জীলোক দু’টি গমের ক্ষেতের মাঝখানের পথ ধরে’ যাচ্ছিলো। ছোট শহরটির গণ-আদালতের কাজ শেষ হ’তে দর্শকরা সবাই বাড়ী ফিরে চলেছে। জীলোক দু’টি গল্প করতে করতে একটু পিছিয়ে পড়েছে।

জীলোক দু’টির মধ্যে একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ; রঙের চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু তার বোদে-পোড়া শ্রাব মুখাবয়বে বাল্ককোর বলিরেখার চিহ্নমাত্র নেই। তা

ছাড়া সে হাটছিলো যৌবনদৃপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। দু’হাত দিয়ে সে একটা লম্বা কালো রঙের তামাক ধারার পাইপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, পাইপের মাছরাঙা পাখীর রঙের নকল পাথরের মুখদানীটা সে এক মুহূর্তের জন্য মুখ থেকে সরেছিলো না।

অপরজন ছিল একটি মধ্যবয়স্ক জীলোক যার মুখটা বাদামী ধাঁচের আর খুঁতনীটা ছুঁচালো। এর মাথার চুল পিছন দিকে কালো চকচকে খোঁপায় বাঁধা।

এরা দু’জনে আদালতের বর থেকে স্বয়ং করে ইত্তক আসামী, ফরিয়াদী, বিচারক এমন কি দর্শক—এক কথায় বিচারের খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়েই আলোচনা করছিলো।

“হ্যাঁ, বিচারক বইকি!” বয়স্ক জীলোকটি তার সঙ্গিনীর প্রশ্নের উত্তরে বলে। তার গলার স্বর ও মুখের

ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, সে হালুখিলু বা-কিছু ঘটছে না ঘটছে সবকিছু সম্বন্ধেই বেশ ওয়াকিফ হাল; তবে একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না: ফেঞ্চিকি গাঁয়ের ঐ পেঁয়াজের ফেরীওয়ালারা! অত রাতারাতি কপাল ফিরিয়ে ফেললো কি করে!” ওরা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কথা বলছিলো বলে জীলোকটির গলার স্বর অতি পরিষ্কারভাবে রপিত হ’য়ে ওঠে।

“তার মানে?” জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে মধ্যবয়স্ক জীলোকটি তাকায় তার সঙ্গিনীর দিকে।

“এইতো কালও দেখেছি ওকে-পেঁয়াজ ফেরী করতে আমাদের নিউকো গ্রামে।” বলতে বলতে গলার স্বর একটু নামিয়ে জীলোকটি বলে, “আর আজ দেখি একেবারে বিচারকদের মধ্যে বসে আছে, বুঝলে না, ঐ যে বাদিকের তৃতীয়জন!”

“এ কি সম্ভব?” মধ্যবয়স্ক জীলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করে। তার মনে পড়ে লোকটাকে। ধোপতুরন্ত জামা কাপড় পরনে, মুখের দাড়ীগোঁফ বেশ ভাল করে কামানো সেই লোকটা বিচারের সময় মাঝে মাঝে একটু চিন্তিত-ভাবে ভুরু কঁচকচ্ছিলো বটে, কিন্তু চৌকটের দুই কোণে যেন সর্বদাই হাসি মাঝানো ছিলো। যে টেবিলটাকে ঘিরে বিচারের কাজ চলছিলো সেই টেবিলটার ফুলের নক্সা-আঁকা চাকনাটার উপর তার মোটা মোটা হাত দুটো রেখে লোকটা বসেছিলো। মাঝে মাঝে একটু ঝুঁকে পড়ে লোকটা এমন সব তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করছিলো যার মুখোমুখী আসামীর মিথ্যে উত্তরগুলো নেহাৎ বোকা বোকা মনে হচ্ছিলো।

“অবিশিষ্ট ফেঞ্চিকি গ্রামের লোক না হলে পেঁয়াজ-ওয়ালারা এই মামলা সম্পর্কে এই কথা জানতেও পারতো না”, বয়স্ক জীলোকটি বলে। ওরা এতক্ষণে কথা বলতে বলতে বড়ো সড়কটা ছেড়ে একটা সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে শুরু করেছে।

“আসামী কোন্ গাঁয়ের লোক?”

“তারও বাড়ী ঐ ফেঞ্চিকি গাঁয়েই।” বয়স্ক জীলোকটি একটু থেমে হাত দিয়ে গায়ের জামাটা থেকে খানিকটা ধুলো ঝেড়ে ফেলে। “ও হ’ল ইয়েন শুয়ানের মামা, গাঁয়ের পুরদিকে ওদের বাড়ী। লোকটার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে তবু কুবুজির শেষ নেই। লজ্জাও হয় না।”

“হ্যাঁ। এবারে মনে পড়েছে, ইয়েন শুয়ানের মামাই তো! পেঁয়াজওয়ালারা যে ওর অন্ধিসন্ধি সবকিছু জানবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।”

“জানবেই তো, এক গাঁয়েরই মানুষ তো ওরা।” ব্যাপারটাকে বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারে, বয়স্ক জীলোকটি বেশ খুসী হয়, কিন্তু তবুনি আবার বলে,

কিন্তু আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না পেঁয়াজওয়ালারা এতো তাড়াতাড়ি বিচারক হ’য়ে গেল কী করে?”

“তুমি কি নিশ্চয় বলতে পারো এ সে-ই। তোমার হয়তো ভুলও হতে পারে।” জীলোক দু’টি একটা তক্তার পুলের উপর দিয়ে একটা সরু খাল পার হচ্ছিলো।

“সারা ফেঞ্চকে গ্রামে ওর মতো দেখতে দু’টি লোক নেই। সেই মোটা ভুরু, বড়ো কাণ আর ভারী গলার আওয়াজ! ও ছাড়া আর কে হবে?”

“আমারও মনে হয় ও-ই।” এতক্ষণে মধ্যবয়স্ক জীলোকটি পুরোপুরি মেনে নেয় কথাটা। তারপরেই একটু ঝুঁকে পড়ে বয়স্ক জীলোকটির কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলে: “তোমার তো মুখের রাশ নেই, এবারে যখন পেঁয়াজ কিনেছিলে ওর কাছ থেকে তখন ওকে বোঁফাস কিছু বলে চটিয়ে দাওনি তো?”

“হঁঃ! বললে-ই বা কী! জেলার প্রধানকে হক্ কথা বলতে ডরাইনে, আর এতো এই পুচকে সহরের বিচারক!”

ঠিক এই সময় পিছন থেকে কে যেন ডেকে বলে:

“রাস্তা ছাড়ুন বোনেরা, দয়া করে একটু রাস্তা দিন।”

জীলোক দু’টি চকিত হ’য়ে পিছন ফিরে তাকায়। দেখা যায় কাঁধের বাঁশের দুই ধারে পেঁয়াজের বুড়ি ঝুলিয়ে তাদের পানে হন্ হন্ করে আসছে একমুখ হাসি নিয়ে সেই পেঁয়াজওয়ালারা।

“পেঁয়াজ চাই আপনাদের, বোনেরা?” সে বলে, “আমাদের সমবায় খামারের পেঁয়াজ খুব চমৎকার। দেখুন না, কেমন টাটকা, কেমন স্বগন্ধ।”

“কে? তুমি...আপনি?” জীলোক দু’টি জ্বন্তে পথের একপাশে সরে দাঁড়ায়, তারপর অবাক হ’য়ে তাকিয়ে থাকে ওর বুড়িভিঁঠি পেঁয়াজগুলোর দিকে।

“আপনি না বিচারক হ’য়েছেন?” বয়স্ক জীলোকটি জিজ্ঞাসা করে।

চলার গতি একটুও না থামিয়ে, শুধু একটু মুখটা ঘুরিয়ে হেসে লোকটা উত্তর দেয়: “ওঃ, আজকের কথা বলছেন? আমরা শুধু আদালতের কাজে সাহায্য করছিলাম। গাঁয়ের লোকেরা এই মামলায় আমাদেরকে বিচারকের সহকারী নির্বাচিত করেছিলো কিনা, তাই আমরা বিচারককে এই মামলাটা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসতে একটুখানি সাহায্য করলাম মাত্র।”

জীলোক দু’টি অনেকক্ষণ অবাক হ’য়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, পথের বাঁকে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, তারপর এক সঙ্গে বলে উঠে—“গণ-বিচারক!”



# সিদ্ধান্তকাব্য

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র :

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র-জন্মের ১২৩ বৎসর পূর্ণ হইল। কিন্তু এই অসামান্য ঘটনাটিতে বাঙালীর দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। পত্র-পত্রিকার আলোচনা বা বর্তমান বাঙালী মানসের গতি-প্রকৃতি ষাঁহারাই লক্ষ্য কবিয়াছেন তাঁহারাই ইহা দুঃখের সঙ্গে অস্বস্তি করিবেন। নারীহরণ ও বলাৎকার কাহিনীকে ইনইয়া বিনাইয়া মুখরোচক করার এবং সিনেমা ষ্টোরের কটাক্ষভঙ্গী, আলাপন ও জীবনকাহিনী সচিত্র পরিবেশন করার মাঝে হুলভে অর্থোপার্জনের যে গণিকা-বৃত্তি তাহা জাতির নৈতিক স্বাস্থ্যের কখনই অস্বস্তি হইতে পারে না। অথচ বিংশ শতাব্দীর আজিকার দিনের পক্ষ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিগত শতকের বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রমুখের বলিষ্ঠ ও বীর্যবান জীবন ও জীবনদৃষ্টান্তের ব্যাপক অধ্যয়ন-আলোচনা।

এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সমালোচক ও মনীষী মোহিতলাল মজুমদার “অতি আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—“রবীন্দ্র-নাথই হউন আর শরৎচন্দ্রই হউন, বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী যত বড় শক্তির লেখকই হউন না কেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের যে অবিসম্বাদী আসনে বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, সেখান হইতে একমাত্র তাঁহাবই (বঙ্কিম-চন্দ্রই) বলিবার অধিকার আছে—“Not to know me is to argue yourself unknown.”

যে বাঙ্গলা ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাতটি ভাষার অন্ততম বলিয়া আমরা আজ স্বীকৃত হইতেছি, সেই নব বঙ্গভাষা সৃষ্টিপ্রসঙ্গে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করিয়া ছিলেন—“রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মানিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন,

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।”

বঙ্কিমচন্দ্র নব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শুধু স্রষ্টাই নহেন, এই সাহিত্যকে তিনি সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অস্বস্তি ও সর্বলোকভূষিতা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কোনও দিক নাই বলিলেই চলে, যেদিকে বঙ্কিম-চন্দ্রের আস্থান ও প্রেরণার দান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী সাহিত্য-প্রতিভা সন্দেহে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্দ্রস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আস্থান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।...ব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন-কার্য্যে ও এক হস্ত নিবারণ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যেই ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ কবাতাই, বঙ্গসাহিত্যে এত সম্ভব, এমন ক্ষুদ্র পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।”

‘জাতির জনক’, ‘জাতীয়তার ঋষি’ প্রভৃতি উপাধি আজ নিবিচারে প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এদেশে জাতীয়তাবোধের জন্ম-ইতিবৃত্ত ষাঁহাদের অগোচর নহে, তাঁহারা দলীয় ‘প্রোপাগাণ্ডা’র এই নিম্নজ্জ্বল রূপ দেখিয়া মনে মনে শুধু হাসিতেছেন; কারণ ‘প্রোপাগাণ্ডা’ যে জল-বুদ্ধদুর্ধর্ম্মী, ইহা তাঁহারা জানেন। বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় ‘প্রোপাগাণ্ডা’-মূলক ইতিহাস রচনায় সম্মত হইতে পারেন নাই বলিয়াই—ভাবতে জাতীয় আন্দোলনের কর্মমাসী ইতিহাস রচনায় রাষ্ট্রীয় চক্র ও চক্রান্ত হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ভারতের জাতীয় মহাসভা নামে খ্যাত কংগ্রেসেরও যখন জন্ম হয় নাই, সেই দূর অতীতে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে

কুখ্যাত 'ইলবার্ট বিল'-এর আন্দোলনকালে 'আনন্দমঠ' বচিত হয়। এই 'আনন্দমঠ' ও তদন্তগত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রীশ্রবিন্দ মন্তব্য করেন: "The 'Mantra' had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself. Once that vision comes to a people there can be no rest, no peace, no further slumber till the temple had been made ready, the image installed and the sacrifice offered."

বঙ্গভঙ্গকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় সমগ্র বাঙ্গলা যখন বাত্যাভিষ্কৃত সমুদ্রের মত উদ্গাম উদ্বেল, তখন এদেশে ইংরেজ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মুখপত্র 'পাইওনিয়র'-এ কোনও ইংরেজ লেখক, জাতির চিত্তে 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্'-র প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন— "Overwhelming old traditions and carrying on its crest a flood of new ideas."

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশিত 'ডেকান টাইমস্'-র সম্পাদক, ইংরেজের পরোক্ষ পদলেহনকারী সিদ্ধমোহন মিত্রে নামে এক বাঙ্গালী, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে—বিলাতের বিখ্যাত 'টাইমস্' পত্রিকার স্তম্ভে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন— "বন্দেমাতরম্' ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেলজ'-এর অমুকরণে লিখিত ও তাহারই অক্ষয় বাঙ্গলা সংস্করণ মাত্র.....ইত্যাদি।" সিদ্ধমোহন মিত্রের এই উক্তি, তৎকালে এই দেশে যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে ভারতে ইংরেজ সম্প্রদায়েরই

প্রখ্যাত মুখপত্র 'পাইওনিয়র' আপন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছিল তাহারই কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কি কবিতা হিসাবে, কি রচনা-পারিপাট্যে, কি গভীরতায়, 'বন্দেমাতরম্' করাসী জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেলজ'-এর তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থিত। 'মার্সেলজ' বিদ্রোহোদ্দীপক ও শাসনশৃঙ্খলোচ্ছেদক; 'বন্দেমাতরম্' কৰ্ম্ম প্রবর্তক ও ভক্তিমূলক। প্রথমটি ভাবোন্মাদনার প্রবর্তক, দ্বিতীয়টি ভাবপ্রবণতার নিদর্শক। প্রথমটিতে আত্মদৃষ্টি নাই, দ্বিতীয়টি অস্বদৃষ্টিপূর্ণ। 'মার্সেলজ' শ্রোতার কর্ণে অহঙ্কারের মদিরা ধারা ঢালিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলে; 'বন্দেমাতরম্' উপাসনার—প্রাৰ্থনার স্রুধায় শ্রোতৃবৃন্দকে পুত ও উন্নত করে। 'মার্সেলজ'-এ কবির হৃদয় নাই; 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে কবি আপনার আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন। উভয়ে এত প্রভেদ!... 'বন্দেমাতরম্' জাতির উদগাত প্রাৰ্থনা—আত্ম-শক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 'মা' বলিয়া তাঁহাব উপাসনা—অপরূপা শক্তির স্বরূপ নির্দেশ করিয়া জন্মভূমি, জননী ও শক্তিরূপিণী জননীকে এক করিয়া 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালীজাতিকে আদর্শ স্বদেশপ্রেমের পথ নির্দেশ করিয়াছে। ইহা রাজ্যদ্রোহও নহে—প্রজার মনে বিদ্বেষ বপনের চেষ্টাও নহে।"

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায়, বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার মুদ্রিত ভাষণে লিখিয়াছিলেন— "বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি নহেন—বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ, বঙ্কিম সাহিত্য একটা

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**ক্যাম্বিক্যাপপার্টেল**



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

বিশেষ যুগ-সাহিত্য। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী দেশে ভক্টোর, রসো যাহা করিয়াছে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি মাত্র পুস্তক ‘আনন্দমঠ’ তাহাই করিয়াছে।”

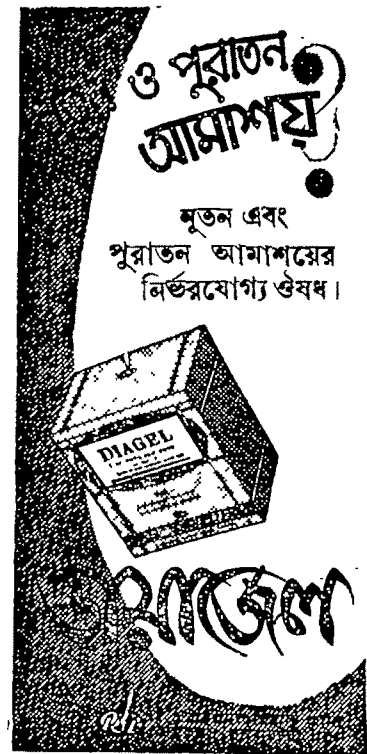
সর্বতোমুখী বঙ্কিম-মনীষ। ও জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে “The greatest man of the Nineteenth Century” বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। দলগত স্বার্থমুক্ত, অপক্ষপাত মন লইয়া, ভারতীয় জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমদর্শনের মনীষার গভীরতা পরিমাপে যিনিই সমর্থ হইবেন, তিনিই ৮রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত যে একমত হইবেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিগত শতাব্দীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিংশ শতাব্দীর উন্মার্গগামী মধ্যাহ্নে নিঃশেষ হইয়া যান নাই। বরং জাতীয় জীবনের নির্ভেজাল বলিষ্ঠ আদর্শ হিসাবে এই অগ্রিময় জীবনের পুনরুত্থান ও অল্পসরণের প্রয়োজন আজিকার দিনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

### সমুজ্জ্বল জীবন-দৃষ্টান্ত :

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমান বাঙালী-জাতির অধঃপতনের অন্ততম প্রধান কারণ সং, সঙ্কল্প-পরায়ণ, চরিত্রে বলীয়ান, নিষ্ঠাভিষ্ঠ জীবনাদর্শের অভাব প্রতিদিনের সংবাদপত্র তথাকথিত নেতৃস্থানীয় যাদের সচিত্র কথা ও কাহিনী বহন করিয়া আনে তাঁদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা কখনই উদীয়মান চিত্তকে শ্রেয়াভিমুখী অতুপ্রেরণা দিতে পারে না। এবং পারে না বলিয়াই আজিকার বাঙালী-জীবনের এই ব্যাপক লঘুচিত্ততা ও উন্মার্গগামিতা। প্রতিভা ও চরিত্রবলেই একদা বাঙালী নিখিল ভারত তথা বিশ্বে মহত্ত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। এই গৌরবময় উত্তরাধিকার আমাদের আছে, কিন্তু যুগ-যুগের অর্থলোলুপতার আমরা ইহাকে আমল না দিয়া ভবিষ্যতের বাঙালীকে আত্মনাশ ও অগৌরবের পথে ঠেলিয়া দিতেছি। বিগত ৩১-এ মে পুণ্যস্মরণীয় স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দেহত্যাগের তিথি ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য কোথাও আমরা এই মহাজীবনের তেমন আলোচনা দূরে থাকুক, নামোল্লেখও দৃষ্ট হয় নাই। নিপাহী বিদ্রোহের এক বৎসর পরে (১৮৫৮ খৃঃ) তাঁর জন্ম এবং ১৯১৯ সালের ৩১-এ মে তিনি পরলোকগমন করেন। অগ্রিময় তপঃশুদ্ধ প্রবন্ধ মহাজীবন ছিল তাঁর। অনির্বাক্ষ উদ্ভীষ্ট উর্দ্ধ প্রেবণার প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। সর্বতোমুখী প্রতিভার সহজ বিকাশ ছিল তাঁর

বিস্ময়কর। কেবলমাত্র প্রতিভার জন্মই ৮মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার বড় ছিলেন বা যুগনন্দবাহী হইয়া স্মরণযোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন এমন নহে। এমন প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক, দেশসেবীর অপ্রতুলতা বাংলাদেশে আজও নাই। কিন্তু অভাব যে বস্তুটির এবং যার জন্ম বাঙালীর বর্তমান দুর্ভাগ্য-পীড়ন তাহা হইতেছে সাধনা ও সেবার সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ত্যাগের বিযুক্তি। শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠার অভাব। অভাব আত্মোৎসর্গের। ইহারই অভাবে আজকের দিনে বাঙালীর প্রতিভা ও কর্মশক্তির এত অপচয় ও অপপ্রয়োগ। ব্যক্তি ও দমষ্টি জীবনে এই মহতী এষণার উজ্জীবনের জন্মই স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার মত সমুজ্জ্বল জীবন-দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে জাতির সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার অভাব নাই। ইহার। যদি দলের গ্রামোফোন না হইয়া এবং তুচ্ছ আত্ম ও অর্থস্বার্থের দাসত্ব পরিহার করিয়া একযোগে মহত্ত্ব উদ্বোধনের শুভ প্রচারকার্যে ত্রুতী হন তাহা হইলে আগামী এক যুগে বাংলা ও বাঙালীর বর্তমানের মসিমলিন চেহারা পরিবর্তিত হইয়া কল্যাণশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে।





## শ্রীশ্রীসম্ভবজ্ঞানীর আবির্ভাবোৎসব :

বিগত ৬ই আষাঢ় প্রবর্তক সজ্জের অধ্যাক্ষরনৌ শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর ৭১তম আবির্ভাবোৎসব সজ্জের মূলকেন্দ্র চন্দ্রনগরে ও অন্ত্যস্ত শাখা-বেঙ্গে শুচি সমাহিত চিত্রে সনিষ্ঠায় উদ্‌ঘাপিত হয়। সজ্জমাতৃকার প্রকট হইবার এই পুণ্যতিথি অত্যন্ত অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গ সজ্জসম্মান, শিষ্য ও অমুবাণী ভক্তদের মধ্যে নিবিড় নিষ্ঠা ও মাতৃ-অমুখ্যানে স্মরিত হইয়া থাকে। সজ্জমন্দিরে অমুগঠিত পূর্ববিন সন্ধ্যার অধিবাস-বাগরে সজ্জীত, সমবেত উপাসনা, সজ্জবাণী পাঠ ও মাতৃকৃষ্ণার প্রদম্ব হয় সজ্জমাতা ও সজ্জাবের অন্তরঙ্গ সম্মেলনে। সজ্জসম্ভাপতি তাঁর সাক্ষাৎ-সম্পর্কের মাতৃ-স্মৃতিকথা সজ্জগ্ন মর্শ্বশী ভাবায় অভিযুক্তি দেন। ৬ই আষাঢ় সজ্জমন্দিরে সমবেত প্রাক্তরপাসনা, মাতৃপূজা ও স্তোত্রপ্রসাদ এবং সন্ধ্যার বখারীতি উৎসব-সভা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পূর্ব প্রক্দের আকুমার দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এম. এ.। সভাপতিকে মাল্য-ভূষিত করেন সজ্জের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সজ্জব সহ সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এক দীর্ঘ ভাষণে সজ্জমাতৃকা তত্ত্ব নিপুণ ভাষণের বিস্তারিত কথিত গিণা বলেন, শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর পার্শ্ব নারী-প্রকৃতির একান্ত উৎসর্গে ও স্নপান্তরে সজ্জ যে শুদ্ধ সিদ্ধ শিষ্য মাতৃকৃত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাই জাতি-মাতৃকার রূপ পরিগ্রহক্ষমও হইতে পারে। সজ্জের মাতৃকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠমক্যের সাধনা সিদ্ধ হইলে ইহাই ভারতের অখণ্ড জাতিসাধনার দিগদর্শন হইবে। তিনি বলেন, ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে কিন্তু ঐশ্য পায় নাই, ঐশ্য তাহার সজ্জের মধ্যে-ছিল না। একমাত্র অখণ্ড মাতৃকৃত্ত্ব অভিযুক্ত হইয়াই এই অনৈক্য দূর করা যাইতে পারে। সভাপতি মহাশয় তাঁব সাক্ষিস্থ ভাষণে অত্যন্ত সহনশক্তির সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, বর্তমান নৈরাশ্রপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এখানে আসিয়া তিনি আশা ও আলো পাইয়াছেন, দেশের অনৈক্যবলক সমস্ত। সমাধানেও খানিকটা ইঙ্গিত পাইয়াছেন। অতঃপর সজ্জসম্ভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদান্তে সভা সমাপ্ত হয়।

## বন মহোৎসব :

সারা জুলাই মানবাণী পশ্চিম বঙ্গ বাজো বন মহোৎসব অমুগঠিত হইল। বর্ষা-সমাগমে এ দেশে বৃক্ষরোপণের প্রথা চিরকালই আছে। রথের মেলায় বিচিত্র বৃক্ষলতার আমদানী হইয়া থাকে। সরকারী উদ্যমে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই উৎসব প্রাণবন্ত ও প্রচারলাভ করিয়াছে। সরকারী হিসাবে দেশা বার, গত দশ বৎসরে ২ কোটি ১৬ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা

হইয়াছিল কিন্তু উহার শতকরা ৫১ ভাগই বিনষ্ট হইয়াছে ও ৪৯ ভাগ বাঁচিয়া আছে। ইহাতে বৃক্ষ সংরক্ষণ ব্যবহার ত্রুটি স্পষ্টকরাইয়া দেয়। বৃক্ষ ছেদন ও বোপণের অমুপাত বিষয়েও এ রাজ্যে জাগ্রত দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। আমেরিকা, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি বৃক্ষসমৃদ্ধ দেশে প্রতিটি বৃক্ষ ছেদনের পরিবর্তে চল্লিশটি নতুন চারা বোপণের নিয়ম প্রবর্তিত। বৃক্ষরোপণ প্রচেষ্টাকে সাক্ষ্যমণ্ডিত করিতে হইলে এদেশেও অমুরূপ নিয়ম বা প্রথা প্রচলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

## শ্রীমাদ্রামোদ জন্মবার্ষিকী :

সম্প্রতি কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পশ্চিম বঙ্গের হুমসন্তান এবং ভারতবর্ষ অন্ততম জাতীয় নেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক স্বর্গত শ্রীমাদ্রামোদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী বিশেষ উদযাপনের সহিত অমুগঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতার কেওড়াতলা স্থানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীগণের উদ্যোগে স্বারভাঙ্গা হলে একটি সভার পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হুবোধচন্দ্র মিত্র। ডঃ মিত্র বলেন : শ্রীমাদ্রামোদ ছিলেন সকল পঙ্কিলতার উর্ধ্বে একটি নির্ভীক মানুষ। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ সকলের পক্ষেই অমুসরণীয়। কলেজ স্কোয়াবের এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভার পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে শ্রীদেবশঙ্কর রায় এবং শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

## পরলোকে হেমিংওয়ে :

বিখ্যাত মার্কিন উপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে গত ২রা জুলাই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বিচিত্র জীবনের এবং বহুমুখী প্রতিভার আকর এই সাহিত্যিকের মৃত্যু আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রখ্যাত ফরাসী-সাহিত্যিক শ্রীমরিসাক বলিয়াছেন : ..... ...তাঁহার মৃত্যুতে মার্কিন সাহিত্যের উপন্যাস শাখা প্রভূত ক্ষতি হইল। শ্রীআর্নেস্ট হেমিংওয়ে পৃথিবীর আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যজগতের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ব্যক্তিগীবনে কখনও শিকারী, কখনও সৈনিক। জীবনের সহজতর গতির আবেগ তাঁব সাহিত্যে প্রতিকলিত হইয়াছে।

তাঁহার পিতাও রাইফেলের গুলীতে আশ্রহত্যা করিয়াছিলেন।

## নীলকণ্ঠ জয় :

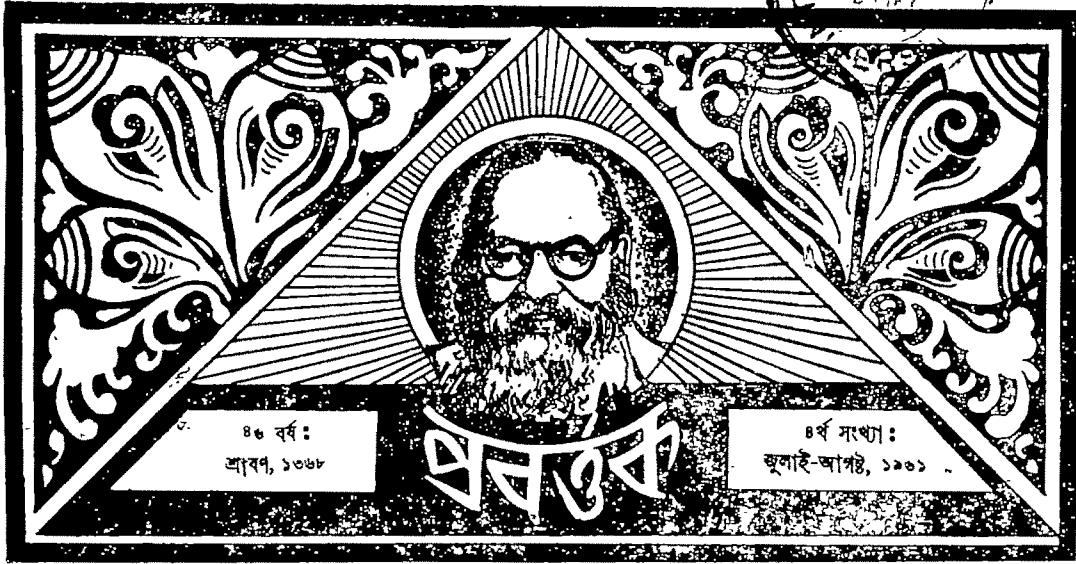
নগাদিরাঙ্গ হিমালয়ের তুবারাবৃত ভগ্নর, প্রাণঘাতী এবং সৌন্দর্যের প্রতীক অমুতম শূঙ্গ নীলকণ্ঠ সম্প্রতি ভারতীয় অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছে। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়। সাতটি অভিযাত্রিদল ২১,৬৪০ ফুট উর্ধ্ব এই শিখরটি জয় করিতে গিয়া ব্যর্থ এবং বিপর্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় অভিযাত্রিদল ক্যাপ্টেন কুমারের নেতৃত্বে এবার সাক্ষ্যমণ্ডিত হইল। ইতিপূর্বে এই দল অরুণা শিখরটিও জয় করেন। আমরা এই দুঃসাহসী দলকে মাদর অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য কামনা করি।

শ্রীসমরজিৎ কর

## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাব কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

অনন্ত মন হওয়া ধর্মের মূল কথা। মানুষ যা জানে, যা বলে, তা জীবন দিয়ে সিদ্ধ করায় উদাসীন। এই পাপে সৃষ্টি অসত্যে পূর্ণ, কিন্তু দৃষ্টি এমনিই অন্ধ যে মহামিথ্যাটার মধ্যেই আমরা হাসি, আমরা আনন্দ করি। হাতের কঁক দিয়ে অমৃত বারে যায়, বিষ পেয়ে তৃপ্তি পাই। ইহাই কি সত্য তৃপ্তি? মরণের যন্ত্রণা সইয়া সইয়া ইহাই স্বভাব হয়েছে। ভগবান হাসেন। তাঁর করুণার অস্ত নেই। কিন্তু জীব জুখা-সমুদ্রে সাঁতার না দিয়ে ঘোলা পঙ্কিল জলে হাসতে হাসতে অবতরণ করছে। জন্ম জন্ম দুর্গন্ধে মানুষের জীবন যে শাস্তিহীন হয়। লোকের দিকে চেয়ে চলাটা ধর্ম নয়। ভগবানের দিকে চেয়ে চলতে হবে। অন্ধ দিকে চাওয়া ব্যভিচার, পাপ। কেননা মানুষ যে ভগবানের পথের যাত্রী। স্বার্থ ও ভোগ নিয়ে ভগবানকে ভুলে অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পানে মত্ত থেক না। যৌবন যুগেই অতিশয় উৎসাহে এগিয়ে চলতে হবে। দেহ জীর্ণ হলে আপশোষের সীমা থাকবে না। যৌবনের উৎসাহ যেন অলস শয্যায় ব্যর্থ না হয়। প্রত্যেক মুহূর্ত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ কর। প্রত্যেক নিঃশ্বাসে ভগবানকে স্মরণ কর। কলিযুগে ঈশ্বর আরাধনা মুখের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মার অভ্যুত্থান ও মুক্তি হিন্দুধর্মের আদর্শ। আর তার জন্য একদা হিন্দুজাতির কি অহুসারগই না ছিল। কোনদিন তারা রোজ দেখে শয্যাভ্যাগ করেনি। কি লীভ, কি গ্রীষ্ম, নদীতীরে উবারাগের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের কণ্ঠে ভগবানের উদ্গান উঠতো। পৃথিবীর ভোগ আর রক্তমাংসের টানে আত্মহার্য হইও না। ইহা স্বভাব-মানুষের সহজ টান। ইহার অতীত হও। যাহা পৃথিবীর ধর্ম তাহা অতিক্রম কর। মনের সঙ্কল্প দৃঢ় কর। অনাবিষ্কৃত অব্যক্তকে জীবনে প্রকাশ করাই ধর্ম—জীবন যাত্রার ইহাই লক্ষ্য। অভিনব আনন্দ ও ভোগের অধিকার পাবে। জগতের ভোগস্বপ্নের দিকে যেন দৃষ্টি না পড়ে। জন্মগত সংস্কার যেন অধীর না কবে। চতুর্দিকের বিপরীত অবস্থা ও ঘটনা যেন গতি স্তম্ভিত না করে। আপনাতে তন্ময় হয়ে থাক। বৃক্কের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্যই তোমার জন্ম। তোমার ইহাই স্বপ্ন ও আনন্দ। হে সাধক, এগিয়ে চল। ভগবানের ডাক পৃথিবীর মোহে যেন কিরে না যায়—মৃত্যুপথে এগিয়ে চল আলোর পথে। [ ১৯০০ সালের দিনলিপি হইতে সংকলিত ]

সঙ্কল্প শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চত্রিংশং সূক্তং ।) নবমী ঋক্  
(মন্ত্রশ্লোক শ্রীমতিলালৈব:জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষনিরুভে ছাবা পৃথিবী অস্তরীয়েতে ।

অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্য্যমভি কৃঞ্চে ন রাজস্যা দ্যাম্ণোতি ॥ ১ ॥

অর্থ—“হিরণ্যপাণিঃ (সুবর্ণ কিরণযুক্ত) “সবিতা” (সবিতৃদেব) “ছাবা পৃথিবী” (দ্যুলোক ও ভুলোক) “উভে” (উভয়কে) “বিচর্ষনিঃ” (দর্শনকর্তা, বিশ্বকর্ষণরত) “অস্তঃ” (উভয় লোকের মধ্যে) “দীয়তে” (অবস্থান করেন) “অমীবাং” (রোগাদি বাধা) “অপবাধতে” (সম্যক প্রকারে নিরাকরণ করেন) “সূর্য্যং” (ত্রিবর্ণ—সোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট সূর্য্য) “বেতি” (গমন করেন) “কৃঞ্চে ন রাজস্যা” (শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের দ্বারা) “দ্যাম্” (আকাশ) “অভি” (সর্ব্বতোভাবে) “ঋণোতি” (পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন) ॥ ১ ॥

সরলার্থ—হিরণ্যপাণি সবিতা দ্যুলোক ও ভুলোক উভয় লোকের মধ্যে দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন। তিনি তদ্রূপে রোগাদির অপসারণ করেন, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সূর্য্যরশ্মিতে গমন করেন, এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের দ্বারা আকাশকে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশদার্থ—এই ঋকে হিরণ্যপাণি সবিতা—ঐহাকে পূর্ব্ব ঋকে হিরণ্যাক্ষরূপে সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্থল আদিত্য বা সবিতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারই স্তুতি করা হইতেছে। এই সবিতাই ভুলোক, দ্যুলোক উভয় লোকের মধ্যে অবস্থান করেন—উভয় লোকের মধ্যেই দীপ্ত কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া তদ্রূপে রোগাদি বাধা দূর করেন। তিনি এই উভয় লোকেরই দ্রষ্টা—দর্শনকর্তা। এই যে নীলাকাশকে আমরা দর্শন করি, যে আকাশের আলোছায়ায় নানা রঙের খেলা, যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সূর্য্যকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি—যাহা দ্বারাই পৃথিবীর বুকে দিবার পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা ক্রমাগত গত্যাত করে, যাহা দ্বাবাই ক্ষিতি, অপ ও তেজের সৃষ্টি—সেই যে সর্ব্বজীবের জীবনস্বরূপ সূর্য্যকিরণ তাহার মধ্যেও তিনিই অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পরিচালিত করেন। শ্রুতির ভাষাব—“ভীষাহস্মাদাত পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাহস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ” ॥ “ইহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় ষম স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।” এই সবিত্রীদেবই আলো ও অন্ধকার দ্বারা আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। চলমান বিশ্বচরাচরের একমাত্র নিয়ন্তা তিনিই।

## ঋগ্বেদ : নবম সূক্ত (গীতানুবাদ)

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ইন্দ্র হে এস নন্দিত হও  
আহুতিব সব আনন্দ যন্ত্রিতে  
বীর্ষে মহান উঠে যাও লক্ষ্যতে ॥ ১

আনন্দময় ইন্দ্রেব লাগি' আনন্দসস্তার  
মুক্ত করিয়া তুলে ধর উপর'তে ॥ ২  
বিশ্বকর্ম্মী দেবতার লাগি' কর্ম্মীর ভাণ্ডার

নন্দিত হও গন্ধমাদন-হৃদয়-মহাবীর  
ওগো সমর্থ বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় সৃষ্টির,  
রসসস্তারে আনন্দ মন্ত্রিতে ॥ ৩

ইন্দ্র তোমার জগৎ মুক্ত সত্যমন্ত্র যত  
বিরহিণী যথা পতিপুরুষের দিকে ধায়  
অবিরত  
উপের' উঠিয়া চলিছে তোমাকে  
পেতে ॥ ৪

বহু ভঙ্গিম বহিতে সেই অল্পম তুষ্টিকে  
ইন্দ্র সঞ্চালনা কর তুমি নিম্নের অধো  
দিকে

বিকাশ, প্রকাশ হোক তব  
সংকেতে ॥ ৫  
ইন্দ্র সঞ্চালন কর তুমি বহুধা জ্যোতির্ময়  
আনন্দবাসী জয়মণ্ডিত আমাদের সমুদয়  
সিদ্ধির লাগি' তুষ্টির স্বর্গতে ॥ ৬

## রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে

শ্রীমুখীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমি অহরহ। যে মহামনীষীর জয়ন্তী করিয়া বিজয় টীকা দিতে অন্যান্য চল্লিশটা বিদেশী কেন্দ্র সোৎসাহে অগ্রসর, সারা ভারতবর্ষ যাহার জয়ন্তী সম্পাদনে পাগলপারা, সর্বজনবরণ্য সেই দিক্‌পালের নাম লইবার যোগ্যতা আমার কিছুমাত্র আছে তাহা অপরিসংখ্য কথা—আমি নিজেই ঘোরতর সন্দিহান।

এই কারণে ‘কিছু লেখা’র প্রস্তাব আমার কাছে হাস্তকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সম্প্রতি চন্দননগরে প্রবর্তক সম্বন্ধে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে সম্বন্ধপূর্ণ দিবস পালনের অমুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিতে গিয়া ডি. এল. রায়ী ভাষায় মতটা আমার বদল যায়—উৎসব প্রদর্শনীতে চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথের কবিত্রিভা উন্মেষের আভাষ পাইয়া।

মনে পড়িয়া গেল, রবীন্দ্রনাথকে আমরা বালকেরা পাইয়াছিলাম, সর্বপ্রথম কবে কোন যুগযুগান্তরে। তখন আমরা হেবার জুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র মাত্র। নিম্নশ্রেণীর ছাত্র হইলেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর পড়ুয়াদেরও হার মানাইয়া দিতাম।

খেলার ফাল্গু মাঠে কেঁলা হইতে বিলাতী গোরা আনাইয়া Military Drill শিখিবার ব্যবস্থা আমরা করাইয়াছি। ভাই প্রতাপ ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের উৎসাহদাতা। “Society for the Higher Training of Young Men in Bengal” (পরের University Institute)-এর সভ্যরা আমাদের জুটি হন। সোরগোল বেশ পড়েছে আমাদের কাণ্ডকারখানায়।

কোথা থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত একদিন, আমাদের খেলার হাটে। তখন শুণী মানী কতক লোক হ’য়ত তাঁকে চিনতেন। আমাদের বালকদের কাছে কিন্তু তিনি খুব চেনা ছিলেন সাক্ষাতে নয়—নামে, গানের রবে। গানের রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের সম্মুখে। কি আনন্দ আমাদের!

বলাবলি ক’রছি আমরা, গান শোনাবেন না উনি আমাদের! বুক ঠুঁকে এগুলাম আমরা আমাদের মনের কথা শুঁকে জানাতে। হাসলেন রবীন্দ্রনাথ। হেসে ধরলেন গান। সারা মাঠ যেন মেতে উঠল। গান হ’ল—এক, দুই, তিন। বালক আমরা চকিত, স্তব্ধ। তেমন গান জীবনে আর কখনও শুনি নি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হরেক রকমের রেকর্ডেও নয়। রবীন্দ্রনাথের ব’লে রেডিওয় যা শুনি তাতো ধর্ষবোর মধ্যেই নয়।

আজকালকার ঘটনা এ হ’লে কাগজে কাগজে ছয়লাপ এ হযতো হোতো। আমাদের সেই বালকবৃন্দের মধ্যে আমি ছাড়া আর একজনও বেঁচে নেই। বাকি শুধু রইলাম আমি, বোধহয় ৮৩ বৎসর বয়সে এই কথা জানাতে।

এর পরেই সোসাইটির সভ্যরা ধরলেন রবীন্দ্রনাথকে সোসাইটিতে গান গাওয়ার জন্ত। সোসাইটির সম্পাদক রাজেন্দ্র সিংহ (আমাদের জিমনাস্টিক মাস্টার) ব্যবস্থা করলেন গান গাওয়ার। এর অনেক পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর নাটকের অভিনয় হয়। একটাই গিলে খেয়েছিলাম আমরা। কাজেই সবাসরি আমাদের রবীন্দ্র ভক্ত হ’তে ঠেকেনি আরো।

মাঝের একটা ঘটনা না ব’লে থাকতে পারছি না। হারিসন বোডের জন্ম জমি নেওয়া হচ্ছে বেপরোয়া ভাবে। কলেজ স্ট্রিটের মোড় থেকে ডানদিকে খানিকটা পূবে যেতেই দেখি, একজন হকার আনকোরা রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর থাক লাগিয়ে বসে আছে, খানিকটা খালি জমিতে।

দুর্ভিক্ষের আসামীর মত গ্রন্থাবলীর দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে এগুলাম হকারের সম্মিধানে। পাঁচ ছয়-জন ছিলাম আমরা। ভয়ে ভয়ে দ্বিধাসা করলাম হকারকে, দাম কত? হকার বললে, এক টাকা। ধড়ে প্রাণ এলো। ক’জনের কাছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেরুল মাত্র আট আনা। বিমর্ষ ক্রেতাদের পানে চেয়ে হকার ব’ললে, বই নেবে নাকি বাবুরা? বাবুরা বলে, আট আনার বেশী আমাদের নেই। “আট আনা! নাও নাও বউনি করি।”

ব'লে হকার দিলে গ্রন্থাবলী। মলাটে দেখলাম এ প্রথম  
গ্রন্থাবলী। দাম লেখা সাড়ে তিন টাকা। গ্রন্থাবলী পেয়ে  
কৃতজ্ঞতার স্বরে হকারকে ব'ললাম, যত পারি খন্দের  
তোমার ক'রে দোবো। দাম কিন্তু ঐ আট আনা।  
হকারও রাজি হ'ল। প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছিল।

প্রায় সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিধারদের 'মিঠে  
কড়া'র কথা আমরা শুনি। শুনি কেন পড়িও। রাগে  
গিস্ গিস্ করি আমরা! কি!

রবিঠাকুর পশু লেখে

মুদিমালায় পড়ে—

তা হ'লে আমরাও মুদিমালা, কেমন! নিখুঁত  
আক্রোশেই অবসান তার হ'ল। বুঝিনি তখন কত বড়  
ইঙ্গিত মুদিমালার পিছনে রয়েছে। যে দেশের কবি,  
দেশের মুদিমালার কাছেও পৌঁছেছেন, তিনি নোবেল  
প্রাইজ পাবেন না তো পাবে কে!

মুদিমালা, মুটে-মজুর-পশুপতি বস্তুর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে  
কর্জনী বহুবিভাগের প্রতিবাদকল্পে সমবেত হয়ে চিত্রার্পিত  
হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনেছে আর যথাসাধ্য  
দান করেছে প্রতিবাদ তহবিলে। সে সময়ে প্রতিবাদ  
অহুষ্ঠানাদিতে স্বরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ  
প্রভৃতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বীজ বপন করেছেন  
রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীর আর বঙ্গভূমিকে উদ্ভূত করেছেন, গেয়ে  
এবং গাইয়ে:

বাংলার মাটি

বাংলার জল

ধন্য হউক, পুণ্য হউক

হে ভগবান!

—এ সবই আমার চ'খে দেখা, কাণ্ডক্ষে-খবর একটাও নয়  
বা তথাকথিত ইতিহাস থেকেও নেওয়া নয়।

রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত 'হিতবাদী' পত্রিকার সহিত  
নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন এককালে। 'হিতবাদী'তেই

তাঁর ছোট গল্প প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম। 'হিতবাদী'র  
সহিত আমার নিকট-সম্পর্কের কথাও জনসাধারণের  
অবিদিত নাই। আমি জানি কিভাবে রবীন্দ্রনাথের  
সকটকালে 'হিতবাদী' তাঁহাকে অর্থসাহায্য করে। সে  
সাহায্যের মূল্য কি, জানতেন রবীন্দ্রনাথ। পরোক্ষভাবে  
সে সাহায্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ লাভে সাহায্য  
করে। সেজ্ঞা ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গভূমি 'হিতবাদী'র  
কাছে কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষের দিকে দিকে কবিসম্রাট জয়গ্রহণ  
করেছেন যুগে যুগে। বঙ্গদেশের চণ্ডীদাস, কাশীরাম  
দাস, বিভূপতি উজ্জল হয়ে থাকবেন শাস্তকাল। কাব্য  
সমুদয়ের জন্ত রবীন্দ্রনাথ ইহাদের সকলের কাছেই অল্প-  
বিস্তরভাবে ধন্য।

বঙ্গদেশের মাইকেলের তুলনা মাইকেল। হেমচন্দ্র,  
নবীনচন্দ্রের নামও ভুলবার নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন  
গিরীশ স্বতিসভায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "গিরীশচন্দ্র  
ঘোষ বঙ্গদেশের একমাত্র জাতীয় কবি।"

'বঙ্গবানী'র 'বাঙালীর গান'-এ কত মনীষীর রচনা যে  
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। আর একটা  
রামপ্রসাদ দেখতে পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে ইহাদের কথা না বললে জয়ন্তী  
অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী অহুষ্ঠান গুরুত্বচক। বংশীরবে  
তাঁর, দোলার মত দোলায় যেন আমাদের দেহ-মন-প্রাণ।  
তাই ভক্তিগাথার পুনরাবৃত্তি করবার সাধ নিবারণ করতে  
পারলাম না:

দে দোল, দে দোল, দে রে দোল

আজি বাঁশীব রোল।

দোহুল ধবগী, চমকে দামিনী

মেঘমন্ড মাঝে মধুব মাতন

বাঁশী কবেছে পাগল॥





# কল্যাণী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

কল্যাণীর সম্মুখে আর বেশী কিছু আনবার কৌতুহল প্রকাশ করি নি। নারী সম্মুখে নির্বিকারত্বের অভিনয়-দক্ষতা যে ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে আমার। প্রতিদিনই তো নানা নারীর সংস্পর্শ আসতে হচ্ছে আমাকে। কেউ আসে আদেশের জ্ঞাত, কেউ উপদেশের জ্ঞাত, কেউ পরামর্শের জ্ঞাত। আমি চোখ তুলে তাকাই না। তারাও মুখ তুলে কথা বলে না। একটা সমস্রম দূরত্বের ব্যবধান যেন স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কল্যাণী অনন্তা।

কোন উপেক্ষাতেই দমল না ও। বিচলিত হল না কোন অপমানে। সপ্রতিভা ওর স্নান হল না আমার নির্মম নিস্পৃহতার খরতাপে। আশ্চর্য ওর প্রাণশক্তি। নাকি ও নিষ্প্রাণ একটি সেবার যন্ত্র শুধু। উত্তাপ নেই, অহুত্ব নেই, নেই ঘৃণা, নেই প্রেম। অথচ অপ্রতিহত ওর প্রস্তাব। অনিবার্য ওর আকর্ষণ।

কর্মে ওর নিষ্ঠা আছে, আছে চরিত্রের ধ্রুত্ব, আছে হয়তো ব্যক্তিত্বও। কিন্তু হৃদয় আছে কি? আছে কি নারীর নমনীয়তা?

ওর নারী-হৃদয় নিয়ে গবেষণা করবার তোমারই বা অত প্রয়োজন ঘটল কিসে কালীকিঙ্কর? নারী তো তোমার কাছে উপেক্ষারই বস্তু শুধু।

কিন্তু সর্বান্তঃকরণে কল্যাণীকে উপেক্ষা করতে পারছি কৈ? মা হয়তো ওর ঠিক নামই রেখেছেন ও কলি, ও এখনও বিকশিত হয়নি। ও শুধু একটি মেয়ে, লাভ করেনি নাবীত্ব। তাই বুঝি পুরুষের কোন পক্ষপাতই রেখাপাত করে না ওর মেয়ে-মনে।

কি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলাম:

তুমি কি কলি হয়েই থাকবে চিরকাল? বিকশিত হবে না কোনদিন?

সেই হাসির কঙ্কণাধারা বইয়ে দিল কল্যাণী:

—সে স্বযোগ আর পেলুম কৈ? কোথায় বা সে সূর্যের আলো আর কোথায় বা দখিনা মলয়!

চমকিত হলুম। স্তম্ভিত হলুম। লজ্জিত হলুম নিজের অসাবধানতায়। এ কোন্ কল্যাণী? এতো একটি মেয়ে-মনের কথা নয়। এতদিনে কি কল্যাণীর মাঝেও কথা কয়ে উঠল সেই শাশ্বতী নারী। কি বলতে চায় কল্যাণী? ওর ঐ হাসির আড়ালে লুকোনো আছে কি কোন উষ্ণ নারী-হৃদয়? আছে কি সে হৃদয়ে কোন স্নান বাসনা?

এমনি অবলীলাক্রমেই কি ও কালীকিঙ্করের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশের ছাড়পত্র আদায় করে নিতে চায়? না না, সে হতে পারে না। কালীকিঙ্কর হবে না অতথানি আকিঞ্চন কোন নারীর কাছে। ধর্মটাকে আরও হৃদু করতে হবে। করতে হবে নিজেকে আরও ছুঁপা।

...এ কোন কালীকিঙ্করের কথা পড়ছি আমি!

কল্যাণী কালীকিঙ্করকে দেখেছি আমরা পাশাপাশি। দেখেছি কায়েন মনসাবাচা কালীকিঙ্করাহুগ কল্যাণীকে। দেখেছি নির্মম নিস্পৃহ কালীকিঙ্করকে।

আজকের এই দুর্বল কালীকিঙ্করকে যেন অচেনা মনে হচ্ছে।

সত্যি কালিদা তুমি দুর্জয়। তুমি দুর্বোধ্য! নাকি এও কালিদার একটা অভিনয়।

মনে পড়ে সেদিনের কালীকিঙ্করকে।

বিহারের একটা অঞ্চলে তখন বন্টার ডাঙবলীলার সাথে দেখা দিয়েছে মহামারী। হাজারে হাজারে মানুষ

মরল। দলে দলে ছুটল সেবাত্রতী দল, আয়বাপ চল্লম। পুরোভাগে কালিদা। অনেক কান্নাকাটি অনেক কাকুতি মিনতির পর কল্যাণীও আমাদের সাথে সেবাকার্যে সহযাত্রিণী হবার অস্বপ্নমতি পেল। কল্যাণীকে দেখলুম সেবার ষথার্থ কল্যাণীকপে। স্নেহে বেদনায় কুহুম কোমল। সেবার আত্মগতপ্রাণ। দেখলুম দুঃখীর জননীরূপে। দেখলুম নেত্রীরূপে। ব্যক্তিত্বে কঠোর, নিয়মাত্মবর্তিতায দৃঢ়নিষ্ঠ, শঙ্কায় সঙ্কটে অবিচল। কল্যাণী সোমকে চিনলুম আমরা। চিনল দেশবাসীও। সেই সাথে নতুন কবে চিনলুম এই নতুন কল্যাণীদ্রষ্টা কালীকিঙ্করকেও।

কিন্তু কি লিখে চলেছে কালিদা তার এই আত্ম-কাহিনীর প্রলাপে। ডাইরি থেকেই পড়ছি :

...দাক্ষণ বর্ষ। সেবাটেবা শিকের উঠেছে। হাত গুটিয়ে সব বসে আছি ক্যাম্পে। মরুক না আবো কিছু। ঋষি ম্যাসল্যাম মিথ্যা বলে নি। যুদ্ধ, মহামারী, মড়ক, দুর্ভিক্ষ এসব প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই হয় খাওয়ার পরিমাণের সাথে খাদকের সংখ্যার সমতা রাখতে। এ বিধাতারই নির্দেশ। আমরা এনেছি সেই বিধাতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এসেছি আত্মের সেবা করতে। মিথ্যা কথা, এসেছি আত্মপ্রচার করতে। সে প্রচার তো পরম নিষ্ঠায় কবে চলেছে বাজু। কাগজে কাগজে নিত্য বিবোধিত হচ্ছে আমাদের মহাপ্রাণতার কথা। আমাদের মহান ত্যাগের কথা। বোকা অসহায় মানুষগুলি হয়তো ভাবছে আমাদের দৈবাগত দেবদূত!

ক্যাম্পেব একমাত্র বিলাসের আসবাব একখানা ছোট চৌকি। সেটি অপ্রতিবাদে আমারই অধিকারে এসেছে। পরম আরামে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। সহকর্মীরা কে কোথায় আছে কে জানে! ক্যাম্পে বাতি জ্বলেনি এখনও। দিনের বেলাটায় শুধু প্রবল বৃষ্টিই ছিল। সন্ধ্যা হতেই ঝড়ও শুরু হল। মেঝেটা একদম কাদা হয়ে গেছে। উলুনেও নাকি এক হাঁটু জল। রাতটা হয়তো অনাহারেই কাটবে।

রান্না বান্না ছিল কল্যাণীর ডিউটি।

কুণ্ঠিত লজ্জায় ও এসে দাঁড়াল সামনে। মোমবাতিটা

রেখেছে নানা কোঁশলে হাওয়া থেকে আঁড়াল করে। ক্যাম্পের পর্দাগুলো নিখুঁতভাবে বন্ধ করেছে। তবুও যেন কোন রন্ধ্রপথে হাওয়া এসে মোমবাতিটাকে অস্থির করে তুলছে।

কাদায় দাঁড়িয়েই কল্যাণী বলছে, আজ হয়তো খাওয়া হবে না। উলুনের যা দশা। কি করি বলুন তো?

—শুধু আহার নয়, নিদ্রাও হবে না হয়তো।

—নিদ্রাটা শুধু আমারই হবে না। আর সবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উলুনের অবস্থা দেখে ওরা সব চিড়ে-মুড়ি যা ছিল আঁচলে বেঁধে স্কুলঘরে চলে গেলেন ভিজতে ভিজতেই।

—চিড়ে-মুড়ি এল কোথা থেকে?

—এসেছিল, কিন্তু এখন আর একটিও নেই আপনার দস্ত।

ওদের ধারণা এ রাতে যার চৌকি আছে তার আবার ক্ষুধা কিসে। দেখলাম ঐ জড়বস্তুটির উপরই ওদের যত দ্রবী।

—দ্রবী কি তোমারও হচ্ছে নাকি?

কল্যাণী হাসল। মোমবাতির মুছ আলোয় মনে হল সে হাসিতে মেশান রয়েছে একটা মধুর মানকতা।

—না না, হাসির কথা নয়। আমি সত্যিই খুশি যাচ্ছি। আহার তো তোমারও হল না। নিদ্রাটা অন্ততঃ নির্বিঘ্ন হোক। লেডিজ ফাষ্ট।

ওর হাসিটা আরও বিস্তৃত হল। হেসেই বলেছে :

—ছিঃ ছিঃ, এতটুকু সাহস আপনার নেই। এতদিনের কর্মসজ্জিনীকে একটা দুর্বোণ বজ্রনীতেও শয্যাসজ্জিনী করতে পারবেন না?

কি বলতে চায় কল্যাণী।

—কি বলতে চাও তুমি? আমার চোখে শাসনের দৃঢ়তা।

—ভয় পেলেন নাকি? আমি কিন্তু সত্যিই ভেবে-ছিলাম আপনার চৌকিব এক কোণে বসেই আজ রাতটা কাটাব। আমার কথা ওরা ভাবলেন না। আপনিও যদি না ভাবেন তাহলে বলুন এই কাদার উপরই বিছানা পাতি।

মনে মনে লঙ্কিত হলাম। সন্দেহে বল্লম, আমি কিন্তু সত্যিই বলছি তোমাকে আজ এখানে শুতে। সেইতো নিরাপদ হবে। স্থলে ওদের সাথে আমার একরকম হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, নিরাপদ বৈকি? কল্যাণীর কণ্ঠে অভিমান। আপনিও চলে যান স্থলে। তারপর দুর্যোগ আর অন্ধকার তো আছেই। সেই সুযোগে ছবর সিং নির্ভয়ে অভিসার করুক তার কলিয়ানীদির ঘরে। ও যে কেন আপনার দলে যোগ দিয়েছে, কেন যে জীবন পণ করে খেটে চলেছে সে কি আপনি আজও বুঝতে পারেন নি।

—জানি। কিন্তু কল্যাণীকেও চিনি।

—ওর একটি আঙ্গুলের জোবও তো আমার নেই। মনের জোরে মাহুযকে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু আনোয়ারকে নয়। তারা সুযোগ পেলে ক্ষতবিক্ষত না করে ছাড়ে না।

—এ পর্যন্ত অক্ষত রয়েছ তো?

—সে খবরে আপনার কি প্রয়োজন? আপনার পাশে স্থান যখন হল না তখন হয়তো ছবরেরই...

—ছিঃ ছিঃ কল্যাণী, এ সব কী কথা! আর আমাকেই বা কেন এত বিশ্বাস করছ? এই নিশ্চিন্তি বাতে নির্জন ঘরে একাকী আমার পাশে থাকতে তোমার ভয় হচ্ছে না? জানতো রাত বড় ছলনাময়ী। রাতে নাকি মাহুয ব্যস্ত হারায়। মর্যাদা ধোয়। রাত যাহুকরী।

—রাতের এত ক্ষমতা? সত্যি নাকি? জানতুম না তো। মোমবাতির কাঁপা আলোতে কল্যাণীর সারাদেহ কাঁপছে হাসির ঢেউয়ে। সেই আশ্চর্য হাসির মাঝেই ও বলে চলেছে,—আপনাকে দিখে আমার কিন্তু কোন ভয় নেই। আপনার প্রতি মাহুযের অপরিণীম শ্রদ্ধা বিশ্বাস.....

—তোমারও কি সেই বিশ্বাস?

—বিশ্বাস না থাকলেও ভয় নেই?

—কেন?

—কেউ বিশ্বাস করবে না তাই।

—আমি যদি আজ সে বিশ্বাস না রাখতে পারি!

—জগৎবাসী তাতে আপনাকে ভুল বুঝবে না। ও

দোনায় খাদ নেই। ও চাঁদে কলঙ্ক নেই। কলঙ্কিণী হব আমিই। ডুবে যাব আমিই অসম্মানের অতলে। কিন্তু আমিও যে ভেসে থাকতে চাই সম্মানে। তাই মান রাখতে ভান করতে হবে আমাকেই।

কল্যাণীর কথাগুলি অভিমান ভারাক্রান্ত। যেন কথার আড়ালে মনের আশুনাটকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। কেমন মায়ী হল। পাশে-দাঁড়ান কল্যাণীর একখানা হাত ধরে বসালুম চোকির উপর।

আমার হাতের চাপে মনের উত্তাপটা চাপা রইল না বুঝি।

—এই যে তোমার হাত ধরেছি আমি, এর সাক্ষী শুধু আমরা। এই মুহূর্তে তুমি আমায় কী মনে করছ?

—মনে করছি একজন পুরুষলোক, নির্ভয়ে নববর্ষাবনা নারীকে উপেক্ষা করবার মত কাপুরুষতা নেই যে পুরুষের। ওর ঠোঁটের কোণে একটা আশ্চর্য হাসির ঝিলিক। সে হাসি যেন সারা ঘরখানিকেই এক মোহময় মাদকরসে ডবে তুলে। কালীকঙ্করের কাণে কাণে কে যেন বলছে,—এমনি ঝড়ের রাতেই তো জীবনে আসে ঝড়। কিন্তু এই ঝড়ে তুমি কি ভেঙ্গে পড়বে কালীকঙ্কর?

—তুমি কি আমায় উপহাস করছ কল্যাণী! সভয়ে হাত ছেড়ে দিলুম।

—ততোটা সাহস কি আমার থাকা উচিত? নাকি থাকা উচিত ততোখানি ধৃষ্টতা! আপনি বড়ো দুর্বল।

—তুমি কি পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পার না?

—কাকে বলব? নিজেই যে পরিষ্কার নয়, তার কাছে পরিষ্কার হতে যাওয়ায় লজ্জা আছে। আছে আশঙ্কা।

কল্যাণীর মনের কথাটা বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু আমার মনের খবরও কি পেয়েছে ও? আবার ওর হাত-খানা ধরলুম। একটু মুহূর্ত আকর্ষণ করলেই ও যেন এলিয়ে পড়ল বৃকের কাছে। বুঝিবা এখনই নিবিড় আলিঙ্গনে একেবারে মিশে যাবে আমার বৃকের সাথে। হৃদপিণ্ডের কম্পন আমার হৃদয় হয়ে উঠেছে। বাহিরে ঝিঝ ঝিঝ বৃষ্টির জ্বর। আকাশে গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি। যেন কতো যুগের গোপন কথা কাণে কাণে বলছে ওরা।

এমন ক্ষণেই বুঝি ধূর্জটির তপোভঙ্গ হয়, শুষ্ক বঙ্গলগারী  
বৈরাগী চায় স্বন্দরের হাতে আনন্দে একান্ত পরাভব।

কল্যাণী বুঝি আমার মনের কথারই প্রতিধ্বনি তুলল  
শুণ শুণ করে : এমন দিনে তারে বলা যায়  
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।  
যে কথা শুনিবে না কেহ আর  
নিভৃত নির্জন চারিদার...

আমিও স্থর মিলালুম,—

প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ  
রুখিষা রাখিতে নারি... ..

কল্যাণী সংযোজন করল,—

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ  
কিসের আধার, কিসের পাষণ,  
উথলি যখন উঠিছে বাসনা  
জগতে তখন কিসের ডর।

একটা অভাবনীয় রোমাঞ্চ পুলকে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল  
আমার থর থর করে। একি কল্যাণীর অভয় আহ্বান ?  
বুকের মধ্যে একসাথে শত শত নাগিনী ফুসিয়ে উঠেছে।  
কী অসহ্য উন্নত আবেগ।

রাজা হয়ে উঠেছে কল্যাণীও। এতদিনে বুঝি  
বিকশিত হ'ল কলি। এই মুহূর্তে যাক না সব বাঁধ ভেঙ্গে।  
আত্মক না প্রাণন। কাঁপছে কল্যাণী। কাঁপছে বুঝি  
অসহ্য পুলক শিহরণে। নারীর এই সর্বনাশা মুহূর্তের রূপ  
আমার অচেনা নয়। এ আহ্বানে কবে পেরেছে কোন  
পুরুষ সাজা না দিয়ে ?

তুমি কি করবে কালীকঙ্কর ? কিসের প্রতীক্ষায়  
প্রতিটি মুহূর্ত তোমার হৃৎসহ হয়ে উঠেছে ?

কল্যাণী সেই থেকেই চোখ বুজে আছে। উপযুপরি  
চুমু খেলুম ওর মুদ্রিত চোখের উপর। নিবিড় আলিঙ্গনে  
আবৃত করে ওর কাণের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলুম, কলি !  
না না, কলি নয়, আজ তুমি বিকশিত শতদল !

এতক্ষণে চোখ মেলে কল্যাণী। সোজা তাকাল  
আমার চোখে চোখ রেখে। এতো অস্বাভাবিক আকৃতি-  
ভরা চোখ নয়। এ-যে একটা বিঘাঙ্ক সন্ন্যাসপের ক্রুর  
দৃষ্টি। তার গরল মাখা তীক্ষ্ণ শর।

অকস্মাৎ সর্পদণ্ড আনমনা পথিকের মত আমি চমকে  
উঠলুম। শিথিল হল নিবিড় আলিঙ্গন।

উঠে বসল কল্যাণী।

ধীরে ধীরে উচ্চারণ কবছে এক একটি শব্দ। এক  
একটি শব্দ যেন ছিন্নমস্তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া এক এক  
বলক তাঁজা রক্ত।

—কি ভাবছেন ? আর কতোটা রিস্ক নেওয়া যায় !  
তাই না ?

রক্তধারার মত গড়িয়ে পড়ছে হাসির ধারা ওর  
ঠোঁটের কোণ বেয়ে।

হেসে চলেছে কল্যাণী। রাত্রির নিতুঙ্কতা থান থান  
হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে একটা বজ্রপাত হতে  
পারে না। পারে না ক্যাম্পটাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে  
ফেলতে ? মুছে ফেলতে কল্যাণীকে চিরতরে।

চিনলুম একটা পুরুষের মত পুরুষকে। গগনস্পর্শী  
যার সম্মান। আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতধারী মহান নেতা  
কালীকঙ্কর মজুমদারকে চিনলুম। আর চিনেছিল  
স্বমিত্রা। সেতো মরেছে। এবার আমার কী ব্যবস্থা  
কববেন ? একটা কিছু করতেই হবে।

—ক্ষমা করো কল্যাণী।

জীবনে এই প্রথম ক্ষমা চাইল কালীকঙ্কর। সেও  
এক নারীর কাছে।

কল্যাণীর কথাগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতের মত  
আমার সর্বাঙ্গে যেন কেটে কেটে যাচ্ছে। আদিম যুগের  
একটা হিংস্র জানোয়ার নিষ্ঠুর রক্তক্ষয় বৃকের মধ্যে  
দাপাদাপি স্তব্ধ করেছে। অদম্য আক্রোশে হাতের মুঠোটা  
লৌহকঠিন হয়ে আসছে। আর বুঝি পারি না নিজেকে  
সংযত রাখতে।

কল্যাণী বলেই চলেছে :

ভয় নেই আপনার। আজ আমায় আরও কিছু  
অপমান করলেও আমার এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে  
আপনাকে আমি ছোট করতে পারি। ও চেঁচায় আমারই  
কলঙ্ক। তাছাড়া যেটুকু শ্রদ্ধা পেয়েছি মাহুঘের কাছে  
সেতো আপনারই দান। এঁতো আমার মূলধন। কাঁপা  
সেটিমেটের ঝোঁকে সে মূলধন হারিয়ে নিঃশব্দ হতে চাই  
না আমি। নেহুত্বের স্বপ্ন আমিও যে দেখি মাঝে মাঝে।  
তাই নিজ স্বার্থেই আপনাকে বড় করে রাখতেই হবে

আমার। শুধু স্মৃতিজ্ঞাদির শেষ চিঠিখানা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিলাম না বলেই মহা অভিনেতার সাথে একটু ক্ষুদ্র অভিনয় করে দেখলুম।

কল্যাণীর দীর্ঘ বক্তৃতায় কাণ দেবার মত মন আমার ছিল না। কিন্তু ওর শেষ কথাগুলিতে সচকিত হয়ে উঠলুম।

—স্মৃতিজ্ঞার কতটুকু তুমি জান ?

—কতটুকু আপনি জানেন।

—কি লিখেছে স্মৃতিজ্ঞা।

—এই দেখুন না।

কল্যাণী তা হলে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

ক্ষুদ্রা নাগিনী তার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত সমস্ত কালকূট নিঃশেষে উল্লীর্ণ না করে আজ নিরস্ত হবে না। বাঁ হাতে মুঠো করে রাখা বহু ভাঁজে জীর্ণ চিঠিখানা এতক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে। সেই আধ-ভেজা ময়লা চিঠিখানা ও তুলে ধরলে আমার চোখের সামনে।

স্মৃতিজ্ঞার লেখা আমার অচেনা নয়। এক টানে ছিনিয়ে নিলুম চিঠিখানা। সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরলুম মোমবাতির উপর। ছাই হয়ে গেল।

—আহা, একেবারে নিরস্ত করে ফেলেছেন আমায় ?

কল্যাণী এসেছে প্রস্তুত হয়ে। কালীকঙ্করকেও অপ্রস্তুত হলে চলবে না। পরুষকঠিন কণ্ঠে বল্লম—যে পরিচয় নিয়ে স্মৃতিজ্ঞা মরেছে, সেই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শেষ পরিচয়। স্মৃতিজ্ঞা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমর শহীদরূপেই অমরীয় হয়ে থাকবে। এ চিঠি হত তার জীবনীতে প্রাক্ষিপ্ত, তাই পুড়িয়ে ফেল্লুম।

—আপনার জীবনেও হয়তো স্মৃতিজ্ঞা প্রাক্ষিপ্ত।

প্রাক্ষিপ্ত আজকের কল্যাণীও। দেশবানী চিরকাল আপনাকে দেবতা বলেই স্মরণ করবে। হাঃ হাঃ হাঃ...

—কী স্মরণ তোমার বিজয়! কী অগ্নিবর্ষী তোমার হাসি! তোমার আজ হল কি কল্যাণী ?

অকস্মাৎ স্নিগ্ধমেহুর হয়ে উঠল কল্যাণীর চোখ দুটি। দুহাত বাড়িয়ে চেপে ধরল আমার একখানা হাত। কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলছে :

আজ এক আশ্চর্য দিন আমার জীবনের। সফল হল আমার দীর্ঘ জীবনের তপস্বী। হে ভোলা মহেশ্বর, আজ খুলে গেছে তোমার অস্থিমালা, মুছে গেছে চিতাভস্ম। কপালে যোগেছ পুষ্পরেণু। তাইতো কৌতুকে হাসছে উমা। আজকের এ প্রগল্ভতা আমার ক্ষমা করো। ক্ষমা করো দেবতা। সত্যি বলছি আজ আমি ধন্য। আমি সার্থক। আমি কৃতার্থ। নারী যদি পুরুষের কাছে তার নারীত্বের স্বীকৃতি না পায় সে যে কত বড় ব্যথা তার তুমি কি বুঝবে ? তুমি তো পাষণ দেবতা। আজ এই দুর্বল মুহূর্তে অন্ততঃ তুমি আমায় নারীরূপে স্বীকার করেছ। খুলে ফেলেছ তোমার অভিনয় মুখোশ, দেখতে চেয়েছিলাম মাতৃষ কালীকঙ্করকে। সেই পরম দর্শন হল আজ আমার। এতদিনের সঞ্চিত ব্যথা তাই আজ গরল হয়ে বেরিয়ে আসছে। একে আমি কিছুতেই রোধ করতে পারছি না। তুমি ক্ষমা করো আজকের এই কল্যাণীকে।

—কি দুর্বোধ্য তোমার কথা কল্যাণী! কি দুর্বোধ্য তুমি!

—ততোধিক দুর্বোধ্য তুমি। তোমাকে বুঝতে কতদিন কেটে গেল আমার। আমাকে বুঝতেও না হয় কিছুটা সময়...ভোর হয়ে এল।...অবসান হল দুর্ধোগ রজনীর।...ঐ দেখ রাজা আকাশ...গুঁরা এসে পড়বে হয়তো...উঠি এবার...

কল্যাণী উঠল আমার হাত ছেড়ে দিয়ে। বাইরে যেতে যেতে বলছে...ভাল লাগে...যা ভাল লাগে তাই কি ভাল ?

কল্যাণীর দেখান রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছি স্থির হয়ে। মেঘ-ধৌত একফালি ঝকঝকে রোর এসে পড়েছে আমার পায়ের কাছে। ভোরের ঝিঝিঝি হাওয়াটা ভারি ভাল লাগছে যেন। রাজিটাকে মনে হচ্ছে একটা হুঃস্বপ্ন। রাজি ছলনাময়ী। অকস্মাৎ মনে পড়ল কল্যাণীর সেদিনের কথাগুলি; 'কোথায়বা সে সূর্যের আলো আর কোথায়বা সে দখিনা মলয়'।

কি বলতে চায় কল্যাণী ? কি চায় ও ?

( ক্রমশঃ )

# প্রাচীন অর্বাচীন তথ্যে বরিশাল

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

জাতীয় তথ্য সেইখান দিয়া তমদাচ্ছ, যদি না পুরাবৃত্ত থাকে। এই পুরাবৃত্তের দ্বারায় জাতির উত্থান-পতনের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। ভারত রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের উক্তিটি বড়ই প্রাণধান যোগ্য—“Records are the basis of History and can alone give authenticity to our knowledge of the past.”\*

বরিশাল নগরের পূর্ব নাম “বাকলা”। চীন পরিব্রাজক হ্যুয়েন সাং† (Hsuen Tsang) এর ভারত ভ্রমণে “বাকলা” নাম দেখা যায়। তখন “বাকলা” সমুদ্রিশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। আকবর বাদশাহের “নও-ই-রতনের” অন্ততম অমাত্য ঐতিহাসিক আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরি”তে “বাকলা”র উল্লেখ দেখা যায়। “আইন-ই-আকবরি” গ্রন্থ মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া যেন মনে হয়। তৎপূর্বে ভাল ইতিহাসের কথা তেমন বড় অবগত হওয়া যায় না। আকবর বাদশাহের অসহমতিক্রমে এবং ইচ্ছায় ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে হিন্দুস্তানের প্রাচীন ইতিহাস, পরগণা বিভাগ, রাজস্ব, প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে (Ain-i-Akbari—Gladwin’s translation, p. 304)। “দ্বিজেন্দ্রপ্রকাশবিস্তৃতি” নামে সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে “বাকলা”র যাহা সীমা নির্ধারিত আছে, মতবৈধ হব পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর সীমানায়। কেননা, তাহা অপেক্ষা আরও দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ঐ তিন দিকের। ইংবাজ রাজত্ব পতন হওয়ার পরে (অর্থাৎ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বাখর-গঞ্জের এলেকা ঢাকা বিভাগস্থ পদ্মা, কালীগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম, মেঘনা, চাঁদপুর এবং সমুদ্রের পশ্চিম পর্য্যন্ত ভূখণ্ড (সমুদ্র পর্য্যন্ত ?); পশ্চিম সীমানায় ভূষণা, যশোহর, রাজমঙ্গল নদীর মোহানা (পূর্ব সীমান্তবর্তী ?) পর্য্যন্ত

যত ঢাকাব দ্বীপ, সম্ভীপ এবং তদধীনস্থ দ্বীপ ব্যতীত সমস্তই বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল (Sixth Report, House of Commons, dated 6th April, 1781)। বর্তমানে যাহা দেখা যায়, তদপেক্ষা “বাকলা” দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ছিল। বিক্রমপুর, বাকলা, নবদ্বীপ এই তিন স্থান সমগ্র বঙ্গভূমে কৃষ্টির আগার ছিল। তন্মধ্যে আবাব “বাকলা”ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বিঘঙ্কনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ ছিল। কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম—মধুসূদন সরস্বতী, গৌরীনাথী-কুট, হরিনাথ, মহামহোপাধ্যায় আলোক, গোলক, রুদ্র, মঙ্গল। মধুসূদন সরস্বতী ব্যতীত আর কাহারও কোন রচনার কথা জানা যায় না। থাকিলেও দুঃখ্য এবং নিশ্চিতই বিরল হইবে। “বাকলা”র বিস্তৃত “দিন-পঞ্জিকা” প্রস্তুত হইত। এই পঞ্জিকার বিধানমতেই তখন হিন্দু-সন্তানের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইত (Taylor, Topography of Dacca)। বৈদিক যুগে লগধ মূনি কর্তৃক “পঞ্জিকা” সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় (বেদাদ জ্যোতিষ, ৭)। “বাকলা” ব্যতীত “কতিয়াবাদ”ও বলিয়া উল্লিখিত আছে (Hunter, Statistical Account of Dacca, p. 119), অনেক প্রাচীন দলীলে দেখা যায়। সাধকপ্রবর বিজয় গুপ্তের “মনসা-মঙ্গল” গ্রন্থে “কতিয়াবাদের” উল্লেখ একরূপ :

“\* \* \* বাজার পালনে প্রজা স্বখে ভুঞ্জে নিত,  
মুল্ক কতিয়াবাদ বাকরোড়া তকসীম।

\* \* \*

কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের স্থর,  
অজ্ঞ জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে হুচতুর।”

কবির গ্রন্থ রচনার প্রাবল্য কাল তাঁহারই গ্রন্থে প্রকাশ-মান—“ঋতু-শৃংখল-বেদ-শশী পরিমিত শক” অর্থাৎ ‘অকস্মৎ বামাগতিঃ’ অল্পবয়সী ১৪০৬ শকাব্দে (১৪৮৪ খৃঃ অব্দে) গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। পাঠান নৃপতি সুলতান হোসেন শাহের সমসাময়িক কবি কর্ণপুরের পরিচয়বাক্যের উক্তিও তদ্রূপ বটে। সুলতান হোসেন ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। সেই সময় এবং তাহারও অনেক পূর্বে “বাকলা” অতীব সম্প্রসারিত ভূভাগ এবং পণ্ডিতসমাজ

\* Presidential Address, The 27th Session of the Indian Historical Records Commission held at Nagpur, M. P., on December 25 & 26, 1950.

† চীনা—হিউএন-ৎসাঙ, উত্তর চীনা উচ্চারণ—Hsuan বা Yuan Chwang জাওয়ান (বা য়ুশান) চুয়াঙ, (বা চোয়াঙ)। কয়েকটি প্রামাণিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস।

নামে প্রখ্যাত ছিল। যুরোপীয় পরিব্রাজকের মধ্যে সর্বপ্রথম রল্ফদিচ্ বাকলায় ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আসেন। ইহা ব্যতীত পর্তুগীজ ধর্ম-প্রচারক ফ্রান্সিস্ ফারনেন্ডেজ্, ডোমিনিচ্ ডাণোসা, এন্ড্রু বাউন্স প্রভৃতি বাকলায় অবস্থান করেন। ইহাদের অবস্থিতিকাল ১৫২৮ ও ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। নবাব আলিবর্দি খাঁর আগা বাকর নামে জনৈক মুসলমান রাজপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে সমগ্র ভূখণ্ড “বাকরগঞ্জ” নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ‘বাকর’ শব্দটি আরবী। ইহার শুদ্ধ অমুলিখন (অমুলেখন বা) কথিতে হইলে করিতে হইবে ‘Baquir’। তন্নিমিত্ত কেহ কেহ ‘Baquirganj’-এ লেখেন—“The District of Bakarganj derives its name from one Aga Bakar, who was a servant of the Nawab of Murshidabad.”—Beveridge, The District of Bakarganj, London, 1876, p. 48. “আইন-ই-আকবরিতে” ও “ইস্‌মাইলপুর” বলিয়া “বাকলা”র আরেকটি নামের উল্লেখ আছে। ইস্‌মাইল—আইস্‌ম (নাম), ইংরাজী—Ishmael.

মুসলমান রাজত্বের সময়ে প্রচলিত শিক্ষা ছিল—গ্রাম্য পাঠশালায় চিঠা-পৈঠা, একোয়াল, রোজনায়া, হিসাব, নিকাশ, তেরিজ্জ, জমা-খরচ, গোসোয়ারী ও তালিম লিখা এবং মক্তবে মুন্সী মৌলবীর নিকট আরবী, ফার্সী, উর্দু শিক্ষা করা। তাই, সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন হিন্দু-গৃহস্থ পুত্রদের শিক্ষার জন্ত বাড়ীতে মৌলবী রাখিতেন।\*

অদ্যাপি বিচারালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আরবী, ফার্সী, প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উর্দু আদালতের কথিত ভাষা ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষা উর্দু ভাষার স্থলে প্রবর্তিত হয় (XI C. W. N., 1907, 306-7)।

ইংরাজ-রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাথরগঞ্জ ভিন্ন জিলা হয় নাই—ঢাকা জিলার অন্তর্গতই ছিল। ইংরাজের শাসনদণ্ড সর্বপ্রথমে নলছিটি থানার অধীন পোনাবালিয়ার সন্নিকট “বারইকরণ” নামক স্থানে প্রোথিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মিডলটন্ সাহিব

কর্তৃক সরকারী আফিসাদি “বারইকরণ” হইতে “বাকর-গঞ্জে” স্থানান্তরিত করা হয়। ইনি সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম স্থানীয় শাসনকর্তা ছিলেন। বিচারকের কার্যও তিনি করিতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি তথায় শাসনকার্য্য নিরূহ করেন। শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভূভাগের এক ভাগের নাম রাখা হইল “বাকর-গঞ্জ জিলা”—শাসন-কর্তা হইলেন মিঃ মিডলটন্ সাহিব। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাকরগঞ্জ জিলা ঢাকা কালেক্টরীর অধীন ছিল। ঐ সনে বাকরগঞ্জে পৃথক্ কালেক্টরী স্থাপিত হয়—মিঃ হাণ্টার সাহিব প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ উইটেল্ সাহিব শাসন-কর্তার আমলে বাকরগঞ্জ জিলার সদর আফিসাদি বাকরগঞ্জে হইতে “বরিশাল” স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই স্থানেই সংস্থাপিত আছে। দেওয়ানী হাকিম ও শাসন-কর্তার অহুমরণ করেন। সম্ভবতঃ, বাকরগঞ্জে রাজধানী হইবার ২১৩ বৎসর পরে ঐ জিলায় রীতিমত দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইয়া থাকিবে। বরিশালে পৃথক্ কালেক্টরী স্থাপিত হইলে কোজদারী ও দেওয়ানী কার্য্য অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে মহকুমা করার প্রস্তাব হইল। বরিশালে সদর ভিন্ন অপর তিনটি মহকুমা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতখাঁ মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের খণ্ড প্রলয়ে দৌলতখাঁ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তৎকাল মহকুমা পব বৎসর ভোলায় স্থানান্তরিত করা হয়। মহাবড়ের সময়ে জিলার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর ছিলেন মিঃ বাটন সাহিব। ১২৮৩ সালে ১৬ই কার্তিক, মঙ্গলবার, শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে (৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ মহাবড় প্রবাহিত হইয়াছিল। তারপর, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পিরোজপুরে এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পটুয়াখালীতে মহকুমা স্থাপিত হয়। খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমাবধীন ষত স্থান, তাহা পূর্বে এই জিলাভুক্ত ছিল। বিগত ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে খুলনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে মাদারিপুর এবং কোটালীপাড়া ফরীদপুর ভুক্ত হইল। †

\* “কায়স্থ-সমাজ”, কলিকাতা, ১৭শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃঃ ২২১, ৪. v., “রাসচন্দ্রপুরের গৃহচৌধুরী।”

† Jaok, Bengal District Gazetteers, Bakarganj, Vol. XXXVI, Calcutta, 1918, p. 23.

পূর্বকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বরিশালে ওকালতি করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর ঘোষ, রাজচন্দ্র রায়, রায়কানাই রায়, বিশ্বেশ্বর দাস, কানীশ্বর দাস, মৌলবী তোফেল আহম্মদ, মহম্মদ আহাছন, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায়, স্বরূপচন্দ্র গুহ, প্রভৃতি। তাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন—“Babu Bisweswar Das is still remembered for unbounded hospitality, Swarup Chandra Guha, Nabin Chandra Ray, Babu Ram Kanai Ray and others, all leaders of society during their time, are still held in great respect and veneration by their grateful countrymen.”

স্বরূপচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রভৃতি ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আইনের সূক্ষ্মজ্ঞান, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপলব্ধি, ফার্সী ভাষায় সমালোচনাবাক্যের অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি, কঠোর কর্তব্যজ্ঞান, জনসাধারণের সহিত সাধু ও অমায়িক ব্যবহার, প্রভৃতি যে সকল গুণের মাধ্যমে বড় এবং শ্রেষ্ঠ উকীল হয়, তাঁহার সে সকল গুণের কোনটিরই অভাব ছিল না। সমস্যাভাবে অনেক সময়ে অনেক লোককে ফিরাইয়া দিতে তিনি বাধ্য হইতেন। দিনের পর দিন ওকালতি করিয়া তিনি অল্প অর্থ উপার্জন করেন। তদ্বারায় বাকরগঞ্জের কালেক্টরীর অন্তর্গত “রত্নদি-কালিকাপুর পরগণা”র তৌজীর কোন কোন অংশ রেভিনিউ সেলেব আইনে (Revenue Sale Law—Act XI of 1859) খরিদ করিয়া রামচন্দ্রপুর গুহপরিবারে সর্ব প্রথম জমীদার এবং “রায়চৌধুরী” আখ্যায় ভূষিত হন এবং সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। বরিশাল শহরে তাঁহার কক্ষক্ষেত্রে এক বিশাল ‘চক্ৰমিলান’ অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ঐ হর্ম্যের স্তায় সুবিধাসম্পন্ন বাড়ী এবং বসতি দালানের মধ্যে একতলা বড় বাড়ী বরিশালে আর একটিও নাই। সম্ভবতঃ, ঐ প্রাসাদ ১২৭৭ সালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হইয়াছিল। ১২৮৩ সালের বজ্রায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমার গ্রামগুলি

বিধ্বস্ত হয়। এই মহকুমায় “রত্নদি-কালিকাপুর পরগণা”র বহু কৃষি প্রজা বাস করিত। স্বরূপচন্দ্র তাহাদের অবস্থার বিষয়ে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি প্রজাদের এক বৎসরের দেয় খাজনাদির ১/৫ অংশ রেহাই দিয়া সম্মান-ভূল্য প্রজা রক্ষা করেন। প্রজাদের কিছুই জীবিকার্জনের ছিল না। কোন শরীফ জমীদারেরা এমন কি সরকার পক্ষীয় হইতে এবং জনসাধারণ পক্ষ হইতেও এবং বিধ ছরবস্থা দেখিয়া সাহায্য দানে স্বীকৃত হন নাই, কি সাহায্য করেন নাই। একমাত্র স্বরূপচন্দ্র কাহাবও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোন প্রকার অর্থ দণ্ডের ভয়ে ভীত না হইয়া ৪০০০০ হাজার টাকা বিনা স্বদে প্রজাদিগকে তাকাবী দিয়াছিলেন। অবস্থার পরিবর্তন হইলে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপে তাকাবী প্রদত্ত অর্থের দ্বিগুণ প্রজারা তাঁহাকে প্রদান করে। স্বরূপচন্দ্রের ঐ কৃতোপকার প্রজাগণ মুক্ত-কণ্ঠে এখনও স্বীকার করিয়া থাকে। প্রজাদের এই সাহায্য দেওয়ার কথা বরিশালের আপামর সুবিদিত আছে।† স্বরূপচন্দ্র তাঁহার ওকালতি ব্যবসার মধ্য দিয়া দেশ-সেবা করিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবসায় শুধু নিমগ্ন থাকিতেন না। অর্থোপার্জন করাই কেবল তাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র ছিল না। তিনি ব্যবসার মাধ্যমে দেশের এবং দেশের জন্ত আত্মনিয়োগ করেন। Dr. Rash Behary Ghosh এর কথাও তাহাই বটে—“Only remember that earning money is not the only object of the profession, but be of help and assistance to your countrymen.”

স্বায়ত্ত-শাসনের সূচনাক্রমে পৌর জ্ঞানপদের ক্রিয়া “টাউন্স কমিটি”র দ্বারায় পরিচালিত হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশীয় ৬ আইন অনুযায়ী “The District Towns’ Act” গঠিত হইয়া প্রতি মণ্ডলের নগরে

† Beveridge, The District of Bakerganj, London, 1876, pp. 132-133; বোদালচন্দ্র দ্বায়—বাধরগঞ্জের ইতিহাস, পৃ: ৩২, ১৫২; “কায়স্থ-সমাজ”, কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃ: ১২৫—১২৬ এবং পাদটীকা, ঐ, ঐ, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃ: ২৫৬-২৫৮, ঐ, ঐ, কাশিক, ১৩৪৩, পৃ: ২৭৬; The Diamond Jubilee of the Bar Association, Barisal, A Short History, pp. 9-10, “Barisal Hitaish”, Barisal, Bengal, Vol. LVII, Nos. 7-8, 10, 14—15, 17—22 & 25, 1949; 57 O. W. N., 5 D. R. (1952—1953), pp. 65—66, 72, etc., etc.

† “কানীপুর নিগারীর সংগ্রহ”, প্রথম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ১২২৬ সাল, ইংরেজি ১৮৮২, পৃ: ৩৬।



তদনুযায়ী “The Town Committee” স্থাপিত হয়। The Bengal Municipal Act প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে পৌর জনপদের কার্য একপে নির্বাহ করা হইত। বরিশাল নগরে উক্ত ৬ আইনের ব্যবস্থা সমূহের প্রবর্তন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দেব ১লা এপ্রিল হইতে আমলে আসে। তৎপবে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে টাউন্স কমিটির সভার প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দ উপস্থিত হইলেন :—

- ১। চক্রপূরশাসক (Dt. Magistrate)—সভাপতি।
- ২। মিঃ টাউন্স (অতিরিক্ত বিচারক)—সহ-সভাপতি।
- ৩। মিঃ আর, জি, ম্যাথিউ (পৌর চিকিৎসক)—

কর্মসচিব।

- ৪। মিঃ ডব্লিউ, এল, ওয়েন্স।
- ৫। বাবু চুর্গামোহন দাশ।
- ৬। বাবু চণ্ডীচরণ রায়।
- ৭। মৌলবী তোফেলে আহম্মদ।
- ৮। মিঃ ই, টাউন্স।
- ৯। বাবু স্বরূপচন্দ্র গুহ।\*

বরিশাল শহরের উত্তর মল্লিক রোডের উপরে জল যাতায়াতের জন্ত একটি খিলান নির্মিত সেতু (culvert) করাব খরচ স্বরূপচন্দ্র গুহমহাশয় জনসাধারণের কার্যের নিমিত্ত বহন করেন।

বরিশাল প্রদেশের বিভিন্ন স্বায়ত্ত-শাসন সঙ্ঘের স্থাপনা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

- ১। ঝালকাঠী মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত ১৮৭৫ খ্রিঃ)।  
তদানীন্তন জন সংখ্যা—৬৪৯৬। কমিশনার—১৫।
- ২। নলছিটি মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত ১৮৭৫ খ্রিঃ)।  
তদানীন্তন জন সংখ্যা—১২৪৬। কমিশনার—৯।
- ৩। পিরোজপুর মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত ১৮৮৫ খ্রিঃ)।  
তদানীন্তন জন সংখ্যা—১০৯৯২। কমিশনার—১৫।

৪। পটুয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত ১৮৮২ খ্রিঃ)।  
তদানীন্তন জন সংখ্যা—৬৪০৪। কমিশনার—২।

৫। ভোলা মিউনিসিপ্যালিটি (স্থাপিত ১৯০১ খ্রিঃ)।  
তদানীন্তন জন সংখ্যা—৫৫৫৮। কমিশনার—১২।

জনগণের মত সংগঠনের এবং সর্ববিধ অভাব দূরী-  
করণের নিমিত্ত বরিশাল শহরে জনসাধারণের (Peoples' Association) যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাব প্রথম অধিবেশন স্বরূপচন্দ্রের ভবনে হয়।† ইহাই পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সমিতিরূপে (১৮৮৬ খ্রিঃ) পর্য্যাসিত হইয়া থাকিবে। প্রথম সভাপতি এবং প্রথম সম্পাদক যথাক্রমে হইলেন প্যারীলাল রায় এবং রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। প্যারীলাল রায়ের পবে দীনবন্ধু সেন, সভাপতি এবং রাখালবাবুর মৃত্যুর পরে অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্পাদক হন। স্বরূপচন্দ্রের প্রাসাদে সরকারী, বেসরকারী, জনসাধারণের বহুবিধ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।‡ বরিশাল শহরের সম্মুখ কাশীপুর-কাঠগড় পল্লীতে শ্রীশ্রীমহামায়া মন্দিরে “শ্রীশ্রীমহামায়া বিজয়তে” শীর্ষক সংস্কৃত গাথায়, রামচন্দ্রপুরে “The Ramchandrapur—Swarup Chandra Guha Chaudhuri Local Board Road,” “Swarup Chandra Guha Chowdhury Charitable Dispensary”, পটুয়াখালীতে “Ramchandrapur Swarup Chandra Guha Chaudhuri Road”, বরিশালে “Swarup Chandra Guha Road,” বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সভার অধিবেশনাগারে শ্বেত-মার্বেল প্রস্তর আরক লিপিতে, বার লাইব্রেরির দরদালানে, স্বরূপচন্দ্রের নিজ বাসভবনের চাঁদনীর দিবারে শ্বেত মার্বেল উপলে সংস্কৃত শ্লোকে বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ এবং ভোলা মহকুমার অন্তর্গত বরানদী থানাধীন উদয়পুড়া গ্রামে “Swarup Babu's Court”এ অদ্যাপি স্বরূপচন্দ্রের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। স্বরূপচন্দ্রের অজ্ঞাত সহোদর ভ্রাতারাম আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রভৃতি

\* The proceedings of the meeting of the Town Committee, Barisal, May, 1869, January, 1873, February, 1873, April, 1873, February, 1876.

† “কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ”, প্রথম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৯২৬ সাল, পৃঃ ২৪, ৩৭।

‡ “Barisal Hitalshi”, Barisal, Bengal, Vol. LVII, Nos. 17—18, 1949.

ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পঞ্চাননের “পঞ্চরত্ন” বলিয়া তখন একটা কথা খুব প্রসিদ্ধি ছিল। তন্মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন স্বরূপচন্দ্র।

স্বরূপচন্দ্রের পুত্র অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী এবং কৃতবিদ্যা ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদেশীয় বহুবিধ ভাষায়, বহুবিধ বিষয়ের প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তিনি একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। হিন্দু আইনে গভীর পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি ব্যবস্থাবিৎ ছিলেন। সঙ্গীত-কলা বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত তিনি সর্বত্র বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত হইতেন। অবিনাশচন্দ্রের বয়স তখন বিংশতি বৎসর হইবে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত বিষয়ে তিনি এম্ এ পরীক্ষা কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে দেন। সেই বৎসরে মৌলবী রহীমুল্লা মুহম্মদ সন্ধানির সভাপতিত্বে ভারতীয় মহাসভার ১২শ অধিবেশন কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে ২৮শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হয়। সেই অধিবেশনে অবিনাশচন্দ্র দর্শকরূপে প্রথম যোগদান করেন। তৎপরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় মহাসভার ৪৩শ অধিবেশন কলিকাতাস্থ পার্ক মার্কারের “দেশবন্ধু-নগরী”তে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরূপে যোগ দেন। এখানে তখন “All Parties Conference”ও হইয়াছিল। “The Nehru Report” মুসলমান্ এবং শিখগণ কর্তৃক বাতীল করা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন। স্বদেশী আন্দোলন তখন বিরাত্ররূপ ধারণ করিতে ছিল। অবিনাশচন্দ্র ওকালতি ব্যবসাতে মনোনিবেশ না করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া অশ্বিনীকুমারের সহকারীরূপে কার্য করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল (১লা ও ২রা বৈশাখ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে) বরিশালে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের ১১শ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনের সভাপতি হইলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মৌলবী আব্দুল রহুল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। কর্মসচিব ছিলেন উকীল রজনীকান্ত দাশগুপ্ত। কোষাধ্যক্ষ এবং আহার বিভাগের কর্তা ছিলেন অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা উকীল কালীপ্রসন্ন গুহ। স্বরূপচন্দ্রের বিশাল অট্টালিকায় সম্মিলনের প্রতিনিধিদের বাসস্থান হইয়াছিল।† অশ্বিনীকুমারের কার্যাবলী প্রচারের এবং সমর্থনের জন্ত তখন কোন সাময়িক পত্র বরিশালে ছিল না। অশ্বিনীকুমার এই অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতেন। এই অভাব দূর করার নিমিত্ত তিনি কৃতসংকল্প হইলেন এবং সংবাদপত্র বাহির করার জন্ত ৩০০০/- হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ঐ টাকা সমভাবে অশ্বিনীকুমার, অবিনাশচন্দ্র এবং বাসন্তীর জমীদার উপেন্দ্রনাথ সেন দেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে “স্বাস্থ্যনাথ মেসিন্ প্রেস” ঐ টাকার দ্বারায় খরিদ করা হয়। এই প্রেস হইতেই কাঁচাবালিঘা-নিবাসী সাংবাদিক প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদনায় “বিকাশ” নামে সংবাদ পত্র বাহির হয়। উহা অশ্বিনীকুমারের কার্যের এবং বরিশালের মুখপত্রস্বরূপে নিপুণতার সঙ্গে তিন বৎসরের অধিককাল প্রকাশিত হইয়া বহু থাকে। “বিকাশ” সাপ্তাহিক, বাঙ্গালা ভাষার সংবাদ পত্র ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে উহা পুনরায় বাহির হয়

+ “Barisal Hitaishi”, Barisal, Bengal, Vol. LVII, No. 17, 1949; ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় মহাসভার দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতার ২২শ অধিবেশনে বরিশালের পক্ষ হইতে অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন গুহ, ভগ্নিনিপতি অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, অমৃতচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, রজনীকান্ত গুহ, নিহারণচন্দ্র দাশগুপ্ত তারিণীকুমার গুপ্ত, নবীনচন্দ্র দাশ, উপেন্দ্রনাথ সেন, দেবকম্বার রায়চৌধুরী, সত্যীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীবোধবিহারী মুখোপাধ্যায়, শচীনাথ সাহা, সৈয়দ মোতাহেয়-হোসেন, মুহম্মদ ইস্‌মাইল চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, ভগিনি নিবেদিতা, প্রভৃতি প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। অবিনাশচন্দ্রও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ নির্বাচনে শহরের প্রতিনিধি ব্যতীত অনেক গ্রাম্য, মহকুমা সমিতি হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিল। শহর সমিতি কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হয়। বঙ্গবিভাগ, বরকট (“অমৃত্যানে অবিনাশচন্দ্র”, পৃঃ ৯৭), কংগ্রেসের নীতি, বিধান-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বাহাতে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়, সেইজন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে ষাণ্ডিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল।

এবং কয়েক সপ্তাহ বাহির হইয়াই বন্ধ হয়। “বাখরগঞ্জ হিতৈষী সভা” সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বাকরগঞ্জে “Female Improving Society” (“নারী উন্নতি বিধায়ক সমিতি”) নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তমহাশয়ের পিতৃদেব ব্রজমোহন দত্ত (বরিশাল জিলায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম হিন্দু বিচারক—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, অথবা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই (৭)—রচনা “মানব”, ইনি স্বরূপচন্দ্রের বন্ধুও ছিলেন) মহাশয় জ্ঞানী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। জ্ঞানীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য তৎকর্তৃক ৪০ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে “বাখরগঞ্জ হিতৈষী সভা” অষ্টঃপুরস্থ জ্ঞানী-শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বাটাজোড়নিবাসী ব্রজমোহন দত্ত, উজীরপুরনিবাসী কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, খলিমাটোনিবাসী চন্দ্রকান্ত সেন, গৈলানিবাসী বিশেষ্বর সেন, ইলুহারনিবাসী বিহারীলাল সরকার, অভয়নৌনিবাসী হরনাথ ঘোষ, গাভানিবাসী অমৃতচন্দ্র ঘোষ, নরোত্তমপুরনিবাসী উগ্রকণ্ঠ রায়, লাখুটিয়ানিবাসী পি, এল্, রায়, বার-অ্যাট্-ল, প্রমুখ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি। কলিকাতানিবাসী কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, জমীদার, ফরীদপুর-সেনদিয়ানিবাসী অধিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহনিবাসী আনন্দমোহন বসু, বার-অ্যাট্-ল (ইনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Wrangler) মহাশয়েরাও এই সভার পৃষ্ঠপোষক এবং উন্নতিকল্পে প্রভূতভাবে সহায়তা করেন। অবিনাশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে এই সভার সম্পাদক এবং সভাপতি পদে বৃত্ত হন। ঐ সব সময়ে সভার কার্যাদি বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে গাভা স্কুল গৃহে “গাভা ধর্মরক্ষী সভা”র যে বার্ষিক সভা হয়, তাহার সভাপতিত্ব অবিনাশচন্দ্র করিয়াছিলেন। ঐ সভার উন্নতিকল্পে তাঁহার সহায়ভূতি ছিল এবং তন্নিমিত্ত তিনি অর্থসাহায্যও করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে বরিশাল হইতে অবিনাশচন্দ্রের উপরে আত্মন আশায় তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকাবশতঃ ঐ নির্বাচন দ্বন্দ্ব দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। না পারায় স্থানীয় সংবাদ পত্রের আক্ষেপ প্রকাশ—“আবার বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় ধনবান্ বটেন, কিন্তু তিনি এ পথে পা দিতে ইচ্ছুক নহেন”—“বরিশাল হিতৈষী”, ২৮ ভাগ, ৩০শে আষাঢ়, ১৩২৭ সাল, ১৩শ সংখ্যা, পৃঃ ২, কলাম ১, “সম্পাদকীয় মন্তব্য।” সভা সমিতিতে অবিনাশচন্দ্রের গতায়ত বড় তেমন ছিল না। তথাপি ২২শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩২৭ সালে কলিকাতা-ভবানীপুরের সাউথ্ স্ববার্কন স্কুলে বরিশাল-চাঁদসীনিবাসী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বেঞ্চ ক্লার্ক স্বর্গীয় শশিভূষণ বসুমহাশয়ের স্ববধার্থ বিরাট সভার অধিবেশনে অবিনাশচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম্-এ, ললিতমোহন দাশ, এম্-এ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্, বসন্তকুমার বসু, এম্-এ, বি-এল্, যোগেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বি-এল্, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল্, রায়মহাশয় (“বরিশাল হিতৈষী”, ২৮ ভাগ, ১০ই চৈত্র, ১৩২৭ সাল, ৪৪ সংখ্যা, পৃঃ ২, কলাম ১ প্রভব্য)। শশিবাবু পরোপকারী, সনাশয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন সমাজে তিনি একজন শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তি থাকায় সর্বত্র সম্মানিত হইতেন। তিনি স্বরূপচন্দ্রের নিকটে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন। সংস্কৃতি সংসদের প্রতি অবিনাশচন্দ্রের অমুরাগ ছিল অশেষ। তন্নিমিত্ত তিনি “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ”, “সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ”, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেবা এবং সাহায্য প্রদান অবিনাশচন্দ্রের নিকটে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ ছিল। তাই, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত “বরিশাল সেবা সমিতি”র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবেই যুক্ত ছিলেন এবং তদবধি বরাবর মাসিক অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সমিতির তিনি পরামর্শদাতৃ সভার সভ্য এবং ১৯২৬ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন \*

\* পূর্বে বঙ্গাধীন বাকরগঞ্জ জিলায় অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে অধুনা লুপ্ত হুগড়া তীরে ৩৯তমদেহের নাসিকা অঙ্গ পতিত হয় এবং এখানে “দেবী উগ্রতার” (“সুনন্দা”) নামে প্রকটতা হন। একাদশ পীঠস্থানের এক পীঠস্থান এই শিকারপুর গ্রামে “তারাবাড়ী” স্থানটি বরিশাল শহর হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থিত। ৩শিষ চতুর্দশী উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই স্থানে দিরাট মেলায় বহু দৃশ্য লোকের সমাগম হইত। অবিনাশচন্দ্র কর্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ “তারাবাড়ী-

‡ “Barisal Hitaishi,” Barisal, Bengal, Vol. XL-VIII, 11th Pousa, 1346 B. S., p. 5, col. 1; অশ্বিনীকুমার—সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বরিশাল, ১৩৩৫, পৃঃ ৪২৮—৪২৯।

নশ্বর জগতে থাকে কীৰ্ত্তি, তাই তাহা অবিনশ্বর !  
কবির উজ্জ্বলিতও তাহাই পরিস্ফুট :

“কাল যারে করে না বিনাশ  
মৃত্যু যারে নাহি পারে করে অপমান  
কীৰ্ত্তি যারে বৃকে নিষে বিতরে সম্মান  
বিশ্ব যাবে স্মরিছে শ্রদ্ধায়  
একমাত্র সেই অবিনাশ ।

\* \* \* \*

রহস্য-তত্ত্বের (৩২৩, ৮) চন্দ্রনীর ধ্যান ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দরভাবে  
অনূদিত হয় ( “বরিশাল হিঠেবা”, ৫০ ভাগ, ৫০শ সংখ্যা, ১৩৫১ সন,  
পৃ: ৫—৪, কলাম ১, ১—৩, ৪ v., “শিকারপুর তারাবাড়ী” জট্টব্য ) ।  
অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত মোহনচন্দ্রের সম্যম পুত্র কালী প্রসন্ন “উগ্রতাবা  
ট্রাষ্ট কমিটি”র ( ২ই জ্যেষ্ঠ, ১৩২০ সনের রেজিষ্টার্ড কৃত ট্রাষ্ট ডিড মূলে  
গঠিত ) অল্পতম ট্রাষ্টী ছিলেন । তারপর, অনেক বৎসর পরে ঐ ট্রাষ্ট  
কমিটির সভাপতি পদে অবিনাশচন্দ্রের পুত্র বিজ্ঞাননাথ বৃত্ত হন ।  
পরিচিতি, “দি ক্যালকাটা রিকিউ”, অক্টোবর, ১৯৫৮, পৃ: ৪৪-৪৮ ।  
তথ্য—বিরেল্লবর্ধা: ভূবি যেন পুংসা সমচ্চিতা: স হবিনাশচন্দ্র: ।  
তদাস্ত্রজ্ঞঃ বিহিতো বিধাতা বিজ্ঞাননাথো নজনাবধন্ত: ॥  
—শ্রীপ্রমথনাথ শর্মণ: ( ভট্টাচার্য্য: কাব্যতীর্থ: বি-এ বিরলবিস্মিত ) ।

বিগত ১৩৫৬ সনের ৪ঠা ভাদ্র হইতে প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী চন্দ্রনগর  
প্রবর্তক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ মতিলাল রায় বরিশালের ধর্মরক্ষণী  
সভার ( প্রাতিষ্ঠিত ১২৯১ বঙ্গাব্দ ) জন্মোত্তমী উপলক্ষে বার্ষিক উৎসবে  
স্বপ্নচন্দ্রের প্রাসাদোপম সুবহু অট্টালিকার ভাহারই পৌত্র বিজ্ঞান-  
নাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন ( “নবমজ্ব”, চন্দ্রনগর, ২৮শ বর্ষ ৩৪শ  
সংখ্যা, ১৩৫৬ সাল, পৃ: ১, পঙ্ক্তি ২, পৃ: ৪, পঙ্ক্তি ২; “বরিশাল  
হিঠেবা”, ৫৭ ভাগ, ১২ সংখ্যা, ১৩৫৬ সন, পৃ: ১, পঙ্ক্তি ২, ৪  
জট্টব্য ) । লেখকের সরল ও অসাময়িক ব্যবহারে সম্বন্ধ অশেষ  
তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন । ভাহার পিতৃদেবের বিরাট গ্রন্থাগারটি  
সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না । চতুর্দশ বিদ্যার সঙ্গে  
বিশ্বের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির এমন সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল দেখা  
যায় । সম্বন্ধের বন্ধ যেন ঐ গ্রন্থাগারে মূর্ত প্রত্যেক পরিগৃহীত ।  
লেখকের কৃষ্টি সংলাপে (cultural discussions) সম্বন্ধের আনন্দিত  
হইয়াছিলেন ।

শাখা প্রশাখায় ভরা বিরাট উন্নত  
সুশীতল স্নেহচ্ছায়ে সবার বন্দিত ।  
শাস্তিতে তোমারে পেলো,  
রামচন্দ্রপুর কীৰ্ত্তি কীৰ্ত্তিমান

অবিনাশ গুহা†

স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং প্রাচীন অর্কাচীন তথ্যে  
বরিশালের দান অশেষ । বৈদেশিক শাসনের বহু  
পূর্ব হইতেই বরিশালবাসিগণ শিক্ষা-দীক্ষায়, কৃষ্টিতে,  
শাসন-সংরক্ষণে অগ্রণী ছিল । বৈদেশিক শাসন দূর  
করার মানসে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ইতিহাসের  
পৃষ্ঠায় স্বর্ণাকরে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে ! আত্মনিষ্ঠ  
এবং দৃঢ়তাই তাহাদের সাফল্য প্রদান করে । “গোড়  
রাজমালা” প্রণেতা প্রভুতাবিক শ্রীমদপ্রসাদ চন্দ্র-  
মহাশয়ের ভাষণ যথার্থ বটে—“যদি বাঙ্গলার কোন  
জেলায় স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকে এবং স্বতন্ত্র ইতিহাস  
লিখিত হইতে পারে, তবে সে বরিশালের জেলা ।  
প্রায় পাঁচশত বৎসরকাল বরিশালবাসী চন্দ্রদ্বীপের  
নৃপতিগণের নেতৃত্বাধীনে আপনাদিগের বাহুবলে  
কার্য্যত: স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং  
তাহারই ফলে বরিশালবাসীদিগের চরিত্রে কতকগুলি গুণ  
ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা আজও লুপ্ত হয় নাই । বরিশাল-  
বাসীদিগের মত দৃঢ়চেতা এবং আত্মনিষ্ঠ বাঙ্গালী আর  
কোন জেলায় দেখা যায় না ।” †

† “বরিশাল হিঠেবা”, ৫০ ভাগ, ২৬শ সংখ্যা ১৩৫১ ।

† বাকসী—স্বর্গীয় রোহিণীকুমার সেন প্রণীত । কীৰ্ত্তিগাথা, বরিশাল,  
১৯১৫, নিবেদন, ১/০ ।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে মোঃহাম লীগেব সভাবসানে জিলা জজের  
সভাপতিত্বে ঐ সমুদ্রে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে Baptist  
Mission-এর প্রধান পাজীসাহেব কেরীর প্রদত্ত বক্তৃতা স্মরণীয় । See  
also, The Encyclopaedia, Britannica, Ninth Edition,  
Vol. III, 1898, pp. 247—249, s. v. Bakarganj; Do.,  
Eleventh Edition, Vol. III, 1910-1911, pp 401—402,  
cols. 2&1; Do., Fourteenth Edition, Vol. 3, 1929,  
p. 112, col. 2, s. v. Barisal.

## তিথি-স্মৃতি

তারাশ্রব ব্রহ্মচারী

১৯৬০-এর ২২শে আগষ্ট। মাতৃকাল্পম গ্রন্থব সত্ত্ব।  
মার্বেল মোড়া হল ভর্তি লোকে লোকারণ্য। সকলেই  
উদ্বিগ্ন হঠাৎ অংগের দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ৮৪ বছরের  
পিতাজী মহারাজের (স্বামী শ্রীশ্রীশ্রী পিতাজী) জন্মে।  
পিতাজীর দীপ্তিপূর্ণ চোখ দুটো শূন্যে আটকে পড়েছে।  
এক স্ত্রে বঁধা হয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। চারদিকের  
লোকের শাসকত্ব অবস্থা।

পিতাজী কী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একটু  
আগেও তো বেশ হাসছিলেন, কথা কইছিলেন। মন  
যেন নিতে চায় না কারো—তিনি অসুস্থ। তবে?

পিতাজী যেন কোথায় চলে যাচ্ছেন। শূন্য-মহাশূন্যে  
নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন ক্রমে। ডাকলে সাড়া নেই,  
স্পর্শে চেতনা নেই। অথচ চোখে-মুখে একটা অব্যক্ত  
আনন্দের চেউ উপচে পড়ছে। ঘরগুরু লোক—মেয়ে-  
ছেলে-বড়-ছোট সকলেরই নিম্পলক চোখের দৃষ্টি বারে  
পড়ছে পিতাজীর মুখে-চোখে সারা শরীরে।

পিতাজীর এতো স্নেহের এরা, ওদের আসায়, অল্প  
সময়ে কতো খুশীতে মেতে ওঠেন তিনি। আজ কী  
কাউকেই তিনি লক্ষ্য করছেন না?

পিতাজী দেখছেন। অনেক কিছু দেখছেন। সবাব  
সামনে, অথচ আড়াল রেখে দেখছেন।

তঁার ছ' চোখে জলের ধারা নামছে। না বুঝে, তাই  
দেখে সকলের চোখও ভাসন্ত হ'য়ে উঠছে। না-জানা না-  
বোঝার অপেক্ষায় তারা অধীর হ'য়ে পড়ছে আরো।

পিতাজীর ঠোঁটে মুহূ হাসির রেখা। সকলের ধঁড়ে  
ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণের স্পন্দন ক্রম হ'য়ে উঠলো। এইবার  
পিতাজী কথা কইবেন নিশ্চয়। কই, কথা তো কইছেন  
না! নিরাশ হ'য়ে যায় ওরা। আস্তে আস্তে চোখ বুঁজে  
এলো পিতাজীর।

পিতাজীর মুখে অক্ষুট 'মা' আওয়াজ। সকলের প্রাণ  
জুড়িয়ে গেলো। ওরা অভয় বাণী শুনলে।

সব নিস্তব্ধ! সন্ধ্যা যেন মাঝরাত। খালি শত শত  
নিশ্বাস বেঁচে আছে হাজার হাজার হ'য়ে। 'মা-মা' বলে  
চলেছেন একটিনা। একের 'মা' অপরের কাণে-প্রাণে ধাক্কা  
দিচ্ছে কেবল—নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

পিতাজী চাইলেন। চোখ অল্প জগতের। স্পষ্ট দেখতে  
পাওয়া যাচ্ছে, সে চোখ দেখছে, কথা কইছে, চলছে,  
ফিরছে, ঘুরছে, হাসছে, কঁদছে। চলে যাচ্ছে মুহূর্তে  
অতীতের অভল তলে। আবার ফিরে আসছেও মুহূর্তে।

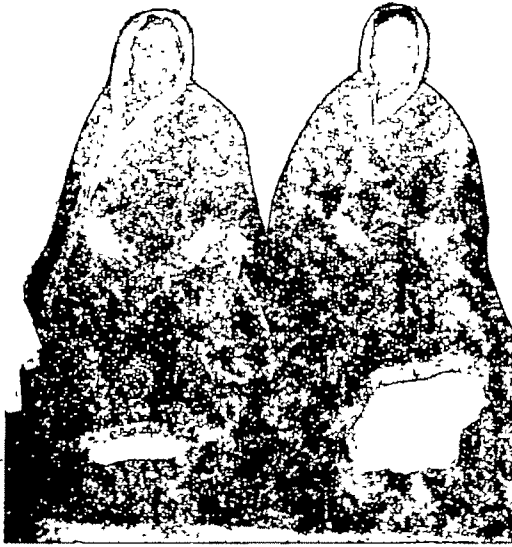


শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীশ্রী পিতাজী মহারাজ

ওই আসা-যাওয়ায় পিতাজী যেন বুঁজে পাচ্ছেন কাকে।  
একেবারে নিজের ভেতরে। নিজের সকল সত্তা ঘিরে  
আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন। ছাড়তে চাইছেন না।  
আর পিতাজীকেও একের পর এক দৃষ্টের পাহারা এসে  
ঘিরে ধরছে। পিতাজীর ভাব-ভংগী মুখের বৈচিত্র্য লক্ষণই  
প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে সেই সত্যটা।

“—প্রণব! কল্পনা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না!  
কল্পনাকে সত্যে রূপ দিতে হ'বে, বুঝলে?”

—যোল বছরের প্রণব বুঝেছিলেন সে কথা। মর্মে  
মর্মে গাঁথে গেছলো তাঁর। মা-বাপের একমাত্র ছেলে  
প্রণব। বড় মুখ-চাওয়া। তাই বাবা সুকুমার মুখার্জী,  
মা শ্রীমালিনীদেবী রোজই দেবীমাতা, শক্তি মাতার কাছে  
নিয়ে আসতেন তাঁকে—ছেলেকে মাহুঘের মতো মাহুঘ  
করবার জন্তে, মাতাজীদের উপদেশ নেবার জন্তে।  
সুকুমারের জোড়াসাঁকোব বাড়ীর খানচু'রেক বাড়ীর  
পরেই মাতাজীদের বাড়ী।



শ্রীদেবীমাতা

শ্রীশক্তিমাতা

উনবিংশ শতাব্দী। দেশবাসীর কুসংস্কারের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হ'বার আকুল আহ্বানই এক এক রূপ নিয়ে প্রকাশ হ'চ্ছে। প্রতিভার শোভাবাত্রা অরণীয় ক'রে তুলছে শতাব্দীটাকে। এই শতাব্দীর অগ্ন্যন্তর সূক্ষ্ম দেবীমাতা ও শক্তিমাতা। হুগলী জেলার আটপুৰ গাঁয়ের প্রসন্ন ব্যানার্জী ও রাজলক্ষ্মী দেবীর যমজ কন্যা। ১৮৬৬ খৃঃ ২ই সেপ্টেম্বর রবিবার তাঁদের জন্ম।

ছোটবেলা থেকেই দেবী আব শক্তি দু'বোনেই পাড়া-প্রতিবেশী কণীদের সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে মেতে থাকতেন নাওয়া-খাওয়া তুলে।

বড় হ'বার সংগে সংগে বেড়ে উঠলো ছোটবেলার অভ্যাস। বেদ-তন্ত্র-যোগ-জ্যোতিষ-আয়ুর্বেদ-সূর্যরশ্মির বর্ণ চিকিৎসা রোগ নিরাময় শাস্ত্র-সমুদ্র থেকে তথ্যরত্ব ছেকে ছেকে তুলতে লাগলেন তাঁরা জনসাধারণকে কঠিন কঠিন রোগমুক্ত, চিন্তামুক্ত ক'রে তোলবার জন্তে—দীঘজীবী করবার জন্তে। দেশে দেশে ঘুরে সে তথ্যগুলো তুলে দিতে লাগলেন জনসাধারণ দরিদ্রদের হাতে হাতে। সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলো একে একে সকলে। 'দাক্ষ্য-দেবী' আখ্যা দিলে ওরা মাতাজীদের।

১৯০২ খৃঃ ২রা নভেম্বর বুধবার রাত ২ টায় শক্তিমাতা দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের বারো বছর পর কাশীধামে ১৯৪৩ খৃঃ ১৮ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত ৩টায় দেহত্যাগ করেন দেবীমাতা।

দেবীমাতা আর শক্তিমাতা তাঁদের দেহত্যাগের সময়,

লোকসেবার গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়ে যান পিতাজী মহারাজের হাতে। পরিব্রাজক স্বামী সচ্চিদানন্দ পরম-হংসজীর শিষ্য যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহাবাহু মাতাজীদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন আজো প্রাণপণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাতৃকাস্রম প্রণব সঙ্ঘে ( ১৫ বি, চৈত্র গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-২৬ )।

মাতাজীরা জাতিভেদ, দেশভেদ, ধর্মভেদ কুসংস্কার থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন আপ্রাণ চেষ্টায়। তাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত এই অমৃত-বাণী আর রোগ নিরাময়ের তথ্যগুলি, পিতাজী মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধরে রাখা আছে—দেবীশক্তি বাণী, দেবীশক্তি তত্ত্ববাণী, দেবীশক্তি মাতাজী কী হিতবাণী, বায়ুরশ্মি বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তিক-সারগীতে।

মাতাজীরা এ কথা বারে বারে বলে গেছেন—দেশকে, জাতিকে গঠন করতে ভালো মায়ের প্রয়োজন। চরিত্রে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সাহসে, ধৈর্যে, স্নেহে, শাসনে, মনঃশক্তি, আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ যে নারী, সেই নারীই একমাত্র দেবী আখ্যা পেতে পাবে। বীরমাতা হ'তে পারে। দেশ জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

শুভ মতিই জীবনের ঐশ্বর্য। চরিত্র ও মন আধ্যাত্মিক কর্শুশক্তির ভিত্তিকে শক্ত ক'রে ধরে রাখে। বিপথ থেকে সুপথে চালায়।

এইভাবে মাতাজীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী-বাণী পাঠ শেষ হ'ল ২৫তম জন্মতিথির সন্ধ্যায়।

তারপর—

পিতাজীর তারপর থেকেই ওই ভাবাবেশ। ভাব-রাজ্যের দেবীমাতা, শক্তিমাতার কোলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেলা করছেন তিনি—সকলকে উৎকর্ষায় ডুবিয়ে রেখে।

আরতির সময় ব'য়ে যায়। ঘণ্টা বেজে উঠলো। পিতাজীর সঙ্ঘিৎ ফিরলো। চারদিকে চলমান চাউনি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। ফিরে এলেন স্বাভাবিক হ'য়ে, আগের পিতাজী মহারাজ সবার মাঝে। সকলের চোখে মুখে আনন্দের ঝলক।

গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন পিতাজী, কল্পনাকে বাস্তবে—সত্যে রূপ দিতে হ'বে তোমাদের।

শ্রীদেবীমাতা, শক্তিমাতা বলে গেছেন—স্বাণু হ'য়ে পড়লে চলবে না। সজীব জীবন্ত হ'য়ে উঠতে হ'বে সকলকে—কাজের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে অসীম শক্তিকে বৃকে ধরে, সব প্রাণ একপ্রাণ হ'য়ে।

## ভারতজননী

শ্রীশুরেশচন্দ্র মজুমদার

অনুবাদক : শ্রীকমলাকান্ত আচার্য্য:

তোমারে উষায় ফুল কুহুমে দেখেছি মধুরহাসিনী,  
অরুণ-প্রভাতে পাখীর কুঞ্জে দেখেছি মধুর ভাবিণী,  
কনক কিরণে তরুলতা শিরে দেখেছি কনকবরণী,  
ছায়া-মায়া-ঘেরা কুঞ্জ-কুটীরে কত না শাস্তিদায়িনী;  
সফল জীবন ওগো স্বধাময়ী, আমার ভাবত জননী,  
লভিয়া জনম তোমার অঙ্গে, চরণ কমলে প্রণমি।

তোমারে দেখেছি শ্রামল শস্ত্রে স্নেহ-ঢল-ঢল-তনিমা,  
দেখেছি তোমারে তটিনী তড়াগে উছলিত তব মহিমা;  
নিদাঘে তপন-তপ্ত দিব্য দেখেছি তোমার দীপ্তি,  
শরতে জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ নিশায় বিহসিত তব তৃপ্তি;  
সফল জীবন ওগো স্বধাময়ী, আমার ভারতজননী,  
লভিয়া জনম তোমার অঙ্গে, চরণ কমলে প্রণমি।

তোমার অঙ্গে গলিয়া পড়িছে পরম জ্ঞান ও পুণ্য,  
ধৌত করিয়া তোমার চরণ সাগর হইল ধ্বজ;  
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে বয়েছে কত না শক্তি,  
অমৃত ভরু তোমার ধূলায় ঢেলে গেছে কত ভক্তি;  
সফল জীবন ওগো স্বধাময়ী আমার ভারতজননী,  
লভিয়া জনম তোমার অঙ্গে, চরণ কমলে প্রণমি।

লভিয়া কাঁপকা তোমার তেজের বিস্মিতা করিলা ধরণী,  
অমর তোমার সম্ভানদল দীপ্ত গৌরবে আপনি;  
তোমার চুল্ল রামকৃষ্ণ ভীষ্মাদি মহাশূর,  
(আর) বুদ্ধ গোরা আদি ষাঁহার কবিল জগৎ আধার দূর;  
সফল জীবন ওগো স্বধাময়ী, আমার ভারতজননী,  
লভিয়া জনম তোমার অঙ্গে, চরণ কমলে প্রণমি।

তোমার ললাটে গরিমার ঢাকা দিয়াছে ঐকিয়া বিজয় বীর,  
কনক-মুকুটে শিবাজী স্ভাষ করেছে ছুঁষিত তোমার শির;  
রক্ত-রাজ্য রূপাণে চরণ পুজেছে প্রতাপ নবীন পার্থ,  
তোমার পরম-পুণ্য বক্ষ আমার স্বর্গ আমার তীর্থ,  
সফল জীবন ওগো স্বধাময়ী, আমার ভারতজননী,  
লভিয়া জনম তোমার অঙ্গে, চরণ কমলে প্রণমি।

দৃষ্টাসি স্বম্ প্রকটকুহুমে প্রাতরাতে সুহাসা  
মন্তোহং স্বাম্ বয়সবিরবৈ রুদ্রগৈতৈর্ভাষমানাং  
উদ্ভিন্নদে কনককিরণে শস্ত্রে স্বর্গকাস্তি:  
মাষাচ্ছমে মধুময়গৃহে কিম অহো! দস্তশাস্তি:  
ভো, ধন্তো মে প্রতন্তুতনিমা, ভারতাষে! স্বধাথ্যে!  
বন্দেহং স্বং চরণকমলং জন্মপুণ্যেন লব্ধা।

শ্রামে শল্পে তন্তুতরলিতং দৃষ্টতে স্বষ্টবর্ণং  
দৃষ্টাসি স্বম্ সরিদি জলধৌ প্রোচ্ছলিত্রী মহিমা  
সম্প্রেক্ষ্যাসি প্রথর কিরণে সৌরদৃপ্তে চ গ্রীষ্মে।  
তৃপ্তি: সা তে বিহসনযুতা শারদে দীপ্তরাত্রৌ  
ভো ধন্তো মে প্রতন্তুতনিমা ভারতাষে! স্বধাথ্যে!  
বন্দেহং স্বং চরণকমলং জন্মপুণ্যেন লব্ধা।

যুগ্মভাষং গলিতপতিতং জ্ঞানপুণ্যম্ অজস্রং  
প্রক্ষাল্যাসৌ জলনিধিবর: পূজ্যপাদং স্বধাত্ত:  
কিং স্বিদ্রং স্ব: স্বমডিপরিভ: গম্ববাহে চ শূত্রে  
নির্গাল্যাস্মিন্ চরণরজসি বস্তু: ভক্তিং সহস্র:  
ভো ধন্তো মে প্রতন্তুতনিমা ভারতাষে! স্বধাথ্যে!  
বন্দেহং স্বং চরণকমলং জন্মপুণ্যেন লব্ধা।

লব্ধাতীত্রং স্বকরলবশং বিস্মিতা স্কোনি নীতা  
সন্তানান্তেহমরতমুধরা: সাবলিখ্যাস্ত দীপ্রা:  
ভক্তান্তেতে প্রতিবলযুতা: রামকৃষ্ণচ ভীষ্মা:  
ধম্ম: সোহমৌ কৃতজয় তম: শাক্যপুত্রশ্চ গৌর:  
ভো, ধন্তো মে প্রতন্তুতনিমা, ভারতাষে! স্বধাথ্যে!  
বন্দেহং স্বং চরণকমলং জন্মপুণ্যেন লব্ধা।

লিপ্তং ভালে বিজয়তিলকং গর্বলিপ্তৈর্কর্যলেন্তে  
শীর্ষে ক্লিপ্তং কনকমুকুটং শ্রীশিবাজী-স্ভাষ্যৈ:  
রক্তাক্তশ্রাচ্চিত্ত যুতপদা, নব্যপার্শ্বে প্রতাপে  
কিং মে যুগ্মং ব্যুতরস্বর: পুণ্যতীর্থশ্চ স্বর্গ:  
ভো, ধন্তো মে প্রতন্তুতনিমা ভারতাষে, স্বধাথ্যে!  
বন্দেহং স্বং চরণকমলং জন্মপুণ্যেন লব্ধা ॥ \*

\* ইতি ভারতজননী কবিতায়া: সংস্কৃতানুবাদ:।

# ‘মহারানী ভিক্টোরিয়া’

অমূল্যরতন সেন

“তঁার পরলোকগত আত্মা প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পরম পিতার আশ্রয়ে তিনি পরম শান্তি লাভ করুন। ভগবান যিশু তঁার মঙ্গল বিধান করুন।”

মহারানী ভিক্টোরিয়া বহুকাল আগেই গত হয়েছেন, তবু এই প্রার্থনাটি আজও আমাকে করতে হয়; বিশেষ করে সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার পর। দিনের রথচক্র পাক খাবার আগেই স্মৃতিতে আমি এই চিম্টি কেটে নিই; বলতে পাব, ভূষো আশ্বিনের ডিব্বাতে একটু উদ্ভানি দিই। দিনের বার ঘণ্টার আবর্তনের কথা ভেবে এই নিয়ম আমাকে পালন করতে হয়; পালন করতে হয় মহারানী যে প্যারাডাইস প্রাপ্ত হয়েছেন তা অবগত রাখার জন্ত।

প্যারাডাইসের নন্দন কাননে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরমাত্মা—যা একদা সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল গীর্জার সমুখের দীঘিতে বাগ্‌সাইজ হয়েছিল—যেখানে অসংখ্য পাপীরা এখন মংস্ত শিকারের ‘পাশ’ পায় তারই উদ্ভাকাশে তিনি ভগবান যীশুর অসীম করুণায ভেফোডিল পুষ্পে মত ফুটে আছেন! মর্ত্যের নন্দন কাননে—আমার রন্ধন-শালায়ও একটি ফুল ফুটে আছে আমার পত্নীকে আশ্রয় করে—আমার ঠিকে রাঁধুনী জবা।

এই জবাকে ভুলে থাকার জন্তই ভেফোডিল পুষ্পকে স্মরণ করা, মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গরাজ্যে ধর্মা দেওয়া, হিন্দুধর্ম থেকে ক্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়া।

ভগবান যীশু আমাকে রক্ষা করুন। আমি শান্তি চাই না, স্বর্থ-সমৃদ্ধিও চাই না; একটু নিরাপত্তা চাই।

জবার মুখোমুখি হ’লে গত্যই আমি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করি। আমি জানি, এই মুহূর্তে সে আমাকে যে কোন প্রশ্ন করতে পারে। প্রশ্ন করতে পারে, বিছানায় বসে বসে বিরূ বিরূ করা উন্মাদের লক্ষণ কিনা, কিংবা প্রাক্ পূজার বাজারে যে মিন্‌সে তার উর্ধ্বশী কন্ডাকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছে সে মিন্‌সেকে আদৌ তার বাপে জন্ম দিয়েছিল কিনা। বিধাতার রাজ্যে জায়বিচার বলে কিছু আছে না নেই, অথবা তার পরমায়ুর শেষ কোথায়? যীশুর কৃপায় তার

মনটা ভাল থাকলে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে, যুদ্ধটা কেন আর ফুটবল খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে হয় না, কিংবা আমার জীবীর বালা ছ’টো গড়াতে কত খরচা পড়ল?

সব প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হয়, এবং ভেবেচিন্তে ওর মনের মত করে উত্তর দিতে হয়। কারণ আমি জানি, এসব প্রশ্ন সে আমার পত্নীকেও করেছে, এবং উত্তরের উত্তরের তারতম্যে যে কোন ব্যাপার ঘটে যেতে পারে। ভালকে সে লবণসমুদ্র বানাতে পারে, কিংবা লাবণ্য স্তম্ভকে মগল্লা দ্বীপ। বকফুল ভাঙ্গায় এমন ব্যসন দিতে পারে যেন সেটা খুনের আশামী।

জীবনের সর্বস্বত্রে—অসংখ্য নিয়মের সঙ্গে অগণিত নিয়মভঙ্গের মধ্যে ভগবান যীশুর করুণা যে সর্বদাই নিভুল কারুণ্যে পরিব্যাপ্ত নয় তার অকাট্য প্রমাণ এত সতর্কতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে জবার কথা আমাকে শুনতে হয়। সময়টা হয়ত মাসের শেষ—চল চল পাঞ্জাবীর সমুদ্রপকেটে যখন ডুবুরী হাত মুদ্রায়নিকে খুঁজতে যেয়ে বিপুল অধ্য-বসায় উঠে আসে, তখন সেই হৃগতীর ভলদেশ থেকে রেডপো শব্দর মাছ ভিন্ন আর কীই বা সে ভুলে আনতে পারে? কিন্তু তা হলেই জবার বিফোরণ প্রায় সূর্যাস্তের মত অনিবার্য হয়ে ওঠে, “ছ্যাঃ-ছ্যাঃ-ছ্যাঃ, একি আনলে গো, দাদাবাবু!”

—“কেন রে? শব্দর মাছ—রাঁধতে পারলে মাংসকেও হার মানায়।”

—“তা হবে! রাঁধিনি তো কোনদিন ও মাছ।”

হলফ করে বলতে পারি অল্প কেউ হ’লে সেখানেই কাত! কিন্তু আমি জানি, কোথায় আমি ভুল করেছি। ওর রন্ধনবিজ্ঞার প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করেও যে কথাটা আমি বলেছি সেটা আদৌ ভগবান যীশুর করুণাশ্রিত ভক্তের ভাষা নয়। সম্ভেদ থেকেই সংঘর্ষ, সংঘর্ষ থেকে সর্বনাশ।

সংঘর্ষ থেকে যে কী সর্বনাশ হতে পারে সে গল্পটা অবশ্য জবা ওর কচি মা’র কাছেই করে। মাইক্রোফোন থেকে লাউডস্পীকার—এসব তথ্য সার্বজনীন পুজোয়



জবার জানা হয়ে গেছে। তারপর ও গল্পটা শেষ হবার আগেই এ গল্পটা শুরু হয়ে যায়, “বুঝলে কচি মা, বক্তিমের করতে যেয়ে সেকি নাকাল, সেকি নাকাল! শেষকালে সেই ভদ্রনোক এসে আমাদের দেখিয়ে দিলে, ‘রাঙা! এদিক থেকে নয়, ওদিক থেকে।’ তাই ত’ জানলুম।”

—“তা’ ভদ্রলোকটি তোমার প্রতি সদয় ছিলেন বলতে হবে?”—কবুতরকণী গুম গুম করে প্রশ্ন করে জবাবে।

তা বৈকি! সদয় মানুষই ত’ সদাশয়। জবা অবশ্য অত খুলে বলতে চায় না। বলে, “যা তা’ ভদ্রলোক নাকি গো—একেবারে বেলাত ফেরত! এংরেজী কথার ঠৈ ফুটত মুখে, বাংলা তো বলতেন শুধু আমার সাথে কথা কইবার সময়। বেবাক নোক হাঁ করে শুনত। আমাদের একখানা শাড়ীও দেহলেন সেবার পুজোয়।”

—“বল কি।”

—“তবে আর বলি কি কচিমা। সেই দেখেই তো মিন্‌সেদের হাড়মাস গুড়ে তাম্ব হয়ে গেল। মুখপোড়ার তল্লাটে ভদ্রনোকের নামে কেচ্ছা রটালে। মরে যাই ঘরপোড়াদের কাণ্ড দেখে। শেষকালে ভদ্রনোক নাথি মেরে তামাকুব আড্ডা ভাঙলেন; আমাকে বললেন, ‘রাঙা! এবার কালিপুজো করব। তিনটে নরবলি দেব যদি কায়েতের বাচ্চা হই।’—তা’ দিলেনও।

—“খ্যা।”

—“হ্যা—ওমা! তোমার বুজি বিশেষ হচ্ছে না? হবে কী করে, তুমি ত’ তখন জন্মাওইনি। এখনও তো তুমি সব কৌড়া বাঁশ হয়ে উঠতে তোমার অনেক দেবী! সেকাল আর একাল! সেকালে কি না হ’ত। এই শঙ্কর মাছ পয়সায় তিন তিনটে করে বাড়ী বয়ে দিয়ে যেত জেলেরা। কত রকম করেই না রাখতুম। হেঁসেল আমার হাতেই ছিল কি না।”

আড়ি পেতে এই নিতৃত বাক্যলাপ আমি শুনেছি। ভগবান যীশু আমার এই চৌর্য্যবৃত্তিকে ক্ষমা করুন। আমি সর্কাস্ত্রকরণে তাঁরই চরণাশ্রিত।

কিন্তু জবাকে বুঝাবার জন্য এই চৌর্য্যবৃত্তি যে কতই

অনাবশ্যক তা’ ক্রমে বুঝেছি। বুঝেছি, জবা যখন অপরিমিত জল মিশ্রিত দুধ ঘটি ভরে নিয়ে ও অবশেষে তা’ গয়লার মস্তকে ঢেলে দিয়েছে নির্বিন্যাসে, ঘুটেউলিকে ‘লচ্চার জেনানা’ কিংবা ‘লটী মাগী’ বলে কাঁকাত্তর ঘুটে উপুড় করে ফেলে দিয়েছে গুণতিতে গলাদ পেয়ে।

তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই জবার সঙ্গে একদিন তার কচিমা’র বিবাহ বেধে গেল। ‘হেতুটা জানবার আগেই রান্নাঘরে সে কি হলুদুল কাণ্ড! ভগবান যীশুকেই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ’ল, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধটা কেন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হয় নি!

শ্রীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেল জবা। তুই-তুকারি, শাপ-শাপাত্তের অতলাস্ত সমস্তায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি এগিয়ে গেলুম। জানি না, সেই মুহূর্তে জবা আমার মুখে কী দেখল; কিন্তু আমাকে দেখেই সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। কথা বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না; বললুম, “তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। এবেলা খেয়ে যাও, পয়লা তারিখে সন্ধ্যায় এসে টাকা নিয়ে যেও কিন্তু।”

জবা আর টাকা নিতে আসে নি। এক মাস, দু’মাস করে ছ’ মাস কেটে গেল, জবার টাকাটা তখনও আলাদা করে রাখা ছিল। এমন সময় একদিন একটা যণ্ডামার্কী লোক এসে হাজির, “জবার টাকাটা দিন তো।”

মেক্কা আরও বিগড়ে গেল আমার। জবা নিজে না এসে এই বদমৎ লোকটাকে পাঠিয়েছে।

বললুম, “জবার টাকা তোমাকে দেব কেন, জবার তুমি কে?”

লোকটা হেসে একটা চিরকুট বের করল। জবা চিঠি। হাতের লেখা নিজের নয়, কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। নীচেয় টিপসই!

জবা জানিয়েছে, “দাদাবাবু, কচিমা’কে আমার নমস্কার বলবেন, আপনি আমার নমস্কার জানবেন। এই মিন্‌সে আমার মেয়ের বর—আমার টাকাটা একে দিতে আজ্ঞা হয়। আর, আমাকে কবে ডাকা হবে?”

ঠিক এর নীচেই টিপসই। কিন্তু এটা নিতান্তই অনাবশ্যক!

# স্বামী সর্বানন্দজী

শ্রীহিন্দুভূষণ রায়

প্রবর্তক সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য স্বামী সর্বানন্দজী গত ২৬শে জুন, ১১ই আষাঢ়, সোমবার অপরাহ্ন ২-১০ মিনিটে চন্দ্রনগর সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরের পার্শ্বস্থিত কক্ষে ইষ্ট-চিন্তায় সমাহিত হইয়া ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ১৫ দিন পূর্বে হঠাৎ জবে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। চিকিৎসায় সামান্য উন্নতি দেখা দিলেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন তিনেক পূর্বে হইতেই জ্বরের প্রকোপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্ঘের সভ্য-সভ্যা ও ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীর শবদেহ লইয়া “মচ্চিদেকং ব্রহ্ম” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সঙ্ঘমন্দিরের ও তৎপরে আশ্রমে মাতৃ-মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হন ও পরে বোড়াইচণ্ডীতলা শ্মশানে অগ্নি-সংস্কারে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

১৭ই আষাঢ় প্রাতঃ ৬।০ টায় প্রবর্তক আশ্রমে মাতৃ-মন্দিরে স্বামী সর্বানন্দজীর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে যথাযথীতি শ্রদ্ধাবাসর অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমলিনচন্দ্র দত্ত পৌরোহিত্য করেন। আশ্রমকল্যাণের সময়োপযোগী সঙ্গীতের পর সমবেত সঙ্ঘোপাসনা হয়। ইহার পর সঙ্ঘবাণী ও কার্তোপনিষৎ পাঠ হয়। সঙ্ঘের স্বামী বোধানন্দজী, অরুণচন্দ্র দত্ত ও হিন্দুভূষণ রায় ও সভাপতি পরলোকগত স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, গুরুনিষ্ঠা, সেবার্থ, সঙ্ঘের প্রতি দরদ ও নির্ভীক জীবনের কথা আলোচনা করেন।

স্বামী সর্বানন্দ পূর্বাশ্রমে হাওড়া জিলায় ডোমজুড় থানার খাঁটোরা গ্রামে এক বিশিষ্ট অভিজাত পবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বনাম ছিল জ্ঞানতরু হালদার। তরুণ বয়সেই হুঃসাহসিকতার অনুপ্রেরণা তাঁকে ঘরের বাহির করিয়াছিল। তিনি প্রথম বিখ্যুদে (১৯১৪-১৮) সেবাব্রতীরূপে যোগদান করিয়া বিশেষ দক্ষতা ও নির্ভীকতার সহিত আপনার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক সেবার্থ ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাইয়া যুদ্ধান্তে তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সরকারী চাকুরী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তি

চাকুরী গ্রহণে স্বীকৃত হইতে পারে নাই; কিছুকাল পর তিনি কৃষি-শিক্ষায় আপনাকে নিয়োজিত করেন। শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ করিয়া কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনভাবে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বৎসর পর তিনি কুমিল্লাতে (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) ‘অভয় আশ্রম’ নামক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া সেবার্থে ব্রতী হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ‘লবণ সত্যাগ্রহ’ আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে ডাঙী যাত্রা করেন। এই সময়ে অভয় আশ্রম মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনে যোগদান করেন ও বাংলা দেশে লবণ সত্যাগ্রহে অতিবাহন করেন। জ্ঞানতরু মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম সৈনিকরূপে এই আন্দোলনে যোগদান করায় পুলিশের কঠোর ও অমানুষিক নির্যাতনে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আন্দোলনের ফলে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে অভয় আশ্রম ব্রিটিশ সরকারের রাজরোষে বে-আইনী বলিয়া বিধোষিত ও ছন্নছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হইতেই জ্ঞানতরুর অন্তর-তন্ত্রীতে একটা নূতন সুর বজ্রত হইতে থাকে। প্রাণে জাগে নূতন জিজ্ঞাসা। তাঁর জীবনের গতিপথেরও মোড় পরিবর্তন হইল। গভীর সন্তার এই নূতন প্রেরণার দিক্-নির্দেশেই তিনি ছুটিয়া আসেন ১৯৩৪ খৃঃ-এ প্রবর্তক সঙ্ঘ। পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকেই গুরুরূপে অন্তবে অন্তরে বরণ করিয়া লন। তাঁহারই নির্দেশে তিনি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সঙ্ঘের কার্যে আপনাকে নিয়োগ করেন ও অধ্যাত্মজীবন গঠনোপযোগী সঙ্ঘের নিয়ম ও আচার পালনে ব্রতী হন। রোগীর সেবা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ব্রত। তিনি সঙ্ঘ দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। রোগীর বাটীতে ঘাইয়াও ঔষধ ও পথ্যদান করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন। চিকিৎসা-যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করায় রোগীর সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কয়েক বৎসর এইভাবে চলার পর সঙ্ঘগুরুর নিকট তিনি একদিন অধ্যাত্মদীক্ষার প্রার্থনা

জ্ঞাপন করেন। সঙ্ঘগুরু তাঁহার আন্তরিক আকৃতির মর্মোপলব্ধি করিয়া পরিশেষে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের (১৩৪৮ বাং) শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তাঁহাকে স্বয়ং আনুষ্ঠানিক সম্মান-মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষান্তে তাঁহার নূতন গুরুনামকরণ হয়—স্বামী সর্বানন্দ।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সঙ্ঘগুরুর নির্দেশে তিনি সঙ্ঘেরই আশ্রম ও কৃষিক্ষেত্রে সমুদ্র উপ-কূলোবর্তী ২৪ পঃ জিলার ফ্রেজারগঞ্জে (সুন্দরবন) গিয়া তথাকার কাজকর্মের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কুখ্যাত নোয়াখালী দাঙ্গার ফলে সেখানকার লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্বস্বহারা ও বিপন্ন হইয়া পড়ে। প্রবর্তক সঙ্ঘ এই নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হিন্দুগণের সাহায্যার্থে ‘প্রবর্তক সেবা-সঙ্ঘ’ নামক প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দীর্ঘদিন নোয়াখালীতে সেবাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই সময়ে স্বামী সর্বানন্দজীও সুন্দরবন হইতে ছুটিয়া আসেন নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে। তিনি দীর্ঘদিন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাদান করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পুনরায় ফ্রেজারগঞ্জে কিরিয়া যান। কয়েক বৎসর পর তাঁহাকে কৃষিকার্যেরও ভাৱ বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ উৎসাহ ও দরদের সহিত এই ক্ষেত্রে তিনি সেবা দিতে শুরু করেন। সঙ্ঘের বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াই তাঁহাকে এই ক্ষেত্রে শক্ত শিকড় গাড়িতে হইয়াছিল ও তাঁহারই দৃঢ় সঙ্কল্পে এই ক্ষেত্রটি নিঃশঙ্ক হইয়া পরিচ্ছন্ন রূপ লয়। কৃষি-বিভাগের কাজ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই ক্ষুদ্র পল্লীতেও দাতব্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন ও রোগী-সেবাকার্যে ব্রতী হন। কয়েক বৎসর একক কঠোর পরিশ্রমের দরুণ স্বামীজী ভয়-স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। অপরূপ দেহ লইয়াও তিনি তাঁহার কর্তব্যকর্ম সনিষ্ঠায় করিয়া চলেন। এই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করার প্রস্তাব আসিলে তিনি উত্তর দিতেন—‘শ্রীগুরুদেবের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি, আমার ইচ্ছা আমার এই ক্ষেত্রে অবস্থান করে সঙ্ঘের সেবা দিই।’



স্বামী সর্বানন্দ (মহাসম্মাধির কিছুদিন পূর্বে গৃহীত আলোকচিত্র)

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে সঙ্ঘগুরু দেহাবসান তাঁহার হৃদয় ও মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার পর শ্রীগুরুকে গভীরভাবে স্বামীজী অন্তরে উপলব্ধি করিতে থাকেন। শ্রীগুরুও আরও স্পষ্ট ও জীবন্তভাবে তাঁর অন্তরে ধরা দেন। কোন জটিল ও সমস্যাপূর্ণ অবস্থার সমাধান তিনি পাইতেন গুরুশক্তির অন্তর নির্দেশে—এ কথা তিনি বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের চিতাভস্ম লইয়া তিনিই প্রথম সাগরসঙ্গমে বিসর্জন করিয়া হৃদয়ে অপাধিব তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রেজারগঞ্জের আশ্রমে আকস্মিকভাবে একটি তরুণের অপমৃত্যু হয় তাঁরই শয়নকক্ষের পার্শ্বগৃহে। এই অপঘাত মৃত্যুতে পল্লীর নিরক্ষর লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং সম্ভ্রাম আশ্রমে আসিতেও ইতস্ততঃ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্তি-ক্রিয়ার কথা বলা হইলে

স্বামীজী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। স্বামীজী স্বয়ং সমস্ত দিন একাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুদত্ত ব্রহ্মনাম অবিরাম জপ করিয়া কক্ষের বিশুদ্ধতা ও শুচিতা আনয়ন করেন— বাহ্যিক লোকাচারকে তিনি আমলে আনেন নাই। সর্ব বিষয়ে স্বামীজী নির্ভীক ও সঙ্কল্পপরায়ণ ছিলেন। বাহিরের আচার আচরণ কখনও কখনও কক্ষ মনে হইলেও, তিনি ছিলেন আত্মতোলা, সরল ও অমায়িক। স্বামীজী অত্যন্ত স্বল্পবাকু ছিলেন এবং সেবা ও স্বাদেশিকতার সর্বদা উদ্বুদ্ধ থাকিতেন।

স্বামীজীর দেহ ক্রমশঃ অশক্ত ও অপটু হইয়া পড়ায় সম্ভ্রাতাগণ তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দিবার উদ্দেশ্যে ফ্রেজারগঞ্জ হইতে গত ১৮ই মার্চ চন্দননগর কেন্দ্র-তীর্থে লইয়া আসেন। সন্ধ্যের শ্রীমন্দির

ও আশ্রমে পৌঁছিলে শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি তাঁর হৃদয়-মনকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর তাঁর দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত অল্পাধিক তিনমাস কাল শ্রীগুরুধামে ইষ্ট-সমাহিত হইয়া বাস করেন। স্বামীজীর সহগুণ ছিল অসীম। রোগশয্যায় তিনি আত্মসমাহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। কোনরূপ রোগষজ্ঞার চিরু মাত্র কখনও তাঁহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠে নাই। স্বামীজী ছিলেন আজীবন বোদ্ধা, নির্ভীক সৈনিক। জীবনে অলস সময়ক্ষেপণ বা বিশ্রাম করার মানস তাঁহার ছিল না। স্বামীজীর নির্বিচার গুরুভক্তি ও মাহুনিষ্ঠাই তাঁহার আত্মাকে ইষ্টসামীপ্যে অমৃতায়মান করিয়া তুলিবে। (২৮শে আশ্বিন, ১৩৬৮ বাং, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৬১ ইং)।

ও শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!



## আদর্শ শিক্ষক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ত্রীকালীপদ সমাদ্দার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোভাবে বাংলার বিদ্যামন্দির যে কি হারাইয়াছে তাহা ১৭ বছর পরে বাদ্বালী জাতি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। আচার্য্যদেবের দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার দোভাগ্য আমার হইয়াছিল। আচার্য্য-দেব ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেমবন্ধন, গৌরবের ইন্ধন। প্রাচীন গুরু ছাত্রদিগকে আহার বাসস্থান দিয়া মানবত্ব উদ্বোধনের জ্ঞান দান করিতেন, তাই তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সেই ধরণের গুরু। তিনি কত নিঃস্ব ছাত্রকে সাহায্য করিতেন, কতরূপে যে জীবিকার পূরণ করিতেন তাহার প্রচার তিনি করেন নাই। এই নীরব দানের আনন্দটুকুই ছিল তাঁহার জীবনে প্রতিদান বা দক্ষিণা। তাঁহার শিক্ষকতায় সরকারী দক্ষিণা মাত্র অল্প পরিমাণ জীবিকায় ব্যয়িত হইত, আর অধিকাংশ দেশের ও দশের কল্যাণে ব্যয়িত হইত। সরল ও সাদাসিদে জীবনে উচ্চ চিন্তাশীলতা ছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। রুগ

দেহেও ছিলেন চির হাসিমুখ। কোনরূপ বিলাসিতাও চির তাঁহার বাহ্যিক বেশভূষায় বা চালচলনে কখনও দেখি নাই। তাঁহার সারা জীবনে ভোগবিলাস বা দাড়ির বৈচিত্র্য কোন নরহৃন্দর সাধিত করার স্বেচছা পায় নাই। নিজের পরিধেয় নিজে পরিষ্কার করা ছিল তাঁহার ব্রত। আধুনিক ছাত্রজীবনে এই স্বাবলম্বনের প্রেরণা নাই বলিলেই চলে। প্রফুল্লচন্দ্রের নাগরিক জীবনের অবসরকাল পল্লীতে কাটিত বলিয়া শহরের কৃত্রিম কদর্যতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি পরিণত বয়সে বাংলার পল্লীর নদীতে সময় সময় নৌকারোহণে যে মনের সজীবতা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেন, ইহাতে তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হইত ও কৰ্মে নূতন উদ্যম পাইতেন। জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাছে প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যাইত। নিজ হস্তে সাধারণ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধিবৃত্তি ছিল তাঁহার জীবনের একটা আনন্দদায়ক কৰ্ম। ছাত্রদিগকে না খাওয়াইয়া অগ্রে অন্ন গ্রহণ করা তাঁহার কাছে

অগ্রিয় ছিল। তিনি রোগাক্রান্ত ছাত্রদিগকে তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা করিতেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল পল্লীবাসীর পরিবারে মিলিয়া মিশিয়া উহাদের সংসারের দুঃখদৈন্তের অভিজ্ঞতা লাভ এবং উহার প্রতিকার চিন্তা করা।

আচার্য্যদেবের আর একটা প্রধান অভ্যাস ছিল প্রগাঢ় অধ্যয়ন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ দুই ঘণ্টা প্রতিদিন অধ্যয়নে আনন্দ উপভোগ ছিল তাঁহার অভ্যাসযোগ। তাঁহার পাঠ্যবিষয় সাধারণত ছিল নানা জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস, আর পড়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিকের। অল্পসঙ্কীর্ণ ছিল তাহার মানসজীবন বা ছাত্রজীবন পর্য্যবেক্ষণের লক্ষ্য। এইরূপ গুরু জীবনই ছাত্র-জীবন সার্থক করে। তাঁহার হাতে-তৈয়ারী ছাত্রদের পরবর্তী জীবনের মনীষা ও চরিত্রই ইহার সাক্ষ্য বহন করে। ছাত্রদের গৌরবই ছিল আচার্য্যদেবের গৌরব।

আচার্য্য-সাহচর্য্য যে পরোক্ষে যুবক সম্প্রদায়কে এক আনন্দদায়ক কর্ম প্রেরণা দিত তাহারই পরিচয় পাই দেশের বন্ধাপীড়িত মানবকে তাহাদের অকাতর সেবায়। তাঁহার দেশাত্মবোধ এত নির্মল ছিল, এত শক্তিশালী ছিল যে উহা কর্তব্য সাধনায় উদ্দীপিত করিত অপরাপর সহকর্মীর জীবনে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ছিল দেশাত্মবোধের প্রতীক কারখানা। সমবায়মূলক একটি বিশেষ আদর্শ লইয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। উহাতে যে ব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা সম্যক প্রতিপালিত হইলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালী নূতন দিগদর্শন পাইতে পারিত। ঐ আদর্শে তিনি বহু প্রতিষ্ঠান, বাংলায় গড়িয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ নানা স্থানে সেবাসংঘ গড়িবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তিনিও বাঙালীর জীবনযাপনের আর্থিক সংস্থানের বাস্তব আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। নিজে আচারি ধর্ম-কর্ম তিনি শিক্ষা দিয়াছেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল সহজে অবিগম্য ও হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটা কলেজে যদি এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, আজিও ছাত্রজীবন ধন্য ও চরিতার্থ হইতে পারে। বাঙালীর অর্থ-

নীতি এখন দুষ্ট হইয়াছে, অভাবের বাহুল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল অভাবের দূরীকরণে যে অভ্যাসযোগ প্রয়োজন, যে চেতনা আজ অবচেতনায় রহিয়াছে তাহার উদ্ধীপন, একমাত্র শিক্ষাবিধানের পরিবর্তনেই সম্ভব। শিক্ষকজীবন আধুনিক শিক্ষণের প্রভাবে জাতীয় কৃষ্টি ও জীবনপদ্ধতির মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে, স্বভাবজ বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্যয় ঘটাইয়াছে এবং ছাত্রজীবন সরল অপেক্ষা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। আদর্শহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষক এখন ছাত্রজীবন দুঃখজনক করিয়া তুলিতেছে। আত্মহত্যা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপ কার্য্যরত ছাত্রজীবন বিকৃতবুদ্ধিজাত মনের পরিচয় মাত্র। আচার্য্যের অধ্যাপনা পদ্ধতি ছিল সকল বিপত্তিনাশক ও জীবনে আনন্দপ্রসারক। আচার্য্যের কৌমার্য্য, মানবপ্রীতি, অধ্যবসায়, নিয়মাত্মবর্ত্তিতা, জীবনের আনন্দবর্দ্ধক গুণাবলী, যেমন ব্যক্তি জীবনে অমূল্যবর্ণীয়, তেমনি সমাজ জীবনেও। তাঁহার সাহচর্য্যে উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাঁহার অন্তরনিহিত শক্তি ও সংগঠন বুদ্ধির মৌলিকতা।

জাতির অর্থাগমের পন্থা যদি সততা ও আতিথেয়তার উপর নির্ভর না করে, তবে সে জাতি কখনই স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। এতকাল নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্তনের মধ্যেও যে বাঙালীজাতি ধ্বংস হইয়া যায় নাই তাহাব একমাত্র কারণ ঐ দুইটি গুণ। আচার্য্যের জীবন ঐ দুইটি গুণের প্রতীক ছিল। জাতির প্রতি তাঁহার যে কত গভীর দরদ ছিল তাহারই পরিচয় মিলে তাঁহার দুইখানি অমূল্য পুস্তকে—“বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার” এবং “অল্প সমস্তায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার”। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য দর্শন ঘটিয়াছিল তাহারই বাণী ঐ দুইখানি পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী যদি সময়ে ঐ বাণী গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ এ জাতি এত দুঃখ ও দৈন্তের সম্মুখীন হইত না।

শিক্ষাগুরু হইতে হইলে স্বার্থত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রেম ও অধ্যবসায় এই চারিটি গুণে গুণী হওয়া প্রয়োজন। আদর্শ গুরুর শাসনে যে শিশু লালিত পালিত হয় সেই শিশুই উত্তরকালে নানা প্রলোভনের মধ্য হইতে আদর্শ-নাগরিক

হইয়া উঠে। আজ বাংলার বড়ই দুর্দিন যে ঐরূপ আদর্শ গুরু একান্ত অভাব।

গীতায় আছে ‘মা ফলেষু কদাচন’। প্রফুল্লচন্দ্র দেশের জন্ত কাষ করিতেন কেবল আনন্দ পাইতেন বলিয়া; কোন ব্যক্তিগত পুরস্কারের আশায় নহে বা উহার প্রতিদান আকাঙ্ক্ষায় নহে। বাহা কিছু তিনি অর্জন করিতেন তাহার প্রায় সবখানিই তিনি ছাত্রজীবন গঠনে ও পরার্থে নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্যদেব বলিতেন, ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের প্রতি গৃহে একটা করিয়া পাঠাগার (study) থাকে। ইহা নিম্নতে আপন মনে ছাত্রের জীবনসাধনার ঠাকুর ঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সবল সুস্থ ও কর্মঠ জীবন গড়িয়া তোলাই আচার্য্যদেবের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। মুমূর্ষু, ক্ষীণদৃষ্টি, দুর্বল শিক্ষিত ছাত্র-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া শ্রাড্ডালার কমিশন মন্তব্য করিয়াছিল “বাঙ্গালীর ছেলেরা হাদে না, হাসিতে পারে না”। আচার্য্যদেব ইহারই প্রতিকারকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের জীবনই ছিল একটা অধ্যয়নরত সংযত তপস্কার প্রতিকৃতি। বৈদিক যুগের কামনা—“জীবম শরদঃ শতম্ পশ্চম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্”—আচার্য্যদেব বাস্তবে রূপায়ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের কথা সমর্থন করিয়া আচার্য্যদেব কক্ষে দেখাইয়াছেন “The Gita is better taught on the play ground”—শক্তি সঞ্চয়নের ক্ষেত্রেই গীতা তত্ত্ব বিশেষ ক্ষুরণ হয়, পুস্তকের অধ্যয়নে নহে। আচার্য্যের জীবন-বেদই ছিল গীতার মূর্ত্ত বাণী। তিনি সমাজের মঙ্গলার্থে যে কায়মন ও বাক্যে ত্যাগ স্বীকার করিতেন তহা নিজ আচরণই ব্যক্ত করিতেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে তিনি রাম্জে ম্যাকডোনাল্ড (ইংলণ্ডের মন্ত্রী ১৯১০) বাঙ্গালী সম্বন্ধে যে মন্তব্য (“Excellent raw materials in the young men of Bengal all over the country”) করিয়াছেন তিনি তাহা কার্য্য-করী করিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলার ছেলেবা অসাধ্য সাধন করতে পারে এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

তিনি বাঙ্গালী যুবকের দেশী পুষ্টিকর খাদ্য মুড়ি, খই,

চিড়া প্রভৃতিকে প্রধান খাদ্য বলিয়াছেন। সে কথা কি সেদিনে বাংলার সমাজ সম্যক গ্রহণ করিয়াছিল না এখনো করে? চানচুর এখন প্রতিটি Tea table-এর পরিবেশনে স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু দালদা মর্দিত লুচী, পরাটা ও ব্যঞ্জনাদি এখন বাংলার উৎসবে আনন্দে একমাত্র লঙ্কা রক্ষার জন্ত অতিথি পোষণে প্রচলন হইয়াছে। মুড়ি প্রভৃতি ঐরূপ দেশী উপাদেয় খাদ্য ২০ টাকা পাউণ্ডের বিস্কুট অপেক্ষা শ্রেয়: ও মিতব্যয়ের পরিচয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেশীয় পল্লীর খাদ্য বিদেশীয় বা দোকানের খাদ্য-দ্রব্য অপেক্ষা যে শ্রেয়: তাহা তিনি প্রমাণ করেছেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আমি সমস্ত দুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এদেশের মতন এমন শিমোদরশরায়ণ তামসিক জাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমি তাই এদের ভেতর রজঃশূণ্য বাড়িয়ে কর্মতৎপরতার দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে চাই।” স্বামীজীর বাণীর সার্থকতা পাই আচার্য্যের জীবনবেদে ও কর্মধারায়। তিনি ছিলেন ধর্ম বিষয়ে প্রায় নীরব, কিন্তু মুখর ছিলেন কর্ম সম্বন্ধে। কর্মের বিধানের মধ্যে হইতেই প্রকৃত মানবধর্ম মানুষ উপলব্ধি করে—এই আবিষ্কারটা প্রফুল্লচন্দ্রের সর্বোপেক্ষা অপূর্ব লোকহিতকর শিক্ষাপদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি।

বিবেকানন্দের মত আচার্য্যদেব মনে করিতেন “If we are to live at all we must be a scientific nation.” এই সিদ্ধান্ত আচার্য্যদেব কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালীর দুর্দশার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই বীর কর্মীর জীবনব্রত গ্রহণ করতে হইবে। বাঙালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এই শুভ লগ্ন উপস্থিত। হে বাঙালী, জাগ্রত হও, বর প্রার্থনা কর! এ যুগের আদর্শ গুরু, গীতানির্দেশিত আদর্শ পুরুষ, আচার্য্য প্রফুল্লের জীবনবের হইতে তাঁর বাণী, স্বামীজীর বাণী আজ একমাত্র বাঙালীর দুঃখ দূরের অব্যর্থ পন্থার নির্দেশ দেয়। জাতি যে এমন আদর্শ গুরুর শত-বার্ষিকীতে স্মরণ লইয়াছে ইহা বাংলার এক শুভ দিনের আগমনী সূচনা করে। জয় হিন্দ!.

# কর্মবীর সতীন সেন

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

( ২ )

১৯১৯ সনে সতীন সেন মুক্ত হয়ে আবার পূর্ণ ভেঙ্গে  
ঝাঁপিয়ে পড়লেন ১৯২০ সনের অসহযোগ আন্দোলনে।  
আড়াই বৎসর সশ্রম দণ্ড গ্রহণ করে প্রবেশ করলেন  
বরিশাল জেলে। জেল স্থপাব মিঃ মুনবোর সহিত সুর  
হোলো বিষম সংঘর্ষ। অস্বীকার করলেন ‘সরকার সেলাম’  
আদি আত্মসম্মান হানিকর আচরণ পালনে। সহকর্মীদের  
থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবদ্ধ রাখা হোল ক্ষুদ্র কুটুরীতে।

কারা নির্ধাতনের প্রাবন এসে গেল। বেড়ী, ডাঙা-  
বেড়ী, দাঁড়ান অবস্থায় ডাঙাবেড়ী। দিবারাত্র হাতকড়া  
থেকে সুর করে বেজাঘাত পর্যন্ত যাবতীয় দণ্ড চলল রাজ-  
নৈতিক বন্দীদের প্রতি।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ছায় গর্জে উঠলেন সতীন সেন।  
এ অত্যাচারের নিকট মাথা নত করা চলবে না।  
উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ জানালেন ৬১ দিবস অনশনে থেকে।  
মুখগর্ষরে ও নাসিকার অভ্যন্তরে রবারের নল নির্ভুর  
উপায়ে প্রবেশ করে তরল খাচ্চ প্রেরণ করবার চেষ্টা  
হোল। সর্ব চেষ্টা যখন ব্যর্থ, তখন মিঃ মুনরোকে  
স্থানান্তরিত করে অবস্থা শান্ত করা সম্ভবপর হোল। সতীন  
সেনের দাবী স্বীকৃতি পেল।

১৯২৩ সনে এলেন বহরমপুর জেলে বিশেষ শ্রেণীর  
বন্দীরূপে। খাট, মশারী, চেয়ার, টেবিল, উৎকৃষ্ট খাচ্চ-  
দ্রব্যাদি ও উন্নত ব্যবহার। নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করলেন  
স্বীয় কারাজীবনের সুখ-আয়াস জীবন। শত-সহস্র সহ-  
যোগীদের ছুঃখ-তপ্ত কারাজীবনের ছুঃখ বেদনার অংশ  
গ্রহণ করলেন সানন্দে।

বরিশালে গান্ধীজীর সম্বন্ধনা সমিতির সম্পাদকরূপে  
সতীন সেনের সহিত গান্ধীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ১৯২৪  
সনে। অহিংসার নূতন অর্থ তিনি পেলেন—অত্যাচার ও  
অবিচারকে কোন অবস্থাতেই স্বীকার করা চলবে না।  
ভীকতা বা কাপুরুষতার স্থান অহিংস সত্যগ্রহীর নেই।

প্রবল আত্মবিশ্বাসী কর্মী নূতন নূতন কর্ম সৃষ্টি করে  
নিদ্রিত জাতিককে উদ্ধুদ্ধ করবার প্রয়াস পেলেন। তাঁর

অদ্ভুত সংগঠনী শক্তির অপূর্ণ ও সার্থক প্রয়োগ দেখা গেল  
বিবিধ গণ-আন্দোলন ও আইন অমান্ত কর্মের মধ্যে।  
১৯২৬ সনের উত্তম সাম্প্রদায়িক পরিবেশে প্রতি বৎসরের  
কলেজ প্রাঙ্গণে অস্থিতির সরস্বতী পূজায় বাধা এল পুলিশ  
থেকে। জেলের ভয় দেখিয়ে অত্যাচার স্বীকার করা চলবে  
না। ১০।১২ সহস্র ছাত্র-যুবক আইন অমান্ত করে পূজা  
করল সতীন সেনের নেতৃত্বে।

বরিশালের লাউকাঠি, যুবাদিয়া, আউলিয়াপুর প্রভৃতি  
কতিপয় ইউনিয়নে জনসাধারণের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা  
করে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হোল। সতীন সেনের  
অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনী শক্তিতে কর বন্ধ আন্দোলন  
করে জয়ী হলেন। ছর্যোগের মুহূর্তে মুসলমান জনতার  
অগ্রবর্তী সতীন সেনের মন্তকেই পুলিশের উন্মুক্ত বেয়নেটের  
আঘাত এসেছিল। জনতার জয়বাস্তী ঘোষণা করতে এসে  
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাণ্ডীকেও বলতে হয়েছিল—‘বল সতীন  
সেন কী জয়’।

বৃটিশ সরকারের প্রচ্ছন্ন প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতা  
বৃদ্ধির ফলে পটুখাখাণিতে সত্যগ্রহ আরম্ভ করা অনিবার্য  
হয়ে উঠলো। ১৯২৬ সনের জন্মাষ্টমীর দিন থেকে প্রায়  
দুই বৎসর প্রত্যহ আইন অমান্ত করে গ্রেপ্তার বরণ করা  
হোত। ইহারই মধ্যে কত ঘাত-প্রতিঘাত, কতবার  
গ্রেপ্তার করা হোল, শাস্তি হোল, ঘানিতে দেওয়া হোল,  
হস্তপদ শৃঙ্খলবদ্ধ করে প্রকাশ্রে হাটিয়ে নেওয়া হোল, ১০৭  
ধারা, ১১০ ধারা বিচার হোল, পুলিশী-অত্যাচারে ভীত  
সন্ত্রস্ত জনতাকে উদ্ধুদ্ধ ও সাহসী করতে দীর্ঘ অনশন করতে  
হোল, অবশেষে এল জয়ের বরমালা।

১৯২৯ সনের বরিশালের সরকারী প্রদর্শনী বর্জন  
আন্দোলনে ত্রতী ছাত্রদের প্রতি নির্ভুর লাঠিপেটা চলল  
পুলিস স্থপার মিঃ কোলসনের নেতৃত্বে। কলিকাতা থেকে  
এসে সতীন সেন দীপ্ত কর্তে ঘোষণা করলেন লাঠির ভয়ে  
মাথা নত করা চলবে না। পুলিশ থেকে বলা হোল—  
এগোতেও দেওয়া হবে না। দারুণ সংঘর্ষের মুহূর্তে যেমন

সতীন সেনকে গ্রেপ্তার করা হোল, তেমনি পুলিশ বাহিনী অপসারিত হোল। দাবী স্বীকৃত হোল।

বিপ্লবীর হস্তে বরিশালের দারোগা যতীন রায় নিহত হলেন। পুলিশ থেকে এল প্রতিহিংসার তান্ডব নৃত্য। ভীত জনতাকে আশ্বস্ত করতে এলেন সতীন সেন, ফলে ১১০ ধারায় পুনরায় হলেন গ্রেপ্তার। ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় জনতাকে উদ্দীপ্ত ও আগ্রত করবার জন্য পুনরায় দীর্ঘ অনশনে ব্রতী হলেন। স্ত্রীভাষ্যে, জে. এম. সেনগুপ্ত প্রভৃতির হস্তক্ষেপের ফলে অনশন ভঙ্গ করলেন ১০৮ দিবস পর।

নাটকীয় ভাবে ঘটনাবলী চলতে লাগল। কারাদণ্ড হোল, জামীন না-মঞ্জুর হোল। সরকারী পক্ষ থেকে মিঃ প্রেন্টিস বলে দিলেন—Barisal is the storm centre of Bengal and Satin Sen is the stormy petree. His release even on bail is fantastic.

১৯৩০ সনের আইন অমান্ত আন্দোলনের মধ্যভাগে মুক্ত হয়ে এসে কলিকাতার ছাত্র-যুবকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুলিশের নির্মম লাঠিবার্ষণ উপেক্ষা করে রক্তপথে দলের পর দল এগিয়ে গেল সতীন সেনের প্রেরণায়। এই অসম সাহসিকতাপূর্ণ কর্মের উৎস সতীন সেনকে গ্রেপ্তার করে পাঠান হোল প্রেসিডেন্সী জেলে। পূর্ব পরিকল্পনা মত ফাঁদ পেতে বিনা কাবণে পাগলা-ঘটি বাজিয়ে জেলের সমুদয় বাজনৈতিক বন্দীদের অবিস্মরণীয় রূপে প্রহার করা হোল। দ্বিতল হতে সতীন সেনের পদযুগল ধরে টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এবং কঙ্করারূত পথের উপর দিয়ে তাঁর উন্মুক্ত দেহ ঘর্ষণ খেতে খেতে রক্তাক্ত কবে কারা-অফিসে আনার জন্য কোন কাতর ধ্বনি বের হোল না সতীন সেনের মুখ থেকে।

দুর্দমনীয় দেশসেবককে দণ্ডদান করে পাঠান হোল দার্জিলিং জেলে পৃথক বাসের জন্য। একজন বুদ্ধ এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজসেবী মহিলা সতীন সেনের জীবন-কাহিনী শুনে মমতায় বিগলিত হয়ে বহু ক্রুস-চিহ্ন অঙ্কিত একখানা টেবিল আচ্ছাদনী উপহার দিয়ে বললেন—Satin, your life is full of crucifixions.

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে মুক্ত হলেও সরকারী নির্দেশে বরিশাল থেকে নির্বাসন করা হোল। বাধ্য হয়ে কলিকাতায় এলেন। কর্মীর কর্ম না হলে চলবে কেন? প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রস্তুতির উপযোগী কর্মসূচী রচনা করলেন, শতাধিক কর্মী সহ প্রত্যাহ বড়বাড়ীতে বিদেশী বস্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং শুরু করলেন। ফলে, সংগ্রামের প্রারম্ভেই এই সংগঠনী মূল্যবান কার্য সম্পাদন করে।

১৯৩২ সনে দ্বিতীয় আইন অমান্তের শুরুতেই বেঙ্গল অর্ডিনেন্সএ আটক হয়ে প্রথমে এলেন দার্জিলিং জেলে এর পরে পাঠান হল দেউলী বন্দী-শিবিরে। এখানে এক রাজবন্দীর চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে শিবির-কর্তৃপক্ষের সহিত বাধল তাঁর বিরোধ। কর্তৃপক্ষ কৌশল করে তাঁকে প্রেরণ করলেন পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা জেলে। পরে এলেন ক্যাশ্মীর জেলে।

দীর্ঘ অনশন, কাবাবাস প্রভৃতির ফলে শরীর রোগাক্রান্ত হোল। উভয় উরুর পেশীসমূহ অবশ হোল। উরুর সংযোগস্থলে অস্থি টি. বি. অস্থিত হোল, বুকে গুরেদী, নাসার রোগ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লাঁহোরের মেয়ো হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কতিপয় মাস চিকিৎসিত হলেন, পরে পাঠান হোল আশালা জেলে।

আশালা জেলে এসে চিকিৎসা, আহার, বাসস্থান এবং সর্বোপরি আত্মসম্মানহানিকর বিষয় নিয়ে দার্জিলিং জেল-সুপার খানবাহাদুর মিঃ খেজার সহিত সৃষ্টি হোল কঠিন সংঘাত। বিবিধ অস্বাভাবিক আচরণের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রেরিত যাবতীয় পত্রসমূহ চাপা দেওয়া হোল। এভাবে সতীন সেনকে দাবিয়ে রাখবে—এ হতেই পারে না। কাবাভাস্ত্রের এক প্রান্তে স্থাপিত ক্ষুদ্র গৃহে অগ্নি প্রদান কবে বসলেন, পরে যে ফৌজদারী মামলা দায়ের হোল উহারই মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হোল অস্বাভাবিক জুলুমের অধিকার দাবীসমূহ। প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই না এই দুঃসাহসিক কর্ম করতে পেরেছিলেন সতীন সেন।

(ক্রমশঃ)



# মেঘের আড়ালে

শ্রীভাস্কর ঘোষ

গলি নয় উপগলি।.....

সংকীর্ণ স্ত্রীসংস্পর্শে। মৃত সপ্নের মত নিশ্চুপ আঁকা-বাঁকা দেহটা। আভিজাত্যবিহীন ছন্নছাড়া। গলিতে ঢোকার মুখেই বাঁ-হাতি একটি মোড়। মোড়ের মাথায় পড়বে একটি স্বাস্থ্যবিহীন কোঠাবাড়ী। ছকু খানসামা লেন। পাঁচ ভাড়াটের দিন শুজরানের ঠাই।

সদর থেকে অন্তরের পথে এলেই দ্বিতীয় ঘরখানা শিপ্রাদেব। ঘর মাত্র একখানা। তবে ঘরের সাথেই চট্ট দিয়ে আঁক দেওয়া এক ফালি বাবান্না। গুরুত্বপূর্ণ রন্ধনশালা।

ঘরে জ্বলন্ত মল্লিকার একটি প্রদীপের শিখা। তারই ক্ষীণ আলোকে চোখে পড়বে শিপ্রাকে। ব্যস্ত একটি ছেঁড়া কাঁধের জোড়াতালি দিতে। চঞ্চল ছুঁটি চোখের পাতা। স্বামীর প্রতীক্ষা-ব্যাকুল। অবুঝ একটি নারী-হৃদয়—আশায় প্রহর গণে।

হঠাৎ দরজার কড়া তীব্রভাবে নড়ে ওঠে। আকাঙ্ক্ষিত লগ্ন আসে। স্বামীর পথ-চাওয়া একটি হৃদয় কাছে পাওয়ার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দরজা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করে একটি শ্রামকান্তি যুবক। ছিপ্‌ছিপে দোহারী দেহ। এক মাথা রক্ত ফাঁপা চুল। চোখের কোণে চিন্তার কালি লেপা। পথচলা ক্লান্ত দেহটা কোন কথা না বলেই বসে পড়ে মেঝেতে পাতা ছেঁড়া শয্যা।

অবাক হয়ে যায় শিপ্রা স্বামীর ব্যবহারে। উৎকণ্ঠায় মন ছলে ওঠে। ব্যস্ত হয়ে স্বামীর কপালে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে “কি গো, শরীর খারাপ হয় নি তো? অমন করে বসে পড়লে যে বড়?”

“না, শরীর আব খারাপ হ’লো কই। হেঁটে হেঁটে শুধু জুতোর হাকসোলই ক্ষয় হ’ল।” একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় হীরেনের পাঞ্জরের নীচে।

ছিঃ, ওসব অলক্ষ্যে কথা বলো না। তুমি এত ভেঙ্গে পড়লে আমি কি সাহস নিয়ে বাঁচি বল? নাও, ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে খাবে চল। জ্বলন্ত দুঃখ এই নিষেই তো জীবন। যে জীবনে দুঃখ নেই সেতো জীবনই নয়।

ঢেউবিহীন সমুদ্র আর দুঃখবিহীন জীবন। এতো কবি-কল্পনা। তুমি না পুরুষ। জন্মের সাথে সাথে জীবনের সাথে লড়াই—এত তোমার পাণ্ডনা।”

স্বীর দরদী মনের সান্নিধ্য হীরেনের সারাদিনের পথচলা দুঃখ নিমিষে মুছে যায়। একটি ভেঙ্গে-পড়া পুরুষের হৃদয়ে আবার বেঁচে থাকার আশা জাগে। পথ-চলা জীবনে আবার সে পেল অমৃত পাণ্ডেয়।

নিশ্চয় হ’য়ে আসে রাতের ক’লকাতা। যন্ত্রজীবনে ক্লাস্তিভাঙা নামে। কালো ঝুল অন্ধকার গভীর হ’য়ে আসে। তারা-ঝরা ঘুমের মদিরায় বুঁজে আসে কাল চোখের পাতা। ঘুমিয়ে পড়ে রাতের ক’লকাতা।

শুধু একটি প্রাণ জাগে—জাগে ছুঁটি চোখের তারা। অতন্ত্র নিদ্রাবিহীন। আকাশ পাতাল খোঁজে মনের গহনে। কত আলোছায়া সন্ধ্যালগ্ন। কত অহুসারের রক্ত রাঙ্গা। মৃত অতীতের কত কথা কাহিনী। এলো-মেলো চিন্তায় ছ’লে উঠে। কিছু জ্বলন্ত-স্মৃতি, কিছু বা...

ধনী পিতার একমাত্র কন্যা সন্তান শিপ্রা। প্রাচুর্য্যতার পরিবেশে দিন কাটানো অভ্যস্ত একটি জীবন। বাপ-মায়ের নয়নের মণি। এই শিপ্রাই বিবে করল কপর্দকহীন হীরেনকে। জ্ঞাতে-নমঃশূদ্র। সেদিনের স্মৃতি আজো শিপ্রাকে ব্যস্ত করে তোলে। বাধা এল সর্বাঙ্গিক থেকে। কিন্তু শিপ্রা অবিচল। দ্বিচারিণী সে কখনও হ’বে না। তার অনাবিল প্রেমের আশুনে ঐশ্বর্য্যের জৈব-তৃষ্ণা পুড়ে ছারখার হ’য়ে গেল। স্বপ্ন ছেড়ে নেমে এল বাস্তবের কঠিন মাটিতে। একটি প্রেমিকার জীবনে এল নতুন প্রাভাত।

হীরেনের উপর বিশ্বাস ছিল অপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে হীরেন। নিশ্চয়ই একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে। নতুন আশার স্বপ্ন নিয়ে নতুন যাত্রাপথে পা বাড়ায় শিপ্রা। কিন্তু কৈ সে স্বপ্ন তো তার আজো ফলবতী হ’ল না। তবে কি!...

অনাগত দুঃখের বিষাক্ত চিন্তার বড় ছলে উঠে পাঞ্জরের নীচে। চিন্তাক্লান্ত মন এক সময় কিমিষে পড়ে। হারিয়ে যায় ঘুম-সাগরের অতল তলে।

আবার সূর্য্য ওঠে। যন্ত্রনগরীর জংগিও জাগে  
আবার কর্মচঞ্চলতা। এমনি করেই দিনের চিতা নেবে।  
আবার রাত্রিবধু আসে বিরহের কালো অঞ্চল জড়িয়ে।  
জ্যামিতিক অক্ষরেখায় জীবনকাঁটা এগিয়ে চলে নিশ্চুপ  
পদক্ষেপে।

ঘটনাতব্ধে দিন এমনি করেই এগিয়ে চলে।  
অভাবের মাত্রাও বেড়ে চলে প্রতি পদক্ষেপে। উতলা  
হয়ে ওঠে শিপ্রা অভাবের তাড়নায়। আজ কাপড়, কাল  
ছেলের দুধ। এমনিতির টুকিটাকি অভাব অনটনে  
দিশাহারা হ'য়ে ওঠে। বাড়ীওয়ালার তাগিদ, দুধওয়ালার  
অভিযোগ, মুদির তর্জ্জন। এ তো আজকাল গা-সওয়া হ'য়ে  
গেছে। এসব কথা স্বামীকে বলেও লাভ নেই। সে  
তার চাকুরী খোঁজা নিয়েই ব্যস্ত। এক এক সময় স্বামীর  
উপর ভীষণ রাগ হয়। ছ' কথা শুনিye দিতেও আজকাল  
দ্বিধা করে না। কেমন যেন একটা চাপা আক্রোশ  
জ্বলতে থাকে মনে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অলক্ষ্যে নেমে  
আসে একটি চাপা ঘৃণা। ছ'জন ছ'জনকে এড়িয়ে চলতে  
চেষ্টা করে। কি যেন এক অব্যক্ত ব্যথায় ছ'জনেই ভীত।

“যাহার লাগিয়া ভাসাইলু ভেলা, এ কাল সিন্ধুতে”  
তাকেই যেন হারিয়ে ফেলে শিপ্রা। তবে কি সে ভালবেসে  
তুল করেছে? দ্বিধা আর স্বন্দে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে সারা  
অস্তর। তবু অনাগত সূত্থের স্বপ্ন দেখে শিপ্রা।

সেদিন হীরেন যথাসময়েই বাড়ী ফেবে। সাবাদিন  
স্নান খাওয়া কিছুই হয় নি। পঞ্চলা ক্লান্ত দেহলতা।  
ঘরে ফিরে দেখে শিপ্রা ও তার ছেলে বাতী নেই; অবাক  
হয়ে যায় হীরেন। ঘরে ভালা দেওয়া। সন্ধ্যা হ'তে  
কিছু বাকী—এই অসময়ে শিপ্রা গেল কোথায়? পুরুষ  
হৃদয়। তার ওপর সারাটা দিন উপবাসী। নানা  
সন্দেহের বারুদ জ্বলে ওঠে মনে। ক্লান্ত দেহটা রোয়াকে  
হেলান দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে হীরেন। হুঃখে, ঘৃণায়

জ্বলতে থাকে হীরেনের সারাটা অস্তর। নিষ্ফল আক্রোশে  
হৃদয় বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘরে ফিরে শিপ্রা স্বামীকে এ অবস্থায়  
দেখে একটু অবাক হ'য়ে যায়। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা  
করে “কখন এলে? আজ এই অসময়ে যে!”

“কেন? এসে কি খুব অসুবিধার সৃষ্টি করেছি?  
কারো আসাব কথা আছে বুঝি?”

চম্কে ওঠে শিপ্রা স্বামীর জ্বালামুখী ভাষায়। ঘরে  
চুকেই বলে ওঠে, “ছি, ছি! কি যা-তা বলছ!”

“যা-তা আমি বলছি না, তুমিই যা-তা করে  
বেড়াচ্ছ?” রাগে ফেটে পড়ে হীরেনের গলার স্বর।

হুঃখে, ঘৃণায় শিপ্রা আর নিজেকে সামলাতে পারে  
না। চীৎকার করে বলে ওঠে—“কি এতবড় সন্দেহ!  
বলি—জীপুজের যে পেট ভরাতে পারে না, তার এতবড়  
কথা বলতে সজ্জা করেনা। এতবড় নীচ তুমি যে  
নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ কর।”

“কি আমি নীচ। এত বড় কথা!” বিরাট এক  
চপেটাঘাত বসিয়ে দেয় স্ত্রীর মুখে।

সারাদিন উপবাসী শিপ্রার ক্ষীণ দেহটা এতবড়  
আঘাত সহ্য করতে পারে না। টাল সামলাতে না পেরে  
ঘুরে পড়ে যায় কঠিন মেঝের উপর। ওর আঁচলে বাঁধা  
কিছু চাল আর একরাশ কাগজের ঠোঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে  
যবে। কাগজের ঠোঙ্গা চোখে পড়তেই হীরেনের চোখ-  
জোড়া চম্কে ওঠে ভীষণভাবে। নিমেষে সে তার তুল  
বুঝতে পারে। লজ্জা আর অপরাধে হুয়ে আসে মাথা।  
গভীর মমতায় বুকে তুলে নেয় শিপ্রার ক্ষীণ দেহলতা।  
গভীর প্রেমে ছ'জোড়া ঠোঁটের মাঝে নেমে আসে  
তৃপ্তির স্বর্গ।

মেঘের আড়াল থেকে রাতের প্রথম তারা নয়ন  
মেলে।



# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসজ্জগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

(পূর্বে প্রকাশিতের পর : ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ (জুলাই—আগষ্ট) ॥ ১৩৫৫-৫৬ বঙ্গাব্দ)

২৪

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

৩ জুলাই—গত ৩০শে জুন প্রবর্তক সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়-এর ৯ম বার্ষিক সমাবর্তন সভায় বিদ্যায়ী ছাত্রগণের প্রতি সজ্জগুরুর উপদেশ-বাণী।

১০ জুলাই গুরু-পূর্ণিমা—সজ্জ চাতুর্দশ্য ত্রতারন্ত।  
গুরু-পূর্ণিমার দিন হইতে রাস-পূর্ণিমা পর্যন্ত শরীর ও মনের বিশেষ তপস্যা ও সংযম-পালনের বিধান প্রবর্তন। পূর্ণিমা-সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী।

১৬ জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাট্টজুর পৌরোহিত্যে কলিকাতার পূর্ণিমা সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন “ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল”-এ অনুষ্ঠিত। প্রধান অতিথিরূপে বিচারপতি বিজ্ঞানকুমার মুখোপাধ্যায়ের যোগদান। সজ্জগুরুর ভাষণ।

১৭ জুলাই—কলিকাতায় ২৬ বি, নলিন সরকার ষ্টাটস্ প্রবর্তক বাসভবনে সজ্জের গভর্ণিং বডির সভায় সজ্জগুরুর ভাষণ।

১৮ জুলাই—সজ্জের কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ও নির্মলা দেবীসহ বিমানযোগে সজ্জগুরুর চট্টল প্রবর্তক আশ্রম পরিদর্শনে যাত্রা।

১৯ জুলাই—চট্টল আশ্রমে উপাসনাস্ত্রে সজ্জগুরুর উপদেশ-বাণী। ঐদিন মহিলা সম্মেলনে সজ্জগুরুর ভাষণ।

২০ জুলাই—চট্টল আশ্রমে প্রবর্তক সজ্জ বিভাগীয় কেন্দ্রের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর অধিবেশন, কম্মিসম্মেলন ও প্রবর্তক শিশুসদন কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর অধিবেশনে সজ্জগুরুর বিভিন্ন ভাষণ প্রদান।

২১ জুলাই—সজ্জগুরুর উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম আশ্রমে ত্রিবৃৎসলি প্রতিষ্ঠাৎসব সম্পন্ন। ১৯৪২ খৃঃ জগন্নাথধামে ধ্যানযোগে এই প্রতীক দর্শনের কথা সজ্জগুরুর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ।

২২ জুলাই—চট্টগ্রাম আশ্রম হইতে বিদ্যায়োপলক্ষে ‘প্রবর্তক শিশু সদন’-এর বালকবালিকাগণ কর্তৃক

সজ্জগুরুকে অভিনন্দন-পত্র(১)। উত্তরে সজ্জগুরুর উপদেশবাণী।

২৩ জুলাই—সজ্জগুরুর চট্টগ্রাম আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন।

২৪ জুলাই—১৫ই আগষ্টে কলিকাতায় ব্যাপকভাবে শ্রীঅবিন্দ-আবির্ভাবোৎসবের আয়োজনে সজ্জগুরুকে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ডক্টর কালিদাস নাগের চন্দননগর সজ্জ আগমন ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

৮ আগষ্ট—বুলন-পূর্ণিমা। সজ্জের চাতুর্দশ্য ত্রতারের প্রথম মাস উদ্‌যাপন। মূলকেন্দ্র চন্দননগরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে সজ্জগুরুর ভাষণ।

(১) চট্টগ্রাম ‘প্রবর্তক শিশু সদন’-এর বালক-বালিকাগণ কর্তৃক সজ্জগুরুকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র :

“হে পূজনীয় সজ্জগুরু, আজ এই বিদ্যায়ক্ষেণে তুমি আমাদের নতুন জন্মের প্রদীপ্ত প্রদর্শন কর। প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের মাঝখানে আসিয়া আমাদের জীবনের আদর্শ, কর্তব্য, লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে তোমার সারগর্ভ উপদেশামৃতের দ্বারা আমাদের পবিত্র করিয়াছ, আমাদের চির-চাক্ষুস্ময় ও অশান্তিময় জীবনে শান্তি পথের অনুসন্ধান দিয়াছ। জীবনের চরম সার্থকতা ভাগবত-জ্ঞানে। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও সংহতির ভিতর দিয়া। দেবজাতি গঠন করার, আমাদের মানুষ তৈরী করার যে ব্রহ্ম জীবন-মথাকে দেখিয়াছিলে, অবর্তকের ভিতর দিয়া তোমার সাধনার দ্বারা তাহাকে বাস্তব রূপ দিয়াছ। তোমার অক্লান্ত প্রচেষ্টাই কর্মে ও ধর্মে স্থিরমতি থাকিয়া প্রবর্তকের প্রাণসঞ্চার করিয়াছে এবং ভারতের সনাতন সংস্কৃতিতে আত্মস্থান একদল ভগবানের মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। আজ গুরুদেব, বিদ্যায়ক্ষেণে আমাদের শুধু এই আশীর্বাদ কর—আমরা যেন নিরাসক্ত, নিরহঙ্কার, নিরভিমান হইতে পারি; তোমার আদর্শ ও প্রেরণা দ্বারা শুদ্ধ জীবন লাভ করিতে পারি। ভগবানকে কোন সময়ে যেন না ভুলি। ঈশ্বর-তত্ত্ববাদের উপর সমাজতত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবলব্ধ স্বাধীনতারমূল্য জীবনে গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের কণ্ঠে যেন গীতার সেই বাণী উচ্চারিত হয়—“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ”। যদি কোন সময়ে সংসারের লালস-কৃতি, ঘেনা-পাওনার টানা-পোড়নে চিত্ত-বিভ্রান্তি পড়ে, জীবন-পথে চলতে যদি কখনও ভুল-ভ্রান্তি হয়, তখন যেন তোমার দিব্য প্রণাম্য মূর্তি অনুধ্যান করি। তোমার যেন না ভুলি।”

১২ আগষ্ট—কলিকাতায় প্রবর্তক ভবনে পূর্ণিমা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন—প্রবর্তকের অর্থ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির নিকট সজ্ঞগুরু মর্মভাষণ।

১৪ আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে তাঁহার বিপ্লবী সহকর্মীগণকে অগ্রভাগে লইয়া বিরাট শোভাযাত্রায় সজ্ঞগুরু যোগদান।

১৫ আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দ-আবির্ভাবোৎসব দ্বিতীয় দিবসে কলিকাতা, হাঙ্গরা পার্কে বিরাট উৎসব মণ্ডপে সজ্ঞগুরু কর্তৃক শ্রীঅরবিন্দের প্রতিমূর্তির আবরণোন্মোচন, তাহাতে মাল্য প্রদান ও শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে অর্চনা-ভাষণ।

উৎসবে অস্বাভাবিক উপস্থিতি ও বক্তাগণ—মহোমহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, দিলীপকুমার বায়, রাজারাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিচারপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল (গভর্নর) কৈলাসনাথ কাট্টজ প্রভৃতি।

১৬ আগষ্ট—জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সজ্ঞগুরু বাণী ও মধ্য-রাত্রে এক ঘণ্টাকাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানরত থাকার জন্ত সজ্ঞের প্রতি নির্দেশ।

২১ আগষ্ট—“ধর্মরক্ষণী সভায়” আহ্বানে সজ্ঞগুরু বরিশালে উপস্থিতি। বরিশালের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অভ্যর্থনা। স্বনামধন্য অভিজাত জমিদার অবিনাশ-চন্দ্র গুহের বাটীতে তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহণ। “ধর্মরক্ষণী সভায়” বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে সজ্ঞগুরু প্রথম দিন ‘শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব’

বিষয়ক বক্তৃতা—দ্বিতীয় দিনে ‘ধর্মতত্ত্ব’ ও তৃতীয় দিনে ‘যোগতত্ত্ব’ বিষয়ে ভাষণ প্রদান।

২৪ আগষ্ট—বরিশাল ‘প্রবর্তক কুটির-শিল্প’ ভবনে সজ্ঞগুরুকে অভিনন্দন প্রদান—সজ্ঞগুরু ভাষণ। সভায় সহরের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় লোকের উপস্থিতি। তৎপরে তাঁহাদের আমন্ত্রণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীশঙ্কর মঠ, হরিনন্দন বিদ্যালয়, “বরিশাল হিতৈষী” অফিস, সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়, কংগ্রেস অফিস পরিদর্শন ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সঘর্ষিত হন। দেশনেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সরলকুমারের বাস-ভবনে উপস্থিত হইয়া অশ্বিনীকুমারের বাস-কক্ষ দর্শন এবং তাঁহার কক্ষটিকে মন্দিরের স্থায় পবিত্র জ্ঞানে সংরক্ষণের জন্ত অতীবোধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরীর আন্তরিক আতিথ্যসংকার ও পরম সমাদর-পরিভূষ্ট সজ্ঞগুরু গৃহ-পরিবারের প্রাচীন ও বহু মূল্যবান পারিবারিক গ্রন্থাগার পরিদর্শন এবং বহু হুপ্রাপ্য সংস্কৃত ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ সংগ্রহ-প্রাচুর্য্যে উল্লাস প্রকাশ ও গ্রন্থাগারটি ভারত-সংস্কৃতি-তীর্থ বলিয়াও অভিযত প্রকাশ।

২৪ আগষ্ট—বরিশাল হইতে সজ্ঞগুরু সদলবলে প্রত্যাবর্তন।

২৫ আগষ্ট—চন্দননগরে সজ্ঞের গভর্নিং বডি ও স্থানীয় পরিচালকমণ্ডলীর অধিবেশনে সজ্ঞগুরু উপস্থিতি ও কার্য পরিচালনা। (ক্রমশঃ)



**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কারিকা পেপটেল**

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

# সম্মাদকাণ্ড

বাংলার দধীচি :

বিগত শতাব্দী ও বর্তমান শতাব্দীর প্রাক-স্বাধীনতা-কালে বাঙালীর যে বিশ্বগৌরব তার মূলে আছে কয়েকজন মুষ্টিমেয় মহামানুষের বিচিত্র অবদান। সর্বদেশে সর্বকালেই এই আলোকদিশারীরাই জনতাকে দিগদর্শন দিয়া থাকেন। স্বজন-পরিকল্পনাব বুদ্ধিবা ইহাই নিয়ম। মানুষের ইতিহাসে কত অগণিত অসংখ্য কোটি নরনারী পশু-কীট-পতঙ্গের মতই জন্মিয়াছে, মরিয়াছে, মহাকালের গর্তে বিশ্বতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ, অরণীয়, বরণীয় হইয়া আছেন স্বল্প কয়েকজনই। এমন মানুষ গড়িয়া-পিটিয়া তৈয়ারী করা যায় না। ইহাদের আবির্ভাব ঘটে যুগ-প্রয়োজনে। বিগত শতকের বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধনা এমনি একজন সর্বত্যাগী আত্ম-ভোলা বাঙালী-প্রাণ মহাত্মার আবির্ভাব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল এইবাংলা দেশে, বাঙালীরই ঘরে আজি হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে। ইনি হইতেছেন আচার্য্য। প্রকল্পচক্র রায়। আজীবন অনড় ছিলেন তিনি। নিজের সংসার বলিতে কিছু ছিল না। বাংলা ও বাঙালীকে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে অগ্রগামী করিয়া তোলাই ছিল আচার্য্যদেবের জীবন-মিশন। এই স্বপ্ন সিদ্ধ করিতে আচার্য্যদেব দধীচিব মত তিলে তিলে আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের ভবিষ্যদ্বাণী যে মর্মান্তিক সত্য তাহা আজিকার দিনে বাঙালী হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছে। তাঁর সমসাময়িক কালেই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আজ সকল রকম ব্যবসা-বাণিজ্য অবাঙালীর হাতে। বাঙালী আজ সামান্ত চাকুরিয়া মাত্র। বাঙালী আজ ‘বাবু’ বলিয়া পরিচিত। সামান্ত কারিক পরিশ্রমের কাজে বাঙালী ভয় পায়। ইহার ফলে বাংলা দেশে আজ বাঙালী কুলি-মজুর, রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, কলের কুলী, ইত্যাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কাজে বাংলা দেশে এখন প্রায় শতকরা ৯০ জন অবাঙালী

বাংলার টাকা নিজের দেশে লইয়া ধাইতেছে। আর বাঙালী বিনা অয়ে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌছিয়াছে। এইভাবে আর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা দেশে জন-কয়েক উকিল মোক্তার ও জনকয়েক অফিসের বাবু ছাড়া আর মধ্যবিত্ত বাঙালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।” অদ্ভুত ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি! পঞ্চাশ বৎসর পরে শুধু মধ্যবিত্ত সমাজই ধ্বংস হয় নাই, সমগ্র বাঙালীই প্রায় নিজ বাসভূমে উদ্ধাস্ত হইতে বসিয়াছে। সেদিন বাঙালীর মৌলিক সম্ভাই যেন বিগ্রহাঘাত হইয়া কণা বলিয়াছে আচার্য্য রায়ের মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতের তপোমূর্তি আগরা বিংশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি আচার্য্য রায়ের মধ্যে। বুনো রামনাথের মতই ছিলেন তিনি অনাড়ম্বর ও অযত্ন-বিস্তৃত রূক্ষ চুল-দাড়ি-গোঁফ বিশিষ্ট জ্ঞানতপস্বী। এমনি উদাসীন উন্নাদই বুদ্ধি এই সর্বহারার দরদীর দল হইয়া থাকেন। আত্মস্বার্থসর্বস্ব হিসাবী বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে ইহাদের মাপা চলে না। ইহার অসামান্য। ইহাদের গোত্র আলাদা। দধীচির নির্লোভ নিস্পৃহতা দিয়া আচার্য্য রায়ের মত মহাপুরুষের ধাতু তৈয়ারী। বাঙালীজ্বের বিগলিত করণার স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল প্রফুল্লচন্দ্রের প্রস্থনকোমল চিত্ত। আজকে তাঁর শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি “তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন ও কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি,— নিজেই দিয়েছেন, সে দানের প্রভাবে সে নিজেই পেয়েছে। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দেবী-শক্তি,—আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না, তরুণের হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। অবশ্য নিজেই জয়কীর্ত্তি তিনি নিজে স্থাপন করেছেন উত্তমশীল জীবনের ক্ষেত্রে,—পাথর দিয়ে নব প্রেম দিয়ে, আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।”

শ্রীনিরপেক্ষের সম্মান ও বাংলার সাংবাদিকতা :

সম্প্রতি শ্রীনিরপেক্ষ ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ করিয়া বাংলা ও বাঙালীরই শুধু মুখোজ্জল করেন নাই, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালীর কৃতিত্বের আন্তর্জাতিক

স্বীকৃতি অর্জনের গৌরব দান করিয়াছেন। এই ম্যাগসেসাই পুরস্কারকে সংবাদপত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলা চলে। টাকার অঙ্কের (হাজার পঞ্চাশেক) দিক দিয়া ঘাই হোক, খ্যাতির বাতে ইহা অমূল্য। সাম্প্রতিক জাতীয় জীবনে ইহা নিশ্চয়ই অরণীয় ঘটনা। সব দিক হইতে কোণঠাসা আঞ্জিকার হেয় অবহেলিত বাঙালী ঘটনাচক্রে ও চক্রান্তে নিম্নেক্রে তুচ্ছ ভাবিতে শুরু করিয়াছে। অই অবসাদগ্রস্ত মানসিকতা আঞ্জকের দিনে বাঙালীর জীবনের বড় ট্রাজেডি। শ্রীনিরপেক্ষের এই অপ্রত্যাশিত সম্মানলাভ বাঙালীর আত্মসম্মিৎ ফিরাইয়া আনিতে সহায়ক হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঘটনাটি ব্যক্তিগত পবিত্রশক্তির উর্দ্ধে জাতিগতভাবে ঠিক আন্তরিকতার সহিত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাধারণ্যে যতটুকু বিশ্লেষিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই—হয় নাই সম্ভবতঃ বাঙালী এখনও জাতি-ঈর্ষাপ্রবণ (Professional jealousy) মনোবৃত্তির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়াই।

শ্রীনিরপেক্ষের আসল নাম শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী বয়সে তরুণ, বিচক্ষণতায় প্রবীণ এবং নির্ভীক সত্যনিষ্ঠায় অল্পময়। শ্রীনিরপেক্ষ ছদ্মনামে ‘নেপথ্য দর্শন’ শিরোনামায় তিনি ১৯৫৬ সালে ‘যুগান্তরে’ লিখিতে আরম্ভ করেন। ম্যাগসেসাই ফাউন্ডেশন কমিটি যেসব তথ্যের উপর তাঁকে এই পুরস্কার দিয়াছেন তাতে দেখা যায়, ২৫০টি নেপথ্য দর্শনের ফলে প্রায় ৫০টি ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি, পদাবনতি অথবা তদন্তমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সাংবাদিকতাব পবিত্রাযায় নেপথ্য দর্শনের বিষয়বস্তুকে ‘ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্ট’ আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ সাম্প্রতিক। সম্ভবতঃ বাংলা যুগান্তর দৈনিকই এ দেশে ইহার প্রথম প্রবর্তক এবং শ্রীনিরপেক্ষ ইহার প্রথম পথিকৃৎ। ‘নেপথ্য দর্শন’ সরকারী Enforcement Deptt.-এর অল্পরূপ হইলেও, সরকারী চাপরাশ ও আইন-গত সুরক্ষা সুরক্ষাই শুধু বঞ্চিত হইয়া নয়, পরন্তু বিরাগ-ভাজন হইবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার দাবিত্ত স্বক্ষে লইয়া

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নেপথ্যের গোপন তথ্য উদ্ঘাটন করার যে কৃতিত্ব এই স্বল্প সময়ে শ্রীনিরপেক্ষ দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। এই কাজে প্রলোভনের বেড়াঞ্জাল চতুর্দিকে ছড়ানো। নিলোভ, নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, ত্রায়নিষ্ঠ, সর্বোপরি জনগণের কল্যাণকামী না হইতে পারিলে এইরূপ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর নয়। শ্রীনিরপেক্ষ-চরিত্রে এই সদৃশগুণগুলি বিগত কয়েক বৎসরে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আশাব্যিত হইয়াছি। ডি. ভি. সি-র কেলেকারী, আসামের বঙ্গাল-খেদা এবং আরও অনেক সদীন ক্ষেত্রে নেপথ্য দর্শনের উদ্ঘাটন সমতাই তারিফ করিবার মত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, শ্রীনিরপেক্ষ এ ক্ষেত্রে একক আকস্মিক নহেন। বাংলা ও বাঙালীর দীর্ঘ সাংবাদিকতার ঐতিহ্যেরই তিনি স্রষ্টা—অগ্রতম সুরোগ্য উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতা-সংগ্রামে, এমন কি স্বাধীনোত্তর ভারতে জনগণের স্বার্থ-সংরক্ষণে বাংলার সংবাদপত্রের অবদান অতুলনীয়ই বলা চলে। দেশ ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় বিশ্বস্ত প্রহরীর মতই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি সদা জাগ্রত ও সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। ইহার প্রধানতম কারণ এই যে, বাংলা দেশে বিশেষ বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি কোন বৃহৎ শিল্পপতির অগাধ মূলধন নিয়োগে ব্যবসা-অভিসম্বিতে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়নি। দেশদরদী মধ্যবিত্ত বাঙালী দেশসেবার সজ্জেশে পত্রিকাগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। টিকিয়া থাকিবার দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়া একদা পত্রিকাগুলিকে পথ চলিতে হইয়াছে। বাংলার সর্বাধিক প্রচারিত এবং নিখিল ভারতের প্রথম শ্রেণীর ছয়খানি দৈনিকের তিনখানি ‘অমৃতবাজার’, ‘আনন্দবাজার’, ‘যুগান্তর’ পত্রিকার ঐতিহ্য ইহাই। ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মাল্যাজের এক ‘হিন্দু’ ছাড়া আর কোন দৈনিকই অল্পরূপে ঐতিহ্যের গৌরব কবিত্তে পারে না। অন্ত্যায় কোন ধনিক বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট পত্রিকা ‘নেপথ্য দর্শনের’ মত বিপজ্জনক রিপোর্ট প্রকাশে সাহসই করিত না। বাংলা দেশের পাঠক-সমাজের সচেতনতাও এই পত্রিকাগুলিকে অর্থাৎ হইয়া অবনত হইতে দেয় নাই বলা চলে। এদেশে কোন সুস্পষ্ট

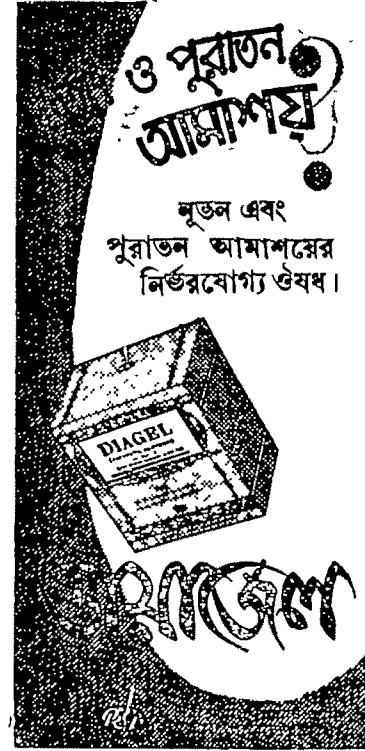
দলীয় বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট পত্রিকার প্রচারের সীমাবদ্ধতাও এই সম্ভাবন বিচারপ্রবণ পাঠকের কারণেই।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আজিকার বাঙালীর বর্তমান অধঃপতন, শোচনীয় দুর্দশা ও নেতৃবিহীন ছরবছার মধ্যে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃৎ-বেদনার কথা জাহির করিতে এই পত্রিকাগুলি সদাই মুখর। এই হেতুই আসাম সরকার, কেন্দ্র তথা প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর বাংলার পত্রিকাগুলির প্রতি এত বিরাগ, এত উদ্ভ্রা। শ্রীনিরপেক্ষের এই সম্মান বাংলার সাংবাদিকতার স্বমহান ঐতিহ্যকেই বিশ্ববাসীর সম্মুখে সম্মানিত করিয়াছে।

### জীবনের চেয়েও আদর্শ বড় :

কঙ্কোর পরলোকগত নেতা এবং মানববন্ধু শ্রীপ্যাট্রিস লুধুয়া মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন : “যত অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং নৃশংসতাই করা হ’ক না কেন কৃতকর্মের জন্ত কখনও আমি অহুশোচনা প্রকাশ করব না। যে আদর্শ আমি এতদিন পবিত্র বলে মনে করে এসেছি, তা ত্যাগ করে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। বরং প্রিয়তম জন্মভূমির ভবিষ্যতের উপর মনে মনে গভীর বিশ্বাস এবং অফুরন্ত আশা নিয়ে আমি মাথা উঁচু করে মরতেই চাই”—লুধুয়া-পত্নী শ্রীমতী পলিন সংবাদিকদের কাছে এই পত্রটি দেখাইয়াছেন। লুধুয়ার আদর্শ ছিল মানবহিতৈষণা। মূল্যস্বরূপ তিনি আততায়ীর হস্তে

নিহত হইয়াছেন। কিন্তু লুধুয়ার আশাকে চরিতার্থ করিবার জন্ত সমস্ত আফ্রিকা আজ জাগ্রত। যাদের কাছে জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়, এমন মহামানুষই দেশ ও দেশের জন্ত আত্মভোলা উন্মাদ হইয়া থাকে। ইহারাই সর্বদেশে সর্বকালে স্মরণীয় লোকনেতা।



### গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

- পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের হেতু অনেকটা নিয়মিত হওয়ায় আশা করি আগামী পূজা সংখ্যা ও পরবর্তী সংখ্যাগুলি যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে।
- এই বৎসরের অগ্রাণ্ড সংখ্যার জন্ত এখনই পত্রদ্বারা জানাইবেন। অত্যধিক বিলম্বে সংখ্যাগুলি আর নাও পাওয়া যাইতে পারে। গত বৎসরের প্রবর্তক বর্তমানে নিঃশেষিত।
- গ্রাহকগণ অল্পগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বকেয়া দেয় দক্ষিণা যাহাতে পূজার পূর্বেই আদায় হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। এ জন্ত স্বতন্ত্র স্মারক-পত্র দেওয়া হইবে না।

—পরিচালক : প্রবর্তক

# সামগ্রিক

## ভারতের পত্রপত্রিকা সংবাদ :

লোকসভা তথ্যসূত্রী কর্তৃক প্রস্তুত ১৯৬১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ : ১৯৬০ সালে আলোচ্য এদেশে পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮০২৬টি। এই সময়ে দেশে সংবাদপত্র প্রচারের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে ইংরাজী পত্র-পত্রিকার সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক ১৬৪৭টি। ইহার পর হিন্দী পত্র-পত্রিকার স্থান—১৫০২টি। উর্দুতে প্রকাশিত ৬৮০টি, বাংলায় ৫২৬টি, গুজরাটিতে ৫১৯টি, মারাঠীতে ৪০৪টি, তামিলে ৩৭৭টি, তেলেগুতে ২৬টি, উড়িয়ায় ৭৬টি, অসমীয়াতে ১৬টি। রাজা হিসাবে মহারাষ্ট্র হইতে সর্বাধিক সংখ্যক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ১২৭২টি। ইহার পরে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয় ১১০৭টি। দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে হিন্দীতে প্রকাশিত হয় সর্বাধিক সংখ্যক ১১৬টি, উর্দুতে প্রকাশিত হয় ৭০টি। ইংরাজী দৈনিকের সংখ্যা ৫০, মারাঠী ৪২, বাংলা ৭, উড়িয়া ৫। আলোচ্য সময়ে দায়িত্ব পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৭৪০৩টি। ঐগুলির মোট প্রচার সংখ্যা হইল ১ কোটি ৩২ লক্ষ।

দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইংরাজী দৈনিকগুলির মোট প্রচার সংখ্যাই সর্বাধিক অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৫০ হাজার। মোট ৭৫টি হিন্দী দৈনিকের প্রচার সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। অষ্টম ভাষার দৈনিকের প্রচার সংখ্যা এইরূপ : অসমীয়া ৫ হাজার, বাংলা ২ লক্ষ ১০ হাজার, গুজরাটী ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, কানাড়া ১ লক্ষ ৫৫ হাজার, মালয়ালম্ ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার, মারাঠী ৩ লক্ষ ৬১ হাজার উড়িয়া ৫৮ হাজার, পাঞ্জাবী ৪৯ হাজার, তামিল ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার, তেলেগু ১ লক্ষ ৬৪ হাজার, উর্দু ২ লক্ষ ৫১ হাজার।

এক লক্ষের অধিক প্রচার সংখ্যা আছে এইরূপ দৈনিকের সংখ্যা হইল ৬টি। ১৯৫৯ সালে এইরূপ ৪টি দৈনিক ছিল। ৫০ হাজারের অধিক প্রচার সংখ্যা বিশিষ্ট ১৬টি পত্রিকা আছে। এই মোট ২২টি দৈনিকের মধ্যে ইংরাজী দৈনিক ৯টি, হিন্দী দৈনিক ৩টি, তামিল দৈনিক ২টি, বাংলা দৈনিক ২টি, মারাঠী দৈনিক ৩টি, মালয়ালম্ দৈনিক ২টি ও তেলেগু দৈনিক ১টি।

ভারতবর্ষে একটি মাত্র কেল্স হইতে প্রকাশিত ৫০ হাজারের অধিক প্রচারবিশিষ্ট ৭খানি ভারতীয় ভাষার দৈনিকের প্রচার এইরূপ : মালোয়ালী মনোরমা ২২৪০৬৪, দুগাস্তর ৮৯৬১১, আনন্দবাজার ৮৭৩৭৭, লোকসত্তা (মারাঠী-বোম্বাই) ৮৫৩৭০, মাতৃভূমি (মালয়ালম্—কোকাকোড) ৭৯৮৯৩, হিন্দুদান (হিন্দী—নয়া দিল্লী) ৬০৮২২;

সকাল (মারাঠী—পুনা) ৫৩১১২। ভারতীয় ভাষায় একাধিক কেল্স হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'ভাস্কি' পত্রিকার প্রচার সর্বাধিক—১৪২১২২। ইংরাজী দৈনিকের মধ্যে মাজাজের হিন্দুর প্রচার সর্বাধিক—১২০৮৬৬; তারপর অমৃতবাজার পত্রিকা ৯০০৯৮।

## শিক্ষা সমীক্ষা :

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রটি শুধু আমাদের ছাত্রদের সময়ই একটি বড় রকমের সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। অথচ বিশেষে এবং তথাকথিত সর্বাধিক অগ্রসর দেশেও যে তা কতবড় সমস্যা, সম্প্রতি তাহারই একটি নমুনা পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, লণ্ডনের পিটম্যান কলেজ সম্প্রতি বুটেনের ছাত্রদের একটি বানানের পরীক্ষা লন। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৭০০। মাত্র ৪জন ছাত্র পুরা নম্বর পাইয়াছে এবং অধিকাংশই শত-করা ৪০ নম্বরেরও কম পাইয়াছে। বানানের নমুনা যথা : 'Payohio' শব্দটির বানান ছাত্র লিখিয়াছে 'Side kloks', Efficiency-র বানান effishunsees এবং courteous শব্দটি লিখিয়াছে courteyus সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বি. এ. পরীক্ষার্থী He went-এর স্থলে উত্তরপত্রে He wented লিখিয়াছেন। কেন এমন হয়—সে উত্তর হরত মনঃসমীক্ষকরা দিতে পারিবেন।

## মেদিনীপুর কুইকোটা অনুরূপ কল্যাণ-কেন্দ্র :

কুইকোটা কল্যাণ-কেন্দ্রে কেবল অনুরূপের উন্নতিমূলক কল্যাণ-কর্মই হয় না, বারো মাস বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইসব কর্মকে রসব্রিদ্ধ ও আকর্ষণীয় করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রের কর্মী হুসাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও কণা দেবী ভারতীয় রচি ও নির্মা এইরূপ উপযোগ্য পবিত্র স্থলটির অনেকখানি সহায়ক হইয়াছে। কুইকোটা কেন্দ্রের আর্থিক উৎসবের বিবরণ দেওয়া হইল :

৪ঠা আর্থিক সঞ্চায়, জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিক শ্রীমতীস্বনাথ চন্দ্রবর্মা পৌরোহিত্যে বিজ্ঞান-জয়ন্তী। প্রধান অতিথি সুবকারী কৃষি-কেন্দ্রের কর্মধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগ দিতে পারিয়া উভয়েই খুব আনন্দিত হন।

১৭ই আর্থিক সঞ্চায়, মেদিনীপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমতীস্বনাথ সিকদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানগণ ও আচার্যদেবের বাণী ও ব্রতচারী নৃত্য-গীত অবলম্বনে বচিত শিক্ষামূলক নাটিকাটি খুবই সমরোপযোগী হব।

২২শে আর্থিক সঞ্চায় শুক্লবেদ রবীন্দ্রনাথ ও রাষ্ট্রগুরু হরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ। রবীন্দ্রনাথের রান ও কবিতাকে সর্বজনগোষ্ঠ্য করিয়া একটি গীতি-আলোচনা তোলা হয় এবং তাহারই মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় উৎসব।

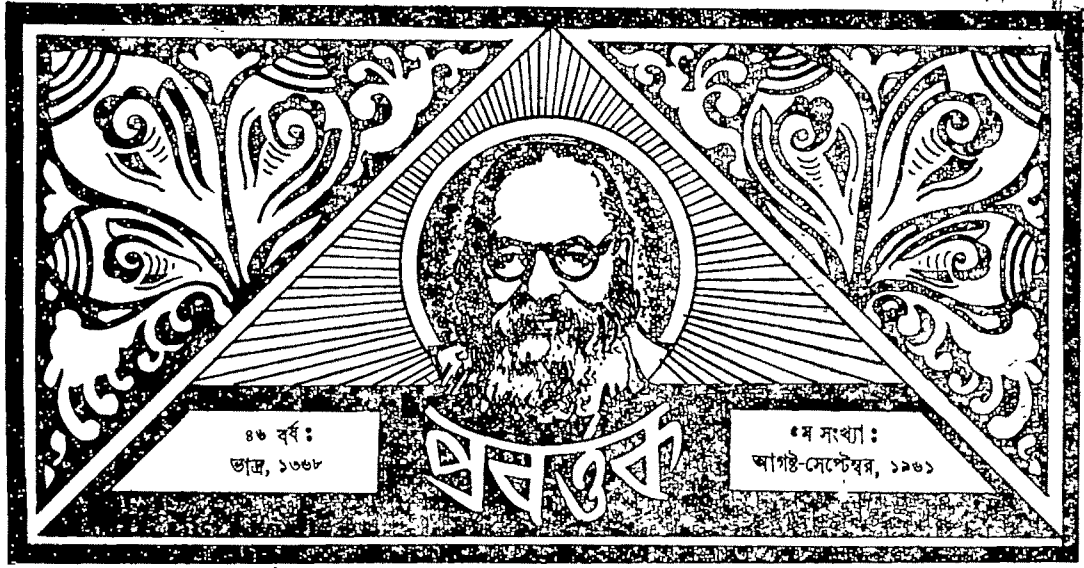
৩০শে আর্থিক সকাল ৭টার জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সঞ্চায় শ্রীমদবিন্দ জয়ন্তী, দুপুর সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীমদামরী দত্তের পৌরোহিত্যে। এই উপলক্ষে আনন্দমঠের কিছু অংশের অভিনয় হয়। বয়স্ক বয়স্করাও অভিনয় আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সঙ্গীত পরিচালনা করেন কণা দেবীভারতী।

শ্রীসমরজিৎ কর

## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।  
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণবাবু কর্তৃক মুদ্রিত।





## আলোর পথে

পৃথিবী যদি তার স্বভাব মূর্তি নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি যদি কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান জীবন ধারণ কর, তা হলে সকল পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের সত্যকেই জাগ্রত ও মূর্ত করে তুলবে। জগতের সকলেই রাজবেশে যদি দাঁড়ায়, তুমি মাহুষের আত্মার আজ যে দৈন্ত, তার সাক্ষ্য দিতে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কটিতটে জড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকো। সমস্ত পৃথিবী কলির প্রভাবে যদি আত্মহারা হযে ভোগবাদে বিভোর হয়, তোমার অটল পদ যেন এক মুহূর্তের জন্যও কঁপে না ওঠে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের অগ্নিমূর্তি জলন্ত রেখো। তোমার বদনে যেন ভোগের তরল-তরঙ্গ রেখাপাত না করে। চক্ষে আগুন, ললাটে সঙ্কল্পের চিহ্ন, ওষ্ঠপুট বন্ধ রেখে, হে বীর, হে ঈশ্বরপ্রণবী, তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্য হারিও না। হৃদয় যদি চঞ্চল হয় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত কর। নিত্য ভাগবত ভক্তের অল্পভূতি দিয়ে হৃদয় পূর্ণ কর। তবুও জগতের নখর সৌন্দর্য তোমায় যেন মুগ্ধ না করে। যদি ক্ষুধায় অন্ন না পাও, তবুও ভগবানের পথ থেকে যেন পদস্থলিত না হয়। বৃক্ষের পত্র, নদীর জল অঞ্চল ভরে পান করো। ভগবানের জ্ঞান তুমি নিঃস্ব, আড়ম্বরের মোহ যেন ভগবানের প্রেম থেকে তোমায় বঞ্চিত না করে। মৃত্যুপণ করেই এ পথে চলতে হয়। অজ্ঞান ভবিষ্যতের আকর্ষণেই যাত্রা শুরু কর। বর্তমানের বন্ধন যেন প্রতিরোধ না করে। প্রতি মুহূর্তে মহাকাল মৃত্যুর স্পর্শ দিয়ে আমাদের বিভুদ্ধ করে তুলছে। প্রতি মুহূর্তে ভোগের পঙ্কিল পক্ষে আমরা আবার মলিন হযে পড়ছি। জীবনমবণের এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দিব্যজীবনের নয়। সেখানে প্রেমের ফাণ্ডাম্ব সবখানি রাঙা হয়ে ওঠে। সেখানে এ মন, প্রাণ চলে না। নূতন মন-প্রাণ নিয়ে ছুটতে হয়। সর্বত্যাগী যে, সেই এ পথের সত্য অধিকারী। তার মন তো মন নয়—বৃন্দাবন, তার প্রাণ কুঠাহীন বৈকুণ্ঠ। শ্রীভগবানের সে যে লীলাক্ষেত্র। কে আজ এই নব জীবনের মধু আবাদ পেতে চায়? কার হিয়া আজ প্রেমের মলয় স্পর্শে তুফান তুলেছে! কে আজ আলোর পথযাত্রী, যাত্রা শুরু কর। দিব্যধাম যে তোমার সম্মুখে।

[ ১৯৩০ সালের দিনগিপি হইতে সংকলিত ]

সঙ্কলকৃত শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং । ) দশমী ঋক্

( সজ্ঞপ্তক শ্রীমতিলেব জীবন-ভাষ্য অমুসবণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ

হিরণ্যহস্তো অশ্বরঃ সুনীথঃ স্মূলীকঃ স্ববা যাহবর্বাঙ্ ।

অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থাদেব প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥ ১০ ॥

অর্থ—“হিরণ্যহস্তঃ” ( হিরণ্যহস্ত ) “অশ্বরঃ” ( প্রাণদাতা ) “সুনীথঃ” ( প্রকৃষ্ট নেতা, স্ব-নেতা ) “স্মূলীকঃ” ( পরম সুখদাতা ) “স্ববান্” ( ধনবান ) [ সং দেবঃ—সেই দেবতা ] “অর্বাঙ্” ( আমাদের মর্যাদা-মুখে ) “যাতু” ( গমন করুন ) “দেব” ( সবিতৃদেব ) “গৃণানঃ” ( আমাদের দ্বারা স্তুয়মান হইয়া ) “রক্ষসঃ” ( রক্ষার নিমিত্ত ) “যাতুধানান্” ( শত্রুদিগকে ) “অপসেধন্” ( দূরীকরণের জন্ত ) “প্রতিদোষং” ( দোষ সকল ) “অস্থান্” ( স্থিতবান্ ) ॥ ১০ ॥

সরলার্থ—হিরণ্যহস্ত, প্রাণদাতা, প্রকৃষ্ট নেতা, পরম সুখদাতা, ধনবান সেই দেবতা আমাদের মর্যাদা-মুখে গমন করুন । সবিতৃদেব আমাদের দ্বারা স্তুয়মান হইয়া আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের শত্রুগণকে দূর করুন, আমাদের দোষ সংশোধনার্থে আমাদের সহিত অবস্থান করুন ।

বিশদার্থ—সাধারণ প্রার্থনামূলক এই ঋক্ । প্রার্থনা—সেই দেবতার দেবতা—যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, চক্ষুর চক্ষুঃ, যিনি সূর্যের সূর্য সেই মূল আদিত্যদেবের নিকট । তিনিই প্রাণদাতা, প্রকৃষ্ট নেতা, পরম সুখপ্রদানকারী, কাবণ তিনিই সকল ধনের আকর—ধনাধিপতি—ঋষিগণ তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছেন । তিনিই আমাদের সমস্তরূপ কর্মক্ষেত্রে আগমন করুন—আমাদের রক্ষা করুন—আমাদের শত্রু—কেবলমাত্র বাহিরের শত্রু নয়—অন্তরের কাম ক্রোধাদি ষড়-রিপুকেও দমন করুন, দূর করুন, আমাদের সকল দোষ ক্রটি সংশোধন করিয়া আমাদের সহিত নিত্য অবস্থান করুন । আর্ঘ্য ঋষি সেই জীবনদেবতার সহিত পরম যুক্তিপ্ৰার্থী !



## ঋগ্বেদীয় গান

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বৃহতের সেই জ্যোতি উজ্জল, স্তম্ভজ ব্যাণ্ড

অখণ্ড আয়ু অক্ষয় যে শ্রবণ—

করহে ইন্দ্র আমাতে সংস্থাপন ॥

বৃহতের শ্রুতি সহস্রারের জ্যোতি

অল্পপ্রেরণা যত সব বেগবতী

আমাদের মাঝে ইন্দ্র কর ধারণ ॥

আমরা মন্ত্রে সত্যপ্রকাশিত্তী—

কল্যাণগামী, ঋক্ময় বসুমতী

সেই ইন্দ্রকে করিতেছি আবাহন ॥

আনন্দ অর্পণে অস্তরবাদী

ইন্দ্রের উদ্দেশে মহা তেজরাশি

আর্ঘ্য বোঝা করিছে প্রজ্ঞালন ॥



# গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

[ গত মাঘ ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশের অভ্যুদয়' শীর্ষক রচনার অন্তর্ভুক্তি ]

৩। দেবপাল দেব (৮১০—৮৫০ খৃঃ)

ধর্মপাল দেবের দুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদের নাম ত্রিভুবন পাল ও দেবপাল। ধর্মপালের খালিমপুর লিপির দৃতক ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবন পাল। ধর্মপালের মৃত্যুর পূর্বেই বোধহয় ত্রিভুবন পাল পরলোক-গত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বোধহয় ধর্মপালের মৃত্যুর পর রঞ্জাদেবীর গর্ভজাত অপর পুত্র দেবপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইয়া তিনি পিতার স্থায় পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পিতার স্থায়ই শক্তিশালী ছিলেন। তিনি পিতার অনধিকৃত অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গর্গের পুত্র দর্ভপাণি ও দর্ভপাণির পৌত্র কেদার মিশ্র তাঁহার মহামন্ত্রী ছিলেন (গরুড় স্তম্ভলিপি)। ধর্মপাল দেবের ভ্রাতা বাকপালের পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন (১), দেবপালের শাসন-লিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি নিরুপদ্রব (শাস্তিপূর্ণ) পিতৃরাজ্য “রাজ্যমাপ-নিরুপদ্রবঃ পিতুঃ” লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রণকুঞ্জরগণ বিদ্যাগিরিতে ও যুদ্ধাশ্রমসমূহ কাশ্মীর দেশে উপনীত হইয়াছিল। মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতিকৌশলে ও সেনাপতি জয়পালের রণচাতুর্য্যে একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ, একদিকে (পূর্বে) বরুণ নিকেতন, অপরদিকে (পশ্চিমে) লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন (ক্ষীবোদ সমুদ্র) পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াজ্ঞা, ভার্গব, কর্ণ ও বিক্রমাদিত্যের স্থায় দাতা ছিলেন। তাঁহার এই [মুদ্রের]-লিপি দ্বারা দেবপাল তাঁহার বিজয় রাজ্যের ৩৩ সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীনগর ভূক্তিতে ভূমিদান করিয়াছিলেন। যুবরাজ রাজ্যপাল এই তাম্রশাসনের দৃতক ছিলেন।

গরুড়স্তম্ভ লিপিতে রাজা দেবপালের বিজয়বার্তা আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রী কেদার

মিশ্রের মন্ত্রণাবলে গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকলকুল উৎকীর্ণিত, হুনগর্ক খর্বীকৃত, অবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের এই দিগ্বিজয় সম্বন্ধে নারায়ণপাল দেবের ভাগলপুর লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, দেবপাল দেবের আজ্ঞায় [তাঁহার সেনাপতি] “জয়পাল” (১) দিগ্বিজয়ে ধাবিত হইলে উৎকলপতি ভীত হইয়া বাজধানী ত্যাগ ও প্রাগ্জ্যোতিষ (কামরূপ)-পতি যুদ্ধ না করিয়াই বশুতা স্বীকার করিয়াছিল। এই কামরূপপতি বোধহয় হর্জুর অথবা তৎপিতা প্রলম্ব। উড়িষ্যার কর-রাজবংশীয় তৃতীয় রাজা মহারাজাধিরাজ শুভাকরের (৭২৫ খৃঃ) পুত্র মহারাজাধিরাজ শিবাকর বোধহয় এই সময় উৎকলরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই সময় হিমালয় প্রদেশের হুণদের একটি এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে কাশ্মীরের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির সহিত বোধহয় দেবপালের সৈন্যদলের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। [বড়া ও দৌলতপুর] শাসন হইতে জানা যায় যে, প্রতিহার নাগ-ভট্টের পৌত্র ও রামভদ্রের পুত্র ভোজ কান্তকুজ ও কালঞ্জর (৮৩৬ খৃঃ) ও গুর্জর রাষ্ট্র (৮৪৩ খৃঃ) অধিকার করিয়াছিলেন। এই ভোজের সহিত [৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পর] বিদ্যাপর্কতের কোন উপত্যকায় বোধহয় দেবপাল দেবের রণকুঞ্জরসমূহের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। অবিড়-নাথ বোধহয় পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ (৮১৫-৮৬২ খৃঃ)। এই পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করায় বোধহয় দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্য সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ষড়বংশীয় চন্দ্রেন্দ্ররাজ বিজয় বোধহয় এই অভিযানে দেবপালের সহায় হইয়াছিলেন। কারণ খাজুরাহো লিপিতে (Epi. Ind. Vol. V, 20) এই বিজয় রাজাকে স্তম্ভদের উপকারে দক্ষ “সুহৃৎপুত্র-

(১) [সম্ভবতঃ] এই জয়পালের নিকট ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশকার কাল্লিবিদ্যার নারায়ণ ভট্টের পূর্বপুরুষ উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন (ছন্দোগ পরিশিষ্ট প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

(১) নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপি।

দক্ষ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কতিপয় সাহসী রাজ্যব সহিত তিনি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন।

যবদ্বীপ, স্তবদ্বীপ ( সুমাত্রা ) ও মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত দেবপালের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল ভূভাগে শৈলেন্দ্র-রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ঐ রাজবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের অমুমতি ও তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়া দেবপালের নিকট দূত প্রেরণ করিলে দেবপাল ঐ প্রার্থনা পূরণ করেন [ দেবপালের ৩৯ বিজয় রাজ্যের নালন্দা শাসন ]।

তিনি নগরহার ( বর্তমানে জালালাবাদ ) নিবাসী হৈন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন ( ঘোষিরাবা লিপি )। বীরদেব তৎপূর্বে বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিয়া [ পুন্ড্রপুরে ] কণিকবিহারে আগমন করতঃ সর্বস্ব শাস্তি নামক বৌদ্ধাচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং প্রাচ্য ভারতে যশোবর্ষপুত্র বিহারে অবস্থান করতঃ রাজা দেবপাল কর্তৃক পুজিত হন ( ঘোষিরাবা লিপি )।

দেবপাল দেবের মহাদেবীর নাম জানা যায় না। নারায়ণপাল দেবের তাম্রশাসনে দেবপালের নাম উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার মহাদেবীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ হয় নাই।

৪। শূরপাল দেব ( ৮৫০ খৃঃ ) ও

৫। বিগ্রহপাল দেব ( ১ম ) ( ৮৫১-৫৪ খৃঃ )

মহাদেবী লজ্জাদেবী।

দেবপাল দেবের মৃত্যুর পর কে পাল-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তাহা লইয়া মতবিবাদ আছে। দেবপালদেবের ৩৩ বাজ্যাব্দের মূদ্রলিপি বর্ত্তক ছিলেন যুবরাজ রাজ্যপাল। এই যুবরাজ বোধহয় দেবপালের জীবদ্দশাতেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। গরুড়-স্তম্ভলিপিতে দেবপাল দেবের পর শূরপাল নামক রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত লিপির ১৫শ

শ্লোকে লিখিত আছে "সেই বৃহস্পতি প্রকৃতি [ কেদার মিশ্রের ] যজ্ঞরূলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রভুল্য শত্রুসংহাবকারী নানাসাগর মেখলাভরণ বহুক্ষার চিরকল্যাণকারী ক্রীশূরপাল নৃপতি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, বহুবাদ শ্রদ্ধাধিত স্বদয়ে নতশিরে পবিত্র [ শাস্তি ] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকে রাজা শূরপালকে দেবরাজ ইন্দের সহিত ও কেদার মিশ্রকে দেবরাজের পুরোহিত বৃহস্পতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, শূরপাল দেবের শাসন সময়েও বরেন্দ্রমণ্ডলে যাগযজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইত এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধামহকারে শাস্তিবারি গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে প্রজাগণের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করিতেন।

নারায়ণপালদেবের শাসনলিপিতে দেবপালের পর বিগ্রহপালের নাম লিখিত থাকায় কেহ কেহ শূরপাল ও বিগ্রহপালকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। এবং আরও মনে করেন যে, এই বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র। কিন্তু নারায়ণপালের লিপির ৭ম শ্লোকের "তৎসুগু" পদের "তৎ" শব্দে "জয়পাল"কে বুঝায় বলিয়া মনে করাই সম্ভব (১) আমাদের এই মত সত্য হইলে শূরপালকে বিগ্রহপালের নামান্তর গ্রহণ করিবার কষ্টকল্পনার আবশ্যক হয় না। মনে হয় [ সম্ভবতঃ দেবপালের অন্ত্যস্তম পুত্র ]

(১) নারায়ণপাল দেবের শাসনলিপির ৪র্থ শ্লোকে বলা হইল "রামেশ্বর গৃহীত সত্যতপসঃ তস্ত্রাস্ত্রপোশুণৈঃ সৌমিত্রৈরদপাতিভুল্য-মহিমা বাক্‌পালনামাশ্রয়ঃ। যঃ \* শূন্তাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাত-পত্রাশিশঃ। (৪) তস্ত্রাৎ \* পুত্রোবভূব বিজয়ী জয়পালনাম। \* \* দেবপালে যঃ পূর্বে ভুবনরাজ্যে স্থাপিতনৈবীং। (৫) যস্মিন্ ভ্রাতৃনির্দেশা-ধ্বলতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুশাশঃ \* \* নিম্নপুর মজ্জহাস্তবকলামধীশঃ। আশাঞ্চক্রেচিরায \* \* বিত্ররুচেন মুর্খা রাজ্যপ্রাগ্‌জ্যোতিষাণাঃ \* \* যজ্ঞচাজাং ॥ (৬) শ্রীমান্ বিগ্রহপালন্তৎসুহরজাতশত্রুরিদজাতঃ।" (৭) অর্থাৎ জ্ঞেয় সত্যত্রতধারী রাসের অমুগ্ন সৌমিত্রীব অমুগ্নপ তাঁহার ( ধর্ম-পালের ) বাক্‌পাল নামক এক অনুজ জন্মিয়াছিলেন। যিনি দশদিক শত্রুপতাকাশূণ্য করিয়া একাতপত্র করিয়াছিলেন। তাহা হইতে [ সেই বাক্‌পাল হইতে ] জয়পালনামা বিজয়ী পুত্র জন্মিয়াছিলেন। যিনি পূর্ব্বে দেবপালকে ভুবনরাজ্যে স্থাপিত অধিকারী করিয়াছিলেন (৫)। প্রজাতাব্দের [ প্রজাতিপ্রাতার ] নির্দেশক্রমে সেই বলবান্ [ জয়পাল ] দিখিজয়ে

শুবপাল কিছুদিনের জন্ত রাজা হইয়াছিলেন। এবং তিনি পরলোকগত হইলে অল্প নিকটতম উত্তরাধিকারীর অভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ধর্মপালের ভ্রাতা বাকুপালের পুত্র জয়পালের শাখায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কথা বুঝাইবার জন্ত ধর্মপাল ও দেবপালের শাসন-লিপিতে বাকুপাল ও জয়পালের কোন উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও নারায়ণপালের শাসনে ধর্মপালের শাখায় শুবপালের উল্লেখ না করিয়া বাকুপাল ও জয়পালের নাম ও কীর্ত্তি-কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে, যেন তাঁহাদের বাহুবলেই পালসাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নারায়ণপালের শাসনের দূতক ভট্টওরব মিশ্র ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভলিপিতে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী এক্রপভাবে বর্ণিত করিয়াছেন যেন তাঁহাদের জন্তই ধর্মপাল ও দেবপালের রাজ্যবিস্তার ও দিগ্বিজয় সম্ভব হইয়াছিল। বিগ্রহপাল জয়পালের পুত্র না হইলে বাকুপাল ও জয়পালের এক্রপভাবে উল্লেখ অগ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে।

হৈহয় [ কলচুরী ] রাজকুমারী লজ্জাদেবীর সহিত বিগ্রহপালের (১ম) বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বোধহয় বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বিগ্রহপাল “আমার পক্ষে তপস্তা ও তোমার পক্ষে রাজ্য” এইরূপ বলিয়া পুত্র নারায়ণপালকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্ভাত্রী হইয়াছিলেন। এই সময় উৎকলে করবাজবংশ ধ্বংস করিয়া শৈলেন্দ্র বংশের সৈন্যভীত মাধবধর্ম্য (৮৫০ খৃঃ) ও কামরূপে হর্জর মহারাজাধিবাজ উপাধি লইয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

৬। নারায়ণপাল (৮৫৪-৯০৮ খৃঃ)।

মহারাজাধিবাজ নারায়ণপাল দেব তাঁহার বাজ্যের

প্রধান করিলে উৎকলপতি নিজ রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগজ্যোতিষপতি তদীয় উচ্চ মন্তকে ষাঁহার [ জয়পালের ] আজ্ঞা ধারণ করিয়া চিরকাল [ পরম হৃৎখে ] অতিবাহিত করিয়াছিলেন (৬)। তাঁহার [ জয়পালের ] অজ্ঞাতশত্রুর ছায়া আঁঘান বিগ্রহপাল নামক পুত্র অসিদ্ধাছিলেন।

১৭শ বর্ষে ৯ই বৈশাখ তারিখে তীরভুক্তির (মিথিলা) অন্তর্গত কক্ষ বিষয়ের মুকুতিকাগ্রাম, কলসপোত নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও পাশ্চপতাচার্য্য পরিষদের জন্ত তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। কেদার মিশ্রের পুত্র ভট্টওরব মিশ্র এই শাসনের দূতক ছিলেন (তাঁহার রাজ্যের ৭ম ও ৯ম রাজ্যাব্দের শাসনগুলি মগধে প্রদত্ত হইয়াছিল (১)। ৮৩৬ খৃঃ প্রতিহার মিহিরভোজ (৮৩৬—৮৮৬ খৃঃ) কালঞ্জর ও কান্তকূজ অধিকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নারায়ণপালের ৯ম রাজ্যাব্দের (৮৬৩ খৃঃ) পর ও ৮৬৭ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে মিহিরভোজ কলচুরী (চেমী বা হৈহয়) স্তম্ভাধোদেব (২) ও মাণ্ডব্যপুত্রের প্রতিহারবংশীয় কঙ্কের (৩) সহিত মিলিত হইয়া গৌড়বঙ্গদিগকে মুঙ্গাগিরির যুদ্ধে পরাজিত করেন (১)। কিন্তু ৮৬৭ খৃঃ গুর্জরপতি ইন্দ্রের পৌত্র রাষ্ট্রকূট ধ্রুবধারাবর্ষ (২) কর্তৃক পরাস্ত হইয়া এতদঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন (Indian Antiquary, Vol. XII, p. 184) পুনরায় মিহিরভোজের (আদিবরাহ) পুত্র মহেন্দ্রপালের (৮৮৬-৯১৭ খৃঃ) ২, ৮ ও ৯ ও ১২ রাজ্যাব্দের প্রস্তরলিপিস্থলি মগধে ও ৫ রাজ্যাব্দের লিপি বরেন্দ্রে (পাহাড়পুর ৮৮৭ খৃঃ হইতে ৮৯৪ খৃঃ মধ্যে) আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ সময় মহেন্দ্রপাল সমগ্র বিহার ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আবার নারায়ণপালের ৫৪ রাজ্যাব্দের (৯০৮ খৃঃ) লিপিস্থ মগধে (উদগুপুরে) প্রতিষ্ঠিত পিতৃলময়ী পার্বতীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় ঐ সময়ের পূর্বেই নারায়ণপাল মগধ ও বারেন্দ্র পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট অমোঘবর্ষের (১ম) পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ অকালবর্ষ (৮৮০-৯১৪ খৃঃ) বোধ হয় এই সময় হয় গৌড়গণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ দেউলি তাম্রশাসনে কৃষ্ণ (২য়)-কে “গৌড়ানাং

(১) নারায়ণপালের ৭ম রাজ্যাব্দের পরায় ভাণ্ডদেব কর্তৃক আশ্রম এবং ৯ম রাজ্যাব্দে উদগুপুরে একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (Memoirs of A. S. B. Vol. V. p. 60)।

(২) স্তম্ভাধোদেবের বর্ষ পুরুষ অধস্তন সোমদেবের ১১০৪ বিক্রমাব্দের (১০৭৬ খৃঃ) কাঙ্কালিপি।

(৩) কঙ্কপুত্র বড়িকের ৪র্থ রাজ্যাব্দের দোণপুর (মাণ্ডব্যপুর) শিলালিপি (৮৮০ খৃঃ) ততোধিক শ্রীমন্তঃককঃ পুত্রোষাতো মহামতিঃ। বশোমুদগিরৌ লক্য যেন গৌড়ঃ সমঃ যথৈ ॥”

বিনয় ত্রতাপর্ণশুক" ও অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধকে তাঁহার আদেশপালক বলা হইয়াছে। এই অভিযানে বোধহয় বেলানাদু (কৃষ্ণা জেলার) সামন্ত প্রথম মল্ল দ্বিতীয় কৃষ্ণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কারণ প্রথম মল্লের পীঠপুরম্ লিপিতে তিনি বঙ্গ, গোড় ও মগধগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অবশেষে বোধহয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র গঙ্গভূদ্রের কন্তা ভাগ্যদেবীর সহিত নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের বিবাহ দ্বারা রাষ্ট্রকূট গোড় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে (প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপি, ৮ম শ্লোঃ)।

#### ৭। রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০ খৃঃ)

মহাদেবী ভাগ্যদেবী।

রাজ্যপালদেবের ২৪, ২৮, ৩১ ও ৩২ রাজ্যদেবের লিপি নালন্দা ও কুর্কিহারে (মগধ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্ত্বজ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত্র ইন্দ্র (৩য়) (নিত্যবর্ষ) রাজা হন। তিনি প্রতীহার মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী কাঞ্চকুজ ধ্বংস করেন এবং ইন্দ্রে (৩য়) সামন্ত নরসিংহ যমুনা পার হইয়া পলায়নপর্ব মহীপালকে অহমসরণ করিতে করিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (কানাড়া ভাষায় পম্পারাজ-রচিত "কর্ণাটক শকাব্দশাসন" Edited by Lewis Rice, পৃঃ ২৬)। রাজ্যপালদেব অগাধ জলধি-মূলতুল্য গভীর গর্ভবিশিষ্ট জলাশয়ের ও কুশাচলতুল্য সমুচ্চকক্ষ সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন (প্রথম মহীপাল দেবের বাণগড় শাসনলিপি)।

#### ৮। গোপালদেব (৯২০-৯৬০ খৃঃ)।

গোপাল দেবের রাজ্যের প্রথম বর্ষে নালন্দায় একটি বাগীশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বারেন্দ্র (জাজিল পাড়ায়) তাঁহার রাজ্যের ৬ষ্ঠ বর্ষে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও পঞ্চদশ রাজ্যাব্দে মগধে বিক্রমশীল বিহারে একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ অঙ্কলিখিত হইয়াছে। (J. Royal, A. S. 1910, p. 150-51)।

সম্ভবতঃ এই সময়ে চন্দ্রেন্দ্ররাজ ষড়বংশীয় যশোবর্মা হিমালয় হইতে মালব ও কাশ্মীর হইতে গোড় পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাপথে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং বিখ্যাত কালঙ্ঘ্য দুর্গ অধিকার করিয়া উত্তরাপথে প্রবল হইয়া উঠেন। তৎপুত্র বঙ্গদেব (৯৫৪-১০০০ খৃঃ) রাঢ় ও অঙ্গরাজ মহিষীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন (খাজুরাহো লিপি)। কলকুরীরাজ ও যুবরাজ (১ম) ও তৎপুত্র লক্ষ্মণরাজ গোড়, বাঙ্গালা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, লাট ও কাশ্মীরে অভিযান করেন (বিলহারী লিপি ও গোহরবা শাসন)। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কান্তিদেব নামক এই সময়ের একজন বৌদ্ধ মহারাজাধিরাজের (ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত) একখানি অসমাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি হরিকেল (বঙ্গ) ও বর্দ্ধমানভুক্তিতে রাজত্ব করিতেন এবং বর্দ্ধমানপুর জয়স্বন্দ্যাবার হইতে শাসন প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই শাসনে লিখিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রী বিদুরতি বাজকন্তা ছিলেন। মনে হয় চট্টগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদপীঠ-লিপি হইতে জানা যায় যে এই সময়ে কুমিল্লায় লয়চন্দ্র নামে একজন রাজা অন্যান্য ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ এই চন্দ্রবংশেরই রাজা পূর্বচন্দ্রের পুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ (বর্তমান বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ও হুমরাবন) ও বিক্রমপুর রাজ্যের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন ('শ্রীচন্দ্রদেবের ৪৪ রাজ্যাব্দে প্রদত্ত মদনপুর লিপি' ভারতবর্ষ : ১৩৫৩ সাল অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫১৪)।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে তৎকালে পাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দৌর্দল্যই স্ফুটিত হয়।

বরেন্দ্রের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বার্পপুরের নিকটবর্তী রাজীমপুর গ্রামের একটি সনাতন মূর্ত্তিব পাদপীঠ লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ মূর্ত্তিটি পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপাল দেবের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে মন্ত্রী শ্রীপুণ্ডরিক কল্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

৯। বিগ্রহপাল—২য় (৯৬০-৯৮৮ খৃঃ)।

১০। (ক) কাষোজরাজ গৌড়পতি (নরপাল-দেব—১ম)।

দ্বিতীয় গোপালের পর তৎপুত্র বিগ্রহপাল রাজা হন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য নিকটক ছিল না। বাণগড়ের একটি শিবমন্দিরের প্রস্তরলিপি (১) হইতে জানা যায় যে, কুঞ্জরঘটাবর্ষ উপাধিযুক্ত কাষোজরাজ গৌড়পতি কর্তৃক ঐ মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল।

এই কাষোজরাজ গৌড়পতির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের মতে ইন্দ্রা শাসনের দাতা মহারাজাধিরাজ নরপাল-দেবই (২) এই “কাষোজরাজ গৌড়পতি”। এই ইন্দ্রা শাসনখানি “ঐ নমঃ শিবায় স্বস্তি” বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, নরপালদেবের পিতা পরমসৌভাগ্য ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা

(১) “কাষোজরাজে নরগৌড়পতিনা তেনেন্দ্রমৌল্যেবঃ শ্রাসাদো নিরমারি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ ॥”

“কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ” পদ দ্বারা গৌড়পতির উপাধি বুঝাইতে পারে। অথবা উহার অর্থ ৮৮৮ শকাব্দও (৯৬৫-৯৬৮ খৃঃ) হইতে পারে। অথবা উহা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে।

(২) “... ... নরপালদেবঃ লঙ্কোদয়ো ভ্রাতুরনন্তরঃ যঃ শ্রীমন্ সমাসাদ্য বুরাসদোহভূৎ অন্তাচলং চন্দ্রমসিগ্রন্থে দিবঃ বিবধানিব সার্বমানঃ ॥ যেন বিধান গণিতানি মহাবলানি নাপেক্ষিণা পরিজ-জমোপি সমীপে। একাকীনৈব ভুজমন্দর-মধ্যমানোলকাঃ সমিঞ্জলধেঃ শতশো জয়শ্রীঃ ॥ পরম সৌভাগ্যে পরম রাজাধিরাজো পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীরাজ্যপালদেব পদানুধ্যাত পারমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধি-রাজঃ শ্রীমান্ নরপালদেবঃকুলী। শ্রীবর্দ্ধমানভুজ্যন্তঃপাতি দন্তভূক্তি-মণ্ডলে” ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি ভ্রাতা নারায়ণপালের পর লঙ্কাদর হইয়া [রাজ্য]-লক্ষী লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি চন্দ্র অন্তাচলগামী হইলে সূর্য যেমন আকাশে উদ্ভিত হইয়া অনতিক্রম্য হইয়া উঠে সেইরূপ [অনতি-ক্রম্য] হইয়াছিলেন। যিনি শত্রুর মহাবলকে গণ্য করিতেন না এবং নিকটবর্তী বজ্রগণের [সাহায্যের] ক্ষমতা অপেক্ষা করিতেন না, যিনি একাকী নিজ ভুজকপ মন্দর পর্বত দ্বারা সমরঙ্গলধি মন্থন করিয়া শত যুদ্ধে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, পরমনৌগত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীরাজ্যপাল দেবের পদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজা-ধিরাজ সেই শ্রীমান্ নরপালদেবঃকুলী ইত্যাদি।

নারায়ণপাল বাহুদেবপাদান্ পূজানিরত মানসঃ হইলেও নরপাল স্বয়ং শৈব ছিলেন। উক্ত তাম্রশাসনে বলা হইয়াছে যে, কাষোজবংশ তিলক পরম সৌগত পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল হইতে তৎপত্নী ভাগ্যদেবীর গর্ভে নারায়ণপাল ও নরপাল জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ “ক্ষতিপঃ” নারায়ণ পানের পর নরপাল রাজশ্রী লাভ করেন। তদীয় রাজ্যের ১৩শ বর্ষে শ্রীরাজ্যপালদেব পাদানুষ্ঠিত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ নরপালদেব প্রিয়ঙ্গু রাজধানী হইতে বর্দ্ধমান-ভুক্তান্তঃপাতী দন্তভূক্তি-মণ্ডলে বৃহচ্ছত্রাবর্ণাগ্রাম বাণ্ডগোত্র অশ্বখ শ্রম্মাকে দান করেন। এই পরম সৌগত কাষোজ-কুলতিলক মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালদেব কে ছিলেন? গৌড়েশ্বর নারায়ণপালদেবের পুত্র পরম সৌগত মহারাজা-ধিরাজ রাজ্যপালদেব এবং এই রাজ্যপালদেব উভয়ের ‘পাল’ উপাধি, পরম সৌগত ও পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ বিশেষণ এবং উভয়ের জ্যৈষ্ঠ নাম ভাগ্য-দেবী দৃষ্টে এই অনুমান অনিবার্য হইয়া উঠে যে, উভয় রাজ্যপাল এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে ইন্দ্রা-লিপিতে রাজ্যপালকে “কাষোজ-কুল-তিলক” বলা হইয়াছে কেন? দেবপালের মুদ্রলিপিতে জানা যায় যে, দেব-পালের সৈন্তগণ কাষোজ দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। মনে হয় দেবপালের দিগ্বিজয়কালে তাঁহার আজ্ঞায় সেনাপতি জয়পাল কাষোজ দেশে (১) উপস্থিত হইলে

(১) মহাভারত যোগপর্বে (৪।৫) কাষোজগণের রাজধানীর নাম রাজপুর বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের দক্ষিণে যে রাজ্যবী গ্রাম আছে, কানিংহামের মতে তাহাই ‘রাজপুর’। কাশ্মীর ও পঞ্জাবের মধ্যবর্তী গিরিমালাবেষ্টিত চম্বা রাজ্য ও চতুর্পার্শ্ববর্তী ভূভাগ লইয়াই বোধ হয় সেকালের কাষোজ রাজ্য ছিল। এই চম্বারাজ্যে প্রাপ্ত একখানি বোধিত লিপির পাঠ কিলহর্ন সাহেব ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারী পত্রিকার ১৭শ খণ্ডে (পৃঃ ৭১৩) মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ লিপিতে চম্বারাজ সাহিন্দেবের (খৃঃ নবম শতক) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, “কুরুক্ষেত্রে রাহপরাগ সময় সমর্পিত—মদগঙ্গলুক-মধু কর-কুলাকুল-কপোল-কলক-করি-ঘটা-দার-শ্রীতিপ্রসন্ন-মানস ভগবন্তাস্ত্রবাভিনন্দিত নিজাম্বর প্রভৃতি পরম্পরা-সার করিবর্ধাভিধানাভূষত” অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে মদগঙ্গলোভী ভ্রমরকুল ‘করিঘটা’র কপোলদেশে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রাহগ্রস্ত সূর্যের ভ্রম উপপাদন

তথ্য তাঁহার পৌত্র নারায়ণপালের সহিত কাঞ্চোজরাজ-কন্টার বিবাহ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কোন লিপিতে এই নারায়ণপালের মহিবীর নাম উল্লিখিত হয় নাই। আমাদের অনুমান সত্য হইলে নারায়ণপালের পুত্র রাজ্য-পালের মাতামহকুলকে লক্ষ্য করিয়াই ইদ্রা শাসনে রাজ্য-পালকে “কাঞ্চোজকুলতিলক” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য হইলে ধবিতে হব যে, বাজ্যপালদেবের তিন পুত্র ছিল, যথা—গোপাল (২য়), নারায়ণপাল ও নয়পাল (১ম) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপাল (২য়) সাম্রাজ্য সিংহাসন লাভ করেন এবং নারায়ণপাল (২য়) দণ্ডভুক্তি সামন্তরাজ পদ ও তাঁহার পর নয়পাল (১ম) ঐ পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ২৬০ খৃঃ গোপালদেব (২য়)-এর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বিগ্রহপাল (২য়) গোড়-সাম্রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু এই সময় নয়পাল (১ম) প্রবল হইয়া উঠিয়া গোড়দেশ (বরেন্দ্র ও রাঢ়) হইতে বিগ্রহপাল (২য়)-কে বিতাড়িত করিয়া মহারাজ্যধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া গোড়পতি হন ও বাণগড়ে (বরেন্দ্রে) শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বিতাড়িত বিগ্রহপাল (২য়) সম্ভবতঃ মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অজ, মগধ ও মিথিলা শাসন করিতে থাকেন। মগধের কুর্কিহায়ে স্থাপিত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ৩য় রাজ্যাব্দের একখানি, ও ১৯ রাজ্যাব্দের দুইখানি মূর্তিলিপি পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালের পুত্র প্রথম মহীপালের বাণগড়লিপিতে পিতার কোন বীরকীর্ত্তি উল্লেখ নাই। ঐ লিপিতে তাঁহাকে সূর্য্য হইতে চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্ম তাঁহাতে কলাময়ত্বের আরোপ করিয়া তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের

করিয়াছিল। সাহিলদেব সেই করিখটার বিনাশ সাধন করাব ভগবান সূর্য্যদেব প্রসন্নচিত্ত হইয়া সাহিলদেবকে তদীয় বংশানুক্রমে “করি (খটা) বর্ব” উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

এই লিপি হইতে আরও জানা যায় যে, সাহিলদেবের বংশীয় শালবাহনদেবের পাঁচামুখ্যাত শ্রীসোমবর্ষদেব ও তৎপুত্র আসটদেব কাশ্মীররাজ অনন্ত (১০২৮—১০৬৩ খৃঃ) ও কলদেব (১০৬৩—১০৮৯ খৃঃ) সমসাময়িক (রাজতরঙ্গিণী) ৭।২১৮ ও ৫৮৭—২০ শ্লোঃ)। সাহিলদেবের কন্টার সহিত হরত নারায়ণপালের বিবাহ হইয়াছিল।

ইঙ্গিত করা অসম্ভব নয় (১)। নয়পাল (১ম) রাঢ় ও বরেন্দ্র অধিকার করিবার পর বোধহয় দণ্ডভুক্তি বর্তমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেইজন্যই তাত্ত্বশাসনে দণ্ডভুক্তিকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

১০। মহীপালদেব—১ম (৯৮৮-১০৩৮ খৃঃ)

মহীপালদেবের ২ম রাজ্যাব্দে প্রদত্ত তাঁহার বাণগড় তাত্ত্বশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়া অনধিকারী দ্বারা বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য “অনধিকৃত-বিলুপ্ত রাজ্যামাশ্রয় পিত্র্য” উদ্ধার করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। এই অনধিকারী যে কাঞ্চোজাধ্বজ গোড়পতি নয়পালদেব (১ম) তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রামের একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠের লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা মহীপালদেবের ৩য় সম্বৎসরে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং মহীপালদেব তাঁহার রাজ্যের তৃতীয় বর্ষ মধ্যেই বরেন্দ্র ও সম্ভবতঃ উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া সমতটের ঐ অংশ

(১) প্রসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের ‘বিধি বিবেক’ নামক সীংহাসনা গ্রন্থে ‘জ্ঞানকণিকা টীকার বাক্যের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে উদাহরণরূপে লিখিয়াছেন “নিজভুক্তবর্ষমাষ্টায় শুরাণি শুরো জয়তি” (জ্ঞানকণিকা, বাণী সংস্করণ, পৃঃ ২৯০)। অর্থাৎ নিজ বাহুবেলে নির্ভব করিয়া আদিশুর শুরগণকে জয় করিতেছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭৭ ভাগ, ৬৮ পৃঃ)। বাচস্পতি মিশ্রের ‘জ্ঞান হুটী নিবন্ধ’র নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তিনি ৮৯৮ শকে (৯৭৭ খৃঃ) উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

“জ্ঞানহুটী নিবন্ধোৎসাহকারি হুয়িয়াং মুদে। শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ বন্ধক বহুবৎসরে” ॥ [হুয়ীগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র ৮৯৮ (শক) বৎসরে এই জ্ঞানহুটী নিবন্ধরচনা করিয়াছেন]। অধ্যাপক পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র গুপ্তাচার্য্যের মতে-বাচস্পতি মিশ্র ষষ্ঠীয় দশম শতকের লোক। সুতরাং জ্ঞানহুটী নিবন্ধের রচনাকাল ৮৯৮ সম্বৎসর মিথিলা ও পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত শকাব্দ বটে। অতএব আদিশুরের আবির্ভাব ৯০৭ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। ইহা রাজ্যপালদেবের (৯৮৮-৯৯০ খৃঃ) রাজ্যকাল। তীক্ষ্ণমলয় লিপির দক্ষিণরাঢ়পতি রণশুর সম্ভবতঃ আদিশুরের প্রপৌত্র ছিলেন। সম্ভ্যাকব নন্দীর রাম-চরিতম্ কাব্যে উল্লিখিত মন্দারাবিপতি (হুগলী জেলার আরামবাগ থানাব গড়মন্দারগণের রাজা) লক্ষ্মীশুরও সম্ভবতঃ এই বংশীয় ছিলেন।



পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাণগড় শাসন দ্বারা পৌণ্ড বর্দ্ধনভূক্ত্যন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ে কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী শ্রীবামনভট্ট ইহার দূতক ছিলেন।

১০২১ হইতে ১০২৩ খৃঃ মধ্যে [ কৃষ্ণ ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী ] চোলদেশের-রাজা রাজেন্দ্র চোলের সেনাপতি গঙ্গাজল আহরণের জন্ত অভিযান করেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দুর্গম ওড়বিষয় ও মনোরম কোশল নাড়ু অধিকার করিবার পর ভীষণ যুদ্ধে রাজা ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ উদ্যান-বিশিষ্ট দণ্ডভুক্তি, রাজা রণশূরকে (১) পরাজিত করিয়া সকল দিকে প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়, রাজা গোবিন্দ চোলকে যুদ্ধকালে গঙ্গপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সেধান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন সেই অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি-পূর্ণ বাদলা দেশ এবং কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাছুকা ও বলয় বিভূষিত রাজা মহীপালকে যেখানে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়নে বাধ্য করিয়া তদীয় অদ্ভুত বলশালী কন্নীসমূহ ও রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করা হইয়াছিল সেই সাগরের ত্রায় রত্নসম্পন্ন “উত্তর রাঢ়” অধিকার করিয়া বালুকাময় তীর্থধোতকারিণী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

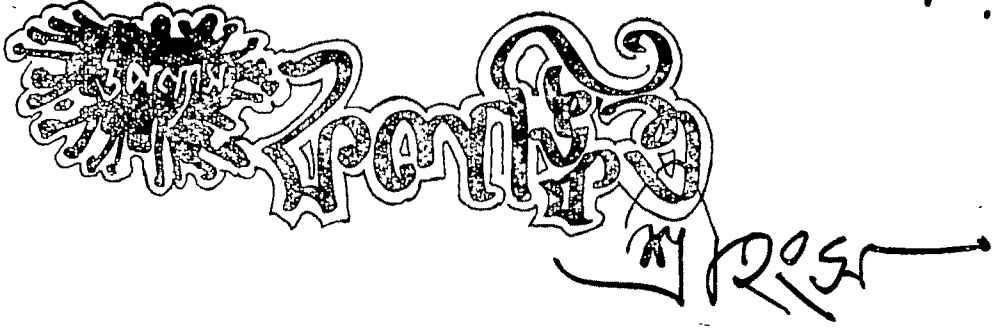
দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল বোধহয় কাষোজ্জ্বলরাজ গোড়পতি (১ম) নয়পালদেবের বংশধর ছিলেন, এবং মহীপাল (১ম) কর্তৃক ত্যাগিত হইয়া নিজের মূল রাজ্য দণ্ডভুক্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিদাম্বরমেব নটরাজ মন্দিরের গাঙ্গে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে (Epi. Ind., Vol. V., P. 105) যে রাজা রাজেন্দ্র চোল কাষোজ্জগণের নিকট উক্ত শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি (কাষোজ্জ্বলরাজ) উক্ত ধর্ম্মপালের নিকট হইতে বোধহয় উহা হস্তগত করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা রণশূরও বোধহয় আদিশূরের বংশীয় ছিলেন।

১০২৬ খৃঃ (১০৮০ সন্থং) সারনাথ লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, গোড়েশ্বর মহীপালদেব বারাণসীধামে অল্পজ স্থিরপাল ও বনস্তপাল দ্বারা ঈশান (শিব) ও চিত্রঘট (দুর্গা) প্রভৃতি শত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাক্ষের কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি মিথিলায় (মজঃফরপুর জেলায়) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ১১ রাজ্যাক্ষ নালন্দায় কতকগুলি ভগ্নমন্দিরে পুনঃ-নির্মাণ ও সংস্কার সাধিত এবং বোধিগয়ায় দুইটি মন্দির নির্মিত হয়। ইহা হইতে অস্বীকৃত হইতেছে যে, ১০২৬ খৃঃ মধ্যে মহীপালের রাজ্য মগধ ও মিথিলা অতিক্রম করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে কলচুরি গাঙ্গেয়দেব গোড়পতি মহীপালের সহিত অঙ্গদেশে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন গোঁহারবা ভাষ্যশাসন (Epi. Ind. XI, P. 153, V.17)। বাইহাকি বলেন যে, নিয়ালতিগিন কর্তৃক ১০৩৪ খৃঃ বারাণসী আক্রমণের সময় গাঙ্গেয়দেব (জানা রাজ্যকাল ১০৩৭ খৃঃ) বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ মহীপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার এই ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছিল।

এই সময় দক্ষিণ রাঢ়ের ভূরীশ্রেষ্ঠী নিবাসী শ্রীধর ভট্ট তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ত্রায়কন্দলী’ রচনা করেন। ত্রায়কন্দলীর সমাপ্তি গুণ্ডিকায় লিখিত আছে “ত্রায়িকন্দলীস্তর নব শকাব্দে ত্রায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রী পাণ্ডুদাস কায়স্থ যাচিত ভট্ট শ্রীধরেন সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রকাশ ত্রায়কন্দলী টকা।” ইহা হইতে জানা যায় উক্ত টকার সমাপ্তিকাল ৯১৩ শক (৯৯১ খৃঃ)।





(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

...একটা ব্যাপার এবার পরিষ্কার হল। সেই দুর্ভোগ রাজিশেষে কালিদা কেন অত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মায়ের কথা মনে করে, কেন কাউকে কিছু প্রশ্ন করবার স্বেচ্ছা না দিয়েই অকস্মাৎ ভোরের ট্রেনে কলকাতা রওনা হল কালিদা। কেন পার্টি পরিচালনভাব দিয়ে গেল কল্যাণীর উপর—সব যেন বুঝতে পারছি এবার। আমার একটু অভিমান হয়েছিল বৈকি। কল্যাণী অল্পদিনের কিন্তু আমি দীর্ঘদিনের। বলতে গেলে আমিই প্রথম। কালিদার অল্পপস্থিতিতে বরাবর আমার উপরই থাকত পার্টির ভার। এবার কেন কল্যাণী? আজ বুঝতে পারছি কেন কল্যাণী সেদিন অতখানি মর্দাদা পেল। দুদিন যেতে না যেতেই কিন্তু কল্যাণীর নেতৃত্বে কিছুমাত্র বিরাগ রইল না আমাদের। ওর নেতৃত্বটা ছিল ঠিক ভরতের রাজ্যশাসন। প্রতি বধায়, প্রতি কর্মে ও স্মরণ করিয়ে দিত কালিদাকেই। ওর নির্দেশ কালিদার আদেশরই প্রতিধ্বনি। ও কায়েন মনসা বাচা কালীকঙ্করাহুগ।

আজ কালিদার এ আত্মকাহিনী পড়ে বুঝতে পারছেন কল্যাণী ওকে শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাই করত, না ঘৃণা। কিন্তু আমরা যেটুকু দেখেছি তাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি সেদিন। কালিদার অগ্নিপরীক্ষা নিল যে কল্যাণী, যে কল্যাণীর কাছে কালিদার হল চূড়ান্ত পরাজয় সে কল্যাণীকে আমরাও চিনি, হয়তো ইতিহাসও জানবে না কোনদিন।

সেবার বেহারের মহামারীতে হল হাজার হাজার অমূল্য জীবনের অবমান, আর কালিদা হয়ে রইল ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল। বিহার কালীকঙ্করকে ভুলবে না।

ভুলিনি আমরাও। অতখানি শ্রম, এতদিকে দৃষ্টি, অত দরদ একটা মানুষে যে কি করে সম্ভব হয় তা আমরা বিশ্বাসই করতে পারতুম না সেবার বিহারের কালীকঙ্করকে না দেখলে।

মায়ের কাছেই ফিরে এসেছিল কালিদা, কিন্তু মাকে আর ফিরে পেল না। মাত্র তিনদিনের জ্বরে সব শেষ হয়ে গেল। মাকে হারিয়ে কালীকঙ্কর যতো না কাঁদল তার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদল দেশবাসী মা-হারী কালীকঙ্করের প্রতি সমবেদনায়।

এ সময়কার কালিদার কার্যবিবরণী আমি নিয়মিত খবরের কাগজে পাঠাতুম “বিহারে কালীকঙ্কর” এই হেডিঙ দিয়ে। নানা ছবি-টবি সহ সে সব পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হত।

এর পর মায়ের পিণ্ডদানের অছিলায় সেই যে তীর্থপথে পা বাড়াল কালিদা তারপর কয়েক বৎসরের ইতিহাস যেমন অস্পষ্ট তেমনি রহস্যচ্ছাদিত—যে সময়টাকে কালিদার আত্মগঠনের অজ্ঞাতবাস বলেই ভেবে নিয়েছিলাম। দেখা না পেলেও প্রয়োজনের মুহুর্তে অলঙ্ঘ্য নির্দেশ তখন নিয়মিত পেয়েছি। অনেকে ভেবেছেন কালিদা হয়তো ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। কালিদার অসাহ্য নেই কিছু। সে সময়ে কালিদা সম্বন্ধে একটা গোপনতা-বোধ স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করেছি সর্বক্ষণ। তাতেই কর্মে পেয়েছিলাম একটা অভিনব অনুপ্রেরণা। ধীরে ধীরে পার্টির শক্তি আশ্চর্য রকম বেড়ে উঠল এক নেপথ্য-নেতার নির্দেশে। এ কালিদা ছাড়া আর কেউ নয়। হয়তো এ গোপনতার

কোন নিগূঢ় কারণ আছে। মহাঝটিকার পূর্বমূহূর্তের স্মৃতি নিয়ে আমরাও প্রতীক্ষা করছিলুম বিরাট একটা কিছু সংঘর্ষের। শুধু জল্পনা আর তল্পনায় দিন যায়, বঙ্গমঞ্চে মহানৈতার পদক্ষেপের শুভক্ষণটি বুঝি আর আসে না।

সেই বহুপ্রতীক্ষিত শুভ আবির্তাব ঘটল প্রায় দশ বৎসর পরে। সত্যই সে এক নাটকীয় আবির্তাব। কিন্তু সে ইতিহাস তো কালিদা লিখতে বলে নি। সেতো তার প্রকাশ ভূমিকা।

দেখি সেই অজ্ঞাতবাস-রহস্য সম্বন্ধে কোন আলোক-পাত করেছে কিনা কালিদা তার এই নব জীবনীতে।

...কল্যাণীর কাছে এবার পেলাম এক নতুন জিনিষ। এর স্বরূপ বুঝতে পারছি না। একি ঘৃণা? এই কি প্রেম? কতটুকু এর সত্য? কতটুকুইবা অভিনয়? কল্যাণী আমায় কি ভেবেছে? কি চেয়েছিল সে আমার কাছে? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কল্যাণীর কাছে আর পাওয়া যাবে না! নেতা কালীকঙ্করের মাথা নত করে পারবে না আর সে প্রশ্ন করতে কল্যাণীকে। প্রশ্ন করতে হবে নিজেব মনকে। কিন্তু কোথায়, কোথায় গেলে পাব নির্জন কর্মহীন অবকাশ? পাব আত্মবিশ্লেষণের জন্ত স্থান মন।

কিন্তু কল্যাণী কি করবে অতঃপর? প্রতারণা করবে কি? ডুবিয়ে দেবে কি কালীকঙ্করের সম্মান? চূর্ণ করে দেবে কি তার খ্যাতির সৌধ কলঙ্ক-কুঠাবাঘাতে? না না, অত মূর্খ নয় কল্যাণী। সেতো বলেইছে, সে বড় হতে চায়। কালীকঙ্করের গায়ে কালি মাখাতে গেলে সে কালি যে তার গায়েও লাগে। সুতবাং মাইভঃ কালী-কঙ্কব। এবারও তুমি অক্ষতই রয়ে গেলে।

কিন্তু স্মিত্রার ব্যাপারটাও কতখানি জানে? কতটুকুইবা জেনেছিল স্মিত্রা নিজে? কি লিখেছিল স্মিত্রা? ছিঃ ছিঃ, কালীকঙ্কর স্মিত্রার চিঠিখানা পড়ে দেখবার সাহসও তোমার হল না। এত দুর্বল তুমি! এ পরাজয়ের মানি তুমি কি দিয়ে মুছবে কালীকঙ্কব? কোথায় লুকোবে তোমার দক্ষ মুখ? হায় কালীকঙ্কর, অতঃপর মৃত্যু ছাড়া যে মুখরক্ষার আর কোন পথই রইল না তোমার। সেই

ভাল, মৃত্যুই হোক নেতা কালীকঙ্করের, সেই সাথে মুছে যাক সব লজ্জা, ঘুচে যাক সব সংশয়।

সেই সঙ্কল্প নিয়েই ছুটে এলুম মায়ের কাছে। বেখে যাই শেষ দেখাটা। বিদায় নিয়ে যাই মায়ের কাছে, বিদায় নিয়ে যাই অভিনয়-মঞ্চ থেকে। শেষ হোক অভিনেতা কালীকঙ্করের ব্যর্থ অভিনয়।

শেষ দেখাটাও হ'ল না।

মা নেই!

রইল না আর কোন মায়ার বন্ধন। তুলে গেলুম মৃত্যুর সঙ্কল্প এই অভাবিত মুক্তির মন্ততায়। মুক্তি নিলুম নেতৃত্ব থেকে, মুক্তি নিলুম রাজনীতি থেকে।

সেই মোহমুক্ত মন নিয়েই ঘুরে বেড়ালুম দেশ-দেশান্তরে, তীর্থে তীর্থে, সহরে নগরে, পল্লীর পথে পথে। একেবারে অগ্নি মাছুষ। এ তীর্থপথিককে কালীকঙ্কর বলে ভুল করবে না তার অন্তরঙ্গতম বন্ধু রাজুও। ছদ্ম-বেশেব দক্ষতা যে আমার অসাধারণ। মিথ্যা নাম গ্রহণ আর মিথ্যাচার বলে মনে হল না। মনে হল কালীকঙ্করই ছিল মিথ্যা নাম। আত্মগোপনতার মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে। এ রোমাঞ্চের স্বাদ আমি অহুভব করেছি বহুবার অনেক পবিচিত মুখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। প্লকিত হয়েছি নিজের দক্ষতায়।

মরে যাক, মুছে যাক নেতা কালীকঙ্কর। আমি বৈচে থাকতে চাই ভূবন-জোড়া পথের মাঝে একজন সাধারণ পথিক হয়ে। বৃহত্তর অভিনয় বহুদিন করেছি। কথা বলতে, চলতে ফিরতে প্রতিক্ষেপে সতর্কতা—এই বুঝি অভিনয়টা ধরা পড়ে গেল। এবার আমায় সেই ভূমিকা দাও প্রভু দুখস্থ না করে মহড়া না দিয়েও যা অভিনয় করা যাবে নির্ভয়ে।

ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসি নি। তাই পাঁচ বৎসরে সাবা ভারতবর্ষ ঘুরে কি দেখলুম সে বৃত্তান্ত এখানে আবার অবাস্তব। কি পেলুম তাইবা বলি কোন্ ভাষায়। সে তো অহুভূতির ব্যাপার। সে আমাব মানস-সম্পদ। তাকে ভাষার তরীতে ভাসিয়ে দিতে চায় না রূপণ মন। তাই আমি শুধু বলব সেইটুকু যেটুকু আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে আমার জীবনী লিখিয়েদের কাছে।

স্বাভি-মায়-মুক্ত নির্মোহ মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি  
পাঞ্জাবের এক পল্লীপথে। অকস্মাৎ চোখে পড়ল বাজারের  
থলি হাতে ছবর সিং চলেছে দ্রুত পায়ে।

ছবর এখানে? এই কি ওর মাতৃভূমি? ওকি পাটি  
ছেড়ে দিয়েছে? ওর থলির উপর দিয়ে মাথা জাগিয়ে  
আছে এক শুদ্ধ পেরাজের কলি। কলি! অকস্মাৎ  
মনে পড়ল কল্যাণীকে। মনে পড়ল পাটির কথা। ছবর  
চলে এসেছে। কল্যাণীও কি চলে গেছে? ভেঙ্গে  
গেছে পাটি?

ধবরের কাগজ ছুঁইনি এতদিন। সত্য-সমিতি দেখলে  
সভয়ে পলায়ন করেছে। আজ কেন এল এ কোতুহল?  
ক্ষণিক আত্মবিশ্রুতি।

ছবর এসে পড়ল একেবারে মুখোমুখী। বারম্বার  
আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে একেবারে মিলিটারী কায়দায়  
হণ্ট করে স্কাল্ট করল।

আমি বিস্মিত। বিব্রত। এই দূর বিদেশে কেউ  
চিনবে না। চেহারাটাও পার্শ্বে। তাই ছদ্মবেশ  
সম্বন্ধে খুব সতর্ক ছিলাম না।

—কালিদা! আরে বাব্বা, আপ ইয়ার?

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলুম। সহজ কণ্ঠে বল্লম, ভুল  
করছেন। আমি সন্ন্যাসী। স্বামী নির্মলানন্দ।

হাসল ছবর। হামি জানে, জানে পাটির সব ভাই।

—কি বলছেন? কি জানেন আপনি? আমার কণ্ঠস্বরে  
কি ছিল অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা?

ছবরের হাসিটা আরও বিস্তৃত হ'ল। আপ সারা  
ভারতে পাটি মেসার রিক্রুট করিতেছেন।

আমি হেসে পড়লুম এবাব প্রাণখোলা হাসি। এতবড়  
একটা অন্ত্যও পরম নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারে  
মাছুষ?

—হেসে আর কেনো রোজ ফাঁকি দিবেন? তারপব  
প্রায় কানে কানে বল্ল, পুলিশ আপকা তল্লাসীমে সারা  
দেশের মাটি অবধি চষিয়ে ফেলছে। পাটিব কাজ চলছে  
বহুৎ প্রাইভেটভাবে। রাজুভাইয়া বর্মার দিকে গেছেন  
আপনার তল্লাসীতে।

বহু চেষ্টা করেও প্রশ্নটা রূপতে পারলুম না।

—কল্যাণী কোথায়?

ছবরের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসি দেখা দিল  
আবার।

—আপ তো চলা আসা। রাজু ভাইয়া ভি চলিয়া  
গেলেন। কল্যাণী দেবী আর কোথা যাবেন? আপকা  
পাস বড্ড স্কু পেয়েছিলেন মালুম হয়। তা আগমে হাথ  
লাগালে তো পুড়বেই। কালিদাকে বাধতে চায় কাল-দি  
হাঃ হাঃ হাঃ!

—চুপ জানোয়ার। কল্যাণী কোথায় বল।

—আছেন হামারা সাথেই। ঐতো গলিকা মোড়মে  
দেখছেন হামাদের গরীবখানা। দুটো বাজা ভি  
আছে। ঠিক বাঙ্গালীর মত দেখতে। একবার যাবেন  
মেহেরবাণী করে।

আবার একটু হাসল ছবর সিং।

চিনে বাখলুম ঘরখানা। মনে রেখো, কালিদা নেই।  
কল্যাণীও যেন না জানে। একটু বেকাস হলে...কালী-  
কিঙ্করকে তো চেনোই। শেষ কথাটায় নেতা কালী-  
কিঙ্করের সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের আভাস পেয়ে সভয়ে সরে  
দাঁড়াল ছবর।

—সে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। এই পায়ে হাথ দিয়ে  
প্রমিস করছি বেকাস হবে না। হামডি আপকো পাটি  
মেসার। লেकिन বিদেশে বিতুঁয়ে কতি কুছ কাম পড়লে  
ছবরকে ভুলবেন না। জান কবুল।

মাথা নীচু করেই চলে গেল ছবর সিং। কিন্তু ঠোঁটের  
কোণে কি যেন একটা রহস্যময় হাসির ইঙ্গিত। কি যেন  
আরও বলতে চেয়েছিল ছবর। কি যেন লুকোচুরি।

কিন্তু ওর কাছে আমার অজ্ঞাতবাসেব যে কৌতুককর  
কাহিনী আজ শুনলুম সেই কালীকিঙ্করের সাথে এ কালী-  
কিঙ্করের তো কোথাও কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না। ওরা  
ওদেব নেতাকে গড়ে নিয়েছে আপন খুশিমত। সেই মন-  
গড়া নেতাকে নিয়েই চলুক ওরা এগিয়ে যেদিকে খুশি।  
আমিও চলছি আপন খুশিমত ছ'চোখ আমার যেদিকে  
মিয়ে যায়। এ এক মন্দ খেলা নয়।

আর কল্যাণীর যে পরিচয় ও দিয়ে গেল তা যে মেনে  
নিতে পারছি না সমস্ত অস্তুরাঙ্গা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ছবর

সিংকেই... ঠিক বাঙালীর মত দেখতে দুটি ছেলে। ছিঃ! কল্যাণীর এইটুকু মাত্র পরিচয়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এত ছোট কল্যাণী! যে ছবরকে ও ঘৃণা কবল মনে প্রাণে সেই ছবরকেই শেষে...। নাকি সেও কল্যাণীর একটা অভিনয়?

কল্যাণীকে আমি চিনিমি। চিনি না আমি কাউকে। শুধু অহমিকাবশে তেবেছি আমিই চিনে ফেলেছি সবাইকে, আর আগায় চিনবে না কেউ কোনদিন। কী ভয়, কী শোচনীয় পবাক্ষয়। ছবর সিংএর হাসি হয়তো আমার সেই ব্যর্থতাকেই ব্যঙ্গ করল আজ।

কে যেন টেনে নিয়ে এল আমার সেই ছোট্ট একতলা বাংলো ধরণের বাড়িটার সামনে।

এইতো ছবরের দেখান সেই বাড়ী। এখানেই থাকে কল্যাণী আর ছবর। স্নেহের সংসার রচনা করেছে ওরা। কেটে গেছে ওদের দেশোদ্ধারের মোহ। সে মোহ তো কালীকিঙ্করেরও কেটেছে। তবু ঘর বাঁধতে পারল কৈ কালীকিঙ্কর?

সামনে ক্ষুদ্র একটু গ্ন। স্নন্দর একটু ফুলের বাগান। কল্যাণীর শিল্পীমন এখানেও চেয়েছে একটু স্নন্দর বাঙলা দেশের ছবি আঁকতে। গেটে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন বাঙলাদেশেরই কোন পল্লীগৃহের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। এখুনি হয়তো সরলা গৃহবধূটি একটু মলজ্জ হেসে আমার আদর অভ্যর্থনা জানাবে।

দরজা জানালায় আকাশী রঙের পর্দা। বাড়িটার দেয়াল হাল্কা সবুজ রঙের। নিম্নক বাড়িটা অলস মধ্যাহ্নে যেন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। বেশ আছে ওরা।

দরজার পর্দাটা একটু নড়ে উঠতেই ছোট ছোট দুটি ছেলে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। যেন দুটি সচল

বর্ণাধারা। ছ'জনেরই হাতে ছোট ছোট কাঠের ছোরা। স্নদক্ষ খেলুড়ের অভ্যস্ত কৌশলে ওরা দুটিতে ছোরা খেলায় মেতে উঠল। পোষাকে চুলের খোঁপায় পাঞ্জাবীয়ানা স্পষ্ট। তবু মুখের বাঙালী আদলটাও মিথ্যে নয়। ওরা কল্যাণীর সন্তান? ঠিক যেন মন দিয়ে মেনে নিতে পারছি না। কি যেন একটু ব্যতিক্রম। দুটি যে জয়জয় সেটুকু সহজেই বোঝা যায়।

কল্যাণীর গলা না? হ্যাঁ, তাইতো। কল্যাণীই ডাকছে এদের ভিতর থেকে,—বেটা ব্রজ গোপাল স্নন্দর আ যাও।

মুহুর্তে আত্মগোপন করলুম।

বাঙলা ভাষাটাও ছেড়েছে কল্যাণী!

একটি ব্রজ আর একটি গোপাল, না একটাব নামই ব্রজগোপাল? নামটা তো বাঙালীরই নাম। ছবর সিংএর ছেলের নাম ব্রজগোপাল? কোথায় যেন কি একটু প্রচ্ছন্নতা রয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু কী সেই রহস্য?

থাক যা খুশি রহস্য ওদেব মাঝে তা নিয়ে স্বামী নির্মলানন্দ কেন অত বিচলিত হল আজ? এ মোহ। এ দুর্বলতা।

মন স্থির কবে ফেললুম। এ দেশে আর নয়।

চলে এলুম আরও দুর্গমে। কাশ্মীরের পাহাড় ঘেরা অরণ্যে। অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ও বলা চলে। ওদের কল্পনার নেতা কালীকিঙ্কর সারা ভারতে বিপ্লবীদল গড়ে তুলুক। আমি এখানে এক সাধুর আশ্রমে কটা দিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করে নি।

কিন্তু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম বুঝি কালীকিঙ্করের জীবনে আর আসবে না কোনদিন। কালীকিঙ্করের ভাগ্যবিধাতা কি তাকে দিবে চিরদিনই মুখোপপরা বিচিত্র ভূমিকায় যথু থেকে মঞ্চান্তরে অভিনয় করাবেন শুধু?

(ক্রমশঃ)



# অলৌকিক

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী

ঘটনাটা ঘটয়াছিল আজ প্রায় বিশ বৎসর আগে। আমার এবং আরও অনেকের প্রত্যক্ষের গোচরে।

জীবনে কতশত ব্যক্তিগত ঘটনা ঘটে এবং অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় তার অন্ত নাই। হয়ত কখনও কখনও মনের আকাশে দুই একবার উকি-ঝুঁকি মারিয়া আবার চলিয়া যায়। জীবন চলিতে থাকে তার অভ্যস্ত বা অনভ্যস্ত, সুনির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পথে। কিন্তু এমন দুই একটি ব্যাপারও জীবনে ঘটে যাহা কেবলই স্মরিয়া ফিরিয়া মানসপটে ভাসিয়া উঠে এবং কিছুতেই তাহা মুছিয়া ফেলা যায় না—বিশ্বস্তির অতল হইতে মাঝে মাঝে কারণে অকাণ্ণে, মূর্ত্ত ও জাম্জল্যমান হইয়া উঠে।

একান্তই যাহা ব্যক্তিগত তাহা নিয়া সহসা কেহ প্রকাশ্য আলোচনা করে না বা করিতে চাহে না। কিন্তু এমন কিছু যদি ঘটে যাহা একান্ত ব্যক্তিগত হইলেও ব্যক্তিগতের সীমানা ছাড়াইয়া যায় তবে সেই ঘটনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার একটা আকুলতা জন্মে এবং অনেক সময়ে তাহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তবুও তাহা সহসা প্রকাশ করা কঠিন হইয়া পড়িতে পারে সাধারণ লোকের পক্ষে—বিশেষ করিয়া, যদি ঘটনাটি অসাধারণ হয়, অর্থাৎ মাহুষের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার সীমার বাহিরে চলিয়া যায়। আরও অত্যধিক কঠিন হইয়া পড়ে যদি ঘটনাটি এমন কোনও বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ঘটে যাহা নিষা আলোচনা করাটা অনেক কল-কৌলীন্ত বা বিশিষ্ট-ব্যক্তিহাতিমানী লোকেরা সাধারণ লোকের পক্ষে অনধিকার-চর্চা বলিয়া মনে কবেন। সেই কারণেও সাধারণ বা অতিসাধারণ লোকেরা ঐরূপ কোন ব্যক্তিগত বিষয়, নিজেরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও, সাধারণ্যে প্রকাশ বা আলোচনা করিতে সহসা সাহসী হয় না বা ইতস্ততঃ করে। কিন্তু আজ প্রায় বিশ বৎসর পরেও যখন ছবিটি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলাম না বা আপনা হইতেই মুছিয়া গেল না তখন একান্ত দুঃসাহসিকতার আশ্রয় নিয়াই যেন বিষয়টি সাধারণ্যের গোচরীভূত করিতে সাহসী হইলাম। তাহাও হয়ত পারিতাম না, যদি না নির্ভর করিবার মত আবও

দুই একটি অবলম্বন পাইতাম এবং ‘প্রবর্তক’-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উৎসাহিত এবং অনুকূল না হইতাম।

এত ভূমিকা করিবার সম্ভবতঃ প্রয়োজন ছিল না যদি এই ঘটনার বিষয়বস্তু এমন একজন মহামানব না হইতেন যার নাম উল্লেখ মাত্র বিদগ্ধ বিশ্ববাসী মাঝেরই হৃদয় মন মুহূর্ত্তে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ সচকিত চঞ্চল হইয়া উঠিতে বাধ্য। ঘটনাটি অলৌকিক এবং ঘটনার বিষয়বস্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

ইং ১৯৪১ সন, ১৩ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, আমি আমার এক বন্ধুকে আমার দেখা ঘটনাটি বিবৃত করিয়া একটি চিঠি লিখিয়াছিলাম। বন্ধুবর রসিক এবং একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ নাহিত্যিক। তিনি আমার চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া তাহার উপরে একটি ছোট্ট মন্তব্যে জিজ্ঞাসা করিয়া- ছিলেন, আমি কি পরিমাণ নেশা করিয়া চিঠিখানা তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমাব একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটেও ঘটনাটি অবিশ্বাস্ত মনে হইয়াছিল। ঘটনাটি ঘটয়াছিল ৭ই আগষ্ট ১৯৪১, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। চিঠিখানা লিখিয়াছিলাম তার কিছুদিন পরে, ১৩ই সেপ্টেম্বর। মধ্যবর্তী সময়টুকু আমার মনের মধ্যে জাগাইয়াছিল একটা বিশ্ময়ান্বলিত আলোড়ন। ইতি-মধ্যে একটি সমর্থন পাইয়াছিলাম আমার একটি বন্ধুপত্নীর নিকট হইতে। তিনি হইলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী শোভারাগীণী ঘোষ। দৃশ্যটি তাঁরও চোখে পড়িয়াছিল। সর্বশেষ এবং প্রবলতম সমর্থন পাইয়াছিলাম আরও কিছুদিন পরে এবং যার কাছ হইতে পাইয়াছিলাম তিনি একজন চিত্রশিল্পী। তাঁকে আজও আমি জানি না এবং চিনি না।

প্রথমোক্ত সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট হইতে আমার চিঠিখানা প্রত্যাখ্যাত হইবার পর আর বিশেষ কাহারও সঙ্গে বিষয়টি নিয়া আলোচনা করি নাই এবং করিবার বিশেষ ইচ্ছাও হয় নাই। একজনের সঙ্গে করিয়াছিলাম, যিনি আজ ইহজগতে নাই। তিনি হইলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় ঔপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অনেকের

মত আমিও তাঁর একজন স্নেহভাজন ছিলাম। তিনি একদিন তাঁর কোনও বন্ধুর বাড়ীতে একটি ঘরোয়া বৈঠকে নিমন্ত্রিত হন। তাঁর বন্ধুর বাড়ী ছিল বিবেকানন্দ রোডে। উপেনবাবু আমাকেও অহরোধ করিয়াছিলেন সেই বৈঠকে যোগদান করিতে। আমার সঙ্গে দেখা হইতেই উপেনবাবু বলিলেন, “শঙ্করবাবু, ভারি একটা interesting কথা। আপনি যে দৃশ্যটি দেখিয়াছিলেন তার একটা ছবি বেরিয়েছে এ মাসের ‘প্রবর্তক’ কাগজে, একটা কাগজ নিয়ে আসুন। ইচ্ছা হইল উড়িয়া যাই। পাখা ছিল না। ছিল ছোট একখানা মোটর গাড়ী। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কলেজ স্ট্রীটের মোড় হইতে কাগজখানা কিনিয়া, খুলিয়া দেখি, আমার দেখা সেই ছবি। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আকাশের গায়ে হেলান দিয়া আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চিত্রশিল্পী দেখিবামাত্র charcoal-এ ছবিখানি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি শিল্পী নই, ছবি আঁকিতে পারি নাই। বিমূঢ় বিশ্বসে, আনন্দাপ্লুত চিত্তে কাগজখানি নিয়া উপেনবাবুর নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

এই বিশ বৎসর বিষয়টি প্রকাশ কবিস্বর সাহস, স্রবোগ কিশা স্রবিশা কিছুই হয় নাই। কিন্তু উপরিউক্ত বন্ধুকে লেখা আমার চিঠিখানা, নিজের লেখা হইলেও, বন্ধুবরের মন্তব্যসহ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।

এত দীর্ঘ সময় পরে স্মৃতির প্রকোষ্ঠ হইতে টানিয়া না আনিয়া, আমাব চিঠিখানা, হবহ বা সামান্য এক-আধটুকু পরিবর্তন করিয়া, উদ্ধৃত করিয়া দিলেই বোধহয় দৃশ্যটি আমার মনে যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা স্পষ্টবিস্মৃত হইতে পারে। তাই বিশ বৎসর আগের লেখা, নিম্নোক্ত চিঠিখানা বন্ধুবরের মন্তব্যসহ উপস্থিত করাই সমীচীন মনে করিতেছি।

Saturday,  
Sept. 13, 1941

প্রিয় পন্নিমলবাবু,

যদিও নিজের মনে সেটা অসম্ভব করি না বা মানিতে ইচ্ছা হয় না, তবুও কালের মাপে ‘বনঃব্রজত’-এর সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এবং এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমণ করিতে

করিতে কত “দূরকে”ই যে নিকট করিয়াছি এবং কত “অজানা”কেই যে জানিয়াছি তার ত ইয়ত্তা পাই না। কিন্তু একটা জিনিষ এই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে করিতে উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই “অজানা”, “জানা” সংখ্যাহীন পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে এমন দু’চারজন আছেন যাদের কাছে জীবন-সৌখের কোন কোন নিহৃততম প্রকোষ্ঠের দ্বার যেন আপনিই খুলিয়া গিয়াছে। দেখানে তাঁদের প্রবেশ সহজ এবং অসঙ্কোচ। আপনি তাঁদেরই একজন। তবুও এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাতে নিজেরই যেন সঙ্কোচ কাটে না। আমাদের বাড়ীতে একটি ঝি আছে, সাদাসিধে চেহারা। একটি ফুটফুটে হৃদয়ের ছেলে তার কোলে। একদিন বিকেলে বাড়ীতে ঢুকিতেই তার সঙ্গে দেখা। আমি বলিলাম, বাঃ কি সুন্দর! কাদের ছেলে গো? যুগপৎ লজ্জায় এবং আনন্দে যেন আত্মহারা হইয়া বলিল, বাবা, আমার খোকা। আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম, বাঃ বেশ সুন্দর তো!

জীবনে যখনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কখনো কোন কিছু বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে তখনই আমার মনের অবস্থা হইয়াছে আমার বাড়ীর ঝি-এর মতন। কোথায় রবীন্দ্রনাথ, আর কোথায় আমি। এ যেন রাজাধিরাজের সঙ্গে তিথারীর সম্বন্ধ পাতানো। তবুও মন ত মানে না। অতি গোপনে, অতি সঙ্কোপনে আপনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা বলিয়াছি। ভয় কাটিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের নিহৃততম প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে আপনার কাছে। তাই আজ আপনাকে একটা গোপন, অতি গোপন কথা জানাইতেছি, যা ঘটয়াছিল আমার এবং আমার অতি নিকট আরও দু’চারজনের প্রত্যক্ষের গোচরে। শুনিলে অশ্রু হয়ত হাসিবে কিন্তু আপনি হাসিবেন না, ইহা জানি।

হাসিবেন না জানি, কিন্তু বিস্মিত হইবেন। আমি যদি বলি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আমি—আমি এবং আমার পরমাত্মীয় আরও দু’চারজন—তাকে দেখিয়াছি, তা’হলে বিস্মিত হইবেন না কি? নিশ্চয়ই হইবেন। কিন্তু তবুও আমি বলিব, আমি তাঁকে দেখিয়াছি। যে-দেখার চেয়ে বড় দেখা তাঁর জীবিতাবস্থায়ও দেখি নাই। ঘটনাটা বলি।



“উপরের ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের মেঘরূপ। নিমতলাঘাট শ্মশানের চিতায় যখন রবীন্দ্রনাথের নখর দেহ আঙুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছিল তখন শ্রাবণ সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমিয়া যে অপূর্ণ রবীন্দ্রাকৃতি গঠিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীঅবনী সেন সেই সময়ে ইহার যে ‘চারকোল স্কেচ’ করিয়া লয়েন তাহা এখানে প্রকাশিত হইল।”  
[কাঞ্চিক ১৩৪৮ সনের প্রবর্তকে প্রকাশিত এই ছবি-সম্পর্কিত মন্তব্য এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল]

৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা। বিশ্বের ভারকেজ্ঞকে স্থানচ্যুত করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বাংলার আকাশ, বাতাস শোকাশ্রমে ভাৱাক্রান্ত। কালসমুদ্রের বক্ষ বাহিয়া সেই মহা-মহীকূহের অস্তিমধ্যাত্মার বর্ণনার চেষ্টা করিবার মত ধূঁতলা করিব না। জ্ঞী, কজ্ঞাকে বেথুন কলেজের পাশে দাঁড় করাইয়া দেবদেহ দর্শন করাইলাম এবং স্তব্ধ প্রদ্বানত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া রেডিও খুলিয়া বসিলাম। সমাহিত চিত্তে, সমস্ত বাংলার, সমস্ত ভারতের বুকফাটা ব্যথানিবেদনের স্বরে নিজের বেদনাতুর চিত্তকে ডুবাইয়া দিয়াছি। ঘড়িতে তখন ৮টা বাজে বাজে। তন্ময় হইয়া শুনিতেছি গানের পর গান, বিলাপের পর বিলাপধ্বনি—গানে, ক্রন্দনে, কথায়, দেবতার পায়ে উচ্ছ্বসিত প্রজ্বলিত অর্ঘ্য নিবেদন। হঠাৎ চোখ পড়িল পূর্ণ গগনপ্রাস্তে। আকাশে মেঘ, মেঘের পশ্চাতে চাঁদ। চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না। রেডিওর পাশে যে কব্জল ছিল, সমস্তরে বলিয়া উঠিল—দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ, রবীন্দ্রনাথ। অবা-ক-

বিস্ময় চাহিয়া রহিলাম। আমরা ছিলাম দোতলায়। আমার বাড়ীর পূর্বদিকটা একেবারে ফাঁকা। আমার জ্ঞী ছিলেন তেতলায়। তখনই নামিয়া আসিয়া বলিলেন, ‘কি আশ্চর্য্য, দেখেছ?’ একই সময়ে বিভিন্ন জনের চোখে পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম, কেহই যেন কিছু বলিতে পারিলাম না। শুধু দেখিলাম। আকাশের মেঘে অবিকল রবীন্দ্রনাথের Profile। পশ্চাতে চাঁদ এবং Profile-এর চতুর্দিকে স্বজন করিয়াছে একটা Halo। যেন দেবমূর্তি! তখনও নিমতলার শ্মশানে সহস্র সহস্র নরনারী আকুল আগ্রহে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্ত ব্যাকুল। মনে হ’ল, মাতা বসুন্ধরার কুলপাবক সন্তান, বাংলার বুকের কোস্তভমণি, মাকে শেষ দেখা দেবার জন্ত মেঘে রূপ পরিগ্রহ করিয়া মাতৃবিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট স্তব্ধ নতশিরে বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে মেঘ মিলাইয়া গেল। দেবতা অদৃশ্য হইলেন। আমরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলাম, বুঝিবা সকলকে শেষ দেখা দিয়া গেলেন! নিজেরাই প্রাণ করিতে লাগিলাম,



এ অপরূপ দৃশ্য আর কারোই চোখে পড়ে নাই কি ? ছেলে মেয়ে বলিতে লাগিল, বাবা, এ কথা তুমি খবরের কাগজে লিখে দাও। সাহস পাইলাম না। ভাবিতে লাগিলাম, দেখি, আর কেহ এ কথা বলে কি না। কয়েক-দিন পরে আর একটি সমর্থন পাইয়াছিলাম অল্প একটি (অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষের স্ত্রী, শ্রীমতী শোভারানী ঘোষ) আত্মীয়ের মুখে। তিনি সেই সময়টা কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ছেলেরা সমস্তরে চীৎকার করিয়া উঠিল—“মা, মা, দেখো এসে, ‘রবিঠাকুরের মেঘ’!” তিনিও তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন সেই অপরূপ দৃশ্য। ভাবিলেন, মেঘে ত কত সময় কত রকম আশ্চর্যরূপ দেখা যায়, এও তারই একটা, তবুও ভারি আশ্চর্য্য ত।

অবশ্য একথা ঠিক যে, মেঘে, এমন কি চুণকাম উষ্ণি-বাণী দেয়ালেও, আমরা অনেকেই কত সময় কত বিচিত্র চিত্ররূপ দেখিতে পাই। কিন্তু তবু যেন সেইদিনের, ঠিক সেই সময়ে, মহাকাশের গায়ে রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রালোকোস্তানিত মূর্ত্তি মনের উপর একটা অদ্ভুত দাগ কাটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমরা আমাদের সাধারণ দৈনিক-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় তবে ক্রন্দন-মেঘভাষাক্রান্ত মহাকাশের গায়ে যে জ্যোতিষ্মান মূর্ত্তি আমরা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাইবা কেন সত্য হইবে না? হুই-ই ত ক্ষণস্থায়ী।

এ প্রশ্নের কোন জবাব নাই। যার যা ইচ্ছা বলিতে পারেন এবং এর কোন চূড়ান্ত উত্তর প্রত্যাশাও করি না। তবে মনে কোঁতুল জাগিয়াছিল আর কাহারও চোখে পড়িয়াছে কি না। পরের দিন খবরের কাগজের পাতা উন্টাইয়া খোঁজ করিয়াছিলাম। দেখিলাম কোথাও এ সম্বন্ধে কিছুই নাই। এখনও ভাবিতেছি, এ রকম দৃশ্য আর কারও চোখে পড়িল না, এও ত ভারি আশ্চর্য্য।

ঘটনাটা এ পর্য্যন্ত অল্প কাহাকেও বলিতে সাহস পাই নাই। কেন পাই নাই আর আপনাকেই বা আজ কেন জানাইতেছি তাহা ভূমিকায বলিয়া নিয়াছি। ইতি—”

চিঠিখানা বন্ধুবর আমাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন এবং সেই চিঠির গায়েই একটি মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। মন্তব্যটি এই: “Please mention the quantity wh. inspired you to put it in black & white. I appreciate the writing—but, as I am now no longer editor of Kari-o-Komal, I regret, I cannot publish it as I should. So I return the m.s. with thanks.”

P. Goswami.

তিনি তখন ছিলেন “বেতার জগৎ”-এর এডিটর। ঠিক কি উদ্দেশ্য নিয়া চিঠিখানা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম তাহা আজ বলা কঠিন। একটা কথা মনে হয় যে, এমন একটা অপরিমিত বিশ্বয়ের বিষয় কোন বিশিষ্ট এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুকে না জানাইয়া যেন থাকিতে পারিতেছিলাম না। আরও বোধ হয় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁর মারফৎ এই অলৌকিক ঘটনাটি অগ্রেও জাহ্নক। কিন্তু তাঁর উত্তর পাইয়া এবং মন্তব্য পড়িয়া মনটা পাথরচাপা পড়ার মত দমিয়া গিয়াছিল এবং “to put in black and white” আর সাহস পাই নাই। কিন্তু মনের ইচ্ছাটা দমিয়া গেলেও নিভিয়া যায় নাই। বরঞ্চ নিজের অন্ত্রাতেই যেন মনের কোণে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিতেছিল এবং বাহির হইবার স্বযোগ অপেক্ষা করিতেছিল।

আজ এই সত্য সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। কি করিয়া হইলাম তাহা গোড়ায় বলিয়াছি। তবুও একটা প্রশ্ন বাকী থাকে। তুমি যাহা দেখিয়াছ, যাহা দেখিয়া তুমি নিজে বিশ্বিত বা পুলকিত হইয়াছ তাহা অপরকে জানাইয়া লাভ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।



# কর্মবীর সতীন সেন

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

( ৩ )

১৯৩৯ সনের দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে একক সত্যাগ্রহী নির্ধাচিত হয়ে ও কাবাবরণের বিশ্রাম গ্রহণ না করে বরিশালের ভোলার বিষম প্লাবন ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্ন্ত মুসলমানদের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। অনিচ্ছুক সরকার থেকে বহু লক্ষ অর্থব্যয় করাতে পেরেছিলেন।

জোর-জুলুম সহ যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের সংবাদ পেলেন। এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকি সতীন সেনের স্বভাব নয়। ১৯৪১ সনের সেই যুদ্ধাবস্থার মধ্যেও আন্দোলন করে বহু আদায়ী অর্থ প্রত্যর্পণ করাতে বাধ্য করলেন। এরূপ ঘটনা বোধ হয় আর কোথাও ঘটেনি।

১৯৪২ সনের 'ভারত-ছাড়' বিপ্লবের প্রারম্ভে বন্দী হয়ে এলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। বাইরে চলছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার। কারাস্তুরালে থেকেও কি করে জনহরদী কর্মী আত্মস্থ জীবন যাপন করবেন! ন্যূনতম খাদ্য ও বস্ত্র গ্রহণ করে উদ্ভূত দ্রব্যাদি পাঠান হোল বাহিরে সেবার কর্মে।

১৯৪৬ সনের অবিস্তৃত বন্দেব নির্ধাচনে বিপুল ভোটধিক্যে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্ধাচিত হলেন। সত্য থাকাকালীন যাবতীয় ভাতার পুরো টাকা তাঁহার সহ-কর্মীদের ঝারাই ব্যয় হত জনসাধারণের কর্মে।

এসে গেল বৈপ্লবিক পরিবর্তন—১৯৪৭ সনের ঐতিহাসিক দেশ-বিভাগ। সর্বশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এমন কি, সরকারী কর্মচারী হতে স্বক করে, দেশনেতা বা কর্মীর দল পর্যন্ত ভয়বিহ্বল চিন্তে, নানা স্বযুক্তির ভেলায় ভর করে, দেশ পবিত্যাগ করবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন। সে ছিল এক বিভ্রান্ত, ব্যাকুল ও অসহায় পরিস্থিতি।

দেশ-বিভাগ প্রস্তাবের ঘোবতর বিরোধী ছিলেন সতীন সেন। স্বতরাং পাকিস্তানে না থাকাই তো ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের এত বড় পরাজয় জাতি হিসাবে তিনি স্বীকার করলেন না। পাকিস্তানে থাকবারই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভীকৃততা, দুর্বলতা,

ও অসহায়তার সম্মুখে তিনি দাঁড়ালেন সাহস, উদ্ধাপনা ও ভবসার জাগ্রত বিরাট শক্তির পুরুষ রূপে।

১৯৪৭ সন হতে মৃত্যু পর্যন্ত পাকিস্তানের কর্মাবলী ছিল সতীন সেনের জীবনের এক অপূর্ণ অধ্যায়। তেজ, বীর্ঘ্য, সাহস, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও নিরলস কর্ম-চাঞ্চল্য ছিল তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে বহিমান অগ্নিশিখা। তিন তিনবার পাকিস্তান কারাগারে নিক্ষেপ করেও এই অগ্নিশিখাকে নির্ধাপিত করতে পারে নি।

শাস্ত্রদায়িক মত্ততাকে অতিক্রম করে এক নূতন জীবনের স্পন্দন তিনি দেখেছিলেন পাকিস্তানী তরুণ মুসলমানদের মধ্যে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর দল সতীন সেনের অপূর্ণ ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্মোন্মাদনায় মুগ্ধ হোল, আকৃষ্ট হোল। কারাগার হতে মুক্ত হয়ে বা কারাগারে প্রবেশকালে শত সহস্র মুসলমান জনতা, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের আন্তরিক সম্বন্ধনা সতীন সেনের জীবনে ছিল অভূতপূর্ণ। কর্মের নূতন চেতনা জাগ্রত হোল তাঁর জীবনে।

শেষবারের স্তব্ধ কারাগারে প্রবেশ করেন ১৯৫৪ সনের ১লা জুন তারিখে, যখন গবর্নরী শাসন স্থাপিত হোল। কিছুদিন বরিশাল জেলে থেকে, পরে পাঠান হোল রংপুর জেলে। হাসপাতালে থাকবার স্থানের উপরের টি. বি. রোগীদের ঘরের নোংরা জল প্রাশঃই তাঁর ঘরে গড়িয়ে পড়ত। বার বার অস্বরোধ করেও এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হোল না।

নির্জন কারাগারকোঠে একটি অসহায় কয়েদীর সন্দেহজনক ভাবে মৃত্যু ঘটল। সতীন সেনের জ্ঞানতঃ গুরুতর অস্ত্রায় সংঘটিত হবে, আর তিনি চূপ করে থাকবেন—এ হতেই পারে না। অবশ্যস্তাবী বিপদ লাজ্জনার কথা বিশ্বত হয়ে সতীন সেন দৃঢ়ভাবে দাবী করলেন, উক্ত মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন করতেই হবে। ফলে, ক্রমশঃই কারা-জীবন অসহনীয় হয়ে উঠল। যেমনি আহাধ্যের স্বল্পতা ও সঙ্কচিত ভ্রমণ ব্যবস্থা দেখা দিল, তেমনি নিদ্রাহীন রজনী বাপনে বাধ্য হলেন। শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়ল।

১৯৪৪ সনে ১৩ই সেপ্টেম্বর দেখা গেল যে ১৩ পাউণ্ড ওজন হাঙ্গ পেয়েছে।

রংপুর জেলের অস্বস্তিকর বিষয়সমূহ উল্লেখ কবে ৫১৬ খানা পত্র প্রেরণ করলেন ঢাকার সবকারের স্বাধীন দপ্তরে। কোন উত্তর এল না।

শরীর বেশ খারাপ হয়ে উঠলে পাঠানো হোল পাবনা জেলে। এখানে প্রত্যহ জ্বর দেখা দিল। রক্তনরশির বা অলুবীক্ষণ যন্ত্রাদির ব্যবস্থা না থাকায় চিকিৎসা-বিভাগে ঘটলো। রংপুর জেলের ইতিহাস জেনে জেল ডাক্তার সনেহ করলেন টি. বি., কিন্তু সিভিল সার্জেন ব্যবস্থা করলেন তিনটি ঔষধের, পাওয়া গেল মাত্র ১টা। অবস্থার গুরুত্ব দেখে অবিলম্বে ঢাকার মেডিক্যাল কলেজেব চিকিৎসার জন্ত উপরে রিপোর্ট গেল। যখন অতি দ্রুত-গতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার আবশ্যক ছিল তখন সেই ‘অবিলম্বে’র ব্যবস্থা হোল প্রায় দেড় মাস পরে। অতীব মূল্যবান সময় চলে গেল। শরীর এখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। পরে স্থানান্তরিত করবার সময় দেখা গেল শরীর ভ্রমণে অশক্ত। পর পর চারদিন যাওয়া স্থগিত রহিল।

এবার কারাগারে প্রবেশ করার পর থেকে সতীন সেন প্রায় প্রত্যহই রোজনামা লিখতেন। এই সময়কার লিখিত ঘটনাবলী পাঠ করলে এক বিভীষিকাময় চিত্র জাগ্রত হয়। ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও দীর্ঘস্থায়ী স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে উঠলো জীবনের পরিসমাপ্তি। সতীন সেন বুঝলেন যে, জীবনের শেষ আগতপ্রায়। মৃত্যুর সান্নিধ্যে এসে অপক্লপ ভাষায় তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করলেন—লিখলেন : “চরম danger ; মনে কোন ভীতি নাই। Calmly face করিব—যাহাই হউক। ...মরিতেই বা কী, মৃত্যুতো একদিন আসিবেই। তবে যে ব্রত নিয়ে আছি তাহার শেষ দেখিবার সাধ খুব বেশী।”

যাদের ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্য ও অবহেলায় একটি অমূল্য জীবন নিঃশেষ হতে চলেছে, সে অবস্থাতেও সতীন সেনেব মন কত উচ্চগ্রামে বিচরণ করত। লিখলেন : “তাহাদের কল্যাণ চাই—তাহারা আগার অকল্যাণ চায় ভুলে।

ইহাতে তাহাদেরই লোকমান। গান্ধীজী, খৃষ্ট প্রভৃতিকে তাহাদের স্বদেশবাসী হত্যাকবিত্যাছে। এই tragedy তো জীবনে রহিয়াছে—ইহাকে boldly face করিতে হইবে। মানুষের এই পথ—ইহাতেই দেশের ও বিশ্বের কল্যাণ।”

পরিসমাপ্তির অন্তিমক্ষণেব পূর্বাহ্নে জীবনেব মধুর বসান্ধাধনে বিগলিত হয়ে ঈশোপনিষদের ভাষাধারায় আপ্ত মন বিশ্ব থেকে বিশ্বাভীত প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠলো। লিখলেন “.....আপন-পর, মৎ-অমৎ, ছোট-বড় দেশবাসী, পরদেশবাসী, বিশ্ববাসী সকলের কল্যাণ—সকলকে ভাল না বাসিলে হয় না।—যে চরম শত্রুতা করিবে, এমন হিংস্র তাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে, তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবে। ‘মেরেচ কলনীর কানা তা বলে কী প্রেম দিব না’—এই ভাব কত সুন্দর, কত মহৎ, অথচ কত শক্ত।”

১৯৫৫ সনের ১১ই মার্চ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনা হোল। ১৩ই মার্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২৫শে মার্চ রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ করলেন—সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, বন্ধুবান্ধব-বিরহিত নিঃসঙ্গ মৃত্যুশয্যায়। একটা বিরাট কর্মযোগী পুরুষ তাঁব শেষ বিদায়ের ক্ষণে কাউকে দেখতে পেলেন না।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় যখন দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল, এমন সময় বুকের উপর রক্ষিত হস্তলিখিত একটুকরা কাগজে ঘোষিত হোল সতীন সেনের মুক্তি সংবাদ। অবশ্য এই মুক্তি সংবাদ হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের নিকটও ছিল অজ্ঞাত। কেননা মৃতদেহ আনয়নের সময় death certificate-এ সতীন সেনকে জেল-সুপারের হেপাজতে নিরাপত্তা বন্দীকপেই উল্লেখ করা থাকে।

যে কর্মযোগী বিপ্লববীর জীবনের প্রারম্ভ হতে শেষ-ক্ষণ পর্যন্ত নিজকে পরিপূর্ণভাবে পরার্থে উৎসর্গ করে দিল, দেহাবসানের পর সেই পুণ্য দেহকে রাখা হয়েছিল ‘মর্গে’। মানবতার crucification পূর্ণ হল।

একটি অগ্নিশিখা নিজে জ্বলে পার্শ্ববর্তী অন্ধকার দূর করে—সুদূরপ্রসারী দীপ্তি ছড়িয়ে মহাকালের কোলে আবাব নিভে গেল। অহরের শেষ মর্ম্মবাণী লিখে গেলেন—‘Love, Love, Love, worldwide universal.’

(‘ট্যানস্’-এর সৌজন্তে)

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর : ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ ( সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর ) । ১৩৫৫-৫৬ বঙ্গাব্দ ॥

২৫

শ্রীহিন্দুভূষণ রায়

৪ সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, দেশনেতা ডক্টর জামায়েদদার মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার কলিকাতার বাটীতে সঙ্ঘ-সভা কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সহ সঙ্ঘগুরুর সাক্ষাৎকার। দেশের ও সঙ্ঘের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

৬ সেপ্টেম্বর—কেন্দ্র-তীর্থে পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

১০ সেপ্টেম্বর—কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে বরিশালের মনোরঞ্জন বসু, ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নাবাংশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য ও সত্যরঞ্জন বস্তু প্রভৃতির সঙ্ঘগুরুর সহিত সাক্ষাৎকার। পাকিস্তানে বর্তমানে হিন্দুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মমূলক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা।

১১ সেপ্টেম্বর—চন্দননগর, তেলিনীপাড়ায় খেয়ালী সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসব-সভায় সঙ্ঘগুরুর বক্তৃতা।

১৭ সেপ্টেম্বর—‘অখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ’-এর কার্য্যকরী সভাপতি-রূপে পাটনা বিড়লা মন্দিরে অহুষ্ঠিত দেবভাষা পরিষদের অধিবেশনে সঙ্ঘগুরুর যোগদান। দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন অহুষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে গ্রহণ ও ইহার প্রচার ও প্রসারমূলক বিভিন্ন কার্য্যকরী প্রস্তাব গ্রহীত।

পাটনাতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট সংস্কৃত ভাষা সর্বভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া সঙ্ঘগুরুর অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত (১)।

(১) পাটনাতে ‘দেবভাষা পরিষদ’ ও সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট সঙ্ঘগুরুর অভিমত প্রকাশিত। পাটনার দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র ‘ইণ্ডিয়ান নেশান’ ( ১৭/৯/৪৯ইং ) হইতে উদ্ধৃত :

“The All-India ‘Deva Bhasa Parishad’ has been founded for the purpose of reviving Sanskrit language”

২১ সেপ্টেম্বর—কলিকাতার পূর্ণিমা সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে সঙ্ঘগুরুর বাণী।

২২ সেপ্টেম্বর—মহালয়া উপলক্ষে সঙ্ঘে অহুষ্ঠিত সভায় বিগতান্নাগণের প্রতি সঙ্ঘগুরুর শ্রদ্ধা-তর্পণ।

and culture. India's glory ( even in her bondage ) has been her cultural heritage, Sanskrit language is the vehicle of this culture. Hence to establish India as a nation with glory, the introduction, study and propagation of Sanskrit language has become essentially necessary. Moreover the fundamental unity between different Provinces, States, classes and communities in India rests upon Sanskrit language and culture. The aim of the Parishad is to re-organise the people of India and establish Sanskrit as the State language of India with Devanagari as the script. Although the Constituent Assembly has adopted Hindi as the State language for India, the Parishad will not stop its effort to have Sanskrit put in the position of the State language in near future.

I believe all our differences provincial or otherwise will be suitably solved and composed if we can manage to have Sanskrit as our State language. Sanskrit stands for common understanding, affinity and relationship between the people of India throughout.

We must be known by nothing more or less than as Indians. The provincial or sectional self-assertion should not be allowed to thrive. Our provincial ego must not exist. This will cripple the nation that is in making. The separatist tendency will in the long run disintegrate the whole of the national edifice. I therefore, warn every son and daughter of India against the possible sin that may endanger our existence as a collective unit. I like to draw the serious attention of the national leaders to take note of this and beware of the possible danger therefrom. The provinces should be allowed to exist only for the purpose of administrative necessity and facility, nothing more than this. The assertion of provincial existence and individualism must have to be dissolved through cultural relationship and by developing national consciousness. The provincial ego it seems is worse than communalism. The culture and civilisation that is Indian should be fostered. Petty provincial speciality

২৩ সেপ্টেম্বর—প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবন-এর শিক্ষকগণের সম্মেলনে শিক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্কটরুজীর ভাষণ।

২৫ সেপ্টেম্বর—চন্দননগরে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী রাঘ হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে 'প্রবর্তক কলেজ অফ কালচার'-এর ৯ম বার্ষিক সমাবর্তনোৎসবে বিদ্যার্থী শিক্ষার্থীগণের উদ্দেশ্যে সঙ্কটরুজীর উপদেশ-বাণী।

২৭ সেপ্টেম্বর—সঙ্কটরুজী কর্তৃক চন্দননগর, গোন্দলপাড়া ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের শ্রীশ্রীচূর্ণা প্রতিমার আবরণোন্মোচন ও ভাষণ প্রদান।

and individualism must go ; otherwise the possibility of creating Mahabharata out of the ruins left by the foreign power will eventually evaporate. We must learn to think move and exist as sons of Bharatvarsha. We must have no other "Parichaya" or existence. I assure you this will lead to a great achievement. The Bengalis, the Assamese, the Oriyas, the Beharis, the Madrasis, the Punjabis, the Marhattis, the Gujratis—all the different communities, classes and sections must dissolve themselves in the totality of Mother India and be known as Indians—Bharatbasis only. The sections, communities, classes, provincial entities should also surrender themselves without reservation. A policy of clear thinking and foresight with strong collective determination will evolve, true nation-hood here in India. It is a divine expectation for me to see real India taking re-birth through greatest trials in the history of nations of the world.

Revolutionary socialism is a necessary factor for our economic progress. But the cultural evolution must have to be worked out. Sanskrit, the true common language will pave the way by opening the treasure of real knowledge and power in man, through its literature. I see the dawn of a glorified India based upon culture that is ours. Love and unity among the peoples of India do not always seem to be found to exist now. Sanskrit had been through our culture maintaining the social and spiritual unity all the time just before the British arrived here. Our nation is to be based upon the tested culture of India. India never tolerate any imported political ideology. India made many and varied experiments in the past. We have got a chance now and we must practise those golden principles of life and society that have been propounded in the cultural life of India in the days gone-by. Ours is the duty to build India. It is our duty—yours and mine and none else."

২৮ সেপ্টেম্বর—সঙ্কটরুজী শ্রীশ্রীচূর্ণাপূজা। পূজার বিভিন্ন দিবসে সঙ্কটরুজীর বাণী।

২৯ সেপ্টেম্বর—মহাষ্টমী দিবসে ছগলী দ্রাচ্চ সমবায়ের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সঙ্কটরুজীর পৌরোহিত্য-ভাষণ।

২০ অক্টোবর—প্রবর্তক প্রিন্সিট্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ-এর ভবনে কলিকাতার পূর্ণিমা সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সঙ্কটরুজীর ভাষণ।

২১ অক্টোবর—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে 'প্রবর্তক ট্রাষ্ট'-এর ১৬শ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ও প্রবর্তক কমার্শিয়েল করপোরেশন লিঃ-এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে এবং প্রবর্তক প্রিন্সিট্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ-এর ৫ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সঙ্কটরুজীর বিভিন্ন বাণী।

৫ নভেম্বর—রাস-পূর্ণিমা—চাতুর্মাস্য-ব্রত সমাপ্ত। পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্কটরুজীর বাণী প্রদান।

৬ নভেম্বর—চন্দননগর আশ্রমে রবীবাসরীর সাধন-বৈঠকের ১ম অধিবেশনে সঙ্কটরুজীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঙ্কটরুজীর আলোচনা।

১৩ নভেম্বর—রবীবাসরীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সঙ্কটরুজীর ভাষণ।

২০ নভেম্বর—রবীবাসরীর তৃতীয় অধিবেশনে সঙ্কটরুজীর পঞ্চাঙ্গ আচার পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান।

২১ নভেম্বর—কলিকাতার স্ববিখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থে ৫৪তম জন্মোৎসবে সঙ্কটরুজীর শুভাশিষ প্রেরণ (২)।

২৭ নভেম্বর—রবীবাসরীর চতুর্থ অধিবেশনে যোগ-জীবন লাভ করার জন্য ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আত্মগত্য গ্রহণের নির্দেশ।

৪ ডিসেম্বর—আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্কটরুজীর বাণী।

## (২) সঙ্কটরুজীর শুভাশিষ :

“অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমি শুনিযাছি আজ আপনাব জন্মতিথি। কল্পদিন এতোক মানুষেরই প্রিয়তম। কেননা এই দিনেই সে নিজের জীবনের কর্তব্য-নির্ধারণ করিয়া লওয়ার অবকাশ পায়।

আপনি বাংলার কৃতী সন্তান। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। এই দিনটি আপনার অত্যন্ত প্রিয় অন্তর করিয়াই : আমি আশীর্বাদ পাঠাইলাম। আশা : এই আশীর্বাদ অন্তরের বাণী বহন করিবে জানি, তবুও কয়েকটি নিষ্টার আশ্রয় কবিতা আমার অন্তরের আশীর্বাদ প্রেরণ করিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবি—আপনার জীবন লক্ষ্য হউক। আপনার আত্মার অভ্যুত্থানের আকৃতি আমার সজল হউক। আপনার নিঃশ্রেয়স্ কামনা করি।”

ভবদীয়  
শ্রীমতিলাল রায়

- ৮ ডিসেম্বর—শ্রীশ্রীসজ্জননীর বিংশ বর্ষীয় তিরো-  
ভাবোৎসব। পঞ্চ দিবসব্যাপী উৎসবে সমবেতোপাসনা,  
ধ্যান, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, সজ্জাবাণী পাঠ, নাম-যজ্ঞ,  
পূজা, দিবসব্যাপী হোম-যজ্ঞ, কীর্ত্তন প্রভৃতি  
অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দিবসে সজ্জগুরুর বাণী প্রদান।  
১১ই তারিখে কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান  
বিচারক চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী ব পৌরোহিত্যে উৎসব-সভায়  
সজ্জগুরুর ভাষণ।
- ১৬ ডিসেম্বর—বেলঘরিয়াস্থিত প্রবর্তক জুট মিলে  
কলিকাতার পূর্ণিমা সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন

অনুষ্ঠিত—প্রবর্তকের অর্থ প্রতিষ্ঠানের কর্মসিগণের  
নিকট সজ্জগুরুর বাণী।

- ২৪ ডিসেম্বর—সজ্জগুরুর সভাপতিত্বে চন্দ্রনগরে প্রবর্তক  
পাঠশালার পরিচালকমণ্ডলীর সভাধিবেশন।

- ৩১ ডিসেম্বর—চন্দ্রনগর প্রবর্তক আশ্রমে নিখিল বঙ্গ  
প্রবর্তক সম্মেলন (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ ধারা অনুসারে  
সমিতির আইনভুক্ত হওয়ার পর) দ্বিতীয় বার্ষিক  
সাধারণ অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা—  
সজ্জগুরুর ভাষণ।

(ক্রমশঃ)



## একখানি পত্র

[পত্রলেখক শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব  
অধ্যাপক। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। বথানময়ে প্রাপ্ত পত্রখানি প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত। প্রঃ সঃ]

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়—

বিগত অগ্রহায়ণ (১৩৬৭) মাসের প্রবর্তকে নোয়া-  
খালী জেলার হাতীয়াস্থ গীতা-ভাবতী মিশনের প্রতিষ্ঠাতা  
ও গুরু মহর্ষি প্রেমানন্দজীর প্রবর্তক সম্পাদক মহাশয়কে  
বিগত অক্টোবরে সংঘটিত চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার  
ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে লিখিত যে পত্রখানি প্রকাশিত  
হয়েছে জানী মানসে তাহা অমুখাবনয়োগ্য

সমগ্র universe চলছে Energy-র বিভিন্ন রূপের  
খেলার মধ্যে দিয়ে। গোড়ায় কিন্তু সেই Energy-  
বিজ্ঞানও একান্ত ভাবে ইহাকে স্বীকার করে নিয়েছে।  
কিন্তু বিজ্ঞান thought wave নিয়ে Superficial  
দু' একটা কথা বললেও, তার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে আজ  
পর্যন্ত কোন চবম কথা বলেনি। মহর্ষিজীর পক্ষে এই  
thought wave সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিলাম।

Energyর উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র uni-  
verse-এ অনন্ত কাল ধরে একটা Balance রক্ষা করেই  
চলেছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞান যে ভাবে আজ স্পুটনিকের  
পর স্পুটনিক মহাব্যোম মণ্ডলে ছুড়ে দিয়ে বিশ্বের জন-  
গণের হাততালি ও জয়ধ্বনি কুড়াচ্ছে তাতে মাটির  
পৃথিবীর উর্দ্ধলোকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সূচিত হলেও  
প্রকৃতির স্বভাবব্রাত ভাবসাম্য রক্ষিত হচ্ছে কিনা, সেই  
কথা বিজ্ঞান ত কই বলতে পারছে না। প্রতিদিন সংবাদ  
পত্রের পৃষ্ঠা খুললেই দেখা যায়, পৃথিবীর কোন না কোন  
স্থানে ঝড়, ঝঞ্জা, প্রাবন, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, মহামারী  
ইত্যাদি আকস্মিক নৈব দুর্ঘটনা একটা না একটা ঘটেই  
চলেছে নিত্য নৈমিত্তিক। ফলে মানুষ পোকা মাকড়ের  
মত এতে প্রাণ হারিয়েছে; যা ৩০৪০ বছর আগে আমাদের  
নিকট ছিল কল্পনার অতীত। এ সমস্ত দুর্ঘটনা মানুষের

অকল্যাণকর thought wave থেকে উদ্ভূত বলে এবং  
প্রকৃতি স্বষ্ট ভারসাম্য মহাব্যোমমণ্ডলে রক্ষিত না হওয়ার  
ফলেই ঘটছে বলে মহর্ষিজী তাঁর পক্ষে পরোক্ষভাবে উল্লেখ  
করেছেন। আধুনিক জড়বিজ্ঞান মহর্ষিজীর এই যুক্তিকে  
অস্বীকার করতে পারবে কি?

বিজ্ঞান মানুষকে এই সমস্ত দুর্ঘটনার পূর্বাভাস  
জানিয়েই আজ ক্ষান্ত, অথচ এই সবের প্রতিরোধে বিজ্ঞান  
আজও সফলতা অর্জন করেনি এবং বিজ্ঞানের  
সেই ক্ষমতাও আজ পর্যন্ত জন্মাননি। বিজ্ঞানের  
ছাত্র হয়ে বিজ্ঞানের এই imperfection আমার পক্ষে  
অনস্বীকার্য।

নোয়াখালি চট্টগ্রামের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও  
জলপ্রাবন ঘটায় একশ কুড়ি মাইল বেগে বঙ্গোপসাগর  
থেকে উদ্ভিত হায়ে উপকূল ভাগের দিকে ছুটে আসছে বলে  
ঘটনার প্রায় ৪৮ খণ্টা পূর্বে রেডিওতে প্রচার করা  
হয়েছিল। কিন্তু এই বিরাট Energyকে প্রতিরোধ  
করবার ক্ষমতা বর্তমান বিজ্ঞানের ছিল না বা এই বিরাট  
Energyকে Concentrate করে তাকে বিশ্বমানবের  
কল্যাণে নিয়োজিত করতে বিজ্ঞান পারেনি। তাই  
মহাব্যোমমণ্ডলে যতই স্পুটনিক ছুড়ে দিয়ে বিজ্ঞান  
হাততালি কুড়াক না কেন তার প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ  
করতে না পারা পর্যন্ত ইহার স্বার্থকতা কোথায়? মহর্ষিজী  
তাঁর পক্ষে বিশ্বের সমগ্র মানবাত্মার পক্ষ থেকে যে  
মহাজিজ্ঞাসার অবতারণা কবেছেন বিজ্ঞানী সমাজ তাহার  
কি উত্তর দেয় তাহা জানার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা  
রইলাম। ইতি গুণমুগ্ধ—

২৭শে মার্চ, ১৯৬১

শায়ের আহম্মদ কামরান

শিববাড়ী রোড, ময়মনসিংহ

এম, এস, সি

## সহমরণ

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার এ্যাট-ল

সর্কেশ্বর সামান্য লেখাপড়া জানা একজন বেকার।  
বড় কষ্ট। আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ নেই।

পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছিল সে পয়সা ছড়ান  
আছে কলিকাতার রাস্তায়—কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়।  
ঘুরতে ঘুরতে একদিন গাড়ী চাপা প'ড়তে প'ড়তে সে  
বোঁচে যায়, চোট একটু খেয়ে।

গাড়ীর মালিক আঘাতপ্রাপ্তকে গাড়ীতে তুলে নেন।  
তিনি তাকে কিছু টাকা দিতে যান, সে তা নেয় না।

মালিক খুনী হ'য়ে আলাপ করেন তার সঙ্গে। আলাপ  
ক'রতে ক'রতে ব'ললেন, আমার জমিদারীতে পাঠশালার  
কাছে বসাতে পারি তোমাকে, তুমি যদি চাও।

সর্কেশ্বর বলিল ছজুর যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন,  
আমি যাবো।

কলিকাতার রাস্তাতেই সর্কেশ্বর পয়সা কুড়াইয়া  
পাইল। তাহার চাকরী হইল। সর্কেশ্বর দেখিল  
পাঠশালাটি মামুলী ধরনের নহে। পণ্ডিত দু'জন যারা  
আছে তারা কর্মক্ষম। উৎসাহিত হইয়া সে কাজ আরম্ভ  
করিল, কয়েক মাসের চেষ্টায় পাঠশালার ক্রমোন্নতি যাহা  
ঘটিল, তাহাতে সেও যে কাজের লোক তাহা বোধ  
হইল সকলের।

আরও কয়েকমাস সর্কেশ্বর গ্রামে একজন জ্ঞানবিৎ  
লোক হইয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল গ্রামের যুবসম্প্রদায়  
তার খুবই পক্ষপাতী। তাহাদের আনন্দ-উৎসব, খেলা-  
ধূলা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সর্কেশ্বর পণ্ডিত আগ বাড়াইয়া  
তাহাদের সহিত যোগদান করে। নূতন কোনও  
কিছু করিতে হইলে যুবকেবা সর্কেশ্বর পণ্ডিতের সহিত  
পরামর্শ করে। ছাত্রদের এবং অগ্রাঙ্ক গৃহস্থের ঘরে নিমন্ত্রণ  
হয় তার প্রায়ই। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, আদ্যশ্রাদ্ধ, শনি ও  
সত্যনারায়ণ পূজা প্রভৃতির কোনোটাতে সে বাদ পড়ে না।

সর্কেশ্বরের কাজকর্ম ও জনপ্রিয়তার সংবাদ পাইয়া  
জমিদার খুব খুসী। তাহার ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়া  
পাঠাইলেন সর্কেশ্বরের যাহাতে কোনো বিষয়ে কোনও  
অহুবিধা না হয়, তাহার উপর নজর রাখিতে।

একটি অপ্রিয় ঘটনায় স্থানীয় যুববৃন্দ উত্তেজিত হয়  
খুবই। সর্কেশ্বরকে বলে, এর হেস্তনেস্ত ঘেঁষকম ক'রে  
হ'ক করাতে হবে। মগের মূলুক নাকি! যার মূলুক তার  
ম্যানেজারকে উত্তেজনার কথা সর্কেশ্বর জানায়। তিনি  
তা পুলিশকে জানান। পুলিশ আশ্বাস দেয় যথাসাধ্য করা  
হবে। কয়েক দিন যেতে না যেতে অপহৃত্যোটেক পাওয়া  
যায় ঘটনাস্থলের কিছু দূরে যারপরনাই শোচনীয় অবস্থায়।  
সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ তাহাকে ধানায় লইয়া যায় এবং  
সেবাশুশ্রূষা করাইয়া তাহার বস্ত্রব্য শোনে। পিজালয়ে  
তাহার এ সংবাদ প্রেরিত হইলে, তাহার কন্যাকে ঘরে  
লইতে ইতস্ততঃ করে। পুলিশের মারকণ্ড জমিদারের  
ম্যানেজার এ কথা শোনে।

সর্কেশ্বরকে ইহা জানান হইলে, উপায় নির্ধারণ হেতু  
স্থানীয় স্কুলে যুববৃন্দের শরণাপন্ন সে হয়। বিবেচনা করিয়া  
স্থির হয় যে অপহৃত্যুর সম্মতি যদি থাকে ম্যানেজার  
মহাশয়কে ধরিয়া, তাহার বাসস্থান একটা ঠিক করা।  
ভরণপোষণের ভার আপাততঃ যোগাড়ের অহুবিধা হইবে  
না। তাহাই হইল। এক বৃদ্ধার তত্ত্বাবধানে রহিল  
অভাগিনী। প্রস্তাব কেহ কেহ করিল, তাহার বিবাহ  
দিলে ভাল হয়। যুববৃন্দ প্রস্তাব সমর্থন করিল। কার্য-  
কালে কিন্তু পাত্র মিলিল না। তাহা তো মিলিলই না,  
উপরন্তু লোকবিশেষে নির্মম কটুজি বর্ণের বিরাম রহিল  
না। অতিভাবিকা বৃদ্ধার কাণেও পৌছাইল, স্ততরাং  
পাঁচ কাণ হইতে বিলম্ব হইল না সে গ্রামে। হাসি-মস্তুরায়  
পল্লী মুখরিত হইল।

হতভাগিনীর পিজালয়ে মাছিটা পর্য্যন্ত তাহাকে ঘৃণা  
করে। পল্লী সববয়সী যাহারা তাহাকে স্নেহ করিত,  
ভালবাসিত, তাহারা আজ কত দূরে। সকলেই তাহার  
সম্বন্ধে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে। তাহার  
অপরাধ? সে পতিতা। যারা সেজ্ঞ দায়ী, তারা স্বচ্ছন্দে  
জীবনযাত্রা নির্বাহিত করিতেছে। অথচ তাহাদেরই  
পশুবৃত্তির বলি সে। আর ভাবিতে পারে না সে। উদ্ভিষা  
দাঁড়াইল। উদ্ধৃদিকে চাহিয়া ঘোড়হস্তে বন্দনা করিল

অদৃষ্টকে। ক্ষণপরের ঘটনা। গভীর এক ক্র্যা। আপনাকে নিষ্কিঞ্চ করিতে যাইতেছে হতভাগিনী। অজানা একজন হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, ছি মা আত্মহত্যা! ভাল, হত্যা আপনাকে তুমি করিয়াছ। এখন তোমার নব জীবন। যাত্রা কর মা নূতন করিয়া। চল মা আমার সাথে। তোমার প্রিয়তম যে তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

সর্বেশ্বরও দলবল সহ মেয়েটিব তল্লাস করিতে কল্পর করে না। বুধা চেষ্টায় তাহা পরিণত হয়।

অকৃতকার্যতার ক্ষোভ ও হুশিষ্টায় সর্বেশ্বরের হৃদয় ব্যথিত। নদীর ধার দিয়া সর্বেশ্বর প্রত্যহই কার যেন খোঁজ করে। ক্রান্ত হইয়া একদিন নদীতীরে বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়া তাহাকে হাসিয়া বলিল, পাঠশালা কি আজকাল জলে ভাসাইয়া তাহার ওজনের পরীক্ষা কার্য চলিতেছে?

এই কৌতুককর প্রশ্নে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া সর্বেশ্বর বলে, আপনি আমাকে চিনেন দেখিতেছি। যাহা হউক কি বলিতেছেন আপনি বুঝিতে পারিলাম না।

প্রধান পণ্ডিতের পক্ষে ইহা গৌরবের নহে। নাম-যশঃ আপনার খুবই শোনা যায়। শিক্ষা দেন কচিকাঁচাদের কি, জ্ঞানেন তা আপনি। ‘ক’ লেখা, খ লেখা, এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দান চ’লেছে নিশ্চয়ই। জিজ্ঞাস্তা সে সম্বন্ধে কিছু নেই। ওই পদ্ধতিতেই কি আপনি সম্বৃত?

সর্বেশ্বর—ওই চিরন্তন পদ্ধতিই ত সর্বজনমাতা। ‘অনস্বীকার্য’ হাসিয়া বলেন প্রশ্নকারী। বলেন তিনি হাসিতে হাসিতেই, ধরুন যদি সেখানে, লিখি ক-এ কৃষ্ণ, খ-এ খুষ্ট—

সর্বেশ্বর—বুঝেছি। কিন্তু আমারই সে শিক্ষার অভাব! পারব না ত’—

উত্তর—শিখুন। শিখবেন?

সর্বেশ্বর—শিখাবে কে?

উত্তর—আরও পাঠশালা আছে। তবে সেখানে ছাত্রের সংখ্যা বড় কম। বলেন যদি তার সম্বন্ধ জানিতে পারি—

সর্বেশ্বর—বুড়ো শালিক কি প’ড়বে?

উত্তর—ছেলে বুড়োর সমাদর সেখানে সমান। ভেবে দেখো। চললুম এখন—

নত হইয়া স্তম্ভিত ছিল সর্বেশ্বর। মুখ তুলিয়া দেখে তিনি নাই, চলিয়া গিয়াছেন।

কি করে! সর্বেশ্বরও প্রত্যাগমনের পথে পা বাড়াইল।

জমিদার তাঁর জমিদারীতে আসিয়াছেন। বহুকাল পবে আসিয়াছেন। তাহাতে বড় খুশী প্রজারা। সর্বেশ্বর গেল প্রণাম জানাইতে। সাক্ষাতে, সে তাহাকে জানাইল যে সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে চাহে।

জমিদার—কেন? কেন?

সর্বেশ্বর—ভাল লাগছে না।

জমিদার—একমাস পরে যাইতে পার। ইচ্ছা হয় কলিকাতার আপিসে দেখা করিও।

সেই সময়ে নদীতীরে পরিচিত সেই সৌম্যদর্শন ব্যক্তি আসিয়া জমিদার মহাশয়কে আশ্রমে যাইবার আহ্বান জানাইলেন। আগ্রহভরে গ্রহণ করিলেন আহ্বান জমিদার। বাহিরে সর্বেশ্বর অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই স্তম্ভিত প্রাণপাত করিল সর্বেশ্বর।

আশ্রমী—এই যে পণ্ডিত! শুভমস্তু।

সর্বেশ্বর—আশ্রম দর্শনে আমার অভিলাষ—

আশ্রমী—যখন খুশী ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে।

সর্বেশ্বরের দলবল সর্বেশ্বরের কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবাব সংবাদে ক্ষুব্ধ। বলিয়া কহিয়াও তাহার তাহার মন ফিরাইতে পারিল না। বিদায়ের দিন আসন্ন। সর্বেশ্বর প্রাপ্ত সংবাদাছুষায়ী রওনা হইল একদিন আশ্রমাস্তিমুখে। অপরাহ্নের শেষ। আশ্রমে পৌছাইল যখন তখন সন্ধ্যার অনেক দেবী।

আশ্রমের দ্বার ছাড়াইয়া সর্বেশ্বর ভিতরে যাইবাব পথে দেখিল, আশ্রমী বালক-বালিকাদের লইয়া ভূগপ্রাঙ্গণে খেলাধুলা করিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সর্বেশ্বর সে প্রীতিপ্রদ দৃশ্য। এক সময়ে ‘আশ্রমী’র চ’খ পড়িল সর্বেশ্বরের উপর। তখন খেলা শেষ হইয়াছে। আনন্দ করিতে করিতে খেলুড়েরা



ছুটিয়া চলিয়া গেল। জানাইয়া গেল, মহারাজ আগামী কাল আবার খেলা হবে।

মহারাজ! আশ্রমের মহারাজ। তিনি ইঙ্গিত করিলেন সর্বেশ্বরকে। সর্বেশ্বর তাঁহার কাছে গেল। মহারাজ বলিলেন, পণ্ডিত, ছেলেমেয়ে চরাবার এই প্রথম পাঠ।

সন্ধ্যা সমাগমে সর্বেশ্বর শুনিল ছেলেমেয়েরা একযোগে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। কর্ণকুহর তার শীতল হইল। মন প্রফুল্লিত হইল। সর্বেশ্বর মহারাজকে বলিল, এই কি দ্বিতীয় পাঠ? মহারাজ বলিলেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মার্জনা করিয়া শুদ্ধবস্ত্রাদি পরিয়া স্তোত্র পাঠই দ্বিতীয় পাঠ।

অতঃপর দেবদেবী অধিষ্ঠিত আশ্রমত্রীর অবধি রহিল না। আলোকসজ্জা ও ধূপধূনা উচ্ছলিত ও আমোদিত হইয়া উপস্থিত জনমনে ভক্তিব্যবের উদ্বেক করিল।

পূজা সমাপনান্তে আরত্ৰিক। সে এক অলৌকিক দৃশ্য। মহারাজ সাদোপাঙ্গসহ বসিয়া আছেন একদিকে। অত্রদিকে আশ্রমাস্তর্গত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

তাহাদিগকে বিরিয়া বসিয়াছে কত পুরুষ, মহিলা।

পূজারী আরত্ৰিক আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে উথিত হইল আরত্ৰিক গান। ছাত্রছাত্রী সন্ন্যাসীচয় ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গানে উন্মত্ত একযোগে। দূর হইতে শুনিলে মনে হইবে মাত্র একটা কণ্ঠে স্তোত্রগীত গীত হইতেছে। আরত্ৰিক শেষে দেবতা-প্রণাম ও প্রসাদগ্রহণ, উপস্থিত সকলেরই মুখচোখ আনন্দময়। প্রসাদগ্রহণান্তে বালকবালিকারা গেল পড়াশুনা করিতে। সন্ন্যাসীরা গেল নিজ নিজ কার্য্য করিতে, অত্যাশ্র ভক্তেরা গেল স্ব স্ব গৃহে মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করাইয়া।

স্নেহভরে মহারাজা বিস্ময়বিমূঢ় সর্বেশ্বরকে বলিলেন, এই পাঠ শিক্ষার কথাই সেদিন তোমাকে বলেছিলাম।

সর্বেশ্বর প্রণত হয়ে বলে, ধন্য হলাম আমি। আপনার ইঙ্গিতমত চলবার চেষ্টা আমি করবো পাঠশালায় ও অত্র।

মহারাজ বলিলেন, বলতে পার আমরা সন্ন্যাসী। লোকহিত সাধনই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। তোমাদের আশ্রম ঘরে। ঘরে থেকে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমী হয়ে যে কাজ করতে পার তার তুলনা নেই। আদর্শ গৃহস্থাশ্রমের পুণ্য

অসীম। আশীর্বাদ করি যথার্থ গৃহস্থাশ্রমের যোগ্য আশ্রমী যেন তুমি হও।

দূরে গান হইতেছিল—

আসা যাওয়া কেমন মায়া

ভাঙ্গবে তোমার জারিজুরি

ওমা তোর মায়াতে বাঁধব তোকে

তোরাই চরণ শিরে ধরি।

উৎকর্ণ হয়ে গান শুনছিল সর্বেশ্বর। গান শেষে সে আপন মনে বলিল, মধু মধু মধু!

লোকে বলে ও অভাগিনী। না না তা' ও নয়; ও সুভাগিনী, তেজস্বিনী—কি বিশ্বাস, কি দম্ভ, কি জ্ঞোর ওর ইষ্টদেবতার ওপর।

গায়িকার কথা মহারাজ বলিলে সর্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, উনি কি আশ্রমবাসিনী?

মহারাজ—আশ্রমের দাসী। সেবাধর্ম্মই ওর ধর্ম্ম। গৃহস্থকন্ঠা। ছুরিপাকে হ'ন আশ্রমবাসিনী। ছুরিপাক সেটা নয়, নবজীবন লাভের সুসহায়ক।

সর্বেশ্বর—এখানকার কর্ম্মে ইস্তফাদান আমার গ্রাহ্য হয়েছে। এই স্বর্গে এসে কিন্তু ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে।

মহারাজ—ইচ্ছা যদি হয়, তোমার মনোমত স্বর্গ উপভোগ করতে পার ক'দিন।

সর্বেশ্বর—অমুমতি যদি পাই, যে ক'দিন আছি, সে ক'দিন এখানে আসব।

মহারাজ—ধুবই খুসী হব এলে।

সর্বেশ্বর যাবার পরে মাধবী (আশ্রমের সেবিকা) এসে বলে, বাবা, আপনার সেবার আয়োজন প্রস্তুত। মহারাজ, ঠাই লাগাব?

সেবা করিতে করিতে মহারাজ বলেন, মাধবী মা, বাইরে যেতে হবে ছু'দিনের জন্য। যাবো আগামী কাল। সাবধানে থেকো।

মাধবী—ছু'দিন শব্দর মহারাজই বোধ হয় দেখাশুনা করবেন?

মহারাজ—হ্যাঁ মা।

মহারাজ আশ্রম থেকে বেরলেন প্রাতে। সর্বেশ্বর আশ্রমে এলো। সন্ধ্যার সময়ে। মহারাজ নেই শুনে আরজিক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে গেল। পরদিন প্রাতে এসে প্রাতঃকালীন পূজা, বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে ঘাইবার পূর্বে কার্যকলাপাদি লক্ষ্য করিয়া আশ্রমের তৃণ-প্রাঙ্গণে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এমন সময়ে নিকটেই নারীর তিরস্কারস্বচক চীৎকার তাহার কাণে আসিল—“দূর হ’য়ে যা পশু, দূর হ’য়ে যা পশু। রক্ষা কর, ওগো রক্ষা কর।” এদিক ওদিক দেখিয়া ছুটিয়া গেল সর্বেশ্বর যেদিক হইতে কাতরোক্তি শুনা যাইতেছিল সেই দিকে। পৌছাইল বারান্দা সংলগ্ন একটি কক্ষের নিকট। দেখিল কক্ষদ্বার অর্ধকৃত। কক্ষ মধ্যে এক নারীকে কক্ষ হইতে বাহিরে আসা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে দ্বারে দণ্ডায়মান ব্যক্তি। সাহায্যের জন্ত চিৎকার করিতেছে নারী।

সর্বেশ্বর দৌড়াইয়া গিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল, সাবধান। সেই চীৎকারে দ্বারীর চেষ্টা শিথিল হইল। দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভূমিতে পড়িয়া আঘাত পাইল।

এমনি সময়ে মহারাজ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, কি হয়েছে সর্বেশ্বর?

সর্বেশ্বর ঘটনার বিবরণ দিল।

মহারাজ—ওঃ! কিঙ্কর, আপিস ঘরে গিয়া অপেক্ষা কর। সর্বেশ্বরকে বলিলেন, তুমিও ওর সঙ্গে যাও।

মাধবী কাদিয়া পড়িল মহারাজের পায়ে। মহারাজ অভয় দিলেন, স্থির হও মা। এসো আমার সঙ্গে।

মহারাজ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এমন সময়ে শঙ্কর মহারাজও আসিয়া উপস্থিত।

আপিস ঘরে যাইয়া মহারাজ মাধবী, সর্বেশ্বর ও কিঙ্কর ব্রহ্মচারীকে তাহাদেব বক্তব্য লিখিয়া দিতে হুকুম করিলেন। পালিত তাহা হইলে মহারাজ সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, লিখিত ঘটনার কথা মোহান্তের নিকট আমার লিপিসহ প্রেরিত হইতেছে।

মোহান্তের নিকট হইতে পত্রোত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কিঙ্কর ব্রহ্মচারীর আশ্রমে থাকা নিষিদ্ধ হইল। মাধবী

পূর্ববৎ নিজ কক্ষে অবস্থান করিবে। সর্বেশ্বর সাময়িক-ভাবে কলিকাতা যাওয়া রহিত করিলে বাধিত হইবে।

কিঙ্কর দৃঢ়ভাবে বলিল, এই রমণীর পূর্ব ইতিহাস এখানের সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি এবং জমিদারের নিকটও বলিব।

জমিদার স্বয়ং স্বকর্ণে সে কথা শুনিলেন। আশ্রম সংক্রান্ত আপীল শুনিবার স্পষ্ট জমিদার রাখে না। মোহন্ত মহাশয়ের বিবেচনায় আসামী যদি অপরাধী নাব্যস্ত হয় তাহা হইলে কেবল আশ্রম নহে, জমিদারীর মধ্যে কোথাও তাহার স্থান হইবে না, ইহা স্থানিষ্ঠ।

জমিদার আরও বলিলেন, “আমার বিশ্বস্ত বন্ধু সর্বেশ্বরকে এখানে দেখিয়া খুবই খ্রীত হইলাম। দুঃখের বিষয় সে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা ঐকান্তিক ভাবে তাহার মদল কামনা করি।”

মহারাজ বলিলেন, সর্বেশ্বরই আশ্রমের আশ্রিতাকে পাষণ্ড কিঙ্করের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। মোহন্ত মহারাজ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করা সর্বেশ্বরের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। আশা করি আপনি এজন্ত অপরাধ লইবেন না।

জমিদার—অপরাধ! কর্তব্য করার জন্ত অপরাধী! যে কয়দিন প্রয়োজন সর্বেশ্বর বরণীয় অতিথি রূপে আমার মহলে—

সর্বেশ্বর—অশেষ কৃপা আপনার। বিনীত নিবেদন, আপনি আমাকে আশ্রমে থাকিবার অল্পমতি দান করুন।

সম্মানে জমিদারকে বিদায় দান করা হইল।

বহুদিন ধরিয়া মহারাজের চিন্তার অবধি নাই। ভগবৎপরায়ণের এ অবস্থা অপ্রত্যাশিত। চিন্তা তাঁহার মাধবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। মাধবীকে একান্তে পাইয়া তিনি তাঁহাকে সকল দিক বুঝাইয়া বলিলেন এবং শেষে জানানাইলেন। মাধবী, তোমার বিবাহ দিবস সঙ্কল্প আমি করিয়াছি।

মহারাজের বাবো মাধবী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মহারাজ তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, ভেবোনো মা, ভাবনার ভার ভগবানের উপর দাও। তিনি যে ভাবে চালাব, চলো তুমি সে পথে বিধিশূন্য চিন্তে।

মাধবী মন্দির দ্বার সম্মুখস্থ অলিন্দে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। চক্ষুদ্বয় তার অশ্রুসিক্ত। নীরবতা বিরাজ করিতেছে মন্দিরের চারিস্থিতে। অলিন্দ শোভিত চিত্রাঙ্গির মধ্যে একখানি চিত্রে তাহার চোখ পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শুনিল দূরগত একটা গানের কলি—

‘কলঙ্কিনী নইগো আমি কলঙ্কিনী নই

বাঁশীর সুরে মন মজে যার কলঙ্ক তার কিসে সহি।’  
মাধবী কি বাঁশীর সুরে মজেছে। স্বতঃই ভাবে, নবধনশ্রাম! বনমালা দোলে তোমার অঙ্গে গরব ক’রে। বনমালা শোভিত তুমি হাস, গাও, নাচ। আবার মধুবানগরে প্রতি ঘরে ঘরে তাদের বাজার গরব করে। বলে রাজ্য ঐশ্বর্যের কথা। বলে কুঞ্জরাণীর কত কথা। রাজ্যাব গলে বনমালার বদলে দোলে মণি-মুকুতার মালা। ব্রজের মালা ব্রজে পড়ে আছে। শুকায়েছে তা’ ধূলা-ধূসরিত হ’য়ে। এ অপমানের, এ কলঙ্কের গ্রামি আর তার সন্ধান। কোথা ক্রিষ্টজিম ঠাম, বাঁকা শ্রাম!

মাধবী আত্মবিশ্বাস, ভাবসাগরে নিমজ্জিতা, মন্দির দ্বারাদি উন্মোচনের সময় সমাগত। উন্মোচনকারীদের একজন, ‘কে ও কে ও’ বলিয়া ডাক দেয় একাধিকবার। মাধবী আত্মহারা হইয়া উঠিয়া বসিল ও নিজের ঘরের দিকে চলিল।

তখন বালক বালিকারা খেলাধুলা সাবিয়া নিজ নিজ স্থানে বাইতেছে। মহারাজ সর্বেশ্বরের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। সর্বেশ্বর ঈশ্বর চঞ্চল। সেই অংশায় বলিল সে—মহারাজ আপনার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে সহজ নহে। আপনি এ গুরুভার আমার উপর দিতে মনস্থ করিয়াছেন সে কারণে গৌরব করা আমার উচিত। তাহা করিলেও অন্ত্যস্ত কারণে খুবই ইতস্ততঃ ভাব আমি বোধ করিতেছি।

মহারাজ—কারণগুলি কি?

সর্বেশ্বর—সর্বপ্রথম, পরিবার প্রতিপালনে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়—সামাজিক বাধা-বিপত্তি। তৃতীয়—মাধবীর মতামত জ্ঞান না থাকা।

মহারাজ—তৃতীয় হইতেই আরম্ভ করা যাক; আমার মতামতই মাধবীর মতামত। সে শিক্ষা নিম্নেকের

দিয়াছে, আশ্রমে আসাব মুহূর্ত্ত হইতে। দ্বিতীয় কারণ তোমার মুখে শুনিব আশা করি নাই। সত্যের সম্মানকারী তুমি। সত্যাহুসরণে ভীত তুমি নও, ইহাই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। বুঝিলাম সে ধারণা করা আমার ভুল হইয়াছিল। বন্ধনে আমি তোমাকে ফেলি নাই। মুক্তির প্রাণ সে কাবণে উঠে না। প্রথম কারণ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা আর না থাকিলেও শুনিয়া রাখ, ও সমস্তা পূরণ না করিয়া প্রস্তাব তোমার কাছে করা হয় নাই।

বলা শেষ হইল। মহারাজ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে উঠিলেন। সর্বেশ্বর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজাস্তে আরাত্রিক কালে দেখা গেল, সর্বেশ্বর মন্দিরালিন্দের একাংশে বসিয়া।

শয়নে সর্বেশ্বর আদীন। কক্ষ অন্ধকার। সর্বেশ্বর কিন্তু ঘুমাইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতেছে।

সন্ধ্যারাত্রিক কালে সর্বেশ্বরের আরাত্রিক-মন কতটা ছিল না-ছিল সে জানে। তবে তার চোখ ছিল মাধবীর দিকে, কেহ কেহ ইহা লক্ষ্য করে। লক্ষ্য মাধবীর কিন্তু দেবতার পানে। প্রাণ ভরিয়া আরাত্রিক গান গাহিতেছে তন্ময় হইয়া ইহাও সর্বেশ্বর নিবীক্ষণ করে।

ভক্তিমতী মাধবী সর্বেশ্বরের চক্ষে তখন সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। মহারাজের মুখে সর্বেশ্বর শুনিয়াছে যে, বালিকার ধর্ম—সেবধর্ম। ভগবতপরায়ণার সেবিকা মূর্ত্তি কল্পনায় সর্বেশ্বর নিজ মনে অঙ্কিত করিল।

এই দেবতুল্যার উপর নির্মম পাশবিকতা! তাব উপর নিষ্ঠুরতা সমাজের! সমাজ পাশবিকতা নিবারণেই অক্ষম। নির্দোষী, নিষ্পাপের তাড়নে সক্ষম। এই সমাজের সত্যাহু-রাগ, নিয়ম নির্ণায় অহুবাগ! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, কীটাত্মকীট আমি। আমি কি করিতে পারি। মহা-মহোপাধ্যায় এই সমাজের স্বপক্ষে, পাঠশালার পণ্ডিতের বিপক্ষতায় কি ফল ফলিবে, তার বিনাশ ভিন্ন।

অকস্মাৎ উদ্বেজিত স্বরে সর্বেশ্বর বলিল, বিনাশই শ্রেয়ঃ। সত্যমেব জয়তি। জীব শিব। শিবোহং।

শিবোহং। কালী কালী মহাকালী। 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণমতিষ্ঠ, যাবৎ সূধা পিবাম্যহম্' রবে পর্তনন্দিনী তোমারই রূপে অহর ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই রূপে আয় মা। সতীর মর্যাদা রক্ষা করিতে সমাজচেতনা জাগিয়ে দে মা। কতকাল মা কত কাল সমাজের এ দুর্বলতা নারী-নির্ধ্যাতনে। নিরপরাধিনী সীতার লাঞ্ছনা হ'তে কত লাঞ্ছনা নারী নীরবে সহ করেছে। ধ্বংস যজ্ঞে এই আহুতি দান জীব-শিবের কি মহান অভিযান।

অনিজ রজনী পোহাইল সর্বেশ্বরের এইভাবে। প্রাতে মহারাজের সহিত দেখা হইবামাত্র সর্বেশ্বর বলিল, মহারাজ আমি প্রস্তুত।

মহারাজ—জানিতাম আমি তুমি জয়ী হইবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।

শুভ বিবাহ হইল জমিদার মহাশয়ের আয়োজনে তাহারই কাছারীর একাংশে সমাজের নানা স্তরের ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ও উপস্থিতিতে। শাস্ত্রীয় বিধিতে অগ্নি ও নারায়ণকে প্রধান সাক্ষ্য রাখিয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহান্তে সঙ্গীক সর্বেশ্বরের কলিকাতা যাত্রা করিবার ব্যবস্থা হইল। সর্বেশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী দক্ষিণ কলিকাতায় যুগলের বসবাস করিবার ব্যবস্থা হইল।

জমিদার মহাশয় অনতিবিলম্বে কলিকাতায় আসিলেন এবং সর্বেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার ও মাধবীর তত্ত্বাবধানে বালকবালিকার শিক্ষাপযোগী নূতন ধরনের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তাহাদের বাসস্থান সংলগ্ন একটি বাটীতে।

বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরের পাঠ্যানুচির কারণে, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর অভাব ঘটিল না। উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত হইল।

বিদ্যালয় চালু হইবার কয়েক মাস পর বিশেষজ্ঞের আসিলেন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ।

পরিদর্শকদের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক অভ্যর্থনা করাইলেন সর্বেশ্বর। বলিলেন, পুরাতন টোলের ধরণ মনে রাখিয়া তাহা কিভাবে আধুনিক কালাপযোগী করা যাইতে পারে পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

অনুসরণে ইহারই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কয়েক মাসের কার্যাক্ষল কি দাঁড়াইয়াছে আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মাধবী বলিল, মেয়েরা উপযুক্ত কন্ঠা ও সহোদরার স্থান লইতে পারে তাহাদের শিক্ষাদানে সেই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে।

পরিদর্শকেরা পৃথক পৃথকভাবে ছেলেমেয়েদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন এবং তাহা করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। চলিয়া যাইবার পূর্বে বিদ্যালয়ের নথিতে লিখিত হইল—

This is an institution of which we are proud. It owes gratitude of us all.

এবার আশ্রমের দাসী মাধবীকে দেখা যাউক সর্বেশ্বরের গৃহিণীরূপে।

বাসস্থানে তিনটি মাত্র ঘর ও একটি অলিন্দ। ইহা ভিন্ন একটি পাকঘর আছে। সবটুকু স্থানই পরিচ্ছন্ন, মার্জিত। যখনই কেহ দেখিবে এই ঘরদুয়ার তাহারই মনে হইবে, এইমাত্র ইহা পরিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ মাধবী এ কার্য করে দিনে মাত্র দুইবার। পাটকা পরিধানে কাহারও কক্ষে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

কক্ষত্রয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট আশ্রমের ধরণে দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রপটে সজ্জিত। অলিন্দের সম্মুখেই এই ঘরটি অবস্থিত। অলিন্দ হইতেই পূজা-কক্ষের সবকিছু দেখা যায়। পূজার্চনা করে মাধবী স্বয়ং নির্দিষ্ট সময়ে।

পাকও করে মাধবী নিজ হস্তে। বাসন ও কাপড় ধোয়াও তাহার কার্য। নিখুঁত করিয়াই সে সব কাজ করে। এত করিয়াও তাহার অবকাশের অবধি নাই। বিদ্যালয়ে যথাসময়ে হাজিরাও নিয়মিতভাবে চলে।

পাড়াপ্রতিবেশীদের কাহারও কাহারও সহিত অল্প-বিস্তর বেশ জানা-চিনা হইয়াছে। মাধবী স্বল্প ও মধুর-ভাষিণী। গিন্নীবান্নীদের বলিতেই হয় বেশ মেয়েটি। সমবয়সীরা হাসিয়া বলে—কলিকাতায় কথার উপর টেক্স এখনও বসে নাই। আজকালকার মেয়ে তারা। পোমাকে-আসাকে আপ-টু-ডেট। মাধবীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা কিন্তু তাহারা চাহিয়া চাহিয়া দেখে। আর দেখে তাহার কর্মক্ষমতা ও কর্তব্যপরায়ণতা।

সর্বেশ্বর সাতো নাই পাঁচো নাই। ঘরসংসারের যাহা কিছু করিবার করে সে নীরবে আর বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে সতত। বিদ্যালয়ের খ্যাতিকথা লোকের মুখে মুখে। প্রধান শিক্ষক সে কারণে পরিচিত এবং অপরিচিতেরও সমাদৃত। পল্লীতে কাজেই একটা বিশিষ্ট স্থান আপনা হইতেই হয়।

এ সব বলা হইলেও বলিতে বাকি রহিল যেটুকু সেটুকুই আসল। যে অবস্থায় মাধবীর বিবাহ হয় তাহার বিন্দুবিদগুণও এখানকার কেহ জানে না। স্বামী প্রভি জীও জী প্রভি স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন সজ্জাবের দৃষ্টান্তে সকলেরই মনে হয়, ইহার আদর্শ নম্পতি।

স্বামীজীব মধ্যে কথোপকথন শুনিবার অবকাশ তাহারা কখনও পায় নাই।

রঙ্গ-রহস্য বা হাসিখুসি দুইজন্যর মধ্যে তাহারা বড় একটা শুনে নাই বা দেখে নাই। কেহ কেহ রঙ্গ করিয়া তাই পরস্পরের মধ্যে বলে মাঠারদের স্বভাবতঃই বাসভারী ভাব। এখানে আবার মাঠারলী। ও বাবা যেন বাধা তেঁতুল, কাঁচা ওল।

সর্বেশ্বরের স্বাভাবিক ক্ষুষ্টির অভাব লক্ষ্য করিয়া মাধবীর ভাবনা, উনি কি আমার সহিত জড়িত হওয়াতে এই রকম হইয়াছেন! সর্বেশ্বর ভাবে আশ্রম-অভ্যাস্তা মাধবী কি আমার সংস্রবে অসুখী! কেহ কাহাকেও এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলে না।

একদিন কিন্তু ইহার বৈপরীত্য ঘটিল। আহারাতি উভয়ে শেষ করিয়া শয়ন-কক্ষে যাইবার কিছু পরে মাধবী কোনও বাক্যাড়ম্বর না করিয়া সোজা স্তম্ভি বলিল, তুমি কি আমাকে বিয়ে করে অহুতপ্ত?

সর্বেশ্বর—আমিও ভাবি সদাসর্বদা এই কথা। তুমি বুদ্ধি অহুতপ্ত। মাধবী ভগবানের প্রত্যাশা, সত্যের মর্যাদা রাখতে আমি তোমাকে আমার করেছি। অহুতপ্ত হওয়া—না না, বোলো না, বোলো না।

মাধবী—আমিও ভগবান ও তোমার চরণাশ্রিত। এতেও অসুখী আমি ভাবছ কেমন করে? যুবকযুবতী আমবা। হাঙ্গা চালে চলি না, তাই কি আমি অপরাধিনী?

সর্বেশ্বর—বাঁচালে মাধবী। বুক থেকে আমার পাষণ

নেমে গেল। আমাদের জীবনে আমরা যেন পরস্পরকে এইভাবেই শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

মাধবী—শুনেছি বিয়ে হয় দুজনে স্বর্গে; আমাকে না নিয়ে তুমি পালাবে কোথা—লোকে কান্দুয়া করে এত বয়সেও আমার ছেলেপুলে হ'ল না।

সর্বেশ্বর—ইন্ডুলের ছেলেপুলেদের দেখিয়ে দাও না কেন।

আদর্শ বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতারূপে সর্বেশ্বরের মর্যাদা বাড়িল খুবই। সর্বেশ্বরকে উচ্চশিক্ষিত বলা যায় না। কিন্তু অসাধারণ তাহার সহজ বুদ্ধি। গ্রাম নিষ্ঠাবাদিতা তাহাকে উচ্চাদর্শের পথে চালিত করে। তাহার জ্ঞান তাহার লোকপ্রিয়তার অবধি থাকে না। আশ্রমের সংস্পর্শে আসিবারাত্র তাহার দিব্য জ্ঞানের স্ফূরণ চমকপ্রদ। আশ্রমের মহারাজ সে কারণে ক-এ কৃষ্ণ, খ-এ গুপ্ত সংযুক্ত শিক্ষাদানের আশা পোষণ করেন। জমিদারের সহায়তার কলিকাতায় সঙ্গীক সর্বেশ্বর তাহা চালু করাইতে সমর্থ হন।

অকস্মাৎ দারুণ পীড়ায় সর্বেশ্বর শয্যাশায়ী হয়। মাধবীর সে এক নিদারুণ পরীক্ষা।

জমিদার মহাশয় কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। সব বিফল হইল।

বিফল হইল মাধবীর প্রাণ মন দিয়া সেবা-শুশ্রূষা। সর্বেশ্বরের ইহজগতের সব কিছুই সমাপ্তি ঘটিল।

মাধবী কাঁদিল না। পূজাকক্ষে যাইয়া দেবদেবীকে প্রণাম করিল। তারপর ধীর শাস্তভাবে জমিদার মহাশয়কে জানাইলেন, আমার দেবদেবী যেন মহারাজের নিকট আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই বলিয়া মাধবী স্বামীপদে প্রণত হইল। হাসিতে হাসিতে গিয়া শয়ন করিল, স্বামীর পার্শ্বে স্বামীর শয্যা।

সেই যে শয়ন করিল, আর উঠিল না মাধবী। সতী অহুগমন করিল পতিকে।

বাহিরে বিপুল জনসমাগম। সর্বেশ্বর সঙ্গীক আসিয়াছিল নীরবে। চলিয়া গেল সহস্রের উচ্চ জয়ধ্বনি-সহ বিদায় অভিনন্দন বন্দিত হইয়া।

সমাজের গায়ে আঁচড় লাগিল না।

# সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ কি এবং কেমন ?

ঘটা করিয়া রবীন্দ্র শতবার্ষিকী করিতে গিয়া বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। সাধারণ মানুষ তার মনের মত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াই এতদিন পরিতৃপ্ত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্নানজয়ন্তী উপলক্ষে দেশ-বিদেশ, মনীষী-পণ্ডিত, মূর্খ-সেয়ানা, কবি-অকবি, জ্ঞানী-জ্ঞানীহীন দল রবীন্দ্র প্রশস্তি-লাঞ্ছনার গাহনায় এমনিই মুখর হইয়া উঠিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নির্বিরোধ সাধারণ মানুষের মন ঘুলাইয়া যাইতেছে। ভয় হয় কবিকে অরণ করিতে গিয়া পাছে বিকৃতি-বিস্মরণ অভিজুত না করে! অবশ্য হৈচৈএর ফেন বুদবুদ শূন্যে মিলাইয়া গেলে প্রশান্ত আবহাওয়ায় এই মহাকবি ও মহামনীষির সিংহাসন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের মতই কালে কালে মানুষের চিন্তে চিরন্তন হইবে, ইহা বিনা বিতর্কে বলা চলে।

জাতির জনক ( অবশ্য কংগ্রেস প্রবক্তা ) মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার করেন নাই। আত্মকাননের গাছ-পাতা না গুণিয়া বাছা-বাছা স্মিট ফলের আশ্বাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়া প্রেরণা পাইরাছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুও রবীন্দ্রনাথের নাম না ধরিয়া ডাকিয়া গুরুদেবই বলিয়া থাকেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানব। পণ্ডিতজীর প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের এই দিকটি বেশ খাপ খাইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ব্যাপ্তিরূপ ধর্ম প্রবণতার মূল উৎসটি যে সংক্ষিপ্ত বাঙালীকে বীজাকারে নিহিত, এটি ভাবিতে তিনি চাহেন না এবং তাঁকে বাঙালী ভাবিবার অন্তরায় যে কি তা অবশ্য জটিল রাজনীতির অঙ্ককার গহবরে সংগুপ্ত। সাধারণের তা জানিবার কথা নয়। তবে আমরা স্বদেশী যুগের মনীষী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের নিকট আগেই জানিয়াছি যে, "Rabindranath is above all, a Bengali."

‘কোয়েষ্ট’, পত্রিকার রবীন্দ্র-বিশেষ সংখ্যার (Quest, May 1961) কয়েকটি লেখা বিশেষ স্মৃতিস্মরণীয় দস্তাবেজ ‘Tagore as a Lyric Poet’ শীর্ষক রচনাটি লইয়া রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি বাঙালীর মধ্যে একটু বেশী হৈচৈ পড়িয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই রচনাটি রাখিয়া রবীন্দ্র-স্বর্ণ শোধ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রেমিক কবিরই কাব্য প্রেরণার একটা না একটা মানসী (এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরকীয়া) থাকে বলিয়া স্ববাদ-কুবাদ আছে। রবীন্দ্রনাথেরও না থাকিবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আভিজাত্য, শিক্ষা, রুচি, শীলতা, শিব-সুন্দর সচেতনতা এত প্রথর ছিল যা বিশ্বের কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুধু অল্পমই নয়, অনন্তও বলা চলে। ময়ীষি বিপিন পালের কথায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন “Inherently refined...perhaps the most fine-fibred of our representatives.” এমন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিরিক কবিতা বিচার করিতে গিয়া তাঁর অন্তর্গত জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ের মানস-প্রবণতার এত স্কুল, বিশেষ পারিবারিক ব্যাপারের বিকৃত আবাস্ত্রনীয় উদ্ঘাটনের জন্য স্মৃতিস্মরণীয় এত মাথা ব্যথা কেন হইল তাহা সাধারণের বোধগম্য হওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : “That in course of time he (Rabindranath) and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all; and when the family married him off presumably to prevent scandal, bad got worse and worse untill his sister-in-law killed herself.” রবীন্দ্রনাথের আর একটি আবিষ্কার এই যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি উপনিষদের অর্থ ভেদন বোধগম্য করিতে না পারিয়া নিজের মতলব মত তার বিকৃত প্রয়োগ করিয়াছেন (...apart from occasional mistakes in construing his favourite passages, he habitually distorted their meaning to serve his purpose...)। অথচ বাংলার অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন সবাই জানে যে, রায়মোহনের ধারায় শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর পিতৃ-পিতামহ সকলেই ঔপনিষদিক মর্মে অবগাহিত, লালিত পালিত।

রবীন্দ্রনাথের এই ছবুন্ধির হেতু সম্ভবতঃ ‘কোয়েষ্ট’ পত্রিকার শেষে লেখক-পরিচিতিতে মিলিবে : “Sudhin-dranath Dutt leapt into fame with a book of poems and collection of literary essays warmly commended by Tagore.” এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়িতেছে। জর্নৈক অনিষ্টকারীর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিয়াছিলেন, ‘কৈ মনে পড়িতেছে না তো আমি এই লোকটির কোনদিন কোন উপকার করিয়াছি কিনা।’ অর্থাৎ উপকৃত না হইলে অপকার কেন করিবে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অনেক পণ্ডিত, অর্দ্ধ পণ্ডিত তাঁর আওতায় আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁরই প্রসাদপুষ্ট হইয়া পরবর্তী জীবনে যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহা দেশের লোকের অজানা নয়। কিন্তু এতদিন পরে রবীন্দ্রদত্তের এই পুরোণো লেখাটি প্রকাশ করার গরজ কেন ‘কোয়েষ্ট’ পত্রিকার হইল, এ প্রশ্ন বাঙালীর মনে জাগা স্বাভাবিক। ইহা কি আকস্মিক অথবা অভিসন্ধি-মূলক? এই প্রশ্নের পশ্চাতে যে একটা অভিসন্ধি আছে তাহা প্রবন্ধ শেষের পাদ-মন্তব্য হইতেই অস্পষ্ট হয়। মন্তব্যটি এই : “Reprints of this article can be had from the Secretary, Indian Committee of Cultural freedom, Calcutta centre, 211 Park St, Calcutta-17.” অথচ এই বিশেষ সংখ্যার আর কোন রচনার সম্বন্ধে অস্পষ্ট মন্তব্য করা হয় নাই। এই রিপ্রিন্ট ব্যাপকভাবে বিতরিত হইয়াছে দেশে ও বিদেশে। এই Cultural freedom কমিটির মূল কেন্দ্র ফরাসীর প্যারিসে এবং শাখা প্রশাখার বিস্তৃতি আন্তর্জাতিক। কলিকাতার কেন্দ্রের যারা সভ্য-সভ্যা, তাঁরা সাধারণতঃ তথাকথিত অর্ধাঙ্গীন কবি সাহিত্যিক। ইহাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ও মর্মের সহিত কোন নিগূঢ় পরিচয় যে আছে এমন কোন পরিচয় আমাদের জ্ঞান নাই। দেশ-বিদেশে আত্মখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রচারের এই কমিটি একটা মাধ্যম।

সর্বদেশে সর্বকালেই সমাজে কিছু কিছু ‘বিভীষণ’ থাকেই। তবে বাংলা দেশে ইহার একটু আধিক্য দেখা

যায়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতকে ছেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ‘টাইমস্’ পত্রিকার স্তম্ভে এক বাঙালীই (সিদ্ধমোহন মিত্র) বিরূপ মন্তব্য করেন যে, ‘বন্দে মাতরম’ ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত ‘মার্সেলজ’-এর অল্পকরণে লিখিত এবং তাহারই অক্ষয় বাংলা সংস্করণ মাত্র।’ সেই অগ্নিযুগের সেদিনকার অগ্নিগর্ত মানুষ এই অনাচার সহ্য করে নাই। সেদিন ইহার বিরুদ্ধে বাংলা দেশে এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া উঠে। আজকের দিনের বাঙালীর কথা স্বতন্ত্র। সেযুগে দেশমাতৃকাকে বন্দনা করিয়া বাঙালী তরুণ হাসিতে হাসিতে ফাঁদীকাঠে ঝুলিয়াছে, আর আজ বাঙালী দেশ পাইয়াছে, কিন্তু মাকে হারাইয়াছে। দেশস্বাধীনতা আজ আত্মবন্দনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা আছে কিন্তু সংবেদন নাই। মা মাটি হওয়ার ফলেই বুদ্ধদেব বোস, তাঁর জামাতা জ্যোতির্শ্রম দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ তথাকথিত শিক্ষিত শিল্প-সাহিত্য সমালোচক নির্বিরোধে রবীন্দ্র-কুৎসা প্রচার করিয়া আত্মজাহির করিতে পারিতেছেন। ‘তথাকথিত’ বলিতেছি এই জন্য যে, এই সব সমালোচকেরা শিক্ষিত এবং বিশ্বসাহিত্য-সংবাদের বিজ্ঞ-পোকা, কিন্তু ঠিক ভারতীয় চরিত্র-মনের অধিকারী কতটুকু সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় “লেখকের নিজস্ব নয়, মহাশয় প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।” তাই যদি হয় তবে সমালোচনার মূলে থাকা চাই অন্ধাবুদ্ধি। অশিক্ষা এবং উন্নাসিকতায় বুদ্ধির প্রথরতা দেখানো যাইতে পারে, আত্মপ্রচারও হইতে পারে, উপদ্রিষ্ট পাঠকের সাময়িক হাততালিও কুড়ানো যাইতে পারে-কিন্তু সত্যকার নির্মাণধর্মী সমালোচক হওয়া চলে না।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে দেশ-বিদেশের সাধারণ পাঠক সমাজ তথাকথিত বিজ্ঞ সমালোচকদের বিরূপ মন্তব্য সম্বন্ধে, কবিরই রচিত অসংখ্য গানে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে নিজেরা আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, কবিকেও সমস্ত হৃদয়ের অকপট অশ্রুধারা দিয়াছেন। কবীকে কেন্দ্র করিয়া এই আনন্দ ও গৌরব লাভই দেশবাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। “রবীন্দ্রনাথকে একবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে,

কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন”— এ বিচার ও প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন হয় না সাধারণ পাঠকের রবীন্দ্র-রসাস্বাদনে। এই বিজ্ঞ মন্তব্যটি পালার্মেণ্টের বাঙালী কমুনিষ্ট-সদস্য হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। কমুনিষ্ট শিবির হইতে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ইহাই। এই গ্রন্থেই ইতিহাসের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যাত্মিকতার অর্থ্যাৎ প্রাচীনের প্রতি গৌরববোধ, হিন্দুত্ব-প্রীতি, ভক্তিগ্রন্থভার প্রতি সরকার মশায় নাক সিটকাইয়াও শেষ পর্যন্ত জোর করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন যে, “রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত।” এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছিলে লেখকের মতে পশ্চিমী সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত ও পরিণত সমাজবাদের মানরক্ষা হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সমাজবাদী করিয়া খাড়া করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথকে ভাঙাইয়া আসন্ন তথ্য দলের প্রচার করাও চলে না।

এইসব জ্ঞান-পাণীদের রবীন্দ্র-বিচার-বিতণ্ডার ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাইয়া সাধারণ পাঠকের অবস্থা হয় ‘বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়?’ রবীন্দ্রনাথ কি ও কেমন ছিলেন, তাঁর সত্যকার স্বরূপটি কি—এ প্রশ্ন মনে জাগে। রবিবারের লাঠি (আষাঢ়, ১৩৬৮) ইহার একটা সমাধান দিয়াছে: “হয়ত ইহা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমরা বহু মাতামাতি করিয়াছি। ঋষি, গুরুদেব, সত্যজ্ঞা প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছি। কিন্তু এ সব কোন প্রয়োজনই ছিল না, কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি।”

লাঠি মারিয়া ‘রবিবারের লাঠি’ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করাইতে চাহিলেও সকল লোকে অবশ্য তাহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না। যেমন করেন নাই শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁর কথার গুরুত্ব সাধারণ সমাজতত্ত্ববাদী সমালোচকদের চেয়েও অনেক বেশী। নিজে তিনি সিদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। দেওঘর দেবসম্মত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত

অম্মরাগী ভক্ত ও শিষ্যের পূজ্য ও পরমার্থ-পথপ্রদর্শক। ব্রহ্মচারীজির কথা বেদবাক্যের মতই তাঁর শিষ্য সম্ভানদের কাছে গৃহীত হইয়া থাকে। এমন একজন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অভিমত (দিব্য দর্শন, জীবন ’৬৮— শ্রীশ্রীবাবা) দিয়াছেন যে, “যাহাকে প্রাপ্ত হইলে ধীর ব্যক্তিগণ সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পাইয়াছিলেন।...বর্তমানকালের যোগযুক্ত ঋষি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।...রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে তাঁহার যোগকৌশলকে জানিতে হইবে।...তাঁহার মর্মে প্রবেশ করিতে হইবে।...রবীন্দ্রনাথকে ধ্যান করিলে ব্রহ্মকেই পাইবে। যদি মানুষরূপী রবীন্দ্রনাথকে শুধু মানুষরূপেই দেখে তবে রবীন্দ্রনাথকে সম্যক চিনিতে পারিবে না।” ডাক-নামের মত রবীন্দ্রনাথ গুরুদেব বলিয়া অভিহিত হইলেও, তাঁর সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট ইতিপূর্বে আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জ্ঞান নাই।

কিন্তু ইহাতেও রবীন্দ্র-স্বরূপের শেষ সিদ্ধান্ত হইল না। যেহেতু ব্রহ্মচারীজির এই কথা মানিয়া লইতে পারেন নাই— (গৌড়ীয় পত্রিকা, ভাঙ্গ, ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীপাদ যখনন্দন বিচার্ণব বি. এ.। ইনি মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের মুখপত্র গৌড়ীয় পত্রিকার ‘দর্শন-বিষয়ক সম্পাদক এবং শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথ সম্বন্ধে ‘ভক্তিবিনোদ’-ভজনধারার সনিষ্ঠ প্রবক্তা। সনাতন ভারতের মহাজনাভুগ পছায় শীল ও সন্যাসসম্মত সাধনাত্মক ব্রহ্মোপলব্ধি না থাকায় রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞেয়-বাদের মধ্যে আত্মহার্য হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাই বিচার্ণব মহাশয়ের সিদ্ধান্ত। তিনি লিখিয়াছেন, “একটা বিরাট অন্তর নিয়ে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) এসেছিলেন এ জগতে। সারা জগতকে তিনি তাঁর মধ্যে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেন নি।...তিনি পেয়েছিলেন এক অজানা লোকের সন্ধান, যার দরজায় এসে তিনি লুটিয়ে পড়েছেন কিন্তু প্রবেশ করতে পারেন নি।...এই দেশে জন্মে তিনি এর মাটির রসে জীবন গড়ে তুলতে পারলেন না।...তাই তিনি অজ্ঞাতের মধ্যেই আত্মহার্য হয়ে পেয়েছেন এক মুক্তির আশ্বাদ—‘অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই মোর মুক্তি।’...তাঁর জীবনদেবতার প্রকৃত স্বরূপ কি কেউ বুঝেছেন?...তবুও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস



তার জীবনে এনেছিল এক সমগ্র বোধের প্রেরণা।...কিন্তু এই বাহির হইতে গুটিয়ে-নেওয়া সমগ্রতার আভাস তাঁকে পরা শক্তি দিতে পারেনি। এক পূর্ণতার সঙ্গে সৃষ্টির মধ্য দিয়েই যে তা পাওয়া সম্ভব। আর এ সন্দেশ এখানে এসেছে মহাজন-নির্দিষ্ট পন্থায়। কিন্তু কালবাহ্য অতীতের বস্তুজ্ঞানে কবি সেদিক ফিরতে পারলেন না। স্বাক্ষর পেলে আর কিছু পাবার থাকে না বলে উপনিষদ ও গীতা বীর পূর্ণতার সন্ধান দিয়েছেন সে জীবনের আভাস কবির কাব্যে কি জীবনে প্রতিফলিত হতে পারল না। তবুও উপনিষদের অকৃত্রিম পূজারী কবি জীবনের সকল খণ্ডতা, সকল বিমুখতার গ্রানি সরিয়ে রেখে বলতে চেয়েছেন, ‘শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।’ তাই কবির হৃদয়ে ভেসে উঠেছে মানবজীবনের নিত্য-জিজ্ঞাসা ‘মামুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যনামা। তখন দিবোনা দেখা দেবতার অমর মহিমা?’—এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই সেই অপূর্ণ জীবনের পাঠ সমাপ্তি নহে কি?”

রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং জীবনের সাধ্য ও সিন্ধি বিচারে সনাতনপন্থীর এই অভিমত অর্ধাচীন কবিসাহিত্যিকের উপেক্ষা-ঔদাসীন্যে উন্মীষ যাইবার নয়। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেই মনীষী বিপিন পাল মন্তব্য করিয়াছিলেন: “Unfortunately, the Brahma Samaj under Rabindranath's father Debendranath failed to realise the essential aspect of its own mission. It strove to take back modern India to the Upanishads, con-

demning the subsequent evolution of Hindu thought and culture of what is called the Pauranic age as evidence of degeneration and arrested development. Rabindranath's theology is inspired by the teachings of his own father. Rabindranath's God is the God of the Upanishads \* \* \* The philosophy of the Upanishads is really the philosophy of the unknown and unknowable.”

বাহিরের চক্ষু দিয়া দেখার ও উপরিচর মনের ভাবনার ফলে রবীন্দ্র-ধারণা বিষয়ে এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইলে কোন কথা ছিল না, সে হইত অনেকটা গায়ে হাত ব্লাইয়া অন্ধের হাতী অমুভব করার মত। ইহাও ঠিক যে, দেশ-বিদেশে রবীন্দ্র-ধারণা বিষয়ে এত বিকৃতি-বৈচিত্র্য ঘটাইতেছে বাহারা তাহাদের মধ্যে আছে বিলাস্ত, জ্ঞানান্ধ, স্বার্থান্ধ, আত্মপ্রচারান্ধের দল। দ্রষ্টার মনের অমুযোগ বিরাগের উপর একই বস্তুর ধারণার তারতম্য ঘটয়া থাকে। গীতার কথায় বলা যায়, বীর যেমন শ্রদ্ধা তিনি তেমনি হইয়া থাকেন (যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ)। স্ততরাং নোংড়া মনের মামুষ রবীন্দ্রনাথকে কুংসিতই ভাবিবে আর ভ্রম্যনবিশিষ্ট যিনি তিনি স্তন্দরই দেখিবেন। এবং গালাগালি আর সমালোচনা করিয়া রাতারাতি কাহারও স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না। কারণ গীতার শ্রীভগবান মোক্ষম রায় দিয়াছেন যে, ‘সম্ভারূপা সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি’। এ প্রপঞ্চের সর্ব বিষয় ও ব্যাপারের মতই অনন্তকাল রবীন্দ্র-ধারণা লইয়াও বিবাদ-বিসম্বাদ-বিতর্ক লাগিয়া থাকিবেই। কেন থাকিবে তাহার হেতু বহু

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কারিকা পপটেল**

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

শতাব্দী পূর্বেই শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :

আত্মপরিজ্ঞানময়ো হস্তীতি নাস্তীতিভিদাত্মনিষ্ঠঃ।

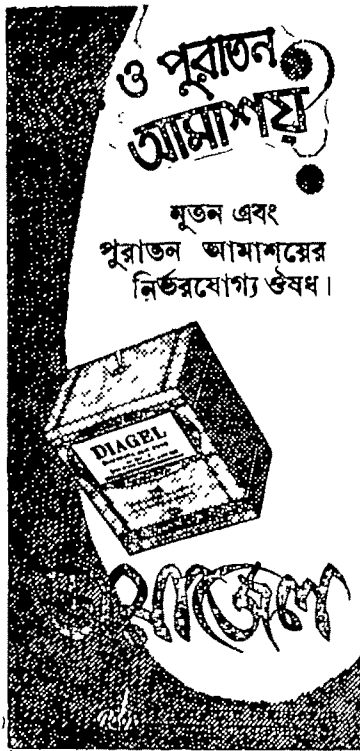
ব্যর্থোহপি নৈবপরমেত পুংসাং মত্ত পরাবৃত্তধিয়াং

অলোকাৎ ॥

—অর্থাৎ আত্মবিষয়ে অজ্ঞানতা ও ভেদনিষ্ঠার হেতু জগতের সত্য-মিথ্যা লইয়া বিবাদ বিফল হইলেও, সত্য-স্বরূপচ্যুৎ যাহারা তাহাদের বিবাদ কিন্তু কখনও নিরস্ত হইবে না। রবীন্দ্রনাথ কেন, সকলের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। তথাপি রবীন্দ্র বিষয়ে একটু কথা থাকিয়া যায়। ব্যক্তিগত নীমিত্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রসাস্বাদনের বিচিত্রতা বিষয়ে কাহারও কিছু বলিবার নাই। প্রশ্ন উঠে তখনই যখন ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে সরকারী ও জাতিগত ক্ষেত্রে

রবীন্দ্র-জীবন ও দর্শনের প্রয়োগ চলে। আজকের দিনে চিন্তাশীল মানুষের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, একদা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আলোচনা-অনুধানে জাতির জীবনে যে অগ্নিময় উজ্জীবন-উৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া তাহা হইতেছে কিনা? কিন্তু তাহার লক্ষণ দেখিতেছি না। দেখা গেলে রবীন্দ্র-বাসভবন নৃত্যগীত-নাট্যের বিশ্ববিদ্যালয় হইত না। অগণিত সভা-সমিতি রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া হৈ চৈ হইতেছে, কিন্তু মহত্তম জীবনাঙ্কুল আত্মগঠনের পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছে কৈ? সংস্কৃতির নামে গালভরা বুলি দিয়া চালাইলেও, এ সবে মধ্য যেরূপের ফেন-বুদবুদ ভাসিয়া উঠিতেছে তাহা হালকা, অগভীর, উপরিচর—সম্ভার জুগুভীরে কোন স্পর্শ দিতে পারিতেছে না। সমস্ত অবস্থা সুষ্ঠুভাবে ভাবিয়া দেখিলে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়তো রবীন্দ্রনাথ কি ও কেমন ছিলেন, তাঁর জীবন-মিশন এখনও ঠিক ঠিক নির্ণীত হয় নাই। এই নির্ণয় বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, বাঙালীর বর্তমান দুর্ববস্থায় রবীন্দ্র-জীবনের বীর্ঘ্যময় বলিষ্ঠ দিকটির অনুশীলন আমরা করিতে পারিতাম। তাহাও সম্ভব হইতেছে না, সম্ভবতঃ আমাদের আজিকার হালকা মানসের জন্তই।

বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ‘Mission as a teacher of Europe’ সম্পর্কে চিন্তাশীল মনোবী বিপিনচন্দ্র পাল একটা ইঙ্গিত দিয়াছিলেন : “Rabindranath stood out here not as a successor of Keshab Chandra Sen but rather as an inheritor of Vivekananda.” এই বলিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে রবীন্দ্রজীবনের অগ্নিগর্ভ বীর্ঘ্যবস্তার সন্ধান মিলিবে। ইহারই অভাবে নাচ-গানে পর্যাবসিত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমরা সংস্কৃতির নামে নির্বীর্ঘ্য মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিতেছি, আর কাব্য-সাহিত্যের দোহাই দিয়া রবীন্দ্র-মানস ও মানসীর চুলচেরা বিচার করিতে গিয়া যথেষ্টচারিতার প্রশংসে রবীন্দ্রনাথকে খেলোই করিতেছি।



# নামটি আমার বন্ধা

॥ নৃত্যগীতিনাট্যালেখ্য ॥

বিনয় চৌধুরী

## ॥ উপস্থাপন ॥

[ জল-কল্লোলধ্বনি...তদ্বীকণ্ঠে উচ্ছল খিল খিল হাসি ]

উক্তি : কে তুমি ?

[ আবারও খিল খিল হাসি ]

উক্তি : একি ! কে তুমি হাসছো অমন করে ?

কে তুমি ?

প্রত্যুক্তি : আমাকে চিনলে না ?

উক্তি : না। কে তুমি ?

প্রত্যুক্তি : আমি বন্ধা—[ হাসি ]

উক্তি : সে কি ! তার মানে ?

প্রত্যুক্তি : তার মানে—

## ॥ গান ॥

হিমপাহাড়ের মেয়ে আমি

নামটি আমার বন্ধা।

আমি যত হাসাই তত কাঁদাই

তাতেই আমি ধ্বজা ॥

উক্তি : বটে। তারপর ?

প্রত্যুক্তি : তারপর—

## ॥ গান ॥

স্বর্ণা রূপে নাচি আমি

নদী হয়ে ডাসাই বালুচর

মেঘ-গুরু-গুরু আঁধার-বেশী কালবোশেধী

আমার সে যে চির অহুচর।

হিমপাহাড়ের মেয়ে আমি...ইত্যাদি ॥

উক্তি : বুঝলুম তুমি একটি ধ্বংসের প্রতীক ; ধ্বংসেই

তোমার আনন্দ। স্বন্দরকে তহ্নহ্ন করে

দিতেই তোমার উল্লাস। কিন্তু ওগো বন্ধা,

প্রকৃতির এই স্বন্দর রূপ—একে আরো স্বন্দর

করেও তো তুমি দিতে পারো। কিন্তু

সেদিকে তোমার আগ্রহ নেই কেন ?

প্রত্যুক্তি : কে বলেছে নেই। তুমি আমাকে জানানো,

তাই অমনি বলছো। তুমি কি দেখতে  
পাও না—

উক্তি : কি দেখতে পাই না ?

প্রত্যুক্তি : দেখতে পাও না—

## ॥ গান ॥

আমি বুড়ি পড়ি টাপুর টুপুর

আমি শিশির হাসি ঘাসের উপর ;

আমি হাওয়া হয়ে আঁখি তুলি

বধুর মুখের ঘোমটা খুলি ;

আমি অলপ হাসি আঁধার নতে

ধরায় নামি বন্ধা।

হিমপাহাড়ের মেয়ে আমি...ইত্যাদি ॥

উক্তি : কিন্তু কোথা হতে তুমি আস ? কোথায়

তোমার ঘর ? কোথায় তুমি ছুটে যাও ? কেন

ছুটে যাও ? কবে তুমি শান্ত হবে বলো !

প্রত্যুক্তি : কি জানো, আমি জন্ম-অশান্ত। কাজেই

কখনোই আমি শান্ত হবো না। তোমাকে

সব কথা খুলে বলছি, শোনো !—

## ॥ গান ॥

চন্দ্রচূড় অটা হতে আমি নামি

স্রোতোধারা হয়ে ছুটি দিনযামি

প্রলয় উল্লাসে বুক বাঁধি

পাষাণী তুহিন আমি কাঁদি,—

দুরন্ত ঝটিকা হবে আসে

আমি হিমবাহ রহি পাশে।

প্রশান্ত নাগরে আমি ভাসি

মিসিমিপি মুখে আমি হাসি

সদা মুক্তিমন্ত—

আমি অশান্ত—আমি দুরন্ত

কৃতান্ত দুর্দান্ত আমি বন্ধা।

হিমপাহাড়ের মেয়ে আমি...ইত্যাদি ॥

[ প্রবল জলকল্লোলধ্বনি...তদ্বীকণ্ঠে উচ্ছল খলখল  
সুউচ্চ হাসি ]

## ॥ নমস্কার ॥

# সাহিত্যিক

## জীব ও শহর :

একটা কথা আছে : পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি আর শহর মানুষের। এই কারণেই কি শহরের প্রভাব জীবদেহের উপর কটাক্ষপাত করে? কারণ মানুষের সৃষ্টির মধ্যে থাকে পাপ এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মুক্তি। সংবাদে দেখতেছি, জনৈক অর্থনীতিবিদ নাকি এই অস্তিত্ব পোষণ করেন যে, শহরে মানুষের জন্মহার কম। গ্রাম ছাড়িয়া মানুষ বতই শহরাভিমুখী হইবে জনসংখ্যা ততই হ্রাস পাইবে। এই অর্থনীতিবিদের মতে শহরের মেয়ের তুলনায় গ্রামের মেয়ের উর্বরতাপ্রাপ্তি বেশী। বিভিন্ন সমীক্ষার দ্বারা এই তথ্য প্রমাণ করারও চেষ্টা হইয়াছে। আশা করা যায়, আমাদের সরকার এতদিনে প্রায়শ্চেষ্ট সমস্তর একটা সমাধান ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন।

## পরলোকে ডঃ কৃষ্ণ :

ভারতের অন্যতম বিজ্ঞানী এবং জ্ঞানপথ ক্রিয়াকাল লেবরেটোরী ডিরেক্টর ডক্টর কে. এন. কৃষ্ণ সম্প্রতি ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালে ডঃ কৃষ্ণ জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত হন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতিরূপে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভও উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ এবং বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্তব্যের এই মানুষটি রয়াল সোসাইটির ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব গিওর অ্যান্ড অ্যালোয়েড ফিজিক্সের এবং ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি, ইউনেস্কোর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি সম্মানজনক পদে ভূষিত হন। ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বা নাম কারিগ্রামানিকুম শ্রীনিবাস কৃষ্ণ। জন্ম

১৮৯৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মাদ্রাজের রামনাথ জেলার ওরাতরায় নামক গ্রামে। তাঁহার লোকান্তরে ভারত এক হৃদয়োগ্য সম্ভ্রমকে হারাইল।

## সোফিয়ায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব :

বুলগেরিয়ার বুলেটিনে প্রকাশ, মহান ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব বুলগেরিয়ার জনসাধারণ কর্তৃক আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় যে উৎসব-সম্ভাব আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে বেশে বহু বিশিষ্ট জননেতা, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাহিত্যিক ও নাগরিক যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসব-সম্ভার উদ্বোধন করেন বুলগেরীয় লেখক-সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকাদেমিসিয়ান জর্জি কারানাতোভ। প্রখ্যাত বুলগেরীয় লেখক এঞ্জেল তোদোরোভ রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেন, "ঔপনিবেশিকতার নিগড় হইতে ভারতীয় জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের সহিত রবীন্দ্রনাথের নাম নিবিড়ভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে ঔপনিবেশিক দাসত্ব অবসানের আহ্বান বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছে; তাঁহার সেই মৃত্যুহীন বাণী আজ আমাদেরকে দাসত্বপাশে বদ্ধ জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামে সঙ্গিত হইবাব আহ্বান জানাইতেছে।" ভারতীয় লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীও এই উৎসব সম্ভার বক্তৃতা দেন।

## সঙ্কল্প এবং সাফল্য :

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ নদীয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত তালুকহা গ্রামবাসী শ্রীধ্বজপদ প্রামাণিক পঞ্চাশ বৎসর বয়সে এই বৎসর আই. এ. পাশ করিলেন। শ্রীপ্রামাণিক নন স্ন্যাট করূপে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু হৃৎক্লেশ রাজার আইনের বলে গুণগত যোগ্যতা তাঁহাকে কোন অর্থনৈতিক সুযোগ দেয় নাই। ২।১০ জন পোষ্যের প্রতিপালক অবশেষে সঙ্কল্প করিলেন এবং এই বয়সে শিক্ষাগত যোগ্যতাও অর্জন করিলেন। প্রকাশ, তিনি নাকি বি. এ. পরীক্ষার অন্তঃ প্রৱ্ত্ত হইতেছেন। আমরা শ্রীপ্রামাণিকের সর্বস্বাস্থ্য সাফল্য কামনা করি।

শ্রীসমরজিৎ কর

ভ্রম-সংশোধন : গত প্রাবণ সংখ্যা প্রবর্ত্তকে 'তিথি-স্মৃতি' শীর্ষক নিবন্ধের ১৩৪ পৃষ্ঠায় ছবির নীচে সংশোধিত নাম হইবে বামে শ্রীশ্রীশক্তিমাতা ও দক্ষিণে শ্রীশ্রীদেবীমাতা। প্রঃ সঃ

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

প্রবর্ত্তক ঠিক ব্যবসায়মূলক পত্রিকা নহে। সকল ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, গ্রাহকগণের সহিত একটা সান্নিধ্য সঙ্কল্প পত্রিকাখানির বিদ্যমান। এই হেতু দেয় দক্ষিণার জন্তও স্বতন্ত্র স্মারক পত্র দেওয়া হয় না। ৬পূজার পূর্বেই বাকী চাঁদা আদায় করিবার প্রতি আমরা গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অন্ত্যায় পত্রদ্বারা জানাইলে বাধিত হইবে।

—পরিচালক : প্রবর্ত্তক

## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত। প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাকটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ২১৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণবাবু কর্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীশ্রীজয় দুর্গা মাতা

( কালনার প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিতা নিত্য পূজিতা দেবী )

‘ভাগীরথী’র সৌজন্যে

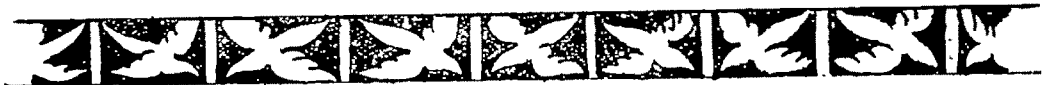


## বাঙালীর শক্তিপূজা

একি হ'ল পবিত্র বাংলা দেশের বৃকে ! কোটি কোটি লোকের হা-হা রব হৃদয় বিদীর্ণ করে। দেশবাসী হাহাকার—অমের, বজ্রের, গৃহের, বেকারের, বজ্রার, মহামারীর, দৈত্যের, নির্বোধের। অভিশপ্ত বাংলা ! বাঙালীর মাকে ডাকার মত ডাক দিবার কণ্ঠ ক্রমেই নীরব হয়ে আসে। বাঙালীর কর্মকল ? বিশ্বের বৃকে কোন জাতি কি নাই যার কর্ম গর্হিত এবং অন্তায় ! তবুও সম্মানব্রতী বাঙালী বর্ষে-বর্ষে ডেকে বলে আয় মা, হৃদয় আলো করে উপবেশন কর। বৃকের রক্তে মাঘের চরণ অলস-রক্ত-রঞ্জিত করে বাঙালী বলে “কালী করালবদনা বিনিজ্ঞাপ্তিপাশিনী অতিবিস্তারবদনা নরমালাবিভূষণা বিপীচর্মপরিধানা শুদ্ধমাংসাত্তি ভৈরবা”। আবার জাগ বাঙালী, সীমার বাধন ছিঁড়ে অসীম শক্তির সহিত যোগযুক্ত হও। স্বর্গ ও মোক্ষ তোমার চরণতলে আছড়ে পড়বে। তুমি লাভ করবে তোমার অজীর্ণ জীবনের অমৃতময় পাথের। দশভুজাকে শুধু ঘরে ঘরে নয়, বাঙালীর প্রতি হিয়ার প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। তবেই শক্তির বরপুত্ররূপে বাঙালী আবার জয়যুক্ত হবে। কর্ম আশ্রয় কর, জ্ঞান আশ্রয় কর, সকল কর্মই মাতৃযজ্ঞ হোক। সকল জ্ঞানই পরম জ্ঞানে উন্নীত কর। তোমার কুণ্ঠা, ক্রোধ, অভিমান, হীনবোধিতা সে তোমারই মূঢ়তা। কার্পণ্যদোষে অভ্যুত্থানের পথ রোধ করো না। উঠ, জাগ, শক্তির প্রসাদে নিজে ধস্ত হও, জাতিকে ধস্ত কর। উৎসবের নিশান উড়িয়ে আবার মৃত্যুর উর্দ্ধে ফণায় নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চল ঋতুময়ী জননীর আবাহনে। সঙ্গীতমুখর কর্ণে আবার জাতির দিশারী চলবে অগ্রে অগ্রে। পশ্চাতে চিরযুগের শ্রায় আজও চলবে অমৃতের পুত্র-পুত্রাগণ। অনাহত সঙ্গীত, অনন্ত যাত্রা। হৃদয় প্রসারিত অসীমের দিকে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চল, হে সম্মানব্রতী বাঙালী ! কর্ণে কর্ণে মা-মন্ত্র উচ্চারণ কর। মাঠে :।

[ সংকলিত ]

সজদগুরু শ্রীমতিলাল



# ত্রিনয়ন

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

অগ্নিজ্যোতিরশোকমেব বিমলং হোতা স্বয়ং

হব্যবাড়্ (হোতা চ হব্যং মথৈ)

দেবানাঞ্চ মুখং দধাতি নিতরাং রত্নানি বৈ স্থিতিষু।

নেত্রং দেবি স এব তে ত্রিনয়নে মাতর্বিশাং পালিকে

দক্ষুং তন্ নিখিলাশ্বিং প্রভবতু ত্রাতুং ত্রিলোকীং স্বজাম্ ॥ ১

সূর্যো জ্যোতিরনাদিবিষ্মভরণং ভর্গো বরেন্যঞ্চ যদ্

রেতো নাভিরিতীরিতশ্চ জগতাং হ্যাত্মা পুনস্তৃষ্ণাম্।

নেত্রং দেবি স এব তে ত্রিনয়নে পুষা জগৎপোষণি!

ভূয়াদ্ ধ্বাস্ত্রসমূহপাটনপটু প্রাণাংশ্চ পায়াদ্ ভবে ॥ ২

সোমো বৈ রসসিদ্ধুবিদ্রুবনং চানন্দসন্দোহনং

সোমাম্মেন হি জীবতি ত্রিভুবনং সোমামৃতান্ নিষ্করঃ।

নেত্রং দেবি স এব তে ত্রিনয়নে সম্রাজি! সোমশ্রবৈ!

বৈগুণ্যোদ্ভবভীষণোগ্রগরলং কুর্য্যাম্ কিং নোহমৃতম্ ॥ ৩

ভূর্গে ত্রিনয়নে!

বল—কোন্ রূপে আজ তব আগমনী?

বহি সূর্য্য সোম,

তিনটি নয়নে কোন্ ভাববীর্ষ্যবাণী?

বিশোক বিমল

শুদ্ধ জ্যোতি অগ্নি সর্ববেদাগমে শুনি ॥

জাতবেদা অগ্নি,

বিশ্ববাগে নিজে হোতা, নিজে হব্যবাট্।

দেবতার 'মুখ',

স্থিতিবাগে "রত্নধাতম" ইষ্ট আত্মরাট্ ॥

সে অগ্নি নয়ন,

হোক আজ মহোগ্রকরাল আশিবের নাশে।

কিস্ত, বিশ্বের পালিনি। মাগো।

নিজ স্বতা ত্রিলোকী যে মরে আজ ত্রাসে!

নেত্রজালা স্নিগ্ধ করি,

কম্পমানা আত্মজারে আজ তুমি রাখ অন্ধপাশে। ১

সূর্য্যনেত্র তব,

প্রত্যক্ষ জ্যোতিরূপ অনাদি বিশ্বের ভরণ।

গায়ত্রী মন্ত্রেতে

(সবিতার) বরণীয় ভগ্নরূপে যে জ্যোতি ধ্যান ॥

ভুবনের রেত,

ভুবনের নাভি—শুনি বেদের বদান।

স্বাবর জন্ম,

নিখিলের আত্মা আদিত্য ভগবান্ ॥

নেত্র তব পুষা,

জগৎপোষণী শক্তি উৎস যে মহান্।

সে নেত্র তোমার,

সর্ব ত্রাস অন্ধকার নাশে (আজ) হোক পটীহান্।

অন্ধ ত্রস্ত বিশ্ব

বর মাগে—মাগো। 'রাখ' 'রাখ' মোর প্রাণ ॥ ২

সোম নেত্র তব

রস-সিদ্ধু-বিদ্রুব, আনন্দমাত্রা-সন্দোহন।

চরাচর বিশ্ব,

সোমে পায় অমৃত তার ধরিতে জীবন ॥

সে সোম অমৃত,

জরা-মৃত্যু-পার তরে, দেবতার পান।

বেদে সোমরাজা,

হে সম্রাজি! সোমশ্রব কর, কর সোমে

আপ্যায়ন।

আজ করম বিপাকে,

উদ্ধৃত গরল—উগ্র বিশ্ব-বিনাশন।

সে ভীষণ গরলে,

তব সৌম্য সোম নেত্রে, আজ হইবে না,

অমৃত-অময়ন? ৩

# জাগৃহি

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী

জাগো খর্পরধারিণী,  
যোগমগ্না তারিণী,  
হুঃখ বেদনা-হারিণী  
মাগো—  
জাগো !  
মহিষাসুর আসে,  
অট্ট অট্ট হাসে,  
ধরিত্রী কাঁপে ত্রাসে  
মাগো—  
জাগো !

জাগিল মহাকালী,  
জাগিল মহাকাল ।  
উঠিল করতালি,  
লটপট বাঘছাল ।  
জাগিল নারায়ণ,  
জাগিল দেবগণ,  
জাগিল ত্রিভুবন,  
জাগিল কংকাল ।  
মাগো—  
জাগো !

## নব-পত্রিকা

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

রস্তা কচুী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিশ্বদাড়িমো ।  
অশোকো মানকশৈব ধাতুধ নবপত্রিকা ॥

দুর্গাপূজাতে “নব-পত্রিকা” বা ‘কলা-বো’ প্রতিমার  
গম্ভুখে রাখিয়া পূজা করার ব্যবস্থা । ইহা ভগবতী কোষিকী  
দেবীর ইচ্ছাসম্মত ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি নবশক্তির  
প্রতীক । স্বয়ং ভগবতীর প্রতীক অপরাঙ্কিতা লতা দ্বারা  
নয় প্রকার বৃক্ষ বা ডাল বন্ধন ও এক্যবদ্ধ করিয়া  
“নব-পত্রিকা” প্রস্তুত করা হয় । যথা :—(১) কদলী বা  
কলাগাছ—অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী [ চন্দ্রাদি মিশ্রিত  
জলদ্বারা স্নানান্তে ‘ব্রহ্মাণী’-রূপে প্রণাম করা হয় ],  
(২) ধাতুগাছ—অধিষ্ঠাত্রী বৈষ্ণবী [ গঙ্গাজল দ্বারা স্নানান্তে  
মহালক্ষ্মীরূপে প্রণাম ], (৩) হরিদ্রা গাছ—অধিষ্ঠাত্রী  
রুদ্রাণী বা মাহেশ্বরী [ বাপী জলদ্বারা স্নানান্তে দুর্গারূপে  
প্রণাম ], (৪) শ্রীকল বা বিজগাছ—অধিষ্ঠাত্রী শিবা বা

শিবদূতী [ ঔষধি জলদ্বারা স্নানান্তে শিবারূপে প্রণাম ],  
(৫) জয়ন্তী গাছ—অধিষ্ঠাত্রী কোমারী [ শিশির জলদ্বারা  
স্নানান্তে কার্তিকীরূপে প্রণাম ], (৬) অশোক গাছ—  
অধিষ্ঠাত্রী ঐশ্বরী [ সুগন্ধ জলদ্বারা স্নানান্তে সদানন্দময়ী  
অর্ধাং শোকরহিতারূপে প্রণাম ], (৭) কচি বা কচুগাছ—  
অধিষ্ঠাত্রী বারাহী [ পুষ্প জলদ্বারা স্নানান্তে ধড়গধারিণী  
বারাহী অর্ধাং কালিকারূপে প্রণাম ; ইহাও  
অহুধাবনযোগ্য যে, কচুগাছ বরাহপ্রিয়, আর কচুপত্র  
দস্তদ্যুত বহুমুখবৎ ], (৮) দাড়িম গাছ—অধিষ্ঠাত্রী  
নারসিংহী [ কষাঘ জলে স্নানান্তে রক্তদন্তিকারূপে প্রণাম ।  
রক্তপানহেতু নারসিংহীও দাড়িম ফলের ভায়  
রক্তদন্তিকা ], (৯) মানগাছ—অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা [ কর্পূর  
জলদ্বারা স্নানান্তে চামুণ্ডারূপে প্রণাম ] হুতরাং  
নব-পত্রিকার নয় প্রকার বৃক্ষসমষ্টি চণ্ডীতে বর্ণিত নবশক্তির  
প্রতীকরূপে সংপূজিত হইয়া থাকেন ।



## “আমার দুর্গোৎসব”

[আত্মশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ‘মা’ বলিয়া তাঁহার উপাসনা, জন্মভূমি-জননী ও শক্তিরূপিনী-জননীকে এক ও অভিন্নরূপে কল্পনা, বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই ভাব-কল্পনাই, বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষে নব-জাতীয়তাবোধের জনক। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে যথার্থ জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়-আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, একথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়, ইহা প্রোপাগান্ডা মাত্র। ইহার বহু, বহু পূর্বে, কংগ্রেস স্বধন ভ্রণস্থও নহে, তখন ভারতের পূর্বপ্রান্তে ধ্যান-সমানীন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনয়ন সম্মুখে দেশজননীর দুর্গারূপিনী যে মাতৃরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার চিত্র তিনি ‘আনন্দমঠ’ ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জাতির সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশে নব-জাতীয়তাবোধের জন্ম ও জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহা অস্বাভাবন করিয়াই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন—“Bankimchandra was seer and nation-builder.” এবং বীর সাদারকরকেও বলিতে হইয়াছে—“Every mile-stone in the path of progress in India is consecrated by the life blood of Hindu-Bengal.” ভারতবর্ষ (খণ্ডিত) পরজাতির শাসনমুক্ত হইলেও, যথার্থ ও আদর্শ-স্বাধীনতালাভ সে আজও করিতে পারিয়াছে কি? আজও কটিবাস-মাত্র পরিহিত কোটি কোটি নির্যাতিত ও নিরমের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাসে ভারতের আকাশ ও বাতাস বিষবাস্প সমাচ্ছন্ন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধ্যানলব্ধ মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠার জাতিকে যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা আজও সার্থক হয় নাই; সে আহ্বান আজও জাতির জীবনে সমভাবে প্রযোজ্য। মাতৃ-আবাহনের এই সন্ধিক্ষণে ঋষি-দৃষ্ট ও ঋষি-বর্ণিত সেই মাতৃরূপ ও ঋষির আহ্বান, জাতির সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।—প্রঃ সঃ।]

আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখনও দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! \* \* \*

তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—স্ববর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ডাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে।

এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমাদের জননী-জন্মভূমি—এই মন্বরী মস্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভূজ দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালশ্রোত পার না হইলে দেখিব না; কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা নানা গ্রহরথধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্ধ্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; আমি সেই কালশ্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই স্ববর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথাব ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম; ডাকিলাম, সর্ব-মঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্বার্থসাধিকে, অসংখ্যসন্তান-কুলপালিকে, ধর্ম-অর্থ-স্বখ-দুঃখদায়িকে—আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, শ্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া

তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া; এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎ-সমীপে প্রকাশ কর! এস মা। নবরাগরঙ্গিণি, নববল-ধারিণি, নব দর্পেদর্পিনী, নবস্বপ্নদর্শিনী। এস মা গৃহে এস। ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশ কোটি কর-ঘোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম গুজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব—মা প্রসূতি অম্বিকে, ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য-দায়িকে, নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে, শরৎ-সুন্দরি চারুচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে, সিন্ধুপুঞ্জিতে সিন্ধুমধনকারিণি! শক্রবধে দশভূজে দশগ্রহবণধারিণি, অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িণি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত-শক্তিপ্রদায়িণি। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মণ্ড এ পদতলে লুপ্তিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুকার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্ত পাত করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জগৎ কাদিব। এস মা, গৃহে এস—বাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না, সেই অনন্ত কালসমুদ্রে দেহী প্রতিমা ডুবিল। সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি অন্ধকারে ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল। তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম—উঠ মা হিবময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার স্বসন্তান হইব,

## আমার চ'খে দেখা পূজা

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার এ্যাট-ল

২

“মা বার আনন্দময়ী

সেকি নিরানন্দে থাকে—”

এমনি একদিন ছিল যখন বাঙালী হিন্দুর ঘরে এই ভাবেই সকলে ভগ্ন হইয়া থাকিত। দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ত’ জীবের নিত্য সহচর। তথাপি আনন্দময়ীর নাম স্মরণমাত্র তার সব ব্যথা বেদনা অস্বর্হিত হইয়াছে নিমেষে। সভ্যই বাঙালয় এমন দিন ছিল। হায় হায় স্বপ্নের মত তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। যাইবে না—মাতৃনামোচ্চারণেও বিরাগ বাহাদের, দুর্দশা ভিন্ন আর কি হইবে তাহাদের!

মায়ের প্রতি অটল ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই বাঙালী বাঁচিয়া ছিল। সেই মায়ের শুভাগমন-বার্তা আকাশে বাতাসে, পুষ্পে পত্রে, জলে জলে যখন ঘোষিত হইল, আনন্দমাগরে ভাসিল তখন অতি দীন, অতি হীনও। আনন্দের সংক্রামতায় বাঙালী তখন পাগল।

বালকবালিকার স্বচ্ছ সরল হাসির তরঙ্গ। কিশোর কিশোরীর অনাবিল হাস্য-কৌতুক। যুবক যুবতীর ফুল প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বাস। প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দাবেগ ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার সৌম্য শাস্ত তল্লভ ভাব মাতৃ-দেবীর সাগ্রহ আবাহনের স্তম্ভ যেন দিন গণিতেছে সবাই আপন আপন ভাবে। পথে, মাঠে, ঘাটে, গৃহাঙ্কণে বিবাদ লালিত্যে গীত হইতেছে,—

“বাও বাও গিরি, আনগে গোরী

উমা বুঝি আমার কেঁদেছে—”

সংপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবাহুগৃহিতে—এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল মাধিব; অধর্ম, অলস, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা।

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালযোতে কাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভূজে ঐ প্রতিমা

ঘরে ঘরে মেনকার প্রাণ কাঁদাইয়াছে এই করুণ বিলাপে, উমামাতা গৃহে কষ্টাব কথা ভাবিয়া, মাতৃপ্রাণ উৎফুল্লা হইয়াছে কষ্টাকে বক্ষে ধরিবার আশু সম্ভাবনায়।

জগত-জননার আগমনী-প্রস্তুতি ঘরে ঘরে আয়োজিত হইয়াছে আগ্রহ সহকারে। সাড়া পড়িয়া গিয়াছে সর্বত্র, মা আসিবেন, মা আসিবেন। সে সাড়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে নিদ্রালসেরা, মা মা রবে উবুদ্ধ হইয়াছে। মাতৃদ্যান, মাতৃজ্ঞান-বিশ্বতেরা কি ইহার মর্ম্ম বুঝিবে।

পূজার স্বতিকথা বলিতে আমি অমুগ্ধ। সত্তর বৎসর পূর্বের কথা। আমি তখন ১৩১৪ বৎসরের।

প্রায় এই সময়ের আর একটা কথা—আই-এক্-এ শীঘ্রে আমার খেলিতে নামা, ডেভিড্ হেয়ার ক্লাবের নেতাক্রমে। সে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে স্টেটস্মানে—My First I. F. A. Shield প্রবন্ধরূপে।

মহাপূজা প্রসঙ্গে এ ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে অনেকের। খেলাধুলা যাহারা ছেলেখেলা বা গুণ্ডালীলা জানে জানবান, তাহাদের কথা বাদই দিলাম। না পড়ে পণ্ডিত-এর সংখ্যাও অগণিত। খেলার মাঠে দর্শকরূপে বা অন্ত্র ঘোঁসাড়ে Note maker-রূপে গাত্রচর্ম্ম বাহাদের গণ্ডারব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাও ধর্ম্মব্যের মধ্যে নহে। শাস্ত্রশিষ্টদের চক্ষে এ ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। তাহাদের উদ্দেশে সসম্মানে বলি, খেলাধুলার কঠোর ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিতে সক্ষম আমরা, প্রবর্তকেরা, হইয়াছিলাম বলিয়াই

তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিত্তেছে—উহারা পথ দেখাইবে। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মণিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি?—না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? [ঋষি বস্কিমচন্দ্রঃ কমলাকান্তের দপ্তর হইতে]

ধলা মারিয়া কালার বাড়-বাড়ন্ত হয় ক্রীড়াঙ্গগতে। সে কথা বাল্যকালের হইলেও কি ভুলিবার।

তাহা যেমন ভুলিবার নহে ঠিক সেইভাবে আমাদের পূজা-পার্বণের সবকিছু যাহা আমাদের স্বচক্ষে দেখা। যাহা দেখিতে দেখিতে আমাদের আমিত্ব আমরা বজায় রাখিতে শিখিয়াছি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

৮৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়াও তাই পূজার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না। আই. এফ. এ. শীল্ডের নিতুল বর্ণনা দিবার কারণে যে সম্মান আমাকে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার পাশাপাশি স্বধর্মকথা উল্লেখে জ্ঞানকৃত যে কোনও প্রত্যয় ঘটবে না সে সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

জন্মোষ্টমীর পর হইতেই মহাপূজার আয়োজন কেবল পূজাবাড়ীতে নহে, অন্ত্রও সোৎসাহে হইতেছে।

ঐর্গ্যপ্রতিমায়, দশগ্রহরিণী তিম্র লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, চোরা সিংহ আদি থাকা বাঙ্গলা দেশে শাস্ত্রসম্মত হইয়া গিয়াছে—ইতিহাস ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বহু বলাবলি করা সম্ভব। বঙ্গদেশে মাত্র ইহা হুর্গাপূজা নহে, হুর্গোৎসবও বটে। বহুজন পালনই এই উৎসবের উদ্দেশ্য—আনন্দময়ীর আগমনেব পার্বকতা।

আমাদের বাল্যকালে ল্যাংকাশায়ারের ধুতি-পরা ভদ্র-সমাজে বড় ছিল না। পূজা বা সামাজিক উৎসবে পবদেখিব ছিটেকোটোরও প্রবেশাধিকার ছিল না। হাফ-প্যান্ট বা হাফ-সার্টের চল ছিল অবশ্য কচুয়ান গাড়োয়ানদেব মধ্যে।

সিমলা, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের ধুতি শাড়ী ছিল জমজমাট। পূজাপোলক্ষে এক পয়সার ছড়ার বহিতেও পাওয়া গিয়াছে—“এবার পূজোয় বিপদ ভারী। বৌ চেয়েছে ঢাকাই শাড়ী—” মাদ্রাজী শাড়ী নহে, বোম্বায়ের ছাপা শাড়ী নহে, চাই ঢাকাই শাড়ী।

বাঙালার আত্মবলয়নের ইহা উচ্চাঙ্গ। সেই বাঙলা আর আজিকার বাঙলা।

সিদ্ধ বলিয়া বাবুনীরা অঙ্গে আজ যাহা চড়াইতেছে, জেলেমালাদের ছেলেপুলেদের পূজার সময়ে রামধনুক রং-এর পোষাক পরিচ্ছদ পরার সঙ্গে কোনও পার্থক্য নাই। না, না কিছু পার্থক্য আছে। তথাকথিত সিদ্ধের উপর

নকলী বেনারসী কাজ। বেনারসীর কাণ ঘেঁষিবার হিম্মৎ যখন নাই, তখন দুধের সাধ বাবুনীরা এইভাবেই মিটাইবে বৈকি।

‘বন্দেমাतरम्’-এর রেওয়াজ আমাদের বাল্যকালে না থাকিলেও হকারের হাঁকেও শুনা গিয়াছে, “বৌ চেয়েছে ঢাকাই শাড়ী” আর “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই” ছড়া কাটিয়া গলা ভাঙ্গিবার পরে, অন্ধের শোভনী মরি মরি—এখনকার ছেলেরা বলবে ছিঃ, ছিঃ! যাক এ কথা।

পূজার সময়ে বাঙলা দেশে এমন কোনও লোক দেখিতে পাওয়া যায় নাই যে, নববস্ত্র পরিধান করে নাই। পশ্চিমা, উড়িয়া ও সাঁওতালীর ভিড় তখন কলিকাতার অলিতে-গলিতে। পূজার কয়দিন নববস্ত্র পরিয়াই তাহারা ঘোরাফেরা করিয়াছে। বাড়ী বাড়ী ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইয়াছে অবাধে। বাঙালীর তো কথাই নাই। তাহাদের ছেলেপুলেরা বেশভূষা করিয়া দলে দলে আনন্দে আস্তহারা হইয়া বেড়াইয়াছে।

পূজার আকর্ষণে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং থাকিয়াছে কয়েক কম চারিদিন শত শত নরনারী বহু দূর দূরান্তর হইতে। তাহাদের প্রত্যেক দল ‘পাঁট্‌ছড়া’ বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে ঘুরাফিরা করিয়াছে কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত এবং কুতর্ভা হইয়াছে কালীঘাটের কালীমদিরে যাইয়া এবং তাঁহার পূজা করিয়া। পূজার সময়ে এই ভক্ত নরনারীর কলিকাতায় আগমন ছিল কলিকাতায় পূজার একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

পূজা উপলক্ষে শ্রমিক, ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ ব্যবসায়ীর অর্থাগমের কুলকিনারা ছিল না। কেবল হিন্দু নহে মুসলমানও লাভবান হইয়াছে অপরিমিতভাবে। চীনাদের জোর কাজ বাড়িয়াছে জুতা প্রস্তুত ও বিক্রয় ব্যাপারাদিতে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান ও রাজমিস্ত্রী তখন প্রায় সবই মুসলমান। পূজার মরুহমে ইহাদের আশাতিরিক্ত মুনাফা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মুসলমান কারিগরের তৈরী বালকবালিকার জন্ত নানা রংয়ের টুপী পালক সমেত বিক্রয় হইয়াছে সহস্র সহস্র। কাগজের নানাবিধ খেলনা ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া

বেশ পরস-কড়ি কামাইয়াছে কয়দিন। এইভাবে পূজা উপলক্ষ্যে পেটে খাইয়া পূজা সম্বন্ধে তাহাদের আগ্রহের সীমা থাকে নাই—তুর্গামায়ীর জয় দিয়াছে সঘনে।

পিতামহ যখন পূজার বহু পূর্বে নৌকাভরা সূতা কলিকাতা হইতে রাধানগরে লইয়া গিয়া স্থানীয় তত্ত্বাব্যয়দের দ্বারা বহু ধুতি, উড়ানি, সাটী প্রস্তুত করাইতেন শ্রিয়জন ও গ্রামবাসীদিগকে পূজার উপহার দেওয়াইবার জন্য। বজ্রাদি দুই দুই রকমের হইত না, একই রকমের সব।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। যখন বজ্রাদি বাহ্য প্রস্তুত করাইতেন, চাহিদা মিটাইতে তাহার উপরও বেশ কিছু বজ্রাদির প্রয়োজন পড়িত। তাহার পুত্রদ্বয় প্রশম-কুমার ও সূর্যকুমার বাড়তি কাপড় কলিকাতা হইতে পাঠাইতেন। একবার প্যাং খুলিয়া যখন দেখে যে বজ্রাদির সহিত একখানি দামী বেনারসী সাড়ী রহিয়াছে। সবিস্ময়ে যখন বলেন, এ কি! শুনে—মধ্যমা পুত্রবধুর জন্ম ইহা। অধৈর্য্য হইয়া যখন তৎক্ষণাৎ আত্মা দিলেন, সমস্ত কাপড় পুড়াইয়া ফেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে প্রশমকুমার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পিতাকে তিনি জানান, “বাক্স, সূর্য্য এ কাপড়ের কথা আদৌ জানে না, আমার হাতেই এ কাপড় আসে, বেনারসের মহারাজার পাঠান—দাম দিয়া কেনা হয় নাই।”

জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা শুনিয়া পিতা বলেন, “জানি আমি, সূর্য্য এমন ছেলেই নয়। তাকে মেজ বৌমাকে।” মেজ বৌমা আসিল। যখন বজ্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, “আমি বলছি এ কাপড় পরিয়া রাখাবল্লভজীউকে তুমি প্রণাম করিবে।”

লক্ষ্য করিবার বিষয় অল্প সময়ে তিনি তাহা পরিতে বলেন নাই। পূজার কয়দিন সকলেই এক রকম কাপড় পরে ইহাই তাহার ইচ্ছা। পূজার দুই দুই হওয়া তাহার কল্পনাভীত।

তখনকার দিনে বাঙালীর মধ্যে মৈত্রীভাব যতটা ছিল, তার কিছুই এখন নাই। লোহার সিঁচুরের মাপকাটি তখন পদমর্যাদার ইতরবিশেষ ঘটাইত না। মহাশয়ের

দাবি তখন সম্মানিত হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আর পূজাপার্বণে মাহুয়ের সঙ্গে মাহুয়ের সমতার ভাব দেখা গিয়াছে সর্বক্ষেত্রে। নাটকীয়ভাবে ইহার উল্টা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিছক নাটক ভিন্ন আর কিছু নহে।

আমরা বালকেরা মাসাধিক কাল পূজার পূর্বে সন্ধ্যার সময় ওয়েলিংটন পার্কে সমবেত হইয়া গাহিয়াছি আগমনী গান প্রাণ ডরিয়া। পূজার আনন্দ-স্মৃতি প্রস্তুত আমরা করিয়াছি সলা-পরামর্শ করিয়া।

একটালীর দেবনারায়ণ দেবের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া শোভাবাহার রাজবাটী পর্যন্ত সকল বাটীর পূজাই ছিল আমাদের নথ-দর্পণে। কবে কোন ঠাকুর দেখিতে যাইব আমরা তাহার স্মৃতি নির্দ্ধারিত করিতাম আমাদের সামান্য-মজলিসে।

বহুবাজারে শ্রীনাথ দাসের বাটীর পূজা সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকের সহিত হইত। প্রতিমা নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমা ভাসান পর্যন্ত এ পূজার আদি অন্ত সকলই আমরা উপভোগ করিয়াছি।

পূজার পনের দিন পূর্বে নহবৎখানায় নহবৎ সুর হইত। মধুর সুরের সে বাদনভঙ্গীতে সকলের মনোপ্রাণ হরণ করিয়া লইত। আর আমাদের সামান্য-মজলিসে মায়ের আগমন প্রতীক্য অবীরতার আনন্দে নাচিতে কুঁদিতে লজ্জা বোধ আমরা করি নাই।

প্রতিমার সৌন্দর্যের সহিত সাজ-পোষাকের সৌন্দর্য-যুক্ত যখন হইত আনন্দবিস্ময় না হইয়া কেহই থাকিতে পারিত না। শ্রীনাথ দাসের তুর্গাপ্রতিমা অপেক্ষা জগদ্ধাত্রী প্রতিমা উচ্চতায় বেশ দীর্ঘ হইত। এ বাটীর কোনও প্রতিমাই টেলিগ্রাফের তার না খুলিয়া বাহির করা যাইত না। এখনকার অপেক্ষা তখন টেলিগ্রাফের তার লাইন একটু বেশী উঁচু করিয়া বাঁধা হইত।

শ্রীতুর্গা হইতে সিংহ ও চোরা পর্যন্ত সকল মূর্তিই গঠিত হইয়াছে শাস্ত্রাদিসম্মত। খামখেয়ালী মূর্তি গড়া কুমারের পক্ষে স্বেচ্ছাজনক। সে মূর্তি সে গড়িবে না। স্বেচ্ছাজনক মূর্তি গড়িবার তুর্ভাগ্য তাহার কখন হয় নাই। দেবীমূর্তির বংশাশ্রমিক বিশেষ কিছু থাকিলে মূর্তিগঠনে

সামান্য ইতর বিশেষ অবশ্য কুমারকে করিতে হইয়াছে, কিন্তু অশান্ত্রীয় মূর্তি গঠনে হাত লাগাইবাব কল্পনাও কুমার কখনও করে নাই। মাতৃমূর্তি যে!

মাতৃমূর্তিই বটে। ধূপধূনার নিবিড়তায় মাতৃনয়নের স্নিগ্ধ শাস্ত অভয় দৃষ্টি দেখিতে যে चाहিয়াছে, সেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে। মাঠে: মাঠে: মায়ের নয়নে বদনে উচ্ছ্বসিত। সেই মায়ের পদতলে লুটাইবে না সে! আরত্নিক শেষে শত শত নরনারী মা মা রবে লুটাইয়া পড়িয়াছে মায়ের সম্মুখে, তাঁহার পদতলে। লুটাইয়া পড়িয়া বস্তু করিয়াছে জীবন তাহার। ভুলুষ্ঠিত হইয়া ভূমি ছাড়িতে চায় না। উঠিতে হয়। উঠিয়া দেখে মধুর হাস্তে মায়ের মুখমণ্ডল ভরিয়া রহিয়াছে। আবার মা মা! এই পবিত্র দৃশ্য দর্শনে বালক আমরা, আমাদের প্রাণে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। সে রেখা উজ্জ্বল রহিয়াছে এখনও, থাকিবেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত।

ঘোড়শোপচারে মাতৃপূজা সম্পাদনকালে অগণিত ভক্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে জোড়হস্তে মায়ের মুখপানে চাহিয়া। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে সেই-ভাবেই থাকিবে সেই স্থানে, এতটুকুও নড়িবে না চড়িবে না। পূজা শেষে প্রাণে তাহার অপার আনন্দ, অসীম বল। সে বলে, সে উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছি আমরাও। সহানু নয়নে মা আমাদের প্রাণে আনন্দে ভরিয়া দিয়াছেন। পূজাঙ্গণ ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চাহে নাই। জ্ঞানি বাহিরে আনন্দ মেলায় তুফান উঠিয়াছে। তথাপি অঙ্গণ ছাড়িতে প্রাণ চাহে নাই।

কলিকাতায় দুর্গাপূজা আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে জীববলির পাট বড় একটা দেখি নাই। কুমড়া, লাউ, তরমুজ, আখ প্রভৃতি বলির কথাই শুনিয়াছি। সে সবও দেখিতে আমাদের বালকদের বড় ইচ্ছা হয় নাই। বহুবাক্ষারে পাঁঠা বলি দেওয়া হইত গণেশচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে, বাজারাম অক্রুর লেনে বিষ্ণু জেলের বাড়ীতে, ও তম্বিকটস্থ স্কুডিদের বাড়ীতে। পশুবলি যেখানে, সেখানে যাইতে আমাদের অনেকেরই মন চাহিত না।

সারি বাঁধিয়া পূজাবাড়ীর নাম এখন করা যাউক।

দেবনারায়ণ দেবের বাড়ী (এন্টালী), মাড়ের বাড়ী

(জানবাজার), স্কুডিদের বাড়ী, বিষ্ণু জেলের বাড়ী, অক্রুর দত্তের বাড়ী, বহুবাক্ষার সরকারদের বাড়ী, অভয় হালদারদের বাড়ী, গণেশচন্দ্রের বাড়ী, শ্রীনাথ দাসের বাড়ী, দেওয়ানজী বাড়ী, মতিলালের বাড়ী—এ কয়টিই বহুবাক্ষার এলাকায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য—দেওয়ানজী বাড়ীর প্রতিমা স্বর্ণধচিত।

কর্ণওয়ালিস্থীটে—মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার বাড়ী ও পটলডাঙ্গায়—ঘোষালদেব বাড়ী, চারু মল্লিকের বাড়ী।

বিডন স্থীটে—কালী মিত্রের বাড়ী

গ্রে স্থীটে—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটী

রাজা নবকৃষ্ণ স্থীটে—শোভাবাজার রাজবাটী

এইসব বাড়ীর পূজা আমার চক্ষে দেখা। পিতৃদেব পূজার নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেন একশতেরও অনেক অধিক—ভবানীপুর, শিদিরপুর, কালীঘাট, বেহালা, কানীপুর, শিবপুর, হাওড়া, ব্যাটরা প্রভৃতি স্থান হইতে।

বহুবাক্ষারের পূজার জাঁকজমকের কথা বলিতে হইলে শ্রীনাথ দাসের ও মাড়ের পূজার কথা সর্বপ্রথমে বলিতে হয়। ঢাকটোল, সানাই, যাজ্ঞান, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে ভরপুর হইত কয়দিন ধরিয়া। শ্রীনাথ দাস লেগে শ্রীনাথবাবুর গাডীবারান্দা হইতে ওয়েলিংটন স্থীট পর্যন্ত কয়দিন, সারাদিন ও রাত্রি তিন ঘটিকা পর্যন্ত জমজমাট হইয়া থাকিত লোকের ভীড়ে ও দোকান পসারীর কাবকারবারে। নাগরদোলা (দোলা ও ঘোড়া) অবিরাম আনন্দবর্জন করিয়াছে বালক ও কিশোরদের সমভাবে: দুই পয়সা মাত্র খরচ করিয়া মহানন্দে দোল খাইয়াছে তাহার।

শ্রীনাথ দাসের পূজার বৈশিষ্ট্য ছিল সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দরিদ্রকে বসাইয়া পেট পুরিয়া খাওয়ানতে। প্রত্যহ প্রায় আড়াই হাজার দরিদ্রের সেবা শ্রীনাথবাবু বৎসরের পর বৎসর এইভাবে করাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতিকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সম্যক পরিচর্যা করাইয়াছেন নিজ তত্ত্বাবধানে। পূজায় দানছত্র যাহাকে বলে সেই মত অহুষ্ঠান করিয়া পূজার সার্বকতা তাঁহার হইয়াছে।

মাড়ের বাটীতেও অল্পবিস্তর এইভাবে পূজাহুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। গণেশচন্দ্রের বাটীতে গণেশবাবু মহাষ্টমীর দিনে বিপ্রহরে পাড়ায় সকলকে সেবা করাইতে বিপুল আয়োজন করিয়াছেন এবং নবমীর রাত্রিতে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাদির আয়োজন করাইয়া তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ দিয়াছেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতিকে সমভাবে। এই রাত্রিতে জাতি নির্বিশেষে মায়ের পূজায় সকলেই সমভাবে সম্বন্ধিত হইয়াছে।

রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে, তখনকার চলা, 'সাহেব ভোজ' মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। এ ধারণা যেন কেহ না করিয়া বসেন যে 'সাহেব ভোজ' মাত্র সাহেবেরাই নিমন্ত্রিত হইতেন, সপ্তমী অষ্টমীতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইতেন না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গের নৃত্য এই অভ্যাগতদিগকে পবিবেশিত হইত।

তখনকার দিনে হিন্দুর পূজা-পার্বণের মধ্যে দুর্গা পূজাতেই হিন্দু ঐদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সহিত নোভ্রাত্ত বন্ধনে বদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে ঐকান্তিকভাবে। পূজা উৎসবে পরিণত হইয়াছে স্বতঃই।

হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা উপলক্ষ্যে এই ঐদার্য্য হিন্দুর সামাজিক অহুষ্ঠানাদির দ্বারা উন্মুক্ত করাইতে সাহায্য করিয়াছে বিপুলভাবে।

একদিকে এই ঐদার্য্য, অত্রদিকে পূজা-সম্পাদনে গভীর নিষ্ঠা ও তন্ময়তা হিন্দুর মর্যাদা বাড়াইয়াছে সকলের চ'খে অস্বাভাবীয় ভাবে। হিন্দুর সকল পূজাপার্বণের উদ্দেশ্য, নিজ ধর্মে আস্থাবান থাকিয়া সকলের সঙ্গে ভাই ভাই ভাব জন্মান। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্বধর্ম্মদেব মধ্যে উচ্চনীচ ভাবের অস্তিত্ব আমরা দেখি নাই, শুনি নাই।

প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজার সার্বজনীনত্ব ভাব অশুভব করিয়াছি, উপভোগ করিয়াছি আমরা আবহমানকাল। পূজাঙ্গন কোথাও কোথাও সঙ্গীর্ণ হইলেও জনসমুদ্র স্থির ধীরভাবে মাতৃদর্শনে অপর ঐশ্বর্য্য লইয়াও কাহারও সঙ্গে কাহারও গালাগালি নাই, ঠেলাঠেলি নাই। পাছু পাছু সকলেই মাতৃদর্শন করিতে স্থিরসঙ্কল্প। গলাগালা দিবার কল্পনাও নাই কাহারও। গৃহকর্ত্তা কৃতার্থ তাহার

দীন কুটীরে এত লোকের স্তুভাগমনে। স্ততরাং মোড়লী করিবারও কেহ নাই সেখানে।

সার্বজনীন দুর্গাপূজা বলিয়া এখন যাহা খ্যাত, তাহার আদি কর্ত্তা শ্রদ্ধেয় বহু মহাশয়, সিমলা ব্যায়াম সমিতির স্বনামধন্য অধ্যক্ষ। সার্বজনীনভাবে পূজা করণের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি আমাদের জ্ঞানে জ্ঞানে জানান। প্রায় সকলেরই কাছে তাঁহার প্রস্তাবের তিনি সমর্থন পান। পূজার মত পূজা অহুষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে—পর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া। সমগ্র কলিকাতা ভাঙ্গিয়া পড়ে এ পূজা দেখিতে।

কলিকাতা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সিমলা ব্যায়াম সমিতির উত্তোগ হ্রাস পাইতে দেখা যায় শীঘ্রই কলিকাতার অস্তিত্ব স্থানে সার্বজনীন গজাইয়া উঠাতে। সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীনে রাজনৈতিক চাল ছিল অল্পবিস্তর ভাবে। পূজার অদনে তাই তাই এক ঠাই করাই ছিল প্রধান উৎসব।

অস্ত্র একের পর এক 'সার্বজনীন' গড়িয়া উঠিতে আদি সার্বজনীনকর্ত্তা দেখিলেন তাই তাই ঠাই ঠাই হইবার উপক্রম। তাই কালবিলম্ব তিনি করিলেন না হাত গুটাইয়া লইতে। লক্ষ্য করিলেন তিনি নব নব সার্বজনীনে দেবীমূর্ত্তি গড়াইবার নব নব প্রহসন। প্রাণে পাইলেন তিনি গভীর আঘাত।

তাহা হইলেও সার্বজনীনে দেশ ভরিয়া গেল, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অমিতবিক্রম একজনের উত্থান না হইলে এবং তিনি রাশ টানিয়া রাখিতে না পারিলে সার্বজনীনের শেষ কি হইবে বলা যারপরনাই কঠিন।

দে যাহাই হউক, সার্বজনীনের কারণে সর্বত্র ডামা-ডোলের অবধি নাই। 'সর্বমঙ্গল্যে' মা জ্ঞানেন, ইহার মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়।

সাজান প্যাণ্ডেল, বাহারী আলোকমালা, দোকান-পাটের বাহার আর অগণিত নরনারী জনতা দুর্গোৎসবের নামের সার্থকতা নিশ্চয়ই করে। উৎসবের আনন্দে জনতার মধ্যে ধর্ম্মভাবের কিছু উন্মেষ হওয়া স্বাভাবিক। আশ্চর্য্যের বিষয় দে ভাবের চিহ্নও দেখা যায় না। আর

দেখা যায় না, মায়ের ছেলে হইয়া ভাই ভাই এক ঠাই হইবার সাধ, বাসনা।

এ সাধ পূর্ণ মাত্রায় আমাদের সময়ে দেখা দিয়াছে বাল্যকালে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পূজার বহু পূর্ব হইতে দাঙ্গা মজলিসে পূজার আনন্দ-উচ্ছ্বাসপর্ক-কথার আভাস দিয়াছি। মহাসপ্তমীর প্রাতে ‘কলাবৌ’-এর আন উপলক্ষ্য করিয়া বালক আমাদের একপ্রাণতার দৃষ্টান্ত অপূর্বভাবে আমরা দিয়াছি।

রাত্রি সাড়ে চার ঘটিকা হইতে চঞ্চলতার আমাদের নামা থাকে নাই। আন সমাপ্ত। ‘কলাবৌ’কে অভ্যর্থনা করিতে মাতামাতি করিয়া আমরা বেড়াইয়াছি রাজপথে মহোজ্ঞাসে। বাস্তবভাবে পূজার স্মৃতি আমাদের আরম্ভ করিয়াছি কলাবৌ নাওয়ানোর পালা হইতে। দল বাঁধিয়া দুই বেলা আনন্দিক দর্শন, পূজাঙ্কণে ঘন ঘন মাতৃ-মূর্ত্তি সন্দর্শন আমাদের বুকে মধুর ভাবের সাড়া তুলিয়া মোহিত করিয়াছে মাতৃসঙ্গ বা সখাসঙ্গ ছাড়িতে মন আমাদের চাহে নাই।

আর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের উজ্জোগে কাঁদিয়া আমরা বুক ভাসাইয়াছি; পরস্পরের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিতে বেদনা অনুভব করিয়াছি আমরা। বাল্যকালের সেই সখ্যতার বন্ধন উত্তরকালে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া আমাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া দিয়াছে।

শুরুজনের পদবন্দন ও সমবয়সীদের সঙ্গে প্রগাঢ় আলিঙ্গন আমাদের প্রাণে মধুর স্মরের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বিজয়া করিয়া সত্য সত্যই বিজয়গর্বে গর্বিত হইয়াছি আমরা। বিজয়ার প্রণাম, আলিঙ্গনে মনে হইয়াছে আমরা কাহাকেও ছাড়িয়া কখন থাকিতে পারি না।

আমাদের বাঁটিতে বিজয়া করিতে আসিয়াছে কত লোক। রাত্রি একটা পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই। সকলে মিষ্টিমুখ করিয়া কত না মাধুর্য্য বিতরণ করিয়াছে।

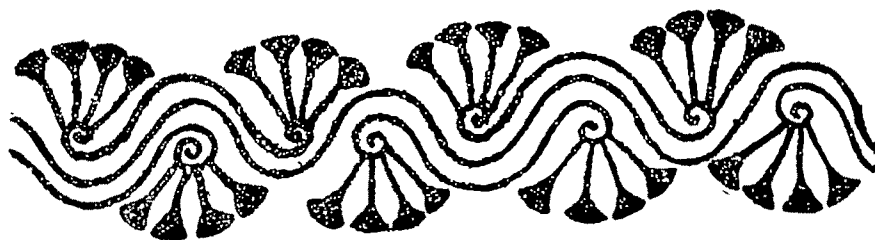
রাজপথে প্রতিমার পর প্রতিমাকে বিদায় দিতে আবুলিবিবুলি করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সম্ভ্রম বিজয়া-সন্তোষে সে ব্যথা-বেদন প্রশমিত সত্যসত্যই হয়—গুরুজনের স্নেহাশীর্ষাদের প্রলেপে।

বৎসরের মত মা চলিয়া গেলেন। যাইবেন কোথায়? আবার তাঁহাকে আসিতেই হইবে। ভক্ত গাহিয়াছে :

‘যাওয়া আসা, কেমন মায়া,  
ভানব তোমার জারিজুরি  
ওমা তোর মায়ীতে বাঁধব তোকে  
তোরই চরণ শিরে ধরি।

যাবি যাস মা যেথায় খুসী,  
বসে হেথায় টানব রশি  
মহামায়ার মেয়ের মায়া  
দেখবে সবাই কারিগরি।  
ওমা বিজয় ভক্তা বাজবে তখন  
যাওয়া আসার পথ মুড়ি।

চ’খে দেখা আমার পূজা, জামতাড়া, কাটিহার নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা বা কানপুর ও পুরীতে। বিশদভাবে বলার স্থানাভাব। এইমাত্র বলিয়া বিদায় লইতে চাই যে, উল্লিখিত সকল স্থানেই অগ্রণী হইয়া বাঙালী মাতৃ-পূজার সমারোহের আয়োজন করে। সর্বাপেক্ষা সমারোহের আয়োজন হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবার্থে।



## আওয়াজ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

স্নেহপ্রভার বৃষ্টি ধড়াস ক'রে উঠলো। মুখ ক্যাকাশে। দারুণ উৎকর্ষ নিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত পায়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

স্নেহপ্রভার আশংকা হাতে হাতে ফলে গেলো। যা ভেবেছিলো তাই হ'ল। ধব ধব করতে করতে, টেবিলের ওপর রাণা, ফুলগুড়ু বড়ো কাঁচের ফুলদানটা তুলেই, সম্বোরে আছড়ে ফেললে রাহুল। টুকরো টুকরো কাঁচ ছিটকে পড়লো চারধারে। স্নেহপ্রভার চোখের কোণে জলের টলটলানি। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নেন্সে এলো নীচে। তপনো তার কানের পর্দায় বেজে চলেছে—সখের ফুলদানটার গুঁড়িয়ে পড়ার কাতরাণি—ঝন্ঝনানি। কানে আঙুল দিলে স্নেহপ্রভা।—সে আর সহিতে পারছে না রাহুলের বীভৎস উল্লাসের মস্ততা। বিরক্তি-হুংখ-ত্রাস তাকে জড়িয়ে ধ'রছে।

—রাহুল কী বুঝবে না? কোনোদিনই না? রাহুলের এই দুর্দান্তপনা খেয়ালের আগুনে জলে পুড়ে ছাই হ'তে থাকবে স্নেহপ্রভা আজীবন ধরে? কেন? বাবা-মা তাকে এই স্বখী করেছেন? বড়োঘরে, ধনীঘরে—স্বপুরুষ ছেলের সংগে বিয়ে দিবেই তো! নিশ্চিন্ত—গরীবের মেয়ে উদ্ধার হ'ল—কুলে উঠলো—আইবুড়ো নাম খণ্ডালো। ব্যস, সব চুকে গেলো। মেয়ের খোঁজখবর নেবার দরকারটাও একবার ভেবে দেখলেন না আর! যাক, সবাইকে চিনেছে স্নেহপ্রভা। ছুনিয়াকে জেনেছে। ইচ্ছে হয় কপাল চিরে দেখে, এরপর আর কী বাকি আছে তার?

বিয়ের পর থেকে কোনোদিনই অস্বখী হয়নি স্নেহপ্রভা শান্তডীকে নিয়ে। শস্তর তো বিয়ের বছরখানেক আগেই মারা গেছেন। স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে স্নেহপ্রভা। তার সবকিছু উজাড় ক'রে দিয়েছে। তবু স্বামীর মন পেলো না। অবিশ্বি সেটা এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিলো—স্বামীর স্ত্রী-অন্তপ্রাণ। ভুল হ'লেও হ'তে পারে। স্বামী যা চেয়েছে, সব কিছু করতে

চেষ্টা করেছে স্নেহপ্রভা জীবনপণ ক'রে। তার ফল যা হচ্ছে খুব!

রাহুলের মনে ডুবুরী নাঘিয়েও, কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না গুর মনের কথা। স্নেহপ্রভার তাই ধারণা।—ওষে কী ধাতুতে তৈরী, গুর মন যে কী, প্রকৃত গুর মন আছে, না নেই—সেই প্রশ্নই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে স্নেহপ্রভার কাছে।

রাহুলের মদ আর ভালো লাগে না স্নেহপ্রভার।

রাহুলের হাতে ধবা—পায়ে পড়া—কৈদে ভাসানো—কোনো কিছুতেই রাহুলের মন ঘোরাতে—ভেজাতে পারেনি একটুও। তার জীবনের এই চরম বার্থতাই তাকে মুষড়ে ফেলেছে। অবসাদের ছায়া জীবনের সম্ভাব্য রাতের আধার হয়ে দেখা দিচ্ছে ক্রমে।

বিয়ের তিন বছরের ভেতর অনেক রকম মূর্তি দেখলে রাহুলের স্নেহপ্রভা।—আর নয়। কিসের টানে থাকবে পড়ে এখানে? ছ'বছরের ছেলেটাও মারা গেলো সেদিন। এক সেই শোকের আগুন তার বুকে জ্বলছে দিনরাত, তার ওপর রাহুলের অত্যাচার-উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলেছে।—আজ ফুলদান, কাল টেবিলের মার্বেল পাথর, পরশু আয়না, তরশু আলমারী ভেঙে খান খান করছে রাহুল।

রাহুলের যেন আজকাল একটা না একটা দামী জিনিষ ভাঙা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী থেকে সব বেয়িয়েছে স্নেহপ্রভা—পাণের লীলাদিদের বাড়ীতে—একটু গল্প করতে—একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে—স্বখ হুংখের আলোচনায় মনের জমা-ব্যথাকে হাল্কা করতে। তা হবার উপায় নেই। ফুলের টবগুলো হুড়ুম হুড়ুম করে, ছাদ থেকে একটার পর একটা ফেলেই চলেছে রাহুল। বিরাম নেই। পাশের বাড়ী থেকে দেখতে পেয়ে, শব্দ শুনে, দৌড়ে এল স্নেহপ্রভা।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে, ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

—কী হবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বাধা দিয়ে অবুঝকে?



বোঝাবুঝির চরম সীমায় গিয়ে সে পৌঁচেছে। বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

স্নেহপ্রভা স্থির করে নিলে—একেবারে অচল অটল সিদ্ধান্ত। কোনো রকমে রাহুলের ঝাকামিভরা ছল-ছলানি চোখের ফাঁদে আর পড়ছে না। মায়া-কান্নাষ আর ভুলছে না। সে চলে যাবে। মা বাপ স্থান দিতে পারবে না। গরীব। তাঁদের ঘাড়ে পড়তে চায় না সে। তাঁদের জানাবেও না তার মর্মপীড়া। যেখানে দু'চোখ যায়—অজানা পথে পা বাড়াবে। মরতে হয় মরবে। অন্ততঃ রাহুলের কাছে দণ্ডে দণ্ডে মরার চেয়ে একেবারে মরা অনেক ভালো। সে নিষ্কৃতি পেতে চায়—রাহুলের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

খানিক পরে রাহুল বেরিয়ে গেলো। মুখখানা ভার ভার। স্নেহপ্রভার পাশ দিয়ে যাবার সময়, একটু কটমট করে চেয়ে গেলো—যেন জিনিষপত্তর ভাঙাচোরায় অন্ডায় কিছু নেই রাহুলের। বরঞ্চ এ ব্যাপারে স্নেহপ্রভার রাগ করাটা—অভিমান করাটা রীতিমতো অন্ডায়। স্নেহপ্রভা রাহুলের কোথায় সহায়তা ক'রবে, তা নয় কেবল ফৌসফৌসানি! না থেয়েই রাহুল চলে গেলো।

অনুদিন এরকম হ'লে, স্নেহপ্রভা রাহুলকে আটকায়। হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে খাইয়ে দেয়। আজ স্নেহপ্রভাও মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

—যাক্গে। আন্ডারা দিয়ে দিয়ে এতোদূর স্পর্ধা বেড়ে গেছে। একেবারে মাথায় উঠে নাচছে। স্নেহপ্রভা ভেবেছিলো—রাহুল তাকে সম্পূর্ণ অবলম্বন ক'রে আছে। সে ছাড়া রাহুলের ভবিষ্যতের আর কেউ এতো নির্ভরযোগ্য সাথী নেই। রাহুল বড়ো অসহায়।

বিয়ের পর নতুন বৌ হ'য়ে, প্রথম যখন এ বাড়ীতে এলো স্নেহপ্রভা, শান্তুড়ী হাতে ধরে বললেন—বৌমা, রাহুলের ভার আজ থেকে তোমার ওপর দিলুম। কথা দাও, ওকে দেখবে? লাজুক বৌ ওড়নাচাকা ঘোমটার আড়ালেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলো।

প্রথম প্রথম রাহুলকে দেখে মনে হ'ত কতো নিরীহ। কতো ভালোমাহুষ। স্নেহপ্রভা ছাড়া জগতে

আর কেউ নেই ওর। স্নেহপ্রভাকে একদণ্ডও চোখের আড়াল করতে চায় না। স্নেহপ্রভার যে কোনো অন্ডায়ই রাহুলের চোখের সামনে ঝায় হ'য়ে ভেসে উঠেছে। কতো সময় বিবস্ত্রের ভান ক'রেছে স্নেহপ্রভা। রাহুলের নিরুপায় চোখ দু'টো জলে ডবডবিয়ে উঠেছে। স্নেহপ্রভার বুকে বাজ পড়েছে সংগে সংগে। দৌড়ে রাহুলের কাছে এসেছে স্নেহপ্রভা। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়ে দিয়ে, নিজেই কঁদে ভাসিবেছে।

—একি কবলুম, কেন ওকে ব্যথা দিলুম? ওষে কিছু বলতে জানে না। ওষে কখনো কিছু বলবেও না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—সহশ্র বৃষ্টিক দংশনের জালা জলতে থাকে স্নেহপ্রভার বুকের ভেতর।

নির্বাক রাহুল তার চোখের ভাষায় স্নেহপ্রভাকে বোঝায়—না, সে কিছুতো মনে করেনি! স্নেহপ্রভা কান্দছে কেন? স্নেহপ্রভা কান্দলে, আছাড়পিছাড়া করলে—রাহুল যে এক মুহূর্ত বাঁচবে না। স্নেহপ্রভার পিঠে হাত বুলায় রাহুলের নীরব মহাহুত্ব। তৃষ্ণির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে স্নেহপ্রভার মুখেচোখে।

শান্তুড়ী মারার যাবার সময় স্নেহপ্রভাকে বলে গেলেন—বৌমা! কখনো রাহুলের ওপর হুঃখু ক'রো না। রাগ-অভিমান কক্খোনো না। ওর ওপর কিছু করা মানে, জানবে নিজের ওপরই পড়বে।

শান্তুড়ী মরবার পর থেকে, শান্তুড়ীর আদেশ শিরোধার্য করে, সংসারে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে স্নেহপ্রভা। কিন্তু প্রতিশ্রুতির পায়ের বেড়ি-ছাতকড়া দিয়ে তাকে শান্তুড়ী কেন আটকে গেলেন? তিনি কী ছেলের গুণ-কাহিনী জানতেন না কিছু? রেহাইয়ের কী কোন পথ নেই তার?

গালে হাত দিয়ে সিঁড়ির চাতালে বসে বসে ভাবছিলো স্নেহপ্রভা। অতীত স্মৃতির ছবিগুলো পর পর এক এক ক'রে চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো। হঠাৎ সে ছবির মাঝখানে ছেদ পড়লো। কিরে এলো রাহুল হস্তদস্ত হ'য়ে। একগাল হেসে, হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে ওপরে নিবে চললো স্নেহপ্রভাকে।

স্নেহপ্রভা বিষ্ময়বিমূঢ়। এতো শক্তি পেলো কী ক'রে

আজ রাহুল ? তার হাত দুটো তেঙে যাবে এখনি। এতো জোরে জোরে পা ফেলছে কেন ? তার বুকের হাড়গুলো মড়মড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন। রোজের ভাঙাচোরায় বাধা দেয় স্নেহপ্রভা। তাই কী রাহুলের প্রতিশোধস্বপ্ন হা জেগে উঠেছে ? জিনিষ ফেলার মতো তাকেও ওপর থেকে তুলে ফেলে দেবে ? ভয়ে কেঁপে ওঠে স্নেহপ্রভা। স্মার্তনাদ করে উঠলো।

পেছনের কোনো আওয়াজই নাড়া দিচ্ছে না রাহুলের মনের পর্দাকে। রাহুলের কোনোদিকে অক্ষিপ নেই। উঠেই চলেছে ওপরে গৌ ভরে। বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে স্নেহপ্রভার কঙ্কি—যাতে স্নেহপ্রভা পালিয়ে না যায়।

স্নেহপ্রভা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার চোখের সামনে শাস্ত্রী, ছেলের মুখ ভেসে উঠতে লাগলো। চোখের জলে চারদিক ঝাপসা হয়ে এলো। সিঁড়িতে হৌচট খেতে খেতে উঠছে নিজীব স্নেহপ্রভা।

—রাহুল শোবার ঘরে নিষে গিয়ে খাটের ওপর বসালো স্নেহপ্রভাকে। স্নেহপ্রভার চোখে মুক্তির আকুতি।

সাদা ধবধবে দাঁতগুলো বাব করে সারল্যের হাসি হাসলো রাহুল। প্রাণ জুড়িয়ে গেলো স্নেহপ্রভার। ভয়ের লেশমাত্র রইলো না মনে। স্নেহপ্রভা যেন পুর্বানো রাহুলকে—আগের রাহুলকে ফিরে পেলো। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

রাহুল পকেট থেকে গোটা ছুরক বাজী বোমা বার করে টেবিলে রাখলে।

স্নেহপ্রভার চোখ বিস্ফারিত—

—আজ দেয়ালী। ঠিক কথা। কিন্তু আগেও তো দেয়ালী গেছে, বোমা বাজী নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কখনো তো দেখেনি সে ? তবে ? তাকে মারবার জন্তেই এসব যোগাড় ?

স্নেহপ্রভা স্বযোগ খুঁজতে থাকে পালাবার। রাহুলের সতর্ক দৃষ্টি দরজা আগলে ধরে। পালাতে গিয়ে স্নেহপ্রভা ধরা পড়লো। দরজায় খিল এঁটে দিলে রাহুল। নিরুপায় স্নেহপ্রভা রাহুলের পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। চোখের জলে ভিজিয়ে দিলো।

স্নেহপ্রভার চোখের জলে রাহুলেরও চোখের জল অঝোরে ঝরে পড়তে লাগলো। বোবা কালা রাহুলের মনের ব্যথা, মনের কথা যেন তার চোখের জল হয়ে গলে গলে পড়তে লাগলো। গোপনকে প্রকাশ করতে লাগলো। উজাড় করে দিতে লাগলো স্নেহপ্রভাকে সবকিছু—

—স্নেহপ্রভা ভয় পাচ্ছে কেন ? সে তাকে মারতে চায় না। স্নেহপ্রভা ম'লে, সে বাঁচবে কেমন করে ? স্নেহপ্রভা ছাড়া যে কেউ নেই তার। সে জানে, কথা কইতে পারে না, শুনতে পায় না কানে, স্নেহপ্রভা কী ভীষণ যত্নগা ভোগ করছে দিনরাত। সে যত্নগাটা ক'দিন ধরে যেন আরো বেড়েছে। স্নেহপ্রভা দিনরাত মনমরা। সে সব বোঝে। সে জানে, আজ স্নেহপ্রভা জানতে পাবে যদি তার স্বামী শুনতে পায়, তা হলে কতো আনন্দ পাবে তার চেয়েও। তার আনন্দে স্নেহপ্রভার আনন্দ। কালী পূজার সময় কাছাকাছি বোমা ফাটানোর আওয়াজ কতোদূর থেকে অতি ক্ষীণ হ'য়ে ভেসে এসেছে তার কানে। সে শুনেছে। প্রতি বছর শোনে। তার অপরিণীম আনন্দ হয়। সে আনন্দে স্নেহপ্রভা দেখলে খুশীতে নেচে উঠবে এখনি। তার 'শোনার আনন্দ' দেখাবার ইচ্ছে ছিলো ক'দিন ধরে। জিনিষপত্র ভেঙেছে। কোন শব্দ শোনে নি। তাই এনেছে সে বোমা। নির্ধাৎ শুনতে পাবে। আনন্দ পাবে। স্নেহপ্রভা না জানি কতো খুশী হবে।

রাহুলের চোখের দিকে স্নেহপ্রভার নিমেষনিহত দৃষ্টি। রাহুলের চোখের ভাষা বুঝতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে গেলো স্নেহপ্রভার। রাহুল মোমবাতি জ্বলে বোমার সলতেতে আশ্রয় ধরাচ্ছে। খরখরিয়ে কেঁপে উঠলো সর্বাংগ স্নেহপ্রভার।

—সর্বনাশ করলে ! রাহুল ক্ষেপেছে নাকি ? স্নেহপ্রভার মন ভয়ের ছবির প্রতিফলন দেখতে লাগলো রাহুলের চোখে।

—রাহুলকে শয়তানে পেয়েছে। ও একটা অনর্থ ঘটাবে এখনি এই বন্ধ ঘরে। কাঁপা গলায় চীৎকার করতে লাগলো স্নেহপ্রভা—বাঁচাও ! বাঁচাও !

জানালা গলিয়ে বারান্দায় ফেলতে গিয়ে রাহুলের

# সাহিত্যে মহৎ সৃষ্টি ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

সাহিত্যে সৃষ্টি আছে এ-কথা সর্ববাদীসম্মত, কারণ সৃষ্টিশ্রুতি সমৃদ্ধ না হ'লে তা' আর যাই হোক সাহিত্য হয় না। সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টিধর্ম ও রূপধর্ম যখন সৃষ্টি সমন্বয়ে তন্ময় হ'য়ে ওঠে, তখনই হয় মতাকার সাহিত্য; এবং তখনই রসপূর্ণ মন সূক্ষ্ম বিচারণার পথে চলে' বারংবার শুধু এই প্রশ্নই করতে থাকে—এ-সাহিত্য মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছলো কিনা! কারণ, এই মহৎ সৃষ্টির শক্তিতেই যে এক দেশের হ'য়েও বিশ্ববাসীর মনকে আকর্ষণ ক'রে নেয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখবোধ ও আশা-আনন্দ সাহিত্যে হয় রূপায়িত,—কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সীমিত-রেখায় তাকে আর ধ'রে রাখা যায় না, যদি তার মধ্যে ঘটে যায় মানুষের চিরকালীন মানস-অনুভূতির অভিব্যক্তি। সে তখন বিশ্বজীবনেরই মূলধন হয়ে ওঠে। বিশ্বজীবনের ব্যথা-বেদনা ও আনন্দকে একটি দৃষ্টি জীবনের মধ্যে চিরন্তন ক'রে রাখার জন্য একটি শাস্ত্র রূপধর্মের সৃষ্টি করা হয়,—জীবনোপলব্ধির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিপূর্ণতা আসে সেখানে। সেইখানেই সাহিত্য যায় মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে। তাই সাহিত্য সৃষ্টি ও মহৎ অঙ্গী-ভাবে জড়িত। ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতে যদি জীবনোপলব্ধির সত্য-চেতনা না থাকতো, তবে শুধু ধর্মের অমরজ্ঞানে রঞ্জিত হ'য়ে ভারতবাসীর কাছে নিত্যকালের বস্তু হ'য়ে থাকতো না—বিশ্ববাসীর কাছে তো নয়ই।

সাহিত্যে যে জীবনেরই প্রতিফলন ঘটাতে হবে পরি-পূর্ণভাবে, এর মধ্যে বিতর্ক বা মতবৈধতার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। জীবনের হাসিকান্নার সঙ্গে কামনা-ভাবনার যে একান্ত ঘনিষ্ঠতা, সেই ঘনিষ্ঠতাকে অস্বীকার ক'রে আর যাই হোক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তাই বলে' জীবনের কামনাকেই একমাত্র পরমার্থ মনে ক'রে নগ্ন-ভাবে সেইগুলোকেই প্রকাশ করতে হ'বে, তার কোন অর্থ নেই। জীবনে কামনার দিক সত্য, কিন্তু একটি সুগভীর আদর্শের প্রতি যে মানব-মনের স্বাভাবিক নিষ্ঠা আছে, সে কথাটি আরও সত্য। মানুষের জীবন পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে যেতে স্নিগ্ধতাভরা একটি শাস্তি চায়—এই শাস্তির সত্যকে ধ'রে রাখে সুগভীর আদর্শ। মানুষের প্রাণতপস্তার সুন্দর-প্রতীকা করে সেই আদর্শময় সত্যের পরিমণ্ডলে। সুতরাং Arts for arts sake-এর দোহাই দিয়ে কেবল জীবনের কামনার দিকটাকেই সাহিত্যে প্রকাশ করতে হ'বে, এ-কথা সর্বাংশে সত্য হ'তে পারে না। সাহিত্যে জীবনের সর্বাঙ্গীন প্রতিফলনের জন্য যেমন কামনার দিক থাকবে, তেমনি থাকবে জীবনের শাস্তিময় বাসনা-সত্যের আশ্রয়স্থল আদর্শের স্বীকৃতি; এবং এই প্রাণময় স্বীকৃতির দ্বারাই সাহিত্য তার মর্গ-স্বাক্ষর অঙ্কন ক'রে রেখে যায় কালের কষ্টিপাথরে। জগতের প্রত্যেকটি কালজয়ী সাহিত্যের মধ্যেই মানব-জীবনের

হাত থেকে ঘরেই পড়ে গেল জলন্ত বোমা। কানফাটা আওয়াজে বোমা ফাটলো। সমস্ত ঘর কেঁপে উঠলো। ধোঁয়ায় ভরে গেলো।

আনন্দের আবেগে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে লাগলো রাহুল দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সে শুনেছে—কান-ফাটা আওয়াজের সামান্য রেশ।

স্নেহপ্রভা খাট থেকে মেঝের ঢলে পড়লো।

কাত হষে পড়া মোমবাতির জলন্ত শিখায় টেবিল রুখ জলে উঠলো। দ্বিতীয় বোমা সেই আগুনে দড়াম্ ক'রে ফাটলো। কোনো খেয়াল নেই রাহুলের, শব্দের

পর শব্দে প্রাণ তার মেতে উঠেছে, নেচেই চলেছে। ঘরের পর্দা, বিছানা, চার ধারে দাঁউ দাঁউ ক'রে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো লকলকে আগুন।

সম্মিৎ ফিরে পেলো রাহুল। স্নেহপ্রভার বুকুর ওপর আছড়ে পড়লো। রাহুলের চোখের জলের অজস্র ধারায় স্নেহপ্রভার বুক ভিজে উঠলো। অচেতন স্নেহপ্রভাকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে বেরুতে গিয়ে টেবিলে ঠোঁটের খেলে রাহুল। ছড়মুড় করে পড়ে গেলো আগুনের বেড়ার মাঝখানে। আগুনের তাণ্ডব নৃত্য চলতে লাগলো ঘরের ভেতর।

কামনাময় দিকটির যেমন প্রকাশ আছে, তেমনি আছে আদর্শময় ঔজ্জ্বল্যের অপকূপ বিচ্ছুরণ। পঙ্কের গভীরে পঙ্কজবিকাশের নিঃশব্দ আয়োজনটিকে না-দেখার ভাগ ক'রে অবহেলা করলে চলবে কি ক'রে? দেহধর্মী বস্তুতাত্ত্বিকতার প্রাশ্রয় দিয়েও আদর্শ-ধ্যানের সূচিময় চেতনাকে গ্রন্থের ফলশ্রুতির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন লেখক। রসপিপাসু পাঠকমনও গ্রন্থপাঠের আনন্দময় 'জীবনানুভূতিতে যেমন ভরে' উঠেছে, তেমনি রসানুভূতির আতিশয্যে সেই গ্রন্থলোকে ফুল ও ফলের, মর্ত্য ও স্বর্গের সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন। জীবনের কামনার সোপানগুলি বেয়ে বেয়ে সেইখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে স্নন্দরের। সেখানে কল্যাণের পরিণাম-চর্চা, সেইখানেই স্নন্দরের শাস্তিময় পরিণতি। এইজন্যই চেষ্টারটন বলেছেন—“There must always be a normal soil for any great aesthetic growth.” আমাদের শব্দচন্দ্রও তাই নিঃসংশয় উপলব্ধির সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন—“প্রকৃত সাহিত্য কখনও immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না।” কারণ যা অকল্যাণকর তা' কখনও কালের কষ্টি-পাথরে ভাস্বর হ'য়ে থাকতে পারে না। স্থায়িত্বের অবলুপ্তি তার ঘটবেই।

তবে কথা হ'তে পারে, স্নন্দরের প্রতিষ্ঠা কি কেবল আদর্শময়তার মধ্যেই? আর কি কোন স্থানে স্নন্দরের প্রতিষ্ঠা নেই? আছে। জীবনের যে-কোন স্তর প্রকাশের মধ্যেই স্নন্দর আছেন; এবং তাঁর সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে সেই সত্য, যে-সত্য জীবনের বহু দুঃখ-বেদনার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে,—বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার আলোড়ন থেকে তার অস্তিত্বের লাভগ্যকে সকলের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে।

সাহিত্যে স্নন্দরের প্রতিষ্ঠা হয় কবি বা সাহিত্যিকের ধ্যানচিন্তার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে যে-একটি ধ্যান-তন্ময়তার গভীরতা আছে, তার মধ্য দিয়েই সূর্যরশ্মিপাতে শতদল বিকাশের মতো স্নন্দরের উদ্ভব ঘটেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কল্যাণের আদর্শবার্তা। সাহিত্যে মহৎ হলোই তার মধ্যে স্নন্দর থাকবে, অর্থাৎ সেই আনন্দ থাকবে, যার মধ্যে দ্ব্যর্থতা স্নদের অঙ্কুরণ আছে। চিরন্তন সত্যকে নিয়েই স্নন্দরের

স্নন্দরতা। ভালোবাসার মধ্যে যে অসীমতার ভাব আছে, তা' কালিদাসের 'মেঘদূত'ের শ্লোকগুলিতে যখন দেখা যায়, তখনই মনে হয়, যুগ-যুগান্তরের ব্যবধানকে অতিক্রম ক'রে মানব-মনের চিরন্তন বিরহ-বেদনাকে কবি কালিদাস আমাদের একেবারে হৃদয়ের কাছে এনে ধ'রে দিয়েছেন।

জীবনে স্নগভীর কল্যাণবোধ জাগ্রত করাই ছিল ভারতীয় কাব্যসাধনার লক্ষ্য এবং এইজন্যই ভাবতীয় সাহিত্যে ট্র্যাগেডির স্থান ছিল না। কিন্তু জীবনের সংঘাতময়তায় যে-ট্র্যাগেডি, সেই ট্র্যাগেডির মধ্য দিয়েই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে মানব-জীবনের, এবং তাতেই মে-সাহিত্যে একটি কালজয়ী মহত্বের সঞ্চার হয়েছে।

মহৎ-সাহিত্যে সৃষ্টিতে একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিক আছে। সাহিত্যিকের সৃষ্টিকল্পনাকে একই বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে নূতন চিন্তার কিছু আহরণ ক'রে নেয়। মধ্য-যুগের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে এই দিকটাই সত্য হ'য়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশি। মঙ্গলকাব্যের ভাবমণ্ডলের প্রথম শ্রেণীর কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'ভাঁড়দত্ত' ও 'দুর্বলা' অথচ সমস্ত কবির একই চরিত্র-চিত্রণের চেয়ে একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল একই কাহিনী রচনার গতানুগতিকতার খাতে ব'য়ে গেলেও চরিত্র সৃষ্টির মূল্যায়নায়, জীবনের মহাকাব্যে অংকুরিত যে-প্রাণময়তা, তার চিত্রায়ণে মহাকালের দরবারে একটি ক্ষয়হীন অমরত্বের উপঢৌকন লাভ করেছে। সেই যুগের সাহিত্য চিন্তার গতানুগতিকতার জড়ত্ব থেকে একটি লক্ষ্যগম্য ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর যখন কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে এসে রূপময় হ'য়ে উঠেছে, তখনই মনে হয় মহৎ-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্মে একটি ভাবস্বাতন্ত্র্যের প্রাণধর্ম আছে। ভাবভিত্তিক বা জ্ঞানভিত্তিক যে-কোন মহৎ-সাহিত্যই হোক না কেন, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রাণ-চেতনা সেখানে স্বাক্ষর রেখে যাবেই। কেবল অসু-সন্ধিস্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিতে হবে সেই স্বাক্ষরকে।

সাহিত্যে যখন মহত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং স্নন্দরের নির্মলতা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, তখন কবি বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিমনের যে-মননশীলতা বা ভাবস্বাতন্ত্র্য তারই সঙ্গে ঘটে শিল্পরসিক পাঠকপাঠিকার চক্ষিত

পরিচয় ; এবং এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই চিরকালের এক আস্তর-বন্ধন খটে যায়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের সত্য সম্বন্ধেও একটি কথা জাগে। মানবজীবনের সমস্ত কর্মধারা থেকে অন্তরের ভাববৃত্তিগুলিকে গ্রহণ করে সাহিত্যিক যখন শাস্ত্রত্বের আনন্দলোকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা দেন, তখনই জীবনের সত্যগুলি সাহিত্যের সত্য হ'য়ে সকলের কাছে ধরা দেয়। তখন আর সেই সত্য একটি বিশিষ্ট কোন জীবনের নয়, তা' সকলের হ'য়ে দেখা দেয়। ঐ সত্যকেই অন্তরের রসে রসায়িত করে জীবনোপলব্ধির আনন্দকে লাভ করা যায়। তাই সাহিত্যের সত্য যদি হয় আমাদের আশা আনন্দ, ভয় বেদনা প্রভৃতি আবেগ আকুলতার গভীরতম প্রকাশ, তবে কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ও নগ্নসত্যের প্রকাশ ঘটালেই সাহিত্য সত্যকার সাহিত্য হ'য়ে উঠবে না। জীবনেব যা-কিছুই হোক না কেন, তার মধ্যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা না সৃষ্টি করতে পাবলে তা' সাহিত্যেব বস্তু হয়ে উঠতে পারে না। আর যেখানে সৌন্দর্য, সেখানেই একটি পবিত্র স্নন্দর আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। আদর্শময়তার এক স্নিগ্ধ প্রলেপ তার মধ্যে থাকবেই। তাই বলে' সাহিত্যে যে আমাদের বাস্তব জীবনকে একেবারে উপেক্ষা করে যেতে হ'বে, প্রাত্যহিক জীবনের সাংসারিক তথ্যকে, তাও কোনওমুক দিয়েই গ্রহণযোগ্য নয় ; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা জীবনের পূর্ণতর ও স্নন্দরতর বাণীরূপকে কামনা করি, তবে বাস্তবলোক থেকে বস্তুকে আহরণ করে, তার মধ্যে আদর্শময় একটি কল্যাণচেতনাকে ঠাই দিতেই হ'বে। কারণ আমাদের জীবনে সমস্ত সত্যের মধ্যে, এ সত্যটিও সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে, জীবনের একটি মঙ্গল পরিণামকে আমরা প্রতি মুহূর্তেই কামনা করি। মহা-ভারতকার তাঁর বিপুলতম কাব্যে বহুপ্রেম কল্পনার শাস্ত্র রূপ ও ঋক্‌যজুর্‌ঋগ্‌ঋষিগণের আবর্ত সৃষ্টি করেও জীবন এবং জগতের মঙ্গল পরিণামের কথাই সাহিত্য-ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে তুলে' ধরেছেন। স্নন্দরকে দেখতে চাই যেমন আমরা ধ্যানচিন্তায়, তেমনি স্নন্দরের প্রতিষ্ঠাও চাই আমরা আমাদের জীবন তথা সমাজ-ভূমিকায়।

আদর্শকামনা প্রতিটি মানবমানবীর মধ্যেই থাকে। ভট্টমহাশয়ের 'ক্রাইম ও পানিদমেন্টের' মৌনিয়া ক্লেদান্ত পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করেও সে তার প্রেমাস্পদের জীবনকে দেখতে চেয়েছে শাস্ত্র স্নন্দর স্তিময় পরিবেশের মধ্যে। তার অন্তবাস্তিত স্নন্দরের কামনাই জীবনের আদর্শগত একটি সৌন্দর্যের মধ্যে তাকে ঠেলে দিয়েছে। এইখানেই বোঝা যায়, আদর্শকে ছেড়ে ভোগ-ময় জীবনকে কেবল কল্পনা করা যায় না।

প্রত্যেক ভাষাতেই যুগ বলে' একটি কথা আছে—যা' একটি বিশেষ সময়ের পরিধিকে নূতন একটি স্তর দিয়ে চিহ্নিত করে রেখে দেয়। এই চিহ্নিত করা বিশেষ সময়টিতে একজন লেখকের মননশীলতার মাধ্যমে এমন একটি মনন-বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে যা' একটা জাতির আন্তরিক-বুদ্ধির ভাবধর্মকে রূপ দেয়। এই যুগসৃষ্টিও মহৎ সাহিত্যেরই কাজ, আর এই মনন-বৈশিষ্ট্যই মহৎ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। মহৎ সাহিত্য পাঠক-পাঠিকাকে শুধু আনন্দ দেয় না, তাকে ভাবায় ; তাকে জীবন এবং জগতের সমস্ত রহস্যময়তার দিকে, নিগূঢ়তর সত্যোপলব্ধির দিকে পথ চলার পাথেয় জুগিয়ে দেয়। মহৎ লেখকের জীবন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার রূপকর্মই হ'লো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—তাতে থাকবে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের যেমন উজ্জ্বল-তম স্পষ্টতা, তেমনি থাকবে সত্যোপলব্ধির গভীরতর বার্তা। অগাধ সমুদ্রের বিপুল বিস্তারে যেমন বহুসঞ্চিত রত্নের আত্মগোপন করে থাকার ইংগিত লুকানো থাকে, প্রত্যেক দেশের মহৎ সাহিত্যের মধ্যেও তেমনি গভীরতম সত্যোপলব্ধি তবু লুকানো আছে। সেখানে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় বলেই যুগযুগান্তরের বহু ভাঙাগড়া ও বহু জটিলতাব মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে মানবহৃদয়ে সেই সাহিত্যের চির-নূতন জগৎটি তীর্থবরূপে উপনীত হয়। সে-সত্য সমষ্টিগত জীবনেরই হোক বা ব্যক্তিচরিত্রের বিশেষ কোন সত্যের উপর নির্ভরশীলই হোক। মহৎ সাহিত্য তাই একদেশের হয়েও সব দেশের, স্নন্দরের আদর্শও তাই একজনের হ'য়েও সর্বজনের। এই সর্বজনের অভিনন্দন-মাল্যেই মহৎ সাহিত্যের চিরস্নান প্রতিষ্ঠা।



# অভিশপ্ত কাণ্ড

বন্ধু !

দেখতো আমার চিনতে পারো কিনা—

দেখ দিকি ভালো ক'রে !

দেখনি আমার শ্রামা বাংলার

ক্ষুধিত চাষীর ঘরে ?

রোগে শোকে ধুঁকে ধুঁকে—

কাস্তে-লাঙ্গলে কঠিন মাটির বুকে,

সোনার ফসল ফলিয়েছি বারে বারে !

জীবনের খাতা ভরিয়ে রেখেছি বেদনার

হাহাকারে !

বন্ধু ! তুমি কি শোননি কাহিনী মোর ?

আমার ফসলে হাত দেব তার.

নেই হেন কোম জোর !

ফসল দিয়েছি তুলে—

ভরা তরীখানি এসে ডুবে গেছে কুলে !

বিনিময়ে আমি কি পেয়েছি জানো, তারি ?

শুধু অপমান বঞ্চনা আর ফাঁকি !



## অশ্রু বিস্ময়



বন্ধু !

এখনো রয়েছে কাহিনী শোনার সাধ ?

জানো,

ছোটো ছুন ভাত চাওয়া কত অপরাধ !

মাথা শুঁজবার মত বড়জোর ঠাই—

এ চাওয়ার পাপ বুঝি তার শেষ নাই !

আরো অপরাধ আমার ঘরের বৌ-বিএদের মান

আমি যে ফ্লাই ধান—আহা সোনার ধান !

ওদের পেটের দাবী

মেটাতে মেটাতে আমার গিয়েছে সব !

থরা ও বরার সঙ্গেই সংগ্রাম

মাটির ফাটলে আমরা যে হারালাম,

বিচার পাইনি হায়—

অশ্রুধাবনে জীবনের তীর শুধু দেখি ভেঙে যায় !

আশায় আশায় বংশপ্রদীপ জ্বালি—

হাত আগলিয়ে নেভানো ঠেকাই

হাওয়া ও ঝড়ে—

তারই মাঝ দিয়ে আমরা যে বাই গ'ড়ে,

নগর-নগরী, শহর-পল্লী,

অরণ্য রাজপথ,  
সত্যতা জয়-রথ;  
স্বর্ণমুকুট চূড়ে।  
এখনো চেননি মোরে ?

বন্ধু ! আমায় দেখনি কামারশালে ?  
লোহার সঙ্গে জীবন আমরা একসাথে দিই ফেলে।  
হাপরের টানে তৈরী আগুনে লোহা পিটি  
জ্বরে জ্বরে—  
হাড়ের হাতুড়ি মেরে।—



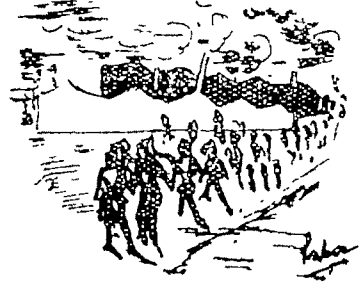
তপ্ত লোহার অস্ত্র তৈরী করি,  
দা ও কাটারী, খোস্তা—কুঠার—ছুরি !  
দেখনি বন্ধু ! আমার অস্ত্রে আমিই হয়েছি খুন  
রক্তের দাগ পুড়িয়ে দিয়েছে আমারই হাপর-আগুন,  
আপনার কাছে আপন বিচার দাবী  
হয় কি বন্ধু ? অলীক নয় কি সবই ?  
এই যে সমাজ, এই যে সভ্য মানুষ বলছ যা'রে—  
তাদের কাছে তো দাঁড়াতে পারি না বাঁচবার  
অধিকারে !

আমরা জেনেছি ভাগ্য এবং ভগবান আছে ওই—  
বল না ওদের ছাড়া কার কাছে বিচারপ্রার্থী হই ?

বন্ধু !

হাজার হাজার কামার আমরা টানি  
হুথের হাপরখানি।  
চিরটাকাল একটি ধারায় লক্ষ বংশধরে  
চলেছি আমরা হাড়ের হাতুড়ি মেরে।

তবুও চেননি মোরে ?  
দেখনি কারখানায় ?  
মৃত্যু আর চটকলে—  
হাজার হাজার কত না কর্মশালে,  
লাথ মজুরের দলে ?



গাঁইতি-সাবল-হাতুড়ি হেঁইয়া হা,—  
জীবন চাইতে যা পেয়েছি হায়, মৃত্যুই বলি তা !  
অসীম জীবন সীমিত, এখানে—  
রুটিনে বাঁধা  
চোখে মুখে কালি, হৃদয় আঁহা সে  
ধোঁয়ার ধাঁধা !  
আটুটা-চারটা, টিফিন ছুটির ফাঁকে—  
নীলাকাশ থেকে সাদা বলাকারা যদিবা কখনো ডাকে  
মাড়া দিতে গিয়ে হৃদয়ে চমক লাগে—  
বলাকা কোথায়—ছুটি কুরানোর হাঁকে  
ঢং ঢং ক'রে বাজছে ঘণ্টা ওই,  
বাড়তি কাজটা ছেড়ে দিতে ভাই  
আমরা যে রাজী নই।

হুথের সাথে লড়াই করছি, হারছি শুধু—  
ছ'চোখে তাইতো বলসানো রোদ সাহারা ধু ধু !  
ভিক্ষে মেঘ চেয়ে চাতকের মত  
চীৎকার ক'রে হায়—  
শহরতলীর ধূমেলি আকাশ  
ভরে দিই বেদনায়।  
ধোঁয়ার কালিতে হাতুড়ী লোহার

আমরা হয়েছি লীন  
শোননি বন্ধু, কেমন আমরা বাজাই যন্ত্রবাণ ?  
যন্ত্রী আমরা হাড়ের তন্ত্রী ধুনে—  
মহাসভ্যতার কঙ্কা যাই যে বুনে,—  
অযোগ্যতার যোগ্য আমরা মজুর-কুলি,  
দেখনি আমরাও কেমন জীবনকে যাই ভুলি !  
অবাক আমরা, অবাক পৃথিবী দেখি,  
পুঁথি-কেতাবের মূল্যকথার কেবল মেকী ?

অবিশ্বাসের ঘনাকার রাতে  
বন্ধু মেলেনি বন্ধু-পথে যেতে  
তবু যে চলেছি আঁধার সঁতার দিয়ে,  
লাখ লাখ যুগ ধরে—  
এখনো চেননি মোরে ?

দেখনি নদীর জলে ?  
তাঁড়া নৌকায় বয়েছি জীবন  
এপার ওপার করে !  
আজ ওঠে ছলে ছলে  
অকাল ঝড়ের দোলে—  
এপার ওপার খেয়া পারাপর  
বন্ধ হল যে ওরে  
নতুন দিনের ঝড়ে,  
এখনো চেননি যোরে ?

বন্ধু !

আমারে চিনবেন নতুন পথের 'পরে  
ক্ষেত ও খামার কুলি-মজুরের ঘরে ।  
দেখবে আমায় কালো মিছিলের সাথে  
প্রাণের পতাকা রয়েছে আমাব হাতে ;  
শিল্পী আমরা, আমরা স্রষ্টা যত,



তিমির পাথার পেরিয়ে এসেছি  
স্বর্ষোদয়ের ভোরে,—  
সেদিন চিনবে,  
চিনবে কেমন করে ?

ভাবচিত্রগুলি কবি নিজেরই আঁকেছেন।

## কাজ ও মন

শ্রীহিন্দু গুপ্ত

কাজ এসে উকি মারে, বেড়ায় কঁাকে ।  
মন বলে, এসো ।  
কাজ এলে ঘরে ঢোকে ।  
মন বলে, স্থির হয়ে বসো ।  
কাজ বলে, না, এখুনি ঝড় উঠবে,  
ঠেকাতে হবে ।  
মন বলে, ঠেকাবে কি দিয়ে ?  
উঠুক না ঝড় ।  
কাজ বলে, কবিত্বের সময় এটা নয়,  
প্রতিরোধ করা চাই-ই ।  
ওদিকে তখন শুকতারার দেশের মেয়ে  
মিটি মিটি হাসে ।

## ঝড়ো সংকেত

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

সুন্দর গানখানি লিখে দিল  
বৈশাখী ঝড়ো সংকেত ।  
কেউ কাঁপে ভয়ে, ভেঙ্গে যাবে এবে  
চুরি করা বাঁশ দিয়ে বেড়া বাঁধা ক্ষেত ।  
এ গানের স্বর দিল যত কন্ডাল  
রক্ত মালকোষ গুরু চৌতাল ।  
ভয়ে জড়ো মালিকানা কিবা হবে হাল  
স্বর শুনে মনে হয় কাছে আসে কাল ;  
চৌতালে তাল ফেলে ঝড়ো সংকেত,  
সৌধীন কাঠামোয় বাঁধে বাসা যত ভূত প্রেত ।



## নবরাত্র উৎসব

শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী

সন ১৩২৮ সালের কথা। পূজা সমাগতা। শ্রীশ্রীশ্রু মহারাজজীউ শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সামিধ্য লাভান্তে আশ্রমবাসী হইয়াছি। অ্যামার আটদিনের মধ্যেই তাঁহার শারীরিক সেবার অধিকার পাইয়াছি। অ্যামার পূর্বে এত শীঘ্র তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার অধিকার পূর্ব্বতন সাধক-গণের মধ্যে কেহই পান নাই। ছোটবাবা শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—দেখ, ইহার আগে সদানন্দ, কালিকানন্দ, মোহানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, যোগানন্দ প্রভৃতি অনেকেই ছিল। উত্তমরূপে সাধকতাও করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে এক্ষণে কেহ কেহ দেহরক্ষা করিয়াছে, কেহবা তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়াছে—শ্রীশ্রীশ্রুদেব কাহাকেও শীঘ্র তাঁহার গৃহে প্রবেশের অধিকার বা স্বীয় সেবার ভার দেন নাই, সেদিক দিয়া তুমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবে। শ্রীশ্রীশ্রুদেবের মহাপুরুষগণের শারীরিক সেবার এক বৈশিষ্ট্য আছে, বাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বহু গ্রন্থ অভ্যাসে, বি. এ., এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কঠোর তপস্তা দ্বারা বাহা লাভ করা দুর্লভ একমাত্র গুরুসেবার দ্বারা ততোধিক ফল-লাভ হইয়া থাকে। আমরা আকণি, উদ্দালকের গুরুগৃহে বাস ও সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুসেবার কথা বাল্যকালে পুষ্টকে পড়িয়াছি; কোনও গ্রন্থাদি অভ্যাস না করিয়াই একমাত্র গুরুসেবাবলে বলীয়ান হইয়া বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞপণ্ডিত হইয়াছিলেন। আর একজন অল্প গুরুসেবা দ্বারাই দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষগণের শারীরিক সেবা দ্বারা তাঁহাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদে যে অমূল্য বস্তু লাভ করা যায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যুগেও অল্প নহে। এতাদৃশ ত্যাগী, যোগী, মহাপুরুষগণের সেবা করিয়াছেন, করিতেছেন তাঁহারাই তাহার নিদর্শন। ঠাকুর পরমহংসদেবের সাধক-শিষ্য স্বামীজির মাস্তদর্শনের বিষয় পাঠকমাজেই বিদিত আছেন। আমরাও আমাদের গুরুদেবের প্রথম ও প্রধান সাধক গুরুভ্রাতা শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীকেও দেখিয়াছি—দেখিয়াছি তাঁহার ইচ্ছামাজে ত্র্যমুহুর উপস্থিত হইতে। শুধু যে পুরুষেই মহাপুরুষগণের

সেবা দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন তাহা নহে এমন অনেক নারীও আছেন যাহারা এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে—বস্তুতঃ সেবা ত মাতৃজাতিরই অগ্রাধিকার—দেখিয়াছি প্রবর্ত্তক সজ্জ্ব সজ্জগুরু শারীরিক সেবাপ্রায়ণা মহীয়সী সাধিকা শ্রীমতী নির্মলা মাতাকে ও শ্রীমতী রেণুকা মাতাকে। এই দুইজন মাতা অল্প জপ, ধ্যান, তপস্তা না করিয়াই যে অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন তাহা আজিও লোকলোচনের গোচরীভূত।

শ্রীশ্রীশ্রু মহারাজের শারীরিক সেবা ব্যতীত দেওঘর, রামনিবাস আশ্রমের পত্র ব্যবহারের কার্যও আমার উপর হস্ত হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে, যথা : আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীশ্রু পূর্ণিমার সময়ে, এই দুর্গাপূজার মহোৎসব প্রভৃতিতে শ্রীযোগীন্দ্র সিংহ প্রমুখ কতিপয় ভক্ত-শিষ্য পত্রলিখন বিষয়ে সহায়তা করিতেন। পূজার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই কাশী, ভাগলপুর, পাটনা, মজঃকরপুর, সমস্তিপুর, কলিকাতা প্রভৃতি ছোট বড় সহরে ভক্ত শিষ্যদিগকে নবরাত্র উৎসবে যোগদানের জ্ঞপ্তি পত্র প্রেরিত হইল। উক্ত স্থানসমূহ হইতে ধনী, দরিদ্র শিষ্যবৃন্দ আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ তিথির পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীশ্রু মহারাজজীউর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ সপরিবারে পুত্রকন্যাদিসহ আসিলেন আবার অনেকে একাকী আসিলেন। আশ্রম বেশ সোরগোল হইয়া উঠিল। ১৬ই আশ্বিন রবিবার প্রতিপদোক্ত কল্পবিধানে পূজা আরম্ভ হইবে। শতাবুত্তি চণ্ডীপাঠ হইবে। দেওঘর সহর হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্রতী হইবার মানসে আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। সকলেই আপন আপন যোগ্যতার পরিচয় দিয়া কেহ আশ্রমপুর্ব্বোহিতের, কেহ পণ্ডিতজীর নিকটে, কেহবা ছোট বাবার নিকটে আবেদন নিবেদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বহুনাথ মিশ্রের উপরে ব্রাহ্মণদিগকে পরীক্ষা করিয়া নিয়োগের আদেশ হইল। দশজনের সপ্তশতী পাঠের, দুইজন জপের, একজন গণেশ পূজার ও একজন রত্নাভিষেকের জ্ঞপ্তি প্রয়োজন। উক্ত ব্রাহ্মণগণের

মধ্যে ঠাঁহারা ব্যাকরণাভিজ্ঞ অথচ গরীব একরূপ উপযুক্ত ১৪ জনকে নিয়োজিত করিয়া পণ্ডিতজ্ঞী অবশিষ্ট সকলকে বিদায় করিলে তাঁহারা হতাশ হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যা-  
বর্তনোত্তম হইলে, গুরুদেব তাহাদিগকে ডাকাইয়া বিমুখ না করিয়া পণ্ডিতজ্ঞীকে কোনও না কোনও কার্যে নিয়োগ করিতে আদেশ করিলেন।

১৫ই শনিবার প্রাতঃকাল হইতে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। কোঠারী (store-keeper) পূজার বাসন বাহির করিয়া ভূতাদিগকে পরিষ্কার করিতে দিল এবং তাহার অধিকারের অন্তান্ত দ্রব্যসম্ভার পূজামণ্ডপে পাঠাইতে লাগিল। লেখক পূজার বস্ত্র, বরণবস্ত্র এবং আশ্রমস্থিত ব্রহ্মচারী শিষ্য, ব্রাহ্মণ, পাচক, ভৃত্য, অভ্যাগত অতিথি, দরিদ্রদিগকে দেয় বস্ত্রসমূহ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকে নির্দেশ অনুযায়ী সজ্জিত করিতে লাগিল। পূজায় বিশেষ রন্ধনের জন্য অধিক সংখ্যক ডাণ্ডারী (পাচক) নিযুক্ত হইল। পুরোহিত দেবমন্দিরসংলগ্ন সুবিশাল মণ্ডপেব মধ্যে এক একটি চতুষ্কোণ বেদীব উপর স্থাপিত রেখাক্রিত মর্ম্মরপ্রস্তরে সর্কতোভদ্রমণ্ডল, নবগ্রহমণ্ডল, চতুষষ্টি যোগিনীমণ্ডল প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া দুর্গোৎসবের ফর্দ অনুযায়ী দ্রব্যসমূহ যথাযথস্থানে স্থাপন করিতে লাগিলেন। আশ্রমে ঘটে ধাতুনির্মিত পটে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কথা উঠিল, এবার মহারাজজীউর প্রতিনিধি কে হইবে? এই প্রতিনিধির অর্থ পূজক। বাঙালা দেশে দেবীপূজায় অন্যান্য দুইজন পূজারীর প্রয়োজন হয়, একজন পূজক ও একজন তন্ত্রধারক। আশ্রমে তন্ত্রধারকের কার্য পুরোহিত করিয়া থাকেন। আর পূজকের স্থান আমাদের যজ্ঞমান স্বয়ং গুরু মহারাজ। তিনি নিজেই পূজার প্রারম্ভে সংকল্প করিয়া তাঁহারই কোন মন্ত্রশিষ্যকে অথবা বেদমন্ত্র কোনও যোগ্য ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিয়া ব্রতী করেন। যদিও ছোটবাবার অভিমতে প্রতিনিধি বরণ করিলেন।

রবিবার প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই বরণীয় ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান, নিত্যক্রিয়া ও সঙ্ঘ্যাবল্লনাদি সমাপনান্তে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূজার সমস্ত আয়োজন সমাধা করিয়া কেশবজী গুরুদেবকে ডাকিয়া আনিয়া, আচমন, আসনশুদ্ধি, স্তম্ভিবাচন, গন্ধদ্যুর্চনা, নারায়ণাদির

অর্চনা প্রভৃতি করাইয়া সংকল্প করাইলেন। ব্রাহ্মণগণ সমস্তরে সংকল্পসূক্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর মহারাজজী আমাকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়া মণ্ডপ প্রবেশের জন্য নমুখস্থিত মহাদেব মন্দিরের চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ আসন ত্যাগ করিবার পর, আমি অন্তান্ত ব্রাহ্মণগণকে কুশাসন, গন্ধাস্ত পুষ্প, বস্ত্রঘৃণ্মাজুযীক, পুগীফল, তাম্বুল ও বরণদক্ষিণা সমেত বরণকল্লোক্ত দ্রব্য দ্বারা যথারীতি বরণ করিলাম। অতঃপর বৈদিক মন্ত্রসহকারে শংখ ঘণ্টা কাংস্তধ্বনি নিনাদিত করিয়া জলধারা দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকে পূর্বোভাগে রাখিয়া মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করতঃ দ্বারদেবতা-দিগের পূজা পুরঃসব মণ্ডপ প্রবেশের পব প্রতিপদাদি কল্লোক্তবিধানে পূজা আরম্ভ হইয়া গেল। মণ্ডপের সে এক অপরূপ শোভা। ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, গণপতি পূজক গণেশের পূজা আরম্ভ করিলেন, জাপকন্ডয় একধারে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপে মনোনিবেশ করিলেন, এদিকে শিবপূজক কপালে ত্রিপুরা অঙ্কিত করিয়া কণ্ঠে কুজাঙ্কের মালা ধারণপূর্বক অভিশিষ্টপাত্র দ্বারা ব্রত্যাভিষেক মন্ত্রে নার্মদ লিঙ্গোপরি অভিষেকে প্রবৃত্ত হইলেন। আর পুরোহিত আমার দ্বারা প্রধান ঘট (দেবীঘট) স্থাপন করাইয়া সর্কতোভদ্রমণ্ডলের পূজা আরম্ভ করিলেন। এতাদৃশ পূজার বিধান বঙ্গদেশে কুত্রাপি প্রচলিত আছে কি না বলিতে পারি না, তবে দেশভেদে সর্বত্রই কিছু না কিছু পূজা অর্চনার পার্থক্য আছে। আশ্রমের পূজা দেবিবার জন্তও চণ্ডীপাঠ শ্রবণোদ্দেশ্যে প্রায় সমস্ত শিষ্যই পূজার সময় উপস্থিত হন কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন বর্ণকেই এই নয়দিন পূর্ণাহতি না হওয়া পর্যন্ত, মণ্ডপাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, অধিক কি ভক্তিমতী ব্রাহ্মণকল্যাণও প্রবেশাধিকার লাভ করেন না। সূচীবিদ্ধ বা ছিন্নবস্ত্রেও অথবা চর্ম্মদংযুক্ত ঘটিকাযুক্ত বা অর্ধকোষ লইয়া ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। মোটের উপর, মণ্ডপাভ্যন্তরের পবিত্রতা রক্ষার জন্ত এবং সাহাতে কোনও প্রকার বিঘ্ন না হয় তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখা হয়। ব্রতী ব্রাহ্মণগণও বাহিরে আসিলে, তাহাদিগকে দ্বারের বাহঃরক্ষিত জলে পদধৌত

করিয়া পুনরায় প্রবেশ করিতে হয়। সমস্ত ভক্ত শিষ্য ও সমাগত সঙ্কনগণ বিশাল বিশাল গবাক্ষমুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূজা অর্চনা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীউর শিষ্যসঙলীর মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানসুপ্রাণী, অধিকাংশ সংস্কৃতজ্ঞ, চণ্ডী-পাঠী, গীতাভ্যাসী ও নিষ্ঠাবান।

প্রতিপদ হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উক্ত রীতিক্রমে পূজা হয়, পরে ভোগরাগাদিব পর ধূনাঙগুণ্ডলের ধূয়ায় মণ্ডপাভ্যন্তর ধূমায়িত হইয়া আরজির স্বাক্ষরে আশ্রম বাহ্যিক হইতে থাকে। অতঃপর সমস্ত পুষ্পাঞ্জলীর মন্ডের সহিত শ্রীমুক্ত পাঠ হয় তাৎকালিক অপূর্ণ ভাবের উপলক্ষি করেন তাঁহারাই ষাঁহার উপস্থিত থাকেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূজার সময় বিশেষ রক্ষনের কার্যে অধিক সংখ্যক পাচক নিযুক্ত করা হয়, বলা বাহুল্য, সঙ্ক্যাগায়ত্রীর ব্রাহ্মণকে কোন কার্যেই অধিকার দেওয়া হয় না। ব্রাহ্মণগণ কূপ হইতে জল আনিবে, ব্রাহ্মণে মশলা পেষণ করিবে, ব্রাহ্মণে রক্ষন করিবে, ব্রাহ্মণগণই পরিবেশন করিবে। প্রত্যেক বড় উৎসবেই ভোজনপরিপাটী বিশেষতঃ এ সময়ে নয়দিন অতি উত্তমরূপেই চলিয়া থাকে। অষ্টমী পর্য্যন্ত নিত্য এক বেলায় দুই তিনশতেরও উর্দ্ধসংখ্যক লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে; নবমীর দিন পূর্ণাহুতির পর দেবঘরবাসী ও পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামবাসী ধনী, দরিদ্র, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, আদালত, রেল স্টেশন, ডাকঘর ও পুলিশ বিভাগের লোকসমূহ, উইলিয়মস্ টাউনস্থিত রামকৃষ্ণ বিজ্ঞাপীঠের সন্ন্যাসী ও ছাত্রবৃন্দ, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, অনাহুত রবাহুত সকলকেই পরিতৃপ্তরূপে জগদম্বার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রয়োজনানুযায়ী দুই তিনখানি গো-শকট লুচি, তরকারী, দধি ও মিষ্টান্ন দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া কুষ্ঠাশ্রমবাসিগণকে ভোজন করান হয়, অধিকতর তাহাদিগকে বস্ত্র ও পয়সাও দেওয়া হয়; এই দান শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাধীন, দুই আনা চারি আনা হইতে কখনও কখনও বোল আনা পর্য্যন্ত প্রত্যেককে দেওয়া হইয়া থাকে। কুষ্ঠাশ্রমবাসিগণ সম্বৎসরের মধ্যে এই প্রকার দুই তিনবার অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—তৎকালে তাহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। ভোজনের

পূর্বে সকলে সমবেত হইয়া মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া কীর্তন করিতে করিতে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়, মনে হয়, তাহারা আহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কারণ এমন কীর্তন আরম্ভ করে যে, দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত কীর্তনরত পরিত্যাগ করে না—তাহাদের কীর্তন শ্রবণে পাষণ্ড হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়—ইহা আমার বিশেষ উক্তি নহে; সত্য সত্যই কীর্তনে তাহাদের ভাবোদয় হয়—তাহাদের মধ্যে স্মরণ এবং স্মরণকণ্ড আছে।

পূজা করিতে করিতে একবার কুষ্ঠাশ্রম সুরিয়া আসিলাম, এখনও অনেক বাকী আছে। নিত্য প্রসাদ গ্রহণের পর ক্ষণিক বিশ্রামস্থলভ করিয়া প্রায়ই সংসদ হয়—ইহা যে কেবল দুর্গাপূজাকালে হইয়া থাকে তাহা নহে, আশ্রমের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ইহা অন্ততম। তবে বিশেষ বিশেষ উৎসব অমুষ্ঠানে তত্তৎ বিষয়ই আলোচনার স্থান লাভ করতঃ, এ সময়ের সংসদে আলোচ্য বিষয় বিশেষতঃ পূজা সম্বন্ধীয়, তন্মধ্যে তন্ত্র ও বেদান্তাদি বিচার আসিয়া পড়িলে তাহাও উপেক্ষিত হয় না। তৃতীয়ার দিন ভাগলপুরনিবাসী গিরীশবাবু বিশ্রামের পর আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা! এই শক্তিপূজার তাৎপর্য্য কি? ষাঁহার শাস্ত্র তাঁহঁরাই এই পূজা করেন, না বৈষ্ণবেরাও করিয়া থাকেন? বলিলাম, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি তথাপি আমাকে যখন প্রশ্ন করিলেন তখন বলিব এই সামান্য কাল শ্রীশ্রীগুরুমন্দিরানে থাকিয়া যে অত্যন্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে ও যাহা শুনিয়াছি তাহাই আপনার কাছে ব্যক্ত করিতেছি। শক্তি পূজা বলিতে এই বৃদ্ধি আত্মার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে তাহারই পূজা; তিনিই আমার অন্তরের সদ্ব্রতিনিচয়কে বিকশিত করা। তদন্তরে বলিতে পারেন, তবে এই দুর্গাপূজা করি কেন? উত্তরে বলিব—দুর্গাদেবীর মধ্যে সমস্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আমরাও শক্তিমান হইব—আমাদের অন্তরের শক্তিকে জাগ্রতা করিব। যিনি এইভাবে শক্তিপূজা করেন তিনিই শাক্ত। শক্তি বলিলেই অপর একটা জিনিষের অপেক্ষা হয়—কাহার শক্তি? যেমন প্রকৃতি বলিলে পুরুষের প্রশ্ন অতঃই সমুদিত হয় তেমনি শক্তি বলিলে কোন্ দেবতার শক্তি এই প্রশ্ন

জাগে। তখন প্রধানতঃ বিষ্ণু বা শিব এই দুই দেবকে লক্ষিত হয়, আর দুর্গাপূজায় বিশেষতঃ মহাকালী, মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী প্রধানা শক্তিদেবীর পূজা হইয়া থাকে; আরও দুর্গা সপ্তশতীতে কাত্যায়ণীস্বতী নামে এক প্রধান স্তব রহিয়াছে। শ্রীমতী রাধিকাও কৃষ্ণপ্রাপ্তির পূর্বে কাত্যায়ণীদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈষ্ণব-দিগকেও শাক্ত বলিলে অত্যাক্তি হয় না, তাঁহারও শক্তিব পূজা করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের একই শক্তি চারিভাগে বিভক্ত, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বৈষ্ণবী, কোপে হন কালী আর আহবে তাঁহাকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হয়। শুধু বৈষ্ণব কেন জগতে বর্তমান সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উপাস্ত শক্তি—সকলেই শাক্ত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন সকলকেই আমি শাক্ত বলি। আবার বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারও আদি কারণ শক্তি। অনাদি অনন্ত শক্তি এক তাঁহার দ্বিতীয় নাই—এক হইয়াও নানারূপে অভিব্যক্ত। দেবী-মাহাত্ম্যেই ভগবতী বাক্য—“একৈহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মম-পর্য” এই শক্তিই আবার সৃষ্টিস্থিতিসংহতিরূপা। দেখুন, বলিতে বলিতে অনেক কথা মনে পড়ে, সময়ও থাকা চাই, এদিকে সন্ধ্যা সমাগতা। এখনই সন্ধ্যারতির জন্ত প্রস্তুত হইতে, আর একটি মনের কথা শুনিয়া জানানার্থে যাইব। এই শক্তিপূজা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে ও রূপে অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেমন বাংলাদেশে আমরা দুর্গাপ্রতিমা গড়িয়া পূজা করিয়া থাকি, কাশ্মীরে অম্বা নামে, গুজ্বরে হিন্দনা বা রুদ্রাণী নামে, পশ্চিম ভারতে ও নেপালে নবরাত্র বা নবপত্রিকা, কান্তকূজে কল্যাণী, দাক্ষিণাত্যে অম্বিকা বা অম্বা, মিথিলায় উমা নামে পূজিতা আবার উদয়পুরে কেবলমাত্র অস্ত্রেরই পূজা হইয়া থাকে।

অন্তঃপর জানানান্তে সন্ধ্যা আরত্নিকের পর স্তব স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শীতলের প্রসাদ সামান্য কিছু ফলমূল ও দ্রষ্ট গ্রহণ করিয়া শয়ন ও পুনরায় চারিটা বাজিতে না বাজিতে পর দিনের পূজার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। এই নিয়মে আরও দুই দিন ব্যতীত হইল, বষ্টী আসিল। ষটে ও পটে পূজা হইলেও বষ্টীর সন্ধ্যায় বিশ্বব্রহ্মের বোধন ও দেবীর

আমন্ত্রণ এবং অধিবাস হইয়া থাকে। পরদিবস মহাসপ্তমীর লগ্নারম্ভে নব পত্রিকা স্নান, পত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন হইল। অষ্টমী ও নবমীতে উৎসবের বৈশিষ্ট্য আছে। অষ্টমীর দিনই অষ্টমীবিহিত পূজার পর মণ্ডপের মধ্যস্থিত সম-চতুষ্কোণ কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন হইল। পূর্বোক্ত ১৪ জন বৃত্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে চারিজন ব্যতীত দশজন ব্রাহ্মণ কুণ্ডের চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইয়া পুরোহিত কেশব পাণ্ডের সঙ্গ সপ্তশতী চণ্ডীর এক একটি মন্ত্র স্বাহান্ত উচ্চারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ঘর তিলাক্ষত ঘৃত শর্করা মিশ্রিত শাকল্যের আহতি প্রদান করিতে লাগিলেন আর যজমান প্রতিনিধি কুণ্ডটীক পশ্চিমে মধ্যস্থলে পূর্বাভিমুখে স্কন্ধ দ্বারা স্তবাহতি প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই অষ্টমী ও নবমীর দিন সহরবাসী ও চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামবাসী ও আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় কেহই আশ্রমে উপস্থিত হইতে বাকী থাকে না। কারণ যজ্ঞীয় ধূম্রা শরীরে লাগাইলে নীরোগ শরীরে সপ্তমসর স্থখে কালযাপন করিবে ইহাই প্রত্যেকের ধারণা—হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস। নবমীর দিন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ্ঞী স্বয়ং মণ্ডপে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া স্তবীর্ষ জুহু স্কন্ধ ধারণ করিয়া পূর্ণাহতি প্রদান করেন। আমরা সকলে তাঁহার স্কন্ধ ও হস্ত স্পর্শ করিয়া যজ্ঞীয় ফল প্রাপ্তির কামনা করি। এই তিন হস্ত পরিমিত দীর্ঘ জুহু স্কন্ধটীর অগ্রভাগ উপর হইতে লম্বমান এক লৌহ শৃঙ্খলো-পরি নিবদ্ধ থাকে; ইহার মূলদেশ শ্রীশ্রীগুরুদেব ধারণ করিয়া থাকেন। মূলদেশে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে ঘৃত মধ্যস্থিত নালির আকার পথে ধাবিত হইয়া অগ্রভাগ দ্বারা ধারাবাহিকভাবে কুণ্ডের মধ্যস্থলে প্রজ্জ্বলিত জ্বালামুখে নিপতিত হইয়া আদিত্যের নিকট পহুছাইয়া দেয়—স্বর্ঘ্য মেঘ সৃষ্টি করতঃ বৃষ্টি দেন ও সেই জল অন্নের উৎপাদক, এই অন্নই আমাদের শরীরে বলাধানপূর্বক সাধনার উপযোগী করিয়া দেয়।

“অগ্নৌ প্রস্তোহতির্ম্যভাদিত্যম্পতিষ্ঠতে।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিস্ততোহন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥”

প্রজার জন্মই, সাধারণের জন্মই নিষ্কাম যোগী, ঋষি, মুনিগণের ফল কামনা। গুরু মহারাজ স্কন্ধ ধরিলেন, তন্মধ্যে ঘৃত ঢালিয়া দিলাম, ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে “মূর্দ্ধা-

নন্দিব...ইত্যাদি বেদোক্ত পূর্ণাহতির মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—সে কি গম্ভীর হৃদয়স্পর্শী ভাব!

আহতির সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরীর এক অপূর্ণ জ্যোতির্ময় মূর্তি ধারণ করিল—মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ, অথচ সৌম্য প্রশান্ত, ধর্মবিন্দু তাঁহার নিবদ্ধ অটোজাল ভেদ করিয়া গণ্ডস্থল দ্বারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—পিছন হইতে তাঁহার শ্রম লাঘবের জন্ত ব্যঞ্জন সঞ্চালন করায়, ইন্দ্রিতে তাহা বদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন—তৎকালে মনে হইল বেন সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞে পূর্ণাহতি দিতেছেন। অবশ্য পূর্ণাহতিই যজ্ঞের পরি-সমাপ্তি নহে—যজ্ঞ পূর্ণও নিজেই দণ্ডায়মান থাকিয়া করাইয়া থাকেন। তৎকালে আশ্রমে সমুপস্থিত সমুদায় নরনারী, বালকবৃদ্ধকে পরিতৃপ্তরূপে প্রসাদ ভোজন করাইয়া থাকেন, এবং স্বহস্তে মিষ্টান্ন পরিবেশনপূর্বক ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ বাক্যটির সার্থকতা সম্পাদন করেন। পূর্ণাহতির পর প্রত্যেককে যজ্ঞীয় বিভূতির তিলক স্বয়ং প্রদানপূর্বক সকলের শুভকামনা, সকলের দীর্ঘাযুঃ ও নীরোগ কামনা করিলেন। অতঃপর দুই তিন সহস্র মূর্তির ভোজন সমাপ্ত হইতে প্রায় রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাছা! আর কেহ ভোজনের বাকী আছে? আমরা একে একে সকলে যখন বলিলাম, না মহারাজ! আর কেহই বাকী নাই, তখন তিনি স্বান সন্ধ্যা সমাপনপূর্বক দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এদিকে আমরাও আশ্রমদেবীর আরত্নিক স্তব স্তোত্র সারিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইলাম।

দশমীর প্রত্যুষে দশমী বিহিত পূজা সমাধা হইলে ব্রাহ্মগণ নববস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দক্ষিণা প্রাপ্তির জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন ইত্যবসরে শ্রীশ্রীগুরুদেব ললাট-ত্রিপুণ্ড্র বিভূষিত করিয়া, রুদ্রাক্ষের গৌরীশঙ্কর কঙ্কি ধারণপূর্বক জটা মূল করতঃ মণ্ডপে প্রবেশপূর্বক একখানি জলচৌকির উপর বিস্তৃত মথমলের আসনে উপবেশন করিলেন ব্রাহ্মগণ শান্তিমন্ত্রে শাস্ত্যদক সিদ্ধন করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মগণকে তাঁহার ইচ্ছামত প্রভূত দক্ষিণা করিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট, সকলের মুখে হাসি, সকলেই পরিতৃপ্ত, সকলেই তাহার চরণ ধূলি লইয়া অমোঘ আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠিল। ব্রাহ্মগণকে দক্ষিণা ত দিলেনই অধিকন্তু আশ্রমস্থ স্থায়ী ও অস্থায়ী নবনিযুক্ত পাচকগণকে, কর্মচারীগণকে, বিদ্যার্থীবৃন্দকে, ভৃত্যদিগকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত অর্থেরও অধিক অর্থপ্রদান পূর্বক পরিতোষ বিধান করিলেন। মণ্ডপের বহির্দেশে বিজয়ার নিরঞ্জনর জন্ত বাদ্যকারগণ ও বহু দরিদ্র ঘাঁটোয়ালী আবালবৃদ্ধবনিতা অপেক্ষা করিতেছিল—অবসর বুঝিয়া মহারাজস্বী প্রত্যেককে বস্ত্র বিতরণ করিলেন এবং একখানি পিতলের পরাতে রক্ষিত পয়সা, আনি, দুয়ানি, চৌ আনির (সিকি) লুট দিলেন—আমিও আমার হাত ধন্ত করিতে ছাড়িলাম না, কিছু কিছু আমিও ছুঁড়িলাম—সেও এক অপূর্ণ দৃশ্য! যাহার ভাগ্যে ঘেরাপ ছিল সে তত কুড়াইল। সকলেই ধুসী, সকলের মুখে হাসি, সকলে বিজয়া দশমীর বিজয়ানন্দে মাতোয়ারা।

## একবারই তুলভ জনম

(“Shall not pass this way again” কবিতার ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীশ্রুতমো মৈত্র

ভালোবাসো ভালোবাসো এই পৃথিবীতে  
ভালোবাসো সমুদয় তার বাসিন্দারে।  
বিলাপ দক্ষিণ্য—প্রেম দয়া জনে জনে  
অবিলম্বে যতটুকু তব সাধ্য সনে।

তুলভ মানবজন্ম এই পৃথিবীতে  
একবারই শুধু আসে এ মহা মহীতে।  
বিন্দুমাত্র অবহেলা খেন করিও না,  
ভবিষ্যে করিবে বলি কিছু রাখিও না।

নাহি জেনো পুনর্জন্ম পৃথিবীতে আর  
একটাবারের তরে, শুধু একবার।

# শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সুগ সুগ ধরে তোমারে ডেকেছে কত স্বরে কত স্বরে—  
কত ডঙ্কর বাজিয়াছে অন্ধরে ।  
কমল ফুটেছে শত শত শরতে—  
পরশ লভিতে তব রাঙা চরণের ।  
তোমার বোধন-অমৃত বার্তা-পাঠায়েছ ঘরে ঘরে ।

২

এই মহাপূজা সারা বাঙলার শুচি করিয়াছে মন ।  
দ্রিষ্টাছে আঁখিতে ভকতির অঞ্জন ।  
মুক্ত প্রসাদী অন্নসজ্জ দ্বার—  
দীনদুখীজনে করিয়াছে আপনার  
ধূল্য নামিয়া দেবতা দিয়াছে মানবে আলিঙ্গন !

৩

উন্নততর পবিত্রতর সমাজ করেছ দান  
অমানীগণেরে যাচিয়া দিয়াছ মান ।  
গুণী জ্ঞানীগণে তুমি দিলে সমাদর  
দেবের দেউল করিলে প্রতিটি ঘর !  
দেশকে করিলে যজ্ঞস্থলী চিরদিন অন্নান ।

৪

অক্ষরন্ত যে তোমার এ পূজা—চির হোমায়ি জলে  
মধুময় করে পার্থিব রজ—আনন্দে আঁখি গলে ।  
তোমার আদিম অমৃতের ধারা  
হয়নি কখনো হবেনাক' হারা  
বাঙালী রহিবে অজেষ হইয়া তোমারি পূণ্য ফলে ।

## অনির্বচনীয়তা

( সংস্কৃত অচলপ্রতি ছন্দানুসারে )

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

এ-জীবনে এত জালা তাহা কে বুঝিত আগে !  
জলিয়া মরিতে হবে গাঢ় প্রেমে অম্বরাগে ।  
মনে মনে সদা যুঝি' ফুরায়ে আসিল দিবা ।  
শরীরে শক্তি নাহি, নয়নে নাহি সে বিভা !

২

কত আশা করেছিহু, মেতেছিহু তব মনে ।  
পুত্রিল না কোনো আশা, জলে' মরি প্রাণেমনে ।...  
বেদনা যাতনা জালা বুঝিতে চাহেনি কেহ ।  
বিজনে ঝরিছে আঁখি, শিহরি' উঠিছে দেহ ।

৩

তুমি কি বুঝিবে, বঁধু, কি তুমি বুঝিতে পার ?  
নাহি সে-ধারণা তব অমুভূতি অতি গাঢ় ।  
ভাসিয়া চলেছ, নারী, উপরে সফরী সম ।  
ডুবিয়া দ্যাখোনি কভু স্বপ্নে কি ব্যথা মর্ম ।

৪

আঁখি-বারি দিয়া আমি ডুবায়ে দিয়েছি ধরা,  
পুড়েছে বিরহানলে সকলি স্মৃতিভরা ।  
এতটুকু বুকে মম কত বড় আছে ব্যথা !  
অতি ছোট জীবনেতে ছিল এত অসীমতা ?

৫

মেপেছে বারিধি-হিয়া ডুবুরী অতলে নামি'  
গণেছে তারকাগুলি বসে' বসে' দিবাযামি ।  
উঠিয়াছে হিমাচলে মাপিতে দূরতা তারো,  
বেদনা যাতনা কেহ মাপিতে পারেনি কারো ।

৬

এত ছোট লেখনীতে মাপিয়া যেতেছি তাহা,  
আভাসে বলিহু সব সারা বুকে আছে ব্যথা ।  
তার-তার আকাশেতে লিখিয়া চলেছি লেখা,  
অ-মাপা অ-জানা র'বে শুধু মায়-মরীচিকা !

## নববেশে আয় বঙ্গে

শ্রীউমাপদ নাথ এম. এ।

মায়ের পূজার নব-উপচার, রচেছি নতুন মন্ত্র ;  
 বিষ্কার-বাকে এবারের স্তব—মরমের ষড়যন্ত্র ।  
 এ জাতি নাকি মা শক্তির ছেলে, তবু হেলেছুলে বঙ্গে  
 লিখেছে কবিতা, সেজেছে ভঙ্গ মেয়েলি কেতায় রঙ্গে ।  
 দৃঢ়ভূজ তুলে বজ্রকণ্ঠে যে-ভাবে ডাকলে, জননী,  
 সাড়া দিস তুই, সে মন্ত্রপাঠ ভুলেছি—তাই এ রজনী ।  
 এতদিন তবু কোন্ লজ্জায় পূজা-বিলাসীর অর্ঘ্যে  
 করেছিল লোভ ? সত্যি কি তবে হাভাত ডেকেছে স্বর্গে ?  
 যেই শক্তিতে অস্তুরে বধিস—জিতুবন কাঁপে জ্বন্তে,  
 সে-শক্তি কোথা ? আসিস কি শুধু বেড়াতে শূন্ত হস্তে ?  
 দশ হাতে শুনি দশ-প্রহরণ—অসি, শূল, গদা, চক্র ;  
 এমনি ভাগ্য, সেই তোর ছেলে নতশির—পিঠ বক্র !  
 মাটি-খড়ে আর রঙে-রাঙতায় বেঁধে তোরে শুধু লাঞ্ছিত,  
 এখন তো তুই কলেজ-ছাত্রী, কে মরিবে তোরে বাহি ?  
 অস্তুর-দলন ছেলে কার্তিক সিনেমায় পাট করতে  
 মায়ের গহনা-সহ বোম্বাই চলেছে, কে পারে ধরতে ?

মাইকে এবং হৈ-হুল্লোড়ে পূজার তামাসা মর্ত্যে ।  
 সঙ্গে ঘাস তুই অন্নান মুখে একেবারে বিনা সর্ভে !  
 আমরা তো শুনি দুর্গা পূজায় যত দুর্গতি নষ্ট,  
 তবে কেন হয় কি-বছরে পূজে বরাতে এ-হেন কষ্ট ?  
 রাঘবের মতো নিষ্ঠা না হলে রাবণ কি মরে এমনি ?  
 পূজার মন্ত্রে জাতির তন্ত্রে রণ জাগা চাই তেমনি ।  
 ঢাকের কাঠিতে বাজে যে বাস্তু ধমনীতে তার নৃত্য  
 না-ই যদি জাগে হবে কতটুকু এ দেহমনের কৃত্য ?  
 জাতির জীবনে সংগ্রাম চাই, নইলে কি ঘোচে দৈন্ত ?  
 দক্ষ সূদৃঢ় সেনাপতি চাই, চাই যুধাজিৎ সৈন্ত ।  
 চাই একতার স্বর্ণশূভ্র, দেশোৎসৃষ্ট কর্ম,  
 নতুবা সরমে মরিব নিজেই—ঘুচিবে না মেঘধর্ম ।  
 তাই তো এবারে করি আহ্বান : নববেশে আয় বঙ্গে !  
 মাধায় মাধায় মৃদুগর মার, মোহ ভাঙ তার সঙ্গে ।  
 শোণিতাক্ত এ ছিন্নহৃদয় দিলাম ধালায় অর্ঘ্য :  
 সাথে নিয়ে আয় জীবন-জাগানো নটরাজবেশী ভর্গ ।

## আর জালিব না আলো

ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অনিচ্ছুক আলো হতে থাক স্বতস্ফূর্ত অন্ধকার,  
 হাত দিয়ে ঢেকে ঢেকে, আর কত জালিব আমার  
 বাবে বাবে নির্বাপিত বাতি ? তার চেয়ে মনে হয়,  
 আলো নিবে গেলে পরে, তথাপি যে

আলিসিয়া রয়,

সর্বজ্ঞ আবরি মোর—তারে করি শীতবস্ত্রসম

অভিন্ন হৃদয় বন্ধু—অন্ধকারে মানি' প্রিয়তম

সুনিবিড় আলিঙ্গনে ।

আলো আর নহে যেন আলো

সে যেন আলোয়া শুধু চলে যায় রেখে যায় কালো,  
 কালো হ'তে আরো কালো, সূচীভেদ্য ঘনিষ্ঠ আঁধার  
 তাই ভালোবাসি কালো; আলো হতে ঋণ সে আমার  
 অহুরক্ত অহুরত অহুগত সাধী রাত্রিদিন  
 আর জালিব না আলো ক্রমে দৃষ্টি হয়ে আসে কণ  
 হীনবল চক্ষে মোর । আসে ওই শাস্ত্রত আঁধার  
 নিশ্চিন্ত নিকষ কালো, হৃৎপ্রস্রাত, হে বন্ধু আমার !

## হরিচরণের গম্পা

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

চিঠিখানা হরিচরণ তিন চারবার পড়লো। না, অবিশ্বাসের কিছু নেই। ইন্টারভিউয়ের চিঠি এসেছে।



চিঠিখানা হরিচরণ তিন চারবার পড়লো

হরিচরণ একবার ভগবানের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানালো। নূতন আশায় তার বুক ভরে গেল। যদি মা কালীর কৃপায় একবার লেগে যায়, তবে জীবনে চলার মত একটা যেন আলোর পথ পাবে। বেকার জীবনে যেন চলার পথ নেই। যেদিকে যাওয়া যায় সবই যেন অন্ধকার। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই যেন কেমন একটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। সেবার তো তার মাসিমায়ের বড় জা'র নন্দ এলেন বেড়াতে তাঁর মেয়ে রিণাকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য একটা ছিল বৈকি। কিন্তু সেই এক কথা, ছেলে বেকার। ছি, ছি জীবনে দিক্কার এসে গেছে হরিচরণের।

কাজেই এই আশার বাণী নিয়ে যে পত্র এসেছে তাকে কেন্দ্র করে হরিচরণের মনে যেন কত রঙিন স্বপ্ন জেগে

উঠলো। চাকরীটা লেগে গেলেই তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে কত আর দেয়ী!

হরিচরণ চিঠিখানা নিয়ে বাড়ীর ভিতর গেল। মা হারা ছেলে। পিসিমার কাছে মাছুষ। সংসারে ঐ পিসিমা ছাড়া কাকেও জানে না হরিচরণ। পিসিমা ভব-হুন্দরী সেই বাল্যবিধবা অবস্থায় দাদার সংসারে এসে-ছিলেন, আজকের কথা নয়। আর সেই থেকেই থেকে গেছেন এ সংসারে। তারপর একে একে হরিচরণ তার পিতামাতাকে হারিয়েছে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। হরিচরণ তখন হবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, নাবালক।

পিসিমাকে শুভ খবরটা দিতেই তিনিও আনন্দ প্রকাশ করলেন। যুক্তকরে কৃষ্ণের ছবির দিকে চেয়ে শ্রীহরিচরণে হরিচরণের মঙ্গল কামনা করলেন।

চাকরীটা মন্দ নয়। অফিসের কাজ। হিসাবপত্র রাখা। একটু হুঁস করে কাজ করলে উন্নতিও আছে। আরজেন্দ্ৰই প্রায় দেড়শো টাকার ওপর মাইনে। তারপর



পিসিমা যুক্তকরে হরিচরণের মঙ্গল কামনা করলেন

বাড়িতে বাড়িতে তিনশো, চারশোর কাছাকাছি। হরিচরণ লেখাপড়াতেও ভাল। বি. এ. পাস সে ভালভাবেই



করেছে। কিন্তু একটু বে-হিসেবী। সংসারের বাস্তব রূপ সে যেন জানতে চায় না। কাব্য-সাহিত্য চর্চার বোঁক তাকে কেমন যেন আনমনা করে রাখে। কিন্তু না, কাব্য-সাহিত্য তাকে পেট ভরাতে পারবে না। হরিচরণ মাঝে মাঝে কেমন যেন ঘা খেয়ে একথা চিন্তা করে। বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি তাকে লড়তে হবে। ঘোর সংসারী তাকে হ'তেই হবে। কুপার পাত্র হয়ে থাকি আর যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে তার পক্ষে।

পিসিমা স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা কবে যেতে হবে বাবা?”

হরিচরণ চিঠি দেখে তারিখের কথা বললে। পিসিমা বললেন, “তবে তো দেবী নেই আর। পরশু তোমাকে বেরুতে হবে। আমি চিঠি দেব। একদিন রত্নাদের বাড়ী থেকে কাজ সারতে পারবি।

রত্না সেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেই রত্না আজ ধনী গৃহিণী। কলকাতায় বাড়ী, গাড়ীও নাকি আছে। স্বামী ভবভারগ সেন মন্তবড় অফিসের কর্তা। ঝি-চাকর, বাগান-বাগিচায় রত্না সেন এখন সুখের সংসারে স্থায়ী। কাজেই কলকাতাতেই যদি যেতে হয় তবে ওদের ওখানে একদিন থাকতে কোন অসুবিধাই হবে না। তা ছাড়া ধনী হলেও রত্না সেনের ব্যবহার খুবই ভাল। আজও চিঠিপত্রে সেই শৈশবকালের বন্ধুত্ব বজায় আছে। এতটুকু অহঙ্কার কি ভিন্ন ভাব নেই। বিশেষ করে হরিচরণের ধোঁজখবরও সে মাঝে মাঝে নেয়। বি. এ. পাশ করার পব রত্না সেন আশীর্বাদ করে চিঠিও লিখেছিলেন। স্ততরাং এমন দরদী আত্মীয়ের মত মানুষের বাড়ী একদিন থাকতে হরিচরণের কোন অসুবিধা হবে না, এ কথা হরিচরণকে পিসিমা ভাল ভাবে বুঝিয়ে বললেন।

হরিচরণ এ প্রস্তাবে বেশ যেন ভাল মনে রাজী হতে চাইলো না। হাজার হোলেও বড়লোক, নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত কাজে কেন আর পরের অসুবিধা করা—এমনি ভাব হরিচরণের কথায় প্রকাশ পেল।

পিসিমা ভবভন্দরী কিন্তু এতে সায় দিলেন না। বিস্ময়ের ভাব এনে বললেন, “বলিস কি হরি? বড়লোক!”

রত্নাকে তুই দেখিসনি, তার ব্যবহারও জানিস না, তাই ও কথা বলছিস। রত্না আর তার স্বামী যেন মাটির মানুষ। কিছু তোর অসুবিধা হবে না, বরং দেখবি কত সুবিধে ওরা করে দেবে। এমন কি যে আপিসে চাকরী হবে জানতে পারলে আপিসের কতকগুলো বলেও দিতে পারে। তা ছাড়া কোলকাতা জায়গা, একটু জানাশোনা মানুষের কাছে যাওয়াই ভাল। তোব তো তেমন পথঘাটও জানা নেই।

কথাটা মিছে নয়। মফঃস্বলের কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে হরিচরণ। কলকাতা গিয়েছিল মাত্র দু'বার। কাজেই পথঘাট তেমন ভাল জানাশোনা নয়। কিন্তু হরিচরণ মনে একথা ভাবে না যে, সে পথঘাট চেনে না বলে তার কিছু অসুবিধা হবে। বি. এ. পাশটা তবে তো বুধায় করা। যাই হোক হরিচরণ বেশি কথা না বাড়িয়ে পিসিমার কথায় ভাল ছেলের মত সায় দিল, অর্থাৎ রত্না সেনের বাড়ী থেকে সব ব্যবস্থাই সে করবে।

নির্দিষ্ট দিনে হরিচরণ কলকাতা এল এবং পূর্ব ব্যবস্থা মত রত্না সেনের বাড়ীতেই সে উঠলো। ইন্টারভিউ পরের দিন। স্ততরাং ধীরেস্থির সকল পথঘাট জেনে নিতে পারবে, কিন্তু হরিচরণের মুন্সিল হলো এই জেনে নেওয়ার ব্যাপারে। ছি, ছি, বি-এ. পাশ করে এদের কাছে জানতে হবে পথঘাট। কেমন যেন একটা লজ্জা-সঙ্কোচ এলো হরিচরণের মনে। এ বাড়ীর চাকর বি পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে যেন কত জানা-শোনার মানুষ। আর সে ওদের কাছে জানাবে তার না-জানার কথা।

হরিচরণ কোন কথাই কাউকে বললো না। এমন কি চাকরীর জন্ত যে সে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে এ কথাও না। ভাবলে চাকরী না হলে তো লজ্জার কথা! অল্প দরকারে কলকাতা আসা এই কথা সে জানালে।

রত্না সেনের আর বাড়ীর বি চাকরের কাছে তার যত্নের ক্রটি নেই। বাল্যবন্ধুর ভাইপো হরিচরণ। দেশে গিয়ে রত্না সেনের সুখ ঐশ্ব্যের কথা জানাবে। এতে আনন্দ আছে বৈকি রত্না সেনের। কাজেই খাওয়া-থাকা আদর-যত্নের একটু বাড়াবাড়িই হলো।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই রত্না সেনের একমাত্র মেয়ে স্বপ্না এসে জানালে—“চা নিয়ে আসবো?” হরিচরণ বললে “এত সকালে চা?”

স্বপ্না হেসে বললে, “ওমা কোন্ সকালে আমরা “বেড টি খেয়ে নিই।”

হরিচরণ যেন লজ্জায় পড়লো। বেড টি বাড়ীতে সে খায় না। সকাল আটটার আগে চা হয় না। তবুও সামলে নিয়ে বললে, “নিশ্চয়ই আনবেন, আপনাদের চা সত্যিই ভাল।”

স্বপ্না এবার খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললে, “এটা আপনার বাড়িয়ে বলা, আপনার বাড়ীর চেয়ে কি আর ভাল।”

হরিচরণ যেন কথাটা বলে ভাল করেনি মনে ভাবলো। এদের কাছে কথা বলাও দায়। একটা কথাও গায়ে রাখে না। আদব-কায়দা সবই যেন অস্ত্র ধরণের। তবুও হরিচরণ আরও সরলভাবে বললে, “কি যে বলেন, আমাদের গাঁয়ের দোকানের চা আর এই কলকাতার চা। কিসে আর কিসে।”

স্বপ্না এ কথায় আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা নিয়ে এল। হরিচরণ এ বাড়িতে আসার কয়েক



স্বপ্না এক কাপ চানিয়ে এল

ঘণ্টা পর থেকেই হরিচরণের কাছে তার ষাওয়া-আসা একটু যেন বেশীই বলা যায়।

হরিচরণ একবার বলেই ফেলেছিল, “আপনি আমার খুব যত্ন নিচ্ছেন, শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছি।”

স্বপ্না হেসে বলেছিল, “কষ্ট আর কি! আপনি আমাদের অতিথি, তা ছাড়া মায়ের অনেক কাজ। আমার তো এখন বলেছ ছুটি চলেছে।

কলেজ! হরিচরণ জিজ্ঞাসা করেছিল, “আপনি কলেজে পড়েন নাকি?”

“হ্যাঁ এবার ইস্কুল কাইনাল পাশ হবে” কলেজে ভর্তি হয়েছি।”

একদিন কেটে গেল, আলাপ পরিচয়ের প্রথম পাঠ কেটে গিয়েছে। স্মরণে আসকের সকাল হরিচরণের কাছে একটা “সুন্দর” সকাল হয়েই দেখা দিল। বিশেষ করে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হরিচরণ বেশ আরাম উপভোগ করলো।

কিন্তু হরিচরণের মন আজ কিছুটা চঞ্চল। আজই ইন্টারভিউয়ের দিন। কি জানি কি হয়, এমন একটা চিন্তা তার মনে সর্বদা চলাফেরা করছে। গতকাল সে অফিসের ঠিকানা দেখে রাস্তা চিনে এসেছে, আজ আর এখানে-ওখানে ঘুরে অফিস খুঁজে বার করতে হবে না। তবুও একটু সকাল সকাল বেরুতে হবে। আপন মনে হরিচরণ একথা চিন্তা করে নিল।

স্বপ্না চলে যেতে রত্না সেন ঘরে এলেন। মিষ্টি কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন অস্থবিধা হচ্ছেনা তো বাবা?”

হরিচরণ লাজুক চোখে একবার মুখের দিকে চেয়ে বললে, “কি যে বলেন মাসিমা, অস্থবিধা আবার কি, এমন যত্নে আমি কোন দিন থাকিনি।”

রত্না সেন তবুও স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, “তোমার মেসোমশাই বাড়ী নেই, আজ দুদিন হ’লো দেশের বাড়ীতে গিয়েছেন, কি একটা জরুরী দরকারে। সংসারের সব কামেলা এ দুদিন আমার ঘাড়ে। তাই দেখা শোনা কিছুই করতে পারছি না।”

হরিচরণ একথায় আরও বিনয় প্রকাশ করে বললে,

“আপনি আবার কি দেখা-শোনা করবেন। এতো আমার নিজের বাড়ী বলেই মনে হচ্ছে।”

রত্না সেন খুসিতে ভবে উঠলেন। বললেন, “বেশ বেশ। নিজের বাড়ী বৈকি। তোমার পিসিমা আর আমি যেন এক-মায়ের-পেটের বোন ছিলাম।”

হরিচরণ আর কথা বাড়ালো না। একটু বিনয়ের হাসি টানলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, “আজ মাসিমা একটু সকাল সকাল আমাদের বেরুতে হবে। নটার পরই বেরুবো। ফিরতে হয়তো বিকেল হবে।”

রত্না সেন বললেন, কোনও কাজে যাবে বুঝি? তা বেশতো নটার মধ্যে আমি ঠাকুরকে ভাত দিতে বলবো। তোমার মেসোমশাই আজ দশটার মধ্যে এসে পড়বেন। তাঁরও অফিসে আজ জরুরী কাজ আছে বলে গিয়েছেন।”

হরিচরণ খাওয়া সেবে জামা-কাপড় পরে নিল। বেরবার মুখে স্বপ্না এল মশলা নিয়ে। হরিচরণ পান খায় না, তা সে গত কালই জেনে নিয়েছে। মশলা হাতে দিয়ে হরিচরণের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, “কোথায় যাবেন?”

হরিচরণের সম্মুখ চলে যাচ্ছে। মনও চঞ্চল। এক-কথায় বললে, “বন্ধুর বাড়ী।”

“বন্ধুর বাড়ী? কোথায়?” স্বপ্না প্রশ্ন করলো।

হরিচরণ টোক গিলে বললে, “বালীগঞ্জে।”

“কি রকম বন্ধু?” স্বপ্নার আবার প্রশ্ন।

হরিচরণ যেন মনে মনে এবার একটু বিরক্ত হ’লো। মেয়েটা যেন কি! ব্যয়সের থেকে পাকা বলে মনে হয়। সংসারের যেন পাকা গৃহিণী।

হরিচরণ তবুও স্বাভাবিক স্বরে বললে, “কলেজের বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছি।”

হরিচরণ একথা বলে পাশ কাটিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল, স্বপ্না কি ভেবে বললে, “একটু দাঁড়ান।”

হরিচরণ দাঁড়াল। না দাঁড়ালে অভদ্রতা হবে এই ভেবে।

স্বপ্না যেমন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল তেমনি তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল। হাতে একটা ছোট শিশি।

হরিচরণ বললে, “ওটা কি?”

“এসেন্স।”

“এসেন্স কি হবে?”

“কেন, বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছেন একটু জামা কাপড়ে দিয়ে নিন না।” বলেই হরিচরণের জামাকাপড়ে ছিটিয়ে দিয়ে স্বপ্না কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলো। সুন্দর সুবাসে ঘর ভরে গেল।

স্বপ্না বললে, “দেখলেন কি মিষ্টি গন্ধ।”

হরিচরণ আর দাঁড়ালো না। পাশ দিয়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

হরিচরণ প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি রত্না সেনের বাড়ী ফিরে এলো। চোখ মুখ শুকনো। হাসিখুসি নেই। কেমন যেন মনের মাঝে একটা অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আজই ট্রেন থাকলে হরিচরণ বাড়ীর দিকে রওনা দিত। কিন্তু কাল সাতটার আগে আর ট্রেন নেই। রাতটুকুনি তাকে এখানেই কাটাতেই হবে।

রত্না সেন ঘরে এলেন। তেমনি মিষ্টি স্বরে বললেন, “কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভাবছি বসে বসে। বিকেলে ফিরবে বলে গেলে অথচ সন্ধ্যা হয়ে গেল। কি ব্যাপার! হাত মুখ ধুয়ে নাও, চা খাবার এনে দিই।”

এমন সময় বাড়ীর কটকে গাড়ী এসে দাঁড়াল। রত্না সেন একবার সেদিকে তাকিয়ে বললেন, “ঐ তোমার মেসোমশাইও অফিস থেকে ফিরলেন।” এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হরিচরণের হাত মুখ ধোয়া কি চা খাবার খাওয়ার কোনই উৎসাহ নেই। কেমন যেন মনমরা হয়ে বসে রইলো। কিন্তু রেহাই নেই। একটু পরে রত্না সেন আবার ঘরে এলেন : “ওমা, এখনও বসে আছো! কি ছেলে গো। ঠুঠ হাত মুখ ধুয়ে নও। তোমার মেসো-মশাইয়ের সঙ্গে চা খাবার দেব। উনি বসেন এসে পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। নিয়ে এস, এক সঙ্গে চা খাবো।”

কথাগুলো বলে রত্না সেন খুসিতে যেন ভরে উঠলেন।

হরিচরণ নিরুপায়। ইচ্ছা না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে উঠতে হ’লো। মনে মনে এই ধনী পরিবারের

উপর যেন রাগই হ'লো। ঐশ্বর্য আছে তাই দেখাতে চায়। আদর যত্ন তার কাছে যেন অসুগ্রহ বলে মনে হ'লো।

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে হরিচরণ রত্না সেনের স্বামী ভবতারণ বাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। রত্না সেন বললেন, “বসো বাবা।”

কিন্তু ভবতারণ বাবু হরিচরণকে দেখে কেমন যেন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করলেন। আর হরিচরণ যেন সামনে একটা বাঘ দেখার মত আশ্চর্য হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। অফিসে তো এরই সামনে ইন্টারভিউ দিয়েছে সে। কিন্তু এই ভক্তলোকের কথাস্তলো যেন এখনও তার কানে বাজছে :

“আপনার নাম হরিচরণ মজুমদার ?”

“আজ্ঞে ই্যা।”

“অফিসের কোন কাজ কখনও করেছেন ?”

“আজ্ঞে না।”

এর পর আর কোন প্রশ্ন নয়। একবার হরিচরণের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, “আচ্ছা যেতে পারেন।”

হরিচরণ মুখ চুপ করে দরজা পেরিয়ে বাইরে আসতেই আরও কয়েকটা কথা তার কানে এল।

শাশের এক কর্মচারী বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কিছু তো জিজ্ঞাসা করলেন না স্ত্রার।”

বড়বাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “কি আর জিজ্ঞেস করবো। যত সব ফক্কড়ের দল। দেখলে না গায়ে এসেন্স মেখে এসেছে। ভর ভর করে গন্ধ বেড়চ্ছে। অভাব থাকলে কেউ এসেন্স মাখে! চাকরীটা একজন গরীবের ছেলেকে দিলে ধর্মকর্ম দুই হবে।”

কর্মচারী সায় দিয়ে বললে—“যা বলেছেন স্ত্রার।”

হরিচরণের এ অপমানের আলা যেন সারা দেহে বিদ্যুতের মত চলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ভবতারণবাবুর এখন আর সে মূর্তি নেই। মিষ্টি কথায় বললেন, “বসো।”

হরিচরণ, মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ারে বসলো। কোন কথা সে বলতে পারলো না।

টেবিলে খাবার এলো, চা এলো। একটু পরে স্বপ্নাও। হরিচরণ একবার আড়চোখে তাকালো তার দিকে।

রত্না সেন বললেন, খাও বাবা, তোমার যেসোমশাইকে দেখে লজ্জা করবার কিছু নেই। উনি ঐরকম গম্ভীর মানুষ। হরিচরণ একখানা সিঁদাড়ায় কামড় দিল। রত্না সেন আবার বললেন, কি হয়েছে বলতো বাবা, তোমাকে বড্ড মনমরা দেখাচ্ছে। হাসি নেই, কথা নেই কি হ'লো তোমার ?”

হরিচরণ এবার কথা না বলে পারলো না। বললে, “না, মাসিমা কিছুই হয়নি। আজ ইঁটাটাটি করেছি তাই।”

স্বপ্না কথা বললে, “বুঝেছ মা বন্ধুর বাড়ী যাওয়া হয়েছিল, টালায় বাড়ী, হয়তো টালিগঞ্জ গিয়েছিলেন।”

রত্না সেন তাড়া দিয়ে উঠলেন, “তুই খাম দেখি, টালায় যেতে টালিগঞ্জ যাবে কেন। তোরা কলকাতার মানুষ বলে আর কেউ যেন কোলকাতা চেনে না। “এরপর হরিচরণের দিকে চেয়ে বললেন, “না বাবা, ওর কথা ধ'রো না, ও ওইরকম, তুমি খেয়ে নাও।”

ভবতারণবাবু বিশেষ কোন কথা বললেন না। কেবল একবার হরিচরণের পড়াশুনা আর বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন।

হরিচরণ চা খাবার খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললে, “কাল সকালে বাড়ী যাবো মাসিমা।”

রত্না সেন তেমনি মিষ্টি কথায় বললেন, “থাকো না আরও দুদিন। কি এত তাড়াতাড়ি!”

হরিচরণ মুখ নীচু করে বললে, “না মাসিমা। কদিন তো হয়ে গেল।”

হরিচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে স্বপ্নাও কি একটা কাজে গেল। রইলো স্বামী জী দুজনে।

ভবতারণবাবু যেন কি একটা চিন্তা করছেন। এমন সময় একটু কাছে বৈসে রত্না সেন জিজ্ঞাসা করলেন “ছেলেটি কেমন ?”

ভবতারণবাবু এক মিনিট কি চিন্তা করে বললেন, “তা মন্দ নয়।” তারপর আর একবার হরিচরণকে ভবতারণবাবু ডাকলেন। একটিমাত্র প্রশ্ন—“এখান থেকে অফিস যাতায়াতে তোমার কোন অমত নেইতো ?”



রত্না সেন জিজ্ঞাসা "করলেন, হেলেটি কেমন?"

এর উত্তর আর হরিচরণকে দিতে হ'লো না।  
রত্না সেন ঘরে ঢুকে বললেন, "অমত আবার কি। আমি  
আজই ভবোদিকে চিঠি দিচ্ছি। হরি এখান থেকে  
অফিস করবে।"



ভবতারণবাবু চিন্তা করে বললেন "তা মন্দ নয়।"

## এ কী লীলা!

শ্রীসুখীর গুণ

প্রশ্ন-জর্জরিত প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া  
সারা হোলো; লবণাষু-জীবন-বেলায়  
অসহায় তরুণেরা প্রাণান্ত খেলায়  
নিষ্ঠুর পীড়নে কা'র পড়ে আছাড়িয়া?  
দয়িতাই হবে যদি, তবে তা'রও হিয়া  
উদ্বেজিত হয় না কি হেরি' এ হিয়ায়  
অনন্ত জ্বলন-জ্বালা? সৈকত-শয্যায়

তা'রও কি লক্ষ প্রশ্ন তোলে জর্জরিতা?  
ব্রহ্মাণ্ড-দয়িত কেহ আছে কি না আছে?—  
এ চিন্ত-চকোরও সে কি? প্রদাহ ছুরীর  
তাহারই কি সৃষ্টি সবই? ভুলি তা'র পাছে  
সজ্জাক-কণ্টকে বিদ্ধ করে অনিবার?  
ফেন-পুষ্প-উদ্ভি-ভঙ্গে—প্রাণ-বৃক্ষে নাচে  
আনন্দ-সহস্র-দল,—একী লীলা—কা'র?

## শ্রীভগবানের মুখে যুদ্ধের কথা কেন ?

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছি জাহাজে। World Congress of Faiths (সর্বধর্ম-সন্মিলন)-এর যে অধিবেশন হইবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাতে যোগ দিব। ১৯৩৭-এর গ্রীষ্মকাল।

ঐ প্রতিষ্ঠানের লণ্ডন শাখার নাম World Congress of Faiths; আমেরিকান শাখার নাম World Fellowship of Faiths। লণ্ডন শাখার সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেণ্ড। আমেরিকান শাখার সভাপতি চার্লস ফ্রেডারিক ওয়েলার। আমেরিকান শাখার আমি ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারী।

স্যার ইয়ংহাসবেণ্ড নিজে আমেরিকায় গিয়া আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা এক-দলে বার চৌদ্দজন আমেরিকার ডেলিগেশন্স। সভাপতি ওয়েলার সাহেবও আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। জাহাজ ছাড়িবার দুই তিনদিন পরে ওয়েলার সাহেব জাহাজে এক সভার আয়োজন করেন।

সভার বক্তা আমরা পাঁচ ছয়জন। একজন ইসলাম ধর্মের বক্তা, একজন খৃষ্টান ধর্মের বক্তা, একজন বৌদ্ধ ধর্মের বক্তা আর হিন্দুধর্মের বক্তা আমি। ওয়েলার সাহেব সভাপতি। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বিশিষ্ট কর্মচারী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অল্পটানে বেশ আনন্দ হয়।

হিন্দুধর্মের বক্তৃতার আমি গীতার সার্বজনীন বাণীর কথা বহু বলি। সভাশেষে প্রমোক্তরের ব্যবস্থা ছিল। আমার বক্তৃতার পরে একজন বিশিষ্ট শ্রোতা গীতা সম্বন্ধে এক প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন—“আপনাদের গীতার উদার বাণী বেশ ভালই লাগে, কিন্তু উপক্রমণিকা (setting) পছন্দ হয় না। গীতার বক্তা ভগবান। শ্রোতা একজন ভক্ত। ভক্ত বলিতেছেন—‘যুদ্ধ করিব না।’ ভগবান তাঁহাকে কঠোরভাবে আদেশ করিতেছেন—‘করিতেই হইবে।’ ভগবানের মুখে ঐরূপ যুদ্ধের কথা আমরা শুনিতে চাই না।”

খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রশ্নকারী আরও বলিলেন—“আমরা যাহাকে ভগবানের তুল্য জ্ঞাপকর্তা বলি তিনি বলিয়াছেন—‘এক গালে চড় দিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দাও। যে তোমার চাদরখানা লইয়া গিয়াছে তাহাকে জামাটাও দিয়া দাও।’ এইরূপ উদার মানবীয় বাণী ভগবানের মুখে শোভন। ভগবান হইয়া অনিচ্ছুক ভক্তকে যুদ্ধের প্রেরণা দিলেন কেন—ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়।”

প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসায় আন্তরিকতা ছিল—কটাক্ষ ছিল না। সভার অধিবেশন চলার সময়েই এই প্রশ্ন। অধিবেশনের মধ্যেই উত্তর করিলাম। উত্তর শুনিতে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ উৎসুক ছিল।

“গীতার বক্তা অর্জুনকে যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছেন এই কথা ঠিক না।” আমি শান্তভাবে বলিতে লাগিলাম, “গীতার উপদেশ যদি যুদ্ধের প্রেরণাই হইত তাহা হইলে কেবল সৈন্তদের ব্যারাকেই উহা পাঠ্য হইত। যুগ যুগ ধরিয়া শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসী ও সাধারণ নরনারী গীতা পাঠে ভুলিয়া থাকিত না। ‘উঠ, যুদ্ধ কর’—এই কথা একাধিকবার গীতায় থাকিলেও বস্তুতঃ, গীতা যুদ্ধের প্রেরণামূলক গ্রন্থ নহে।

‘যুদ্ধ করিতে বলিয়াও যুদ্ধ করিতে বলেন নাই’—আমার এই বিরোধী কথায় সামঞ্জস্য কোথায় জানিবার জন্য সভার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। তাহা অসম্ভব করিয়াই স্পষ্টতর ভাষায় বলিতে লাগিলাম : “অর্জুন এক বিরাট কর্তব্যের সম্মুখীন। তাহার রাষ্ট্র, সমাজের দাবী এই কর্তব্য করা। কর্তব্যের দায়িত্ব মাথায় লইয়া অর্জুন অগ্রসর হইয়াছে; এমন সময় এক লাভ বুদ্ধি তাঁহাকে কর্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। গীতার বক্তার ভাষায় ঐ লাভ-বুদ্ধির নাম ক্লীবতা, কশ্মল, হৃদয়দৌর্বল্য, অজ্ঞানসম্মোহ। ইহা দূর করা আশ্চর্যের কাজ। সদগুরুর কাজ। জগদ-গুরু ভগবানের কাজ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের উপদেশ দেন নাই, কর্তব্য-

পালনের পথে যে মানসিক বাধা তাকে অপনোদন করিয়া কর্তব্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি স্নেহময় ভগবানের পক্ষে ঠিক কাজ নয়?

যদি বলেন—‘যুদ্ধ কখনও কর্তব্য হয়?’ তবে বলিব—হয়। হয়ত অনেকে একমত হইবেন না। আধ্যাত্মবিদের স্ফুটিত অভিমত এই—সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনে যুদ্ধও অপরিহার্য্য হয়। যুদ্ধ করিতে হইবে শুধু কর্তব্যের জন্ত। হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈরভাব বিন্দুমাত্রও থাকিবে না। কাহারও মনে হইতে পারে যে, ইহা সম্ভব নহে। বৈর-ভাবহীন যুদ্ধ—সোনার পাথর বাটির মত। কিন্তু গীতা ইহাই সম্ভব মনে করেন। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতেও বলিয়াছেন (১১।৩০)। আবার “নির্বৈরঃ” হইতেও বলিয়াছেন (১১।৫৫)।

আহার করা দেহের ধর্ম। লোভ মনের ধর্ম। নির্লোভ হইয়া আহার করা চলে। বিশ্রাম করা দেহের ধর্ম। অলসতা মনের ধর্ম। অলস না হইয়া বিশ্রাম করা চলে। যুদ্ধ রাষ্ট্রধর্ম। হিংসা বৈরভাব মনের ধর্ম। অহিংস নির্বৈর হইয়া যুদ্ধ করা চলিবে না কেন? স্নেহময় হইয়া কি দণ্ডজনকে দণ্ড দেওয়া চলে না? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“দণ্ডিতের সাধে

দণ্ডদাতা কঁাদে যবে

সমান দরদে।

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।”

দণ্ডনীয়জনকে দণ্ড দিয়া যদি দণ্ডদাতা সুখী হয় তবে বুঝিতে হইবে কোথায়ও তাহার স্বার্থ লুক্কায়িত আছে। যদি সে ব্যথিত হয়, দণ্ড্য ব্যক্তির সঙ্গে বেদনায় সে আহত হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার দণ্ড দান স্বার্থগন্ধহীন, শুধুই কর্তব্যের প্রেরণা।

গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। যুদ্ধের জন্ত তৎকালীন ঘটনার পরম্পরা দায়ী। শ্রীকৃষ্ণ নহেন। বরং তিনি শাস্তির প্রস্তাব লইয়া কৃত-কার্য্য হইবার আশায় মাড়ঘরে দুর্ঘ্যোধনের সভায় আসিয়া-ছিলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার জন্ত বহু উপদেশ দিয়া-ছিলেন। শাস্তিদূতের মহাবাহী দুর্ঘ্যোধনের বধির কর্ণে

প্রবেশ করে নাই। সে দূতকে বন্দী করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলে সভা-স্থল ত্যাগ করেন।

যুদ্ধ যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল তখন তিনি প্রথমে ভাবিলেন নিরপেক্ষ থাকিবেন, কোন পক্ষেই যোগ দিবেন না। পরে গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেন—নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নহে। বাহিরে নিরপেক্ষতা দেখাইলেও মনে এক পক্ষের জয়কামনা করিতে থাকিবে। ইহা একরূপ মিথ্যাচার। অস্ত্রবাহিরে নিরপেক্ষতা যখন সম্ভব নহে তখন উভয় পক্ষেই সমভাবে থাকিবেন। এক পক্ষে দিলেন তাঁহার বিপুল নারায়ণী সেনা। অপর পক্ষে দিলেন নিজের বুদ্ধি ও সারথ্য। ঘোড়া চালাইবেন, অর্জুনের বুদ্ধি চালাইবেন। নিজের হাতে অস্ত্র কখনও চালাইবেন না অর্জুন যখন নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তখনও তিনি নিজে সারথ্য করিয়াছেন। এইরূপ উভয় পক্ষে সমতাব রক্ষা মানবেতিহাসে আর কোন ব্যক্তি করিয়াছেন—এইরূপ দৃষ্টান্ত কেহ দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

শাস্তিময় ভগবান কর্তব্যবিমূঢ় ভক্তকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—সমগ্র গীতা ভরিয়া ইহাই দেখিতে পাইবেন ইহাতে অশোভনতা কোথায়? বরং সংসারকর্মক্ষেত্রে কর্তব্যপরাধু জীবের প্রতি ইহাই পরম শোভন উপদেশ এইজন্তই এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে যে যেখানে কর্তব্যের ভূমিকায় ছুঁকল, বিভ্রান্ত বা বিমূঢ় হইয়া পড়ে তখনই গীতার উপদেশ তাহার পক্ষে সঞ্জীবনীসুধার কার্য্য করে। দিশাহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে গীতার মত গ্রন্থ আর নাই। সর্বশ্রেণীর মানুষের সর্বপ্রকার অবস্থায় গীতার বাণী জীবনপথের সর্বোচ্ছল বস্তিক।

আলোচনার মধ্যে গীতার কথা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আর একবার গীতার সার নির্ঘাস শুনাইব। আমরা সসীম, ক্ষুদ্র, খণ্ড জীব। জগতের বাহ্যিকিছু দেখি—খণ্ড, খণ্ড দেখি। ইহা ভ্রান্ত দৃষ্টি। নিখিল বস্তুকে অখণ্ড-ভাবে দেখা, এক বিরাট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে দেখাই ঠিক দেখা। সেই দেখার নাম বিশ্বরূপ দর্শন। বিশ্বের যেটি প্রকৃত রূপ তাঁহাকে মহাচৈতন্য সত্তার অবিভক্ত বিশাল রূপ—তাহা দেখাই বিশ্বরূপ দর্শন। অর্জুন তাহা

দেখিয়াছেন। কৃষ্ণের দেওয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া অর্জুন বলিয়াছিলেন—‘হে দেব, তোমার এক দেহে নিখিল বিশ্ব দেখিতেছি’ (১১।১৫)।

এই দিব্যদৃষ্টি দিয়া, দিব্যদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন—অখিল বিশ্বের যাহা কিছু সবই আমি করি। সবই করা হইয়া রহিয়াছে, তবু তোমাকে কৰ্ম্ম করিতে হইবে—‘নিমিত্তমাত্র’ হইয়া (১১।৩০)।

সমগ্র জগৎ ভগবানের। জগতের যাহা কিছু সবই তাঁহার কাজ। যাহা করিবার তিনিই করেন। আমি নিমিত্তমাত্র—এই একটা উপদেশই বিশ্বমানবের জীবনে শাস্তির বাতাস বহাইবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। আমরা শুধু এই একটা কথা নিয়ত স্মরণপথে রাখিয়া চলিব। এই বিশ্বরূপ—বিশ্বের যাহা কিছু আমি, আপনি বিশ্বেরই রূপ। তিনিই কর্তা, তিনিই কৰ্ম্ম, তিনিই কারণ।

আমরা সকলে তাঁহার হাতের ক্রীড়ণক। তাঁহার হাতের ক্রীড়াযন্ত্র। যন্ত্রী যেমন বাজাইবেন ঠিক তেমনি বাজিব। তাঁহার সভাই আমার সভা। তাঁহার কর্তৃত্বই আমার কর্তৃত্ব। আমি অধীন তিনিই স্বাধীন। তাঁহার স্বাধীনতার সঙ্গে এক হইয়াই আমার স্বাধীনতা, তাঁহার সঙ্গে যুক্ততায়ই আমি কৃতার্থ। বিযুক্ততায় অপদার্থ। কেশ মাথায় থাকিয়াই স্নানর। বিচ্যুত হইলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।”

শেষ কথাটুকু বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি ওয়েলার সাহেব হাততালি দিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলাম। সভাপতির হাততালির সঙ্গে সঙ্গে সভাপ্রসঙ্গ লোক সোমাসে হাততালি দিয়া উঠিল। সভাস্থে প্রসঙ্গকর্তা আমার করমর্দন করিয়া কহিলেন—আপনার স্মরণ বিচারে সুখী হইয়াছি। একটা সংশয় কাটিয়া গিয়াছে।”

## পূজার আমোদ

কাজলজতা সর্বাধিকারী

(দাছর কাছে শুনে)

শারদশ্রী আগমনে শরতের শোভা হিয়ার মাঝে যে হিজোল ভুলে, তাহার পরে কি যে আনন্দ-মদিরা, কে যে ঢালিয়া দেয়—কে জানে! ছলিয়া ছলিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, মস্ত-মাতঙ্গিণীর মত মানা সে মানে না কোনও দিকে কিছুতে।

মানিবে সে কেমন করিয়া? সে যে নিজেকেই নিজে ধরিয়া রাখিতে পারে না। চাপা আনন্দের ঢেউ চাপা রাখিতে পারা যায় না। মাতৃ-শুভাগমনের এই পূর্বসন্ধান প্রকাশের ভাষাও বড় মধুর, বড় মনোরম।

আনন্দে কল-কলধ্বনি তোলে শিশু-দেবতার। প্রাণ ভরিয়া সে মধুব দৃশ্য দেখেন তাহাদের জনক-জননীগণ। সুখ-সুখময় সংসার মধুময় হইয়া উঠে। পূজার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া শিশুদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। নাচিয়া-কুঁদিয়া শারদোৎসবকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলে কচিমুখের দেবজুহু হাসি-রঙ্গ। হাতে হাত মিলাইয়া, দলে দলে, পথে পথে, পূজা-বাড়ীতে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের বেশভূষা ও প্রাণভরা হাসিমুখ দেখিয়া বিদেশীরা ভাবিয়াছে—এদেশে দারিদ্র্য কোথায়! অশান্তি কোথায়!

ঠাকুর দেখা, আরতি দেখা—আনন্দের কুল-কিনারা নাই। যাত্রাগানের আনন্দে—কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয় আনন্দে ভরপুর। যাত্রাগানের মাধ্যমে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া তাহারা শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই পাইয়াছে। ঠাকুরমা দিদিমারাও শুষ্ঠ নিশ্চুস্ত-বধের ও রামায়ণ মহাভারতের গল্পে, ছোট ছোট নাতি নাতনীদেব মন হরণ করিয়াছেন।

পূজার কয়দিন রাত্রি বারটার পরও অনেক পর্দানশীন মহিলা ঠাকুর দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু পুরুষদের পোকা মাকড়সিও সে সময়ে তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে বা বিরক্ত করিতে সাহস পায় নাই।

বিজয়োৎসবের আনন্দেরও অবধি ছিল না। বিজয়া উৎসব চলিত প্রায় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত।

এসব কথা সার্কজনিদের পূর্বযুগের কথা। তখনকার বাকালী পরিবার একান্ত বস্ত্রভূক্ত ছিল। অবিচ্ছিন্ন মিলনে প্রতিটি পরিবার হাসি-গান-গল্পে মুখর হইয়া উঠিত—আনন্দেরও সীমা থাকিত না। আমাদের সমাজ-জীবন হইতে একান্ত বস্ত্রিতার পাপ দূর হইয়া, পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে কতটা—দেখুন, বুনন ভাবুক সূজন।



## “তারিণী”

ডক্টর রমা চৌধুরী

আজ পরমেশ্বরের শ্রীশ্রীমাতৃপূজা উপলক্ষ্যে আমরা পবিত্র “অর্গলা স্তোত্র” থেকে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে জননীর বন্দনা করছি :—

“তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্তাচলোদ্ভবে।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

“দুস্তর-সংসার-সাগর-তারিণী,

অতুলা অমলা গিরিবরনন্দিনী।

রূপ দাও, যশ দাও, দাওগো জয়,

রূপভরে কর, মাতঃ, শত্রু বিজয় ॥”

এস্থলে, প্রথমেই জননীকে “তারিণী” বলে স্তুতি নিবেদন করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি জগত্তারিণী এবং মুক্তিদায়িনী।

বস্তুতঃ, দার্শনিক দিক থেকে, শ্রীভগবান অথবা তাঁর সঙ্গে অভিন্না আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর দুটি প্রধান কার্যঃ সৃষ্টি ও মুক্তি। এই দুটোরই একত্রে উল্লেখ করে, শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলেছেন :—

“না বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী।

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥”

এই সৃষ্টি ও মুক্তির প্রকার কি? ভারতীয় দর্শনানুসারে, এই দুটাই নির্ভর করে জীবের নিজেরই উপর যেহেতু সৃষ্টি জীবের কর্মানুসারী, মুক্তি তার সাধনানুসারী। ভারতীয় কর্মবাদমতে, জীবের নিজের সকাম কর্মের ফলভোগের জন্যই তাকে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেপে, সৃষ্টির প্রারম্ভে, ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ জীবের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব প্রাক্তন, অভুক্ত সকাম কর্মের সংযোগসাধন করেন, এবং তারপর, জীব সেই সেই সব কর্মানুসারে, নরদেহ ধারণ করে, নব পরিবারে নব পরিবেশে সংসারে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের কার্য মাত্র এইটুকুই।

একই ভাবে জীবের স্বীয়, যোগ্য নিকাম কর্ম ও বিভিন্ন সাধনাদির মাধ্যমেই মুক্তিমুক্ত করে। সে ক্ষেত্রে, পরমেশ্বরকে “মোক্ষদাতা”, অথবা মহাজননীকে “তারিণী”

প্রভৃতি রূপে অভিহিত করার অর্থ কি? বস্তুতঃ একেশ্বরবাদী বেদান্তসম্প্রদায়ের স্ববিখ্যাত “ঈশ্বর রূপবাদ” সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক বলেই বোধ হতে পারে।

এই “ঈশ্বর রূপবাদ”-অনুসারে সর্বপ্রথম, ক্রমাস্রয়ে; নিকাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রমুখ প্রারম্ভিক ও পারিশেষিক সাধনা দ্বারা, জীব মোক্ষলাভের যোগ্য হলেও, সর্বশেষে আরেকটি বস্তুর প্রয়োজন, যা’ না হলে, মোক্ষলাভ অসম্ভব—সেটি হল, ঈশ্বররূপ বা ভগবৎপ্রসাদ। এরই উল্লেখ আমরা উপনিষদেও পাই :—

“নাম্যমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহন্য শ্রুতেন।

যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্য

স্তম্ভৈষ বিযুগতে তন্মাম্।”

স্বভাবতঃই, এস্থলে প্রশ্ন উপস্থাপিত হতে পারে যে, জীব যদি সাধনা দ্বারাই শ্রেষ্ঠ মোক্ষ-ধন লাভ করতে পারে, তাহলে, সেক্ষেত্রে, ঈশ্বর প্রসাদের স্থান কোথায়? তাহলে, মুক্তি ত তার ছায়া প্রাপ্য, কারো অঙ্গগ্রহের দান নয়।

এ কথা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য। এ সঙ্গেও একেশ্বরবাদী বেদান্ত দর্শনে যে, একরূপ বিশেষ জোরের সঙ্গে ঈশ্বররূপার কথা বলা হয়েছে, তারও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেটি হল এই :—এই দর্শনানুসারে, ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ অতি মধুর উপাস্ত-উপাসক, সেব্য-সেবক, সম্পর্ক; শ্রদ্ধা ও শ্রীতির, অবিচ্ছেদ্য, ঘনিষ্ঠতম, প্রাণের সম্পর্ক। একরূপ সম্পর্কে, অধিকার, দাবী প্রভৃতির কোনো স্থানই নেই। যেমন, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। ভ্রাতৃধর্ম্যানুসারে, আইন-কানুনানুসারে, পুত্র, সত্যই অনেক কিছুই সজোরে দাবী করতে পারে। কিন্তু তা কি সে সত্যই কোনোদিন করে? না; কদাপি নয়। বরং সে প্রজ্ঞাভরে, করষোড়ে পিতার নিকট থেকে তার ছায়া বস্তু তিক্ষা করে নেয়। একই ভাবে, স্বামীর নিকট জীব দাবীও অল্প নয়—কারণ ভারতীয় মতে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পূর্ণ সমান। তা’

সত্ত্বেও, জী নম্রসম্রভাবে, তাঁর শাস্ত, অধিকার স্বামীর নিকট থেকে যাক্সা করেন, এতেই ত তাঁর পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

✱ একই ভাবে, মুমুকু জীব নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের নিকট থেকে তার সাধনামুসারে মোক্ষ কল দাবী করতে পারে। কারণ, তার সাধনা যদি সূচুভাবে অমুষ্ঠিত হয়, তাহলে তার মোক্ষলাভ নিবারণ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই কারো নেই। কিন্তু পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিশ্চয় দাবী-দাওয়ার অধিকার বিস্তারের সম্পর্ক নয়। বস্তুতঃ, “দাবী” কথাটিই যেন একটু কঠোর—এতে মনে হয় যেন কোন অনিচ্ছুক খাতকের নিকট থেকে ছোর করে কিছু আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর অনিচ্ছুক খাতক নন, জীবও ছোর করে আদায়কারী প্রাপক নন। উপরন্তু পরমকরণাময়, অশেষমধুর, অতুলকোমল শ্রীভগবান সর্বদাই উদ্যমী হয়ে রয়েছেন জীবকে তাঁর ব্রহ্মানন্দের, স্বরূপ-রসের, শাস্ত আলোক-অমৃতের সমভাগী করতে। সেজন্য,

✱ মুমুকু জীব তার সাধনোচিত, জ্ঞান ফল মোক্ষের বিষয় পরমেশ্বরের নিকট সম্বোধে, সদন্তে, দাবীরূপে, অধিকার ভিত্তিতে পেশ না করে, নতমস্তকে, নম্রভাবে, কৃতজ্ঞলিপুটে যেন তা’ তাঁর নিকট ভিক্ষা করেই নেয়। এতে তার আর ক্ষতি কি? বরং, লাভ অনেক। কেবল সূকঠোর দাবী দাওয়া রূপে প্রাপ্ত, কেবল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ রূপে উপস্থাপিত, কেবল পূর্ণ অধিকাররূপে উপযুক্ত বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ মৌলিক বস্তু নেই—তা’হল প্রাণের আকর্ষণ, মনের মত্ততা, আত্মার আত্মীয়তা। কেবল অধিকার দাবী-রূপে আদায় করা অপেক্ষা এগুলি লাভ করা কি লক্ষণ শ্রেয়ঃ নয়?

✱ সেইজন্যই, একেশ্বরবাদী ও ভক্তিবাদী বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বররূপবাদের সম্মান ও মূল্য একরূপ অধিক। ঈশ্বর পরমকরণাময়, ভক্তবৎসল, ভক্তদাস—তাঁর রূপা, তাঁর জ্ঞান বিচারকে সকাম কর্মফলের অবশুস্তাবী ফলসমূহকে কোনোক্রমেই ব্যাহত অথবা পরিবর্তিত করতে পারে না। তাহলেও, সর্বকরণাময়ের করুণা এইসব অবশুস্তাবী বস্তু বা ঘটনাকে কোমল করে, সুন্দর করে, মধুর করে। সেটাই কি অল্প লাভ?

এই কারণে, জগজ্জননীকে যে বারংবার “তারিণী” বলা হয়েছে তা অতি স্তোভের স্তোভক। অবশ্য শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও স্বয়ং শ্রীভগবান বলেছেন যে, মুক্তি স্বপ্রচেষ্টালভ্য, কারো সাহায্য দ্বারা প্রাপ্য নয়, কারো অমুগ্রহের দান নয়।

“উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং নাত্মানম্বসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৱাত্মনঃ ॥”

তা’ সত্ত্বেও, তিনিই “তারিণী”। এই অর্থে যে, একমাত্র তাঁকেই লাভ করলে, আমরা জ্ঞান লাভ করি। তাঁকে “লাভ” করার অর্থ কি? তাঁকে নূতন ভাবে প্রাপ্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই এস্থলে নেই যেহেতু তিনি নিত্যপ্রাপ্ত, আমরাও নিত্যমুক্ত। কারণ, তিনিই ত আমরা শাস্তকাল, আমরাই ত তিনি চিরন্তন কাল। তিনি কি নিজেই বলেননি—

“একৈবাহং জগত্যত্র বিতীয়া কা মমাপরা।”

সেজন্য, তাঁকে “লাভ” করার অর্থ, তাঁকে উপলব্ধি করা—আমাদের অন্তরের অন্তরস্থলে জগতের অণুতে পরমাণুতে তাঁর শাস্ত উপস্থিতি, তাঁর অতুল আনন্দ, আলোক, অমৃত, তাঁর অফুরন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা। এই কি আমাদের অনন্ত জ্ঞান, অসীম মুক্তি, অতুল পূর্ণতা নয়? সেইজন্যই তিনি “তারিণী”—“ভবতারিণী” “জীবতারিণী।” তিনি রূপাভরে আমাদের স্বাধীনেচ্ছা ও স্বাধীন কর্মশক্তি দান করেছেন। সেজন্য, সাংসারিক বাসনা কামনা কার্ষকলাপে সেই মহাস্বাধীনতা বুধা নষ্ট না করে, আমরা যেন তাঁকেই নিত্য উপলব্ধি করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা করি—

“সর্বশ্রু বুদ্ধিরূপেণ জনস্ত হৃদি সংস্থিতা।

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥”

... ..

“সর্বদে বুদ্ধিরূপে তুমি বিরাজিতা।

স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী নিত্য অনিন্দিতা ॥

প্রণাম তোমায়, প্রণাম তোমায়, নারায়ণি।

নিস্তারিণি! তুমি ভব-সাগর-তরুণী ॥”

# আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

( ১ )

“আজি প্রাণে তুমি প্রাণে  
করিছ সবল, সরস সচল জীবনী-সুধাদানে।  
দহিয়া-দহিয়া বেদনায়  
জাগিছ মোহিয়া চেতনায় ;  
দুঃখ আমূল ফুটাইয়াছে ফুল আকুল করিয়া ভ্রাণে।  
ফুটিছে অটুট নিশানাথ  
সেই দেশ, যার দিশা নাই,  
( যেষা ) জরা ও মরণ অমৃত বরণ বরণ করিয়া আনে।  
করুণা ধারায় বরিষা,  
এসেছ চিত্ত ভরিয়া,  
ভাসাই আমার ঐ করুণায় প্রেমের ধারার টানে ॥”

( ২ )

“চলু-রে সবে মহোৎসবে অশেষ পথের যাত্রী  
ওরে যাত্রী—যাত্রী।  
তৃষা-সুধায় দিবেন সুধা স্বয়ং জগদ্ধাত্রী।  
পথের পাশে পাছবাসে  
সন্ধ্যা যদি ঘনিষে আসে,  
শুন্বি প্রাণে অভয়-বাণী, করবে কি কাল-রাত্রি !  
লোকের মেলায়, দানের পালায় ;  
প্রাণ কুড়াবি, গাঁথবি মালায় ;  
দিবেন চিন্তে সেই ত বিস্ত্র নিত্য সুধাদাত্রী ॥”

অনবদ্য ভাষা, সুপবিজ্ঞ ভাব—সাধনা-মনীষারই  
স্বতঃস্ফূর্ত সুরের নৈবেদ্য—উপরোক্ত গান দুইখানি  
আচার্য্য কবি বিজয়চন্দ্রের রচনা। এই দুইটা গানই  
প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩৩৬ সালের “প্রবর্তকের” ভাঙ্গ  
সংখ্যায়।

সেই মাসেরই “প্রবর্তকের” পূর্ব বিভাগে “ডাঃ  
ব্রজেননাথ শীলের অভিমত ও প্রবাসীর প্রতিবাদ” শীর্ষক  
আলোচনা নিবন্ধ প্রসঙ্গে আচার্য্যদেবের একটুখানি  
স্পষ্টীকরণ লিপিও প্রকাশিত হয়—যার পিছনে ছিল এক  
সাংস্কৃতিক মতামতের ক্ষুদ্র ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের  
সুত্রপাত যে ঘটনায়, তাহার বিবরণ বাহির হয় ঐ

বৎসরেরই “প্রবর্তকের” বৈশাখ সংখ্যায়—“মনীষিমন্দিরে”  
“আচার্য্য ব্রজেননাথ শীলের সহিত কথোপকথন” এই  
শীর্ষনামায় এক বৈঠকী আলোচনা প্রসঙ্গে। আচার্য্য  
পরিচয়ের কথায় আসিতে হইলে সেই দিনের ঘটনার  
আলোচনাটা আবুপূর্ব্বিক এখানে তুলিয়া দিলে আমার পক্ষে  
খুবই সুখকর হইবে—কারণ আমার স্মৃতিক্ষেত্রে ঐ দুই  
আচার্য্যের মহিম্ময়ান মূর্ত্তি একই সঙ্গে অভিন্ন স্মৃতি  
গাঁথিয়া আছে। সে দুইটা ছবি সংযুক্তভাবেই আমার  
মনে এখনও উজ্জ্বল, পবিত্র স্মৃতির ও অম্লান।

“আচার্য্য শ্রীব্রজেননাথ শীল কলিকাতায় আসিয়াছেন।  
কথাটা শুনিয়াই বহুদিনের অন্তরের সাধ জাগিয়া উঠিল—  
ভারতবরেণ্য এই মনীষি-সম্রাটের চরণে আমাদের  
অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিব। দুই তিনজন সহতীর্থ  
মিলিয়া অপরাহ্নে যাত্রা করিলাম।

আচার্য্য শীল তো আমাদের চিনেন না। তাই  
পরিচয়ের ভার দিয়াছিলাম—আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও  
কল্যাণকামী অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের উপর।  
তিনি সানন্দে সে ভার বহনে সম্মত হন। উদার হৃদয়  
স্নেহশীল অধ্যাপক কতখানি অন্তরের দরদ ও আকুলতা  
লইয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা  
বলিবার স্থান এ নহে। তাঁহার নিকট আমরা যে উৎসাহ  
ও প্রেরণা পাইয়া থাকি, তাহা চিরদিন স্মরণে থাকিবে।  
বাহিরের দৃষ্টিহারা হইয়াও তাঁর অন্তরের আলোকোজ্জ্বল  
দৃষ্টি অনেক প্রকারেই পথের সঙ্কেত দেয়—তাঁর আশিষবৃষ্টি  
স্বচ্ছ নিবারণধারার ত্রায় সকল কুষ্ঠা ও গ্লানি মুক্ত করিয়া  
জীবনকে শান্ত, স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। এই জ্ঞান-  
গভীর প্রবীণ মনীষী-পুরুষকে দেখিলে মনে পড়ে সেই  
বাঙালী মরমী কবির কথা—

‘আমার বাহির দুয়ারে কপাট পড়েছে  
ভিতর দুয়ার খোলা।’

সত্যই নিত্য স্মৃতির তীর্থযাত্রী কি নিবিড় মধুময়  
আত্মীয়তার স্পর্শে আমাদের কাছে এতখানি কাছে টানিয়া  
লইয়াছেন।

উজ্জ্বল গরিমাময় অপরাহ্ন। আচার্য্য মজুমদার নিজের মোটরে আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া আচার্য্য শীলের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন।

✱ আচার্য্য অস্থস্থ। ভূত্য খবর দিল—তিনি উপর তলাতেই আছেন। অধ্যাপক মজুমদার তাঁর আগমন সংবাদ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাঃ শীল বিজয় বাবুকে উপরেই যাইবার জ্ঞাত অস্বরোধ জানাইলেন—শরীর খারাপ বলিয়া নীচে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া কষ্টকর হইবে। বিজয়বাবু অগ্রেই গেলেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই আমরা আহূত হইলাম।

দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত নয়ন, সৌম্য-দর্শন, মহিমাব্যঞ্জক শ্বসিষ্টি। ব্রাহ্মণ্যগর্বে ললাট সমুজ্জ্বল, শূদ্রদেহে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও প্রতিভা—এ যুগের চাতুর্স্বর্ণের নূতন সংস্থানের কথাই মনে আঁকিয়া বসে। আত্মদমাহিত দিগন্তহীন অগাধ জলধির হ্রাস গাভীর্য্য পূর্ণ।.....

ডাঃ শীল বিজয় বাবুকে স্বয়ং মমতাভরে হস্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে একখানি আরাম-কেনারায় বসাইয়া দিলেন—আমাদিগকেও আসন দেখাইয়া বলিতে বলিলেন। আমরা তাঁহাকে মাঝখানে রাখিয়া সারি সারি পাতা চেয়ারগুলি বসে এক একখানিতে স্থান গ্রহণ করিলাম।

ইহার পরে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আচার্য্য শীলের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন চলিল। কথা যখন প্রায় শেষ হইল—বিজয় বাবু যিনি এতক্ষণ একেবারে চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি এইবার তাঁর মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন “আমি এতক্ষণ কিছু বলি-নি। এঁর সম্বন্ধে একটা কথা—ইনি চিরদিন আড়ালে থেকেই দেশকে তাঁর দান দিয়ে’ এসেছেন। অনেকেই জানেন না—ইনি যে সব নূতন গবেষণা ও সিদ্ধান্ত করেছেন, নানা-জনে তাঁর কাছে থেকে তা’ শুনে’ নিয়ে’ নিজেদের নামেই চালিয়ে দিয়েছে—এইজ্ঞ তাঁর চিন্তার দান কতখানি দেশ তা’ জানে না। এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয়ে আমি খুবই সুখী হয়েছি।”

আচার্য্য মজুমদারের সহিত পরমপূজ্য সত্যেন্দ্রনাথ সৌহার্দ্য একটা অন্তরঙ্গ প্রীতি ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে গভীর ও

যেন চেতনার এক আলোকময় স্তরেই সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্যজীর বিশেষ আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ একবার তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে পড়িতেছে। সেদিন তাঁহাদের আলাপ ও সাংস্কৃতিক অন্তর বিনিময় এক অভিজাত মহিমায় সমুজ্জ্বল ও আমাদের মত জিজ্ঞাসু ছাত্রের পক্ষে শুধু অতিশয় উপভোগ্য নয়, সত্যিই চিন্তোন্নতিকর বলিয়াই অস্বভাব করিয়া উল্লসিত হইয়া-ছিলাম। আচার্য্যভবন সেদিন তীর্থক্ষেত্র পরিণত হইয়াছিল।

আচার্য্যদেবের দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম—অন্ধ মহামানবী স্বৃতি হইতে অনর্গল বোধোপনিষদের মন্ত্রস্ততির স্বাক্ষর তুলিয়া এক অসীম জ্ঞানরাজ্যে কেমন সহজে সকলের মনকে তুলিয়া দিলেন। কর্তৃস্বর সজল মেঘমন্ডলের মত সরস গভীর, সংস্কৃত উচ্চারণ স্পষ্ট, প্রত্যেকটা মস্তাক্ষর চিত্তের মর্ম্মস্থলে অল্পপ্রবেশ করিয়া গভীর ভাবব্যঞ্জনাময় আলোড়ন তুলে। বহু বর্ষ পূর্বের কথা—সেই আচার্য্য-গুরু সংলাপের কোনও প্রামাণ্য স্বাক্ষর সেদিন সংরক্ষণ করা যায় নাই—শুধু আর্ধ্যসংস্কৃতির মহিমোজ্জ্বল একটা অস্বভাবের রেশই স্বৃতিভাণ্ডে এখনও গোপনে জমিয়া রহিয়াছে। তাহা ভাবিতেও আজ হৃদয়ে পুলক-শিহরণ জাগে।

আচার্য্যদেব স্বরচিত অনেকগুলি মুদ্রিত গ্রন্থ আমাদের উপহার দেন। গ্রন্থগুলি তাঁর শুধু গভীর মননশীলতা নহে, তাঁহার বিচিত্র ও বহুমুখী সাংস্কৃতিক প্রতিভা, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক হুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞাবস্তারও অকাট্য পরিচয় বহন করে।

পালি ভাষায় রচিত মূল ধেরীগাথার কবিতায় অহুবাদ ও তাহার সূসম্পাদিত প্রকাশ, তাঁহার এক বিশিষ্ট সাহিত্য-কীর্ত্তি। মূলের ভাব ও ব্যঞ্জনা অহুবাদের উৎকৃষ্ট ভাষায় ও ছন্দে স্বরক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী বৈদিক শ্বসিপত্নী বা শ্বসি কন্তাগণকে ঐতিহাসিক অল্পক্রমে অধ্যাত্মোত্তরাধিকারিণী এই বৌদ্ধ ধেরী বা ভিক্ষুণীরা—ইহাদেরই অন্ততমা রূপসী অশ্বাপাতীর বৈরাগ্যময়ী গাথার

কি সুন্দর, সরল ও মধুর বঙ্গাহ্বাদ কবি বিজয়চন্দ্র  
করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়—

“নীল রঞ্জে তুলি দিয়া যেন পটে লিখিত

ক্রমুগল সুন্দর দেখিত

জরায় এখন তথা পেলীগুলি অবনতা

সুন্দরী আঁজ আমি নহি-ত।

উপবনে কোকিলীর মত আমি নিতি-গো

গাহিতাম স্বপ্নের গীতি-গো।

গেছে সে মধুর স্বর, তবু কেন করে নয়

এ দেহের পরে এত প্রীতি-গো।

এমনি তো জর্জর দেহ দুঃখ গেহটি

তার পানে ফিরে চাহে কেহ কি ?

দেয়াল হইতে বরে রূপের প্রলেপ পড়ে

গরবের ধন এই দেহ কি ?”

তাহার অন্তান্ত বৌদ্ধ গ্রন্থের অহ্বাদও তথ্যপূর্ণ ও  
সুপাঠ্য।

বৈজ্ঞানিক বিজয়চন্দ্র ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ  
ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে তাহার  
অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। “Elements of Social  
Anthropology” ও “The Aborigines of the  
Highlands of Central India”—তাহার নৃত্য  
বিষয়ে প্রামাণিক পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার পরিচয় দেয়।  
দুইটাই তাঁর মৌলিক অহুসন্ধিৎসা ও সিদ্ধান্তের স্বাক্ষর  
বহন করে। মোগপুর রাজ-সংসারে যেখানে তিনি  
আইনোপদেষ্টারূপে কর্মজীবনে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে  
থাকিয়া তিনি পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন  
ও সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মধ্য প্রদেশের আদি-  
বাসীদের জীবন ও প্রথাাদি সম্বন্ধে উপরোক্ত সম্বর্ড-গ্রন্থ  
রচনা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ “Chauhan Rulers  
of Sonapur”—তাহার এইরূপ স্থানীয় ইতিহাস-সংগ্রহ

সঙ্কলনেরই নিদর্শন। এইগুলি সমস্তই ইংরাজী ভাষায়  
বিরচিত।

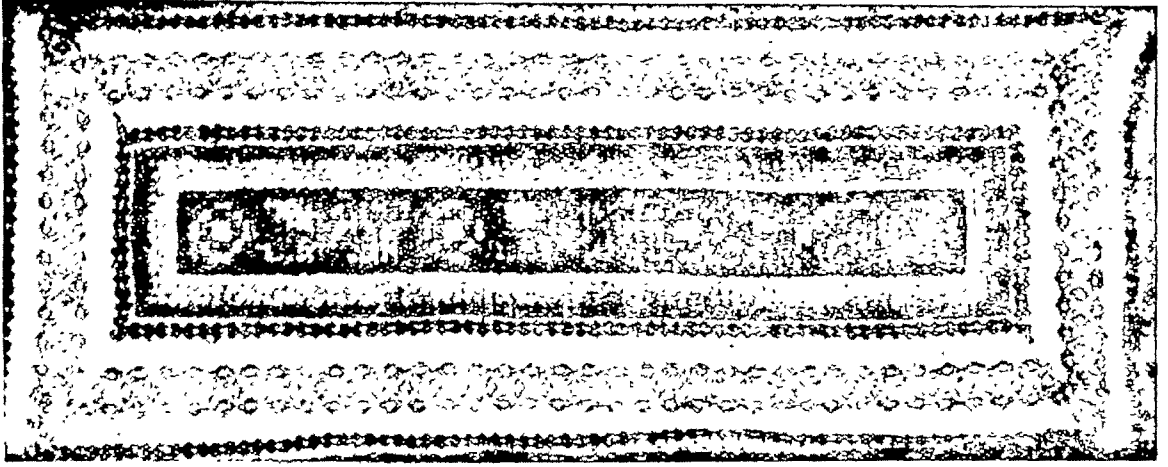
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য্য বিজয়চন্দ্র প্রাচীন  
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।  
ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তাহার “The History of  
Bengali Language”—বাংলা-ভাষা সম্বন্ধীয় তাঁর  
বক্তৃতামালারই প্রকাশিত সংগ্রহ। ইহাতেও তাহার  
মৌলিকতার উজ্জল দিগ্‌দর্শন আছে।

দীর্ঘদিন উড়িষ্যায় থাকিয়া তিনি প্রাদেশিক উড়িয়া  
ভাষাও সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আর,  
আশুতোষেরই প্রেরণায়, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
জ্ঞাত “Typical Selections from Oriya Literature”—নামক ৩ খণ্ডে প্রকাশিত বিরাট গ্রন্থ রচনা  
করেন।

সম্ভবতঃ আর আশুতোষেরই বা তদীয় স্বনামধন্য  
পুত্রগণের অহুরোধে তিনি মনীষী দীনেশচন্দ্র সেনের  
সহিত “বঙ্গবাণী” মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ  
করেন ও উহাকে একটা উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক পত্রিকারূপে  
উভয়ে কয়েক বৎসর সুপরিচালনা করেন।

কবি বিজয়চন্দ্র, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র, ঐতিহাসিক  
বিজয়চন্দ্র, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী বিজয়চন্দ্র, ভাষাবিজ্ঞান  
বিজয়চন্দ্র—সর্বোপরি ঋষিপ্রতিম ধর্মপ্রাণ মনীষী ও ব্রাহ্ম  
বা ত্রয়ী সাধক আচার্য্যবর বিজয়চন্দ্র—এই বহুপ্রাণ ও  
মহাপ্রাণ মানুষকে সেদিন প্রত্যক্ষে, আজ উদ্দেশে তাঁর  
এই জন্ম শতবর্ষে অন্তরের প্রজ্জ্বলি নিবেদন করিতেছি ;  
প্রার্থনা করিতেছি—অনন্ত লোক হইতে তিনি আমাদের  
উপর এই আশীর্ব্বাদ করুন—যেন বাঙালী তাহার ছায়  
মহাভূতব মানুষকে প্রকার সহিত মনে রাখিয়া, চিন্তায়,  
চরিত্রে ও জীবনে সেই শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনারই অঙ্গুষ্ঠ মান  
রক্ষা করিতে পারে। ও শান্তি: শান্তি: শান্তি: হরি: ও।



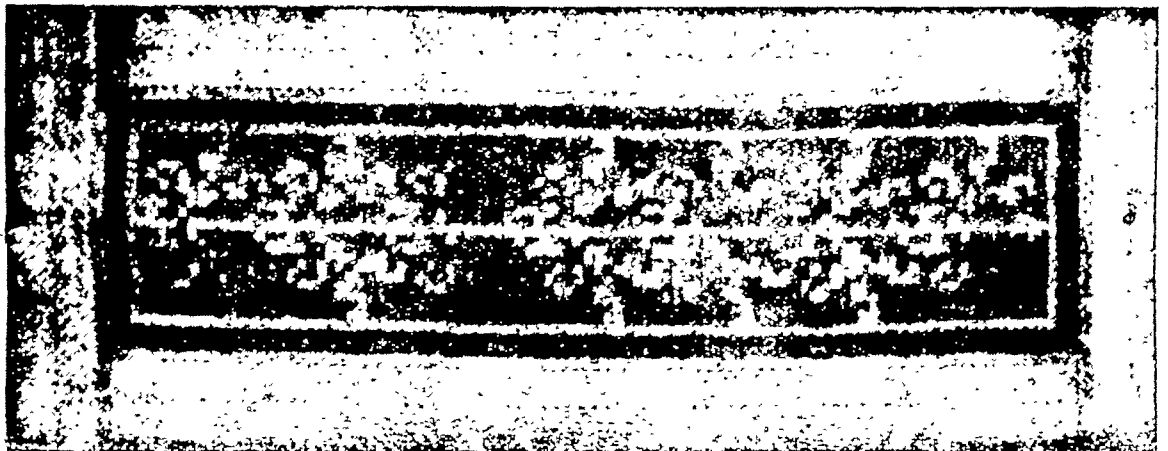


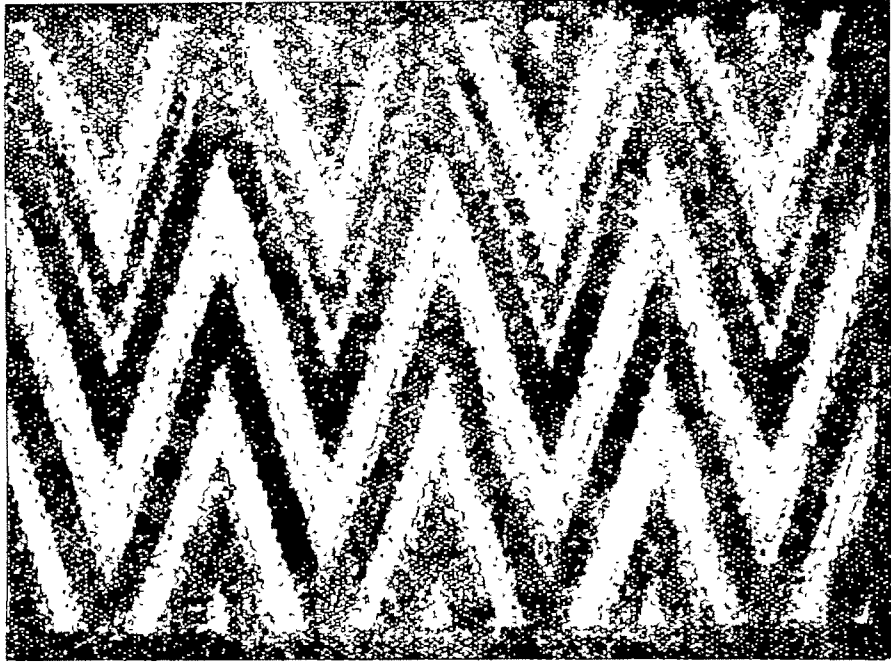
## সতীরাণীর শিল্পশৈলী

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

উনবিংশ শৃষ্ট শতকে এই বাঙ্গলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য দিকপাল প্রতিভাবানব আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কলিকাতার স্ববিখ্যাত সর্কাধিকারী পরিবারের মেজর জেনারল ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্কাধিকারী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ষাঁহার শিল্পশৈলীর পরিচয় প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা, সেই স্বর্গতা সাধনী সতীরাণী ছিলেন ডাঃ সূর্য্যকুমারের পুত্রবধু ও বাঙ্গলা তথা ভারতের ক্রীড়া জগতের স্বনামধন্য পুরুষ, ব্যারিষ্টার শ্রীস্বশীল প্রসাদ সর্কাধিকারীর সহধর্ম্মিনী। খাতা-বিজ্ঞায় অদ্বিতীয় স্বনামধন্য সার্জেন ডাঃ কেশরনাথ দাস ছিলেন

সতীরাণী সর্কাধিকারীর পিতা। অভিজ্ঞাত ও রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবারের কুলবধু, একদা বেথুন বিজ্ঞায়তনের ছাত্রী, সঙ্গীত-নিপুণা, অনন্তসাধারণ শিল্প মণীবার অধিকারিণী এই আদর্শ মহিলা ছিলেন—আদর্শ বধু, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী ও পরম ভক্তিমতী। ইহার সন্তানভাগ্যও অসাধারণ—দ্ব্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিমান চন্দ্র সর্কাধিকারী একজন বিদিতনামা ‘ষম্মা’ (টি, বি) চিকিৎসক, দ্বিতীয় পুত্র বিকাশ চন্দ্র সর্কাধিকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতার চীফ এজেন্ট, তৃতীয় পুত্র বিজয় চন্দ্র (বেবী) সর্কাধিকারী ক্রীড়া বিশ্লেষকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং স্বর্গতা





কল্পা বিজ্ঞানী, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় বিশেষ পরিদর্শনী ছিলেন। যে যুগে এই মহায়দী মহিলা শিল্পকলায় আপন অপূর্ব নৈপুণ্যের দ্বারা দেশ বিদেশের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই যুগে আমাদের দেশে নারীগণের ত' দূরের কথা, পুরুষদেরও শিল্প শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কোনও বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পিতৃকুল ও স্বস্তরকুল, উভয় সংস্কৃতিবান্ অভিজ্ঞত পরিবারের আবহাওয়ায় লালিত, পালিত ও বদ্ধিত সতীরাগীর শিল্পাত্মবাস ছিল—সহজ মৌলিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই অল্পবয়সের বশেই স্বীয় চেষ্টায় শিল্পাত্মশীলনের ফলে

তাঁহার বহুমুখী শিল্প প্রতিভা নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া, ভারত ও বহির্ভারতের বহু শিল্পী ও শিল্পাত্মবাসীগণ মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদা সতীরাগীর শিল্পমনীষাজ্ঞাত • অভিনব-সৃষ্টি শাড়ী-স্কাট লগুন প্যারিসে এক নূতন ফ্যাশানের প্রবর্তন করে।

স্বর্গতা সতীরাগী শিল্পের নানা বিভাগে তাঁহার শিল্পশৈলীর অনন্তসাধারণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই অসাধারণ শিল্পশৈলীর নিদর্শনরূপে তাঁহার-সৃষ্ট শিল্পের মাত্র কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হইল।



## শ্রীশ্রীচণ্ডীর ক্রমবিকাশ

ডাঃ শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার, পুরাণরত্ন, বিজ্ঞাবিনোদ, সরস্বতী

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ব্রহ্ম স্বশক্তি প্রভাবে এই বিশ্ব-জগৎ এবং তদন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থ সকলের ক্রমাগত সৃজন, পালন ও সংহরণ করিতেছেন। কল্পকালে তৎসমগ্র শক্তির কিয়দংশ মাত্র জাগ্রত বা ক্রিয়াশীল হয়। অবশিষ্টাংশ প্রচ্ছন্ন অপরিষ্কৃত বা অব্যাকৃত থাকে। প্রলয়কালে সেই সক্রিয় অংশটিও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিশ্রাম করে। সুতরাং কল্পকালে ব্রহ্ম চেষ্টমান বা জাগ্রত এবং প্রলয়কালে তিনি নিশ্চেষ্ট বা যোগনিদ্রাবলম্বিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। কল্পকালে ব্রহ্মশক্তিপ্রভাবেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড এবং তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত অনন্ত ব্যষ্টি পদার্থের কখনও কাহারও আবির্ভাব, কখনও বা কাহারও প্রাচুর্য্য অথবা তিরোভাব হইতেছে। ইহাকেই সৃজন, পালন ও সংহরণ বলে। কল্পাবসানে যখন সেই ক্রিয়াবতী শক্তির অবসাদ হইতেছে তখন সকল ব্রহ্মাণ্ড তত্তদন্তর্গত ব্যষ্টি পদার্থনিচয় এবং তত্তৎ প্রকাশিত বিভিন্ন শক্ত্যভিব্যক্তি সকলই বিলুপ্ত হয়। কেবল একমাত্র চৈতন্যরূপী ব্রহ্ম স্বশক্তি সংহরণপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। ব্রহ্মের এই অবস্থার নামই যোগনিদ্রা। ব্রহ্মাণ্ড তৎশক্তির আলোচনার জন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মাকে মূখ্য ও শক্তিকে তাহার গৌণ এবং সাংখ্যের মতে শক্তিকে প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাকে বীক্ষণকারী নিশ্চেষ্ট চৈতন্য বা পুরুষমাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্ম ও তৎশক্তি উভয়েই অনাদি অনন্ত এবং পবম্পরে অচ্ছেদ্য। এইজন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ ব্রহ্মকে পুরুষরূপে এবং শক্তি বা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে, উভয়কেই সৃষ্টিস্থিতি সংহৃতির কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।

সগুণ নিগুণ ভেদে বিভিন্ন অবস্থায় ব্রহ্মকেই প্রকৃতিরূপে উল্লেখ্য দেখা যায়। শাস্ত্রকারের নিরুপমা বা মূল কথা এই যে, শক্তি ও শক্তিমান অভেদাত্মক একই পদার্থ, ব্রহ্মেরও পুংস্ত বা স্ত্রীত্ব কল্পনা মাত্র। উপাসকের কচিভেদে একই-ব্রহ্মের বিভিন্ন আকারে পূজা হইতেছে।

কল্পকালে জগতের বিবিধ ঘটনাবলীতে সগুণ ব্রহ্মের

নানা প্রকার সম্বন্ধগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল প্রভাবব্যঞ্জক তাঁহাকে নানা প্রকার আখ্যায় উপকল্পিত হইয়াছে, এই সকল বিবিধ নামের মধ্যে তাঁহার অন্ততম একটি নাম চণ্ডী। আচার্য্য ভাস্কর রায়ের চীকায় দৃষ্ট হয়, চণ্ড শব্দের অর্থ ইয়ন্তারহিত পরিমেষ ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন। চণ্ড শব্দের আর একটি অর্থ ভয়ঙ্কর, কোপযুক্ত ও রক্তভাববিশিষ্ট। উপনিষদাদিতে উক্ত আছে যে, পাপীর সম্বন্ধে তিনি “মহন্তরং বজ্রমুত্তমম্ অয়ং”। তিনি ভয়ঙ্কর উদ্যত বজ্রস্বরূপ।

সুতরাং চণ্ড শব্দে দেশ, কাল ও বস্তুতে ইয়ন্তারহিত, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমেষ, অসাধারণ গুণসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর রক্তধাতুবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্ত্রীত্ব-ভাবে ঐসকল গুণব্যঞ্জক অথচ মাধুর্য্য ও কোমলতাবিশিষ্ট মাতৃভাবসম্পন্ন নামই চণ্ডী। জ্ঞানযোগে এই চণ্ডীদেবীকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। বহু তপস্তায় বহু কষ্টে বা দুঃখে তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, এইজন্য চণ্ডীর অপর প্রসিদ্ধ নাম দুর্গা।

তগবান্ বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ স্বরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহন্তর বর্ণনাকালে ঐষ্টম মনুর উৎপত্তি বিবরণ প্রসঙ্গে যে ত্রয়োদশটি অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে দুর্গা বা চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যই সর্বশেষ, বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়গুলিই স্তোত্রাদি সমন্বিত চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। যামলাদি নানা তন্ত্রেও এই চণ্ডী স্তোত্রে স্বল্লাধিক পরিবর্তিত ভাব দৃষ্ট হয়। তথাপি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডী স্তোত্রে কিঙ্কিন্যূন ছয়শত শ্লোকাত্মক হইলেও অপরাপর বিবিধ স্তোত্রাদি সমেত সমগ্র গ্রন্থকে সপ্তশত মন্ত্রাত্মক বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই জন্যই চণ্ডী স্তোত্রের অপর নাম দুর্গাসপ্তশতী। সপ্তশতী মন্ত্র সম্বন্ধে রচনাগত অনেক রহস্য কাব্যায়ণীতন্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গা হোমে সপ্তশত আহুতি প্রদানের নিমিত্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সপ্তশত মন্ত্রে বিভাগ হইয়াছে, এই কারণে ইহার একটি নাম সপ্তশতী। ইহা মার্কণ্ডেয়পুবাণোক্ত নাম। ইহাতে সাতশত মন্ত্র অথবা ৫৭৮টা শ্লোক আছে।



চণ্ডীর ঘটনাবলীর স্থান সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নন্দদা অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু বাংলাদেশেই চণ্ডীর জন্মস্থান। ভারতবর্ষের প্রচলিত তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গোড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। বরদাতন্ত্রের দশম পটলে বঙ্গাক্ষরের বর্ণনা ও প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বহু সংখ্যক পীঠস্থান বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। প্রধান প্রধান তন্ত্রই বাংলাদেশে উৎপন্ন। চণ্ডী বাংলাদেশে উদ্ভূত এই কথা অস্বীকার করা যায় না। চট্টগ্রাম করালডাঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত মেধা মুনির আশ্রমই চণ্ডী-উক্ত মেধশাস্ত্রম। কুমিল্লা সহরের অনতিদূরে চণ্ডীমুড়া পাহাড়ে ঘটনাস্থল। তথাকার বিকটকায় অশ্বের অস্থিসমূহ অতীতের সাক্ষ্য আদ্যও বহন করিতেছে। স্থিতি-প্রক্রিয়ার বৃত্তান্তগুলি যথাপূর্বক অনুধাবন করিলে জীবাশ্মের পুনঃ সংসাবে গমনাগমন এবং স্থিতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বেশ উপলব্ধি করা যায়। চণ্ডীতে বর্ণিত মাহাত্ম্যক্রমে রূপকচ্ছলে সেই স্থিতি প্রক্রিয়াই জন্মগ্রাহীরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। ক্রমবিকাশ নিয়মে প্রলয়ের কারণ জলরাশি ক্রমশঃ তেজোসম্পন্ন ও ঘনীভূত হইয়া স্থলভূতে পরিণত হইতে থাকে এবং ক্রমে ইহা জলস্ত উত্তপ্ত ধাতুময় তরল অণুকার ধারণ করে। তৎকালে ইহা হইতে ক্রমাগত পুনঃ পুনঃ যে জল ও উষ্ণা উদ্ভিত এবং পরে হ্রস্ব তাপ হইয়া উষ্ণবৃষ্টি বর্ষিত হইত। সুতরাং তখন সেই উত্তপ্ত তরলাণু অল্প কিছুই প্রকাশিত হইতে পারিত না। ইহার সেই তৎকালীন কর্ণমলবৎ উদ্যোতান ও উষ্ণবৃষ্টিই মধু ও কৈটভ নামক ব্রহ্মদেবী অস্বরময় বলিয়া চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে। ভগবৎ প্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক নিয়ম প্রভাবে সুদীর্ঘকাল ক্রমে সেই উত্তপ্ত তরলাণু শীতল হইয়া নারিকেলের মালার স্থায় কাঠিন্দ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন সেই জলস্ত উষ্ণা উষ্ণবৃষ্টিও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উত্তপ্ত ত্র্যয় পদার্থ-সংঘাত কঠিন হইবার পূর্বে কোন একটি স্থল পদার্থ আশ্রয়ের অপেক্ষা করে। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে দৈবধানে পঞ্চ সহস্র বর্ষ যুদ্ধের পর এই মধুকৈটভ অস্বরময় বিমোহিত বা তেজোভ্রষ্ট হইল এবং ইহাদের বধের জন্ত

স্থলের প্রয়োজন হইলে, বিষ্ণু তাঁহার মায়িক জঘন দেশকে কাবর্ণার্ণবের উপরিভাগে উত্তোলন করিয়া তথায় তাহাদিগের বধসাধন করিলেন। তদ্বাদি শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়—

“মধুকৈটভয়ো রাশিষ্মদসৈব পরিপ্লুত।

তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।”

মধুকৈটভের যেনোরাশি দ্বারা পৃথিবী সর্বতোভাবে আবৃত হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে মেদিনী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ক্রমবিকাশক্রমে দ্রবভাবাপন্ন পৃথিবীর উপরিভাগ শৈত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া কাঠিন্দ্য ধারণ করিলে, প্রকৃতির নিয়মে প্রচণ্ড অগ্নি ভূগর্ভে রুদ্ধ হইয়া বেগে বিলোড়িত হইতে লাগিল, এ কারণে ভূগর্ভ মধ্যে স্থানে স্থানে ধরাবরণ ভেদপূর্বক প্রায়ই ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত হইতে লাগিল। এ কারণে ভূমিকম্পোদয় হইয়া পৃথিবীর সমতল ভাগ তিরোহিত হইয়া ক্রমে ভূপৃষ্ঠে উচ্চ পর্বতমালা সুবিস্তীর্ণ সৈকত ক্ষেত্র ও স্থগভীর নদনদী এবং সমুদ্রে পরিণত হইল। সেই সকল অগ্ন্যুৎপাতে ও ভূকম্পে সাগরজল চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বিলোড়িত প্রচণ্ড বায়ুরাশি ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও বাত্যাগ্রবাহ প্রবাহিত করিতে লাগিল। সেই প্রবল বাতায় মেঘমালা ঋণবিখণ্ডিত হইয়া ভীষণভাব ধারণ করিল। সেই সময় ঘোরতর মেঘমালা হইতে অনবরত অশনিপাতে ও ভীষণ জ্বলনির্দোষে পর্বতশৃঙ্গসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অপরিমিত চঞ্চল প্রচণ্ড বায়ুগ্রবাহ জলস্ত ধাতু নিঃশ্রাবের সহিত প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত ও ব্যয়িত হইয়া প্রচণ্ডভাব পরিভাগ করিতে লাগিল। বায়ুর প্রকোপ হাসজনিত মেঘসমূহ শাস্তভাব ধারণ করিল। এই নিয়মে ধরাধাম বাসযোগ্য স্থানে পরিণত হইল। মহিষাসুরের আক্রমণ-বর্ণনায় চণ্ডীতে উল্লেখ আছে—

সোহপি কোপান্নহাবীর্ঘ্যঃ খুরক্ষুঃ মহীতলঃ

শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতান্নুচ্চাংস্কিঞ্চৈচ চ ননাদ চ

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তন্ত ব্যাশীর্ঘ্যত

লাঙ্গুলোনাহতশ্চাব্ধিঃ শুদ্ধি প্রাবয়ামাস সর্বতঃ ॥

মৃতশৃঙ্গাভিন্নাশ্চ খণ্ডং খণ্ডং যযূর্ণনাঃ

শাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুৰ্ভদ্রোহচলাঃ ।

ভূতরমালা আলোচনা করিলে দেখা যায় জীব সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রথমতঃ জীবাত্মা কীটাত্মা, তৎপরে কীট পতঙ্গ জলোকা শুল্কি শস্য প্রভৃতি নির্মল জীবী সৃষ্ট হইয়া তদনন্তর মৎস্য সরীসৃপ বিহঙ্গ পশু প্রভৃতি স্তম্ভদণ্ড জীব ও সর্বশেষে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে যখন ভগবচ্ছক্তি পূর্ণ বিকাশে জীবনিচেষ্টে সৃষ্টির বিধানে সমধিক প্রাচুর্য হইয়াছিল, পৃথিবী তখন মহাবলকায় দুর্দান্ত পরাক্রান্ত ভয়ঙ্কর পশুসংঘাতে সমাকীর্ণ ছিল। ইহারাই মহিষাসুরের সৈন্য ও সেনানী উক্ত হইয়াছে। চিহ্নর, চামর, উদগ্র, মহাহস্ত, অসিলোম প্রভৃতি নামগুলি তৎকালীন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পশুগণের পরিচয় মাত্র। চণ্ডী বা প্রকৃতির যুদ্ধে অস্ত্রের সৈন্যের তাদৃশ অপরিমিত সংখ্যা এবং মহিষাসুরের বিবিধ রূপের পরিবর্তনে ইহাই অল্পমিত হয় যে, তখন ধরাতল এতাদৃশ অগণ্য ভীষণ পশু বা জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। একদল বিনষ্ট হইতে না হইতে অপর দল তখনি বিদ্যমান হইত এবং এক জাতীয় জন্তু বিনষ্ট হইতে না হইতে অপর জাতীয় ভয়ঙ্কর জন্তু দেখা দিত। মৃত্যুর পূর্বে মহিষাসুরের পশুদেহে অর্দ্ধ নরদেহ ইহাই ব্যঞ্জিত করে। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে পশু ও নরের মধ্যবর্তী এক প্রকার দুর্দান্ত নর-জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। শাস্ত্রান্তরেও উল্লেখ দেখা যায়— বিষ্ণু প্রথমে মৎস্য, কূর্ম (সরীসৃপ) রূপে, তদন্তরে বরাহ (অর্থাৎ পশুরূপে) তৎপশ্চাৎ নৃসিংহ (অর্থাৎ নরপশুরূপে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া শেষে বামনাদি ভিন্ন ভিন্ন নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমবিকাশই ভগবৎ সৃষ্টির প্রধান নিয়ম ও আশীর্বাদমূহের তাহাই উপদেশ। জীব অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নবজন্ম লাভ করে।

পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা যখন দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর, তখন পশুগণই ইহার সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার করিয়াছিল, তখন শাস্ত্রশিষ্ট ধর্মপরায়ণ নরগণের অভাবে দেবভাব বিকশিত হইতে পারে নাই। তাহা তখন পশুভাবের প্রভাবে যেন স্বর্গচ্যুত ও স্ব স্ব অধিকারচ্যুত হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে বিবাক করিতেছিল। পরে সর্বশক্তি সমুচ্চরুপা

ভগবচ্ছক্তি আবির্ভূত হইয়া যখন সেই পশুভাবকে স্বীয় বলবীৰ্য্যপ্রভাবে তিরোহিত করিল, তখনই সেই প্রকৃতি বা চণ্ডীদেবীর মহালক্ষ্মী নাম্নী রাজসী অভিব্যক্তি হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

সুদীর্ঘ কালান্তে ধরাতল নরজাতির উপযুক্ত আবাস-স্থল হইলে, ক্রমে ইহা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানুষে পরিপূর্ণ হইল। তখনও বিভাবুদ্ধি ধর্ম প্রভৃতি উচ্চভাবে মনুষ্য অলঙ্কৃত হয় নাই। দৈহিক আকৃতি ও মানসিক প্রবৃত্তিতে পশু হইতে ক্রমান্বয়ে সে শ্রেষ্ঠত্ব উচ্চত্ব লাভ করিল। আদিম অবস্থায় ইহাদের পাশববৃত্তি প্রবল ছিল। উৎকৃষ্ট মানব-প্রবৃত্তিমূহ তখন বিকাশ-উন্মুখ ছিল। কাম-ক্ৰোধাদি রিপুবর্গের প্রাধান্য ও উভেজनावশতঃ মানব পরজীলিপ্সা, কামিনী-রিরংসা, ঐশ্বর্য্যভূক্ষা, অরাতি-জিঘাংসা প্রভৃতি আত্মরিক প্রবৃত্তিতেই চালিত হইত। স্তব্রাং ধর্ম জিজ্ঞাসা, সাধুচিকীর্ষা, পুণ্যালিপ্সা, শাস্তিপিপাসা ইহাদের নিকট অজ্ঞাত অনাদৃত ও কুণ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় মধ্যস্তরে আদিম অবস্থায় মানুষ এইকপ আত্মরিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে দানব অস্ত্র প্রভৃতি জাতিবাচক আখ্যায় অভিহিত করিত। ইহার দোদীপ্তপ্রতাপ মহাবল ও পরাক্রমশালী হইয়া দেবভোগ্য সম্পত্তিসকল বলপূর্বক অধিকার করিত। দেবতাগণকে তাহা বা নিতান্ত হীন অবস্থায় রাখিয়াছিল। ক্রম-বিকাশোন্মুখ ভগবচ্ছক্তিকে বহুতর চেষ্টায় মনুষ্য-সমাজকে আত্মরিক অবস্থা হইতে দিব্য অবস্থায় আনয়ন করিতে হয়। ইহারই নাম চণ্ডিকা দেবীর সহিত নৃশংস-স্বভাব স্তম্ভ নিস্তম্ভের যুদ্ধ। পরিশেষে তাহাদিগের সংহার-পূর্বক জগতে শাস্তি, স্বস্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম ও সদগুণানাদি সংস্থান হয়। ইহাতেই তাঁহার চরম মাহাত্ম্যের প্রকাশ। কয়েকটি আত্মযজ্ঞিক বর্ণনে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রকৃতি বা বৈকারিক সৃষ্টির ক্রমবিকাশের স্তায় মনুষ্য-সমাজ ও তাহাদের সংগ্রাম-নৈপুণ্যের উন্নতি ও ক্রম-বিকাশেরই নিয়ম। প্রথমতঃ সেনাপতি ধৃষলোচন মহাকায় মহাবল এবং মহতী সেনাপরিবৃত ছিল, কিন্তু রণকৌশলে তদ্রূপ নিপুণতা ছিল না। ধৃষলোচন আফালন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু চণ্ডিকা দেবীর হস্তারে সে বিনষ্ট হইল। তদীয় সৈন্যদের দেবী অগ্নায়াসে ধ্বংস করিলেন।

চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধে বর্ণনাকৌশলের দ্বিতীয় অবস্থা।

এই যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড ও তদীয় চতুরঙ্গ সৈন্যসামন্ত বহু চেষ্টা করিয়া নানা প্রকার রণচেষ্টা দেখাইয়াছিল। দেবীকে তজ্জগৎ চামুণ্ডা-মূর্তিতে তাঁহার সর্বসংহারিণী ক্রোধশক্তি প্রকাশ করিতে হইয়াছিল এবং সেই সংহারিণী মূর্তিতে চণ্ডমুণ্ড সসৈন্তে নিহত হয়। রক্তবীজের যুদ্ধবর্ণনা সংগ্রাম কৌশলের তৃতীয় অবস্থা। এই যুদ্ধকালে অসুর-সৈন্য নানা অস্ত্রে সজ্জিত ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইল। দেবীকেও সেই অসংখ্য সৈন্য সংহারে ষথাবিধ শক্তি প্রকাশ, যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দূত মুখে সুরকৌশল চাৰ্য্যপূর্ণ সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ ও উহা অগ্রাহ্য হইয়া মুহূর্তমধ্যে অসুরসমূহ নিপাতেব পর রক্তবীজ সমরাজনে অবতীর্ণ হইল। রক্তবীজের যুদ্ধে আগমনের পশ্চাতে আশ্চর্য্য ব্যাহরচনা, একদল নষ্ট হইলে পুনরায় অপরাধলের আগমন, এইরূপ গুপ্তব্যূহে মনে হয় রক্তবীজের রক্তবিন্দু পতিত হইলে নূতন রক্তবীজ দেখা দেয়। ইহাই চণ্ডিকাদেবীর অদ্ভুত রহস্য। অসুরদের এই অদ্ভুত কৌশল ভগবচ্ছক্তি পুনরায় সংহারিণী তামসী মূর্তি প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে ক্ষণমধ্যে স্বীয় মহাতেজরূপ করালবদনে গ্রাসকরতঃ উদরসাৎ করিতে লাগিল, মহামারী দিগ্‌দাহ, অয়ুঃপাত ভূকম্পন প্রভৃতি যে সকল অত্যাংকট বিশ্বধ্বংসী, আকস্মিক দৈবোৎপাতে দেশ জনপদ সকল মুহূর্ত মধ্যে জনশূন্য ভস্মাচ্ছাদিত বা রসাতলগত হয়, সেই সকল লোমহর্ষণ দৈবোৎপাতই ভগবচ্ছক্তির সেই সর্বসংহারিণী

বিশ্বগ্রাসী ধোর তামসী চামুণ্ডা মূর্তি। যখন কেবলমাত্র কামরূপী শুভ্র ও মোহরূপী নিম্ভুজ ব্যতীত সকল অসুর নিহত হইল তখন দেবী স্বীয়শক্তিপ্রভাবে অসুরসমূহ নিহত করিলেন। তদানীন্তন সর্বপ্রকার উৎপাত নিরস্ত হইয়া জগতে মঙ্গল ও শান্তি স্থাপিত হইল।

ফলতঃ প্রপঞ্চ জগতে দেখা যায়, একমাত্র তেজঃ পরার্থেরই রূপান্তরে বেগ, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তেমন একমাত্র মূল বা সমষ্টি শক্তি নানাবিধ দৈবিক বা আধ্যাত্মিক ও তদীয় অসংখ্য অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, কার্য্য শেষে এই অসংখ্য শক্ত্যাভিব্যক্তি পুনরায় অক্ষুট হইয়া সেই মূল শক্তিতে সংহত হয়। অথচ মূল অথবা শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি পায় না। যে মূলে শক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি সমূহ পবম্পরাপেক্ষী এবং সেই মূল শক্তি স্বয়ং নির্বিকল্পভাবে অবস্থিত। ইহাকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ Co-relation of forces এবং conservation of Energy বলেন। তদ্রূপ আধ্যাত্ম্যে এই মূল শক্তি চণ্ডিকা দেবী বিভিন্ন মাতৃশক্তিতে প্রকাশ করিয়া পুনরায় আপনাতে সংহত করিয়া প্রত্যকৃতঃ স্বয়ং একমাত্র অদ্বিতীয় ভাবে রহিয়াছেন।

[ বঙ্গদেশে 'গুপ্তবতী'-র টীকাকার কৃত রাধাচার্য্যের এই অদ্ভুত রসাত্মক ও রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাটি প্রায় অপ্রচলিত বিধায় সাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত টীকা অবলম্বনে লিখিত হইল—লেখক। ]

## বাণী

### শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

সৃষ্টির মাঝে থাকিবে না কিছু  
থাকিবে বাণী ও বহুধরা  
আমার বলিতে রবোনা তো আমি  
ভবে কেন থাকি গর্কে ভরা ?  
কত স্তম্ভীজন কণ্ঠস্থধার  
গেসে গেলো গান বিশ্ব মাঝে,  
শত সিংহাসন গিয়াছে টলিয়া  
তবু সেই বাণী আজিও আছে,

রয়েছে আজিও গিরি কান্ডার  
মরু, নদ-নদী, সাগর জল  
গগন জুড়িয়া আজো দীপ জালে  
চন্দ্র-তপন তারকাদল।  
মানুষ রয়েছে মানবতা নাই  
হারাসেছে সে মন ও প্রাণ  
জানে না নিশ্চয় সব হ'য়ে লয়  
বাণী শুধু রবে দীপ্যমান।

## দিগন্ত

রংজিৎ ভট্টাচার্য্য

সাইকেল রিকশাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখা হয়ে গেল। পাশ থেকে ডেকে উঠল,—রমেন না!

চমকে ফিরে চাইলাম। একমুহূর্ত খেমে বলে উঠলাম,—সন্তোষ!

একমুখ হেসে সন্তোষ বললে,—চিনেছ দেখছি। অবশ্য না চিনলেও বলবার কিছু নেই। প্রায় এক যুগ পরে দেখা হল তো। তার ওপর আমার এই পোষাক-পরিচ্ছদ! হো হো করে হেসে উঠল সে।

হাসিতে হল আমাকেও। একটা অপ্রস্তুতের হাসিতেই মুখটা ভরিয়ে তুলতে হল।

সন্তোষ বলল,—মাসিমার বাড়ি যাচ্ছ তো। তুমি চল। আমাকে একবার রায়পাড়ায় যেতে হবে। মন দুই মাসের অর্ডার আছে। ডেলিভারিটা দিয়ে আসি। পরে দেখা হবে।

হাসিটা আমার মুখ থেকে তখনও মিলিয়ে যায় নি।

অস্বস্তির সঙ্গে অপস্রম্যমান রিকশাটার দিকে চেয়ে রইলাম। সামনের পা-দানীতে বসানো বড় বাজরাটায় মাছের জুপ। উপরের সিটে সন্তোষ; স্ট্রাণ্ডেল আর আড়ময়লা ধুতি-শার্ট-পরা গ্রাম্যতার ছবি একটা।

যাবেন না বাবু?

রিকশা-চালকের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙে গেল। মুহূর্তে মনটা কঠিন হয়ে গেল আবার। শহরে বড় চাকরী করি। মুখে-চোখে সেই অভিজাত্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল কিনা জানি না। কিন্তু চলনে-বলনে পোষাকে-পরিচ্ছদে যে কোথাও এই অভিজাত মনোবৃত্তির এতটুকু খুঁত নেই, তা আমি খুবই জানি। সন্তোষের সঙ্গে সেরিক থেকে আমার জীবন যাত্রার এবং আমারও তফাৎ নিঃসন্দেহে অনেকটাই। তবুও দীর্ঘদিন পরে তার সঙ্গে এই আকস্মিক সাক্ষাতের ফলেই হয়ত সেই স্বাতন্ত্র্য হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এবং সে কথা ভেবেই মনটা অল্প ধরনের একটা অস্থিতিতে ভরে উঠল। জুঁককে চালককে বললাম,—চল।

স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পথ। রিকশাটা যখন মাসিমার দরজায় এসে পৌঁছাল, একেবারে হৈ হৈ পড়ে

গেল। দীর্ঘদিন পরে আমাকে পেয়ে মাসিমা আর তাঁব ছেলেমেয়েরা হাসিতে কলরবে বাড়িখানা ভরিয়ে তুলল।

বিরাট গ্রাম। বর্ধিষ্ণুও। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ব্রাহ্মণ পাড়া। তারপরই জলে, বাউরি, ডোম, জেলে এইসব অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের বাস। একটা বিরাট দীঘি দুই পাড়ার মাঝে এক হস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে।

দীঘির এ পারেই মাসিমার বাড়ি।

বারান্দায় বসেছিলাম। আনমনা দৃষ্টিটা ছড়িয়ে পড়েছিল সামনে। শাস্ত, নিস্তরঙ্গ জল। তার ও-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কুটীরগুলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ওই দিকে চেয়েই সন্তোষের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাড়াতেই তার বাড়ি। সন্তোষের কথা তুলতেই মাসিমার ছেলে সুনীল বলল,—সন্তোষের সঙ্গে দেখা হল বুঝি? তোমাকে চিনতে পারলে। তার সব কথা জানতো?

সুনীল প্রায় আমার সমবয়সী। মুহূর্তের জন্ত তার দিকে তাকালাম। প্রায় সাত বছর আগের কথা। তবু মনে পড়ে গেল সব। আত্মবিশ্বস্তের মতই বললাম—উমা!

সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল সুনীল। তারপর সরে এসে বললে,—তুমি জানবেই বা কি করে! সন্তোষ বিয়ে করেছে উমাকে।

আশ্চর্যে আশ্চর্য চোখটা মুদে গেল আমার। বুকের মধ্যে একটা বড় উঠেই ধীরে ধীরে শাস্ত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন। তীব্র ব্যাধার বুঝি এমনি হয়! অসহ্য আনন্দেও হয়ত রক্তের মধ্যে এমনি আবেশ নেমে আসে!

মনে পড়ে গেল সব।

আগের দিনই ঘটে গেছে সেই দুর্ঘটনাটা।

সেদিন সন্ধ্যার আধারে আমি ছিলাম একা। ভগ্ন বিকল চেহারা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল উমা। শাস্তস্বরে বলেছিল,—তুমি ফিরে যাও রমেন না! আর আমার সঙ্গে নিজেই জড়িও না। আমার দুঃখ আমাকেই বইতে দাও।

বলেছিলাম,—তোমার দুঃখের ভাগ কিছু নিলাম-ই বা। উমা, আমি বলিনি কোন দিন, আমি তোমাকে—

জানি বৈ কি। আমিও কি তোমাকে কম ভালবাসি! তবু তুমি আর এমো না। এখান থেকে আমাদের যেতে দাও। শান্তিতে যেতে দাও।

হুহাতে মুক ঢেকে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠেছিল সে। পরমুহূর্তে ছুটে চলে গিয়েছিল ক্যাম্পের মধ্যে।

গ্রামের শেষে যেখানে চৌধুরীবাবুদের সিনেমা বাড়িটা আছে, তারও কিছু পরে চুঁচুড়া-হরিপাল রাস্তার ধারেই ক্যাম্প। প্রায় তিন শ' উদ্বাস্তু পরিবারের বাস ওখানে। ওরই মধ্যে মিশে গেল উমা। ফিরবে না সে আর। ফেরাতে পারবে না কেউ। আমি পারব না, স্কুমার পারবে না,—সন্তোষও না।

টিক এই সময়ে সন্তোষের গলা শোনা গেল।

চমকে উঠলাম। চিন্তাটা মুহূর্তে হারিয়ে গেল। কিছু বলার আগেই সুনীল ডাকল তাকে—আয় সন্তোষ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সন্তোষ বললে,—না, বসব না। আমি রমেনকে ডাকতে এলাম। একটু বেড়িয়ে আসব আমরা।

কুণ্ঠিতস্বরে বললাম, কিন্তু রাজে—

সন্তোষ হেসে উঠল,—রাত কোথায়! আর হলেই বা কি। আগে তো কত রাত—

একমুহূর্ত ধামল সে। তারপর মাসিমাকে লক্ষ্য করে বললে,—কাকীমা, রমেনকে নিয়ে যাচ্ছি একটু।

ধামতে হয়েছিল আমাকেও। কিছু বলতে গিয়েও পারিনি। মুহূর্তে চোখের সামনে এক অন্ধকার রাতের একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণার কাহিনী ভেসে উঠেছিল। নিঃশব্দেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। নীরবে সন্তোষের পাশে পাশে চলতে লাগলাম ধীর পায়ে। দীঘি আর সন্তোষের পাড়া বাঁ দিকে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম বাজারের দিকে

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সন্তোষ বলল,—তোমাকে দেখে পুরাণো কথা মনে পড়ে গেল সব। তা ছ'সাত বছর হবে, কি বল?

অস্বস্তিকর মতই বললাম,—তা' হবে।

হঁ, তা হবে। কথাটা যেন আবৃত্তির মতই আর একবার বলল সন্তোষ। তারপর যেন বিধার স্বরে লললে, জান, উমাকে বিয়ে করেছি।

মুখ তুলে শুধু একবার তার পানে চাইলাম। বুকটা একবার তুলে উঠল। স্কুমার যা এড়িয়ে গেল, আমি যা পারিনি,—সন্তোষ তাই করেছে। সে আমাদের সবার উপরে উঠে গেছে যেন। তাকে মহান বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে। অশ্রুচক্রে বললাম,—শুমেছি।

বাজারটা আলোকোজ্জ্বল। বহু দোকানপাট। বাস স্ট্যাণ্ড। রিকশার আড্ডা। কোলাহলে কলরবে মুখরিত। বাজার পেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে রাস্তাটা। আমি জানি এবার আমরা পুলটার উপরে উঠব। অন্ধকারে ডুবে ডুবে একবারে বসব। সন্তোষ কথা বলবে। আমি শুনব।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে রমেন।

অন্ধকারের মধ্যে পিউরে উঠলেও লক্ষ্য করবে না কেউ। আমি জানি—এ কথা আমাকেই শুনতে হবে। আর কেউ শুনতে আসবে না।

সন্তোষ বলে চলল,—তুমি তো জান, স্বাভাবিক অবস্থায় উমা আমাকে বিয়ে করতে চাইত না। একটা কায়স্থর মেয়ে কি জেলের ছেলেকে বিয়ে করতে চায়! বিশেষ করে যেখানে ভালবাসা নেই।

নেই! কিন্তু—

বিচিহ্ন হেসে সন্তোষ বললে,—হাঁ। দেখলে অবশ্য অশ্রুতকম মনে হবে। কিন্তু নিপুণ কর্তব্যপালন আর ভালবাসা তো এক নাও হতে পারে। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে, ও সখী হত। স্কুমারকে ও চায়নি। ঘৃণা করতে তাকে! আর আমি! আমাকে সে দয়া করতে, রমেন। তবু আমিই তাকে বিয়ে করলাম। সেই দুর্ঘটনাই ওকে আমার কাছে এনে দিল। তার আগেই তো তুমি চলে গিয়েছিলে।

আমার মনে পড়ে গেল সব।

আমি, স্কুমার আর সন্তোষ। উমার রূপবহিতে তিনজনই পতঙ্গের মত বললে গিয়েছিলাম। স্কুমার বসত,—ও বাবা, ক্যাম্পের মেয়ে। বলে কিনা কায়স্থ। আচ্ছা, আমিও কায়স্থর ছেলে। কতদিন তুমি আমাদের খেলাও—আমি দেখব।

আমি হাসতাম। আর সন্তোষ চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে মনে হত দেখা করব না উমার সঙ্গে। কিন্তু থাকতে পারতাম না। দেখা করতাম। পথের ধারে, দীঘির পাড়ে অথবা খালের বাঁধে। কখনও দল বেঁধে। কখনও একা।

একদিন বললে, চলে যাচ্ছি এবার। পুনর্বাসন হচ্ছে আমাদের। আর তোমাকে জালাব না।

উত্তর দিলাম না। তাকিয়ে রইলাম শুধু।

শোন, তুমি ওদের সঙ্গে আস কেন? একা আসতে পার না!

বললাম,—কেন?

কেন আবার। এমনি। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে, বুঝলে।

বুকটা আমার আবেগে তোলপাড় করে উঠল।  
একমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল উমা। তারপর হঠাৎ ফিস  
ফিস করে বললে,—ভীক কোথাকার!

খিল খিল করে হাসকে হাসতে দৌড়ে গিয়েছিল সে।

মনে পড়ে গেল সব।

আর সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণার কাহিনীটাও মনে পড়ে  
গেল। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা করেছিলাম  
উমার সঙ্গে। ভগ্ন বিধবস্ত গ্রানিমাখা চেহারা। উদাস  
চোখে যেন দৃষ্টি নেই। আগের রাতেই দুর্ঘটনাটা ঘটে  
গেছে। রাতের অন্ধকারে একটা নির্মম পাশব-কৃষ্ণা  
ঝাপিয়ে পড়েছে তার উপর। তুলে নিয়ে গেছে ক্যাম্পের  
এলাকার বাইরে।

সব বলেছে উমা। আমাকে বলেছে সব। তারপর  
বিচলিত অথচ মিনতির স্বরে বলেছে আবার,—তুমি  
ফিরে যাও রমেনদা। তোমাকে—তোমাকে আমি—  
না। তুমি যাও। আর এসো না। এখান থেকে  
আমাদের যেতে দাও। শাস্তিতে যেতে দাও।

দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছিল উমা।

শুধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। নামটা কাণে বাজছিল  
থেকে থেকে। স্বকুমার! স্বকুমার এমন করল!

\* \* \*

যাওয়া হল না উমার।

সন্তোষ বলে চলল। আলোকোজ্জ্বল বাজারের দিকে  
চেয়ে বলে গেল তার কথা। নিবিড় মমতার স্পর্শে ওর  
কণ্ঠে যেন একটা ব্যঞ্জনা জেগে উঠল। অন্ধকারের স্তব্ধতার  
স্তনে চলি সে কথা।

যেতে পারল না উমা।

প্রার্থনা নিয়ে একটা বিপুল বাধার মত দাঁড়িয়েছিল  
সন্তোষ। উমা বললে,—আমি মরে গেছি। আবর্জনা  
হয়ে গেছি। বইতে পারবে তুমি!

বেশী কথা বলেনি সন্তোষ। বিচित्र হাসি ফুটে  
উঠেছিল তার মুখে। বলেছিল,—আবর্জনা আমিও।  
তুমি যদি পার, আমিও পারব।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখছিল উমা। কাঙাল মানুষটার  
এ এক নতুন চেহারা। এরা ফেলতে জানে না, বইতেই  
জানে। একটা আকস্মিক আবেগে মাথাটা ঘুরে গেল  
উমার। চোখ দুটো মুদে গেল আস্তে আস্তে। কল্পিত  
অশ্রুটকণ্ঠে শুধু বলতে পারল,—বাবাকে বল।

তারপর শুধু উমা; শুধু সন্তোষ। উমা আর সন্তোষ।  
চৌধুরী বাবুদের সিনেমার বুকিং ক্লার্কের চাকরী ছাড়তে

হয়েছে সন্তোষকে। কঠিন কণ্ঠে উমা বলেছে,—বামুন-  
কায়েতের মত অপরের গোলামখানায় তোমাকে চাকরী  
করতে দেব না আমি!

তবে!

জাত-ব্যবসা কর তুমি—

বিপুল বিশ্বয়ে সন্তোষ বললে,—সে কি। ম্যাটি ক'  
পাশ করে—

উমা অধীর হয়ে বললে,—ই্যা। এই আমার শেষ কথা।

সন্তোষ আর উত্তর দিল না। চেয়ে রইল শুধু। উমার  
মুখ সহসা একটা শাস্ত হাসিতে ভরে গেল। জ্বলে টলমল  
করে উঠল দু'টি চোখ। আস্তে আস্তে সন্তোষের বুক  
মাথাটি রেখে ধরা গলায় বললে,—আমার এই সাধটুকু  
মেটাতে দিও গো। আমরা বামুন হতে চাইনে, কায়েত  
হতে চাইনে। তুমি জেলের ছেলে। তুমি তাই হও।  
আমাকে জেলের বো হয়ে থাকতে দাও।

\* \* \*

সামনের রাস্তা দিয়ে ঝড়ের মত একটা বাস চলে  
গেল। মুহূর্তের জ্ঞাত অন্ধকার ত্রিভুজ আলোকিত হয়ে  
উঠল। সন্তোষ বললে,—হরিপাল থেকে লাস্ট বাস  
এসে গেল।

চোখটা মুছে আস্তে আস্তে বললাম,—চল।

চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সন্তোষ। থেমে থেমে  
বললে,—কিন্তু, উমার সঙ্গে দেখা করবে না।

দুদপিণ্ডটা ধক করে উঠল একবার।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—না, না, আজ থাক।  
কাল—কাল—কাল দেখা করব—

সন্তোষও বললে, সেই ভাল।

কিন্তু আমি জানি কাল দেখা হবে না। কোনদিনই  
না। কাল ভোরের বাসেই চলে যেতে হবে আমাকে।  
তারপর ট্রেন। তারপর শহর; আমার চাকরী, আমার  
সমাজ—আমার নিজস্ব জীবনযাত্রা। আজকের এই  
বিচিত্র রাজির পর আর থাকা যাবে না এখানে। ভোরের  
বাসটা যখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে তখনও ভুলতে  
পারব না। মনের আকাশে শুকতারার মত দপ দপ করে  
জ্বলতে থাকবে উমার কথা, সন্তোষের কথা। তখন হয়ত  
পূর্ব দিগন্তে চেয়ে চেয়ে প্রার্থনা করব: যারা ব্রাহ্মণ হতে  
চাইল না, কায়স্থ হতে চাইল না; যারা জেলের ঘরে  
জেলের মত হয়ে, জেলের বো জেলেনী হয়ে সাধ মিটিয়ে  
থাকতে চাইল,—তাদের গর্ব, তাদের অহঙ্কার যেন  
কোনদিন চূর্ণ না হয়!

# মহাপুজা

## মহাপুজা ও বাঙালী :

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের দেবীস্তুতে দেবীতত্ত্ব এইভাবে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে :

অহং স্তবে পিতরমস্ত মূৰ্দ্ধন

মম যোনি অপরপসন্তঃ সমুদ্রে ।

ততোবিত্তিষ্ঠে ভুবনান্ন বিশো-

তামুং ছাং বস্মোনোপস্পৃশামি ।

‘আমি পরমাত্মরূপে সর্বকারণের কারণ হইয়া অবস্থিত, বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যরূপে সৃষ্টির মধ্যে অস্থপ্রবিষ্ট, মহামহিমা দ্বারা সমস্ত বিশ্ব আমার জ্যোতিতেই জ্যোতিমান ।

এই দেবীই বেদ-তন্ত্র-পুরাণ বন্দিতা । চণ্ডীতে ইহারই মহিমা ব্যাখ্যাত । এই দেবী “একৈবাহং”, “দ্বিতীয়া কা মমাপরা” । উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীয়ম্” তত্ত্বই দেবীতত্ত্ব । একই তত্ত্ব নিগূর্ণ ব্রহ্মরূপে এবং ‘গুণাশ্রয়ে’ ‘গুণময়ে নারায়ণী দেবীরূপে কথিত । ভগবান ভগবতী শব্দে শব্দিত হইলেও স্বরূপতঃ বস্তুতঃ অভেদই । নিগূর্ণ উপাসকের ব্রহ্মই ভক্তের মা ব্রহ্মময়ী—সৎ-চিং-আনন্দরূপিনী । স্বরূপ লক্ষণার অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তটস্থ লক্ষণায় চিদৈশ্বর্যময় বিভূতি আচ্ছাদিত হইয়া শক্তিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন । তখনই তিনি দেবী আত্মাশক্তি, জীবের আত্মাঙ্গননীকরূপা শরণাগতপালিনী । সন্তানব্রতী বাঙালী এই দেবীকেই দশভুজধারিণীরূপে হৃদয়ার্ঘ্য নিবেদন করে :

শরণাগত দীনান্দ পরিজ্ঞাপ পরায়ণে

সর্বস্তুার্থি হরে দেবী নারায়ণি নমোস্তুতে ।

সর্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে

শরণ্যেতদ্বকে গোঁরী নারায়ণি নমোস্তুতে ।

বাঙালীর মাতৃসাধনা ও সিদ্ধি আরও অগ্রসর হইয়া পরিপূর্ণ মাতৃতত্ত্বকে পরিক্রমা করিয়াছে । চণ্ডীর “নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ”—এই চারিবার মাতৃপ্রণামের যথার্থ সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই গর্ভধারিণী মাতা, ধরিজী মাতা, বিশ্বমাতা, সর্বকারণ কারণরূপা মায়ের বন্দনা

গাহিয়াছে । তাই বাঙালী বলিতে পারিয়াছে “জনন জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরিয়সী” । এই মুন্সায়ী দেশমাতৃকা চিন্ময়ী হইয়া তার চোখে প্রতিভাত হইতে পারিয়াছে । দেশজননীৰ আধারে আধেয় মাতৃতত্ত্ব সামগ্রিকভাবে বাঙালীর কাছে বিগ্রহাঙ্কিত । বাঙালীর ব্যাপক বিশ্বগ্রাসী জাতীয়তার জন্ম এই মাতৃতত্ত্বই । তাই নবযুগের ঋষি বস্তুমচন্দ্রের কর্ণেও ধ্বনিত হইতে শুনি “ধরণীঃ ভরণীঃ মাতরম্” । বাঙালীর এই মর্ম্ম রবীন্দ্রনাথের ছন্দেও অভিব্যক্ত হইয়াছে :

“রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শক্তি

ধরেছে আমার কাছে জননী মুরতি” ।

বাঙালীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি, দেশসাধনা এই স্বাবব জন্ম সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত মাতৃমূর্ত্তিতে একাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । বাঙালীর সাধনা জীবন ও জগৎ হইতে পলাইয়া মুক্তি-মোক্ষ-নির্কারণের তাই পথ ধরে নাই । সে চাহিয়াছে এই জীবন ও জগৎকে নব-নব রসে, তাবে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করিতে । তার বিশ্বাস ও দর্শন এই চলমান বিশ্বভূবন, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখময় বন্ধ-সংঘাত-তরঙ্গের তলে-তলে আনন্দময়ী, মঙ্গলময়ী মাতৃকরূপা-পীযুষধারা নিত্য প্রবহমানা । ‘সর্বং বস্তুদং ব্রহ্ম’ । কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, গিরি-নদী, বক্ষ-রক্ষ, দানব-মানব, খেচর-ভূচর, জানা-অজানা সবই জগন্মূর্ত্তি মায়ের সন্তান সন্তান ।

আজিকার আত্মবিশ্বত বাঙালী-মানস-যে অবর চেতনার স্তরে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা আমাদের স্বনীর্ঘ সাধনা ও মিশনের মর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছি । শ্রীঅরবিন্দের কথায় “The life you lead conceals the light you are” বিশ্বমানবের একটা নবজন্মের সন্তানবানকে সফল করিয়া তুলিবার মত জীবন-দর্শন বাঙালী উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে । মানব অভ্যুদয়ের এই পরম পথ যদি বাঙালী আজিকার হিংসার উন্মত্ত পৃথিবীতে প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই কবীন্দ্রের কথা সার্থক হইবে : “নিখিল জগৎ আসে তোমারই পশ্চাতে ।” বাঙালীর মহিমায় সেদিন বিশ্ববাসী বিশ্বিত হইবে, হইবে প্রভাসিত । সঘৎসরের এই মহাপুজার সন্ধিক্ষণে বাঙালীকে তার এই মহান ব্রতে সচেতন দেখিতেই আমরা আশা করিব ।

# সাময়িক

## মীরাবাই আবির্ভাবোৎসব :

মীরা বাণী প্রচার মন্দির'-এর উদ্যোগে বারানসীতে ১২ই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত চারি দিন বাণী 'মীরাবাই আবির্ভাবোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এ্যাডভোকেট শ্রীদেবীনায়াগজী বিদ্যাসাগর সভাপতিত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণ পূজা, ভোগ, আরতি, কীর্তন, ভজন-গান, ভাষণ ও প্রবন্ধাদি পাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই উৎসব সুষ্ঠু ভাবে ও সাক্ষ্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহু ভক্ত-নরনারী, সাধু-সন্ন্যাসী ও বিদ্বজ্জন এই উৎসবে যোগদান করেন। পাঁচাত্তোর বস্ত্র সর্পসভা সভাপতির অঙ্ক অধিকরণে উদ্বারগামিতার দিনে ভক্তিমতী মীরা বাণীর জীবনালেখ্য, তাঁহার ভাব ও ভাবনা, জাতির মানস-পটে তুলিয়া ধরিবার যে বিশেষ সার্থকতা আছে—ইহা অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে মীরাবাই গ্রন্থ প্রণেতা ও 'মীরা বাণী প্রচার মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোমকেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিনব প্রচেষ্টা ও অনন্তসাধারণ উদ্যম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

## শ্রীশূলপ্রসাদ :

'প্রবর্তক'-এর চির-সুভামুখ্যারী ও হৃদয় শ্রীশূলপ্রসাদের সর্বাধিকারী বর্ধমান আদিনি ৮৫ বৎসরে পরার্ণব কবিলেন। ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া তিনি প্রধানতঃ খেলা ও সাংবাদিকতার অন্তর্নিয়োগ করেন এবং সে সাধনার সমুচ্ছল চিহ্ন তাঁর প্রতিভাসীল জীবনের দীর্ঘ-পথ বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এই বয়সেও তাঁর স্মৃতি ও মেধা এতটুকুও যে হ্রাস হয়নি তাঁর সাক্ষ্য প্রবর্তক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আজও বিদ্যমান। বিশেষভাবে জীড়া-জগতে ও জীড়া-সাহিত্যে শূলপ্রসাদের অবদান আজও অনতি-ক্রমণীয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে শূলপ্রসাদের আত্মজ্ঞ আন্তর্জাতিক জীড়া-সমালোচক বেরী সর্বাধিকারী তাঁরই যোগ্য অধিকারী। সমাজ-সেবী, স্বাধীনতা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিমাংক হিমাবেনেও শূলপ্রসাদ

স্বরণীয়। আমরা প্রবর্তকের এই অকণ্ট পৃষ্ঠপোষক শ্রীসর্বাধিকারীর নিরাময় শতাব্দী কামনা করি।

## পরলোকে হিমাংকুমার রাবচৌধুরী :

বেঙ্গলুরিয়া নিবাসী প্রখ্যাত ইন্ডিয়ান হিমাংকুমার রাবচৌধুরী ৭০ বৎসর বয়সে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন কাড়াপাড়ার (খুলনা-বাগেরহাট) প্রসিদ্ধ উপসমানন্দ বহু রাবচৌধুরী বংশজ। মৃত্যুর বারো বৎসর পূর্বে কর্তৃত্বগত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বহুমুখী সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। কর্তৃত্বগত হইতে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি



হিমাংকুমার রাব চৌধুরী

দেশ ও আমেরিকা পবিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। বিগত ১২ বৎসর ধরিয়া তিনি শিক্ষামূলক ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে 'সমাজ শিক্ষণ সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে অগ্রণীয় করিয়া রাখিবে। 'প্রবর্তক' বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনি সহঃসভাপতি ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন মানসে তাঁহার হৃদয়স্থিত পরিকল্পনা ছিল। বেল-ঘবিধা উচ্চ বিদ্যালয়, ছাত্রমঙ্গল সমিতি, মহাকালী পাঠশালা, বাণী

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেনসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

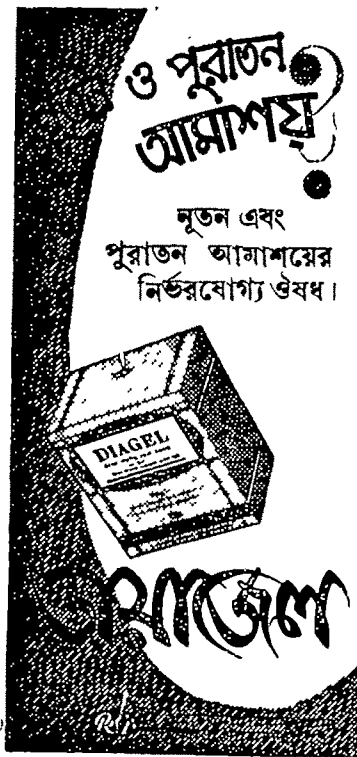
**কারিকা পেন্‌টল**

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।



মন্দির প্রতিষ্ঠা শিক্ষা, ব্যায়াম, পাঠ্যপুস্তক ও সমাজ সেবামূলক বহু ও বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সংগঠনীয় বুদ্ধির সাক্ষ্য বর্তমান। কিন্তু এ সকলেরও উর্দ্ধে বাহা তাঁহাকে অমরীয় করিয়া রাখিবে তাহা তাঁহার চূড়ান্ত মনুষ্যত্ব। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিনয় ছিল অসাধারণ। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে “বিদ্যা দদাতি বিনয়ঃ” ইহা মনে না হইবা পারিত না। সাহেবি-পরিচ্ছদে ভূষিত এই নিরঙ্কর, ধীর, নম্র ও পরহুঃখকাতর পুরুষের অন্তঃকরণটি ছিল খাঁটি বাঙ্গালিদের ঐতিহ্যে ভাষ্য। তাঁহার জীবনব্যাপী, পরিচ্ছদে, ব্যবহারে ও ভাষণে একটা বিশিষ্ট আভিজাত্য ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু উচ্চতা ছিল না। তিনি বিস্তারিত ছিলেন এবং সে বিস্তারিত তিনি দানের মাধ্যমে অগণিত জন-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও দরিদ্রের হুঃখ বিমোচনে নীরবে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্ভ্রমের নীকা লাভ করিয়া শেব জীবনে শাস্ত্রাশ্রমলীনে মনোনিবেশ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি একটিমাত্র পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।



তাঁহার চারিটি কন্যাই বিদ্বতী। পুত্র শ্রীমান মিলীশকুমার উচ্চ-শিক্ষিত এবং বর্তমানে তিনি একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। আমরা আমাদের এই অমূল্য স্মৃতির বিদেহী আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করি।

### সতীরাণী সর্বাধিকারীর ৭২তম জন্মতিথি উৎসব :

মেজর জেনারেল ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর পুত্রবধু, দেশবিশ্রুত খ্যাতবিদ্যা বিশারদ ভাঃ কেদারনাথ দাসের কন্যা এবং ‘প্রবর্তক’-এর অন্তরঙ্গ চির-স্বস্ত ও নিয়মিত লেখক, দেশ-বিদেশের জীবাশ্মগতে প্রখ্যাত পুরুষ, ব্যারিষ্টার শ্রীমশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর স্মরণার্থে সহ-ধর্মিণী, স্বর্গতা সতীরাণী সর্বাধিকারীর ৭২তম জন্মতিথি উৎসব শ্রীল-বাবুর বালিগঞ্জস্থিত বর্তমান বাসভবনে গত ১৮ই ভাদ্র অনাড়ম্বর সাধিকতার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। স্বর্গতার স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধু, পৌত্র ও পৌত্রীগণের সমাবেশে, এক আবেগ-গভীর, পুত্র পরিবেশের মধ্যে এই অগুষ্ঠান হুস্পন্ন হয়। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, স্বর্গতার প্রিয়-বাল্যসান্নিধ্য অন্ন নিবেদন; তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী তলপতচিহ্নে এই নিবেদন কার্য সম্পাদন করেন। পরদিন এই উৎসবের সাক্ষ্য অগুষ্ঠানে কীর্তন, স্তোত্র-সঙ্গীত, রামপ্রদাহী, বাউল ও বেহতর বিষয়ে অক্ষাত পান গীত হয়। কীর্তন-গানে স্বর্গতার পুত্রবধু ও পৌত্রবধুরা অংশ গ্রহণ করেন। কথেকল্পন খ্যাত বেডিও তারিঙি এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ গীটার বাদক শ্রীমুকুলচন্দ্র দাসও (সতীরাণীর ভ্রাতৃপুত্র), এই অগুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীতে ও যন্ত্র-বাদনে সমাগতজনকে মুগ্ধ করেন।

### পাশবিকতা ও মানস্তুত্ব :

মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, জীবদেহের প্রতিটি কোষে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে। বাহ্যিক সংঘাত তাহার সেই প্রবৃত্তিকে জাগরিত করিবা জীবকে কর্ণে প্রবৃত্ত করে। জীবের বা কিছু বাহ্যিক কর্ম তাহার সমস্তই লীন-প্রবৃত্তিরূপে দেহের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের এ সকল শিক্ষান্ত মানুষের ক্ষমতা পশুর উপর তাঁহাদের পরীক্ষা অনেক কম, স্মৃতি একটি ঘটনার যেখিত্তি, পশুর মধ্যে যে ত্রিবাংগ-বৃত্তি থাকে লীনভাবে, তাহা মানুষেরই মত। বনপ্রাসাদের সংবাদে প্রকাশ ফিব্রী নামে একটি গরলা একটি ছুরত্ব পাড়ীর ছদ্ম দোহন করিত এবং একদল তাহাকে ঐ পাড়ীর পা বাধিতে হইত। কিন্তু একদিন অসতর্ক মুহূর্তে সে উহার পা বাধিতে ভুলিয়া গেল এবং পাড়িটি শিং ধারা ভঁতাইয়া এই প্রবীন গরলাকে হত্যা করিল। গরলা বহু চেষ্টা করিয়াও পরিজ্ঞান পায় নাই। গৃহপালিত পশুর মধ্যে এইরূপ আক্রোশপ্রবণতা কিন্তু খুব কমই দেখা যায়।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

### সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিণ্টিং এন্ড হাফটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২৩, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিষ্ঠরায় কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

— তুমি বৃহত্তর উপাসক। বৃহৎ হ'তে হ'লে নির্গত-কলুষ হ'তে হ'বে। নির্গত-কলুষ না হ'লে বৃহৎ হওয়া যায় না। ভগবান লাভ হয় না। যত সংস্কার ও কামনা সব ভগবানে নিবেদন কর। কার্পণ্য রেখ না। দেহ ও মনের ধর্মে, সাধারণ মানুষের মত হৃৎ-হৃৎ-ধ্বনির ঝড়ে চঞ্চল হয়ো না। অসাধারণ হও। অচঞ্চল গতি লাভ কর। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই হোক তোমার স্বরূপ। কেবল নিজের মধ্যেই তাঁকে দেখার স্বার্থ রেখো না, অপর সকলের মধ্যেও দেখতে শেখ—তবেই নিষ্কামিণীর যে আনন্দ, সেই আনন্দলাভ করবে। পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম ও ঐক্য তা এই আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই দিক্ হবে। যে ধারা পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরে; তার প্রাণ অক্ষুরন্ত এবং অনাহত—তাই তো নিয়ত প্রবাহে কঠিন পাষাণ-গাজ বিদীর্ণ করে, সে সমতল ধরণীর বুকে বয়ে এসে ধরণীকে স্ত্রামলা ক'রে অনন্তের দিকে ছুটে যায়। এমনই উৎসর্গের মধ্যে প্রাণ যখন জাগে, উৎসারিত হয়, তখন সে অলস উদ্ধার গ্রাস ছুটে চলে—কোন বাধা সে মানে না, তার কাছে বাধা বলতে কিছু থাকেও না—অব্যর্থ লক্ষ্য পথে সে ছুটে এগিয়ে চলে দিক্‌বিদিক আলোকিত করে। লক্ষ্য কি? বৃহৎ হওয়া, ভগবানকে পাওয়া। ভগবানকে পেতেই তো তোমার জন্ম, তাঁকে পাওয়াই তো তোমার সবখানি পাওয়া। তবে? দৈন্ত দূর কর। হৃৎ-ধ্বনির বেদনায় চঞ্চল হয়ো না। যদি না পাও তবে তুমিই তো তার অঙ্গ দায়ী—চক্ষু থাকতেও অন্ধ। ক্লান্ত অহংকার ও কামনা আশ্রয় ক'রে বৃহৎকে পাওয়ার ছলনায় মন্দির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ, তোমাকে বঞ্চিত হতে হবে বৈকি? অহংকার ছাড়। কামনা ত্যাগ কর। নিজেকে শূণ্য কর। তাঁর রূপের আলোয় তোমার সবখানি ভরে যাক। তোমার পদাঙ্ক হতে কেশাগ্র পর্যন্ত তাঁর আনন্দঘন মূর্তির আধারে অঙ্কিত হ'য়ে যাক। তোমার শোণিত তরঙ্গ ভাগবৎময় হ'য়ে সর্বদা নেচে ছুটুক। তোমার নিঃশ্বাস প্রাণসে “তুঁহ তুঁহ” ধনি উঠুক। তুমি নেশার মানুষের মত শুধুই তাঁতে ডুবে থাক। ওরে আনন্দের সম্ভান! সেই আলোর দিশারীই তো সব—সেইতো সকলের জীবন। তাঁকে শুধু তাঁর মাঝেই দেখা নয়, নিজের মাঝে, সকলের মাঝে দেখতে হবে, তবেই মুক্তি, তবেই পাওয়া সার্থক!

সজয়গুরু শ্রীমতিলাল

( ১৯৩৩ সালের দিনলিপি হইতে সংকলিত )

# বিজয়ার বাণী

মহর্ষি প্রেমানন্দ

মাটির লালসে মত্ত অস্তর বাকুল  
জীবনের ভিত্তি ভেদি জাগিতেছে ভুল  
স্বরূপ সরমে কাঁদে—  
শ্রুতিহীন মহানাদে  
অ-স্বর পঙ্খিল পথে নেমেছে ধরায়  
বাকপ্রবাহ শ্রুতিহীন স্বীয় মহিমায় ॥

আত্মিক ব্রহ্মাণী শক্তি লাক্ষিত্যে রৌরবে,  
পথ রেখা উত্তরীচে ‘আমিত্ব’ গৌরবে,  
বিভক্ত অম্বর তাপে  
শ্রুতমণি ধরণী কাঁপে  
হৃদিতলে সিংহ-শক্তি স্থপ্তিতে অচল  
গণেশের পূজাবেদী হ’ল টলমল ॥

পালনের প্র-হরণ ম্লান হ’ল লাজে  
সেই করে সময়ের ডমরু যে বাজে  
ত্রিধ্ব ত্রিধামা-ত্রাসে  
সুপাণ আধারে গ্রাসে  
বিজয়ায় সময়ের নিষ্ঠুরতা নাশি  
রূপান্নাত চিত্তখানি উঠুক উদ্ভাসি ॥

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমঃ মণ্ডলঃ । পঞ্চত্রিংশং সূক্তং । ) একাদশী ঋক্

( মন্ত্যগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

যে তে পহ্না সবিতঃ পূর্ব্যাসোহরণেবঃ সূকৃতা অস্তরীক্ষে ।

তেভিনো অদ্য পথিভিঃ সূগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ক্রহি দেব ॥ ১১ ॥

অর্থ—“সবিতঃ” ( হে সবিতৃদেব ) “অস্তরীক্ষে” ( অস্তরীক্ষলোকে ) “সূকৃতা” ( সুসম্পাদিতা ) “যে” ( যে সকল ) “পূর্ব্যাসঃ” ( চির প্রসিদ্ধ ) “অরণেবঃ” ( স্থানির্খল ) “পহ্নাঃ” ( পথ সকল ) ( অস্তি—আছে ) “তেভিঃ” ( সেই সকল ) “সূগেভিঃ” ( সূগম ) “পথিভিঃ” ( পথ দিয়া ) [ আগত্য—আসিয়া ] “অজঃ” ( আজ ) “নঃ” ( আমাদের ) “রক্ষ” ( রক্ষা করুন ) “চ” ( এবং ) “দেব” ( হে দেবতা ) “নঃ” ( অর্চনাকারী আমাদের ) “অধি” ( সহিত ) “ক্রহি” ( বলুন ) ॥ ১১ ॥

সরলার্থ—হে সবিতৃদেব! অস্তরীক্ষে আপনার সু-সম্পাদিত যে সকল চির প্রসিদ্ধ স্থানির্খল পথ আছে, সেই সকল সূগম পথ দিয়া আসিয়া আপনি আজ আমাদের রক্ষা করুন এবং হে দেব আমাদের সহিত আলোচনা করুন ॥

বিশদার্থ—পঞ্চত্রিংশং সূক্তের সমাপ্তি ঋক্ ইহা। যে দেবতার স্তুতি সূক্তের আদিতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দেবতার সহিত এক ও অভিন্ন হওয়ার আকৃতি এই শেষ ঋকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দেবতা সবিতৃদেব— যিনি নির্খল, ভাস্বর, চিরোজ্জ্বল। যার উদয় নাই। অস্ত নাই। যিনি নিত্য শাস্ত্র অনন্ত অসীম। যিনি পরিপূর্ণ সংচিং আনন্দময় বিগ্রহ। দৃশ্যমান সূর্য্য তাঁহার অংশ—পূর্ণ সূর্য্যেরই একাংশের বহিঃপ্রকাশ। “শাখাচন্দ্র ত্রায়ের” ত্রায় অংশকে দেখাইয়া, অংশীতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিতে ঋষি আদিতে দৃশ্যমান সূর্য্যের গুণ, কর্ম এবং একাংশের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর শেষ তিনটি ঋকে পূর্ণ সূর্য্যের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ অংশের উপাসনায় আংশিক সিদ্ধিই লাভ হয়, পূর্ণের প্রাপ্তি ঘটে না। ঋষিরা চান পরিপূর্ণ দেবহিত জীবন—সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন। যজ্ঞরূপ কর্মের দ্বারাই তাঁহারা অংশ পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় দেবতার সহিত যুক্তি-প্রার্থী।

## পাশ্চাত্য নাটক—ইভসেন থেকে এলিয়ট

অধ্যক্ষ ফণিভূষণ বিশ্বাস এম. এ.

নাটকই জাতীয় মানসের প্রচ্ছবি। নাটকের মাধ্যমেই পাওয়া যায় জাতির পরিচয়। সেক্সপীয়ারের এই মন্তব্যটি খুবই অর্থপূর্ণ। প্রথমতঃ জাতীয় অভিরূচি ও গণ-মানসের সমীক্ষা চলে রঙ্গালয়ের জন-সমাগম থেকে। দ্বিতীয়তঃ জন-মানসের সাহিত্য-রুচি ও মনোধর্মের নিদর্শন মেলে মঞ্চস্থ নাটকের জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে। সাধারণ দর্শকের চাহিদার মান কতটা উন্নত হয়েছে, জনপ্রিয় নাটকের কষ্টি-পাথরেই হ'বে তার প্রামাণ্য বিচার। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত রুচিবান দর্শকের চাহিদা থেকে কখনই অধিকাংশ দর্শকের অভিরূচির যাচাই হ'তে পারে না। যখনই দেখা যাবে যে, উচ্চাঙ্গের নাটকের রসাস্বাদনের জন্য রঙ্গালয়ে রঙ্গালয়ে ভীড় জমছে, তখন বুঝতে হবে যে জাতীয় সংস্কৃতির মান নিশ্চয় উন্নত হয়েছে। অন্ততঃ এটুকু বুঝতে হ'বে যে, ঐ ধরনের নাটকের বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করার মত যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, জনসাধারণের মধ্যে সেই চেতনা জাগ্রত হ'য়েছে। অতি নগণ্যতম দর্শক যে নাটক দেখে আনন্দ পায়, যে নাটক সর্বস্তরের মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারে, নিঃসন্দেহে বুঝতে হ'বে যে সেই নাটকের মধ্যে জাতীয়-মানসের চিরন্তন আবেদন স্বীকৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ নাট্যকার আলেকজেন্ডার ডুমার একদিন নাট্যব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর একটি নাটক যখন প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছিল, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তৃতীয় দৃশ্য মঞ্চস্থ হওয়ার পরেই বারো আনা সাধারণ দর্শকই প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে গেল। তখনই তিনি ছুটলেন মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তবে কি আমার নাটক সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি? তখন মঞ্চাধ্যক্ষ জবাব দিলেন যে, আপনার নাটক সাধারণের জন্য নয়, কাজেই অশিক্ষিত লোকে ওর মর্ম বুঝবে কি? কথাটা ডুমারের মনঃপূত হ'লো না। তিনি বাসায় ফিরে সেই রাজে নাটকের বাকী দৃশ্যগুলি আবার নূতন করে লিখলেন। তখন সেই নাটক বিপুল জন-সমর্থনে মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করলো।

তা হ'লে দেখা গেল যে, কি ধরনের নাটক, কোন্ দেশের জনসাধারণের কতখানি সাফল্য অর্জন করল, তা দেখেই চেনা যাবে সেই দেশের জাতীয় গণ-মানসকে। সেই সঙ্গে জানা যাবে কি ধরনের নাট্য-সাহিত্য, গল্প, চরিত্র, ভাষা-সংলাপ এবং অভিনয়-প্রথা সর্বজন গ্রাহ্য হ'য়ে উঠছে। যখন নাটকীয় জটিল পদ্ধতি, রূপক নাটকের ভাবব্যঞ্জক বিষয় বস্তু কোন দেশের জনসাধারণে প্রভাব বিস্তার করে, তখন বুঝতে হ'বে যে, সেই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের রস-বোধের প্রগতি ঘটেছে।

ইউরোপের শতবর্ষের নাট্যান্দোলনের মধ্যে এহেন গণ-অভিরূচির একটা ক্রমবিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। হেনরিক ইভসেন থেকে টি-এস এলিয়ট (১৮৫০ থেকে ১৯৫০) পর্যন্ত এই শতবর্ষের পাশ্চাত্য-নাট্যোতিহাস পর্যালোচনা করলেই, তা'টের পাওয়া যাবে। ইভসেনের প্রথম মুদ্রিত নাটক 'ক্যাটিলিনা' পছন্দ লেখা। অন্ত-দিকে ইলিয়টের লেখা 'দি কক্ টেল পার্টি' নাটক—ভাষা ও নাটকীয় শৈলীর দিক থেকে বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র। এই শতবর্ষের ব্যবধানের মধ্যে লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'লো আবেগঘন ঘটনাময় নাট্য-পরিস্থিতির উদ্ভব। পাশ্চাত্য দেশের নাট্যোতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এক ফরাসী দেশ ছাড়া গত ছ'শতকের আগে অন্য কোন দেশ নাট্য-সাহিত্যের অনুশীলনের দিক থেকে তেমন এগুতে পারেনি। তখনকার যুগে যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে, তার অধিকাংশই ছিল শ্রাব্য-কাব্য নাটক। সেগুলি ঠিক মঞ্চস্থ করার উপযোগী ছিল না। যখনকার রঙ্গমঞ্চে ছিল হালকা প্রহসন এবং মেলোড্রামার ভিড়। ফরাসী দেশ থেকে আমদানী হয়েছে "intrigue plays of decadent" এবং "romantic drama". গত তিনশ' বছরের নাট্যান্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গদ্যধর্মী বস্তু-তান্ত্রিক নাটক। ইভসেনের গদ্য-নাটক 'ঈগুবার্গ', চেকভের নাটক, সাঁগার গদ্য-নাটক, পিরান্দেলোর নাটক 'হামপ্‌ম্যান' এবং শ'-র 'আর্মস্‌ এ্যাণ্ড দি ম্যান'

প্রভৃতি নাট্য-প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য দেশের নাট্যোতিহাসে প্রগতির পরিচায়ক।

বস্তুতান্ত্রিকতা বা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের নাট্যোতিহাসে যে ভাব-দীপ্ত আবেগ-ধর্মিতা দেখা দিয়েছিল, তার নাম অভিব্যক্তিবাদ (expressionism)। প্রাচীন কাব্য-নাটকের মধ্যে ইভসেনের Peer Gunt-ই উল্লেখযোগ্য। নাট্যোতিহাসের স্বধর্ম বা স্বাভাবিকতা সম্পর্কে কোন সমালোচ্য বিবরণী পাওয়া যায় নি।

বুদ্ধি বা আবেগগ্রাহ্য সমালোচনার মোড় ফিরল নাট্য-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। তখনই নাট্য-সমালোচনার একটা ব্যবহারিক রীতি উদ্ভাবিত হ'লো। এই ব্যবহারিক (practical) সমালোচনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রিচার্ড। ইলিয়টও ঐ রীতিকে অহুসরণ কবেছেন নাট্য বিচারের ক্ষেত্রে। এর আগে মুরী, এমারসন প্রভৃতি নাট্য-সমালোচনার নামে কেবল কাব্যই করেছেন, সর্বক্ষেত্রে নিভুল বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন নি।

এই ধরনের সাহিত্য-গম্ভীর নাট্য-সমালোচনা আংশিক এবং অসত্য হ'তে বাধ্য। কেননা নাট্য-ব্যবস্থাপনার প্রধান দিক যে রঙ্গালয়, তাকে বাদ দিয়ে নাটকের বিচার সম্ভব হ'তে পারে না। এই কারণে অবশ্য বিচার বিষয় হ'চ্ছে কি ধরনের নাটক কোন্ রঙ্গালয়ের জন্য লিখিত হ'য়েছে, সেটাই সর্বাগ্রে জানতে হ'বে। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই নাটকের সম্যক বিচার হ'তে পারে। তা না হ'লে কি নাট্য-বিচার পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে? এটাই আজকের নাট্য-বিচারের মূল সমস্যা।

এখানেই নাটকের সাহিত্য-রূপ এবং শিল্পাঙ্গুণীলন সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠেছে। জিজ্ঞাস্য সমালোচক প্রশ্ন করেছেন, নাটক এবং সাহিত্যের সম্পর্ক কি? অনেকে বলেছেন যে, মঞ্চস্থ নাটকের পরিবেশিত আনন্দ-মুগ্ধাই নাটকের আস্বাদ্য বিষয়, তার সাহিত্য-রস বিচারের কতটুকু অবকাশ দর্শকেরা পায়। এটা অনেকটা যেন মঞ্চের নাট্য-সমালোচকের অভিমত। নাটকের সাহিত্য ধর্মিতায় কি কোন নাটকের মঞ্চ-সাফল্য নির্ভর করে? ভালো সাহিত্য না হ'লেও নাটক অভিনয়গুণে প্রভূত মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করতে পারে। বিরুদ্ধপন্থীরা বলেছেন যে,

সাহিত্য-রস ও মঞ্চ-সাফল্যের সমগ্রতার উপরই প্রকৃত নাট্য-সমালোচনা নির্ভরশীল। এই বিচারের নিরিখ অবশ্যই হ'বে, এমন নিরপেক্ষ উদার সমালোচনা, যা বিবেচনা শক্তিকে প্রশস্ততর ক'রে অস্বাস্ত মতবাদের দ্বন্দ্ব দেবে।

এই দিক থেকে এলিজাবেথীয় যুগকে নাট্য-সমৃদ্ধির যুগ বলে অভিহিত করা চলে। এ যুগের নাটকের বিষয়বস্তু যেমন ছিল সন্তোষজনক, অশুদ্ধিক দিয়ে তা' ছিল সাহিত্য-সম্পদেও সমৃদ্ধ। এদিক থেকে সেকস্পীয়রের নাটকই অতুলনীয়। তৎপ্রকার নাটক বা সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, হাউয়ার্ড তার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "Literature is a means of communication of imaginative experience through certain written organisation of words." এটাই হ'ল বিশুদ্ধ সাহিত্য-কৃতির মোক্ষ কথা। এরই সঙ্গে আর একটু নাটকীয় সংলাপের সংযোজন করলেই, সৃষ্টি হ'বে নাটক। সেখানে নট-নটী সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে নাটকের বক্তব্য বিষয়টি বিবৃত ক'রে যাবে নানা ঘটনা ও দৃশ্য :বিজ্ঞাসের মধ্য দিয়ে। হাউয়ার্ড তাই বলেছেন যে, নাটক আর কিছু নয়, সেটা হ'চ্ছে "Composition of several persons speaking extempore."

নাট্য-ব্যবস্থাপনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় কি, সে সম্পর্কে মিষ্টার স্ক্রিয়েস, ডেভিস্ যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রাণিধান যোগ্য। তাঁরা বলেছেন যে, নাটকের নট-নটী গুছিয়ে সব কথা বলতে পারে কিনা, অথবা তাদের আড়ষ্ট বাচন-ভঙ্গি কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাদের এতটুকু বিরক্তি উৎপাদন করে, সেটা নাটকের তেমন মারাত্মক ত্রুটি নয়। সেখানে লেখক কতখানি নৈর্যজ্ঞিক হ'তে পেরেছেন, সেটাই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয়। নাটক দেখতে যেখানে বার বার স্মারকদের কণ্ঠই শোনা-যায়, সেখানে পরিবেশিত নাটকটিই বিরক্তির উদ্রেক করে। তার কারণ, তারাই তখন লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বি। যে নাটকে লেখক তত্ত্বধার বা স্মারকের ভূমিকায় নিজেদের বার বার তুলে ধরেন, নাট্য-প্রকরণের বিচারে সে নাটক কিন্তু প্রকৃত

নাটক নয়। নাট্য-উপাদানের অন্তর্ভুক্ত প্লট বা কাহিনী, ঘটনা-সংঘাত, নাটকীয়-পরিস্থিতি, চরিত্র, পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্ব যখন একযোগে নাট্যের অন্তর্নিহিত অকথিত চিন্তাকে শ্রোতাদের চিত্তে ভয়-সংশয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্রচনা করে, তখনই নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কাহিনী এবং চরিত্রই নাটকের বিষয়বস্তুর চেয়ে যদি না প্রকট হয়ে ওঠে, তা হ'লে কাহিনীর ভিড়ে নাটকের চরিত্রগুলি নিশ্চয় হ'তে বাধ্য আর তখন নাটকের মূল আকর্ষণ যে ব্যাহত হ'বে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই কারণে বিষয়বস্তুর চেয়ে নাটকের চরিত্র-চিত্রণই বড়। ঘটনা পরিস্থিতির বাধা-বিপত্তিগুলি যেন অভিনেতার আবির্ভাবে রক্তমাংসের মানবিক-চেতনা লাভ করে। বিমূর্ত ভাবগুলি যেন জীবন্ত মাহুষের কথনে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ “abstractions are given flesh by the presence of actors.” এই কারণে অভিনয় নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। এদিক থেকে সাহিত্য ও নাটকের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টানা যুক্তিসঙ্গত নয়। নাটক তাহার আখ্যান, চরিত্র এবং ভাব—এই ত্রিবিধ ব্যবহার প্রয়োগেই সৃষ্ট। এই কারণে অনেকে নাটককে লেখকের অভিজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা বা “ফরমুলা” বলে অভিহিত করেছেন। এককথায় তার নামকরণ করা হয়েছে “objective correlation”, এর স্তম্ভ থাকবে a set of objects, a situation, a chain of events, and formula for expressing particular emotion”.

নাটকের দৃশ্য-পটগুলি যেন অভিনয়ের ক্ষেত্র, অভিনেতাদের ভাব-প্রকাশের পটভূমি। অথবা অভিব্যক্তির প্যাটর্ন। এই কারণে কোন একটা নাটককে অনুধাবন করতে হ'লে, নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবরূপটিকে আবিষ্কার করতে হ'বে। অর্থাৎ “the mode of expression has to be found out”. ‘ফ্রেড’ ‘প্রমথুয়াস’, ‘ওরেস্টেস’ (orestes), ‘পারসিউস’ (perseus) প্রভৃতি প্রখ্যাত নাটকগুলিকে বুঝতে হ'লে, তার অন্তর্নিহিত ভাব-রূপটিকে প্রথমেই জানতে হ'বে। তা না হ'লে নাটকই দেখা হ'বে, তার রসাস্বাদন করা যাবে না। এই সঙ্গে নাট্য-বিচারের

সময় জানতে হ'বে, নাটকের সত্য, তার বিচিত্র-জীবন এবং তার জন-মানসকে। আর জানতে হ'বে তখনকার সেই জীবনের কাঠামোটিকে, যার ছকে চরিত্রগুলি তৈরী হয়েছে।

জীবনকে নাটকের পাশাপাশি রেখে যেদিন থেকে নাট্যবিচার স্রব্ধ হয়েছে, সেই দিন থেকে নাট্য-সাহিত্য এবং জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। ডি-এইচ লয়েন্স জীবনের চেয়ে বড় করে দেখেছিলেন নাটককে। তিনি বলেছেন যে, নাটক জীবন নয়, ‘abstraction from life.’ অর্থাৎ নাটক আদতে সত্য জীবনের নিখুঁত চিত্র নয়, জীবনের বিমূর্ত ভাবরূপ। অথবা নাটক গতিহীন জীবন-পুস্তক মাত্র নয়, নাটক আবেগ-ঘন প্রাণময় জীবনের বিমূর্তভাবের সক্রিয় আনন্দঘন মূর্তি। নাট্যান্দোলনের স্রজ্জট ধরে অগ্রসর হ'লে দেখা যায় যে, জটিল মানব-জীবনে যখন থেকে বাইরের সংঘাত কেবলি মাহুষের মনে স্বন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছে, তখন থেকেই মনস্তাত্ত্বিক নাটকের উদ্ভব। সেক্সপীয়ারের নাটকে যেমন সাহিত্যের বিপুল রসদ আছে, তেমনি আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রাচুর্য। মনস্তাত্ত্বিক নাট্যে আছে চরিত্র এবং ঘটনার অন্তর্দ্বন্দ্বের দুঃখ-বেদনা বিজড়িত ইতিহাস। অর্থাৎ প্রায়শঃক্ষেত্রেই মানসিক অভিব্যক্তি আর তার উপস্থাপনের সংঘাতে অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক নাটকই সমস্তাকীর্ণ অথবা জটিল।

‘চেকভ’, ‘ইভসেন’ প্রভৃতি ছিলেন প্রতীক-ধর্মী। প্রায়শঃ তাঁদের নাটকে ছিল normal expression বা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের নাটক হ'লো স্বাভাবিক সংলাপ-সমৃদ্ধ। তৃতীয়তঃ এঁদের প্রতীক-ধর্মী নাটকে দেখা যায় অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিমার্জনা ঘটেছে। কোথাও বা এসেছে ওর পরিপূরকরূপে স্বাভাবিক ভাষা, সংলাপ কথ্য-ভাষার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে।

‘উইলিয়ম আর্চার’ অবশ্য নাটকে আবেগ ধর্মিতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। “Greatest emotion can be dramatically suggested.” অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গভীরতর আবেগকে নিবিড়তর ভাবে

নাটকের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে প্রথ্যাত নাট্যকার পেনিরো ‘লেস্টি’কে বলেছিলেন যে, আবেগ ছাড়া প্রকৃত নাটকের কোন প্রাণ-বেগই থাকতে পারে না। এই কারণে নাটকের মধ্যে থাকা উচিত জীবনের একটা ‘মিশন’। অন্ততঃ সম্ভাব্য এমন কথা নাটকের মূল স্তরের মধ্যে ধ্বনিত হওয়া উচিত, যে কথা মানবতার দিক থেকে বলা উচিত ছিল।

‘গ্রানভিলে বারকারে’-র ‘ওয়েষ্ট’ নাটকে এই মানবতার বাণীই প্রতিধ্বনিত। সেখানে জীবনের ঔচিত্য-বোধ কেবল প্রকট নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। নাটকের ‘মিশন’ কি হওয়া উচিত, ‘ট্রেবেল’ তার একটা সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি নাটকের অন্তর্নিহিত মৌলিক, বা তার জয় পরাজয়ের কথা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনে; আমার বিচার্য বিষয় হ’ল নাটক যদি না জীবনকে যত্নের ডাঙন থেকে রক্ষা করতে পারে, তখনই বুঝতে হ’বে যে, সেই নাটক বিষাদ-ব্যঙ্কক বা ব্যর্থ হ’য়েছে। এহেন নাট্য-সমালোচনাকে ‘ক্যান্টেলুপে’ বলেছেন যে, গির্জার ধর্মোন্মাদনের সেই দাবীর কথাই যেন প্রতিধ্বনিত হ’য়ে উঠেছে। তার চেয়ে বেশী বা নূতন কোন কথা বলা হয়নি।

ডেনিস জনশনের “দি মুন ইন দি ইয়েলো রিভার”, নাটকের মূল কথা হচ্ছে ‘will, here endeth the first lesson.’ এই হ’ল নাটক উদ্দেশ্যমূলক নাটক। এ ধরনের নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল কিছু বলা নয়, শেখানোও বটে। এর ফলে অনেক নাটকের মধ্যে এসে পড়েছে প্রচার-ধর্মিতা দোষ।

আইরিশ নাটকে কথ্য ভাষাই বেশী ফলপ্রসূ হ’য়ে উঠেছে। সাঁগা ও ক্যাসের নাটকেও কথ্য-ভাষার প্রয়োগ-সাফল্য দেখা গিয়াছে। নাটকের সংকল্প যদি মুখের ভাষার কাছাকাছি না যায়, তবে সাধারণ দর্শক নাটকের মধ্যে তাদের মনের, প্রাণের কথা শুনতে পাবে কি করে? অতীতকালে এলিজাবেথীয় যুগে যেমন “গ্রাচারেলইজিমের” সুর ছিল একটু খাদে, তেমনি ‘কন্ভেনশনশানালইজিমের’ সুর ছিল বেশ চড়া পর্দায় বাঁধা। এর মধ্যে ছিল একটা ‘communicational unity.’ এর পরে নাট্যানোলনে

দেখা দিবেছিল ‘community of sensibility’ তখন নাট্য-প্রবক্তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শিক্ষাদীক্ষা, সত্যতা-ভব্যতা এবং রুচি-বোধে নাট্যকাররা হবেন দর্শকদের চেয়ে ঢের পরিমার্জিত। আরও প্রচেষ্টা চলেছিল যে, যেমন করেই হোক যান্ত্রিক পরিবেশ থেকে, গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্ত করতে হ’বে নাটককে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, নাট্যকার বা শিল্পীকে হ’তে হ’বে সমগ্র সমাজের মুখপাত্র। তখনকার নাট্যকাররা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নাটকের সংলাপগুলিকে এমন ভাবে সুবিস্তৃত করতে হবে যে, তা’ যেন সর্বতোভাবে ‘spoken performance’-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এই আন্দোলনের ফলে স্থিরীকৃত হ’ল যে, নাটকের সম্ভাব্যতা ও সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তার ফলে নাট্যকারদের সামনে এই প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠল যে, নাট্য-সৃষ্টির শৈলী-নৈপুণ্য নিয়ন্ত্রিত হ’বে পরোক্ষভাবে, না সরাসরি ভাবে নাটকের রূপান্তর ঘটাবে? সমালোচকরা এই সমস্যা সমাধানের উপায় বাতুলে দিয়ে বললেন, সার্থক নাটক সৃষ্টি করতে হ’লে, লেখককে নাটকের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হ’বে। একান্ত নাট্যপ্রচেষ্টা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে উঠতে হ’বে; এবং তাঁকে পাত্র-পাত্রীর একজন হ’তে হ’বে। অর্থাৎ ‘the artist should become the character’. নাট্যানোলনের সাহিত্য-প্রচেষ্টার ধারকরা বিশ্বাস এই যে, নাটকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি হ’বে জীবনের কাছাকাছি। সেটা জীবনের হবহু অম্লকৃতি বা বিমূর্ত ভাব-চিত্র হবে না, তা’ হ’বে জীবনের মত নিটোল, প্রাণ-স্পন্দনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে তার আবেদন। জীবনটাই হবে নাট্যানুভূতির প্রাণ-কেন্দ্র সেখান থেকে হাসি-কান্না, স্বপ্ন-স্বপ্নের উৎস নিঃসৃত হ’বে।

নাট্যানোলনে ধারা ছিলেন ‘টার্গ সিস্টেমে’ বিশ্বাসী প্রত্যক্ষ বাস্তববাদী, তাঁরা মনে করতেন যে, নাটকের জন্তই চরিত্র, চরিত্রের জন্ত নাটক নয়। নাটক বিশেষকৈ সামনে রেখে করতে হ’বে চরিত্রের সৃষ্টি। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকাররা অবশ্য তাই করতেন। এই উদ্গম ছিল

দ্বিধা-বিভক্ত : যথা, মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করা অথবা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্রের পুনর্গঠন বা ‘revival of character’. সেকস্পীয়ারের ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’ই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নাটকের চরিত্র, ঘটনা-সংঘাত বা কাহিনী যাই হোক না কেন, নাট্য-সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে ‘construction’ এবং ‘form’-এর উপর।

অর্থাৎ নাটকের বিকাশ এবং তার কাঠামোটি যদি নিখুঁত হয়, তবেই তা’ সংলাপে, চরিত্রে, ঘটনা-সংঘাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এক শ’ বছরের পাশ্চাত্য নাট্যান্দোলনের মধ্যে নানা আকারে-প্রকারে, ভাবনা-বিশ্বাসে নাটকের এই অন্তর্নিহিত জীবন-সত্যটি বার বার পরীক্ষিত এবং স্বীকৃত হ’য়েছে।

## ‘চন্দ্রনগর’-জগদ্ধাত্রী

শ্রীমুখীর গুপ্ত

১

জন্ম-মৃত্যু ঘোঁষ ধারায় ঘোঁষ ধাম ;  
অবাক জনতা ‘চন্দ্রনগর’ রেখেছে নাম।  
আকাশ সেখায় পলকে ছলকে—ঝলকে স্তম্ভে,  
চন্দ্র-গলানো মাধুরী ক্ষরায় মধুর মুখে ;  
—মন্দাকিনীর তুল-ছাপানো স্বধায়-ভরা  
সে-দেশ যেন গো না-জানা-কী-এক নেশায় ধরা।  
বিহগ-বিটপী-বিপুল জনতা নেশার ভরে  
ছলিছে—টলিছে জন্ম-মৃত্যু দোলায় পরে।  
লীলা-ঝিলঝিল সেখায় নিখিল দিবস-রাত্রি ;  
নিরবধি কাল জাগে লীলাময়ী জগদ্ধাত্রী।

২

জনতা চলেরে—নেশায় চলেরে—কি-কথা বলেরে  
ষায় না বুঝা ;  
ছিন্নভিন্ন মন্ড্রে—মন্ড্রে চলে কি জগদ্ধাত্রী-পূজা !  
এত যে স্তম্ভের মোহাগ—মমতা, জীব-লীলা বুঝি  
মাতৃ-কোলে।  
হু’ কথা বলিতে না-বলিতে হাস কখন তা’রা যে  
ঘুমতে ঢোলে।  
এই দুর্মর মাটির মাধুরী মাতায় ফিরিয়া নোতুন প্রাণে ;  
নোতুন বিহগ বিটপী-জনতা হয়গো মুখর নোতুন গানে।  
—‘চন্দ্রনগরে’ আকাশ-গেলাসে চন্দ্র-মদিরা ফেনায়ে ঝেঁটে ;  
মন্দাকিনীর মন্দ গতিতে মাতাল শোণিতে বিষ ফোটে।  
টলিছে-টলিছে—তবুও চলিছে, সরাইথানায়  
সবাই যাত্রী ;  
সবারে লীলায় মাতায়ে হেথায় জাগ্রত রয় জগদ্ধাত্রী।

৩

সেইতো কখনো জননী—গেহিণী—বঁধু কি মিতা ;  
সে-ই রঙ্গিনী—মাটির ঘরেই প্রেমসী—পিতা।  
খেয়ালে খেলায় মাতিবে—মাতাবে রসোৎসবে ;—  
বিহগ-বিটপী—জনতা সকলই সে-ই তো হবে।  
সাজ-ঘরে তা’র নিরবধি কাল চলিছে নাট ;  
সাধ ক’রে কতু ছোট হয়—কতু হয় বিরাট।  
‘চন্দ্রনগর’ জুড়িয়া তা’রই যে মাধুরী-ধার  
মন্দাকিনীরে ছাপায়ে বহে গো বারংবার।  
জন্ম-মৃত্যু গর্ভধারিণী অনাদি মাতৃ—  
কে জানে কি রসে ভূষিতা-বিতোর জগদ্ধাত্রী।

৪

শুনেছি সহসা মন্দাকিনীর মুদুল-মন্ড্রে পাতিয়া কান,  
লক্ষ লক্ষ প্রাণের লহরে লীলা করে সেই একক প্রাণ ;  
সবার নেশায় তা’রই নেশা জাগে, সবার প্রেমেরও  
সে প্রেম-দাত্রী ;  
সেইতো বিশ্বরঙ্গময়ী গো ‘চন্দ্রনগর’—জগদ্ধাত্রী।  
এ দেহে আমার জাগে রোমাঞ্চ—নয়নে আমার  
লাগেরে ঘোর,  
নেশার অবধি পাইনে মরমে পরাণে প্রেমের নাহিরে ওর ;  
বিটপী-বিহগ-বিপুল জনতা সবইতো আমার  
প্রাণের প্রাণ ;  
জন্ম আমার মরণে মিশেছে—মৃত্যু জনমে করিছে স্নান।  
তৃতীয় নয়ন ভরিয়া হেরিছ একাধারে প্রেম-পাত্র-পাত্রী  
চন্দ্রধৌত ‘চন্দ্রনগরে’ চন্দ্রবরণা জগদ্ধাত্রী।



# রবীন্দ্র নাট্য-চিন্তা

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম.বি., বি.এস., আয়ুর্বেদাচার্য

নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নবজাগৃতি আনয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে গিরিশচন্দ্রের সাধনার সিদ্ধিতে সাহিত্যের এই বিভাগটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। সংস্কার যুগের নাট্য-আন্দোলনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পর রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য সমকালীন কোন কোন ঘটনার সঙ্গে দু'একটি নাটকের যোগাযোগ আছে। কিন্তু সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে বিশাল কালের মহাজীবনের রঙ্গে - রসে - ভাবে - ভাবনায় নাটকগুলি যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর ধারণ করে আছে।

জীবনের সমগ্র রূপটিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্য চিন্তা। গতানুগতিকতার পথে রবীন্দ্রনাথ চলেননি। তাঁর নাটকের সৃষ্টিপ্রবাহ প্রথমটি সজীব এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বন্দ্বসংঘাতের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ, দ্বিতীয়টি প্রাণীক চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় সংস্থান, দ্বন্দ্ব এবং গতিময়তা। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নয়, চেতনার রসলোকে সমুত্তীর্ণ হয়ে আত্মার যে আত্মবিশ্বাস—রবীন্দ্রনাটে তার স্বাদ পাওয়া যায়। রূপক নাট্যসম্ভারে কবি আবার আর একটি ধারা প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় এ ধরনের নাটকগুলিতে।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বনাট্য-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভা রূপক ও সাংস্কৃতিক নাট্যরচনায় একটি বিশিষ্ট সত্যে ও তথ্যে নব নব নির্মাণ সম্ভব করেছে। কবির জীবনদর্শন এখানে বিচিত্র চিন্তার আলোকে সার্বভৌম সত্যকেই উদ্ঘাটিত করেছে—যার তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখি, রসসৃষ্টি জীবনের আনন্দ-বেদনায় জীবনকে দেখার মাধুরী ও আনন্দ। অতিস্বাভাবিক ভাবেই কাহিনী ও নাটকের সংলাপের মধ্যে মুখ্য অংশ প্রদান করেছে জীবনের বিচিত্র অহুত্ব। অতীত যুগের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' এবং আর ছ' একটি সাক্ষেতিক নাটক ব্যতীত জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তির প্রাণীক সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্তর্মুখী চেতনার

দিকে মনকে টেনে নেয়। “ফাল্গুনী” “রক্তকবরী” “মুক্তধারা” ইত্যাদি এদিক দিয়ে সার্থক সৃষ্টির পরিচয়বাহক। এ ধরনের রূপক নাট্যাংশের অন্তরালে কবিমানস বিশ্বজীবন ও প্রকৃতির অপূর্ণ তাৎপর্য উপস্থাপিত করেছে। রবীন্দ্রচিন্তার এ বিশেষ দিকটি বিচিত্র ভাবে ফুটে উঠেছে এ ধরনের নাটকগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে পাঠ্যগুণ অধিক। শিল্প সৌন্দর্য্যে নাটকের অন্তর্নিহিত রস এবং সৌন্দর্য্য অহুত্বভূতিতে ধরা পড়ে কবি-সৃষ্ট বিচিত্র চরিত্রের সংলাপে। নাটকীয় উপাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্বততর ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে গীতিনাট্য, নাট্য-কাব্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্য এবং সাক্ষেতিক নাট্য সম্ভার। সামাজিক নাট্যগুলিতে পাই বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে সমাজ-জীবনের সমালোচনা। সাহিত্য-রসের যুক্তধারা নাটকগুলির সংলাপে ও চরিত্র চিত্রণে প্রকাশিত। সেই সঙ্গে গীতিকবিতার রস-রস ও ভাব নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, গীতিনাট্যগুলিতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। সাক্ষেতিক নাট্যগুলি রবীন্দ্র-দর্শনের পরিচায়ক এবং ব্যঙ্গ ও সামাজিক নাটকগুলি সাহিত্যের দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার বিরাট সাফল্য ধারণ ক'রে আছে নাট্য-কাব্যসমূহ। বিচিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া এবং ভাবের বৈচিত্র্যের দিক দিয়া এই নাট্য-কাব্যগুলির সার্থকতা অপরিমীম।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রতিপাত—জীবনের দর্শন। এক একটি ঘটনা নিয়ে এই জীবন-দর্শন রূপ নিয়েছে। অতি-বাস্তবতা নাটকের এ সহজ ও সরল জীবনদর্শনের রস উপলব্ধির পথে বাধাধনক। তাই চাই অন্তর্মুখী হবার মত পরিবেশ যাতে অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে একটা রস-সামিধ্যলাভ ক'রে উপলব্ধির মধ্যে চেতনার নবজাগরণ ঘটে। রবীন্দ্রনাট্য সম্ভারে জীবনদর্শনের এই রূপটি এমন একটা চেতনা এনে দেয় যে, মানস সম্ভার নতুন একটি সত্যের ও রসের উপলব্ধিতে মন ভরে উঠে। প্রকৃতপক্ষে নাটকের সার্থকতাও এখানেই।

## রাত্রে ও প্রভাতে

সুবোধচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী

হালকা নীল আলো। মহার্ঘ আসবাবে সাজান শয়ন-ঘর। মেফেষার রোডের বাগান-ঘেরা নিলয়ের এই কক্ষে বসে মনে হয় যেন Hearst-এর "San simeon"-এ এসে পৌঁছেছি। হাঁসের পালকের গদি-মোড়া অতি-প্রশস্ত পালকে গা এলিয়ে মনোরমা শুয়ে আছে। বহু রকমের শব্দ তুলে দেওয়াল-ঘড়িতে নয়টা বাজল। মনোরমা একটু উচাটন ভাবেই উঠে গিল্টি-সোনার ফ্রেমে ধরা প্রকাণ্ড আর্শিতে নিজেকে দেখে নিলে। বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ যে কোনো-খানে দাঁড়াতে পারে। অতি-মাত্রিক খেদ-বিলাসিনীর বৈভব ও "কিং কং" উভয়কেই স্বরণ করিয়ে দেয়। কবির কথা মনে হয়—"নিকষ হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার!"

একটু পরেই স্বামী অঘোষ মৈত্র জুতোর খটখট তুলে ঘরে ঢুকলো। অঘোষের চরিত্র তার নামের সংগে সংগতি রেখেছে। বড়লোক শব্দের দেওয়া বাড়ির বিলাসের মধ্যে তার মধ্যবিত্ত মনের উপর একটা আভিজাত্যের আবরণ দেবার তার ইচ্ছে। তাই বাকুশংখম।

—ই্যা গা, শুনেছ! খোকার যে নতুন মাষ্টার মশাই প্রোফেসর অরুণাংশু ভাট্টা তোমাদের দেশের লোক।

সন্দ্বিষ্ট কৌতূহলে অঘোষ—কে বললো? তুমি কেমন করে জানলে?

—আজ অরুণাংশু বাবু যখন এলেন, খোকা তখনো খেলার মাঠ থেকে ফেরেনি। তাই আমি কতক্ষণ তাঁকে সন্ধ দিচ্ছিলুম। কথায় কথায় বললেন, তাঁদের দেশ কুম্ভমপুরে। কুম্ভার আদিত্যনারায়ণ ভাট্টা তাঁর জ্যেষ্ঠত্বতো ভাই।

অঘোষের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। —আচ্ছা, অরুণাংশু বাবুর তিন মাসের বেতন বাকি পড়েছে না?

—ই্যা, উনি কাজে যোগ দেবার পর কোন টাকাই দেওয়া হয়নি। আর দেবও-না ঠিক করেছি। পঁচাত্তর টাকা ক'রে ছুশ' পঁচিশ। আজ চাচ্ছিলেন। দেই-দিচ্ছি করে কথাটা এড়িয়ে গেছি। আদিত্যের কথা জিজ্ঞাসা

করাতে ভদ্রলোকও সংকুচিত হয়ে আর চান নি। বিনিপন্নসায় ষতদিন পড়ায় পড়াক না।

—আমার আর ওর সামনে বেশি যাওয়া চলবে না দেখছি।..... আমরা যে প্রাইভেট টিউটরের বেতন দিই না, রাখার সময় যোটা বেতন স্বীকার করি, তারপর বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলে নতুন লোক আরও বেশি বেতনে রাখি, আর তার অবস্থাও পূর্বের মতো হয়, এখবরটাও না ভদ্রলোক পেয়ে যান। তবে তো এখনি ছেড়ে দেবে। এদিকে খোকার টেইট পরীক্ষা এসে গেছে।

—না, না, সে সম্ভাবনা নেই। পাঁচ মাসের আগে বুঝতেই পারবে না। বেঙ্গল নার্সিংহোমের 'সূর্যদা' যখন ভদ্রলোকের কথা বলেন, তখনই জেনে নিয়েছি যে খোকার পূর্বের মাষ্টারদের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় নেই। 'সূর্যদা' চালাক লোক। কর্তব্যপরায়ণ বোকাবোকা টিউটরই তিনি ঠিক করে দেন।.....

অঘোষ খানিক চুপ করে থেকে বলে,—আজ আমার প্রোমোশনের কথাটা পাকা হোল। সাড়ে সাতশ'র গ্রেডে উঠলুম!—কৃষ্ণমুখ বঙ্কিম করে অঘোষ হাসে।

\* \* \* \*

রাত্রিতে ঘুমোবার পূর্বে নরম পালকের গদিতে ডুবে গিয়ে মনোরমা ও অঘোষ যার যার মন উধাও করে দিলে কোন্ এক স্বপ্নলোকে। কাকাকাছি থেকেও তারা যেন কেউ কারও নয়।...

অঘোষের মন ঘুরতে লাগল কুম্ভমপুরে। অঘোষরা বংশাশ্রমিক আদিত্যদের প্রজা। আদিত্যর বাবা ও ঠাকুরদা রাজা শাস্ত্র হু ভাট্টা ও নুসিংহ ভাট্টার সময় কখনো সেখানে গিয়ে বসতে সাহস হয়নি। আদিত্য বসতে বললেও কেমন যেন ভয় ভয় করতো। বাকী খাজনার দায়ে যেদিন তাদের সর্বস্ব নিলাম হয়ে গেল, সেদিন সেও তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল শাস্ত্রহর কাছে দয়া ভিক্ষা করতে। ম্যানেজার তাদের আমলই দেয়নি। শাস্ত্রহর কাছেও পুরো চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

সেদিন বহুলোকের দরবার শোনে শাস্ত্রস্থ। সকলের শেষে তাদের কথা শোনে। বহু কাম্বাকাটির পর শাস্ত্রস্থ তাদের ভিটে ও জমি ছেড়ে দেয় আয়ুগতোর বিনিময়ে। এই দানে তার বাবা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন; কিন্তু তার মনে এই দান পাওয়ার অপমান ও হীনতাই বেজেছিল, সবছমানে সে তা গ্রহণ করতে পারেনি। বালক-মনে দরিদ্রের প্রতি ধনীর অবহেলাই সেদিন প্রথর হয়ে উঠেছিল।...আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে এ দানও তাদের ভোগে আসেনি।...

চল্লিশ বছর পূর্বে সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। তারপর একদিন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ডাঃ পরমেশ লাহিড়ীর মেয়েকে বিয়ে করে এই বাড়িতে উঠে এল। জীবনের ধারা গেল বদলে। পরম নিশ্চিন্ততায় সে আজ নিরুদ্বিগ্ন। কুস্থমপুরের কথা কদাচ মনে হয়েছে। সেদিনের দারিদ্রময় জীবনের কশাঘাত আজও মনকে চনকে দেয়। ভয় হয়, বর্তমান স্বপ্ন নয়তো!...সেদিন তার অভাবের যারা সাক্ষী তারাতো কেউ এই প্রাচুর্যকে দেখে গেল না। অরুণাংশু তাকে চেনে না। কিন্তু আদিত্যকে আজ এনে দেখান যায় না!...না সে স্বপ্ন সম্ভাবনা।...

মনোরমাও ভাবছে। তার কিশোরী মনে কবে আদিত্যের উদয় আজ আর যেন মনে হয় না। তবে অস্ত তার হয়নি। একদিকে আদিত্য, অত্রদিকে অঘোষ। আদিত্য দূরে, সে তার কেউ না। অঘোষ নিকটে, জীবন-গ্রস্থিতে জড়ান। তবু চল্লিশ বৎসর পূর্বের স্বপ্ন-স্রোতোধারায় আজও তার মন বিধ্বত।...আদিত্যকে দেখান যায় না যে তাদের বিরাট মহীরুহের এক ছিন্নপত্র অঘোষ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে, আর আদিত্য কোথায়।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ ও কুমার শাস্ত্রস্থ দু'জনেই মনোরমাকে দেখতে এসেছিলেন। কত স্বপ্ন সেদিন তার মনে জ্বলেছিল। আদিত্য যেন কোন্ অচিন্ দেশের রাজপুত্র। নৃসিংহনারায়ণের চেহারাকে সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের সঙ্গে বদলে নেওয়া যায়। শাস্ত্রস্থ—এ যেন এক চলমান খুঁদে হিমগিরি। বহু শতাব্দী সঞ্চিত আভিজাত্যের মর্যাদা মুখেচোখে ব্যবহারে পরিব্যাপ্ত। ইতিহাসের ছায়াপথ ধরে এরা বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছিল।

আবার একদিন কোথায় মুছে গেছে; বর্তমানে কোথায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরমেশ ধনী, বণিক-আভিজাত্যের জুবিলী তার ম'জ্ব হয়েছিল। তবু সেদিন নৃসিংহনারায়ণের কাছে তাকে নগণ্য মনে হয়েছিল। সামন্ত আভিজাত্যের কাছে বণিক-আভিজাত্যের পরাজয়। তার ব্রাইট প্লীটের উজ্জ্বল-বাটিকাকেও ক্ষুদ্রে মনে হচ্ছিল। অঘোষকে কেনবার টাকা তাঁর ছিল, কিন্তু আদিত্যকে লাভ করবার মূল্য জমে অতীতে। সেখানে তিনি দেউলে। সাধারণ মনোরমাকে সুন্দরী বলতো; তবু নৃসিংহ ও শাস্ত্রস্থ তাদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা দেখিয়েছিল। ষটকের মারফৎ জানিয়েছিল—সুন্দরী, সুশীলা, সুলক্ষণা বধুকেই তাঁরা বরণ করে নেবেন। ধন-কৌলিত্যের মর্যাদা তাঁদের কাছে নেই।

\* \* \* \*

এদের সম্বন্ধে কত গল্পই সেদিন মনোরমা শুনেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অধীন আচার্যবাটা গ্রামের কৃষ্ণকান্ত ভাটুড়ী নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষার জন্ত এসেছিল সুবে-বাংলার নবাবের দরবারে। নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও সামরিক নৈপুণ্যের জন্ত শীগ্গিরই তিনি হলেন নবাবের প্রিয়পাত্র। তখন সাম্রাজ্যিক দাঙ্গা বলে কিছু ছিল না, ছিল শুধু হিন্দু রাজা জমিদারের দাঙ্গা, মুসলমান নবাব জমিদারের কুট-চক্রান্ত। খবর এল বগুড়ার তরুণী বেগম মেহের-উল্লিমা কে তার সরিক জমিদাররা রাজ্যচ্যুত করতে চায়। বেগম বাংলার নবাবের সাহায্য ভিক্ষা করে পাঠালেন।

মুর্শিদকুলী তখন বাংলার নবাব। তিনি কৃষ্ণকান্তকে ফৌজ নিয়ে বেগমের সাহায্যে যেতে বললেন। কৃষ্ণকান্ত যখন গিয়ে পৌঁছিলেন তখন বর্ষা এসে গেছে। ব্রহ্মপুত্র দু'কূল ছাপিয়ে চতুর্দিকে উন্মাদ কলরবে ধ্বংসে। হাতী পর্যন্ত সে-বেগ ধারণে অক্ষম। বাধ্য হয়েই কৃষ্ণকান্তকে চাপাপুরের নবাব বাড়িতে অপেক্ষা করতে হ'ল।

মেহেরুন্নিহার সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের সাক্ষাৎ ঘটল জ্যোৎস্না-রাত্রে, অন্ধর ও বাহির মহলের মধ্যবর্তী ঝরোকার পাশে। সম্রাট আকবরের নিয়ম অনুসরণ করে কৃষ্ণকান্ত বললেন—

আল্লাহো আকবর। মেহেরুন্নিসা প্রত্যাভিবাদন করলে—জালা জালালুজ্জাহ।

আকবরের রীতি তখন কোনখানেই অল্পহৃত হচ্ছে না। তারই মধ্যে দুটি মানুষ দেশের দুই প্রান্তে বসে যে একই সাংস্কৃতিক ধারা বহন করছে, এই অল্পহৃত পরস্পরের মনে এক নৈকট্য বোধ জাগিয়ে তুললো.....চন্দ্রালোকে অন্ধকারে সৃষ্টি হোল এক নতুন রাজ্য, হৃদয় ও আত্মার মিলনে অস্তহীন এক প্রেমের দিবস।

কৃষ্ণকান্ত স্মদর্শন, কূট-চক্ৰী ও সুগায়ক। মেহেরুন্নিসার শত্রুদের পরাভূত করে তাদের সম্পত্তিও যেমন তিনি বাজেয়াপ্ত করলেন, তেমনি মেহেরুন্নিসার অন্তরে প্রবেশ করাও তাঁর পক্ষে সহজ হোল। মেহেরুন্নিসা প্রাসাদের মধ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে শুনে কৃষ্ণকান্ত কারণ জিজ্ঞাসা করল। বেগম জানালেন—লেবাননে বালবেকের মন্দিরে ভারতীয় সন্ন্যাসীর অঙ্করণে ভগবানের অর্চনা হয় ধূপ, প্রদীপ ও ষণ্টীধ্বনির সাথে। চাঁপাপুরের বেগমপ্রাসাদে হলেই বা দোষ কী?

—দোষ কিছুই নেই।—কৃষ্ণকান্তর সারামুখ মধুর মুহূর্তায় ভরে ওঠে। মানুষের জীবন সন্ন্যস্ত সীমা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অসীমের সন্ধানই ছুটে চলে।...

ধীরে ধীরে একটি পরিণত ও একটি অপরিণত মন আরেকটি নিশ্চিত অপরিণামের পথে এগিয়ে চললো।... সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইতিহাসের পদক্ষেপ জটিল হয়েছিল। মানুষের জীবনে, মনে, সমাজে, সাম্রাজ্যে জট পরিবর্তন ঘটছে। মুঘল রাজত্বের ভস্মাধারেই ইংরেজ রাজত্বের গন্ডামস্তিকা। তারই মাঝখানে মারাঠারা উল্লাদের মতো ভারতের আকাশে আকাশে প্রলয়ের কশাঘাত করলো। তপ্ত তৈলকটাহে যেন মশলার জটবিবর্তন। কৃষ্ণকান্ত প্রতি মুহূর্তের তাল গুণে চলতে লাগলো। কৃষ্ণকান্তর হৃদয় দেউলে হয়ে রইল চাঁপাপুরের সুন্দরী মেহেরুন্নিসার কাছে—আরেকটি মহৎ সম্ভাবনার প্রতীক্ষায়।...চাঁপাপুরে সৃচিত হোল ভাড়াড়ী পরিবারের স্বাধীন শাসন। মেহেরুন্নিসাই নাকি উইল

করে দিয়ে যায়। কৃষ্ণকান্তের দূরদর্শিতা তাকে রাজধানী থেকে দূরে কুঠি তৈরি করালো।

তারপর একসাথে দেখা দিল সরফরাজ ও বর্গী। কৃষ্ণকান্ত আলীবর্দিখান বন্ধু। সরফরাজকে সরিয়ে আলিবর্দীকে সিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণকান্ত সরকারী কাজে অবসর নিলে। কৃষ্ণকান্ত তান্ত্রিক। সাধনার সুবিধার জন্য সে এইবার স্থায়ীভাবে এসে বসল চাঁপাপুরে। বর্গীর উৎপাতে সারা দক্ষিণবঙ্গ যখন শ্মশান হয়ে গেল, বীরভূম লোকশূন্য ও রক্তিম হতে লাগলো, কৃষ্ণকান্ত তখন ব্রহ্মপুত্রের জলে ঈশ্বরের কাছে প্রণাম জানান, ছিন্নমস্তার দিকে চেয়ে বলেন—তোমার ঐ রূপ আমার দেখাতে হোল না। আগামী সাত পুরুষে আমার বংশের যেন কারও দেখতে না হয়। কৃষ্ণকান্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেছে মহাকালি। দুই শতাব্দী ধরে নিশ্চিন্ত অপ্রতিহত ছিল ভাড়াড়ী গোষ্ঠীর প্রভাব। তারপর রথের চাকা আবার ঘুরলো ১৮৫৫ সালে।

\* \* \* \*

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমেরই যখন বৈত শাসন চলছে, কৃষ্ণকান্তর চার ছেলে চাঁপাপুর ছেড়ে কুসুমপুরে উঠে এসে। কুসুমপুর পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত; তখন বঙ্গ হাতী-বাঘ-ভাল্লুকের বিচরণ ভূমি; ব্রহ্মপুত্রের শাখা আয়মান-নদীর তীরে। সারা জেলা ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা ঘিরে রেখেছে। অসংখ্য তাদের শাখা-প্রশাখা। বর্ষার কয়েক মাস বহু মাইল বিস্তৃত বনভূমি জলপ্লাবিত হয়। জুগভূমি বলে কিছু যেন চোখে পড়ে না। জায়গাটা দুর্ধর্ষ ডাকাতদের শিক্ষাশ্রম ও কেন্দ্রীয় জমায়তখানা। এখানের বিস্তীর্ণ অরণ্যানী উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে সুন্দরবন-মধুপুর ভাওয়াল আসাম এক করে দিয়েছে। এখানের রাজস্ব নামমাত্র, লোকবসতি অতি বিরল।

এই বিশাল ভূখণ্ডের মালীক কৃষ্ণকান্তের চার ছেলে। বর্গীকে ও কিছুটা নবাবকে এড়াতে যেমন কৃষ্ণকান্ত বাসা বাঁধলেন চাঁপাপুরে, তেমনি ইংরেজকে এড়াতে তাঁর ছেলেরা চলে এল কুসুমপুর। আয়মান নদীর পাড়ে তৈরি হোল মাইলব্যাপী গর্বোদ্ধত দুর্গ-প্রাসাদ। সেখানের মহাকালের মন্দিরের সুবর্ণ-মিনার যেন আকাশ ছোঁয়া।

কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, পুরীর জগন্নাথের মন্দির বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে তার স্থাপত্যের ও বিশালত্বের তুলনা চলে। সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে কুহুমপুর দুর্গে তৈরি হোল মোঘল সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার এক যৌগিক মিলন ক্ষেত্র। দৃশ্য অধ্যুসিত ঘোর কাস্তারে গড়ে উঠলো মোঘল সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার এক মিলন কেন্দ্র। দুর্গম স্থাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমিতে নির্মিত হোল যেন Claude-এর Enchanted Castle, মার্লিনের দুর্গ, আরবের “হাজার এক রাত্রির” অভিনয়ের পটভূমিকা।

কৃষ্ণকান্তর চার ছেলে—রামরাম, হরিরাম, শিবরাম ও বিষ্ণুরাম। এই শিবরামের বংশধর হোল নুসিংহ, শাস্ত্রু ও আদিত্য। নুসিংহের ছোটবেলাতেও দিনে দুপুরে বুঝে হাতী বাঘ ভালুক কুহুমপুরে ঢুকে পড়তো। নুসিংহ বন কেটে লোকালয় বসিয়েছে তার জমিদারীর প্রত্যন্তভূমি পর্যন্ত। সে-দিনের সেই প্রজা আর নেই। কিন্তু তাদের বংশধরদের এখনো বলা হয় “জঙ্গলকাটি”র প্রজা। জুল বসিয়েছে, কলেক্ট করেছে, হাসপাতাল গড়েছে, জলের-কল ও বিদ্যুৎ-আলোর ব্যবস্থা করেছে। কোনখানেই লাভের আশায় নয়; শুধুই খরচ করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সাহায্য করতে তখনই ইংরেজ প্রভু ‘রাজা’ উপাধি দিয়েছে। তবু তাদের ভূমি নেই।

সারা মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু সমাজ তখন সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকবার সংস্থান নেই। সে-আমলে মাসে পাঁচ টাকা হলেই একটা সংসার চলতো। কিন্তু সেটুকু উপার্জনের পথও বাঙালীর খোলা নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়েছে; কিন্তু গ্রহণের উপায় নেই।...নুসিংহ ও শাস্ত্রু উঠে-পড়ে লাগলেন যাতে বাঙালী না-খেয়ে মারা না যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে। ছিয়াত্তরের মধ্যস্তর দেহমনে আর যেন না ঘটে।...যেখানে যত দুঃস্থ আত্মীয়-পরিচিত ছিল সবার কল্য মাসহারার ব্যবস্থা হোল। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। অন্ত্যস্ত জমিদাররাও সেইভাবে অহুপ্রাপিত হোলো। ব্রিটিশ শাসনের “ভ্যাম্পায়ারের” হাত থেকে রক্ষা করতে লাগলেন নবজাগ্রত

বাঙালী হিন্দু সমাজকে। এরা না জন্মালে হয়ত আজ বাঙালী সমাজ কুলী মজুর হয়ে থাকত।

শাস্ত্রু ধরে রইলেন সংস্কৃতি। ভারতের, বিশেষ করে বাংলা দেশে যেখানে যত সংগীত-শিল্পী, সবার অব্যাহত দ্বার ছিল তাঁর সভায়। ছোটবড়র বাধা ঘুচিয়ে তৈরি হোল নতুন সময়। প্রতিভাবান শিল্পী-ছাত্রেরা পেল অবাচিত অব্যাহত আর্থিক আয়ুকূল্য। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন রক্ষা পেল এক বড় বিনাশের হাত থেকে।

আদিত্যরা বংশাধিকার শিকারী। এককালের যুদ্ধের নেশা শিকার করেই তৃপ্তি লাভ করে। হাতী রাখা এদের এক বড় সখ। সারা কুহুমপুরে হাতী ছিল মোট আড়াইশ। তার মধ্যে আদিত্যদের অংশেই ছিল প্রায় সত্তরটা। হাতী ছাড়া পূর্ব-বাংলায় দ্রুত চলাফেরা এবং বর্ষার সময় চলাচল একেবারেই অসম্ভব। শোনা যায় রাজা নুসিংহনারায়ণ হাতীর মত জানতেন। তাঁর বিখ্যাত হাতী শঙ্খ ও ভোলানাথ (প্রায় ১৪ ফুট উঁচু) যখন ‘মস্তী’ পেত, তখন নুসিংহ সম্মুখে গিরে দাঁড়ালে— সেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি করীয়াও তাদের ঘোলাটে চোখ ও মাথা নিচু করে শুঁড় নাড়ত।

বিদেশী পণ্ডের প্রতি এঁদের লোভ ছিল না মোটেই। হাতী থেকে মটরের প্রতি আকর্ষণ বাড়েনি; যুরোপের বিলাস দ্রব্যের চেয়ে ভারতীয় কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি এঁরা ছিলেন বেশি আগ্রহান্বিত। প্রয়োজনের দ্রব্যসম্ভার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে প্রাসাদ ভরে উঠেছে। দিশি ব্যবসাকে সাহায্য করতে গিয়ে বহু খেসারতই এরা দিয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বেই ম্যানেজার রাজা নুসিংহ নারায়ণকে বলেছিল—দেনা বা’ হয়েছে তা’ ষ্টেটের পক্ষে বহন করা আর সম্ভব নয়। খরচ কমাতেই হবে।

নুসিংহনারায়ণ গম্ভীর হয়ে বললেন—তাইতো; কিন্তু কী করে তা সম্ভব?

—যে বিরাট মাসিক ছোট-ছোট দানের বরাদ্দ আছে, ওটা বন্ধ করলেই বছরে দেড় লাখ টাকা খরচ কমে যায়। এসব দানে নামও নেই; শুধু ভয়ে ঘি ঢালা।

অতি বৃদ্ধ রাজা নুসিংহনারায়ণ একটু চুপ করে থেকে

বললেন—এসব দান বহু আগেই যদি আমরা বন্ধ করতাম, তবে বাংলাদেশের জমিদাররা বিরাট ধনী হতে পারতো। কিন্তু তা হলে তোমার মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও মাথা তুলতে পারতো না। টাকার অভাবে লেখাপড়া না শিখে লাঙল ধরতে হতো।...ওসব হবে না।

রাগে অপमानে মুখ লাল করে ম্যানেজার বেরিয়ে এসেছিল।

এই ক্ষেত্রের ফল ভুগতেও অবশ্য দেরি হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষেই রাজা নৃসিংহ লোকান্তরিত হন। শতাধিক বর্ষব্যাপী একটা জীবনেই তাঁর ব্যক্তিগরিচয় নয়। নৃসিংহ বা শাস্ত্রহু তো কোন ব্যক্তি নয়...একটা যুগ, একটা আদর্শের ইঙ্গিতগ্রাহ্য রূপায়ন মাত্র। Phoenix-এর মতো যুগে যুগে এরা ইতিহাসের আঙুনে জলে যায়; আবার বিপ্লবের চিতাভস্ম থেকে নব-কলেবরে নব-রূপায়নে মায়ুষের মনে সম্ভাব্য হয়ে থাকে। এদের আস্থানিক রিজন শুধু বলে—I change, but I cannot die!

শাস্ত্রহু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতেই বিদায় নিলেন। কৃষ্ণকান্ত বা তাঁর ছেলের দূরদর্শিতা আদিত্যের ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সে বেথলে যে, গত দু'শ' বছরে পৃথিবী আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন শক্তি সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছে। সেখানে সে কেউ নয়, সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। ক্রমবর্ধমান মরু প্রান্তরে ছোট্ট মরুদ্যানের ছায় কুসুমপুরেও তার টিকে থাকা সম্ভব নয়। মহাকালের তরীতে তার ঠাই নেই।

এদের পারিবারিক জীবনও ছিল অদ্ভুত। শাস্ত্রহুর মা ভাস্করমতী ছিলেন মেদ-মেছুরা, ধর-রসনার অধিকারিণী। ছেলের বৌ বরণাকে তিনি স্বামী-সহবাসে যেতেই দিতেন না। শাস্ত্রহু যেই রাতে শুতে আসতেন, অমনি বরণার ডাক পড়তো শাস্ত্রহুর পদসেবা করতে। সে সাধারণ সেবা নয়। সারা রাত ধরে সেটা চলতো। প্রত্যুষে শাস্ত্রহু বেবিয়ে গেলে তবে তার মুক্তি। প্রাচীন প্রথাযুগীয় দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর দেখা হোত না; শাস্ত্রহুও অন্যরে প্রবেশ করতো না। ভাস্করমতীই বাড়ির

কর্তা; তাঁর উপর কথা বলার সাহস রাজা নৃসিংহেরও ছিল না।

আদিত্যের জন্ম দিয়ে বরণা যখন মারা গেলেন, তখন রাজা নৃসিংহ বলেছিলেন—শাস্ত্রহু, কেঁদ না, আবার তোমার বিয়ে দেব।

শাস্ত্রহু গম্ভীর হয়ে বলে—না, বাবা, সে আদেশ করবেন না। আবার একটা জীবন নষ্ট করে কী হবে?

নৃসিংহ বুঝেছিলেন, আর সে সম্বন্ধে কথা বলেননি। বছরদিন পর ভাস্করমতীর মৃত্যুর পর রাজা নৃসিংহ আরেকবার কথাটা উঠান—শাস্ত্রহু, এখনতো তোমার মা নেই; এবার বিয়ে কর।

— বাবা, আর বয়েস নেই। এখন আদিত্যের বিয়ের চেষ্টা দেখুন।

কথাটার ছুঁথ নৃসিংহ বুঝেছিলেন। আবার তার ভালও লেগেছিল। অতীতের ভুল, বেদনা ও জ্বালা স্মরণ করেই তিনি খুঁজছিলেন সুন্দরী, সুশীলা, সুলক্ষণা বধু। মনোরমার মেদ-প্রাচুর্য ও কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতাই হয়তো নৃসিংহের মন বিকল্প করেছিল। তাঁর উত্তরেও একটু জ্বালা ছিল—হয়তো তাঁর বৈদগ্ধ্য ভবিষ্যতের একটা রূপ দেখেছিল। তবু ইতিহাসের পরিহাস কেউ এড়াতে পারে না। তিনিও পারেননি। আরও তিনি পারেননি বুঝতে যুরোপের আশ্রিত জগতে কালমাক্সের চিন্তা-নক্ষত্রের প্রভাব যে টেউ তুলেছিল, তা'র কত হৃদয়গ্রসারী হবে। রূপ বিপ্লবের খাটি রূপ ও কারণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে কুসুমপুর পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

শাস্ত্রহুর মাথের পরমেশ্বর ব্যক্তিগত হৃদয়তার স্বত্র ধরে যে অল্পলোকে মনোরমার প্রবেশের সম্ভাবনা হয়েছিল, তা' চিরদিন শুধু ব্যর্থ দিবা অগ্নিই হয়ে রইল। সেই যুগে এদের সমকক্ষ সে হতে পারেনি। কিন্তু আজ তাদেরই একজন তার বাড়িতে চাকরি গ্রহণ করলে। যাদের একদিন সমকক্ষ ভাবা যেত, তারা যদি তার অধীনস্থ হয়, তাতেই বা তৃপ্তি কম কী!

২

মাসখানেক পরের ঘটনা। অরুণাংশু পড়াচ্ছে, বাড়ির বুড়ো চাকর এক প্লেট খাবার ও চা নিয়ে এল। অরুণাংশু

বিস্মিত হয়ে বলে—একী! আবার এসব কেন? আমি সন্ধ্যার পর চা ছাড়া আর কিছু খাইনে।

চাকরটা বিজ্ঞের হাসি হেসে পিঠ-চাপড়ান-ভাবে বলে, খেয়ে নিন মাষ্টারবাবু। পড়ালে তো মেহনৎ হয়, ভাল খেতে পারলে শরীর ঠিক থাকবে। বাবুৱা তো বড়লোক, কত লোক এখানে খেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ অরুণাংশুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। মনে মনে ভাবে—বড়লোক তো চার মাসের বেতন দিচ্ছে না কেন!...ছাত্রের দিকে চেয়ে দেখে সে হাসছে। তার মনে হ'ল—তাইতো, চাকরের কথায় রাগ করা ঠিক নয়। সেও তখন মুহূ হাসল! কিন্তু খাবার খেতে রাজী হল না।

ছেলেটির নাম নির্মল। নির্মল বলে—মাষ্টার মশাই, আপনি যে 'এসেটা' লিখে দিয়েছিলেন, টেবিল পরীক্ষায় ছবছ সেটা মুখস্থ লিখেছিলাম। কিন্তু চম্বিশের মধ্যে দশ পেয়েছি। আমাদের ইংরেজীর স্তার বলেছেন, ওরকম 'এসে' লিখলে পাশ করতে পারব না।

অরুণাংশু কী বলবে জবাব খুঁজে পায় না। একবার ভাবে বলে যে প্রাইভেট পড়ে টাকা না দিলে এমনই হয়। কিন্তু তা হলে টুইশানিটা ছাড়তে হয়। সেই সঙ্গে অতগুলি বকেয়া পাওনা। অথচ আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে সব পাওয়া যাবে, এমনি একটা ভরসা সে পেয়েছে। তাই বললে—সেই স্তারকে বল না, একটা আদর্শ রচনা লিখে দিতে।

—তা' কি তিনি দেবেন? তাঁর কাছে তো প্রাইভেট পড়ি নে!

কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ, না তাচ্ছিল্য, না সারল্য বোঝা যায় না। অরুণাংশুও বিব্রত বোধ করে।

নির্মলই বলে—আমার দিদি একটা রচনা লিখেছে, একটু দেখে দেবেন?

একটি মেয়ে এই সমস্ত কোণাকুণি পড়ার ঘর পার হয়ে গেল।

বেশতো, দেখি?...

Catharsis-এর উপর লেখা গবেষণামূলক রচনা। ইংরাজী কোন্ কোন্ নাটকে এটা পাওয়া যায়, অ্যারিস্টো-টলের পারগেশান্ ও ভারতীয় নাটকের অনুতাপানল এক

পদার্থ কিনা এবং একের উপর অজ্ঞের প্রভাব পড়েছে কিনা।...অরুণাংশু মন দিয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ ধূপ করে বসার শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখে মনোরমা উণ্টো দিকের সোফায় এসে বসেছে।—খোকার টেবিলের ফলতো শুনেছেন। ভেরি মিঞ্জারেবল্। নট্ এট্ অল্ হোয়াট্ ওয়াজ্ এক্সপেক্টেড্ অব্ হিম্। অ্যালাউ করেছে, তবে ওয়ার্নিং দিয়ে।...না, না, আপনাকে দোষ দিচ্ছি না; তবে 'আপনি যা' পড়ান, ও তাই পড়ে।

অরুণাংশু করণ জ্বরে বলে—আমিতো মাধ্যমত চেষ্টা করছি।

—তাতো বটেই, তাতো বটেই। আচ্ছা যাক সে কথা। নির্মলের বাবা জিজ্ঞাসা করছিল, ওদের আফিসে 'পাবলিসিটি অফিসার' নেওয়া হচ্ছে। ওর খুব হাত সেখানে। আপনি কি নেবেন কাজটা? বেতন ছয়শ'।

—আমাকে দিয়ে যদি তাঁদের কাজ চলে, তবে নিশ্চয় করব।

—কলেজের কাজ কিন্তু ছাড়তে হবে।

—সেতো নিশ্চয়ই।

—তবে কালুকেই আপনি একটা দরখাস্ত আমার হাতে দেবেন। এই কার্ডখানা রাখুন, এতে ঠিকানা ও কাকে 'এড্রেস' করতে হবে লেখা আছে।

ফেরার পথে অরুণাংশু ভাবছিল—এমন গায়ে পড়ে উপকারতো কেউ কারও করে না! একেই বলে, ভগবান যখন দেন ছগ্নর ফুঁড়ে দেন...the visible reminder of Invisible Light!

আরও মাসখানেক পরের কথা। মনোরমা ও অঘোষ তার জন্ত ভাল চাকরির চেষ্টা করছে, এটা বুঝে অরুণাংশু আর তার পাওনা টাকার তাগাদা দিতে পারছে না। মনে ভাবে—চাকরিটা যদি হয়, আর হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ ডাঃ পরমেশ লাহিড়ী ঐ কোম্পানীর হোমডা-গোছের ডিরেক্টর, তবে না হয় টাকাগুলি সে ছেড়েই দেবে। ফাইন্সাল পরীক্ষারও আর দেরি নেই। তার একটু টানটানি চলছে, তা' চলুক।

আজকাল নির্মলের দিদি নন্দিতা ঘন ঘন তার সাথে

পড়ার আলোচনা করে। কখনো কখনো নির্মল সে আলোচনায় উহ্ন হয়ে যায়। সন্ধ্যাটা অরুণাংশুর ভালই কাটে, মে-ফেয়ার রোডেই এখন তা'র কমলালেবুর মধু সংগ্রহের ঘাঁটি, তা'র unpriced ultimate Treasure of seeing!

\* \* \* \*

অঘোষদের কোম্পানীতেই অরুণাংশুর চাকরি হয়ে গেল। নিয়োগপত্র পেয়েছে। এক মাসের মধ্যে তাঁকে কাজে যোগ দিতে হবে। উত্তর কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজে সে অধ্যাপনার কাজ করতো। সেখানে সে কর্মে ইস্তফার নোটিশ দিয়ে দিল। নোটিশ গ্রাহ্যও হোল। ১৫ই মার্চ সে সেখান থেকে মুক্তি পাবে। ১৪ই মার্চ তা'র কোম্পানীর কাজে যোগ দেবার কথা ছিল। ম্যানেজারকে বলে তারও ব্যবস্থা করেছে। ডাঃ পরমেশ লাহিড়ী পক্ষে থাকতে সবই সহজ হয়েছে। সতীর্থরা এখন বেশ ঈর্ষার চোখে তাকে দেখে। কেউ কেউ বলে—এরকম দু'একটা ট্যুইশানি আমাদের জুটিয়ে দিন না!

অরুণাংশু বিনীত ভূষ্টির হাসি হাসে।...

কলেজ থেকে অরুণাংশুকে বিদায় অভিনন্দন জানান' হোল ১৪ই মার্চ। বহু ভাল ভাল কথা ও ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া উপহারের মধ্যে উৎসব যখন শেষ হোল, তখন সন্ধ্যা বনিয়ে এসেছে। মনে মনে তার একটা প্ল্যান ছিল যে তিনটের মধ্যে এখান থেকে মুক্তি পেলে অফিসে আজই 'জয়েন' করবে। কিন্তু হোলো না।

মনটা টানতে থাকে মে-ফেয়ার রোডের দিকে। নির্মলের কয়েকটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে বন্ধিতা...

অরুণাংশু যখন ট্রাম থেকে নামল তখন রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। ব্রাইট স্ট্রীটের মোড়ে সে নেমেছিল। একদিকে এককালের প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) বাড়ি "কমলালয়", অগ্র দিকে একালের সুরেন ঠাকুরের প্রাসাদ। শালা-ভগ্নীপতি দুজনেরই হাতছাড়া হয়েছে বাড়ি দুটো। ওদিকে তাকালেই অরুণাংশুর মন ধরাপ হয়ে যায়। মাহুষের জীবনের উপর, নিজের ভবিষ্যতের উপর, একটা কালো ছায়ার শ্রেন দৃষ্টি অহুতব করে।

নির্মল বাড়িতে নেই। পর পর কয়েক দিন পরীক্ষা নেই, তাই প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে গেছে বেড়াতে। অগ্র দিন এমন ক্ষেত্রে চাকর পাঠিয়ে নির্মলকে ডেকে আনা হতো। আজ আর কারও তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। নন্দিতা এলো পড়ার আলাপ করতে, সেই বড়ো চাকরটা এল' চা নিয়ে। আলাপ ক্রমে মৃদুতর হয়ে নৈশকেন্দ্র সীমানায় আসার পূর্বেই মনোরমার আবির্ভাব।

—এই যে মিঃ ভাদুড়ী; নতুন অফিস কেমন লাগলো? চেয়ারে একটা ক্যাচ শব্দ তুলে বিপুল দেহভার এলিয়ে দিলেন।

অরুণাংশু চেয়ার থেকে অর্ধ গুঠার ভঙ্গি করে নমস্কার জানিয়ে বলে—না, আজ 'জয়েন' করতে পারিনি, কলেজের 'ফেয়ারওয়েল' শেষ হতেই সম্ব্য হয়ে গেল। আর প্রিন্সিপ্যাল কিছুতেই একদিন আগে ছাড়তে রাজী হলেন না।

মনোরমার হাসি সারা মুখে যেন চমকে গেল। বললে, থাক্গে, তাতে কিছু হবে না। আগে যদি বলতেন। আপনাদের অধ্যক্ষ অক্ষয়বাবু বাবার বিশেষ বন্ধু। একটা ব্যবস্থা করা যেত।...আচ্ছা আপনি বহন, আমি নির্মলের বাবাকে বলে সব ব্যবস্থা করছি।

\* \* \* \*

পরদিন সকালে ঠিক দশটায় অরুণাংশু "লারি এ্যাণ্ড উইলসন" কোম্পানীতে হাজির হোল। কিন্তু সবার ভাবভঙ্গি কেমন অদ্ভুত ঠেকে তা'র। বেয়ারা সেলাম না করেই জানায় 'পাবলিসিটি' অফিসারতো একজন 'জয়েন' করেছেন; অরুণাংশু যেন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে।

অরুণাংশুর বিশ্বয়ের অস্ত নেই। কাল সে 'জয়েন' করেনি, কিন্তু আজকের মধ্যে নতুন লোক এল কেমন করে? সে যদি কাল আসতো?

ম্যানেজার একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললে, দু'জন লোকই আমরা ঠিক করেছিলুম...যদি আপনি ঠিক সময়ে না আসেন, তবে অগ্র জনকে নেওয়া হবে। তাই হয়েছে।

—কিন্তু আমি যে এদিকে আপনাদের ভরসায় কলেজের কাজ ছেড়ে দিলুম, তার কী?



—খুব দুঃখিত মিঃ ভারুডী। আইনের চোখে আমরা নির্দোষ। আপনাকে এক মাস সময় দেওয়া হোল, তাও সময়ে আসতে পারলেন না। ডাঃ লাহিড়ীও বলছিলেন যে আপনার কর্তব্যজ্ঞান বড় শিথিল। জমিদারের ছেলের যাহ হয়।

ব্যাপার অস্বাভাবিক করতে অরুণাংশুর দেবী হয় না। নিয়তির ষড়যন্ত্রের আঁচ সে পায়। একটা কাল জাল যেন ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে ধরছে। সব চাইতে বড়-কথা—তা'র বর্তমান নিরালস্য অবস্থা তা'র স্বদৃষ্টিমান যেন বন্ধ করে দিতে চাইছে। তা'র উপার্জনের একটি মাত্র পথ, কলেজের কাজে সে ইস্তাফা দিয়েছে এখানের ভরসায়। কিন্তু এতো দেখা যাচ্ছে শুধুই মৃগ-ভূমিকা, অতীত মিশরের Serbonianbog।

প্রথম কয়েক মিনিট অরুণাংশুর কোন অস্বস্তিই ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে সে ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল। ডাঃ লাহিড়ী বা অঘোষ কেউ তার জন্ত কিছু করেনি। তাদের এই গুরুতর ব্যাপারে উদ্যমহীনতা ও নির্লিপ্ততাই যেন এক উদ্দেশ্যহীন শত্রুতা, motiveless malignity, যা' অরুণাংশুর ভবিষ্যৎ গ্রাস করতে আসছে।...অতীতের গহবরে কি এর বীজ রয়েছে? নাকি এই Ouspenskyর "time cycle"।... অস্বস্তি বিনয় এখানে বৃথা, এটা সে বোঝে। মাথা নিচু করে তা'কে পুরোনো কাজেই ফিরে যেতে হবে।...

এগারটা নাগাদ অরুণাংশু তা'র পুরোনো কলেজে পৌঁছয়। মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে অধ্যক্ষ অক্ষয়বাবু বললেন,—আপনাকে এই কলেজে আর রাখা সম্ভব নয়। আপনি নিজে থেকে না ছাড়লে ছাড়িয়েই দিতে হোত। আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে, নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার—moral turpitude-এর। অফিসিয়েলি সে অভিযোগ আমরা এখনো আনিনি; তবে আপনাকে আর এখানে রাখা সম্ভব নয়।

অরুণাংশুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে তা'র রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যকলাপের জন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ তা'র প্রতি বিরূপ। তাঁরা তা'কে তাড়াবার ছল খুঁজছিলেনই; এই স্বযোগ তাঁরা হাতছাড়া করবেন না। নিজের

দাঁড়াবার মাটি কত শক্ত তা'না বুঝেই সে লাক দিয়েছে। এখন তার ফল ভুগতেই হবে।...গত কয়েক বছরে কলেজের সমস্ত ছাত্রবিক্ষোভের নেতা বা উপদেষ্টা ছিল অরুণাংশু। আজ কর্তৃপক্ষ তা'কে কায়দার পেয়েছে।... একটা হতাশা ও অক্ষম ক্রোধে অরুণাংশুর হাত পা কাঁপতে থাকে। ইচ্ছে হয় অক্ষয়ের ছিঁটটা টেনে ফেলে দেয়। তবু শাস্ত থেকে বলে,—আমার অপরাধ?

—দেখুন, ব্যাপারটা খুব জ্ঞানাজানি হয়, তা' আমি চাই না। তবে ইন্ বিটুইন্ ইউ অ্যাণ্ড মি বলছি—নন্দিতাকে চেনেন?

—মে-ফেয়ার রোডের নন্দিতা মৈত্র?

—সেতো আপনিই ভাল জানেন। তবে অভিযোগ আছে। এ কলেজে আপনাকে রাখা চলবে না।... আপনাকে তো ভাল প্রশংসাপত্র দিয়েছি। অন্ত কোন কলেজে চেষ্টা করুন। বিজ্ঞাপন তো রোজই বেরুচ্ছে।

—চাকরি পাওয়া কি অতই সোজা আজকালকার দিনে?

মুচকি হেসে অক্ষয় বলে,—আহা মাথা গরম করবেন না; ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ভাবুন। আমার তো কোন হাত নেই। কর্তৃপক্ষ আপনাকে রাখতে রাজী হবেন না।

অরুণাংশু বোঝে এখানেও কোন আশা নেই। গ্রীকদেবী নেমেসিস্ যেন গত জন্মের অস্তিত্বের মতো তার পিছনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কী অস্ত্রায় সে করেছে? এ জন্মে বা গত জন্মে? গত জন্মের শাস্তি এজন্মে কেন আসবে? অজানা পাপের জ্ঞান-শাস্তির মূল্যই বা কী? এজন্মে তো কোন অস্ত্রায় সে করেনি! তবে কেন নিয়তির এই বিজাতীয় মানবীয় আক্রোশ, সর্পিল সংগ্রাম?...

মাস্তুরের পরাজয় স্বীকারেরও শেষ আছে, আত্ম-অবলুপ্তি কামনারও পরিণতি আছে। বিপদের আঘাত যতক্ষণ উদ্যত, ততক্ষণই সে বড়। আঘাতের সাথে সেও নেমে আসে যেখানে মাস্তুরের আপনার ভূমি। ছোট হয়ে যায় বিপদ ও নিয়তি, মাস্তুরের লজ্জা যায় টুটে। আত্মবিক্ষোভী ঔদ্ধত্যে সে প্রতিহত, প্রত্যাখ্যান করে ভয়ের মায়াজাল। অরুণাংশু উঠে দাঁড়াল—শুধু অক্ষয়ের সম্মুখে নয়, সমস্ত অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে।

প্রথম “প্রাকফেনরস্ রুমে” এসে সব ব্যাপার খুলে বললো; তারপর ছাত্র-যুনিয়নের নেতাদের ডেকে সব বললো। Moral turpitude-এর অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন; কলেজে অরুণাংশুর স্থলে নতুন অধ্যাপক কাউকে নেওয়া হয়নি; সুতরাং তা’কে নিতে কোন বাধা নেই।...তাই ঠিক হোল, অরুণাংশু পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাতে যোগ দেবে। তখনই সেই মর্মে একটা নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হোল।...

ধর্মঘটের নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। কর্তৃপক্ষ অনমনীয়। ইতিমধ্যে অরুণাংশু খোঁজ নিয়ে জানলে যে, কলকাতার সমস্ত কলেজে অধ্যক্ষ অক্ষয়বাবু নিজে গিয়ে, কোন বরে বা চিঠি লিখে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়েছেন যে তা’কে যেন কোন কলেজেই স্থান দেওয়া না হয়।...

এ যেন জিঘাংসার মানবিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কেন এ জিঘাংসা?...তা’র রাজনৈতিক মতবাদ তো তা’র ব্যক্তি-স্বাধীনতারই অঙ্গ। তাকে কেন অর্থের বিনিময়ে মাহুষ খব ক’রতে চায়?...এই কি আমাদের স্বাধীনতার স্বরূপ?

যেদিন ধর্মঘট আরম্ভ হোল সেদিন থেকেই অরুণাংশু সারা বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় বিখ্যাত হয়ে পড়ল। পত্রিকায় পত্রিকায় ছবি বেরল’, ধর্মঘটের মোটামুটি একটা কারণও বেরল’। শুধু নন্দিতা-অরুণাংশু সমাচার ছ’পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থে চেপে রাখল। জন-সাধারণ জানল—রাজনৈতিক কারণে কর্তৃপক্ষ অরুণাংশুকে রাখতে রাজী নয়, এবং তাই নিয়েই দুইদলে সংগ্রাম।

কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করল। অগ্রাগ্র কলেজেও ছাত্র-ধর্মঘটের হুমকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাণেও কণাটা উঠল। বিশ্ববিদ্যালয় একটা তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত ক’রে অরুণাংশুকে অনুরোধ জানাল অনশন ভঙ্গ ক’রতে।...অরুণাংশুর অবস্থাও তখন শোচনীয়। অনশন ক’রলে সংসার চলে না। তা’র সাথে বাড়ির লোকদেরও উপোসের অবস্থা।...কলেজ থেকে টাকা না পাওয়া যাক, অগ্র উপায়তো

আছে। টুইশানির পথে বাধা সৃষ্টিতো অক্ষয়-পরমেশ কেউ ক’রতে পারবে না। ধর্মঘটের জগ্ন সে পথও বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে তা’কে মেনে নিতে হোল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ। তদন্ত-কমিশনের ফল অবশ্য অননুমোদন নয়।

কেমন ক’রে কোথা দিয়ে সমুদ্রোপকূলে জলস্তম্ভ ভাঙনের মতো ঘটনাস্তম্ভ তার উপর নেমে এল, ভেবে অরুণাংশুর বিস্ময়ের শেষ নেই। একটা ঝড়ো মেঘের মতো তার জীবনের আকাশে মনোরমা-নির্মল-নন্দিতার উদয়, সমস্ত তছনছ ক’রে তার। যখন চলে গেল, তখন সর্বত্রই শ্মশানের রিক্ততা তা’র মনের বাইরে ও ভিতরে। আধুনিক বড়লোক ও ক্ষমতামালীদের সমাজের উপর একটা নির্মম আক্রোশে সে ফুলতে থাকে। কিন্তু কিছুই করবার নেই। প্রাক্তনের গতি প্রতিহত করা যায় না। মাহুষতো শুধু কল; অক্ষ নিষতির হাতে পাশার খুঁটি। এখানে উত্থান পতনের কোন নিয়ম নেই; প্রতিটি ঘটনার চেউ আপন খেলালে সৃষ্টি হচ্ছে, আবার আপনিই বেলা-ভুমে আছড়ে পড়ে ইতিহাসের গতিকেই শুধু অশান্ত রাখছে। তা’র আর কোন কাজ নেই—না নিঃস্রম, না নীতি।.....

যেদিন অক্সিসের ঘটনা ঘটে, সেই দিনই অরুণাংশু অঘোষ ও মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রে সব বলে। মনোরমা খুব দুঃখ ক’রে অঘোষ ও অক্ষয়কে দোষারোপ করলো। অঘোষ অলস ও নির্বোধ; অক্ষয় নির্ভর, অমাহুষ। নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়ে বললে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক’রব আপনার একটা কাজের জগ্ন। আপনি কিছু ভাববেন না। শোঁকাকে পড়ানর আর প্রয়োজন নেই; তবু আপনি মাঝে মাঝে আসবেন। নন্দিতা ওর পড়া বুঝে নেবে।...আপনার পাওনার মধ্যে এই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি। পরে আবার দেব। সত্যি আপনাদের জগ্ন কষ্ট হয়। কী ছিলেন, কী হয়েছেন!

অরুণাংশু মনোরমার মুখের পানে চেয়েছিল। মহিলার জগ্ন তারও কষ্ট হয়। পাঁচখানা নোট তাঁর হাতছাড়া হতেই মনে হোল যেন পাঁচখানা পাঁজর তাঁর খুলে গেল।...অরুণাংশু আর সেখানে যায়নি। জীবন-সংগ্রামের ঘূর্ণিপাকে প’ড়ে আর সময়ও করতে পারেনি।

## এবারের পূজা

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এট-ল

এ বৎসরে পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, মহালয়ার প্রাতে কলিকাতা আকাশ বাণী অনুষ্ঠিত ‘মহিষাসুর মর্দিনী’। বাণীকুমার, বীরেন ভদ্র ও পঙ্কজ মল্লিকের অসাধারণ কৃতিত্ব এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে, পরিপূর্ণভাবে। ভক্তমণ্ডলী সে-কারণে তাঁহাদের কাছে বারপরনাই কৃতজ্ঞ।

কলিকাতার পূজা এখন সার্কসজানীর একচেটিয়া। সার্কসজানীর প্রচেষ্টার সাফল্য অসমীত হইবে হয়তো পূজা-মণ্ডপাদিতে সহস্র সহস্র নরনারীর সাগ্রহ সমাগমে। মনোরম বস্ত্রিকাদিসহ মণ্ডপাদির শ্রী পুলকিত করিয়াছে বিপুল জনতাকে।

জনতার শৃঙ্খলা রক্ষা সর্বক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সুস্থ না হইলেও, জনতার বিপুলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা আয়ত্বে রাখিবার প্রচেষ্টা যে প্রশংসাযোগ্য তাহা বলা যায়। আমরা কিন্তু মনে করি, জনতা-পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবকের যান আরও উচ্চাঙ্গের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মণ্ডপসজ্জা ও আলোকমালা প্রভৃতিতে ব্যয়ের মাত্রা দেখিলাম বিপুল। ব্যয়ের তুলনায় সজ্জাকরণাদি যে ক্রেটিহীন তাহা আমাদের মনে হইল না। আমাদের ধারণা এ বারবে ব্যয় সংক্ষিপ্ত বেশ কিছু করিলেও মণ্ডপাদির মনোহারিত্বের লাভ কিছু মাত্র হইত না, যদি সুযোগ্য বিশেষজ্ঞের হস্তে ইহা সমর্পিত হইত।

আর একটা কথা, কলিকাতার সার্কসজানীর পূজার সংখ্যা কম হওয়া উচিত। মণ্ডপাদি সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব একেবারে লোপ পাওয়া উচিত। লোপ পাইলে প্রচুর অপব্যয়ের হস্ত হইতে কর্মকর্তারা নিস্তার পাইবেন।

আর একটা ব্যাপার বাহা আমাদের লক্ষ্যে পড়িয়াছে, তাহা এই। প্রসাদ বিতরণ নামে মাত্র হয় জনসাধারণের মধ্যে। তাহার মাত্রা ও সংখ্যা হ্রাস করাইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাইতে মনযোগী হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

বিধিসম্মত পূজা করান’ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় অভিমত, ইহা যোগ্যতর হস্তে হস্ত করানর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

আছে। তদুপযুক্ত আয়োজনেরও আবশ্যকতা রহিয়াছে। সে-কারণে বাহাডম্বরের ইতরবিশেষ যদি ঘটে কিছু, ঘটুক। মাতৃপূজার অদ্বহানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রতিমাদি বাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে, তন্মধ্যে বাগবাজার সার্কসজানীর প্রতিমা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে পরিপূর্ণভাবে। মাতৃমূর্তির ছোঁয়াচ তাহাতে দেদীপ্যমান। গিরীশ-পার্কের প্রতিমা ও ফায়ার-ব্রিগেডের প্রতিমাও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ কলিকাতার নবদুর্গা ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছে।

আমরা বারপরনাই দুঃখিত যে, অগ্ন্যাক্রম অধিকাংশ প্রতিমাদি সম্বন্ধে আমরা এ-কথা বলিতে পারিতেছি না। মাতৃমূর্তির এতটুকু হ্রাস-রক্ষি আমাদের প্রাণে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে।

মাতৃমূর্তির স্থানে ছায়াচিত্র-তারকার অভ্যদয় কেবল মর্ম্মবাতী নহে, প্রাণবাতী। মাতৃমূর্তির এমন অমর্যাদা-অচিন্ত্যনীয়। মুঠি মুঠি টাকা দিয়া সার্কসজানী বাহারা পুষিতেছেন, তাঁহার সজাগ হইলে একদম্ব ঘটনা কিছুতেই ঘটিতে পারে না। সাধু সাবধান।

দক্ষিণ কলিকাতার সজ্জাশিল্পী প্রতিমা এ-অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক দর্শক আকর্ষণ করে। প্রতিমার শিল্প-কলার মাধুর্য্যই নাকি ইহার কারণ। শিল্পমাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠ ইহাতে যতই থাকুক না কেন, মাতৃরূপ তাহাতে ফুটাইয়াছে কিনা, ইহাই হইল একমাত্র প্রশ্ন। ঐ প্রতিমার শিল্পাভি-শয্য প্রতিমাকে প্রহেলিকায় ছাইয়া দিয়াছে, ইহা আমাদের অকপট অভিমত।

বিগত পূজায় যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইল সেই ব্যয়োপযোগী বিশুদ্ধ আনন্দ কি সত্যিই আমরা ভোগ করিয়াছি।

কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্য্যন্ত কাহারও মুখে হাসির মত হাসি দেখিতে পাই নাই আমরা। অল্পপরে কা কথা, শিশুদের নয়নে-বদনেও পূজার স্বচ্ছ আনন্দলহরীর চিহ্নমাত্র আমরা দেখিতে পাই নাই।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা বাঙালীর নিজস্ব উৎসব। বাঙালীর প্রভাবে ইহা ভাবতের বহু স্থানে প্রবর্তিত হইয়াছে। সেই পূজা, সেই উৎসবের ইতরবিশেষ বাঙালীরই দেশে, বড়ই বেদনাদায়ক।

পূজায়, পত্রিকাদির ‘পূজা সংখ্যা’ বিজ্ঞাপনের ভাৱে ‘পকেট-রোচক’ হয় খুবই। আয়তন দৃষ্টে মনে হওয়া অনেকের অস্বাভাবিক নহে, ‘আকার সদৃশ প্রযত্ন’ সংখ্যাটিতে আর যাহাই থাকুক, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পূজা সম্বন্ধে ‘প’ও থাকে না। বিজ্ঞাপনের দৌলতে অর্থ আমদানী যাহা হয় তাহাতে পূজা সংখ্যার মূল্য খুব কম করিলেও আসিয়া যায় না। তাহা না করা মতলব করিয়াই। যুগধর্ম্য হইতেছে, ‘যার যত হাঁক তার তত জাঁক।’ জাঁক যে করিতে পারা যায় না, পূজা সংখ্যা নষ্টায় ছাড়িলে।

পুরাকালের ‘বদ্ববাণী’, ‘হিতবাণী’র পূজা সংখ্যার কথা মনে পড়িতেছে। বাহির হইবামাত্র সত্যই লুঠ হইয়া যাইত দুইখানি পত্রিকাই। পত্রিকা থাকিত পূজার কথায় ভরপুর। ছবি, ছাপা, রংতামাসা, গল্প-গুজবে ভরা। পরিবেশক সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা। পূজার সর্বাদীন হুঁহু আলোচনাদির সঙ্গে এই সুবের সংযোজনায় পূজা-সংখ্যা জনসাধারণের চক্ষে বড়ই লোভনীয় বোধ হইয়াছে। সে-সব পূজা-সংখ্যা বহু ব্যয়ে প্রকাশিত হইলেও, নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। পূজা-পত্রিকা ও তার বিষয়বস্তু বিচারে সে-কাল ও এ-কালের পাঠক মানস ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে মা দুর্গাকে কস্তারূপে আবাহন আমরা করি। সেই রূপেই মায়ের আবাহন ও পূজার প্রবর্তন আমরা করাইয়াছি ভারতের নানা স্থানে। প্রবর্তক আমরা কিন্তু ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। ওঠ ভাই। জাগো। না জাগিলে বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সব কিছু যে যায়।

\* \* \*

বছর দুই পূর্বের পূজার একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ঘটনাটি ‘আপ-টু-ডেট’ সম্পর্কে আমার পৌত্রীকে লইয়া।

“দাছ, দাছ দেখে যাও, up-to-date”—হাত ধরিয়া দাছকে টানিয়া লইয়া গেল নয় বৎসরের পৌত্রী কাচঘর হইতে up-to-date দেখাইতে—

দাছ দেখিল রাস্তায় একটা বেশ বড়সড় মেয়ে মুখে চূণঘসার মত কি ঘসিয়া, ঠোটে আলতা দিয়া, পায়ে নাগরা পরিয়া, আর পরণে কি সব সাঁটিয়া যাইতেছে পূজা-মণ্ডপে। পরণে যা তার রং, আর মেয়েটির হাত পা মুখের রং মিলিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহা, পথচারী কেহ জিজ্ঞাসাও করিতে পারে “এ সংটার দাম কত।”

দাছ হাসিয়া পৌত্রীকে বলে, ‘বাঃ বেশত’—

পৌত্রী—ওর কাণে, গলায় গয়না দেখছ—

দাছ—হঁ, ও সবও ত’ বেশ।

পৌত্রী—জান দাছ ও-সব পেতলেরও নয়। তবু টং কত—

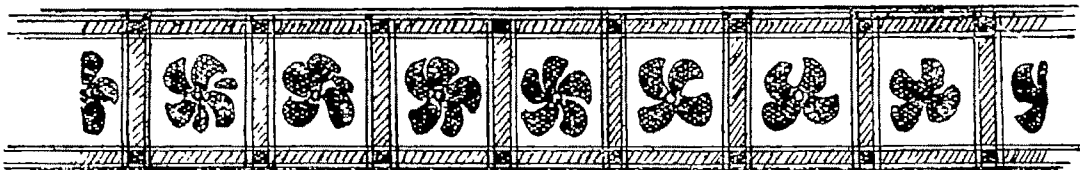
দাছ—আচ্ছা থুতু তা তোর ওতে এত রাগ কেন?

পৌত্রী—রাগব না। সং সেজে নকল গয়না প’রে লোক ঠকাবে।

up-to-date নিজের পথে গেল। পৌত্রী দাছকে বলিল, চল দাদির কাছে। দাদির কাছে যাইয়াও up-to-date-এর নিজার নাই। বলে—দাদি তোমার কত কি থাকতেও কিছু তুমি প’রবে না। আর ওই বুড়ো মাগীটা—ব’লতে যেমা ক’রছে দাদি—

দাদি—ওরা ওই রকম রে ওই রকম। কাকের ময়ূর সাজার গল্প পড়েছিসত’—ওরা তাই। আর পূজো ক’রে নে। খেতে-দেতে হবে না।

দাছ শুনিল, দু’জনের কথা। মনে হ’ল তাঁর—মাহুঘের দুঃখ দৈন্ত বাড়ছে যত—up-to-dateও বাড়ছে তত। আর মনে হ’ল কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথা “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।”



# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ (জানুয়ারী—আগষ্ট) : ১৩৫৬-৫৭ বঙ্গাব্দ ॥

২৬

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

- ৬ জানুয়ারী—২২ পৌষ, ১৩৫৬ বঃ—সঙ্ঘগুরুর ৬৮তম আবির্ভাবোৎসব। এতদুপলক্ষে চাবি দিবসব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান। ৮ই তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর চাকচন্দ্র বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কচাৰ্য্য, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডাঃ সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চর শেঠ প্রভৃতির উৎসবে যোগদান। সঙ্ঘগুরুর ভাষণ। কালীপদ তর্কচাৰ্য্য কর্তৃক দেবভাষায় সঙ্ঘগুরুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ও প্রশস্তি পাঠ। সঙ্ঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সঙ্ঘগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে সুহৃদ্বর্গের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-বাণী।
- ৪ জানুয়ারী—চন্দননগরে সঙ্ঘের অন্নপূর্ণা মন্দিরের বিতল কক্ষে পূর্ণিমা-সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর বাণীপ্রদান।
- ৬ জানুয়ারী—সিঁথি বৈষ্ণব সম্মেলনীর উদ্যোগে সঙ্ঘগুরুর আবির্ভাবোৎসব পালন। কবির দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাট্টার পৌরোহিত্যে উৎসব-সভায় সঙ্ঘগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।
- ২৩ জানুয়ারী—চন্দননগরে বাণীপূজা, সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।
- ২৪ জানুয়ারী—সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে ন'-পাড়া পল্লী সংস্কার সমিতির উদ্যোগে অহুষ্টিত পল্লী-সভায় গ্রামবাসিগণের প্রতি সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।
- ২৭ জানুয়ারী—এই বর্ষের ২৬ জানুয়ারীতেই ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—এতদুপলক্ষে সঙ্ঘগুরু ও বিশিষ্ট নাগরিকগণের আস্থানে কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে সভাধিবেশন। নব রাষ্ট্রকে অভিনন্দন করিয়া সঙ্ঘ গুরুর ভাষণ।
- ২৭ জানুয়ারী—সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সভ্য, অর্থ-প্রতিষ্ঠানের অগ্রতম ডিরেক্টর কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ব্যবসা বাণিজ্যোপলক্ষে হংকং যাত্রা। সঙ্ঘগুরুর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রদান।
- ৩০ জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধীর অরণ দিবসোপলক্ষে অহুষ্টিত সঙ্ঘ-সভায় সঙ্ঘগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।
- ২ ফেব্রুয়ারী—সঙ্ঘে মাঘী-পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর বাণী।
- ৫ ফেব্রুয়ারী—মানভূমের শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের সভাপতিত্বে নৈহাটীতে বৈষ্ণবচাৰ্য্য রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণের সন্মোৎসব-সভায় সঙ্ঘগুরুর বক্তৃতা ও রসিক-মোহনের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন।
- ২ মার্চ—প্রবর্তক প্রিন্টিং-এর বাটীতে কলিকাতার সপ্তদশ পূর্ণিমা সম্মেলনে কর্ম্মিগণের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগুরুর উপদেশ বাণী। এই দিনে কলিকাতায় প্রবর্তক সেবা সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির সভায় সঙ্ঘগুরুর যোগদান।
- ৪ মার্চ—দোল-পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর বাণী।
- ৬ মার্চ—কলিকাতার রাজসভানে প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সহিত সঙ্ঘগুরুর সাক্ষাৎকার। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের ফলে যে বিরাট সমস্কার সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও জওহরলালের হস্তে সঙ্ঘগুরুর স্মারক-লিপি প্রদান।
- ১৯ মার্চ—সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে নৃত্যগোপাল স্বতি মন্দিরে অহুষ্টিত জনসভায় চন্দননগরের জনপ্রিয় ডাক্তার ওবলাইচাঁদ শীলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন।
- ২২ মার্চ—পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্ধাস্তদের সাহায্যকল্পে চন্দননগরবাসীর কর্তব্য নির্ধারণের জন্য প্রবর্তক সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে সঙ্ঘগুরুর সভাপতিত্বে অধিবেশন—বিভিন্ন আলোচনা ও কার্য্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ।
- ২৩ মার্চ—সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে তাঁর ২৮শ বর্ষ উৎসবের জন্য পরিকল্পনা প্রদান।

২ এপ্রিল—পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর বাণী।

১৪ এপ্রিল ( ১ বৈশাখ, ১৩৫৮ বঃ )—নববর্ষে সঙ্ঘগুরু কর্তৃক আবাহন বাণী ও জ্যোতিষের দৃষ্টিতে বর্ষ-বিশ্লেষণ।

২০ এপ্রিল—পার্লামেন্টের সদস্য, হিন্দুপ্রাণ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পৌরোহিত্যে ২৮শ বর্ষীয় প্রবর্তক সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন—মেলা ও প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন—সঙ্ঘ গুরুর অভিভাষণ—ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী উৎসব। বিভিন্ন দিবসের সভাপতি ও বক্তাগণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগের পরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্ততম মন্ত্রী শ্রীমাদ বর্ষন, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, বীরেন ভট্ট, ডক্টর কালিদাস নাগ, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, বারিষ্টার জে. পি. মিত্র, ডক্টর হরিদাস চৌধুরী, স্মৃতিসাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদার, এড্‌মিনিষ্ট্রেটর বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ মে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসের প্রাতঃকালে সারস্বত মঠের স্বামী সিদ্ধানন্দ ও নলিনী ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে আশ্রম-সংলগ্ন ভাগীরথী সলিলে সপার্বদ সঙ্ঘগুরুর অবভূত-স্নান।

৭ মে—গৃহীভক্ত অরুণ চন্দ্র দোমের বাটিতে উপাসনা-বার্ষিকী উৎসবে সঙ্ঘগুরুর উপদেশ-বাণী।

৩১ মে—চন্দননগরে পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর বাণী প্রদান।

১১ জুন—চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে নব-নির্মিত গো-শালার উদ্বোধনোপলক্ষে সঙ্ঘগুরুর বাণী।

১৬ জুন—কলিকাতা কেওড়াতলা শ্রাশানে সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ২৫-তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মৃতি-সভায় দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন ও ভাষণ।

২১ জুন, ৬ আষাঢ়—সঙ্ঘজননীর ৬০তম আবির্ভাবোৎসব

—চারিদিনব্যাপী অস্থান—স্থানীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা—সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

২২ জুন—কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে সঙ্ঘগুরুর পৌরহিত্যে পূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

৬ জুলাই—সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে চন্দননগর হাসপাতালে বন-মহোৎসব অস্থানে বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্যে ও সার্থকতা সঙ্ঘে সঙ্ঘগুরুর বক্তৃতা।

১৬ জুলাই—ফ্রেণ্ডস্‌ ক্লাবের উদ্যোগে চন্দননগর, গোল্ড-পাড়া ‘অম্বিকা স্মৃতিমন্দির’-এ হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলনের অবিবেশনে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হুগলী জেলার অবিস্মরণীয় অবদান সঙ্ঘে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

১৬ জুলাই—সঙ্ঘগুরুর সভাপতিত্বে রিষড়া (হুগলী জেলা) অনাথাশ্রমে সাহস্‌সরিক উৎসবে তাঁহার বক্তৃতা।

২২ জুলাই—সঙ্ঘপূর্ণিমা সম্মেলনে সঙ্ঘে চাতুর্মাশ্রিত পালনের নির্দেশ ও বাণীপ্রদান।

৩০ জুলাই—চন্দননগরে সঙ্ঘগুরুর সভাপতিত্বে সঙ্ঘের গভর্নিং-বডির সভা।

১৫ আগষ্ট—কেবল সঙ্ঘে স্বাধীনতা দিবসোপলক্ষে সঙ্ঘগুরু কর্তৃক জাতীয় পতাকোত্তোলন ও বক্তৃতা।

১৫ আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাবদিবসোপলক্ষে বিচারপতি কমলচন্দ্র চন্দ্রের কলিকাতা, ল্যান্ডাউন রোডস্থ ভবনে সঙ্ঘগুরু কর্তৃক “শ্রীঅরবিন্দ ইনষ্টিটিউট অব্‌ কালচার” প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ও বক্তৃতা। উপস্থিতি—ডক্টর শ্রীমাদ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর হরিদাস চৌধুরী, মন্ত্রী নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার, ডক্টর কালিদাস নাগ, বিচারপতি রমাশ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিচারক চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী, জগদগুরু শঙ্করাচার্য, জগন্ময় মিত্র প্রভৃতি।

১৬ আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাবোৎসবের দ্বিতীয় দিবসে সঙ্ঘগুরু কর্তৃক কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সন্তার উদ্বোধন ও বক্তৃতা।

( ক্রমঃ )



# স্বামীজীর পথ

শ্রী ২০৫

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

জনহীন নিশ্চিহ্ন নিবিড় অরণ্য। তার মাঝে প্রকৃতির এক বিচিত্র খেলায় তৈরী স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আশ্রম। একটি আশ্চর্য গিরিশৃঙ্গ। দেখে মনে হয় কে কার নিহৃত সাধনার জ্বলন্ত বৃষ্টি অরণ্যের গভীরে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে এই নিরালা গুহা নির্মাণ করেছিল। সূর্যালোক এ গিরিগহ্বর দর্শন করেনি কোনদিন। বর্ষার প্রবেশ পথও রুদ্ধ হয়েছে গাছ আর পাহাড়ের দেওয়ালে।

পথচলা মাহুঘের এখানে পৌঁছবার কথা নয়। এখানে মাহুঘ আসে পথ ভুলে। স্বামীজীও নাকি একদিন এখানে এসেছিলেন পথ ভুলে, আমিও এলুম পথ হারিয়ে।

আগতপ্রায় রাজির অস্পষ্ট অন্ধকারে তখন মহারণ্য সমাচ্ছন্ন। চেনা পৃথিবীতে যখন সন্ধ্যা নামে তার অনেক আগেই এখানে আঁধার ঘনিয়ে আসে। বন পেরিয়ে কোন জনপদে পৌঁছবার দুরাশাব সারাটা দিনই কেটে গেল অবিশ্রাম পনযাত্রায়। কিন্তু এ বন বুঝি আর শেষ হবে না। পদস্থ প্রতিনিবন্ধ তুলেছে। না 'পাদমেকম্'। রাজের আহাৰ্য কিছু সন্দেহ আছে। প্রয়োজন একটু নিরাপদ রাতের আস্তানা। প্রয়োজন একটু বিশ্রাম। তারই সন্ধ্যানে তাকাচ্ছি এদিক ওদিক। সময় বেশী নাই। একটু পরেই ঘন অন্ধকারে দৃষ্টি আর এগুবে না। উৎকণ্ঠার সাথে একটা অজানা ভীতিও মাঝে মাঝে উকি দিচ্ছিল বৃকের মধ্যে। ঠিক এই মুহূর্তে যেন অকস্মাৎ সেই কপালকুণ্ডলার কাপালিকের দর্শন পেলাম। একটু যেন কেঁপে উঠলাম। এখানেও মাহুঘ!

ঘন-ক্লম্ব কেশ আর শ্মশ্রুতে আবদ্ধ আবৃত এক সম্যাসী চলেছেন ধীর পদে। সেই অন্ধকারেও দেখলুম তার চোখের অপার্থিব দ্যুতি। অরণ্যের মতই গম্ভীর আর

প্রশান্ত। তন্ময়, আত্মসমাহিত। এই কি সেই সত্য দ্রষ্টা পথ-প্রদর্শক যার সন্ধ্যানে আমার এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা? সুস্পষ্ট কোন আশা নিয়ে পথে রেফাইনি যদিও। কিন্তু চলার পথে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কিসের যেন সন্ধ্যানে একদিন বেরিয়েছিলাম পথে। কে সে? এই কি সেই 'পুরুষ মহাস্তম'?

একেবারে মুখোমুখী হয়ে প্রশ্ন করতেই সম্যাসী চমকে চোখ তুলেন। একটু যেন বিস্ময় সে চোখে। একটু বা জ্বাস।

কে তুমি? নিদ্রিত অরণ্য যেন সচকিত হয়ে উঠল সে প্রশ্নে। কোন হিংস্র স্বাপদাক্ষির মত জলে উঠল সম্যাসীর চোখ দুটি। এ চোখে কই সে বাস্তব বাৎসল্যের অভয় আহ্বান?

একটা অজানা আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠল আমার সারাদেহ। কিন্তু অভিনেতা কালিকিঙ্কর কথা বল্ল সংযত নির্ভিকতায়।

—স্বামী নির্মলানন্দ আমার বর্তমান পরিচয়। আমি বাঙালী।

স্বামীজীর বাংলা প্রশ্নে 'আমি বাঙালী' কথাটার উপর ইচ্ছা করেই একটু বেশী জোব দিলাম।

অদৃষ্ট লাগছে স্বামীজীর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা। যেন কোন আবিষ্কারের সন্ধানী দৃষ্টি।

—কি করে এলে এখানে?

—সে প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি স্বামীজী।

নেতা কালিকিঙ্কর এবার দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রতিপক্ষের মুখোমুখী।

স্বামীজীর চোখদুটি আর একবার জলে উঠল।

—সাবাস্ বাঙালী বাচ্চা। স্বামীজীর দৃষ্টিটা এবার সহজ হয়ে এল। ই্যা সে প্রশ্ন তুমিও করতে পার। আমি এসেছিলুম একদিন দেশমাতৃকার আশ্রানে পথের সন্ধানে।

—আমি এসেছি দেশমাতৃকার আশ্রান থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথের সন্ধানে।

সন্ন্যাসীর দৃষ্টিটা আবার তীক্ষ্ণ হ'ল।

—কে তুমি? দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন স্বামীজী।

আমি নিরুত্তর।

—বলতে চাওনা? বেশ। কিন্তু আমাকে কি চিনতে পার? দেখেছ কোন দিন?

এইবার দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হল আমার। বারবার নিরীক্ষণ করলুম সন্ন্যাসীর আপদমস্তক। তারপর সংক্ষেপে বলুম, না।

—তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

কে এই সন্ন্যাসী? কেন এই উৎকর্ষ? এই সন্দেহ?

—এ প্রশ্ন কেন করছেন? তাছাড়া বিশ্বাসের প্রয়োজনই বা কি। আমি তো এক রাজ্যের অতিথি। পরম্পরের অপরিচিত।

—অপরিচিত তুমি নও। তোমায় চিনেছি আমি। তুমি কালি—কালিকিঙ্কর মজুমদার।

একটা সোধেগ ভীতিতে সারাদেহ আমার আর একবার কঁপে উঠল। এই সুদূর নির্জন অরণ্যে এক অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর মুখে আমার নাম! কে ইনি? ছদ্মবেশী কোন পুলিশের লোক? ছবর বলেছিল পুলিশ নাকি আমার সন্ধানে সারা দেশটাকে চষে ফেলছে। কিন্তু এই নিবিড় অরণ্যে আমাকে ধরবার ফাঁদ পেতে প্রতীক্ষা করছে এদেশের পুলিশ? এ যে অবিশ্বাস। আজ আমার এখানে পৌঁছনটাই তো একটা দৈব-ঘটনা। নাকি এর মাঝে ছবরের কোন কৌশল আছে। উৎকর্ষায় আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠছি। কোথায় কোন কালিকিঙ্কর সারা ভারতব্যাপী বিপ্লবীদল গড়ে তুলছে, আর এখানে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতে পারছে না স্বামী নির্মলানন্দ। এ কি বিড়ম্বনা! চিংকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমরা ভুল করেছ। সে কালিকিঙ্কর মরে গেছে। স্বামী নির্মলানন্দের মাঝে

তাকে খুঁজবার চেষ্টা বুধা। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনদিন, কোনোখানে।

কোন প্রতিবাদই করতে পারলুম না। ষথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বলুম,—আমাকে তো চিনেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তো আপনাকে……

—যদি তোমাকে কোনদিন আত্মপরিচয় দানের যোগ্য পাত্র ভাবতে পারি, পরিচয় সেইদিনই দেব। এবার এসো আমার সাথে। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে দৃঢ় কন্ঠ্যগুণের সুর।

সম্মোহিতের মত অহুসরণ করলুম।

চলতে চলতে স্বামীজী বলছেন,—নির্মলানন্দ বলে তোমায় চেনে তোমাব পাটির কেউ?

—চিনত না এতদিন কেউ। সম্প্রতি একজন চিনেছে।

—কে সে?

—আপনি চিনবেন না।

হয়তো চিনব। ভারতবর্ষের অনেককেই আমি চিনি। বিশেষ করে তোমার পাটির প্রায় সকলকেই। তুমি যে এদেশে এসেছ সে সংবাদও আমি রাখি। বলতে পার, এমন একটা সাক্ষাৎ আমি প্রত্যাশাও করছিলাম।

আবার সেই সন্দেহের কাঁটাটা খচ করে বিঁধল। ছবর সিং...পুলিশ...কথাবার্তায় সতর্ক হতে হবে। অতীতের বিপ্লবী নেতা কালিকিঙ্কর সচকিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করলুম। না, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রই বটে। কিন্তু তোমার থলির অটোমেটিকটা ঠিক আছে তো কালিকিঙ্কর?

—এসে পড়েছি।

কোথায় যে এসে পড়লেন সন্ন্যাসী, বুঝতে পারছি না।

—এই আমার বাসস্থান। আশ্রমও বলতে পার।

অন্ধকারটা ইতিমধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি আর মস্ত মস্ত জানোয়ার আকৃতির পাথর ছাড়া তো আর কিছুই দেখছি না।

সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করলুম,—আর বুঝি বেশী দূর নেই।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সন্ন্যাসী। সে হাসিতে সারা অরণ্য যেন কঁপে উঠল। মশাল জ্বালান একটা। মাটিতে পোতা আছে হাত দু'য়েক উঁচু একটা



শক্ত লাঠি। তারই মাথায় মশাল। মশালের আলোয় খানিকটা জ্বালা আলোকিত হয়ে উঠল বটে। কিন্তু এ-আলোতেও বাসস্থানের নিশানা পেলুম না।

—এস, ঠিক আমার পেছনে পেছনে। বরং দাও তোমার হাত। হাত বাড়িয়ে ধরলেন আমার ডান হাত। কঠিন স্পর্শ। অবিস্মৃত পাথরের উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সন্ন্যাসী আর একটি মশাল জ্বালালেন। আলোকিত হয়ে উঠল একটি গিরি গুহা। দেখলুম এবার সন্ন্যাসীর বাসস্থান।

—বাইরের মশালটা যে.....

—ওমনি জ্বলবে সারারাত। বস্ত্র-পশুগুলো আগুনে ভষ্ম পায়।

—কিন্তু বাইরে ঐ নিশানা রেখে নির্ভয়ে ভিতরে থাকতে পারেন কি? পশু না হয় আগুন দেখে পালায়, কিন্তু মানুষ তো ঐ আলোতেই পথ চিনে নেবে।

—তাহলে তো বাসস্থানেই পৌঁছে যাবে। সন্ন্যাসী হাসলেন রহস্যময় হাসি।

সমতল একখণ্ড পাথরের উপর মৃগচর্ম বেহান। একধারে মোটা একখানা তিক্ততী কয়ল ত্রুপরিপাটি করে ভাঁজ করা। এই বুঝি সন্ন্যাসীর শয্যা। কাঁধের কোলাটি নামিয়ে রাখলেন ঐ শয্যার পরেই। শিয়রে রয়েছে কয়েকখানা প্রাচীন গ্রন্থ। মনে হয় ধর্মগ্রন্থ।

গুহাভ্যন্তরে বেশ গরম লাগছে। বাইরেব শীত শীত ভাবটা নেই। স্বামীজী আলখাল্লা খুলে নগ্ন দেহে এসে দাঁড়ালেন সামনে। জামা খুলবার একটা প্রেরণা আমিও অনুভব করছিলুম। কিন্তু স্বামীজীর স্ত্যাম দেহের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমারও একটু গর্ব ছিল। কিন্তু এ দেহ অতুলনীয়। কী শালগ্রাম সিংহগ্রীব তেজোদীপ্ত কান্তি!

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

—কি দেখছ!

—এতক্ষণ দেখছিলুম আপনার বাসস্থান। এবার দেখছি আপনাকে।

—শুধু চোখে দেখেই খুসি হবে না, পরীক্ষা করেও দেখতে পার।

—আপনি কি আমার উপহাস করছেন?

—না, উপহাস নয়। নেতা কালিকিঙ্করকে দেশবাসী যে আসনে বসিয়ে দিয়েছে, সে আসনে বসবার যোগ্যতা তার আছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখা যে আমারও প্রয়োজন।

—তাতে আপনার লাভ?

—লাভ তো আমারই। আমার মুক্তি। এই পাঁচ বৎসর ধ'বে যার প্রতিনিধিত্ব করছি এবার বাকিটুকুর ভার তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। তার আগে একবার দেখে নিতে হবে না, সে ভার বইবার শক্তি তার আছে কি না।

—কি বলছেন আপনি? আমার প্রতিনিধিত্ব...

—হ্যাঁ তোমার। তোমারই কাজ। সারা ভারত-ব্যাপী বিপ্লব-দল গঠন।

এতক্ষণে চিনলুম দেশবাসীর কল্পনায় গড়া সেই কালিকিঙ্করকে।

—কে আপনি? কেন আমাকে নিয়ে এই মিথ্যা— খেলা খেলছেন? আমি চাইনা খ্যাতি। চাইনা নেতৃত্ব। চাই একটু নিশ্চিন্ত অবসর।

—এই পাঁচ বৎসরে প্রচুর তো অবসর পেয়েছ! পেয়েছ কি কোন পথের সন্ধান?

—পথের সন্ধান আমি বেরোইনি। বেরিয়েছিলাম পথ ভোলায় সাধনায়! স্মৃতি আছি বিশ্বাসিত অতলে ডুব দিয়ে। কিন্তু আপনি কেন এভাবে নেপথ্যে অভিনয় করে আমাকে পুলিশের শত্রু করে তুলছেন? রাজনীতি আমি ছেড়ে দেয়েছি।

সন্ন্যাসীর মুখে বিবাদের ছায়া।

—এত ভীষণ ভূমি কালিকিঙ্কর। পুলিশের ভয়েই শ্রেষ্টের পথ ছেড়ে দেবে! কিন্তু ভূমি ছাড়তে চাইলেও দেশবাসী যে তোমায় ছাড়তে চায় না। তারা জানে তাদের প্রিয় নেতা কালিকিঙ্করকে। তাইতো আমার এ প্রতিনিধিত্ব। এ নেপথ্য সাধনা। পুলিশের শত্রু হয়তো করে তুলেছি, কিন্তু দেবতাও করে তুলেছি মানুষের কাছে। ক্ষেত্র তোমার প্রস্তুত। এবার শুধু স্নকৌশলে ফসল তুলে নেওয়া।

—সেটুকুও আপনি করুন। রেহাই দিন আমাকে।  
আমার কণ্ঠে বিরক্তি স্পষ্ট।

—তুমি পুরাতন, আমি নতুন। সম্যাপীর কণ্ঠে  
অমরোধের স্বর। নতুনকে চিনতে সময় নেবে। তাতে  
মূল্যবান সময়ের অপচয়ই হবে। ফল হবে বিলম্বিত।  
এমন কি কুফলও সৃষ্টি হতে পারে দুই নেতার দুই দলের  
দলাদলিতে। থাক এ সব পরে হবে। তুমি পথিশ্রান্ত।  
বিশ্রাম করো। জামা খোলো।

আমার সঙ্কুচিত ভাবটা বুঝতে পেরেছেন স্বামিজী।  
প্রায় জোর করেই জামা খুলে নিলেন। সর্বদা একবার  
হাত বুলিয়ে দিলেন সন্নেহে। তারপর মোংসাংহে  
বল্লেন,—নাবাস বেটা। এ পাঁচ বৎসর তোমার  
ব্যর্থ হয়নি।

সার্থকতার কি তিনি দেখলেন, তিনিই জানেন।

এক কোণে জলের বালতি মগ শুছোনোই রয়েছে।  
ছুজনেই হাত মুখ ধুয়ে নিলুম। অনেকটা সহজ মনে  
হচ্ছে এ পরিবেশ এবারে। স্বামিজীর ইঙ্গিতেই বসলুম  
ওঁর শয়ান।

নৈশ আহারের আয়োজন হচ্ছে। শুধু কয়েকটি  
ফল। আঙুর, বেদানা, আরও কিছু অচেনা ফল।  
আমার সামনে একটা ডিস রেখে সহাস্তে বল্লেন, এই  
খেয়েই আছি ক'বছর। তোমাকেও হয়তো থকতে হবে  
কিছুদিন। অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে ভাত রুটির চেয়ে  
এ অনেক রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর।

—এদেশে আমারও কম দিন হ'ল না। হাসলুম  
আমিও। ফলে আমি অভ্যস্ত।

সংক্ষেপেই সমাপ্ত হ'ল আহারপর্ব।

(ক্রমশঃ)

## শ্যামাপূজার একদিক

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার, পুরাণরত্ন

শ্যামাপূজা বাংলার বিশেষ ও বহুল জনপ্রিয় পূজা।  
তন্ত্রোল্লিখিত এই পূজার বিচিত্র ভাষ্য বর্তমান।  
আধ্যাত্মিক দিক ছাড়াও, এই পূজার দেশাত্মবোধের যে  
একটা দিক আছে তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচ্য।

ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্কীর্ণ কার্তিক মাস। এই মাসের  
অমানিশিতে শ্যামা মা পূজিতা হইয়া থাকেন। জাগতিক  
নিয়মেও দেখা যায়, এই মাসে বহুসংখ্যক লোক নানা  
উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া শমন সরনে প্রেরিত হয়। এই  
মাসেই ষমের দক্ষিণ দ্বার উদ্বাটিত থাকে। সেই জন্তই  
হিন্দুগণ এই মাসেই প্রকৃতির ভয়াবহ মূর্তি নির্মাণ পূর্বক  
তাঁহার পরিতোষার্থে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া  
থাকেন। চণ্ডীতে উক্ত আছে :

ক্রুটা কুটীলাং তস্তা ললটফলকাদ্ ক্রতম্।

কালি করালবদনা বিনিক্রাস্তাসিপাসিনী॥

বিচিত্র খটাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।

দ্বীপচর্ম পরিধানা শুকমাংসাত্তৈরবদা

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন ভীষণা

নিমগ্না বক্তনয়না নাদাপূরিত দিগ্‌মুখা॥

রণক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য প্রকৃতিদেবীর কালিকা মূর্তিতে  
সম্যক প্রকাশ পাইয়াছে। রণরঙ্গ বেশে মহাকালের  
তাণ্ডব নৃত্য। অস্তুর শোণিতে রঞ্জিত দেহ, নুমুণ্ডমালা  
কণ্ঠে ধারণ। মানবীজুলীর মেথলা কটিদেশে পরিহিত।  
উষ্ণ শোণিত পানার্থে রসনা লক্ লক্ করিতে করিতে  
অসি হস্তে তাণ্ডব নৃত্য। উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট শায়িত  
পরমাত্মারূপ মহেশ্বর শবরূপে পদমূলে ধূলুটিত। ইহাই  
তন্ত্রোক্ত কালিকা মূর্তির সম্যক পরিকল্পনা।

পুরাণে উক্ত আছে, শঙ্কু-নিশঙ্কুর যুদ্ধে গৌরাজিগী মা  
ভগবতী, ভীষণা-মূর্তি ধারণ কবিয়া জগৎ সংহার করিতে  
উদ্যতা হন। তৎকালে তদীয়া পদবিছাসে ধরাভল  
রসাতলগামী হইবার উপক্রম করিলে, সৃষ্টি রক্ষাহেতু পরম

পুরুষ মহাদেবান্দিদেব মহেশ্বর শব্দরূপ ধারণ করিয়া তদীয় পরমাপ্রকৃতির পুরোভাগে পতিত হন। মহাকালী রণরঙ্গ বেশে স্বীয় স্বামীর উপর পদক্ষেপ করার লক্ষিত হইয়া জিহ্বা নিঃসরণ করেন।

দার্শনিকের মতে কাল-শক্তিই মা কালী। মহাকাল ও কালশক্তি অভিন্ন। অনাদি কাল হইতে মহাকাল-রূপিনী মা কালী পর-পীড়ক, গর্ভিত পাপীকে ও সাধুজন-শত্রু অস্ত্ররূপে ভীম-মুষ্টি ধারণ করিয়া নির্মমভাবে বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহাই কালিকারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তত্ত্বকল্পিত মায়ের ধ্যানমুষ্টি—

মহাকালং যজ্ঞেন্দ্রব্যো দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং ।

বিলম্বং দণ্ডখটাজ্যো দংষ্ট্রা ভীম মুখং বিভূম্ ॥

ব্যাঘ্রচন্দ্রাঘ্রতং কটিং তুন্দিলং রক্তবাসনং ।

ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিকৃষিতং

জটাবারলসচ্ছত্রং খণ্ডমুগ্ধং জলদ্রিভম্ ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১১৭৬ সালের মঘস্বরের শ্রামাদিনী বাংলা মায়ের অমুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : “কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী মা। দ্ব্যতসর্কস্বা এই জন্তু নয়িকা। আজ দেশের সর্বত্র শ্মশান—তাই মা ককালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।” ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত কমলাকান্তও বদমাতার অমুরূপ রূপ-বর্ণনা দিয়াছেন...“সেই সে প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশী অন্ধকারে ব্যাপিল। জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল।” তখন যুক্তকরে সজল নয়নে কমলাকান্ত ডাকিল—“উঠ মা হিরণ্যায়ী বঙ্গভূমি”।

মা আধ্যাত্মিক্তি করালবদনী শ্রীচণ্ডী বা শ্রীদুর্গার রূপান্তর মাত্র। ইনি গিরিরাজ কন্যা, সেই হেতু পার্বতী নামে অভিহিতা।

ভূতস্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, সমগ্র আর্ধ্যাবর্ষ মহাদেশ হিমাচল হইতে উদ্ভূত। গঙ্গা, যমুনা, সিঙ্গু, ব্রহ্মপুত্রাদির পলিমাটি-গঠিত এই ভারতভূমিই হিমালয় কন্যা পার্বতী।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এ দেশের জলবায়ুর তারতম্যে, অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। শস্ত্রশ্রামলা নন্দনদীমেখলা ভারতবর্ষই শ্রামাদিনী নামে অভিহিতা। সেই জন্তই মায়ের আর এক নাম শ্রামা। ইতিহাসে দেখা যায়, আর্ধ্য, শক, হুন, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ প্রভৃতি বহিরাগত জাতি সমূহকে ভারতমাতা আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন। কেহই তিন শতাব্দীর অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। সকলেই মহাকালের চরণে লীন হইয়াছেন। অগ্নায় অত্যাচার, পরপীড়ন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মগজ্বর, যুদ্ধ ইত্যাদির ফলে এই সব রাজত্ব ধ্বংস হইয়াছে। এই ধ্বংসের প্রতীক-চিহ্নই মায়ের মুণ্ডমালা।

আমরা ভারতবাসী চিরদিনই দুর্ভিক্ষ-দুর্দিশার অমানিশিতে ভারতমাতাকেই কালীমাতারূপে অর্চনা করিয়া থাকি। পূজার প্রধান উপকরণ আত্মবলি। কিন্তু আমরা তাহার পরিবর্তে ছাগশিশু বলিদান করিয়া কর্তব্য শেষ করি। ইহাতে মাতা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ফলে পূজাবীও অচরিতার্থ থাকিয়া যায়।

একমাত্র উৎসর্গ ও আত্মদানই মুগ্ধ মাটিকে চিহ্নায়ী-রূপে উজ্জীবিত করার উপায়। ইহাই কালী পূজার ও অর্চনার ষণ্মার্থ তাৎপর্য। ষণ্মা—

ও জয় জয় দেবী চরাচরদারে।

নয় নয় মাতরঘাণব পারে।

জহি জহি ভারত দুর্গতি ঘোরং

কুরু কুরু মাতারূপেক্ষিত ত্রাণম্।

এই অঙ্গলী-স্তোত্রে চরাচর ব্যাপী দেবীর জয় দিয়া ভারতের ঘোর দুর্দিন নাশ ও ভারত-সন্তানের পরিত্রাণই প্রার্থনা করা হইয়াছে। বস্তুত বাঙালী মানসে চিহ্নায়ী শক্তিমাতাও দেশজননী মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

বন্দে মাতরম্ !



# শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা

মহর্ষি প্রেমানন্দ

শ্রীচণ্ডীতে দেখিতে পাই কথোপকথনরত তিনটি মানব চরিত্র। অধ্যাত্ম সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য বহন করে এরা। মুনি মার্কণ্ডেয়—ব্রাহ্মণ, উপদেষ্টা। স্বরূপ ও সমাধি যথাক্রমে ক্রিয় ও বৈশ্ব—তদুপদেশামুসারী। জৈবী জীবনের সর্ব চণ্ড বিনাশ করে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ)—নিজেই চণ্ডীরূপা। “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মইব”। তাইত অপরের চণ্ড বিনাশের অধিকার আসে তাঁর। সমাজ-মানসে ক্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র বর্ণের চণ্ড নাশের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন ব্রাহ্মণ—উপদেষ্টার আসনে স্থিত। পরিচ্ছন্ন মানসে ব্রহ্মজ্ঞান-সংবেগ নিয়েই জগতে ভ্রম নেয় প্রত্যেকটি মানব শিশু। পরে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বহির্জগতের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে ও অন্তর্লোকে ইন্দ্রিয় বিকাশের কলরোলে হারিয়ে যায় জীবনের সেই বিশুদ্ধতা—সেই ব্রাহ্মী-জ্ঞান। বর্ণ্যছে দেখা দেয় শূদ্রত্ব। আবার সর্ব-অপবিত্রতার ক্রমমুক্ত হয়ে পবিত্রতার পুণ্য পরশ লাভে বৈশ্ব ও ক্রিয় বর্ণের মাধ্যমে সে ফিরে পায় হারিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মী জীবন। ব্রাহ্মীচেতনা নিয়ে জগতে আসা, আবার এই চেতনা নিয়েই জগত থেকে বিদায় নেওয়া—এইত অধ্যাত্ম সাধনা। এইত শাস্ত্রের নির্দেশ। কবি গের্টে বলেছেন—“He is the happiest man who can set the end of his life in connection with the beginning.”

ব্রাহ্মী চেতনাময় যিনি তিনিই ত ব্রাহ্মণ। তাই তাঁর লক্ষণ বর্ণনায় ব্রহ্মোপনিষৎ বলেছেন—

শিখা জ্ঞানময়ী যন্ত উপবীতক তময়ম্।

ব্রাহ্মণং সকলং তন্ত ইতি যজ্ঞোবিভো বিদুঃ।

(বেদজ্ঞ সুধীগণ বলে থাকেন—যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ও তময়তা অর্থাৎ ব্রহ্মময়তারূপ সূত্র ধারণ করেছেন, সকলের মাঝে তিনিই ব্রাহ্মণ)।

বাসনাময় সাধনা ভুক্তি-অমৃগ, কিন্তু নির্কাসনা মুক্তি-দাত্ত্ব। যে পথেই সাধনা অভিগমিত হোক না কেন শক্তির চরম অবস্থাকে অমৃতভূতির কোঠায় পেতেই হবে। সে পাওয়াতে সাধককে ছয়টি স্তর ভেদ করে যেতে হবে

সপ্তম স্তরে (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য)। বধ হবে সাতটি অস্তুর তাদের সকল অমৃতচরসহ। কিন্তু চরম ভুক্তিরও পরিণাম বা পরিণতি কিন্তু মুক্তিতেই।

মধুকটভ বধ—আত্মিক জ্ঞান লাভের অভিযাত্রায় স্বরাগর সংগ্রামের প্রাথমিক পর্য্যায়েরই মধুকটভ বধ। উপাখ্যানটি হ’ল—প্রলয়ে জগত জলপূর্ণ। বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় মহামায়া প্রভাবে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। তখন বিষ্ণুর কর্ণমল হ’তে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুই অস্তুর উদ্ভূত হ’য়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণে উদ্যত হ’ল। সে সময় বিষ্ণুর নান্তিপদ্যে স্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই অস্তুরদ্বয় ও নিদ্রিত জনার্দনকে দেখে যোগনিদ্রার স্তব করলেন। উহাতে বিষ্ণু যোগনিদ্রা হ’তে উথিত হ’য়ে পঞ্চবর্ষ-সম্ভ্রম অস্তুরদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তখন বলোন্মত্ত অস্তুরদ্বয় বিষ্ণুকে বর প্রদানে ইচ্ছুক হ’লে বিষ্ণু “তোমরা আমার বধ্য হও” বলে বর চাইলেন। অস্তুরদ্বয়ও তদুত্তরে বলল—“যেখানে পৃথিবী জলে মগ্ন হয়নি, সেখানে আমাদের বধ কর।” শম্বা, চক্র, গদা, পদ্মধারী এক মুষ্টি তখন অস্তুরদ্বয়কে জঘনে রেখে চক্রঘারা শিরশ্ছেদ করলেন।

প্রলয়—(প্র-লয়) প্রকট রূপে বিলয় অবস্থা—মনের স্থির, নিশ্চল অসঙ্গ ভূমিতে স্থিতি। মনের স্থিরত্বে বায়ুর স্থিরত্ব। স্থিতি বাসনা বা সর্বক্রিয়া রহিত অবস্থা। বিশ্ব-ব্যাপ্ত প্রাণ সত্ত্বার (বিষ্ণুর) স্থূল স্থিতির মৌলিকরূপ কারণে (casual bodies) বিরাট ব্যাষ্টি নিয়ে তাঁর স্থিতি। শাস্ত্র তা’কে আখ্যা দিয়েছেন কারণার্ণব। রস হ’তেই স্থূল স্থিতির রূপায়ন শুরু। তাই স্থূল স্থিতির আদিভূমি (অপ্) সলিল। বিশ্বাত্মগ দৃশ্যমান রূপায়নে যেমন (সলিল) অপ্ নিকটতম আদি কারণ, তেমনি বিশ্বোত্তীর্ণ সত্ত্বায় ও সর্ব রূপায়নের আদি কারণ (cause) এই কারণ-সলিল। মনের স্বনই স্থূল ও লিঙ্গ দেহবোধ হয়ে আসে বিলুপ্ত, তখনই সে ক্রমে কারণ-দেহের বিরাট ব্যাষ্টিতে মের বিভূতি। ব্যক্তিবোধ বা ব্যক্তি চেতনার ঘটে অবস্থাপ্তি। সেটিই প্রাণসত্ত্বার (বিষ্ণুর) অনন্ত শমন। এক সমষ্টিভূত অবস্থা থেকে ব্যাষ্টিভূত অবস্থা।

অনন্ত কারণ-দেহে লীযমান হ'য়ে লীয়মান। এখানেই প্রকাশিত হয় বিষ্ণু সত্তার (প্রাণসত্তার—“প্রাণোহি বিষ্ণুঃ”) যোগনিদ্রা।

যোগনিদ্রা—যোগ=যুক্তি; নি=(অন্তর্ভাব); দ্রা=(দ্রুমান)। ব্যক্তি চেতনা যখন পরাচেতনায় বিলীন তখনই যুক্তি বা যোগ। সেই যোগে সকল অন্তর ভাব থাকে নিদ্রিত। তাইত এর নাম যোগনিদ্রা। যোগ-নিদ্রা আসে মহামায়ার প্রভাবে।

মহামায়ী—মহা=তেজ, মায়ী=রূপ।

যোগনিদ্রা আসে রূপাময়ী তেজঃশক্তির প্রভাবে। এই তেজঃশক্তি যখনই নিজেকে সম্বৃত করে নেয় তখনই শুদ্ধ হ'য়ে আসে প্রাণ-চাক্ষুঃ। সেই শুদ্ধতায় নিরুদ্ধ হ'য়ে আসে স্বপ্ননী ক্রিয়া। তখনই প্রলয়। এখানেই উদ্ভাসিত হয় মৌন লোক; মহামৌনী সত্তা। উপ-নিষদের—“তদরূপমনাময়ম্” অবস্থা। এই মহামায়ী নিত্য। তিনিই প্রাণ-প্রকৃতি। তাঁর সম্বন্ধেই গীতা বলেছেন—“প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্বাদী উভাবপী।”

পঞ্চভু—অনন্ত শয়নে শায়িতা মহামায়ী প্রভাবে যোগনিদ্রাচ্ছন্ন বিষ্ণু। নাভিমূলে ব্রহ্মা। নাভিমূল—যোগশাস্ত্র মণিপুর ও বলে তাকে। মণি অর্থে তেজ। জৈবী দেহস্থ তেজের সংহতস্থান সেটা। বস্তুধর্মী জৈবী বিকাশ সেই স্থানটিকে আশ্রয় করে হ'লেও, সাধকের সাধনাও অভিগমিত হয় মণিপুত্রের আশ্রয়েই, তাঁর দৈবী প্রদীপ্তির জন্ত। মণিপুত্রের এই দৈবী প্রদীপ্তির মাধ্যমেই প্রকাশ নেয় মনঃশক্তির তেজোসত্তা। সেটিই ব্রহ্মা। সেখানেই জীবের ব্যক্তিবোধ বা ব্যক্তিচেতনা।

অসঙ্গ নিশ্চল মনে ব্যক্তিবোধ (অহং) জাগৃতির সাধেই জাগৃতি নেয় সৃষ্টি চেতনায় সক্রিয় ভাব। বিশ্বাস্য সত্তায় সৃষ্টি চলছে দু'টা ধর্মে (virtues)। একটি তেজ এবং অপরটি বস্তু। সৃষ্টি চেতনায় সক্রিয়তায়ই ক্রীড়াশীল হয় বস্তুধর্মে। তখনই বস্তুধর্ম প্রভাবে প্রাণিক সত্তার কুসংস্কারের পঙ্কিল কর্ম হ'তে জন্ম নেয় জৈবী অহং (Sensual Ego) ও কীটবৎ বিচরণশীল কামনা-বাসনা। ইহারাই বিষ্ণুর কর্মমল হ'তে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ (কু ধাতু থেকে কর্ম, মল=পাপ, পঙ্কিলতা)। মন

(বোধ করা)+উ, ণ=মধু। কীটশব্দ—ভা+ভক=কৈটভ)। জীবের স্বীয় অন্তরজাত বস্তুধর্ম চায় তেজো-ধর্মকে গ্রাস করতে। বস্তুধর্মই আচ্ছন্ন করে রাখে জীবের তেজোধর্মের চেতনাকে। তেজোধর্মে সম্বিত-লব্ধ মানস-চেতনা বস্তুধর্মী মধু-কৈটভের সংহারের নিমিত্ত বিশ্বব্যাপ্ত সত্তায় সংহত নিষ্ক্রিয় শক্তির (যোগনিদ্রার) করে স্তব। সেই মানস চেতনায় প্রলয়ের বিলয় থেকে প্রাণ-চেতনা উদ্ধুক্ত হ'য়ে আবার চলে স্বপ্নের পথে, কর্মের পথে। জৈবী অহং আর বাসনার বিলয়ে সে কর্ম থাকে না কোন বস্তুধর্মী কৃতি-ভাব। প্রাণসত্তার স্বচ্ছন্দে হয় তার প্রসারণ, সংকোচন ও বিলয়। জীব তখনই ক্রমে হয় গীতায় উল্লিখিত সেই তদ্ব্যবস্থার অধিকারী—

চেতনা সর্বকর্মানি ময়ি সংনস্ত মংপরঃ

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভবঃ।

(গীতা ১৮।৫৭)

আত্মরক্ষার মানস চেতনায় প্রাণচেতনা (জনর্দন=লোকে থাকে যাঁকে যাঁক্ষা করে এই অর্থে) প্রবুদ্ধ হয়ে প্রবৃদ্ধ হয় জৈবী অহং ও বিচরণশীল কামনা বাসনার সংহারে মধু ও কৈটভ। “পঞ্চবর্ষ সহস্র” চলে সংগ্রাম।

পঞ্চবর্ষ সহস্র—পঞ্চ=পন্থ (বিস্তৃত হওয়া), বর্ষ=বৃষ (বর্ষণ হওয়া), সহস্র=সমান শব্দ—হস্ (হাস্তকরা)।

মানস সম্বিত-লব্ধ সাধক প্রাণচেতনার আশ্রয়ে সহাস্রে নাভিমধ্যস্থ সমান বায়ুর বিস্তৃতি বর্ষণ করে সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। যৌগিক প্রণালীতে অদ্বৈত সাধনায় বা অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধ বা শুদ্ধ পথে পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ুর (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) সক্রিয়তায় সমানের ক্রিয়াই মুখ্য। সমান বায়ুর সহায়তাই সাধক “অপাণে জুহতি প্রাণঃ...” (গীতা—৪।২৯)। নাভিমূলের সমান বায়ুকে অবলম্বন করেই জাগ্রত হয় “ব্রাহ্মীহংস”; ব্রহ্ম-জ্ঞানময় দৈবী অহংযুক্ত বায়ু বা শুদ্ধ অঙ্গপা ধারা। এই কারণেই শ্রীচণ্ডী বলেছেন—শক্তি আশ্রয় করে আছে এই ব্রাহ্মীহংসকে—“ব্রাহ্মীহংস সমাক্রান্তা”। এইত পঞ্চবর্ষ সহস্র সংগ্রাম। এবং আত্মিক সংগ্রামধারা বহনকারী প্রহরণ (বহ্ ধাতু বহন করা অর্থে বাহু, প্রকৃষ্টরূপে হরণকারী শক্তিবলেই প্রহরণ) এই ব্রাহ্মীহংসই।

‘পঞ্চবর্ষ সহস্র’ সংগ্রামে, “বাহু প্রহরণে” জঘনে নিহত হয় মধুকৈটভ।

বস্তুসম্বায় জৈবী অহং ও বাসনার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন দুঃসাধ্য। কারণ (causal) বা পরমানবিক দেহেও বস্তু সত্তা বিদ্যমান। তাই বস্তুর অতীত লোকে, দেহাকাশে উর্মিধারায় (wave pattern) যেখানে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে বিস্তৃতি নিচ্ছে (জঘনে=জ=জাত হওয়া, ঘন=বিস্তার) মধু আর কৈটভ, সেই মর্মান্বলে প্রাণ-চেতনার পুনঃ পুনঃ আঘাতে (চক্র=আঘাত করা অর্থে চক্র) সংহার হল সর্গশক্তিমান (omnipotent) প্রাণশক্তির প্রতিস্পর্কী শক্তি (Antipotent) জৈবী অহং ও তদ-সহচর বাসনা।

চতুর্ভূজ পুরুষ মূর্তিতে সংহার হ’ল মধু ও কৈটভ। কিন্তু শ্রীচণ্ডীতে অশ্রান্ত সকল অশ্রুবই নিহত হয়েছে নারী মূর্তিতে। ভূজ ধাতু প্রতিপালন অর্থেই ভূজ শব্দের ব্যবহার। বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণসত্তার (বিষ্ণুর) প্রতিপালক রূপে যে প্রকাশ সেইটাই চতুর্ভূজ, নারায়ণ (নারং=জলং, অয়নং=গৃহং যশ্র=নারায়ণ)। প্রাণিক চেতনায়ই প্রজনন শক্তি। প্রজনন শক্তিই পরোক্ষে সঙ্কুচিত হয়ে এই নারায়ণ রূপ। তাই নারায়ণ অর্থে বুঝায় সমগ্র সৃষ্টিটাকেই। কারণ বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণ সত্তার প্রজনন চেতনার আদি স্থলরূপ জল বা রসের মাধ্যমেই সৃষ্টি বিকশিত। ইহাই স্থল সৃষ্টির নিকটতম আদি কারণ। এই চেতনা তার জৈবী রূপায়নে সমগ্র সৃষ্টিটাকে প্রতিপালন করছে চারভাবে রূপায়িত ক’রে—জরাযুক্ত, শ্বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ। তাইত নারায়ণ চতুর্ভূজ। বিষ্ণু দ্বিভূজ। বিশ্বব্যাপ্ত প্রাণসত্তার জ্যোতিঃ ও ধ্বনিতে প্রকাশ এবং বিশ্বপালন। সেই প্রাণসত্তার প্রাণিক চেতনা সৃষ্টিতে এসে ব্যাপ্তি নিষে চলমান (পদ) হয়েছে আরও

তিনটি বিষয়ের সংযুক্তি দিয়ে—নাদ বা ধ্বনি (শব্দ), প্রাণচক্র বা জীবদেহস্থ ঘূর্ণায়মান আত্মার চক্র (চক্র), শক্তি বা জ্যোতিঃ (গদা)। এ ভাবগুলিই প্রতীকে রূপায়িত হয়েছে শব্দ, চক্র, গদা, পদরূপে। প্রাণিক চেতনায় নারায়ণী শক্তিতে মধু ও কৈটভ (জৈবী অহং ও কামনা-বাসনা) নিধন হলেই, সাধকে জাগ্রত হয় আত্মিক শক্তির বোধ। বোধির দ্বার হয় উন্মুক্ত। দৈবী অহং-এর (Soulful Ego) হয় জাগরণ। এই আত্মিক শক্তিই শ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত নারীরূপা মহাশক্তি।

দৈবী বা জৈবী যাই হোক না, অহং কিন্তু অহঙ্কারই। ব্যক্তি চেতনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। পরমে উপগত হতে হ’লে, জানতে হ’লে, সেই অরূপ ও অনাময় অবস্থাতে সকল ব্যক্তিবোধকে দিতে হবে মিলিয়ে, বিলিয়ে। মধু, কৈটভ বধ হ’লে অহং কতকগুলি জৈবী কলুষ থেকে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু তার সেই দৈবী বোধেও জেগে থাকে কতকগুলি জৈবোত্তর স্বার্থলোলুপ ভাব। যেভাবেই হোক না কেন, অহং-এর অস্তিত্ব যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ব্যক্তিচেতনার একটা লোলুপতা আছেই। শ্রীচণ্ডীর স্তব বধ পর্যন্ত তা’ব গতি। তারপর সে মিলিয়ে যায় মহাব্যোমে মহাকালের সাথে, যেখানে শক্তির সর্বদিক-বিসারী নৃত্য চলছে সর্বক্ষণ।

মাহুশ জন্মায় সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়েই। জৈবী কলুষযুক্ত ব্যক্তিবোধ যখনই তার মনকে করে আচ্ছন্ন তখনই জীবনে ঘটে সত্য-বিচ্যুতি। জীবনকে আবার সত্য-প্রতিষ্ঠা দিতে যে ছয়টি স্তর সাধকের অতিক্রম করতে হয়, লড়াই করতে হয় যে সকল জৈবী ও দৈবী বৃত্তির সাথে, তার প্রথম স্তরই হচ্ছে মধুকৈটভ বধ। এ’টি ভূঃলোক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই পরম সত্যপ্রতিষ্ঠার স্তরগুলিই পর পর বর্ণিত।



## সুকবি সুবোধ রায়

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দর্শনাভিলাষে যখন আমরা কোনও মন্দির সমীপে উপনীত হই, তখন তাহার হুউচ্চ চূড়াই আমাদের সর্ব-প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে হয় ঐ চূড়াটিই মন্দিরের সর্বপ্রধান বস্তু—আর যাহাকিছু সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু চূড়াটি যে শূন্যাবলম্বনে ঝুলিতেছে না, গভীর যুক্তি-তলে নিহিত তাহার ভিত্তিতল হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরবদ্ধ ক্রমোচ্চ গাঁথনি-আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে—একথা একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না। কোন যুদ্ধজয়ের বৃত্তান্ত যখন ইতিহাসে লিখিত হয়, তখন সেই যুদ্ধের সেনাপতির জয়গানেই ইতিহাস মুখর হইয়া উঠে, কিন্তু যে সেনাবর্গের আত্মোৎসর্গে আহব-বিজয় ঘটে, মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত-কথার মুখর ভাষণ সেখানে মুক। কি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে—সর্বদেশ ও সর্বকালে এই একই কর্তৃত্বজ্ঞা capitalistio মনোবৃত্তি চলিয়া আসিতেছে। এমন কি Proletariate-স্বাধীনতা সোবিয়ত রাশিয়াতেও ইহার ব্যত্যয় আজও অ-দৃষ্ট।

পরলোক-নব-প্রবাসী সুকবি সুবোধ রায়ের জীবন-পরিচয় লিখিতে বসিয়া, এই কথাই আজ বার বার মনে উদয় হইতেছে। স্বর্গত সুবোধ রায় বাঙ্গলা-সাহিত্যের চূড়া ছিলেন না; কিন্তু মাতৃভাষার পূজা-বেদীমূলে এই আকুয়ার ও আজীবন সাহিত্যসেবীর অখলিত অর্ঘ্য-নিবেদন অবহেলার বস্তু নহে। বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্য ও সংবাদ-সাহিত্যক্ষেত্রের এই একনিষ্ঠ আজীবন সাধকের তিরোবানে বাঙ্গলার সংবাদ-সাহিত্যসেবিগণ তাঁহার অতি-সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় প্রদানও অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন, নতুবা মাত্র দুই-একখানি সংবাদপত্রে দুই-এক ছত্র আশ্রয়ে শুদ্ধমাত্র তাঁহার মৃত্যু-সংবাদটুকুই বাহির হইত না। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের, বিশেষ করিয়া ‘কল্লোল’ যুগের প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু, সদাহাস্যমুখর, সর্বজনপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় এই সুকবি সাংবাদিকের অকাল বিয়োগ, তাঁহার গুণমুগ্ধ অগণিত বন্ধু,

শুভার্থী ও স্নেহভাজনগণকে আজ গভীর শোকে মুগ্ধমান করিয়া ফেলিয়াছে। চড়াগলায়, সাহিত্যক্ষেত্রে কবি সুবোধ রায়ের প্রাপ্য লইয়া বিবাদ করিবার সময় এ নয়।

কবি সুবোধ রায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নন্দীপুরের সিংহরায় উপাধিদারী প্রসিদ্ধ কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত গুরুপ্রসন্ন রায় একজন বিদিতনামা চিকিৎসক ছিলেন। গুরুপ্রসন্নের চ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধীর রায় হুগলী জেলা-আদালতের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, সুকবি সুবোধ রায় ছিলেন তাঁহার মধ্যম পুত্র এবং সাহিত্য-রসিক শ্রীসুশীল রায় কনিষ্ঠ।

সুবোধ রায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ‘ম্যাট্রিকুলেশন’ ও ‘ইন্টারমিডিয়েট’ উভয় পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যাহরণ ও কবিতা-রচনা-নৈপুণ্য শিক্ষকবর্গ ও বন্ধুজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলেজী শিক্ষা সমাপনান্তে, বোলপুর ‘শান্তিনিকেতন’-এ কিছুকাল ইনি অধ্যাপকতা করেন এবং সেইসময়ে কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ, সি, এফ; এণ্ডুজ, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী প্রমুখ দেশবিশ্রুত জ্ঞানিজনের সান্নিধ্য ও সাহচর্যের সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন তাঁহাকে সোদরোপম স্নেহ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার চুঁচুড়াস্থিত বাসভবনে আসিয়া কয়েকদিন যাবৎ অবস্থান করিয়া যাইতেন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দে ‘কল্লোল পাবলিশিং’ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার রচিত ‘নাট্যমন্দির’ নামক নাটিকা একদিন বাঙ্গলা সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থসন ‘মালা বদল’ কালী ক্রিস্চিয়ান কর্তৃক পরিবেশিত হইয়া যে অনাবিল হাস্য-কৌতুকরসে দর্শক-চিত্ত আশ্রুত করিয়াছিল, তাহার স্বতি চিত্রামোদিগণের চিত্তলোক হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

‘শান্তিনিকেতন’ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি

বাঙ্গলার সাময়িক-পত্রিকা জগতে প্রবেশ করেন। স্বর্গত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'-তে সহঃসম্পাদকরূপে যোগ দেওয়ায় তাঁহার সাংবাদিক জীবনের স্বত্রপাত হয় এবং পরবর্তীকালে যথাক্রমে—দৈনিক 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাহী'র সহঃসম্পাদক ও সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'র সম্পাদক হন। দীর্ঘদিন, পাক্ষিক 'সমাচার' ও মাসিক 'চিক্রালী'-রও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে নৈহাটি হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়া এই রায়পরিবার যখন স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিলেন, তখন, ঋষিবল্লভ ভূদেব, আচার্য অক্ষয়চন্দ্র ও সুরসিক দীননাথ ধরের সাহিত্য-সাধনাপ্ত চুঁচুড়ার সাহিত্য-ঐতিহ্যের শেষ সাক্ষ্যরূপে কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়, শিবরাজির সলিতার মত মিট মিট করিয়া জলিতেছেন মাত্র। কবি সুবোধ রায় চুঁচুড়ায় আসিয়া এমন এক সাহিত্য-পরিবেশ ও সাহিত্যিক-চক্র গড়িয়া তুলিলেন, যাহা চুঁচুড়ার নির্বাণোন্মুখ সাহিত্য-দীপ-শিখাটিকে বহু-শিখা ও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও বিশেষ সংগঠনী শক্তি ছিল। চুঁচুড়ায় 'রবি-চক্র' নামে তাঁহার স্রষ্ট প্রখ্যাত সাহিত্য-সমিতি, তাঁহার সংগঠনী শক্তির উজ্জল নিদর্শন।

যে সকল সাহিত্যসুহৃদগণ ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই তিনি সাহিত্য-সৃষ্টি কার্যে নানাভাবে সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণাদান করিয়াছেন। 'অবধূত' ইতুপাখিক কালিকানন্দের সিনেমা-সমাদৃত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নামধেয় উপন্যাস-পুস্তক, কবি সুবোধ রায়ের উৎসাহ, প্রেরণা ও সহায়তায় যে পুস্তকে পরিণত হইতে পারিয়াছে তাহা, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কালিকানন্দ অকপটে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'প্রবর্তক' সত্ত্বের সহিতও ইহার অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। সম্বন্ধুর শ্রীমতিলাল রায় ইহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সত্ত্বের সহঃসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও 'প্রবর্তক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদ্বারমণ চৌধুরী উভয়েরই সহিত তাঁহার গভীর হৃদয়তা ছিল।

ঈশ্বর হৃদয়াকৃতি, অতি-প্রশস্ত ললাট, উজ্জল নয়ন, উচ্চ-হাস্যমুখর, বহুবৎসল ও সদালাপী এই সাহিত্যিকের অকাল-বিয়োগে বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে একজন একান্ত সাহিত্যপ্রাণ পুরুষকে হারাইল এবং চুঁচুড়ার সাহিত্য-ঋশানভূমিতে তিনি যে সাহিত্য পরিবেশ ও পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার যে অপরিমেয় ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

## শ্যামা-বন্দনা

ঠাকুর শ্রীধনঞ্জয় চক্রবর্তী

অকৃতী-অভাজনে তার মা, তারা।

ভবযায়া-বন্দনা—মোহ-পাশ-ধুনা;

হর-হৃদি-রঞ্জনী, মহেশ-দারা।

ভ্রমর-নিব্ধিত, কুঞ্চিত-কেশ-পাশা,

কণ্ঠিত করপুটে গ্রন্থিত-কটিবাসা।

মুণ্ডমাল-হার, লম্বিত কুচযুগে,

বরবপু রঞ্জিতা-শোণিত-ধারা॥

স্মুরিত ঝাঁখি হুঁয়ে, রক্তিম দৃষ্টি—

রোযানলে 'জল্ জল্' হৃদয় সৃষ্টি,

মহাকালসঙ্গমে বিপরীত রতাতুরা—

নৃত্যপটিয়দী! অভয়া তারা।

নির্বাণদাজী! শবাসনা—তারিণী,

জিহুবন-ধাত্রী। স্বর-রিপুনাশিনী।

যড়রিপু-মর্দিনী, প্রণমামি অম্বিকা!

বন্দিতা জগজন, সারাংসারা!!



## সভ্য-সংবাদ

### প্রবর্তক সভ্যের সাধারণ অধিবেশন :

গত ২১শে আশ্বিন চন্দ্রনগর প্রবর্তক আশ্রমে সভ্যের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভ্য-সভাপতি শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত পৌরোহিত্য করেন। এই সভায় সর্ব শ্রেণীর ৩৬ জন সভ্য-সভ্যা উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে পূজনীয় সজ্জগুরুর অমর আত্মার আশীর্বাদ মর্মনভাবে প্রার্থনাস্তর অন্তরঙ্গ সভ্য স্বামী সর্বানন্দজী, আজীবন সভ্য শ্রীনাথরথি কুণ্ডু ও মহাযোগী সভ্য মানিকচন্দ্র রক্ষিতের প্রস্নানে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। উহা যথাযথি গৃহীত হইবার পর, তিনি ১৩৬৬ সনের পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাবসহ মুদ্রিত কার্য-বিবরণী অধিবেশনে উপস্থাপিত করেন। সমুদয় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতি-ক্রমে সভায় পরিগৃহীত হয়।

গত বৎসর যে সকল অন্তরঙ্গ সভ্য-সভ্যাগণ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন, তাঁহারাও সর্বসম্মতিক্রমে এবারেও নির্বাচিত হন। সদস্যগণের নাম : সর্বশ্রী নলিনচন্দ্র দত্ত (সভাপতি) নারায়ণ চন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক), স্বামী বোধানন্দজী (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক), স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, রাধারমণ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ফণিভূষণ রায়, বক্ষিমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, হরিরঞ্জন রক্ষিত, নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ও নির্মলা দেবী।

শ্রীনিরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি, কম, জি-ডি-এ, এফ-সি-এ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আগামী বর্ষের জ্ঞাত পুনরায় হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

অধিবেশনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, সামাজিক পরিবেশ, সজ্জের অধ্যাত্মমূলক সংগঠন কার্যের পরিকল্পনা, জাতীয় জীবনে নিঃস্বার্থ সজ্জ-শক্তির সক্রিয় জাগরণ কল্পে সজ্জ-ধর্মীদের প্রেম ও ঐক্যমূলক সেবা ও কার্যক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়।

### প্রবর্তক ট্রাষ্ট ও ট্রাষ্ট পরিচালিত যৌথ কোম্পানীসমূহ :

গত ৭ই অক্টোবর শনিবার বেলা ২টায় প্রবর্তক সজ্জের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে প্রবর্তক ট্রাষ্টের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ট্রাষ্টের কলিকাতা অফিসে (৬১নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীইন্দুভূষণ রায় কোম্পানীর ১৩৬৭ সালের

আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সভায় উপস্থাপিত করেন। হিসাব নৃষ্টে দেখা যায়, ট্রাষ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক পাব্লিশার্স ও কৃষি বিভাগের লোকসান বাদে আলোচ্য বর্ষে ৫৬০৭-০৪ নং পঃ উদ্ভূত হইয়াছে। ট্রাষ্ট পরিচালিত যৌথ কোম্পানীসমূহের মধ্যে প্রবর্তক কমার্শিয়াল করপোরেশন প্রাইভেট লিঃ, প্রবর্তক ফার্ণিশার্স লিঃ, প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিঃ-এর যথাক্রমে লাভ হইয়াছে—টাকা ৩২,৮০২-২২ নং পঃ, ১১,০২১-৬৮ নং পঃ ও ১০,০৫১-২০ নং পঃ এবং সাধারণ অংশের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে ৫, ৪, ও ৪ টাকা। এই সভায় প্রকাশ পায় যে, ট্রাষ্ট পরিচালিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক জুট মিলস লিমিটেড বিগত বৎসরাধিক কাল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই কোম্পানীর অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত অভিব্যক্তি দেন। জুট মিলের বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই সভার সমস্ত আলোচনা চলে। মেম্বার্স এন চৌধুরী এণ্ড কোং আগামী বর্ষের জ্ঞাত হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ট্রাষ্টের পরিচালকগণ : সর্বশ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, রাধারমণ চৌধুরী, স্বামী বোধানন্দ, মণীন্দ্রনাথ নায়ক, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ফণিভূষণ রায় ও ইন্দুভূষণ রায়।

ট্রাষ্ট পরিচালিত যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিবরণ :

**প্রবর্তক কমার্শিয়াল করপোরেশন প্রাইভেট লিঃ**—১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সময়—৪ঠা অক্টোবর, বুধবার, অপরাহ্ন ৪টা, ১৯৬১। ডিরেক্টরগণ : সর্বশ্রী স্বকুমার মিত্র, ইন্দুভূষণ রায় ও কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

**প্রবর্তক ফার্ণিশার্স লিঃ** : ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সময়,—৭ই অক্টোবর, শনিবার, বেলা ১টা, ১৯৬১। ডিরেক্টরগণ : সর্বশ্রী নন্দকৃষ্ণ মল্লিক, তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীমোহন মতিলাল, রাধারমণ চৌধুরী ও ইন্দুভূষণ রায়।

**প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাঃ লিঃ**—১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা। তারিখ ১১ই অক্টোবর, বুধবার, বেলা ২টা ১৯৬১। ডিরেক্টরগণ : সর্বশ্রী মানিকলাল দত্ত, ইন্দুভূষণ রায় ও ফণিভূষণ রায়।

উপরোক্ত কোম্পানীগুলির ১৯৬৮ সনের জ্ঞাত মেম্বার্স এন চৌধুরী এণ্ড কোং হিসাব পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন।

# সম্মাদকীয়

৫ বিজয়া :

বিজয়া—বিশিষ্ট জয়লাভ-জনিত আনন্দোৎসব।

“যথৈব রামেন হতো দশাশ্রু তথৈব শক্রন্ বিনিপাতয়ামি।”

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দশানন রাবণ যে উপায়ে নিহত হইয়াছিল, আমিও সেই উপায়ে আমার শত্রুকে বিনাশ করিব—মাতৃ-আবাহনের প্রাকালে এই সঙ্কল্প-বাক্য আজও আমরা উচ্চারণ করি। কিন্তু কি সে উপায়? শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য কোন্ আদর্শ, কোন্ পন্থা আমরা গ্রহণ করিব? এর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন বাহুবল। পদতলে শত্রুবিমর্দিনকারিণী দশ হাতে দশপ্রহরণ-ধারিণী মাতৃমূর্ত্তিই আমাদের সেই আদর্শ। কিন্তু নিছক বাহুবল আত্মরিক শক্তি—ইহার পরিণতি অমঙ্গল। সুতরাং এই বাহুবল নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে নৈতিক বলের দ্বারা। তথাপি নৈতিক বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও এই বাহুবল ক্রমে আত্মরিক শক্তিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং তার পরিণামও অমঙ্গলপ্রসূ ও অন্তত। অতএব নৈতিক বল পরিচালিত বাহুবল যখন অধ্যাত্মজ্ঞান বা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, একমাত্র তখনই আমরা অবিশিষ্ট শুভ বা মথার্থ মঙ্গল লাভ করিতে পারি।

এই বাণী বর্তমানযুগে ঋষি বক্রিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দ-মঠ’ অবলম্বনে এবং বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও যোগীবর শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের সাধ্য সাধনা ও বাণীব মধ্য দিয়া আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন। এই বাণী ভগবদগীতারই বাণী : “যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো, যত্র পার্শ্বোদয়ঃ।”

বাহুবলের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ধর্ম্মের অর্জুনের সঙ্গে নৈতিক ও অধ্যাত্ম-বলের মূর্ত্ত-বিগ্রহ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয় চাই।

যুগের প্রচণ্ড গতিপথে প্রতি বছরের মত এবারও মহা-পুঙ্খাস্তে ‘বিজয়া’ আসিল আবার অতীতের গর্ভে বিলীনও হইল। আগামী দিনে চলার পথে বিজয়া-উৎসব হইতে আমরা কতটুকু প্রেরণা, কতখানি বীর্ঘ্য পাণেয়স্বরূপে সঞ্চয় করিলাম তাহা নিশ্চয়ই অসুখাবনযোগ্য। তাই বিজয়ার অন্তর্নিহিত এই মর্ম্মকথাটি বাঙালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা প্রবর্তকের গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, অমুরাগী-সুহৃদবর্গকে আমাদের সর্কাস্তঃকরণের প্রেম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কবিতৈছি। শ্রীভগবান তাঁদের চলাব পথ জয়শ্রীমণ্ডিত করুন। বিজয়া উপলক্ষে আমরা বহু শুভেচ্ছা ও প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে সব পত্রোত্তর না দিতে পারায় আমরা হতাশ।

রাজনৈতিক উপবাস :

হিন্দুজাতির জীবনযাত্রায়, তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উপবাস নিঃশাস বায়ু মতই অপরিহার্য ও অনায়াস। হিন্দুর জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন, বিবাহ, হোম, যোগ-জাগ, পূজার্চনা, বারতত, এমন কি মৃত্যুর পরেও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম ‘উপবাস’ অঙ্গীকার, অচ্ছেদ্য ও ওতঃপ্রোত। সুতরাং হিন্দুর নিকট উপবাস, বিশ্বাসবহ বা অভিনব কিছু নহে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুগ অর্থাৎ গান্ধীযুগ হইতে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একরকম নূতন ধরনের উপবাস আশিয়া দেখা দিয়াছে। এই ধরনের উপবাসের সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়া সারা দেশব্যাপী চাকুলোর সৃষ্টি করে। নবোদ্ভূত এই উপবাসের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন, চিত্রাচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম তথা সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের কোনও যোগসূত্র বা সম্বন্ধনসূত্র নাই। সম্প্রতি খণ্ডিত পাঞ্জাব-রাজ্যকে আরও খণ্ডিত কবিয়া শিখ-সুবার দাবীতে মাঠার তারা সিং-এর উপবাস ও ঐ-দাবীর বিরুদ্ধতায় যোগীরাজের পাণ্টা উপবাস সারা ভারতে যে আলোড়ন বিক্ষোভ ও বিরক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে এই-জাতীয় উপবাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের কথা আজ প্রত্যেকেরই মনে একটা প্রশ্নের আকার ধারণ করিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সজ্ঞত অথবা অসজ্ঞত দাবী-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া আমরা অনশনের হুমকি জুলুম-বাজীরই নামাস্তর মাত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা যেন একটা ফ্যানাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জাতি-দাবী পূরণের জন্য আন্দোলনের, সংগ্রামের অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু উপবাসকে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার পরোক্ষ ক্লেবোরই পরিচায়ক। বিচারমুতাজাত এই শ্রেণীর উপবাস, এমনকি উপবাস করিয়া জীবনহাতি দেওয়াব মধ্যেও, কোনও বীরত্ব বা গৌরব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে—সমগ্র ভারতবাসীকে অস্ত্রায়, অধর্ম্ম ও পাপাচার হইতে বিরত করিয়া তাহাদের চিত্তশুদ্ধিসাধন ও শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াসে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে বেলা ১২ ঘটিকার সময় মহাত্মাজী ঐতিহাসিক অমরণ-অনশন-ব্রতাসুরণের কথা। এই অনশন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার অনুরোধ জানাইয়া বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীকে যে অবিস্মরণীয় দুই-খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই জাতীয় উপবাসের স্বরূপ, অযৌক্তিকতা, অকার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বদর্শী কবি-মণীষীর বলিষ্ঠ অভিমত অপূর্ব ভাষায় রূপম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বতপ্রায় এই পত্র দুইখানির তাৎপর্য্য বর্তমান যুগেও বিশেষভাবে অসুখাবনীয় বলিয়া আমরা এখানে উহার সংক্ষিপ্তাংশ মুদ্রিত করিলাম।

## রবীন্দ্রনাথের পত্র

(১)

প্রিয় মহাত্মাজী,

কয়েকদিন পূর্বে আপনার নিকট যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, কোনও কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও তাহা আপনার হস্তগত হয় নাই বলিয়া বোঝা যাইতেছে।

আপনি যে কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমি যদি আপনার অল্পরূপ মত অবলম্বন করিতে না পারি, তাহা হইলে আশা করি আমাকে দোষী করিবেন না। যে সকল কারণ বশতঃ আপনি আপনার কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা না জানিলে আপনার সিদ্ধান্তের মর্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং আমি সেই কারণ অবগত নহি। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই জগতে কুৎসিত পাপাচার রহিয়াছে, উহা সমাজ-সংস্থিতির বিরোধী। শাস্ত ও সনাতন আদর্শ সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণই উদ্ধাতিত করেন। তাঁহাদের চতুঃস্পার্ষবর্তী অপবিত্রতা ও চিন্ত-দোর্বল্য দেখিয়া বিরক্তি ও নিরাশায় কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। জগতের সীমাহীন দুঃখ দুর্গতিতে যখন ভগবান বুদ্ধ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি জগতে মুক্তির বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত আপনাকে দেখাইতে যাওয়া আমার পক্ষে ষ্টুতী মাত্র।

মরণশীল জীবের পক্ষে মৃত্যুই যখন ধ্রুব, তখন মৃত্যুর, আগমনে বীরত্বের সহিত তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে কিন্তু যে-ক্ষেত্রে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত মৃত্যু-বরণ ব্যতীত গতাস্বের থাকে না, একমাত্র সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্ত্র মৃত্যু-বরণ করিবার অধিকার আমাদের নাই। অনশনব্রতের সঙ্কল্প যে অপরিহার্য

বলিয়া আপনার বিশ্বাস, তাহা আপনার একটি ভ্রমও হইতে পারে। আপনার ভীষণ প্রতিজ্ঞার পরিণাম যদি সংঘাতিকভাবে সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আপনার শুকতব ভ্রম সংশোধনের কোনই উপায় থাকিবে না তাবিয়া, আমরা মুহূর্তমান হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করিবার যত্নচরু অযোগ্য সত্ত্বেও, ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান জীবন বিসর্জনের সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত এবং ভগবানকে এইরূপ পরম শোকাবহ চরমপত্র না দিবার জন্ত আমি আপনাকে অহুরোধ না করিয়া পারি না।

(২)

প্রিয় মহাত্মাজী,

জগদ্বাদীকে আজ আপনি যে বাণী দান করিয়াছেন, আমি তাহার মর্ম সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য দ্বারা জগদ্বাদীকে সর্বভূতে অগাধ করুণা বিতরণের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বীণথুণ্ড বলিতেন, 'শত্রুকেও ভাল-বাসিও।' তাঁহার এই শিক্ষা পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছিল তাঁহার হত্যাকাবীদিগকে তৎকর্তৃক ক্ষমায়। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, মনে হয়, স্বদেশবাদীদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পেই আপনি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমি যদি বলি, যে-হতভাগ্যেরা কৃতকর্মের গুরুত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের নিমিত্ত প্রাত্যহিক প্রচেষ্টা করিলেই যথার্থভাবে ও বীরত্বের সহিত প্রায়শ্চিত্ত অস্বপ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। দুহৃতকারীদের প্রতি আপনার অনশন কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—অথচ এই অনশনের ফলে তাহারা আপনার নির্দেশলাভে বঞ্চিত হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কার্লসপার্টল**



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এন্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লি:  
সালকিয়া, হাওড়া।

লোকশিক্ষক তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ প্রাণঘাতী প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই সমীচীন নহে।

আপনার দৃষ্টান্তের পরিণতি এই দাঁড়াইবে যে, ধরাবক্ষ হইতে সমস্ত মহাপুরুষ বিলুপ্ত হইবেন এবং নৈতিক হিসাবে দুর্বল ব্যক্তিরা অজ্ঞতা ও অজ্ঞায়ে আকর্ষণ নিমজ্জিত হইবার জন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কেবল আপনার পক্ষেই সমীচীন এবং অন্তান্ত সকলের পক্ষে নিরর্থক, এই কথা বলিবার অধিকার আপনার নাই! যদি তাহাই আপনার বক্তব্য হয় তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিগূঢ়পন্থা যোগীর ছায় আপনার এই প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য ছিল; তাহা হইলে আপনি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ জনিতে পারিত না। যে পাপে আমাদের জাতীয়-জীবনের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সর্বসাধারণকেই আপনি সক্রিয়ভাবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আপনি যে ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিষ্ক্রিয়। যাহারা আপনার মত জ্ঞান-

বৈভবের অধিকারী নহে, তাহারা নিষ্ফল আত্মনির্যাতনের অন্ধকারময় গহ্বরেই নির্বিচারে লক্ষ প্রদান করিতে চাহিবে। তাহারা যদি দেশের পাপ মোচনে আপনার পন্থা অবলম্বন করে, তবে আপনি তাহাদিগকে দোষ দিতে পারেন না; কারণ সমস্ত বাণীই সর্বসাধারণের প্রতি অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রযোজ্য হওয়া কর্তব্য, নতুবা ঐ বাণী প্রচার করাই উচিত ছিল না।

আপনার সঙ্কল্পে আমি যে মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তাহার ফলেই আমি আপনাকে এইরূপ ভাষায় পত্র লিখিতেছি। কারণ, আমি যাহার কোনই সার্থক যৌক্তিকতা দেখিতেছি না, একটা মহনীয় জীবন সেই পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য। আপনার জীবনে আমাদের জাতির যে গৌরব প্রতিফলিত, সেই গৌরবের খাতিরে, যে কোটা কোটা লোক আপনার মুখ চাহিয়া আছে তাহাদের নামে, আপনার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত আমি পুনরায় আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

“প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী—

কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন

সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ,

সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যের শক্তি অনুভব

করিয়া মহৎ।”

—রবীন্দ্রনাথ

উৎসব—আনন্দের দিনে

দুঃখ—বেদনার দিনে

বাজালীর নিত্যসঙ্গী

ঢাকেশ্বরীর বস্ত্রসস্তার

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬

১নং ও ২নং মিল—পূর্ব পাকিস্তান,

৩নং—আসানসোল, পশ্চিম বাংলা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস্—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

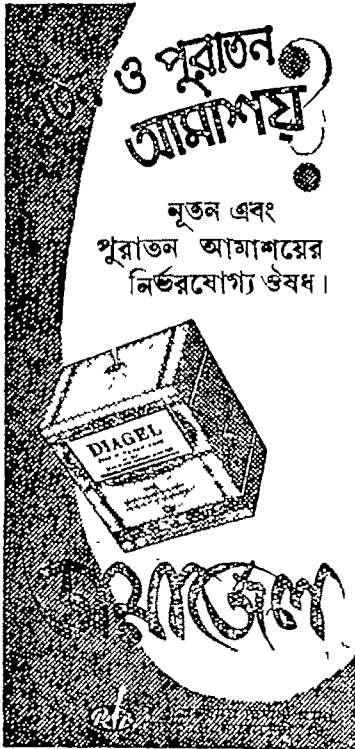
# সাহিত্যিক

## বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রক্ত-জয়ন্তী :

আগামী ২৮, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর কাটোরা মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরী গ্রামে এবার বাঙ্গলা সাহিত্যের অস্বতম দিক্‌গাল ৬ইচ্ছনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইচ্ছালায়' ভবনে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর রক্ত অধিবেশন হইবে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কর্ণধার শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহোদয় এই সম্মেলনের আয়োজন সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। আসন্ন এই সম্মেলনের শুষ্ক রূপ-দানকল্পে বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। হৃদয় পরীতে এই সম্মেলনের স্থান-নির্বাচন ঘাঞ্জনীয় হইয়াছে। আড়ম্বরের কিছুটা অভাব হইলেও, পরীবাণীর উৎসাহ, আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা সম্মেলনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

## অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য :

এখাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানবিদ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গত ২৬শে আগষ্ট ৭৮ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।



তার জীবন ৩৬ বৎসর অধ্যাপনাব পূর্ব অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীমতেনে কর্মসচিব পদে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র-ভারতীর সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে গত ১৬ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁহাকে জীবন-সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্ল-চন্দ্রের ছাত্র ছিলেন এবং নিজেও অসাধারণ কৃষ্টি-ছাত্রসম্পদ-সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ছোটবড় সকলেরই তিনি শ্রীতি ও আদার প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গলার নানাভিমুখী সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

## জগলী কৃষ্টি পরিষদে বিজয়া সম্মিলনী :

গত ৫ই নভেম্বর জগলী কৃষ্টি পরিষদের উদ্যোগে চুঁচুড়ার সাধবীতলায় 'বিজয়া সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহুপতি বঙ্গমদার মহোদয় এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। কুমারী ছায়া সঙ্গল কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত ও প্রবীণ সঙ্গীতবিদ শ্রীইচ্ছনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক কবিতা পাঠের পর জনসাহিত্যিক শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বিজয়া তত্ত্ব' সম্বন্ধে বলবৃণ্ড ও সারগর্ভ একটি ভাষণ পাঠ করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় বহুল তথ্য-সমৃদ্ধ তাঁহার ভাষণে প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের কাল হইতে দুর্গোৎসবের ক্রম-পরিণতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত উদঘাটন করিয়া সমাগত অধিভূমকে বিম্বিত ও মুগ্ধ করেন।

## বিপ্লবীবীর কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত :

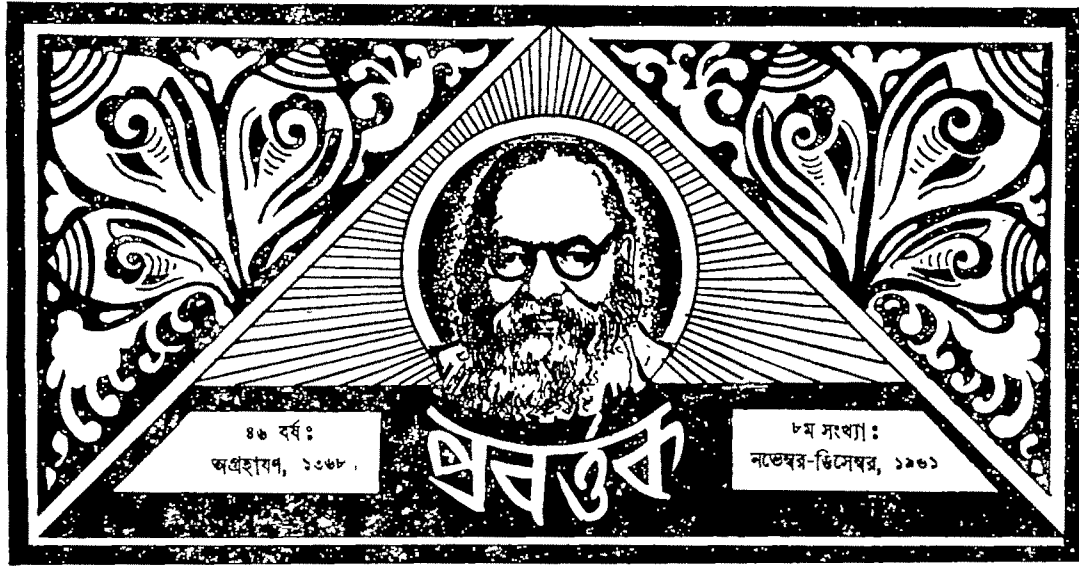
বিপ্লব-যুগের অমূল্যলয় সমিতির অস্বতম পুরোধা কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত গত ৭ই অক্টোবর ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন : কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অস্ত্রোপচারের পর 'সেপটিক' হওয়ায় কলে তাঁহার মৃত্যু হয়। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কুণ্ঠাটের সন্নিহিত যে অমূল্যলয় ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়, কেদারেশ্বরই ছিলেন তাহার অস্বতম প্রধান উদ্যোগী এবং তথায় যে মাসে বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর যে অস্বাধিকারী পালিত হ'ব তাহাতেও ছিলেন অগ্রনী। দেশেব মুক্তিযজ্ঞে উদসর্গীকৃত-সর্বথ এই বিপ্লবী-জীবনে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। শীর্ণ দেহ, সর্বত্র অনমনীয় শির এই বিপ্লবীর সন্মান ছিল অদগ্য।

প্রবর্তক সজ্জের সহিত বিপ্লবী কেদারেশ্বরের দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সজ্জকল্প শ্রীমতিলালের প্রতি তাঁহার প্রকৃষ্টি ছিল অপরিণীম এবং অযোগ্য পাইলেই বা কর্ণহুয়ে আবশ্যক হইলেই, সজ্জকল্পের সাহচর্যের নিমিত্ত তিনি চলননগরে যাইতেন। প্রবর্তক সজ্জের সহঃসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমদীচ্ছনাথ নায়েকের সহিতও কেদারেশ্বরের অস্বতম পরিচয় ছিল। এই বিপ্লবীবীরের তিরোধানের সঙ্গে বাংলার অগ্নিযুগের অনমনীয় বিপ্লববীর্যের ধাবক ও স্রাবক প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত  
প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড হাকটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকপিলকৃষ্ণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

যে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, অক্ষমতার মহাপাপে পঙ্কু, সে দেশে আত্মমুক্তির প্রয়াস ভগবানের অভিপ্রায় নয়। ভারতের ভগবান চাহিয়াছিলেন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ইহারই জন্ম তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাক্‌জন্তুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, পার্থের কোদণ্ড টঙ্কারে অস্তুর মনকে সজ্ঞাসিত করিয়াছিলেন। আজ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সে মহাশক্তি উদ্যত নয় কেন? কেন সে সঙ্কুচিত, ভীত, পরমতাপেক্ষী? ইহাতে মনে হয় না কি, হয় আমরা প্রতারিত হইয়াছি, নয় ভগবানের সেই অপরাঞ্জেয় শক্তি ধারণে আমরা অক্ষম। ইহার কারণ ভাবের ঘরে চুরি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যোল আনা দিয়া বঞ্চিত হওয়ার কথা কখনও শুনিয়াছ কি?

উৎসর্গের তীর্থভূমি ভারতবর্ষে হে নবযুগ-ঋদ্ধিক নবপ্রাণে, নবীন উৎসাহে আবার জাগিয়া উঠ। অবহেলে শ্রীভগবানের প্রতিভূ ইষ্টমূর্তির চরণে নিজেকে উৎসর্গ কর। দেহ, প্রাণ, জীবন, যৌবন ইষ্ট মূর্তির চরণে নিঃশেষে বলি দাও। কার্পণ্য রাখিও না। সাধনার প্রভাবে অন্তর্দর্শনের ছয়ার যদি মুক্ত হয়, তবে সে ছয়ারও বন্ধ রাখিয়া ইষ্টের আহ্বানে মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াও—তবেই তো তোমার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের অবদানে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানবের অজ্ঞানতা দূর হইয়া যাইবে—তবেই তো তোমার জীবন “বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায়” উৎসর্গীকৃত হইবে। তাই বলি—জাগো কৃৎস্নকর্মকৃৎ, ভাগবত প্রেমিক, ভারতের সর্বত্যাগী শঙ্কর—জগতের ঐশ্বর্য্য তোমাদের শাসন যন্ত্রে সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত হইয়া সর্বজগতের দারিদ্র্য দূর করুক। বর্ণাশ্রম প্রত্যেক জীবনে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করুক—গুণ ভিন্ন করিয়া পরিপূর্ণ জীবনকে এবার খণ্ড এবং ক্ষুদ্র করিও না। ভারতের এই নবজন্মের পরিচয় দিবার যুগ যেন বহিয়া না যায়। হে তরুণ! নূতন মস্ত্রে তোমরা উদ্বুদ্ধ হও—নূতন ব্রত তোমরা গ্রহণ কর—সে ব্রত এই লক্ষ লক্ষ মানবের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া, এই লক্ষ লক্ষ মানবের কণ্ঠে সত্য মন্ত্রের ঝঙ্কার তোলা, এই লক্ষ মানবের অন্তরে শ্রীভগবানকে জাগ্রত করা। আজ ব্যক্তিগত সিদ্ধি, ঋদ্ধি বিসর্জন দিয়া সমষ্টিগতভাবে জাতিসম্মার পূর্ণ-শ্রী ফুটাইয়া তোলা—তবেই নবাবুগলোকে তোমার অন্তর ভরিয়া উঠিবে, তুমি ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবে। (সজ্জগুরু বাণী হইতে সঙ্কলিত)।

—সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমং মণ্ডলং । ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং । ) প্রথম ঋক্

( সজ্বগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অঙ্কসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

প্রবো যহং পুরুগাং বিশাং দেবযতীনাং ।

অগ্নিঃ সূক্তেভির্বচোভিরীমহে যং সীমিদম্ভ ঈলতে ॥ ১

অনুব্র—[ হে ঋষিকগণ ] “বঃ” ( আপনারা ) “দেবযতীনাং” ( ষাহারা, দেবতাগণকে প্রাপ্তেচ্ছ ) “পুরুগাং” ( বহু ) “বিশাং” ( প্রজাসকলের মঙ্গলার্থে ) “যহং” ( মহৎ ) “অগ্নিঃ” ( অগ্নিকে ) “অন্তে” ( মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ ) “ইং” ( সর্বদা ) “যং অগ্নিঃ” ( যে অগ্নিকে ) “সর্বতঃ” ( সর্বপ্রকারে ) “ঈলতে” ( স্তব করিয়া থাকেন ) [ সেই অগ্নিকে আমরাও ] “সূক্তেভির্বচোভিঃ” ( সূক্তরূপ বাক্যের দ্বারা ) “প্র ইমহে” ( প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি ) ॥

সরলার্থ—হে ঋষিকগণ । আপনারা, ষাহারা দেবগণকে প্রাপ্তেচ্ছ, তাঁহারা বহুসংখ্যক প্রজা—আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই মহৎ অগ্নিকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সর্বদা, সর্বপ্রকারে স্তব করিয়া থাকেন, সেই অগ্নিকে সূক্তরূপে বাক্যের দ্বারা আমরাও প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি ॥ ১ ॥

বিশদার্থ—ষট্‌ত্রিংশং সূক্তে মোট কুড়িটি ঋক্ আছে । প্রত্যেক ঋকেই অগ্নিদেবতার অর্চনা করা হইয়াছে । মধ্যে “যুপা” দেবতার প্রসঙ্গ থাকিলেও, উহা অগ্নি সংক্রান্ত মন্ত্র বলিয়া অভিহিত । মূলতঃ এই সূক্তটি আগ্নেয় সূক্ত । অগ্নি সম্বন্ধে আৰ্য্য ঋষিগণের জ্ঞান যে কত গভীর ও ব্যাপক তাহা ঋগ্বেদের বহু বিভিন্ন সূক্ত ও ঋক্ হইতেই জানা যায় । অগ্নি যে শুধু ব্যবহারিক হতাশন তাহাই নহে, ইহা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বহিঃ, আবার ইহা বেদের ব্রহ্মস্বরূপও বটে । প্রকরণাত্মক ঋগ্বেদে আরণ্যক যুগের ঋষি বহিরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া একদিকে যেমন—অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন—অন্য দিকে তেমনই আত্মোপলব্ধিরও সাধনা করিয়াছেন । এই সাধনা সনাতন, চিরযুগ ইহা বর্তমান আছে । সাধনার দ্বারা তাঁহারা জানিয়াছেন, অগ্নি প্রাণের দেবতা । প্রাণের আছে তেজ, আছে বীৰ্য্য । অগ্নির অপর নাম তাই তেজ । এই তেজ হইতেই ঋকের সৃষ্টি । পুণ্য প্রাণ ঋষিবৃন্দ সকলের মঙ্গলের জন্য প্রজ্জ্বলিত হতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া ঋগ্বেদে প্রাণকেও উদ্বোধিত করিতেছেন, বেদের ঋষি ঋষিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—‘মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সর্বদা সর্বপ্রকারে যে অগ্নিকে স্তব করিয়া থাকেন—আমরাও সেই অগ্নির নিকট সূক্তরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা জানাইব জাগতিক মঙ্গলের নিমিত্ত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্যও বটে’ ।

## বেদ-গান

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সাম গায়কেরা গাহিছে তোমারি গান ।

ঋক্ দ্রষ্টারা তোমারি জ্যোতিকে  
করিছে জ্যোতিমান ।

অন্তর্বাণী সাধনধর্মী  
তোমার সহায়ে হে শতকর্মী  
করিতেছে উত্থান ॥ ১

যবে সামু থেকে উঠেছি উপর  
পেয়েছি তখনি আরো বহুতর  
কর্মের সন্ধান ।

ইন্দ্র জাগান সাকল্য সুব  
করিছেন যেন নন্দী বৃষভ  
গোমুখের অভিযান ॥ ২

কর স্রপুষ্ট বীর্ষে প্রবল,  
কেশর শোভিত অশ্বযুগল  
গতি রথে সংস্থান ।

রসিক ইন্দ্র রস উদ্দেশে  
মোদের সত্যমন্ত্রের রেশে  
হও তুমি আশ্রয়ান ॥ ৩

এসো প্রতিষ্ঠা মন্ত্রে মোদের  
দাঁও উত্তর তুমি তাহাদের  
করোহে ঘোষণা দান ।

ইন্দ্র হে তুমি স্বভাবধর্ম,—  
অন্তর্বাণী, যজ্ঞকর্ম  
করোগো বর্ধমান ॥ ৪

# গোস্বামী-মালিপাড়া

শ্রীশুধীরকুমার মিত্র

গোস্বামী-মালিপাড়া হুগলী জেলায় পোলবা ধানার অন্তর্গত একটি বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন স্থান। সুদূর অতীতে এই গ্রামের ভূভাগ কেদারমতী নদীর গর্ভগত ছিল। এই নদী এখনও ক্ষীণাকারে গোস্বামী-মালিপাড়া ও দাঁতড়া গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যখন এই নদী খুব বেগবতী ছিল, তখন পারাপারের জন্ত ইহার দুই তীরে দুইটি ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। সেই দুইটি ঘাটে—উত্তর দিকে দ্বারচাদিনীতে শ্রীশ্রীবিষহরি দেবী ও দক্ষিণ দিকে নানি-হাটে শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাদের সেবার জন্ত কুটপালের নবাবের জমি দান করা আছে। কালক্রমে এই নদীগর্ভে যে চর বাহির হয়, সেই চরে রাজা দ্বারপালের পুষ্পোদ্যান হইয়াছিল এবং রাজার মালিরা সেই চরে বাস করিত বলিয়া, ইহা মালিপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়।

পূর্বে এই অঞ্চল দামোদরের তীগীরখীমুখী শাখা-প্রবাহের তীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের উত্তরে কেদারমতী নদী দামোদরের এই প্রাচীন প্রবাহের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর\* অন্ততম পরিকর শ্রীপাদ ঋদ্ধ ভগবান আচার্য্যের সময় হইতে গোস্বামীগণ এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন এবং গোস্বামীদের প্রাধান্য হেতু ইহা গোস্বামী মালিপাড়া বলিয়া পরিচিত হয়। ভগবান আচার্য্য একজন সাধক পুরুষ ছিলেন; প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাঁহার বিষয় লিখিত আছে। গোবিন্দদাস তাঁহার করচাম্ লিখিয়াছেন,

ধ্বজ আচার্য্য আসে গাঢ় অম্বরাগে  
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে।  
ধ্বজনে দেখিলা প্রভু দিয়া হরি বোল।  
হুবাছ পসারিয়া তারে দিলা কোল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :

ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়।  
অবগেও ধারে নাহি পরশে বিষয়।

ভগবান আচার্য্য মহাশয় গৃহাশ্রমে বাস করা কালে পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনাঙ্গন, শ্রীশ্রীব্রহ্মামাতাজীউ অর্পুজিত প্রিয়াঙ্গীসহ কেশবলালজীউ প্রভৃতি বিগ্রহের

পূজা মালিপাড়া গ্রামে প্রবর্তন করিয়া এই স্থানে প্রেম-দীক্ষা-শিক্ষা প্রবর্তনের বীজ পত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আধুনিক গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে আজও তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। মহাপ্রভুর সময় হইতেই বাংলাদেশে তাঁহাদের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং আজও এই গ্রামের অসংখ্য মন্দিরাদি দেখিয়া, পূর্বে ভগবান আচার্য্য মহাশয় যে ইহাকে সত্যসত্যই অভিন্ন বৃন্দাবনরূপে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করা যায়।

কলিকাতা হইতে গোস্বামী-মালিপাড়ার দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল এবং চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ইহা দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের জনসংখ্যা ১,৮৩৪ জন। গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, সাধারণ গ্রন্থাগার, ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যালয়, হরিসতা, পল্লী উন্নয়ন সমিতি, দাতব্য চিকিৎসালয়, সমবায় ব্যাঙ্ক, নাট্যমন্দির এবং খেলাধুলার যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। একটি ছোট গ্রামের মধ্যে এরূপ সুব্যবস্থা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউ ও রাধাকান্তজীউর মন্দির বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দির-গুলির মধ্যে অন্ততম। শ্রীপাদ বল্লভ গোস্বামী মদন-গোপালজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের মধ্যে প্রিয়াঙ্গীসহ রাধাবল্লভ এবং রাধা মদনগোপাল এই দুই যুগল মূর্তি আছেন। এতদ্ব্যতীত গোস্বামী বংশের বংশীবাদন শালগ্রাম এবং শ্রীশ্রীব্রহ্মামাতা নামক দক্ষিণ কালিকা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। একটি মন্দিরের মধ্যে দুইটি যুগলমূর্তি কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটি যুগলমূর্তি থাকিবার সম্বন্ধে এইটি ইতিহাস আছে।

বল্লভ গোস্বামী সর্বপ্রথম প্রিয়াঙ্গীসহ রাধাবল্লভের সেবা এই মন্দিরে প্রকাশ করেন। ইহার অল্পদিন পরে যুড়াজয় ব্রহ্মচারী নামক এক শিষ্য তাঁহার কুলদেবতা মদনগোপালজীউর বিগ্রহ লইয়া গুরুগৃহে এই গ্রামে



আসেন। তিনি রাধাবল্লভ দর্শন করিয়া নদীতে স্নান করিতে যান; স্নানান্তে বাড়ি যাইবার সময় তিনি আর মদনগোপালকে মন্দির হইতে উঠাইতে পারেন নাই। পরে মদনগোপাল কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তিনি এই স্থানেই থাকিবেন, অন্তত যাইবেন না। ব্রহ্মচারী ইহাতে বিশেষ ব্যথিত হইয়া ত্রিবেণীতে নিম্ন প্রাণ বিসর্জন দেন। বল্লভ গোস্বামী মহাশয় মদনগোপালজীউকে রাধাবল্লভের পার্শ্বে রাখিয়া যথাবিধি সেবাপূজা দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করেন এবং কথিত আছে যে, বিগ্রহের সহিত তাঁহার কণোপকথন হইত। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় রাধারাগীর বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মদনগোপালের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং একই মন্দিরে যুগলসেবা লাভ করেন।

এই মন্দিরের মধ্যে তিনশত বৎসরের পুরাতন একখানি পালকি আছে। এই পালকি করিয়া দুই যুগলমূর্তি রাসেব সময় রাসমঞ্চে এবং রথযাত্রার সময় রথে আরোহন করিবার জন্ত যান। মন্দিরের বাহিরে বল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের পুষ্পসমাধি রক্ষিত আছে। অদ্যাপি তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব সপ্তাহব্যাপী ধরিয়া এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কর্তৃক মন্দির ও নাটমন্দির প্রতি বৎসর স্বেচ্ছায় হয়। ১২৮৫ সালে শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী নাটমন্দিরে ষেতপাথর বসাইয়া দেন, ইহা একটি প্রস্তরে লিখিত আছে।

মন্দিরের পার্শ্বে দেশদেশান্তর হইতে আগত বৈষ্ণব-দিগের থাকিবার জন্ত স্কন্দর ঘর আছে। এই বৈষ্ণব-ঘরের নির্মাতার নাম একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। ফলকটি এইরূপ :

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব

মদনগোপাল দেবশর্মা

ও

মাতৃদেবী নিতম্বিনী দেবীর

স্মৃতিকল্পে

তালচিনান নিবাসী তদীয় পুত্র

শ্রীতিনকড়ি পাঠক দেবশর্মা

কর্তৃক এই বৈষ্ণববাস্তু নির্মিত হইল।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দির। শ্রীপাদ ভগবতানন্দ গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, শ্রিয়াজীসহ রাধাকান্ত বিগ্রহ মহারাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বিগ্রহ হুগলী জেলার পোলবা নিবাসী শ্রাম রায়ের গৃহে পূজিত হইতেন। শ্রীপাদ ভগবতানন্দ গোস্বামী স্বপ্নাদেশ পাইয়া উক্ত বিগ্রহ গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যসেবা ও ভোগরাগাদিতে পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে স্তনৈক বটব্যাণ ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্তাকে লইয়া মন্দিরে আসেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ কন্তার মৃত্যু হয়। কন্তার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ বিশেষ কাতর হন; তখন ভাগবতানন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ব্রাহ্মণ কন্তা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া আমার শ্রিয়াজী হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণকে শোক ত্যাগ করিতে বল এবং তাঁহার কন্তার একটি ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া আমার পার্শ্বে সংস্থাপন কর। উহা “বড়ালের ঝি” নামে রাধাকান্তজীউর বাম পার্শ্বে অদ্যাপি বিরাজিতা আছেন।

মন্দিরের বাহিরে শ্রীধুবচাঁদ ও শ্রীলুপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত একটি ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর মন্দির

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিকর

শ্রীপাদ থলু ভগবান আচার্য্যের পুত্র

শ্রীপাদ রঘুনাথ আচার্য্যের পৌত্র

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বা ভাগবতানন্দ

গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৩৬১ সালের ২৪শে কার্তিক রাধাকান্ত জীউর মন্দির—  
ও নাটবাংলা আনুল-মোড়ী নিবাসী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া কুণ্ড-চৌধুরাণী তাঁহার পিতা মাকড়দহ নিবাসী কেশবনাথ শ্রীমানী ও মাতা কুসুমকুমারী দাসীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমূল সংস্কার করিয়া দেন। এই কথাগুলিও একটি প্রস্তরে লিখিত আছে।

রাধাকান্তজীউর মন্দির সংলগ্ন সেবাকুঞ্জ ১১ই বৈশাখ ১৩৪৩ সালে সংস্কার করা হয়। আড়িয়াদহ নিবাসী শ্রীপ্রিয়নাথ দে ও তাঁহার সহধর্মিণী বসন্তকুমারী দাসী স্বর্গীয় নবকুমার দে'র স্মৃতিরক্ষার্থে উহা সংস্কার করিয়া দেন। ভাগবতানন্দ গোস্বামী ঋক ভগবান আচার্যের পৌত্র; পূর্বে তাঁহার নাম ছিল কৃষ্ণদাস। 'জগদীশ চরিত' নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, একবার বৃন্দাবনে যাইলে, শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উত্তর পাইয়া তিনি তাঁহাকে 'ভাগবতানন্দ' আখ্যা দেন। তাঁহার সম্বন্ধে জগদীশ চরিতে এইরূপ লেখা আছে :

পূর্বেতে শ্রীকৃষ্ণ নাম আছিল বিখ্যাত।

তাঁহার পাঠ শুনি প্রভুর হৈল মহাপ্রীত ॥

দেখি গৌর ভক্তগণের হইল আনন্দ।

সবে নাম রাখিলেন 'ভাগবতানন্দ' ॥

তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং রাধাকান্তজীউর মন্দিরে জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ভগবৎ পূর্বের অনুষ্ঠান করিতেন। অত্যাপি উক্ত অনুষ্ঠানগুলি যথারীতি হইয়া থাকে। তিনি "গোঁপাল-মন্ত্র-পদ্ধতিঃ" নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। মন্দিরের বাহিরে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা-দ্বাদশী হইতে সাত দিন যাবৎ তিরোভাব মহোৎসব এই স্থানে হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রামের মাঝেরপাড়ায় একটি প্রাচীন শিব মন্দির ও কালী মন্দির, পূর্বপাড়ায় মদনমোহন জীউর মন্দির, পশ্চিমপাড়ায় বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এবং আচার্যপাড়ায় গোপীনাথজীউর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঝেরপাড়ার শিব মন্দির ও কালী মন্দিরের নিত্যসেবার জন্ত বর্ডমানে মহারাজা ও আন্দুলের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত জমি আছে। উহার আয় হইতেই সেবা পূজা হইয়া থাকে। শিব মন্দির বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া কুণ্ড-চৌধুরাণী ১৩০১ সালে ইহা সংস্কার করিয়া দেন।

পূর্বপাড়ায় মদনমোহনজীউর মন্দির বর্ডমানে ভগ্ন হইয়াছে। একবার এই গ্রামের চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দেন। আচার্যপাড়ায় গোপীনাথ জীউর সেবাপূজা স্থানীয় চক্রবর্তীগণ করিয়া থাকেন। দোলের সময় এই স্থানে মেলা হয়। প্রতি বৎসর গ্রামে মহাধুমধামের সহিত সার্কজনীন অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে।

গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামে পূর্বে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। বর্ডমানে সম্পাদকরূপে শ্রীবিখনাথ গোস্বামীর এবং প্রধান-শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাব্রতী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রধানতঃ চেষ্টায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ইহা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। বিখনাথ-বাবুর চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনও হইয়াছে। ইহা নির্মাণের জন্ত পণ্ডিত বঙ্কিমবিহারী গোস্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নন্দরানী দেবী ও ছই পুত্র শ্রীনবগোপাল ও জয়গোপাল গোস্বামী ১০০১ টাকা সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা, ইটালী নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় যতুনাথ সরকারের সহধর্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সরকার তাঁহার ত্যক্ত এষ্টেট হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া এই বিদ্যালয়ে সাহায্য করিবার জন্ত একটি উইল করিয়া গিয়াছেন।

গোস্বামী মালিপাড়ায় গিরিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুন্দর নিজস্ব ভবন আছে। শ্রীঅজিতকুমার মণ্ডল ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অর্থদানে ও সরকারী অর্থ-সাহায্যে শ্রীবিখনাথ গোস্বামীর চেষ্টায় বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। উচ্চ-বিদ্যালয়ের সহিত প্রাথমিক-বিদ্যালয়ের বিভাগের পূর্বে গৃহ নির্মাণের জন্ত মন্নথনাথ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করেন। বর্ডমানে সেই গৃহই বর্ত্তিত আকারে উচ্চ-বিদ্যালয় ভবন হইয়াছে।

শ্রীশিবনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীবিখনাথ গোস্বামী এই গ্রামে 'ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব' স্থাপন করেন; উহার ত্রি-শাখায় খেলাধুলা, গ্রন্থাগার ও অভিনয়ের সুব্যবস্থা আছে।

গোস্বামী-মালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার শ্রীবিখনাথ গোস্বামী ও শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায়

# সংস্কৃত-প্রবন্ধ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

নিস্তরু গিরিশুভা। প্রশান্ত পরিবেশ। রাজি নিবিড়।  
সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট। অকম্পিত শিখায় জ্বলছে  
একটি মোমবাতি। আমিও বসে আছি একধারে স্থির  
হয়ে। স্বামীজী বলেছিলেন স্মৃতোতে, কিন্তু হঠাৎ-জ্যেগে-  
ওঠা কালিকিঙ্করের এত সহজে ঘুম আসবে না আজ।

শুক নীরবতায় কেটে গেল দীর্ঘক্ষণ। হয়তো এক  
ঘণ্টা, হয়তো দু' ঘণ্টা। হয়তো আরও বেশী।

সমস্ত গুহাটি এক অপার্থিব দ্ব্যতিতে উজ্জ্বল। হৃদয়  
আমার ভরে উঠেছে কানায় কানায় অপরিসীম আনন্দে।  
বুঝি আজ এসেছে আমার চরম প্রাপ্তির মহালগ্ন। বুঝি  
পেলুম সেই পরম দিশারীকে যার সন্ধানে একদিন বেরিয়ে-  
ছিলুম নিরুদ্ধে যাত্রায়। সব বিতৃষ্ণা বুঝি আজ ঘুচে  
গেল, বুঝি মিটে গেল সব তৃষ্ণা।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছি সন্ন্যাসীর দিকে।  
অকস্মাৎ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন—

অজুর্ন উবাচ,—

প্রকৃতিং পুরুষকৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রকমেবচ  
এতদবোধভূমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥

বুঝলুম গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়। এ যেন অজুর্নের  
মুখে আমারই আত্মজিজ্ঞাসা।

ধীষোদান্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে গেলেন সম্পূর্ণ ত্রয়োদশ  
অধ্যায়। গীতা আমিও পড়েছি। পড়তে শুনেছিও  
অনেককে। কিন্তু আজ যেন শুনলুম নতুন করে। অমূল্য-  
করলুম শ্রীভগবানের প্রতিটি বাণীর শাস্ত বাহ্যিক রূপ।  
নাকি এই মহাপুরুষের কৃপাস্পর্শে খুলে গেল সব রুদ্ধদ্বার।  
ক্ষণিক স্তব্ধতার পর সন্ন্যাসী যেন অধ্বাৎসবশায়  
আত্মগত ভাবে বলে চলেন:

এ প্রশ্ন কি শুধু অজুর্নের? অনাদি কাল থেকে সমস্ত  
মুমুক্শুর এই একই প্রশ্ন। প্রকৃতি কে, পুরুষ কে? ক্ষেত্র  
কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কে? জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কে? শুধু তর্ক আর

বর্তমান আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিজস্ব ভবন  
নির্মিত হইতেছে এবং ইহা গ্রাম্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাররূপে  
পরিগণিত। গোস্বামী মালিপাড়ার বৃহৎ রথ যাহা মদন-  
গোপালজীউর রথযাত্রার জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা কিশোরী  
মোহন গোস্বামীর চেষ্টায় নির্মিত হয়। সংস্কৃত চর্চার  
জন্ত এই স্থান এক সময় বিখ্যাত ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য,  
অলঙ্কার, বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়নের জন্ত বহু  
টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। এই গ্রামের গৌরগোপাল  
গোস্বামী তর্কালঙ্কার এবং হর্ষানন্দ গোস্বামী অসাধারণ  
বিদ্যাবত্তার জন্ত বর্ধমান মহারাজার দ্বারপণ্ডিত হন।

নবকৃষ্ণ গোস্বামী ও নীতানাথ গোস্বামী 'মন্ত্রমুক্তাবলী'  
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্বলিত গোস্বামী  
মহোদয়গণের বংশাবলীর ভূমিকায় গোস্বামী মালিপাড়ার  
গোস্বামীদের পাঁচটি দেবালয়ের বিষয় যাহা লিখিত আছে,  
তাহা উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীবল্লভী রাধাকান্ত মদনগোপাল  
রাধাদামোদর গোপীনাথ পরম দয়াল ॥  
এই পঞ্চ প্রভুর শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।  
প্রেমে কৃষ্ণসেবা করে বংশধরগণ ॥

বিচার। তর্কের আর অবধি নাই, বিচারেরও অন্ত নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ বিচারেও পাবে না, বেদের তত্ত্বমসিতেও হবেনা। হৃদয়হীনের শুদ্ধ বিচারে জ্ঞেয় বস্তুই হয়ে পড়বে দুজ্ঞেয়। মূল তত্ত্ব একই, সেই একই সত্য, একই জ্ঞেয় বস্তু। এই বোধকেই বলে জ্ঞান। বস্তু লাভের জন্য চাই প্রজ্ঞার অহুত্ব, চাই ভক্তের হৃদয়। ভক্ত হৃদয় যে তাঁর বৈঠকখানা। সংস্কারের সব প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল, জালিয়ে দে জ্ঞানের আলো, তবেই তো হবে তমোনাশ। ময়লা না মুছে ফেলতে পারলে দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়বে কেন? ভক্তির জলে মনের আয়নাটা মুছে ফেল দেখি। যুগে যুগে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন মানুষের হৃদয় দুয়ারে। অহুত্ব দাঁড়িয়ে আছেন পরম করুণায়। ব্যর্থ বেদনায়। কৈ ক'জন চাইল তাঁকে? ক'জন ডাকল তাঁকে ডাকার মত? কে চাইল তাঁর অহেতুকী কৃপা? কে এজন্ম সোজা পথটি ধরে নিঃসঙ্কোচে, নিষ্ঠায়? তাইতো প্রেমের ঠাকুরের চোখের জল আর স্কুরোলো না!

কা পছা? কোন পথ?

পথের কি আর অন্ত আছে? সব পথের ধারেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ধরা দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে। যা-না কোন পথে যাবি। পাতঞ্জল যোগমার্গে ধ্যান ধারণা কর, আত্মদর্শন হয়ে যাবে। জ্ঞানমার্গে নেতি নেতি করে বিচার করে যা ইতিতে পৌঁছে যাবি। কর্মমার্গে নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্বকর্ম তাঁকে সমর্পণ করে দেখনা, তোর কাজে তিনিই হাত যোগাবেন। বিচারের পথে না পারিস বিশ্বাসের পথে আয়। অচল অটল বিশ্বাস শুধু। ঠাকুর পরমহংস দেবের ছিল সেই জলন্ত বিশ্বাস। দেখা দিবি না, বল, দেখা দিবি কিনা? দেখা না দিয়ে উপায় আছে? ছেলের আকুল কান্নায় মাকে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতে হবে যে। একবার তাকে পেয়ে গেলে আর ভাবনা কি। ঝড়ের রাতে বটগাছটার তলায় দাঁড়াতে পারলে আর ভয় কি। দাঁড়া দেখি এসে অভয় আশ্রয়ে। সব ভয় কেটে যাবে। মোহান্ন অজুন, তাই কেবল বিচার আর দ্বিধা, সন্দেহ আর সংশয়। তাইতো গোড়াতেই শ্রীভগবানের সাবধান বাণী—

ক্লৈব্যং মান্য় গমঃ পার্থ নৈতৎ তদ্যুপপাদ্যতে।

ক্লান্ত হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তে শ্রুতিষ্ঠ পরম্পরঃ॥

তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবার দাঁড়া দেখি শক্ত পায়ের। ক্লীবতায় কল্যাণ নেই। শুতে শুধু ব্যক্তির নয়, সমষ্টিরই সর্বনাশ হয়।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নীরব হলেন।

ওঁর শেষ কথাগুলি যেন আমাকে কঠিন আঘাতে মচতন করে তুললো। শুধু বিচার আর দ্বিধা, সংশয় আর সন্দেহ। ক্লীবতায় সর্বনাশ হয়। মনে মনে সঙ্কল্প করলুম, আর দ্বিধা নয়, সংশয় নয়, এবার থেকে শুধু এগিয়ে চলা আমার এই মহান দিশারীর নির্দেশিত পথে।

অজ্ঞান তিমিরান্ধ্র জ্ঞানান্ধ্র শলাকয়া।

চক্ষুঃশূলীভঃ যেন তথৈব শ্রীশুক্রে বনমঃ॥

মনে মনে প্রণাম জানালুম এই মহামানবকে। তুমি আমার গুরু। তুমিই পথপ্রদর্শক। আজ থেকে বরণ করলুম তোমায় গুরুরূপে। এবার থেকে শুধু এগিয়ে চলা—যথা নিযুক্তোন্মি তথা করোমি।

সারারাত কেটে গেল এক পরমার্চর তন্ময়তায়। শুহামুখে অম্পট ভোরের আলোর আভাস। বনভূমি মর্ময়িত হয়ে উঠল ঝিরঝিরে হাওয়ায়। ঝড়ত হয়ে উঠল অসংখ্য পাখীর কাকলীতে।

স্বামিজী চোখ মেললেন। প্রশ্ন হাঙে প্রশ্ন করলেন, কি দেখলেন?

—দেখলুম। কিন্তু এ পথতো রাজনীতির পথ নয়। শুধু নিষ্ঠা আর বিশ্বাসেই সিদ্ধিলাভ? নেই কি কিছুমাত্র কূটনীতির প্রয়োজন, নেই কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয়-গুহা?

রাতের সঙ্কল্প ভুলে গেলুম। আবার মনে জাগল প্রশ্ন, জাগল সংশয়।

—এই একমাত্র পথ। তোমার আমার সারা ভারতবর্ষের। এ দেশে আর কোন পথ দিয়েই সার্বকতায় পৌঁছান যাবে না। গীতা উপনিষদের আদর্শ এ দেশের মর্মবাণী। স্বামিজীর কণ্ঠে অবিচলিত দৃঢ়তা।

আমি জিজ্ঞাসু। অন্ধ আবেগে অহুগামী হতে আমি পারব না। রাতের মোহান্ন ভাবটা বুঝি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এতক্ষণে। সম্যাসীর সম্মোহন শক্তির কাছে অত

সহজেই পরাভূত হবে না কালিকিঙ্কর। প্রশ্ন করেই যাচাই করতে হবে সত্যকে।

—এ পথে রাজনীতির স্থান কোথায়? এতো বানপ্রস্থের পথ।

—কর্মের নীতি না জানলে রাজনীতি করবে কি করে? স্বামীজীর মুখে তেমনই সহজ প্রশান্ত হাসি। আগে তাঁর কুপালাভ করতে হবে। পথ তিনিই দেখিয়ে দেবেন। পথের নিশানা আমি পেয়েছি, এবার তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে আমার পালা শেষ।

আবার যেন অসুভব করলুম সেই সম্মোহনের প্রভাব। প্রশ্ন করলুম, আপনি কেন এভাবে আত্মগোপন করে থাকতে চান?

—এর প্রয়োজন আছে। তারতবর্ষের মাটি পবিত্র হয়ে আছে কতো মহাপুরুষের হৃৎসান্থ্য সাধনায় কে তার ধবর রাখে। নগণ্য আমি শুধু সেই ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বারি সিঞ্চন করে তার উর্ধ্বরতা বাড়াবার সাধনা করছি। এ কাজ একা আমার নয়। মহামানবের সম্মিলিত সাধনা আর তপস্যায় এ পতিতার উদ্ধার সম্ভব। স্নেহ স্পর্শ পতিতা জননী। শুধু বক্তৃতা ধর্মঘট, আন্দোলন আর অনশনে কিছুই হবে না। মানুষ গঠন করতে হবে আজ। তাদের বোঝাতে হবে কর্মের আদর্শটা। হজুগে দেশপ্রেমিক অনেক আছে, কিন্তু খাঁটি দেশহিতৈষী আর ক'জন! সত্যিকারের কর্মসম্মানী বেশী নাই। তাদের খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে। সেই কাজ শুরু করেছি আমি, শেষ করতে হবে তোমাকে। তার আগে চাই আত্মগঠন। নিজেই যে স্ফুটন নয়, অন্তকে সে গঠন করতে পারে না।

আমি আবার পরাভূত হলুম। কে যেন ভিতর থেকে কথা কয়ে উঠল, আপনি আমায় স্ফুটনিত করুন। আমি শরণাগত। 'শিষ্যস্তেহং শাধি মাং স্বাং প্রপন্নম্'। মানুষ এতদিন ভুলে কালিকিঙ্করকে অজ্ঞাস্তে শ্রদ্ধা করে এসেছে। তাদের শ্রদ্ধার যোগ্য করে তুলুন এবার আসল কালিকিঙ্করকে। এ লজ্জা যে আর বইতে পারছি না।

—ভাগ্য তোমার সহায়। দৈব অমূল্য। উত্তীর্ণতঃ জাগ্রত। স্বামীজী স্নেহে হাত রাখলেন আমার কাঁধে। আকাশ পরিষ্কার, পালে লেগেছে জোর হাওয়া। এইতো

এগিয়ে যাবাব শুভলগ্ন। তারপর মাঝ দরিয়ায় গিয়ে পড়লে প্রাণেব দায়ে, মানের ভয়ে, প্রেমের জ্বরে সব বাধা কাটিয়ে উঠবে।

পরম শ্রদ্ধায় পদধূলি নিলুম স্বামীজীর। সংশয়ের মেঘটা কখন যে কি ভাবে কেটে গেছে বুঝতেও পারিনি।

হাত ধরে আমায় তুলে স্বামীজী। স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। মুহূর্তে সারা দেহ আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এক আশ্চর্য আনন্দ শিহরণে।

—তুই-ই পারবি বেটা। পারতে যে হবে তোকে। শক্তিমানের কাছে অসাধ্য কিছু নেই।

স্বপ্ন হল আত্মগঠন।

প্রাতে শরীরচর্চা। সন্ধ্যায় শাস্ত্রচর্চা। গভীর নিশীথে যোগাভ্যাস। আশ্চর্য এক নেশায় কেটে যেত নিরবসর দিন, নিদ্রাহীন রাত। এমনি করে কাটান প্রায় দু'বৎসর। আহা! নিদ্রা বিশ্রাম ইত্যাদি জৈব প্রয়োজনগুলি প্রায় ভুলেই গেলুম। আহা! সংগ্রহে স্বামীজীকে সময়ের অপচয় করতে দেখিনি বড়। কখনও ছুটি ফল কখনও শুধু বর্গার জল। অথচ অমিত শক্তির আধার স্বামীজী। দৈহিক শক্তি সযত্নে আমারও একটু গর্ব ছিল। কিন্তু ধূলিসাৎ হয়ে গেল সে গর্ব এ সম্মানীর কাছে।

অদ্বুত গুণ কর্মপদ্ধতি।

স্কুলে, কলেজে, অফিসে, রেস্টোরাঁয়, ধর্মীয় প্রাসাদে, দীনের কুটীরে সর্বত্র অবাধ গতি, অটুট সম্মান। সর্বত্রই ছড়ান রয়েছে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মন্ত্রশিষ্যদল। গুণ রিক্রুটস্। এখানে অমুক সজ্জ, ওখানে অমুক ক্লাব, সেখানে অমুক পার্টি সবগুলির সূত্র এক হাতে ধরে এক আশ্চর্য পুতুল খেলা খেলে চলেছেন। নেপথ্যে রয়েছে এক এবং অদ্বিতীয় নেতা কালিকিঙ্কর। উনি শুধু নেতার আজ্ঞাবহ। এ এক অভিনব আবিষ্কার। এই একপ্রাণতা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। প্রাণে আশা জেগেছে।

এ সময়ে আমার ভূমিকা ছিল স্বামীজীর একজন বোবা পাহাড়ী সেবক। অভিনয় দক্ষতা আমার জন্মগত। অবিচল নিষ্ঠায় কঠিন সংযমের সহিত এ অভিনয় আমি করেছি। অভিনয়-নৈপুণ্যের জ্ঞান স্বামীজীর

সপ্রশংস আশীর্বাদও লাভ করেছি। জম্মু, কাশ্মীর, সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এক কথায় সমস্ত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই আমরা পদত্বজে পরিক্রমা করেছি এই দুই বৎসরে। দক্ষিণ ভারতের সংগঠন স্বামীজী ইতিপূর্বেই করে ফেলেছেন। বর্মা, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর অঞ্চলেও নাকি আছে স্বামিজীর রিক্রুটস্।

ঊরু আশ্রমের অবস্থান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল একদিন।

—এ জায়গাটা কেন বেছে নিলুম জান ? এ অঞ্চলটার নাম পছেলগাঁও। স্ত্রীনগর এখান থেকে ষাট মাইল, অমরনাথ বিশ পঁচিশ মাইল। তা ছাড়া কেমার, বজী, গাঙ্কোজী, ধমুনোজীও বেশী দূরে নয়। সাধুর আস্তানার পক্ষে স্থানটি স্তুতবাং নিরাপদ। সহরে সাধু দেখলেই ধারা সন্দেহ করে, তীর্থক্ষেত্রে তারাই আবার সাধুকে প্রশংসা করে। ওদের চোখে ধূলো দেবার এইটেই প্রকৃত রাজপথ। বোকার মত ধরা পড়ে কান্দাকাঠের সহিদ হওয়াটা বড় কথা নয়। ইতিহাসে না হয় স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা হল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে ব্যর্থ হল তার কৈফিয়ৎ কে দেবে!

সহিদ হওয়াটা বড় কথা নয়। অকুস্মাৎ মনে পড়ল স্মিত্রায় কথা। ব্যথা পেলুম। প্রতিবাদ না করে পারলুম না।

—কিন্তু এমনি অসংখ্য সহিদের রক্তেই তো রাজ্য হয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস।

স্বামিজী হাসলেন।—পলাশীর যুদ্ধে মীরজাদা মোহন-লাল মরেছিল, এ যুগে ক্ষুদিরাম, মাষ্টার-দা মরেছেন; সে কি শুধু সহিদ হবার মরা? সে মৃত্যুর কী মূল্য দিয়েছি আমরা? কে জানে কবে শোধ হবে সেই মৃত্যুশ্রাণ। সে মৃত্যুতে খেদ নেই, লজ্জা নেই! মরতে হলে তেমনি করে মরবে। নিবৃত্তিতার লক্ষ্য, ব্যর্থতার অহুশোচনায় যেন না মরতে হয়। মরতে হয় না যেন তিলে তিলে অঙ্গকার জেলে।

—সর্বদা পুলিশকে এড়িয়ে চলার চেষ্টায় সময়ের অপব্যয় হবে না প্রচুর? উদ্দেশ্য কি তাতেও বিলম্বিত হবে না?

—হলই না হয় বিলম্বিত। তবু বিকল যেন হতে না

হয়। আর শুধু কি পুলিশের ভয়েই পালিয়ে এসেছিবে জঙ্গলে? হাতের কাছে কাঁদের পেয়েছি দেখ না। পাঠান, কয়াসী, মারাঠী, রাজপুত, নেপালী, শিখ সব পাশাপাশি। সব আজন্ম যোদ্ধা এরা। ভারতবর্ষও যে একটা ওয়ারিয়র নেশান এইখানে বসেই তা মালুম হয়।

বাঙালী কালিকিঙ্কর একটু ক্ষুণ্ণ হবে বৈকি। সখেদে বললুম, বাঙালীও পশ্চাতে পড়ে নেই স্বামিজী। বাংলার মিডনাপুর, বরিশাল, চিটাগড়?

—বাঙালীর পরিচয় মাত্র ঐটুকু নয়। বাঙালীর পরিচয় চিন্তার ক্ষেত্রে। বাঙালী এদের তুলনায় অনেক বড়। বাঙালীই পরে সারা ভারতবর্ষ লিড করবে। করেছেও একদিন।

স্বামিজীর বাঙালী প্রশস্তিতে গর্বান্বিত হব করছি মনে মনে। স্বামিজী বলে চলেছেন, মহাত্মার কুইট ইন্ডিয়া কার্যে পরিণত করতে পারত একমাত্র বাঙালীই। কিন্তু বাঙলার আজ বড় দুর্দিন। ওদের ব্রেন আছে, কিন্তু নেই নেতৃত্বের আস্থা। আর যোগ্য নেতাও নেই কেউ।

ক্ষুণ্ণ হলুম স্বামিজীর শেষ কথাটিতে। আপনি গড়ে তুলুন যোগ্য নেতা।

—নেতা তৈরী হয়নারে। নেতা জন্মায়। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘটে তার আবির্ভাব।

—সে মুহূর্ত কি এখনও আসেনি?

এসেছে বলেইতো আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমি বলছি তাদের কথা যাদের নিয়ে নেতাকে কাজ করতে হবে। নেতার কাজ তাদের সংগঠন করা। স্বেচ্ছায় করা মেহে মনে প্রাণে। এ কাজে সাহস চাই, চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর সতেজ প্রাণ। এর কোনটাই পূর্ণতা লভে করতে পারে না যদি দেহ থাকে দুর্বল স্বাস্থ্য, হয় পছন্দ। সেই স্বাস্থ্য আছে এদের—বাংলায় যা দুস্প্রাপ্য। আমার তো মনে হয় স্বাস্থ্যের দীনতাই বর্তমান বাঙালীর অগ্রগতির একটা মস্ত অন্তরায়। ডিসপেন্সিয়ারি আর ম্যালেরিয়ার ওদের দেহমনও যেমন ভুজুর, তেমনি সরলতা নেই বাঙালী চরিত্রে। এদের আছে সবল আর সরল বিশ্বাস। নেতাকে বিশ্বাস করতে জানে এরা। তাই এই কয় বৎসরে এদিকে

থেকে যা পেয়েছি বাঙলায় থেকে সারা জীবনেও হয়তো তা সম্ভব হত না।

বর্তমান বাঙলার প্রতি, বাঙালীর প্রতি স্বামিজীর এই মনোভাব, এই ভ্রাস্ত্র ধারণার নিরসন হওয়া দরকার। বাঙালীর বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস তো আমার কাছে অপষ্ট নয়। আমি ব্যথিত কণ্ঠে বললুম, আমার তো মনে হয় এদিকের মানুষ বিপ্লবান্দোলনের কাছে ব্যাক-ওয়ার্ড। এদের ট্রেন-আপ করতেই যে দীর্ঘ দিন কেটে যাবে। অথচ বাঙলায় এ ট্রেনিং অনেক দূর এগিয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু সজীববদ্ধতা আর নিষ্ঠা।

—শুধু সজীববদ্ধতা আর নিষ্ঠা! এ দুটো বস্তু বুঝি খুব জ্বলন্ত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি হস্তামলকবৎ অনয়াস-লভ্য। তুল আমাদের ঐখানে। এই তুলন্ত বস্তু দুটির সন্ধান পেয়েছি আমি এদের মধ্যে। ব্রেইন এদের কম, কিন্তু নিষ্ঠায় এরা বহুসম। পরিচালনার দক্ষতা এদের হয়তো কম, কিন্তু পরিচালিত হবার সুশীল গুরুত্ব এদের অনবদ্য। নায়ক একজনই দরকার, কিন্তু কর্মী চাই হাজার হাজার, লাখে লাখে। বাঙলার সবাই সেই একজন হতে চায়, এরা খুশি থাকতে জানে বছর মাঝে এক হয়েও, অথচ এদের মাঝেও আছে এমন অনেকেই যারা সেই একজন হবার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু তা নিয়ে এদের কাড়াকাড়ি নেই। এদের নিষ্ঠা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস এই উত্তর ভারতই একদিন লিড করবে সারা ভারতবর্ষ।

—আপনি সম্ভবত বাঙলায় বেশী দিন থাকেননি।

—তা সত্যি, কিন্তু এ কথাও সত্যি যে মিরজাফরের বংশধরদের ওখানে মুত্য়া নেই।

—কিন্তু ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছে বাঙলার উজ্জল জ্যোতিষ্ক ক্ষুদ্রিরাম, সত্যেন বসু, কানাইলাল, বীরেন গুপ্ত।

—আবার দেশদ্রোহী নরেন গোস্বামীও বাঙালী।

—নরেনদের বিনাশ করতে সত্যেনদের অভাব হবে না।

—কিন্তু ফাঁসিতে ঐ সত্যেনদেরও হবে। কতবড়

শক্তির কী মর্মান্তিক অপচয়! ভেবে দেখতো আজ যদি অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, মাষ্টারদার মত শক্তিগুলি আমাদের হাতে থাকত, আমরা কী না করতে পারতুম। কিন্তু ওরা শুধু ফাঁসির মধ্যে মরণের জয়গান গেয়েই ফাটা বেলুনের মত মিলিয়ে গেল নিস্তক্ব অতীতে। শুধু গালভরা স্তবগান আর নাটকীয় অশ্রুপাত। এইটুকুই ওদের জীবনের দাম!

স্বামিজীর চোখে দুটি অশ্রুভারে টলমল। লুকোতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি এ সুযোগ ছাড়লুম না। আপনাদের চোখেও জল! তবেই বুঝুন ওদের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। ওরা পথিকৃৎ। ওরাই আঁচলধরা বাঙালীকে শিখিয়েছে ‘জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য’। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুশয্যায় নলিনী বাগচির শেষ কথা ক’টি, ‘Don’t disturb please, let me die in peace!’ এ কি মানুষ ভুলতে পারবে সহজে। এই বাঙালীকে আমি শ্রদ্ধা করি সমস্ত অন্তর দিয়ে।

স্বামিজীর চোখে জল, মুখে মুদ্র হাসি।

—এ হ’ল খাঁটি বাঙালীর কথা। যে বাঙালী ভাব-প্রবণ। যে বাঙালী বীরের সম্মান দেয় চোখের জলে। ওরে, ছ’ কোঁটা চোখের জলে একটা বিরাট শক্তির ব্যর্থ অপচয়ের মূল্য দেওয়া যায় না। অপচয় করবার মত অপধ্যাপ্ত শক্তি আমাদের কোথায়। যেটুকু আছে তাকে সংহত করতে হবে। তার একটি বিন্দুও না অকারণে অপচয় হয় যতদিন না পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হচ্ছে। থাক ওসব ভাবালুতার কথা। এমনি অনেক ব্যর্থ আত্মহত্যার কাহিনীতে ভারতবর্ষের ছ’ হাজার বৎসরের ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। পরাজয়ের ইতিহাসের কলেবর আর বাড়িয়ে কি হবে। এখন রচনা করতে হবে বিজয়ের ইতিহাস। ভারতবর্ষের নব ইতিহাস।

—সে ইতিহাস কি ১৯২৬ থেকেই শুরু হয়নি?

—স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হওয়াটাই স্বাধীনতা লাভকে নিশ্চিত করেনি। কোথায় সুপরিকল্পিত পন্থা। কে সুযোগ্য নেতা আজ, যে পরিচালনা করবে এই আন্দোলন। (ক্রমশঃ)

# পাষণের ক্ষুধা

( কথাবার্তা )

ত্রি নৈমিষ্যারণ্যক

( প্রমা ও প্রেমা—দুটি মেয়ে স্বাধীনতাদিবসের পতাকা উত্তোলনের পর ঘরে ফিরছে ; পথে এক জীর্ণ পাষণ দেউল, সেদিকে চেয়ে— )

প্রেমা—দেখ প্রমা! ঐ পুরাণো পাষণটার পানে চেয়ে আমার গা ছম্ছম্ করে, বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে...কত সকাল সাঁঝ তো এই পথে আনাগোনা করেছি, কখনও একলা, কখনও বা সাথীসঙ্গে...যখন এর পাশ দিয়ে গিয়েছি, এ পাষণটাকে কিছুতেই পাশ কাটাতে পারিনি...ও আমাকে পাশ কাটাতে দেয়নি...ওর ভেতর থেকে কে যেন আমায় অদেখা হাতছানি দিয়ে ডেকেছে...কোন এক অশাস্ত অশরীরী যেন ঠিক কাণের গোড়ায় এক সন্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিয়েছে, কিন্তু কৈ...কিছুই তো দেখিনি বুঝিনি। ঐ তো শেওলাধরা বিরাট পাষণ—ওতে আবার এক অনামা গাছ তার শত শেকড়ের ফাঁকড়া দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে—যেন ঐ পাষণটার ভেতরেই হৃদপিণ্ডটা ধুকধুক করে যাচ্ছে তার—দিনবাম বর্ষযুগ ধরে।

প্রমা—সত্যি, বললে বিশ্বাস হয়তো করবে না কেউ—পাষণেও প্রাণ আছে, হয়তো লুকিয়ে আছে...যেমন সেই রূপকথায় রাজকন্তা মড়ার মতো পালকে পড়ে...সোণার জীওন কাটিটি ছোঁয়াও, অমনি তার পরাণের সকল আকৃতি নিয়ে সে তার চোখ দুটো মেলেবে...খুঁজবে তার দরদী দোসর চাইবে তার মধুসঙ্গ, তার ভরা ভালবাসা...হারানো সোণার কাটিটা মিলেচেনা বলেই না ওটা একটা পাথর, হয়তো ওটাই লুকিয়ে রেখেছে কবির সেই পরশ পাথর, যা' ক্ষাপা খুঁজে খুঁজে হ'ল সারা।

প্রেমা—আমারও তাই মনে হয়, প্রমা। সেই যে ওদেশের এক স্বভাব কবিও বলেছেন—“তোমার চলার পথে ঐ যে বনলতিকা, ওকে দরদী করে পরশ করে যাও...ওরও যে মরমে লুকানো আছে ব্যথা পুলকের কড়ি কোমল যাতনা সাড়া শিহরণ...”

প্রমা—ঝরাফুল, ঝরাবাতা, শুকনো লতায় তা নৈলে কোথা থেকে গজায় আচম্বিতে এত অরুণরাজা নবকিশলয়,

এত সদা প্রসাধিতা মুকুলমঞ্জরী। সোণার কাটি কে ছোঁয়াল, কোন্ মোহনিয়া ঘাড়কর ?

প্রেমা—লতায় আছে প্রাণ, শিরায় শিরায় আছে প্রাণের স্পন্দন, বেদনার হিল্লোল, তাজা রসের সঞ্চার। কিন্তু পাষণে ?

প্রমা—পাষণেও আছে প্রেমা, তবে পাষণে প্রাণের নাড়ীগুলোর আরও গোপন সঞ্চার! আমাদের এই মামুলি কেজো আঙ্গুলগুলোর স্পর্শে তাতে নাড়ীর সাড়া মেলে না...ভূতনাথ তাঁর এই বিচিত্র সৃষ্টির পালাটা কোনও গতিকে শেষ করে ঐ পাষণেই পেতেছেন জড় সমাধি।

প্রেমা—হয়তো তাই! নইলে পাষণেও প্রেমের পূজারী তার সকল প্রাণ নিঙড়ানো পূজা অব্যোম্বরায় চোখের জলে টেলে দিতে আসবে কেন! পাথরের বুকে কেন সে খুঁজবে তার মোহনিয়া পিতম্ব নঙল-কিশোর, কেন তাকে ডাকবে—‘মা-টি আমার’ বলে, কেন তার স্নিগ্ধ স্মৃতি ছায়ার তলে লুটাবে—‘জয় বাবা বিশ্বনাথ’ বলে ?

প্রমা—যিনি সব, তিনিই ঐ পাথর...আর, যিনি সব হয়েছেন, তাঁর কোথাও এতটুকু ঘাটিতি হয়নি...পূর্ণ যিনি সবতাত্তে, পূর্ণ তিনি আমার এই এতেও...এই ভাবে ধরলে তো সব ঠিকই আছে প্রেমা।

প্রেমা—তবু কোথাও দেবতা, কোথাও বা রাক্ষস...কোথাও পাই বুকে পরম ভরসার স্নিগ্ধ নিশ্চিত বাতাস, কোথাও বা বুকে লাগে যেন এক মহাভয়ের জলন্ত নিঃশ্বাস...কোনো পাষণের কাছে গেলে বুকে জাগে অপূর্ণ এক আনন্দের হিল্লোল, আবার কারুর কাছে গেলে অজানা আতঙ্কের এক অবুঝ অসামান শিহরণ।

যেমন—ঐ পাষণটায়।

প্রমা—আমার কি মনে হয় জানো, প্রেমা ?

প্রেমা—বলো...

প্রমা—যিনি ‘সত্যং শিবং সুন্দরং’ তিনি এই পাষণটার মাঝেও রয়েছেন, কিন্তু বড় গোপনে, যেন কোন অতি গোপন গহন গুহার অন্ধরে—কেউ যেন টের না পায়,



টাকৈ দেখতে না পায়, ধরতে ছুঁতে না পায়। আর, নিজে গোপন হ'য়ে ভারি এক মজার খেলা দেখাচ্ছেন—

প্রমা—অন্দরে তাঁর গোপন পরম নিশ্চিন্ত মণিকোঠা, বাহিরে এক আশ্চর্য যাহু আর ভেঙ্কি দেখাবার কত না কেরামতি!

প্রমা—বাহির বাড়ীটা যেন সেই রূপকথার 'সাত মহল পুরী'—দেউড়ির পর দেউড়ি পেরিয়ে যেতে হবে অজানা যে অরূপরতন, তার সন্ধানে...

প্রমা—আর দেউড়ি পেরুলেই রকমারির যত সব আশ্রব খেলা...

প্রমা—হ্যাঁ, কোথাও বা দেবতার লীলা, কোথাও বা রাক্ষস, শয়তানের খেলা...

প্রমা—ছুটোই ভেঙ্কি?

প্রমা—একটা, ভেঙ্কি ভাসিয়ে সত্যজন্মের রত্নবেদীর হয় মঙ্গল দিশারী; অগুটা, ভেঙ্কিতে আরও তুলিয়ে, আবণ্ড জড়িয়ে হয় ক্ষুধিত রাক্ষসের তৃপ্তিহীন ক্ষুধার কপট পশারী!

প্রমা—সেই যে গল্প—বনের আঁধারে হুজনে সরু পথ ধ'রে চলছে। হুজনারই পথের ওপর ছোটো আলোর বিন্দু দেখল—ভাবল মণি। ছুটে গেল; কিন্তু মণি তো নয়, আলোর ফোঁটা। তবু এলো কোথেকে? খুঁজতে গিয়ে একজনা দেখল—রাক্ষসীর ঘরে এক নরমেঘের জলন্ত প্রদীপ জ্বলছে; অগুজনা পেল—মোনী সাধুর গুহায় তাঁর পাছুকার প্রান্তে 'সাতরাজার ধন' এক মাণিক!

প্রমা—পাছুকার ধুলোয় লুটিয়ে প'ড়া মাণিক...

প্রমা—সেই পাছুকার ধুলোই হোক এই ভেঙ্কি-বিহ্বল নয়নছটির দীপ্ত জ্ঞানাজ্ঞান—

প্রমা—নৈলে তো মাণিক পেয়েও চিনবে না সে, কাচ ভেবে ফেলেই বা দেবে...

প্রমা—ভেঙ্কি যার ভাঙ্গল, তার আর রাক্ষুসে মায়ায় ভুলে সর্বহারার হবার ভয় নেই। যেমন কুম্ভমেলায় সেই প্রেমী সাধু—যিনি লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের সামনে তাঁর যুক্ত করপুটে প্রেমের আরতি ক'রেই চলেছেন—বলছেন "এহি মেরা রাম! এহি মেরা রাম!" আর চোখের

জলে ভেসে যাচ্ছেন। নরনারী তো কেউ চোর, কেউ লম্পট, কেউ বেকুব বেচারী! কিন্তু সে সবই বাইরের সাজ আর মুখোস! অন্দরে—'ঘট ঘট মে একহি রাম!'

প্রমা—যেমন আবার সেই গল্প—একজনা বাঘের গোটা চামড়াটা মুড়ি দিয়ে বনের ধারে সবাইকে ভয় দেখাত'। একজন চতুর চালাক লোক বুঝল—'গুটা মুখোস! বল্ল—'ভয় কি দেখাচ্ছিস, তুইতো আমাদের হ'রে।' হ'বে বল্ল—'দাদা, দোহাই তোমার, চুপ! আমার মজার খেলাটা খেলতেই দাও না!'

প্রমা—আমার ঐ রাক্ষুসে পাষণটা তবে মুখোস প'রেই ভয় দেখায় বুঝি!

প্রমা—তা না ত' কি! তবে যতক্ষণ চোখে ভেঙ্কির কাজল র'য়েছে, ততক্ষণ একশ'বার 'গুটা বাঘ নয়, গুটা বাঘ নয়, ও আমাদের হ'রে বল্লও প্রত্যয় হবে না তো!

প্রমা—ততক্ষণ ওই যে পাষণটা, ও দেবতা নয়, রাক্ষস! ওর রাক্ষুসে ক্ষুধা আছে; বলবে—'মায় ভুখা হ'—আমাকে বলি দাও, আবারও দাও...

প্রমা—সেটা শুধু চোখের ভুলের জন্তে নয়। তোমার ভেতরেও ওর মতন এক ক্ষুধিত পাষণ র'য়েছে ব'লে। সমানে সমানে নৈলে তালে তাল দেয়া তো যায় না। তোমার ভেতরে যদি পরম দেবতা নিশ্চিত-বেদীই রচনা ক'রে থাকতো, পাষণটা রাক্ষস হ'য়েই বা কি করবে তোমার? দেবতার জন্তে খাঁটি খাঁটি তোমার দেহ-মনের, তোমার ভাবভক্তির যে নৈবেদ্যডালা সাজাবে, তাতে কোন রাক্ষসের লোভ, কোন শয়তানের নজর প'ড়বে না জেনো। আলো আর আঁধার, অমৃত আর বিষ একসঙ্গে থাকে না। তবে নৈবেদ্যের ডালায় ভাঙ্গা ফুটো রাখতে নেই যাতে ক'বে তাঁর তরেই গাঁথা মালাটা ধুলোয় প'ড়ে হয়ত' ছাগলের ভোগেই লেগে গেল!

প্রমা—আমার ভেতরেই কোন একটা ঠাই আছে—কাঁচা, কয় জোর—শিথিল, ভঙ্গুর। বাইরের ভয়, সেইটাকেই কাবু করতে চায়। নয় কি? যতক্ষণ তাঁর টানা গণ্ডীর ভেতরে আমি র'য়েছি, ততক্ষণ কোন রাক্ষুসে আমায় ক'রবে হরণ!

প্রমা—তিনটে গণ্ডী টানা তোমার পঞ্চবটীর কুটীর  
দুধারে...তিনি আছেন, আর তিনি তোমার একমাত্র  
স্বামী, এটা ভুলো না; তাঁর নাম—সে নামের মহিমায়  
বিশ্বাস হারিও না, তাঁর প্রেম—সে প্রেমে ‘জয়’ দিতেও  
ভুলো না!

প্রমা—এসবতো উচু থাকের উপর দরওয়াজার খবর  
হচ্ছে, নয় কি?

প্রমা—তোমার থাক তো উচুই প্রেমা! মরতের  
ধূলায় মরতের সাজে নেমে এসেছো তবু মরতের ময়লা তো  
তোমাতে দাগ বসায় না!...

প্রমা—তবুতো মনে হয় ঐ রাক্ষসের ভয়টা মরতের  
প্রাণীর চাইতেও আমার বেশী বেশী...মরতের জীব মরণকে  
সবচাইতে বেশী ভয় করে...আমারও তো ওটা ভাবলেই  
কেমন জানি ভয়ই হয়।

প্রমা—ভয়ের জন্ত ভয় নয়, প্রেমা; যে চিরসুন্দরকে,  
যে চির কিশোরকে, যে নন্দহুলালকে নৃপুত্র পায়ে তোমার  
জীবন-আজিনায় নিতি নবরাগের আলপনায় তুমি নৃত্যপর  
দেখতে চাও—যে নৃত্যের ছন্দে তোমার দেহ-মনের  
সকল তার র’য়েছে বাঁধা...সে ছন্দ বুঝি টুটেই যায়, সে  
বাঁধী বুঝি ভেঙ্গেই যায়, যখন তুমি শোষণ’ নদীতে নাইতে  
গিয়ে কারা জড়াজড়ি ক’রে ভুবে মরল?...কোন আধ-  
ফোটা মল্লিকার কলি ক্রুর কীটে কেটে নিরুঁর মাটিতে  
লুটিয়ে দিল...তোমার অন্তরের সুরে ছন্দে বা লাগে বলে  
তোমার আঁখিপাতে রয়না নিদ। তোমার অধরে বিদায়  
নেয় হাসি...যেন তোমার নিজের বুকেই গেল কোন  
দরদী মরমী তারটা খট্ করে ছিঁড়ে...

প্রমা—এটা তো তবে বড় কাঁচা তার! সকাই  
তো বেশ সহজে ওসব দিবি কাটিয়ে ওঠে, আমাকে অমন  
ক’রে পেয়ে বসবে কেন?...যেন একটা আবেশের মতো  
আচ্ছন্ন ভাব...ছেড়ে ফেলতে পারিনা...

প্রমা—ওর মানে আছে প্রেমা। স্বরগের দূতী নৈলে  
মরতের ব্যথায়, আর্জিতে অমনদারা আপনহারা বুকখানা  
পেতে দেবে আর কে বলত! মরতের টেউ মরতের  
তটেই একটু খানি কল্লোল, একটুখানি ফেনা রেখে  
মিলিয়ে যায়, কিন্তু স্বর্গের অনিবার্য আলোর ঝলগা,

শাওনের নিশীথের অঝোর বরিষণ, মরতের ক্লাস্তিতেই  
কৈ ক্লাস্ত হয় না, মরতের ঘুমেও তো কৈ ঘুমিয়ে পড়েনা...  
সে যে উদার চিরসুহৃৎ, কণেকের পরশে, সম্ভাষণে,  
করমর্দনে তার তো চিরসাম্বন্ধার কাজটা ফুরোয় না!...

প্রমা—ভাগবতে শুনেছি সাধুরা মরতের ব্যথায় যেন  
মায়ের মতোই ক্লেশ পান, আর, সেটাই যিনি অখিলাস্বা,  
তাঁর সব চাইতে বড় আরাধন!

প্রমা—তোমারও আরাধন তো তাই, প্রেমা।

প্রমা—কি জানি! তবু ভয় তো করে...

প্রমা—ও জন্তে মোটেও ভেবনা। শুধু মাঝে মাঝে  
নিজের ভেতরে তাকিয়ে দেখো—ঐ তিনটি গণ্ডী ঠিকই  
টানা আছে তো...‘নিবাস: শরণং সুহৃৎ’—তাতেই আছি,  
তাঁর জোরেই আছি, আর ডাকলেই, হাত বাড়ালেই  
তাকে পাব।...তোমার-জন্মতিথিতে লেখা সেই কবিতার  
বই দুখানা অন্তরের কাছটাইতেই রেখ’ যেন,...নিজের  
জন্তে শুধু নয়, সকাইকার জন্তে সকল হৃদয় শোভনকে  
জীবানোর শোণার কাঠি, তুমি যে হাতে তুলে দিয়েছ,  
তাতে...তোমার কমনীয় উজ্জল সোণালী ছায়ায় যেই  
আসবে, তারির যে রাক্ষসের ভয়, ভুতের ভয় কাটবে...  
নিজের ভয়েরই ছলটুকু, তোমার মমতাঢালা অভয়,  
আশ্বাসকে আরও মঙ্গল মধুর করে সকাইকে এনে  
দেবে যে...

প্রমা—সত্যি ভাই, আমার ভেতরে এক পরশ রক্তনের  
খোঁজ যে না পাই, এমন নয়। তখন ভাবি—আমি  
যাই ছোঁব, তাইতো শুচি শুদ্ধ হ’য়ে যাব...আমার  
ভেতর সব ঠাঁই ঘুড়ে প্রেমের ঠাকুরই র’য়েছেন যে!  
তখন এ মরতের তহু আর পেশীর বশ মন ভুল  
হ’য়ে যায়...

প্রমা—মরতের ‘পেশী’ দিয়ে তো তুমি তৈরী নও  
তাই...যে পেশী দিয়ে গড়া, তার ভেতরটা হয়  
পেশীলালস...সে লালনা যেখানে বেশী, সেখানে মনটা  
হয় পেশীপরবশ, পেশীপাগল...আর পেশীপাগল মনই  
হ’ল আসলে ক্ষুধিত রাক্ষুসে পাষণ! বাইরে অই যে  
পাগলটা, ওটা ভেতরকার ক্ষুধিত পাষণেরই প্রতিক্ষায়া,  
বাহিরের রূপ...

প্রেমা—পেশীর বদলে ঐশী হ'লে ?

প্রেমা—ওটাও রাকুসে থাকবে না...ওতেও তোমার দেবতার আসন পাতাই দেখবে...

প্রেমা—কিন্তু, যাকে 'পেশী' বলছ সেটাতো সৃষ্টির গোড়াকারই জিনিষ...ঐটেকে ধরেই তো চলছে সৃষ্টির ধারা নব নব বিকাশ উন্মেষের পথে ওটা বাদ দিলে তো গোড়াটাই বাদ।

প্রেমা—ঠিক, তবু ঐ এক মূল থেকে যে বিপুল গাছটা জন্মেছে, তাতে বেশীর ভাগ শাখাতেই ফলে নানান কুহক ফল, সেগুলো বাইরে দেখতে রঙ্গীন মাকালের মতো হ'লেও, ভেতরে বিস্ত্রী, বিস্বাদ, বিষাক্ত। গাছের ছোটো একটা ওপর ডালে যেখানে তাঁর কিরণ, তাঁর পবন, তাঁর বর্ষণ পরম মঙ্গল আলিষের মতো নিত্য ঝরে—সত্যিকার মিষ্টি অমৃত ফলও ফলে বৈকি। ভাগবতে শুকমুখে 'গলিত রস' যেমন 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'...গাছটার গুঁড়ি থেকে ছদিকে ছোটো বড় শাখা বেরিয়েছে যেন...একটা পেশীকাম, অপরটা কামনা, প্রেম। তোমার ভেতর এ দুটোতো গুলিয়ে নেই, কাম নিজে থেকে প্রেম ব'লে ভাঁড়ায় না' প্রেমা। গুলিয়ে নেয়, আর, চোরা ডালবাঁসা মেজে ভাঁড়ায় বলেই না চারধারে এত সর্বনাশা সম্মোহন ফাঁদ পাতা। কামুক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পায়ের চটুল ঘুঁঘুর জোড়া খসিমে, প্রেমিকের গেকরা গায়ে জড়িয়ে, বাউলের একতারা বাজিয়ে, গানে খাসা দেহতত্ত্ব, প্রাণে তাজা পেশীসত্ত্ব...

প্রেমা—মহাজীবনের পারাবার। তাতে চলেছে মন্বন। মন্বনে উঠছে নিদাক্ষণ জ্বালাময় হলাহল...কামনার আগুন, হতাশার বীজ...কতকি। কোন্ অতর্কিত শুভ

লগ্নে বুদ্ধিবা কমলাও ওঠেন কক্ষে সূধাকলসটি নিয়ে... কিন্তু ভুবনডরা বিঘের রাগে সে সূধাকলসও বুদ্ধি কোথা উপে যায়...যে অমৃত কলস স্রবের জন্ম, অস্রর তা নিয়ে করে কাডাকাড়ি, ভাগাভাগি...

প্রেমা—হাঁ, স্রবের তো দেখছি পরাজয় হচ্ছে... অস্ররই ভোগ করতে চাইছে সূধার কলস। কিন্তু তাই কি হয়! 'ভোগই চাই'—যে বলে সেই তো অস্রর! ত্যাগ, সংযম, বলি ছাড়া তো অমৃত মেলেনা কোনদিনই! সেই যে—'ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ'—'ত্যাগেনৈকেহমৃতম্-মানসঃ'। ত্যাগই ভোগের প্রাণ সেই সোণার কাঠি...

প্রেমা—ত্যাগের মূর্তি শঙ্কর। এক শঙ্করই বিষ কণ্ঠে ধারণ করতে পারেন। তখন সকল অশিব হয় শিব। যেমন শ্মশানে নুকপাল, চিতাত্ম। শঙ্কর কালব্যালকে করেন তাঁর শোভন বিভূষণ। ফণা তুলে নাচ্ছে তারা দেখলে হয় ভয়। যত পাই ভয়, ভয় বাড়েও তত! ভয় ছাড়, 'জয় শিব শঙ্কর' ব'লে হও তাঁর শরণাগত, দেখবে সাপ তার ফণা গুটিয়ে নেবে, জটিল জটাজালে গুনবে সর্বসম্ভাপহরা স্রধুনীর স্নেহ নিবিড় সোহাগের অশ্রুট কলতান, আর শঙ্করের সৌমোজ্জ্বল ডালে ক্ষরিত হবে সোমার্দ্ধনিঃসন্দিনী মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা!

প্রেমা—সবাই তো শঙ্করের সাপটাকেই রাগিয়ে তোলে—ভয়ে পালায়, পালিয়েও তার বিষ বাষ্পে হয় জ্বল্লর...আর পালিয়ে ঘাব বুলেই কি পালান' যায়! শঙ্করের জটার ভেতরে কে পায় তোমার স্রধুনীর সন্ধান, এই মহাভয় ভেঙ্কির মাঝে কেই বা দেখতে পায় শঙ্করের এই অমৃত অভয় নিব্বার প্রসন্ন উজ্জ্বল ভাল নেত্র ?

## মুক্ত : বাঁধন

অশ্রু জানা

জীবন আমার খুলে রেখে যাব  
 রেখে যাব মোর মন—  
 যেমন দেখেছ অসীম আকাশ,  
 পাহাড়ের বকে বারণার বাস,  
 নদী কুলু কুলু শুধু উচ্ছ্বাস,  
 সেই কোন বন্ধন।

জীবন আমার বেঁধে দিয়ে যাব  
 বেঁধে যাব মোর মন  
 মোরে দেখে নিও বরফের পাশ,  
 অথবা কাজের কোন অবকাশ,  
 যদি দেহে মোর নাহি থাকে শ্বাস,  
 সেই হ'ল বন্ধন।

# আলোচনা

## বাঙালী পরিবারে মেয়েদের খাদ্য

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

আজকাল প্রায় পত্র-পত্রিকায়ই ভূতুড়ে গল্প, প্রেমের কাহিনীর অভাব দেখি না—অভাব শুধু সত্যিকারের জনকল্যাণকর বিষয়ের। আজ এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই—যা প্রতি বাঙালী ঘরেই ঘটছে অথচ চোখ থাকতেও আমরা যেটি দেখতে পাই না, মনে মনে অনুভব করলেও যার প্রতিকারের জন্য আমরা আদৌ কোনও চেষ্টা করি না।

কোট প্যান্ট পরে' সাহেব সেজে ছোট বড় সবাই আমরা সরকারী বা বেসরকারী অফিসে যাচ্ছি। কিন্তু সাহেবদের মত কয়জন স্ত্রীপুত্র নিয়ে একসঙ্গে বসে আহার করছি? গৃহিণী কি খেল তার খবরই বা কয়জন রাখি? নিজেরা অফিসের ক্যানটিন বা রেস্তোঁরাতে মাংসভিষ খাচ্ছি—যাদের সে সুযোগ নাই তারা অফিসের নীচে রাস্তার মোড়ের ডিমসিদ্ধ ডিমভাজা পাকাকলা বা লেবু খেতেও কষ্ট করছি না। আবার বাড়ি ফিরে উপাদেয় খাদ্যের অধিকাংশই গলাধঃকরণ করছি—স্ত্রী বা পুত্র-কন্তার জন্য ক'খানা মাছ বা ক'টা ডিম অবশিষ্ট রইল তার খোঁজ করি কই? যে দিন পড়েছে তাতে শতকরা ৯০ জনেরই রোজ মাছ জোটে না। দুগ্ধপোষ্য না থাকলে কয়টি পরিবারে দুধ লওয়া হয় সে হিসাব একমাত্র শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহলানবিশই করতে পারেন। স্তন্যরাং শুধু ভাতডাল খেয়ে কয়জন গৃহিণী স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন। টালিগঞ্জ থেকে টালা ট্যাক পর্যন্ত সারা নগর চুড়ে পঞ্চাশটি পাত্রী দেখে থাকে পছন্দ করে পত্নীরূপে আনলাম গৃহে দু'একটি সম্ভান প্রসব করেই তিনি পেত্নীর আকার ধারণ করলেন দেখে শক্তিত হয়ে ডাক্তার ডেকে ভিটা-মিনের বাড়ির বা লিভার-ইনজেকশনের ব্যবস্থা করলাম—কিন্তু কেন যে স্বর্ণপ্রতিমা মসীময়ী হলেন তার আসল কারণটা তো চোখে পড়ল না। দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতার মেয়ে-হাসপাতালের খবর যারা জানেন তাঁরা দেখবেন 'ম্যালিনিউট্রিশন'-জনিত ভীষণ রক্তাক্ততা রোগে আক্রান্ত শোথে স্ত্রীতাদের রোগিণীর সংখ্যাই সেখানে শতকরা

পঞ্চাশের উপর। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' বুলি সকলেই জানি। গৃহিণীর ভগ্নস্বাস্থ্য সংসারে কি ভীষণ অশান্তির আকর তা অনেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, কিন্তু প্রতিকারের সহজ সরল উপায়টির দিকে নজর দিচ্ছি কই?

মেয়েদের এই শোচনীয় অবস্থা দেশ-বিভাগের পূর্বে এতটা প্রকট ছিল না—কারণ তখন দুধ মাছ অনেকটা সহজলভ্য ছিল। তার পর অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনের চাকুরীয়ারা স্ত্রী-পুত্র দেশে রেখে এখানে মেসে হাট্টেলে থেকে চাকরী করতেন। বৎসরে দু'এক মাস দেশে গিয়ে প্রিয় পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং দেশের 'ড্যামটা' দুধমাছের কল্যাণে স্বাস্থ্যলাভ করে ফিরতেন। কিন্তু এখন ত সারা পরিবারই চাকুরীস্থলে—অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাথা গোঁজা আর শুধু ডালভাতে উদরপূর্তি। দেশের যারা কর্ণধার তাঁদের অধিকাংশই ভীষণগোস্ত্রীয়, কাজেই তাঁরা জননিরোধের ফতোয়া দিয়েই খালাম—প্রধান খাদ্যসামগ্রী জ্বলন্ত হোক, পুষ্টিকর খাদ্য, অন্ততঃ মাছটা সর্বলোকায়ত্ত হোক সেদিকে তাঁরা কতটা নজর দিচ্ছেন বুঝি না। মহাকবি গোটে বলেছেন, সমাজে আজ আমরা যা করছি এর ফল সদ্য সদ্য ফলবে না। বীজ বপন করে চারা জন্মায়—চারা প্রকৃষ্টভাবে বড় না হলে ফল দেয় না—সামাজিক ব্যাপারও তদ্রূপ। সু বা কুফল ফলে দেয়ীতে। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের মেরুদণ্ড—এদের আত্মদানেই এসেছে স্বাধীনতা। কিন্তু আজ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ধ্বংসের মুখে সেদিকে কয়জন লক্ষ্য রাখছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা গোলদীঘির পাশে বা বানবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। জীবন যৌবন কাটাতে সংকল্প করেছে অফিসে ঘরের বাইরে। স্তন্যরাং স্তন্যজ্ঞানের জননী হবে কারা এ দেশে? জনসংখ্যা বাড়ছে বলে যে জীগির শোনা যায় সেটা তথাকথিত ভদ্রসমাজে নয় অনেক নীচের স্তরে।

যাক, আসল কথায় আসা যাক। মালম্মীদের কানে একটি বাঁচন-মন্ত্র দিতে চাই। বাবাজীবনরা যখন অফিসে

বা বাইরে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে আসছেন তখন তোমরা একটু স্বার্থপর না হলে তাঁদের নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারবে না—রোগ-যন্ত্রণায় জীবন ছুঁবিসহ হয়ে উঠবে। তোমরা সীতা সাবিত্রী হও—আদর্শ হিন্দু রমণী হও—সর্বতোভাবে কামনা করি, কিন্তু নিজের ক্ষমতা এক ষণ্ড মাছ বা আধখানা ডিমও না রেখে সবটাই পতিদেবতার পাতে দিও না, এইটে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। তারপর দেশ বিভাগের ফলে তোমাদের অনেকেরই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই বোনও হয়ত কাঁধে এসে পড়েছে—স্নেহে আত্ম আত্ম হয়ে নিজে কিছুই না খেয়ে সবটাই তাদের পাতে গড়িয়ে দিও না। এর ফল কি ভয়াবহ হয় তা আমার নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করছি বলে এই রুঢ় সত্য তোমাদের কাছে পরিবেশন করতে চাই। তোমাদের উপরে সংসারের সমুদয় সুখশান্তি নির্ভর করছে, সুতরাং তোমরা ভাবালুতা-বশতঃ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিজের দিকে তাকাতে ভুলো না।

তারপর মেয়েদের অন্তঃসত্তা অবস্থায় এবং প্রসবান্তে প্রোটিন, লবণ-পদার্থ এবং ভিটামিনের চাহিদা অনেক বেশী। অভিভাবকদের এ বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য, মায়েরের এ বিষয় মনে রেখে অভাবের সংসারেও যথাসম্ভব বিবেচনার সঙ্গে নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সুবিশেষ লক্ষ্য রাখা, নিজের স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য তথা সাংসারিক সুখশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। দুঃ যখন অনেকেরই নাগালের বাইরে তখন পুঁটি, টেংরা, খলসে, মৌরান প্রভৃতি ছোট মাছ নিয়মিত খাওয়া উচিত। এই মাছগুলি অনেক সময় কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে খাওয়ার ফলে হাড় গঠনের উপাদান ক্যালসিয়াম লবণ অনেকটা পাওয়া যায়। আহারান্তে পান-খেলে চুনের সঙ্গে খানিকটা ক্যালসিয়াম লবণ মিলে। পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে ক্যালসিয়াম-বৃদ্ধি লবণ খেলে মায়ের শরীরের হাড় থেকে জগের হাড় তৈরী হয়ে থাকে; অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে বেশী সম্ভান জমিলে মায়ের শরীর ভেঙে যায়, দাঁতও নষ্ট হতে দেখা যায়। রোগ জন্মালে উহা সারানোর চাইতে, রোগ না জন্মাতে পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন অনেক বেশী সমীচীন, বুদ্ধিমানের কাজ।

ঔষধপত্রের টাকা খরচ করার চাইতে পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান সর্বতোভাবে বেশী সমীচীন। ধনী দরিদ্র সকল গৃহস্থেরই এ কথা মনে রাখা উচিত।

তারপর হীনস্বাস্থ্য প্রসূতীর ক্ষমতা সম্যক করিত না হওয়ায় নবজাত শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ, ছাগ বা গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে শিশুর পুষ্টি ব্যাহত হয়—শিশুহীন ব্যারামপীড়াও বেশী দেখা দেয়। জার্মানীর হাইডেনবার্গের নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক রিশার্ট কুন সম্প্রতি মাতৃদুগ্ধের ভিতর এমন কতকগুলি উপাদান আবিষ্কার করেছেন যেগুলি অপর কোনও প্রাণীর দুগ্ধেই নাই। এই পদার্থগুলি মানবশিশুর পুষ্টির তরফ থেকেই যে অসম্ভব উপকারী শুধু তাই নয় পরন্তু এই পদার্থগুলি (অ্যামিনো অ্যুগার) শিশুর ব্যাধি প্রতিরোধক শক্তি জন্মাতেও অসম্ভব উপকারী। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অধ্যাপক রিশার্ট কুন এগুলির উপকারিতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করেছেন।

সুতরাং প্রসূতী যাতে নবজাত শিশুকে সম্যকভাবে স্তন্য দিয়ে তাকে মাহুষ করে তুলতে পারেন তজ্জগৎ অন্নি-ভাবকগণ প্রসূতীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আর একটি অতিশয় দরকারী অথচ অনেকের কাছে আপাতঃ অপ্রীতিকর কথার অবতারণা করে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই।

আজ একাদশবর্তী পরিবার সচ্ছল সহরবাসীদের মধ্যে লোপ পেতে বসেছে। নিয়মমধ্যবিত্ত পরিবারে এখনও ঐ প্রথা একেবারে উঠে যায়নি। এরূপ পরিবারে অনেক স্থলে বিধবা ভগ্নি বা বিধবা ভ্রাতৃবধূ রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে পরিবারের সম্ভান পালনের সমুদয় ঝামেলা নির্বাকভাবে বহন করে চলেছেন। এঁরা যেকোন কঠোর পরিশ্রম করেন সে অল্পপাতে এঁদের পুষ্টির দিকে না তাঁরা নিজেরা, না পরিবারের অপর কেহ আদৌ কোনও দৃষ্টি দেন। শাস্ত্রকারের নির্দেশ অলঙ্ঘ্য। এঁদের নিরামিষ খেতে হবে। কিন্তু যে যুগে শাস্ত্রকার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যুগে হৃদ বা দুগ্ধজাত খাদ্যের আদৌ কোনও অপ্রতুলতা ছিল না। কাজেই বিধবাদের আহাৰ্য

## ভাগবতের কথা

শ্রীমুরেশ্বরমোহন শাস্ত্রি তর্কতীর্থ

ভাগবতের কৃষ্ণলীলা আগে না কৃষ্ণতত্ত্ব আগে তার—সঠিক বিবরণ দেওয়া সহজ নয়। তত্ত্ব নিত্যকালের। কাহিনী বিশিষ্ট দেশ কালকে অবলম্বন ক'রে রচিত হ'য়ে থাকে। আবার এ কাহিনীকে আশ্রয় করে আমাদের মনে 'তত্ত্ব' রসরূপে স্ফুরিত হয়। ফলে তত্ত্ব আর রূপ, প্রাণ ও দেহের মত, রূপ ও স্বরূপের মত অভিন্ন, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের প্রচার ও স্থিতি অপরকে নিয়ে। এককে ত্যাগ ক'রে অপরকে ভাবা যায় না, যুগে যুগে লীলার পরিবর্তন, হ'লেও দেশ-কালাতীত এ লীলা তত্ত্বরূপে সাধক চিত্তে নিত্য বিরাজমান।

“অম্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।”

শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার অন্ত নেই, পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিশেষ।

“পরমাত্মা বিহো তিহো কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ।”

ভাগবতের রস-মধুর লীলা-কাহিনীর মূলে আছেন,—

“ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।

নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী।”

ভাগবতের লীলার মূল নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, মূল নায়িকা মহাভাবময়ী শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী, স্থান বৃন্দাবন এবং অস্ত্রাঙ্গ লীলাপরিকর যেমন সাধকের চিত্তে নিত্য পরিদৃশ্তমান, আবার তেমনি সাধারণের কাছে অদৃশ্যমানও।

বিশেষ দেশকালে যেমন এ লীলার প্রচার, আবার তেমনি ভাবরস স্বরূপে এ লীলা নিত্যকালেরও সম্পদ বিশেষ।

“অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।

ভাগ্যবান যেইজন দেখিবারে পায়।”

বহু প্রাচীনকাল থেকে যেমন উপনিষদের জ্ঞান-সাধনার ধারা চলে আসছে, তেমনি করে চলে আসছে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রে—অর্হেতুকী ভক্তিসাধনার ইতিকথা। ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন জ্ঞানসাধনার ইঙ্গিত দেয়, তেমনি অর্হেতুক ভক্তিসাধনের; এক-কথায় বলতে গেলে প্রেমধর্মের সঙ্কেত দিয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

অস্ত্রাঙ্গ অবতারের মত শ্রীকৃষ্ণ শুধু অবতারমাত্র নন, অবতারাও তিনি। বিশিষ্ট বৃষ্ণি বংশে বিশেষকালে বাহুবদেবরূপে অবতীর্ণ হলেও তাঁর ষাথার্থ স্বরূপ অবতারের বহু উর্দ্ধে। দেশকালাতীত অপরিণীম মহিমা তাঁর। পূর্ব পূর্ব সকল অবতারের স্থান তাঁ'তে ;—

‘অবতারি দেহে সব অবতারের স্থিতি’।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনায় মহাযোগী শুকদেব বলছেন—

তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়

যায় যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব-অবতংশ।

খাদ্যবিজ্ঞানসম্মত উৎকৃষ্ট স্তরেই ছিল। আজকাল অনেক বিধবাকেই সারা দিন জ্বলে ছেলেমেয়ে ঠেঙাতে হয় বা পূর্বে উল্লিখিত পারিবারিক ব্যাপারের ঐকান্তি কামেলা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পোহাতে হয়। এই সব কাজে এঁদের শরীরের ক্ষয় যে অল্পপাতে হয় খাদ্যের ভিতর দিয়ে তা পুষিয়ে নিতে পারেন না। কয়জন গৃহস্থ বিধবা ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূর জন্ত পৃথক দুধ, দই বা সন্দেশের ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা রাখেন? তাই অচিরকাল মধ্যেই শাস্ত্র নির্দেশে শুধু ডাল ভাত খেয়ে এঁদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং তদ্রূপ সংসারে ভীষণ অশান্তি দেখা দেয়। দুধ সন্দেশ যখন তাঁদের দিতে পারছি না

তখন তাঁদের সুস্থ রেখে পরিবারের শাস্তি অব্যাহত রাখতে হলে তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য শাস্ত্রকারের নির্দেশ একটু শিথিল করে পরিবারের সাধারণ আশ্রয় ঋণ থেকে তাঁদের বঞ্চিত না করাই কি সর্বতোভাবে কাম্য নয়? আশা করি, সমাজের প্রকৃত উন্নতিকামী সুবিবেচক ব্যক্তি মাজেই এ কথার ষাথার্থ্য উপলব্ধি করে চলতে দ্বিধা বোধ করবেন না। অভাগা বিধবা মেয়েরাও স্থান-কাল বিবেচনা করে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নিজেদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, ও নিজস্ব সেবার দ্বারা যে পরিবারে বাস করেন সেই পরিবারের সুখশান্তি বিধানে সর্বতোভাবে যত্নবতী হবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ-শরীরেই সমগ্র বিশ্বের বিশ্রাম, সর্বাশ্রয় তিনি—

“কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ এক ধাম  
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥  
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়  
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥”

সবার অন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূমি। স্থাবর জন্ম অর্থাৎ নিখিল প্রকৃতিকে নিয়ত আকর্ষণ করাই তাঁর স্বভাব; তাঁর ধর্ম। কৃষ্ণনামের তাৎপর্যও এখানে। তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে চলেছে সমগ্র জীবজগৎ। অনন্ত মৌন্দর্ঘ্যের আকর তিনি। তাই সাধক কবি হুঁচোখ দিয়ে রূপ-সুধা পান করে রূপের তিথ্যাস মিটাতে পারেন না। অফুরন্ত রসভাণ্ডারে রসনা ডুবে থেকেও মিটাতে পারে না তার অনন্ত রস পিপাসা। প্রাণ মাতানো শব্দ শুনেও তৃপ্ত হয় না তাঁর আকুল শ্রবণ-সাধ। যুগে যুগে চলে আসছে রূপ-রস-সুখা মেটানোর কত প্রয়াস।

“জন্ম অবধি হাম রূপ নেহারিছ  
নয়ন না তিরপিত ভেল  
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু  
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।  
কত মধু ঘামিনী রভসে গোয়াইছ  
না বুঝিছ কৈছন কেল  
লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখছ  
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥”

অনন্ত রূপরসের আকাঙ্ক্ষা যেখানে, খণ্ড ক্ষুদ্র রূপরসে সে পিয়াস মিটারবার নয়। সে পিপাসা মিটাতে একমাত্র সচ্চিদানন্দময় তাঁকেই আস্তে হস্ত পরিপূর্ণ মানবরূপে। আদিম যুগে কল্লিত দেবদেবীর অপ্রাকৃত রূপরেখা উত্তর কালের মানুষের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। মানব হৃদয়ের সহজ সঙ্কম মধুর রসে। ভয়ে বিশ্বম্বে ক্ষণিকের অল্প মানব মন চমকিত হলেও, চিরন্তন রস-ভূষণের পরিপূরণে মাধুর্য রস-শিরোমণি রসিকশেখর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তাই দেখতে পাই সাধক কবি বিলম্বজল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনায় অল্প কোন বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে একমাত্র মধু বিশেষণেই তাঁকে ভূষিত করেছেন—

“মধুরং মধুরং বপুঃস্ত বিভো  
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।  
মধুগন্ধি মৃদুশিতমেতদহো  
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥”

মধুর রসের পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, মানবীয় বৃত্তির সম্যক বিকাশও তাঁতে। সমগ্র রূপ ও রসের সার মধু হতে

মধুরতর নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণই জীব-পরিণামের একমাত্র আশ্রয়, নররূপী পবন দেবতা দ্বিজ মুরলীধর মানব-বিগ্রহ সকল অবতারের পরম।

“কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা  
নরবপু তাহার স্বরূপ  
গোপবেশ বেণুধর নব কিশোর নটবর  
নরলীলা হয় অরূপ।  
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন  
যে রূপের এক কণ ডুবায় সর্ব জিহ্বাবন  
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥”

যুগ যুগ ধরে পান করলেও এ অপূর্ণ রূপ-সুধার ক্ষুধা মেটেনা। অনন্ত অকৃপ্তিই থেকে যায় সমগ্র জীবনে—

“কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই  
তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মূই ॥”

ভাগবতের এই অভিনব প্রেমধর্মই হচ্ছে নিখিল মানবধর্ম। এ প্রেমে মুহূর্ত-বিরতিও অসম্ভব। আনন্দ মধুর কোটিচন্দ্র অশীতল রূপরসধন প্রেম-বিগ্রহই মানবের সকল কামনার সকল বাসনার ধন।

“অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম আলোকস্বরূপ”—মায়ায় অন্ধকার—  
তা’তে মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়—

“কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয অন্ধকার  
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ায় অধিকার ॥”

একমাত্র প্রেমমূল্য তিনি—

“কৃষ্ণ তোমার হই’ যদি বলে একবার  
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।

সহজাত এ প্রেম কামনাহীন চিন্তেই বিকসিত হয়—

“নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কছু নয়  
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥”

সমগ্র জগৎ জুড়ে চলেছে হিংসার তাণ্ডবলীলা। মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধিই হচ্ছে এর মূল। হিংসা বিলোপ না হলে মানুষের হৃৎকোণে কোনোদিনই ঘুচবে না। একমাত্র প্রেম-ধর্মই মানব মন থেকে ভেদবুদ্ধি বিনাশ করিতে পারে। প্রেমেই মানুষ সবার ভেতর আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, প্রতি মানবে আত্মীয় বোধ জাগে। তখন মানুষের হৃদয় আর মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে না,—হৃদয় দিয়েই মানুষ মানুষকে গ্রহণ করবে, তখন মানব-সত্যই হবে পরম সত্য—

“সবার উপরে মানুষ-সত্য  
তাহার উপরে নাই ॥” \*

\* কলিকাতা আকাশবাণী দৌলছে।

# রায়

চন্দ্রকুমার

হুই পক্ষ যখন কোনরকম আপোস মীমাংসায় রাজি হল না তখন বাধ্য হয়ে ওদেরকে আমার খাসকামরায় ডেকে পাঠালাম। নিরিবিলিতে, আইনজ্ঞদের দ্বন্দ্বের আওতার বাইরে, অভিভাবকদের শাসানির বাইরে হু'জনের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখতে চাই কোন মীমাংসার সূত্র পাওয়া যায় কিনা! আরদালী দরজা বন্ধ করে চলে গেল। ওদের হু'জনের দুটি চেয়ারে বসতে বললাম।

মিষ্টি একটি টয়লেটের গন্ধে সারা কক্ষটা ভরে উঠল। গায় নীল রঙের একটি শাড়ীর আবরণের মধ্যেও যেন একটি বহির্নিখা। উগ্র ফর্সা রঙ মেয়েটির! সাব দেহে ওর স্বাস্থ্যের ঐক্যতা। বেশ-বিছাসে চরম আধুনিক।

ছেলেটি ওর তুলনায় কৃশ, শ্রামবর্ণ। ঈষৎ নম্র। ওর লাজুক চোখে কেমন যেন একটা মিনতিমাখা দৃষ্টি। বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ।

ওরা হু'জনে দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে রয়েছে, হুজনের পরস্পরের বিপরীত দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন কেউ কাউকে চেনে না, জানে না। একটা টেনের কামরায় যেন দুটি পরস্পর অপরিচিত তরুণ তরুণী বসে আছে। ওদেরকে ভাল করে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলাম : তোমাদের কেন ডেকে পাঠিয়েছি জান?

ওরা কোন জবাব দিলো না।

তোমাদের চিড়-খাওয়া সম্পর্কটির অবসান ঘটাতে চাই। হুজনের মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে আমি একটি স্থায়ী সেতু বেঁধে দিতে চাই। এখানে আমি বিচারক নই, একজন প্ররোহিত। তোমরা পরস্পরের দিকে একটি প্রীতির দৃষ্টি নিয়ে তাকাও। আমার এই খাস কামরায় তোমাদের শুভ-দৃষ্টি হোক। এই কক্ষ তোমাদের মিলন-বাসর হোক! আমাকে শুধু তার সাক্ষী থাকতে দাও।

না অতটা সরে থেক না। আরও নিবিড় হয়ে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বস! তোমার নাম?—মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সুতপা! মেয়েটি জবাব দিলো।

বাঃ বেশ মিষ্টি তোমার নাম। কেন তোমরা তোমাদের সহজ মধুর সম্পর্ককে আইনের যুপকাঠে বলি দিতে এসেছ? মনের খেলাকে আদালতের প্রাঙ্গনে কেন এনেছ মা? গৃহের সেই ক্রীড়া-জ্বলন্ত বীকে বারবণিতা করো না।

ওর গৃহ আমার অদৃশ্য স্তার। যে গৃহের নায়ক একজন মাতাল চরিত্রহীন, এবং যে গৃহের প্রতিটি লোকই আমার বিরুদ্ধে, দৈহিক নিপীড়ন যে বাড়ীর কালচার। ঐ জাঁহাবেজে শাস্ত্রীকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না।

মেয়েটি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওঁ ইঁপাতে লাগল। ছেলেটিব লাজুক বোবা চোখে ফুটে উঠল ঘৃণার আশ্রয়। সে প্রতিবাদ করে উঠল।

ওর কথা একবর্ণ সত্য নয়। জীবনে আমি কোনদিন সিগারেট পর্যন্ত খাই না। মদ তো স্তার দূরের কথা। নিজের ভ্রষ্টা হয়ে সকলের চরিত্রে ও গলদ দেখছে। আমার মা বালবিধবা, জ্বলের মাষ্টারী করে আমাদের মাহুষ করেছেন। মাহুষ যে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে ওকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

ছেলেটিকে আমি ধমক দিয়ে বললাম : তুমি খাম, তোমাকে তো এখন কিছু জিজ্ঞেস করি নাই।

না স্তার! ছেলেটি অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

মেয়েটি সোৎসাহে বলে উঠলো : দেখলেন তো স্তার, ওর স্বভাবই ওরকম, ও সব সময়ই নিজের দিকে ঝোঁল টেনে কথা বলে, অপরের কথা শুনতে চায় না। আমার নিজের হু'একটা ব্যক্তিগত 'ছবি' আছে। গায়িকা হিসাবে ষৎসামান্য খ্যাতি আছে, কিন্তু ওঁদের বাড়ীতে এইগুলিই অপরাধ। ওঁরা জী কিংবা বধূদের গৃহস্থের কাজ চালানোর পরিচারিকা ও বাচ্ছা-বিশ্বাসের যন্ত্র হিসাবে দেখতে চান। বিংশ শতাব্দীতে আপনিই বলুন স্তার ঐ সব মধ্যযুগের বুদ্ধবাকী চলে কিনা?

সে তো নিশ্চয়ই, তবে, বাড়ীর বধূ হিসাবে তোমার



স্বামী শান্তীদীর উপর একটা মহান কর্তব্য আছে। তুমি তোমার মহত্বের মহিমায় গৃহটি শান্তিতে পরিপূর্ণ করে রাখবে—আমি স্তূতপাকে বজ্রাম। স্তূতপা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জবাবে বলতে লাগলো—

স্তার প্রতি মেয়েই স্বামী চায়, চায় একটি শান্তির নীড়, কিন্তু পিশাচ দ্বারা তারা শান্তির মর্যাদা কি করে বুঝবে বলুন!

আমরা পিশাচ? তোমরা রাক্ষসী, ছেলেটি গর্জে প্রতিবাদ করল।

দেখছেন স্তার! আপনার সামনেই আমাকে ক্রিয়াকর্ম গালমন্দ করছে, ওর নিজের মর্যাদা বোধই নেই, তাই অপরের মর্যাদা রাখতে ও জানবে কি করে বলুন?

স্তূতপা তুমি এবার ধাম, এবার ওর পালা। তুমি সংঘম রক্ষা করবে বলে আমি আশা করি।

স্তূতপাকে অনুরোধ করলাম।

আমার নাম শোভন গাঙ্গুলী। দু'বছর পূর্বে ওকে বিয়ে করি! ফুলশয্যার রাজ্যে স্তূতপা আমাকে বলেছিল এ বিয়ে মিথ্যে। অপর একজনকে ও তার মন-প্রাণ সব কিছু সমর্পণ করেছে।

কথাটা শুনে শোভন গাঙ্গুলী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, সারা দেহে তার যেন একটা চাবুকের কশাঘাত। পরে অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিল শোভন—তা ওকেই বিয়ে করলে পারতে। প্রেমের সঙ্গে লুকোচুরি না করে ওকেই বিয়ে করলে শান্তি পেতে। জবাবে স্তূতপা বলেছিল : সে আমাদের স্বজাত নয়। বাবা মার সম্মতি আমি পাইনি। বাপ মার সম্মতিকে সত্যিই যদি তুমি শ্রদ্ধা কর তবে যে-বিয়ে তাঁদের সম্মতিতে এবং অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয়েছে তাকে মধুর করার দায়িত্ব তোমার।

জবাবে স্তূতপা বলেছিল : মনকে বোঝাচ্ছি, কিন্তু পারছি কই? একজন অজ্ঞানকে প্রেমাম্পদ বলে সত্যিই গ্রহণ করতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তোমার সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয় স্তূতপা, তুমি নিজেকে সংশোধন করে আমার সঙ্গে একাত্ম্য হয়ে মিশে যেতে পার না স্তূতপা? আমি দীন হয়ে তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষে চাইছি, অতীতকে তুমি ভুলে যাও।

শোভন বলে চলেছে ওদের কথা। ওর কণ্ঠে আবেগ, স্বরে আন্তরিকতা। দেখছেন স্তার কি রকম ঘৃণু! কি অভিনয়ই করতে পাবে ও!

স্তূতপা টিপ্পনী কেটে বলে ফেলে। ওর কথা-স্বরে বেশ উত্তেজনা।

ইদ্রিতে স্তূতপাকে থামতে আদেশ করলাম।

শোভন আবার বলতে আরম্ভ করল : কিন্তু স্তার আমার প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছিল। ও নিজেকে সংশোধন করতে পারেনি। তারপর বহুদিন ওকে এক অশ্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে ওর সেই প্রেমাম্পদের সঙ্গে দেখেছি। আপনিই বলুন স্তার কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে অপরের সঙ্গে ব্যভিচারাসক্ত দেখলে স্থির থাকতে পারে? তবুও আমি ওকে সংশোধনের প্রচুর সুযোগ দিয়েছি।

ইউ সাট আপ! গর্জে উঠল স্তূতপা—তোমার মুখে নিশ্চয়ই পোকা পড়বে। ওব কোন কথা বিশ্বাস করবেন না স্তার—ও একটা মিথ্যের জাহাঙ্গ।

ধাম স্তূতপা! তোমরা দু'জনে খানিকটা নিভৃত্তে আলাপ কর। বলে সহসা আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

আমি বাইরে আসার পর ঘরের মধ্যে যেন একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল।

স্তূতপা চোঁচাচ্ছে : ননসেন্স, ক্রট, পিশাচ, মাতাল, লম্পট, লজ্জা করে না কোর্টে এসে সাধু সাক্ষতে।

শোভন চোঁচায় : ভ্রষ্টা, রাক্ষসী হারামজাদি।

তারপরই একটা হটোপুটির শব্দ! স্তূতপা পায়ের চটি খুলে মারতে আরম্ভ করেছে শোভন গাঙ্গুলীকে।

শোভন ধরেছে স্তূতপার চুলের মুঠি!

রণক্ষেত্রের অবস্থা। ওদের এই জাতীয় অশোভন কাণ্ড দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে গেছি। ঘরে ঢুকে সজোরে ওদের দুজনকে ধমকে বলে উঠলাম : তোমরা এমনিতে শাস্ত না হলে আমাকে পুলিশ ডাকতে হবে। একুনি আদালত অবমাননার দায়ে পড়বে।

আমাকে ঢুকতে দেখে ওরা শাস্ত হয়ে গেল।

শোভন হাউ-হাউ করে কঁাদতে কঁাদতে বলল : ছজুর

আমাকে ঐ রাক্ষসীর হাত থেকে মুক্তি দিন। ও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

আমি পুনরায় ধমকে বললাম : ও সব কোন কথা নয়—আদালত অবমাননার দায়ে তোমাদের পড়তে হবে। ভাল চাও তো নিজেরা মিটমাট করে নাও।

ওরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওদের আর্জি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সাক্ষীসাব্দে এমন কিছু প্রমাণিত হল না যেটা ওদের বিবাহ বিচ্ছেদের অল্পকূলে যায়।

বিবাহবিচ্ছেদ ওদের অল্পমোদন করতে পারলো না। রায়, শোভন গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে গেল। অর্থাৎ ও মুক্তি চেয়েছিল স্ত্রীপার হাত থেকে, আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু সেই মুক্তি সহজ হ'ল না।

\* \* \* \*

আমার পুত্রের জন্ম একজন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

সেদিন সকালে একজন দেখা করতে এলো।

— আমি আপনার বিজ্ঞাপিত প্রাইভেট টিউটরের কর্মপ্রার্থী।

লোকটিকে ভাল করে দেখলাম। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল।

আপনার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে? ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমি একজন স্কুল শিক্ষক, শিক্ষকতাই আমার পেশা।

বেশ। আপনিই পড়ান।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমি পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছি বলুনতো?

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দিলেন : আপনার কোর্টে আমার একটা মামলা ছিল। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা।

কতদিন আগে বলুনতো?

তা প্রায় বছর দুয়েক হবে।

কি নাম আপনার?

শোভন গাঙ্গুলী স্ত্রী।

ঠিক মনে করতে পারলাম না। তবুও বললাম, ও মনে পড়েছে। আপনাদের মিটমাট হয়ে গেছে?

হ্যাঁ স্ত্রী। মেয়েটির স্বভাবই দুরন্ত। কিছুদিন সকলকেই জালিয়েছে। স্ত্রীপার এখন 'ক্যানসার' হয়েছে স্ত্রী। তার হাসপাতালের সমস্ত খরচা আমাকে চালাতে হচ্ছে! ওর বাবা মারা যাওয়ার পর স্ত্রীপা যখন পুনরায় আমাদের বাড়ীতে ফিরে এলো তখনই ভেতরে ওর ক্যানসারের আক্রমণ শুরু হয়েছে। কয়েকটা মাস পরেই ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল। সেদিন আপনার সামনে সেই অশোভন কাণ্ডটির জন্ম আমার লক্ষিত।

স্ত্রীপার ক্যানসার হয়েছে, অত জ্বলন্ত আত্মা ছিল ওর! এবারে সত্যিই মেয়েটিকে আমার মনে পড়ল।

হ্যাঁ স্ত্রী। স্ত্রী অবস্থায় ওকে কোনদিনই জয় করতে পারিনি। রোগাক্রান্ত হয়েও যে সে আমার কাছে ফিরেছে...এতেই আমার শাস্তি! শোভনের চোখ দিয়ে হু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল...

আমার যেন মনে হল বিচারক হিসাবে আমার রায়ে হয়ত কোন ভ্রান্তি ছিল না। ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে দিলে হয়ত অনেক কিছু ঘটানো সম্ভাবনা ছিল। বিচ্ছেদই জীবনের সম্ভবতঃ শেষ কথা নয়!

## ইতিহাস

শ্রীঅস্তিমকুমার দত্ত

ভাইয়ের রক্তে বিবিক্ত ইতিহাস,  
অবলুপ্ত কত দ্রোণদীর লাজ—  
অট্টহাসির তুরন্ত লালসায়  
দুঃশাসনেরো মাথা হেঁট হ'লো আজ।

রৌদ্রমুখর রাঙা মঞ্চের 'পরে  
মুখোমে নকল দরদীর ছাপ আঁকা—  
ললিতবাণীর কণচক্ৰমকি জলে  
আড়ালে পশুর কালো কুটিলতা ঢাকা।

মহাসাগরের স্রমহান গভীরতা,  
সূর্য-শপথ আজো বুঝি জেগে রয়—  
হৃদয়নীর আশ্রায় প্রত্যয়ে  
ইতিহাস রচে জীবনের পরিচয়।

## কে তুমি ?

শ্রীহীরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়

নিবিড় নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশে চাঁদ ও তারার সমারোহ। এই পৃথিবী সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। পথে চলেছি একা। পথও ফাঁকা। দেখতে পাচ্ছি দূরে, বহু দূরে, মাটি আর আকাশের মিতালি, আর চিন্তা করছি ঐ ছয়ের ব্যবধান বহু যোজন সঙ্কেত একে অপরকে আলিঙ্গন করবার জন্ত কত ব্যাকুল। এমনি সময় চিন্তার জাল ছিঁড়ে কে যেন বলে উঠলো—“পথিক কে তুমি, কোথা যাও ?” বিহ্বল হয়ে চারিদিকে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই। আবার ঐ প্রশ্ন। প্রশ্নের জবাব আপনা আপনিই বেরিয়ে এল—“কে আমি, আমি তো জানিনা, আর কোথায় যে যাচ্ছি তারও কোন নিশানা জানা নেই।” প্রশ্ন হইল—“উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে তো পথ চলছ না, থাকে খুঁজছ তোমার জড় বুদ্ধির অগোচরে তিনি তোমার মাঝে ‘তুমি’ সেজে কতই না খেলা খেলছেন, সে খবর রাখ কি ?” আমি উত্তর দিলাম—“তিনি আমার না জানালে কেমন করে তাঁকে জানব ?” প্রত্যুত্তর যেন বাতাসে ভেসে এল—“তিনি তো কারও অজানা নন। তিনি যে আপনাকে জানাবার জন্তে সর্বদা ব্যাকুল। ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডলী, আকাশ বাতাস, জল-স্থল, বৃক্ষলতা, পশুপাখী, সৃষ্টির যাবতীব প্রাণী তাঁকে চেনে। দেখতে পাও না উষার আলো পৃথিবীর বুকে আনার সংগে পাখীর। তাঁর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করে। বজ্রের মেঘমস্তকনি হতে পাখীর কলতান সবই তাঁর উদ্দেশ্যে। পথে হোঁচট লাগার ভয়ে আপনাকে যে সামলে চলছ, দেহটাকে বাঁচাবার বোধ কে দিয়েছেন জান কি ?” নিঃশব্দ প্রশ্ন জাগল—“তবে কি দেহটাই আমি ?”

বিবেকের নীরব কণ্ঠ শ্রুত হ’ল—“এই নামরূপধারী দেহটাই যদি আমি পদবাচ্য হয় তবে মৃত্যুর পর দেহটাকে যখন পুড়িয়ে ছাই করা হয় তখন কোথায় থাকে ‘দেহরূপ আমি’ ? যতক্ষণ দেহটা ছিল ততক্ষণ দেহের সংগে আত্মীয়তা ছিল। তা হলে বোঝা গেল যে এই নখর দেহ-নামরূপেব সংগে সত্যিকার ‘আমির’ কোনই সম্বন্ধ নেই।” পুনশ্চ প্রশ্ন করলাম—“তবে কি ইন্দ্রিয়াদি

রিপুগণ ‘আমি’ ? অন্তরেই তিনি সাড়া দিলেন—“মন একখানা আয়না। সেই আয়নায ইন্দ্রিয়াদি রিপুগণ যেমন-ভাবে ছবি দেখায় সেইভাবে প্রতিচ্ছবিরও প্রতিফলন হয়। মনের বরা ছেড়ে দিলে সে উদ্ভাসভাবে ছোটো, আবার তার লাগাম কবে রাখলে এমন জিনিষ জানা যায় তার কোন তুলনা হয় না।”—“তবে কি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার এরা আমি ?”

—“তাই বা কেমন করে হয়গো ? পার্থিব বস্তু বিনাশশীল। আবার এরা যে পার্থিব দেহটাকে আশ্রয় করে থাকে। দেহনাশে পার্থিব বস্তুরও নাশ। তখনতো তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।”

সংশয়ে চিত্ত আচ্ছন্ন হ’ল—“তবে কি আমি নেই ?”

অন্তরবাণী ধ্বনিত হ’ল—“থাকবে না কেন ? এই যে রূপ-রসাদি, আকাশ, বায়ু, মাটি, ইন্দ্রিয়, রিপু, মন, বুদ্ধি অহংকার সব মিলিয়েই তো আমি—সর্বভূতাত্মা। ব্যষ্টি নিয়ে তো আমি নয়—সমষ্টি নিয়েই আমি। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর একটিকে বাদ দিলে অস্ত্রগুলি বেমানান, খাপ-ছাড়া হয়ে যায়।\* এরা পরস্পরের সংগে যুক্ত, একের অভাবে অস্ত্র অচল। দেখছ না কি তোমার মাঝে বিরাজ করছেন বিশ্বপ্রাণের হংসমালিকা। সমষ্টিভূত মহাপ্রাণ প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে হংসধ্বনী তুলে পরম ‘আমি’র কাজ করে যাচ্ছেন। এই দেহ ‘আমি’র লয় হলেও হংস ‘আমি’র লয় নেই। চৈতন্যময় মহাকাশে ষাঁর স্থান তিনি তো পার্থিব বস্তু নন যে তার ক্ষয় হবে! সমষ্টিভূত ‘আমি’কেই খুঁজছ তোমার মনের অতি সূক্ষ্ম কোণে। খোঁজোও সকলে—তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা যার যত দৃঢ় সেই তাঁর করুণায় দ্বৈতার্থৈতদ্ভাবলেশহীন জগন্মঙ্গল বিধাতাকে জানতে পেরে আনন্দময় হয়ে যায়।”

—“তাঁকে কি জানা যায় ?—আমার ব্যাকুল প্রশ্ন।

অন্তশ্চেতনারই ইসারা পেলাম—“যিনি সর্বপ্রাণ তিনি তো অজানা নন। তাঁকে দিয়েই তাঁর স্বরূপকে জানা যায়। তাঁকে দেখতে চাও ? একবার জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ ত’ সর্বত্রই তিনি যে সত্যস্বরূপ হয়ে

বিরাজ করছেন। নিত্যের নিত্যই যিনি তাঁর সংগে  
সখ্যভাবে, মাতৃভাবে ঐক্য স্থাপনা করতে হয়? নিকপট,  
একনিষ্ঠ, অবিচলিত চিন্তে বারে বারে তাঁর নাম স্মরণ মনন  
ও অহুচিন্তনে সেই দুর্লভজ্ঞেয় স্রবিস্মৃত হয়ে আপনার  
সংস্করণ করেন উদ্বাটিত। তিনি যে কর্মীর কর্ম, ধ্যানীর  
ধ্যান, জ্ঞানীর জ্ঞান আর ভাবীর ভাব—স্বাভাবিক সত্যের  
মূলে তিনিই পরম সত্য। এক ও অখণ্ড হয়েও আনন্দ-  
ভাবে প্রকট করেন লীলা। “তিনি যে আপনাকে  
ফুলের মত বিকাশ করবার জগৎ কতই না ব্যাকুল! মাটিতে  
বীজ বসিয়ে দেখেছেতো কেমনভাবে সে খোসা ও মাটির  
আবরণ ভেদ করে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। তোমার  
ঐ ছ’টো চোখে যতটুকু দেখতে পাচ্ছ সে সবই তিনি,  
তোমায় দেখাচ্ছেন, খেলাচ্ছেন। আবার ঐ ছ’টো চোখ  
বুজ্জেও যখন দেখতে শিখবে তখন দেখবে তিনি কত  
বিরীচ, কি মহান! তিনি যে অকপের মাঝে রূপের,  
নিগুণের মাঝে গুণের লীলায় মেতে আছেন। তোমরা  
বল যে তিনি মায়া দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। একবার  
ভেবে দেখ দেখি এ কতবড় মিথ্যা কথা—কর্তব্যচ্যুতির  
অমোঘ কৈফিয়ৎ নয় কি? পাছে তাঁর পানে ফিরে  
তাকাই তাই নানা অকাজের মঝে পাই বাড়াই বিবেকরূপী  
তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে  
ন আগুনে হাত দাও—যখন জ্বলন আরম্ভ হয়

তখন দোষ দাও তাঁকে। তিনি তো সবই দিয়েছেন আর  
শাস্ত্রমুখে বলেছেন—নং হও, বিবেকের কথা শোন,  
আনন্দ পাবে।

উদ্ভাস্ত মানসে আকৃতি জাগলো—“আপনি দয়াময়,  
বলে দিন কোন্ পথে গেলে তাঁকে পাব, কোন কর্মসম্পাদন  
করলে তাঁকে জানতে পারব?”

আকাশবাণী শ্রুত হ’ল—“সত্যকে আশ্রয় কর দৃঢ়ভাবে,  
আর শক্তিমান হও। জানতো ‘শব’ মানে মড়া—এই  
‘শবের’ সংগে ‘ই’ রূপী শক্তি যোগ করলে শিব হয়ে যায়।  
শক্তির বরপুত্র না হলে তাঁকে জানা যায় না—‘নায়মাত্মা  
বলহীনেন লভ্য’—সংগোপনে মহাশক্তির বোধন কর  
আপনার হৃদয়মন্দিরে, দৃঢ়ভাবে বারে বারে তাঁকে স্মরণ  
কর, মনন কর। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে বিমুক্ত ভাব-বোধের  
প্রার্থনা জানালেই তিনি গুহাহেতুকর গুহ-বুদ্ধির সন্ধান  
দেন—তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলে দেখবে অপার আনন্দ,  
অনন্ত শান্তি। জড়তা, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে তিনিই  
পথের সন্ধান দেবেন।”

আন্তর্য্যকর্মে আকৃতি জানালাম—“যাবার আগে অন্ততঃ  
দয়া করে আমার বলে যান—আপনি কে?”

আকাশ আর মাটি যেখানে মিলেছে সেখান থেকে  
প্রতিধ্বনি অভয় দিলে—“আমি তোমারি—‘মামেকং  
শরণং ব্রজ’—।”

## আমাকে ডুবাও

শ্রীউমাপদ নাথ

হু-বাহ বাড়িয়ে দিয়ে এই আমি বলছি তোমাকে :  
এখানে মনের তীরে তোমার তরীর দেখা পেয়ে  
বিমনা বিভোর আমি। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম ছেয়ে  
তোমার দেহের ছায়া; নিষে যাও এবার আমাকে !

আমার মাথার কোষে সনক্ষত মহাকাশ ধ’রে  
বিন্দুসম ভেবেছিহু নীহারিকা, সপ্তর্ষিমণ্ডল ;  
প্রবন্ধও লিখেছিহু : পরব্রহ্ম জটিল কুণ্ডল ;  
অথচ কালকে আমি কেঁদেছি সমস্ত রাত ভ’রে।

সমুদ্র, সমুদ্র ওগো! নীল-নীল নীলাঞ্জন দিয়ে  
তোমার স্বপন দাও। তোমার প্রণয়-ঢেউ এসে  
এ-প্রাণে আছাড় খাক, বাধা-বোধ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষে  
তটরেখা মুছে যাক। আমাকে ডুবাও মাঝে নিয়ে ॥

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিজত্বলাভ

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকে, বাঙ্গলাদেশে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল দিকপাল শ্রীমণীবিদ্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ব্যক্তিগতভাবে আপনাপন ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রত্যেকেই জাতির প্রণয় এবং তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়াও একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগর এই তিন যুগন্ধর মহাপুরুষের সহিত, একদিক দিয়া তাৎকালীন আর কাহারও তুলনাই হয় না। উৎকৃষ্ট চিন্তা, অসাধারণ মেধা বা প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বই তাঁহাদের মহত্বের কারণ নহে; তাঁহাদের সেই প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ছিল। জাতিগত চেতনার উৎকর্ষ-জাত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সত্যকার কাতরতা ছিল তাহাতেই জাতির প্রাণে সাড়া জাগিয়াছিল। জাতির হৃদয়গত আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত আপন প্রতিভাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া তাঁহাদেরই একজন হইয়া, জাতির সর্বাঙ্গিক অভ্যুদয়ের নিমিত্ত, আপন মন-প্রাণের সকল শক্তি এমন নিঃশেষে নিয়োগ অপর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। ব্যক্তিগত চিন্তোৎকর্ষ বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা নহে—পরার্থে আত্মোৎসর্গ; ব্যক্তি নয় জাতি, ‘আমি’ নয় ‘তুমি’-ই ছিল তাঁহাদের সাধনার মূলমন্ত্র।

উপরোক্ত যুগন্ধর মহাপুরুষত্রয়ের অন্ততম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্ত্তিকালে স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় যুগ-সঙ্কীর্ণ। নবাগত যুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে মোহগ্রস্ত, আত্মবিশ্বাসহীন আমাদের জাতীয়-জীবন, তখন অবনতি অশ্বের মত উন্নত, উদ্দাম—দিগ্‌ভ্রান্ত। প্রথম ঘোবনে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ত নরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই সঙ্কট প্রকটরূপেই দেখা দিয়াছিল; কিন্তু তাহা অচিরেই নরেন্দ্রনাথের প্রাক্তন-কর্মবশেই হউক অথবা জাতির যুগান্তরসংকীর্ণ পুণ্যকালেই হউক, দক্ষিণেশ্বরে রাণী বাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের, স্বল্পাক্ষর, ভাবোন্মাদ পূজারী ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এই দ্বিধান্দোলিত-চিন্তা-অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের যে নবজন্মলাভ ঘটিল, সেই নব-জীবন গতি-বেগের ইতিহাসই—স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়তিহাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন নরেন্দ্রকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহার ললাটের শৈব-দীপ্তি দেখিয়া আপন স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের যথার্থ আধাররূপে তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই দৃষ্ট, দীপ্ত তেজকে আপন করপুটে ধারণ করিয়া জগতের হিতার্থে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সহজে সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কাহিনী স্বাহাদের অবিস্মৃত নয়, তাঁহারা সকলেই জানেন কি দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, চরম জ্ঞানান্ধিমার, আত্মান্ধিমার ও দুর্জয় স্বাতন্ত্র্যভিলাষী নরেন্দ্রনাথ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই গুরু-শিষ্যের কতই না প্রকৃতিগত প্রভেদ! একজন মর্ত্যজীবনের অবিচ্ছিন্নসূত বড়-ঝঞ্ঝার বহু উর্দ্ধে ভ্রমানন্দে বিভোর; মসিয়ে রোয়াল্যার ভাষায়—“His life had been spent in the serene fulness of cosmic joy.” অপর জন জীবনে বিশ্রাম চাহেন নাই—“He was energy personified and action was his message to man.” গুরু-শিষ্যের এই প্রকৃতিগত পার্থক্যজনিত দ্বন্দ্বতিহাস প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন—“How I used to hate KALI and all her ways! That was the ground of my six years fight—that I would not accept Her. But I had to accept her at last! গুরুর নিকট এই পরাজয়ের কারণ স্বামীজি নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—“I loved him you see and that was what held me.....I saw his marvellous purity...I felt his wonderful love.”

শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি চিৎখন আনন্দ-সত্তার আশ্বাদন লাভ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, অদ্বৈতের উপাসক, তিনি এই বহুকে, এই সৃষ্টিকে, এই মান্না-স্বপ্নের ছায়া-বুদ্বুদরাশিকে এমন করিয়া আঙুলিয়া বাবিতে চান কেন—নরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারে না! এই বিশ্বয় হইতেই নরেন্দ্রের প্রাণে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল, তাহারই পরিণামে নরেন্দ্রের বিবেকানন্দরূপে জন্মান্তর ঘটিল। যে প্রেম জ্ঞানেরই পরম পরিণাম, অবশেষে সেই মহাপ্রেমের পদতলে শিষ্য আপনাকে লুটাইয়া দিল।

## সম্বন্ধজননী

ইন্দুগুপ্ত

ওঁ মা। মা।

মা পরমা জ্যোতির্ময়ী।

মা ব্রহ্ম-বিদ্যা-রূপিণী।

মা অদ্বিতীয়া সনাতনী।

সত্তার সার সৎ, চেতনার বিস্তৃত ক্রিয়াশক্তি চিৎ, শুদ্ধ  
সচেতন অস্তিত্বের রস আনন্দ, এই ত্রি-তত্ত্বই সচ্চিদানন্দময়ী  
মা।

মার অমুভাবে নিষ্কর অমুভাবে অমুভাবিত করা।  
কেননা মা-ই সব। অমুরন্ত ভালবাসার, অবিচল বৈধেয়র  
প্রতীক মা। এই মাকে কেন্দ্র করে যে জীবন, যে কর্ম,  
—সে জীবন, সে কর্ম দিব্য।

সম্বন্ধজননী এবং সম্বন্ধগুরু যে জীবন, যে কর্ম সে  
জীবন, সে কর্মও এই দিব্য জীবনকর্মেরই বাণীরূপ।

— চিরন্তনের ছন্দে বাঁধা এই বাণীরূপের মুক্ত স্বীকৃতিতে  
একদিন দেশ ও জাতি ধস হয়েছিল। তাঁদের আত্মদানে  
গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠার বেদী। সেই বেদী রচনার প্রাক্  
মুহূর্তের এক অনবদ্য-কাহিনী মাতৃ-উৎসবের এই গুণ্য  
লগ্নে আজ বার বার মনে পড়ছে। তখন তাঁরা সবে  
উত্তরণের পথে চলেছেন।

চলেছেন দেহস্থখের বাইরে, গতির প্রেরণা নিয়ে  
মননের বিচিত্র ঐশ্বর্যের মূল স্রুতি ধরতে। উদ্দীপনা  
প্রবল। প্রবৃত্তির রাশ টেনে টেনে চলেছেন এক পর্ব  
থেকে আরেক পর্বের।

শীতকাল।

হাসির মতো, কান্নার মতো বারে-বারে পড়ছে  
চাঁদের আলো। বাতাসে মধু গন্ধ। জীবনের সকল  
অন্ধকার গলে যাচ্ছে যেন। গঙ্গায় জল ছল-ছল সুরে  
গান ধরেছে। তানের বিস্তারে সেই সুরের স্বরলিপি  
ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্বন্ধগুরু গঙ্গাতীরে বসে প্রসন্নতম হাসি হাসেন।  
সঙ্গী-নাথীদের সঙ্গে গল্পে মনগুপ্ত হয়ে ওঠেন। চোখ দুটো  
অর্ধ-নিমিলিত করে কী যেন ভাবেন। রাত অনেক

হয়েছে। গৃহে ফিরতে হবে, ফিরতে হবে সেইখানে  
যেখানে দূর-প্রসারিত তরঙ্গায়িত সবুজের ক্ষীণ রেখা নদীর  
ধার বেঁসে উধাও হয়ে গেছে। সেই দিকে স্থির হয়ে  
কিছুক্ষণ কি যেন দেখলেন। তারপর ধীরে ধীরে পা  
বাড়িয়ে দিলেন।

সম্বন্ধজননী ঘুমিয়ে আছেন।

অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে  
হয়। আহা কতনা ক্লান্তি। সেই ক্লান্তির নিরসন ঘুমের  
শীতল কোড়ে। কিন্তু যিনি একটা বিশেষ পর্যায়ের ভেতর  
দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ঘাতাঘাত গমনাগমন সব কিছুই আত্মার  
উন্মীলনে উন্মীলিত। সম্বন্ধগুরু ধীর পদক্ষেপে বের হয়ে  
এলেন বাইরে। দালানের খাম ছুঁতোর কালো ছায়া আর  
ফ্যাকাশে হাসির মতো বোবা আলো লুকোচুরি খেলছে।  
একটা বিরাট আম গাছ বোরখা পরা মেয়ের মতো কি  
এক ভয়ে ভাবনায় কঁপে কঁপে উঠছে। একটু ঝুঁকে  
আছে সামনের দিকে। যেন ফিস্ ফিস্ করে কি কথা  
বলছে। কিন্তু তার স্বর বোবা যাচ্ছে না।

কে—

পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন সম্বন্ধগুরু। তবে কি—  
মুহূর্তে অবিস্থানের আলো মিলিয়ে যায়। একটা কিছু  
সম্ভাবনার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে।

ঐতো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ঐতো—

চোখে চোখ বেধে যায়।

দৃষ্টির প্রদীপ জ্বলে উভয়ে উভয়কে দেখেন। একটা  
মিষ্টি সুরের আবেশে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। অনাবিল লাভাণা  
ভরে উঠেছে সত্তার বিশেষ সুর। দেহ-দেউলে আকৃতির  
আরতি। প্রান্তিলহরীর দোলায় ছলছে স্বীকৃতির আলো।  
কত ভূষ্টি! কত শাস্তি!

এ সেই পল্লীবধু। বাসনার রক্তপদ্ম। কামনার  
সুর্ঘ্যোদয়।

এসো আমার সঙ্গে। আজ আমার উৎসব।

হাতে হাত এসে মেশে। নয়নে নয়ন রেখে উভয়ে

উভয়কে নিরীক্ষণ করে। পলক পড়ে না। হৃদয়ে হৃদয়ে  
আবেগ-স্পন্দন ওঠে নামে। নামে ওঠে।

এসে। আমি কত রাত সুযোগের অপেক্ষায়  
কাটিয়েছি, আজ সে সুযোগ এনেছে।

যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেন সজ্বগুরু।

গলিপথ শেষ হয়।

আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

আমার ঘরে।

তোমার স্বামী?

তিনি ভিন্ন ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

এতক্ষণ সজ্বগুরু ছিলেন প্রাথমিক স্তরে বস্তু সত্তার  
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে। হঠাৎ চেতনার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল।

ভগবৎ পরিকল্পনার মূল সূত্রটি ধরা পড়লো।

তোমার স্বামী কিছু জানেন না? তাঁকে লুকিয়ে  
আমাকে ডেকে এনেছ!

মহিলা হাসলেন। সে হাসি হাসি, নয়। কান্না। সে  
কান্না ভিধাবিধীর কান্না। সে কান্নার ভাষা অতি সহজ।  
এক কোঁটা অশ্রুর মুক্তা বয়ে পড়লো। আর সেই সঙ্গে  
জ্বলে উঠলো সমস্ত আকাশ জুড়ে আয়তী উষার পদরাগ।

ছুটি ছন্দে চলেছে শক্তির লীলা।

সজ্বগুরু এবার ফিরে পেলেন শৈব-দৃষ্টি।

কৌতুকে হাসছে প্রকৃতি।

সবেগ পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলেন সজ্বগুরু।

সজ্বজননী শুনলেন সবই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে  
নিলেন—জেরা করলেন, তবু সংশয় গেল না। সংশয়াতীত  
হতে পারলেন না তিনি। অস্থির হয়ে উঠলেন। হাত  
মুষ্টিবদ্ধ হোল। আরক্ত নয়নে ক্রোধ বয়ে পড়লো। বৃকে  
করাঘাত করলেন। সম্পূর্ণ উন্মাদ যেন। দুঃখে কণ্ঠে  
অতিষ্ঠ হয়ে সজ্বজননী স্বগম্ভীরা ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ  
করলেন। পতিপ্রাণা নারীর ব্যথা মর্মান্বিতিক। মিথ্যা  
অহং-এ আগুন ধরিয়ে দিতে একমাত্র পতিপ্রাণাই পারে।

সজ্বজননী স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেই

মহিলার বাড়ী গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে এলেন। থাকে  
সামনে পেলেন তাকেই সবিস্তারে ঘটনার আন্তোপান্ত  
জানালেন। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়লো অহংএর মুখোশ।

সজ্বগুরু ক্ষুব্ধ হোলেন।

সজ্বজননী সম্পূর্ণ উন্মাদিনী। সারা রাত্রি কেঁদে  
কাটান। কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন না। নিঃশব্দে যেন  
ভেঙেচুরে শেষ করে দিতে চান। একদিকে তাঁর মৃত্যু-  
পণ, অন্যদিকে সজ্বগুরুর তাঁকে ধরে রাখার আকৃতি।

এ-আমির ইচ্ছা, সে-আমির ইচ্ছার সঙ্গে এক করে  
দেখতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে বি-সৃষ্টি। আলোড়ন  
জ্বেকেছে সমুদ্রের বুকে।

অনাহারে অনিদ্রায় স্নায়বিক উত্তেজনায় সজ্বজননী  
মেহ বিকল হল। ডাক্তার এলো, কবিরাজ এলো—রোগ  
সারল না। জীবনের কোন আশাই নেই।

কাল রাত্রি।

সজ্বজননী মুমূর্ষু।

অনেক পরিশ্রম, অনেক প্রয়াস—তাঁকে বাঁচাতে হবে।  
মুখখানা বিবর্ণ। মৃত্যু আসছে। তার নিঃশ্বাস  
প্রশ্বাসের দ্রুত শব্দ যেন ঐ শোনা যায়।

সজ্বগুরু অপলক নয়নে চেয়ে আছেন। মাথায় হাত  
বুলিয়ে দিচ্ছেন আলগোছে।

প্রাণ স্তব্ধ। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ সজ্বগুরু  
যেন দেখতে পেলেন এক ছায়াময়ী মূর্তি। এগিয়ে  
আসছে। পলক পড়ছে না তার চোখে। চেয়ে আছে  
তাঁর দিকে।

সজ্বগুরুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। ছায়ামূর্তি ধীর  
পদক্ষেপে এসে শয্যা স্পর্শ করলো।

সজ্বগুরু ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন।

\*

\*

\*

এরপর থেকেই সজ্বজননী সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়ে উঠলেন।  
অলৌকিক রহস্তে তাঁর দেহে যেন নূতন স্বাস্থ্য ও নূতন  
সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠলো।



# মনুষ্যত্ব-মহিমায় মহান যারা

শ্রীশুশীল প্রসাদ সর্বস্বাধিকারী বার-এ্যাট্ট-ল

[ বক্ষ্যমান নিবন্ধের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় শ্রীসর্বস্বাধিকারী মহাশয় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। সাহিত্যের প্রায় সর্বটিকেই তাঁর সার্থক পরিক্রমা পাঠক-সমাজ বিশেষ 'প্রবর্তক'-পাঠক-পাঠিকার নিকট সুবিদিত। বর্তমানের প্রাচীনতম লেখকদের মধ্যে তিনি অন্ততম। আশীতি-উর্দ্ধ বয়সেও তাঁর স্মৃতি ও মেধাশক্তি বিশ্বম্বকর-ভাবে সজীব। ফেলিয়া-আসা বিশ্বতপ্রায় দূর অতীতের কথা শুনাইবার ওদ্যাকিবহাল অভিজ্ঞ মাহুষ আজ আর বেশী নাই। সে-কালে সাধারণ মাহুষের মধ্যেও সত্যতা, স্বধর্মপরায়ণতা, সদাচার, জ্ঞাননিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদগুণরাজি কত ব্যাপক ও প্রবল ছিল সে সম্বন্ধে লিখিতে অল্পরুদ্ধ হইয়া তিনি রাগী হইয়াছেন। পুরাতন সেবক-সেবিকাদের কথা লইয়া তিনি প্রসঙ্গ স্মৃক করিবেন। বড় লোকের গুণগানই সাধারণতঃ ফেনাইয়া-ফুলাইয়া সাধারণ্যে ধরা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভূতা' বাদ দিলে এ বিষয়টি বড় বেশী সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় নাই। আজিকার দিনে যে জিনিষের সবচেয়ে অভাব তার আলোচনা যদি তথাকথিত উপরের মহলের বিবেককে একটু নাড়া দেয় তবে এই তথ্য-পরিবেশন খানিকটা সার্থক হবে। প্রঃ সঃ ]

## । ভূপাল সিং ।

সিপাহী-যুদ্ধের আমলে তখন ভারতের অনেকাংশ প্রজলিত। সে অনলের নির্কাণ সরকার বাহাদুর-এর বাহাদুরীতে কতটা হইত না হইত, যদি শুভাশুভ দৃষ্টি-সম্পন্ন ভারতবাসী সে চেষ্টায় মদত না করিতেন, তাহা প্রজাবতী রাণী ভিক্টোরিয়ার পত্নাদি ও প্রত্যক্ষদর্শী সত্যবাক যদুনাথ সর্বস্বাধিকারী ও তাঁহার পুত্র ডাঃ সূর্যকুমার বর্ণিত তথ্যাদি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিবে।

ডাঃ সূর্যকুমার তখন গাজীপুর অঞ্চলে সিপাহী-যুদ্ধের পরিণামে বাহারা হত, আহত তাহাদের সেবায় নিযুক্ত। কাজের কাজী হিসাবে সূর্যকুমার এখন ত্রিগেডিয়ার জেনারল পদে সম্মানিত। সে অঞ্চলের ধলা-কালী নির্বিশেষে যুদ্ধের তিনি মা-বাপ। লক্ষ্য-এ পতিত সার জন লরেন্সের রক্ষার চেষ্টায় তাঁহার সহযোগিতা অনিবার্য।

সেই সময়ে 'হাতে মাথা কাটা'র বিরাম নাই, সরকার বাহাদুরের। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সে বাহাদুরী যথাসাধ্য রোধ করতে সূর্যকুমার কৃতসঙ্কল্প। হাতে মাথা কাটার ধপ্পরে পড়ে ভূপাল সিং সরকার বাহাদুরের একজন কর্মঠ সিপাহী। তাহার মাথা কাটা নিবারণ করেন, ত্রিগেডিয়ার জেনারল সূর্যকুমার এবং স্বয়ং জামিনদার হইয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

ভূপাল সিং দুই হাতে সমান তেজে রিভলবার চালাইতে সিদ্ধ। মহা-অবাকতার প্রাবল্যে সিপাহী

যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সেই ভীষণতা কালে ভূপাল সিং একাধিকবার বিপদক্ষেত্রে হইতে রক্ষা করিয়াছে সূর্যকুমারকে বুকের মধ্যে লইয়া, দুইহাতে বন্দুক চালাইতে চালাইতে।

ডাঃ সূর্যকুমার, শাস্তি বিরাজিত হইলে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে, ভূপাল সিং তাঁহার সঙ্গ লয় এবং কলিকাতায় তাঁহার গৃহে দ্বাররক্ষক রূপে নিযুক্ত থাকে। বলা বাহুল্য, ফলে দ্বারের জিনীমানায় দুইটির ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর ( বাহাদুর প্রাণ গাজীপুরে রক্ষিত হইয়াছিল সূর্যকুমার কর্তৃক ) নিত্য অস্বাভাব্যে প্রাতে দেখা করিতে আসিতেন তাঁহার বাটীতে, সূর্যকুমারের সহিত। একদিন তিনি আসিয়াছেন, সূর্যকুমার বাটীতে ছিলেন না। গিয়াছিলেন তিনি এটর্নিপ্রবর ও প্রতিবেশী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের বাটীতে, চিকিৎসা ব্যপদেশে। ছোটলাট সাহেব জানিলেন, ত্রিগেডিয়ার জেনারল গৃহে নাই, আছেন নিকটেই। জেনারল সাহেব কোথায় দেনা, লাট সাহাব—ভূপাল সিং স্মরিং বলিল, আপনি লাট সাহাব না ডাকু মালুম হামার নাই। ইকুম আমার ওপর দরোয়াজা ছেড়ে যাবে না কখনও। মাক্ কিজিয়ে।

সূর্যকুমার গণেশবাবুর বারান্দা হইতে অস্বাভাব্যেই দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাটা আসিলে, অস্বাভাব্যেই হাসিয়া বলিলেন, এ দরোয়ানটা কোথা হইতে পাওয়া! শুনিলেন



তিনি ভূপাল সিং-এর কথা। অস্বাভাবিক আবার হাসিয়া বলিলেন, আমিও ভাবছিলাম, মিলিটারী ট্রেনিং না থাকলে এমন Discipline—

স্বর্য়াক্ষর শুনলেন সব কথা। শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, ‘আহাশ্বক’।

লাট চলিয়া যাইবার পরে স্বর্য়াক্ষর স্বির হইয়া বলিলেন, ভূপাল সিং তাঁহার সন্মিলনে গিয়া করজোড়ে বলিল, “আমার ছুটির হুকুম হ’ক।”

আশ্চর্য্যঘটিত স্বর্য়াক্ষর—কেন! কেন!

ভূপাল সিং—হুকুম পালন করিয়াও প্রভুর মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে যদি না পারি—

স্বর্য়াক্ষর—কি সব বলছ। শুনেছ বৃষ্টি ‘আহাশ্বক’ বলেছি আমি—

ভূপাল সিং—হ্যাঁ হজুর, ছুটি আমার চাই, নোকরী আর আমি কোরব না।

কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেল ভূপাল সিং। প্রভু ও ভৃত্য দুই জনেই দুইজনের প্রাণদাতা। সে খতিয়ান আত্মসম্মান রক্ষার ব্যপদেশে গণ্য হইল না ভূপাল সিং-এর কাছে।

লাট সাহেব যখন শুনিলেন, ভূপাল সিং চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তখন তিনি বলিলেন, “এক করলেন মেজর জেনারল, আপনি যে তার জামিন।”

মেজর জেনারল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, “ভাববেন না মহাশয়, ভূপাল সিং এমন কোনও কাজ কখনও করবে না, যাতে আমার এতটুকু ক্ষতি হয়।”

বলিলেন স্বর্য়াক্ষর আরও, “উহাদের অবিশ্বাস করিবার কারণেই সিপাহী-যুদ্ধ হ্রস্ব হয়েছিল, নতুবা হইত না।”

দেশপাল ইহা শুনিয়া কিছু বলিলেন না, শূন্য দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র।

ভূপাল সিং ‘নোকরী’ আর কোথাও করে নাই। করে নাই বলিলে ঠিক হইবে না, ভগবানের নোকরীতে সে আপনাকে বহাল রাখিয়াছিল জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

## ॥ নথুনি মিয়া ॥

অখ্যান চালক নথুনি মিয়া পিতৃদেবের কশ্মে কবে বহাল হইয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে ‘কচুয়ান’ নথুনি ও সহিস আকবরকে দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে।

গাড়ী-ঘোড়ার কাজ ভিন্ন তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ ছিল, বালক আমরা আমাদের কোলেপিঠে করিয়া স্নেহাদর করা, গল্প করা।

দুইজনেই ছিল আমাদের ‘দাদা’। মাতৃ ঠাকুরাণীর তাহারা পুত্র ছিল কিনা! ভায়ে ভায়ে আমাদের মিল কি! একদিন তাহাদের ‘কোল’ না পাইলে, অভিযোগের আমাদের নীমা থাকিত না। তখন আমাদের ভুলাইবার চেষ্টা কি তাহাদের!

পূজার সময়ে বস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি মাতাঠাকুরাণী তাহাদের দিবেনই সর্ব্বাগ্রে। আর ৬বিজয়া তাহারা করিবে সর্ব্বাগ্রে মাতৃদেবীর পাদবন্দনা করিয়া। বাড়ী—বাড়ী ৬বিজয়া করিতে ক’দিন সকাল-বিকাল আমরা তাহাদের গাড়ীতে যাইতাম।

আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব প্রভৃতির প্রত্যেক বাটা তাদের নথদর্পণে। পরের পর সব বাড়ীতে আমাদের লইয়া যাইবে তাহারা। ৬বিজয়া আমরাও করিব, তাহারা করিবে। তাদের বড় পরব বকরীদ উপলক্ষে আনন্দ করিবে তাহারা আমাদেরই সঙ্গে।

মাতাঠাকুরাণীর গন্ধার ধারে বেড়ানর প্রয়োজনীয়তা হয় তাঁহার স্বাস্থ্যের কারণে। অপরাহ্ন ৪০০ ঘটিকায় প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবেন তিনি। ভুলিয়াও কখন গাড়ী হাজির রাখার ব্যতিক্রম ঘটে নাই নথুনি ও আকবরের।

আর এক ভারী কাজ ছিল নথুনি ও আকবরের। গাড়ী করিয়া প্রত্যেক ভাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উপলক্ষে পরীক্ষা কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া ও দিনের পরীক্ষা শেষে ‘ভাই’কে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনা। সে কাজ করিতে কি আনন্দ তাহাদের! তাহাদের জানা, ‘ভাই’ পাশ ‘দিয়েই’ দিবে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে ‘পাশ দেওয়া’র জন্ত তাহারা ভাইকে ফল মিঠাই খাওয়াইবে ও ভাই তাহাদের প্রণাম করিবে।

ভাই-এদের বিয়াসাদির আনন্দ তাহারা করিয়াছে  
দলবল লইয়া 'নাচিয়া-কুঁদিয়া'।

আমাদের ৫৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ বাসভবনের  
পশ্চাতে চৈতন সেন লেন। বাটার খিড়কি দরজা  
ছিল একদিকে, বাটার দক্ষিণে প্রকাণ্ড লোহার  
মাঠ। বহুবারের লোহাপটির কারবারীরা সকলেই  
কৃষ্ণনগরের লোক।

লোহার মাঠের পূর্বদিকের অংশে ছিল আমাদের  
গোয়াল, আস্তাবল ও নথনী, আকবরের থাকিবার ঘর।  
সবই চৈতন সেন লেনের উপর পশ্চিম দিকে। চৈতন  
সেন লেনের বাড়িদের মধ্যে পুণ্য ঘোষ, লালবিহারী  
দে ও যজু মুখোজ্যের নাম খুব মনে পড়ে। খুবই সজ্জন তাঁরা  
ছিলেন। বাবাকে ভয়-ভক্তি করিতেন সকলেই।

সুতরাং বাবার কচুয়ান সহিস গলির খানিকটা জুড়িয়া  
গরুর গাড়ী বসাইলে কেহই আপত্তি করে নাই। গরুর  
গাড়ীর ফলোয়া ব্যবসা সেখানে চলে। আর সেই সব  
গাড়ীর গাড়োয়ানদের তীক্ষ্ণ নজরে আমাদের গোয়ালের  
গাই বাছুরের অল্প কাহারও পক্ষে চক্ষুদান বা অল্প কোনও  
প্রকারের তঞ্চকতা কখনও হয় নাই। কলিকাতার  
বুকে তখন আমাদের গোয়ালে থাকিত ঘোলাটি গাই ও  
তাদের বাছুর।

সমগ্র অংশটাই কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! ইহার সম্পূর্ণ  
কৃতিত্ব নথনী, আকবর ও গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানদের।  
বাবা গত হইলে নথনী ও আকবর দু'জনেই স্বদেশে ফিরিয়া  
যায়। তাহাদের কর্মের অভাব কলিকাতায় ছিল না।  
কিন্তু অল্প বাটীতে নোকরী করিতে তাহাদের মন  
চাহে নাই।

বিদায়-গ্রহণকালে তাহাদের কি কাতরতা! মাছু-  
দেবী ও পিতৃদেবের ফটো তাহারা মাথায় করিয়া লইয়া  
যায়। ঢুকিয়াছিল তাহারা আমাদের বাটীতে কাজ  
করিতে—কাজের মত কাজ ত' তাহারা করেই এবং  
তাহা করিতে হইয়া যায় তাহারা বংশেরই ছেলেপুলে।

তাহাদের দু'জনেরই মুখ আমার মনে আঁকা।  
তাহাদের স্নেহ ভালবাসার রেশ এখনও ঘেন কাণে  
বাস্তিতেছে।

সহধর্ম্মিণী সতীরাণীকে আশীর্বাদ তাহারা করে  
গিনি দিয়া। সতীরাণী তাহাদিগকে প্রণাম করিলে,  
গদগদভাবে 'ছোটভাইয়া'-কে বলে, "ভাগ্ তুহার আছা।  
আল্লা দুয়া করে।"

নথনী ও আকবর-এর আশ্রয় উদ্দেশে জানানই  
সকাতরে, "আল্লার কাছে দুয়া কর ভাই, দ্বিবিং জীবনাঙ্কের  
অবদান ঘেন আমার হয়।"



**অজীর্ণ রোগে...**



অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

কারি কাপেপটল

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

# সম্মাদকায়

বিগত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য :

অজয়ের তীর বৈষ্ণব-সাহিত্যের পাদপীঠ। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিগত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রক্ত-জয়ন্তী অধিবেশন অমুষ্ঠিত হইয়াছে এই অজয়তীরের গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। ‘পঞ্চানন্দ’ নামে পরিচিত, একদা বঙ্গসাহিত্যে—বঙ্গগর্ভ ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্গত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি, মূলতঃ কৃষক-পল্লী এই গঙ্গাটিকুরীতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে শুধু অভিনবত্বই প্রকাশ পায় নাই—পল্লীপ্রধান বাঙ্গলার পল্লীবাসিগণের সহিত সহরে কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও পরস্পরের ভাববিনিময়ের সুযোগ ও অবকাশ যদি এই সম্মেলনকে উপলক্ষ করিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহার মূল্য অপরিমেয়।

সহর-সৌধের জিতল কক্ষে বসিয়া দূর বাতায়ন-পথে, কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে ও ভাষার তুলিকা-সাহায্যে যে সকল কবি ও সাহিত্যিক, পল্লী ও পল্লীবাসীর চিত্র-চমক-প্রদ চিত্র অঙ্কনে অভ্যস্ত তাঁহারা গঙ্গাটিকুরী হইতে পল্লী ও পল্লীজীবনের যদি সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আনিয়া থাকেন এবং সাহিত্যে তাহা রূপারনে বহুবান হ’ন—তবে বস্তুতন্ত্র-বলিষ্ঠ কল্পনায় বঙ্গসাহিত্য যে সমৃদ্ধতর হইবে, এমন আশার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে।

এইরূপ পল্লী-অধিবেশনের সার্থকতার অপর দিকও আছে। যাহারা চৈত্রে রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিয়া আমাদের ক্ষুধার অন্ন আনিয়া দেয়, অনাহার, অর্দ্ধাহারে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া নোকা চালায়, মাছ ধরে, কাঠ কাটে, সেই কটিবাসমাত্র-পরিহিত কোটি কোটি পল্লীবাসী যে আমাদের একান্ত আপনাব জন, রক্ত-সম্পর্কে আমাদের ভাই—এ কথা লেখায় ও পাটি-পলিটিক্স-বক্তৃতায় স্বীকার করিলেও, শিক্ষাভিমান তাহাদের সংস্পর্শ হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াই আমরা চলি। পল্লী-বাঙ্গলার অত্যন্ত অস্তরভূমি কৃষকপল্লী এই গঙ্গাটিকুরী ও সম্নিহিত গ্রামাঞ্চলের অতি-সাধারণজনও এই অধিবেশন উপলক্ষে

—সমক্ষে ও রাষ্ট্রে যাহারা শ্রেষ্ঠজন বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের দর্শনলাভের, তাঁহাদের আতিথেয়তা জ্ঞাপনের ও সম্ভবক্ষেত্রে ভাব-বিনিময়ের অবকাশ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, ইহা কম কথা নহে। এইরূপ পল্লী-অধিবেশনের মাধ্যমে আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জনদের সহিত পল্লী-বাসী অগণিত বিজ্ঞানীনজনের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার খানিকটা সুযোগ হইয়াছে।

পল্লীভূমিতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন এই প্রথম এবং সেই দিক দিয়া ইহা উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

এই রক্ত জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমালি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি ও কর্ণধার শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শান্তিনিকেতনের উপাচার্য শ্রীহৃদীরঞ্জন দাস মহাশয় ছিলেন এই সম্মেলনের মূল পুরোহিত। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শাখা-সভাগুলিতে পৌরোহিত্য করিয়াছেন বাঙ্গলার প্রখ্যাত সাহিত্য-সেবিগণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী :

বিগত দীপান্ত্রিতা দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীজীর ৪২তম জন্মোৎসব ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সারাদিনব্যাপী সাড়শরে অমুষ্ঠিত হয়। উৎসবে বক্তৃতা দি হয, কিন্তু প্রধান অঙ্ক ছিল বিচিঞ্জাতুষ্ঠান। স্বদর্শন, স্মৃঠাম শ্রীঠাকুরের স্বর ও ছন্দ-প্রিয়তা তাঁর মন্ত্র ও সাধনারই তাৎপর্য বহন করে। সৃষ্টির মৌলিক স্বর, ছন্দ ও ধ্বনির সঙ্গে আত্মভাব ও ভাবনা, স্বর ও ছন্দের সঙ্গত, ঐক্যতান ও লয়েই মিথ্যার হিরণ্য পাঞ্জের উন্মোচন এবং জ্যোতির্শ্বের উন্মেষণ। ইহাই ব্রহ্মচারীজীর সাধনারও মূলগত দিগদর্শন। এবারকার উৎসবের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য, যারা এই উৎসবের আত্মায়ক, আয়োজক ও পরিচালক তাঁরা সবাই সমাজের অপাংক্তেয় হরিজন। ঠাকুরেরই ভরসা—“তোমরাই বা কম কিসের? সমাজের পরম কল্যাণে কলম হাতে যাদের, ঝাড়ু হাতে যাদের—উভয়েবই দেবা একান্ত অপরিহার্য।” উৎসবে সারাদিন ব্যাপী জ্ঞাতি-বর্গ নির্বিশেষে অগণিত ভক্ত-অহুরাগী-শিষ্যের সমাগম বিশ্বম্বকর। শ্রীঠাকুর যেন যুগের বলিষ্ঠ গতিবান

ভাব-বিগ্রহ—আজিকার অনড় সংস্কার, মানস অরাজকতা, অপ্রত্যয়, সংশয়, ভাবানুতা, নাস্তিকতাকে সমাহার করিয়া সমুচ্ছল—লক্ষ লক্ষ নরনারীর আকর্ষণ-কেন্দ্র। এই জন্মোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের শক্তিগর্ত সর্গচিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য-মহিমা সমাগত সবারই কাছে হৃৎপ্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারীজিকে কেন্দ্র করিয়া একটা প্রগতিশীল ধর্ম্মান্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে তাহা এই জন্মোৎসবে বেশ বুঝা গেল।

### বাংলার মধ্যবিস্ত সমাজ :

ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের নব-জাগৃতির হোতা বাঙ্গলার মধ্যবিস্ত-সম্প্রদায়, আজ আসন্ন ধ্বংসমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের উপর ইংরেজের সুপরিকল্পিত খড়গাঘাত, দেশ-বিভাগ ভিত্তিক স্বাধীনতালাভ, প্রতিবেশী বিভিন্ন রাজ্য ও রাষ্ট্রের উল্লঙ্ঘন আক্রমণ, চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতিতে আজ সর্কারিক বিপন্ন ও বিপর্যস্ত এই বাঙ্গালী মধ্যবিস্ত সমাজ। যাহার মনীষায়, বীর্ঘ্যবস্তায় ও আত্মাহুতিতে নব্য ভারতের জন্ম, সে আজ ভারতের সর্বত্র অবহেলিত, লাজিত, নির্যাত্তিত। তাহার বেদনার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, তাহার মৃত্যুতেও কেহ বিচলিত হয় না। তাহাকে রক্ষার জন্ত সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের কোন মাথা ব্যথা নাই। অথচ এই বাঙ্গালী মধ্যবিস্ত-সম্প্রদায়ই দখিচীর মত আপন অস্থি দিয়া ভারতের রাষ্ট্রিক মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। এ কথা অবশ্য ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মমাসী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ক্ষমতামগ্নমস্তদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা-মূলক এই ইতিহাসের পাতাগুলি যত সম্বন্ধেই রক্ষা করা হউক না কেন—যেদিন ঝড় উঠিবে, শুষ্কপত্রের মত দশ দিকে উড়িয়া মুছর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সেই ঝড়ের ভৈরব গর্জনে মিথ্যাগর্ভ দস্তোক্তি ও নিল্লব্ধ আত্ম-ঘোষণার ঢকানিনাদ যখন আর শুনা যাইবে না, তখন ভারতবর্ষের নব-জাগরণের, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের যে নিরপেক্ষ সত্যোতিহাস রচিত হইবে, তাহার

প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাক্ষাৎকার মিলিবে বাঙ্গলার মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়েরই সম্মানগণের।

‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বীর সম্রাসী বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাঙ্গলার ব্যাঘ্র আশুতোষ, অগ্নিহোত্রী বারীন্দ্র, ক্ষুদ্রিরাম ও কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী ও বাবা যতীন, রাসবিহারী বসু ও সূর্য্য যেন, শ্রীমাদ্রাসাদ ও সূভাষচন্দ্র সকলেই বাঙ্গলার মধ্যবিস্ত-ঘরেরই সম্মান। ঘরে ঘরে একদা এইরূপ শত সহস্র দখিচী ও দিকৃপালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই—ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে ভারতবর্ষের সগৌরব পরিচয়ের সম্মত পতাকা আজ সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন হইতে পারিয়াছে, পরজাতির হৃৎশ্লেষ্য নাগপাশ হইতে তাহার রাষ্ট্রিক-মুক্তি আজ সম্ভব হইয়াছে।

বিংশ খৃষ্ট-শতকের প্রথম দশকে বাঙ্গলার মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের সর্বতোমুখী অমিত-বীর্ঘ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মারাঠি মনীষী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ গোপ্বলেকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—“What Bengal thinks to-day India will think to-morrow.” বীর বিপ্লবী সান্ভারকরকেও বলিতে হইয়াছে—“Every mile-stone in the path of progress in India is consecrated by the life blood of the myrters of Hindu-Bengal.”

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস হইতে রক্ষার্থে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ‘মধ্যবিস্ত সমিতি’ নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই নব গঠিত সমিতির আহ্বানে বিগত ২২-২৩-২৪ ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নগর ও পল্লী বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যবিস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনেক দরদী মহামাছু ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান ও বক্তৃতা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই সমিতি সক্রিয়ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়া ইহার উদ্দেশ্যকে অগ্রবর্ত্ত করিয়া সাক্ষ্যের পথে লইতে পারিবেন, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আজিকার যারা রাষ্ট্র-কর্ণধার, রাজনৈতিক নেতা তাঁরাও প্রায় সকলেই মধ্যবিস্ত ঘরেরই। মধ্যবিস্তের এই জন্ত

নিশ্চিহ্নতার বিষয়ে তাঁরা যে অবহিত বা ব্যথিত নয়, এমনও নয়। তথাপি ক্ষমতা ও গদীর মোহপাশবদ্ধ হইয়া তাঁরা এদিকে নিক্ষেপ। বর্তমানে গণতন্ত্র রাষ্ট্রের কাঠামো এবং আদর্শও মধ্যবিস্তৃত সম্প্রদায়ের স্বায়ীত্ব ও স্বিতাবস্থার অমূলক নয়। ইতিহাসেরই ইহা চক্রগতির পরিণতি। এতাবৎ কাল যে মধ্যবিস্তৃত সম্প্রদায় বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল তাহাকে ইতিহাসের বৈপ্লবিক পথে অগ্নিস্নান করিয়াই শুদ্ধ মূর্তিতে নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সুপ্রাচীন কালের ভারতবর্ষ যে সর্বাত্মক আলো ও অমৃতের দিকদর্শন দিয়া গিয়াছেন সেই সুস্নিগ্ধ আকাশ প্রদীপের দিগা যারা মৃত্যুপন তপস্কার মধ্যে ধারণ ও বহন করিবেন তাঁবাই মধ্যবিস্তৃত। চিরন্তনকালের এই ভারতবর্ষকে হারাইয়া যাহারা দৈহিক-প্রবৃত্তির প্রয়োজন মিটাইতে শ্রমিকের জ্ঞাতিতে পরিণত হইতে চাহে না, তাহারাই এই মধ্যবিস্তৃত সম্প্রদায়কে জীয়াইয়া রাখার এই মহনীয় প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাইবে।

### শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ ভারতী :

বাংলার সুপ্রাচীন পত্র-পত্রিকার অমূল্য ‘যুবক’ পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক ও সাংবাদিক বর্ষায়ান সাহিত্যিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ দবদী শিক্ষাব্রতী পরম শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ ভারতী (ব্রহ্মচারী) গত ১৫ই নভেম্বর ৮৮ বৎসর বয়সে তার শান্তিপুরস্থ আবাসগৃহে সজ্জানে সাধনোচিতধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। নদীয়া জিলায় সম্ভবতঃ ক্রীভারতীই ছিলেন প্রবীণতম শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। তাঁর পরলোকগমনে শান্তিপুরে শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল তাহা অপূরণীয় বলিলেও এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না। চন্দননগরে ক্রীহরিহর শেঠ মহাশয়ের যে স্থান শান্তিপুরে শ্রদ্ধেয় ভারতী মহোদয় অমূল্য স্থানের ছিলেন অধিকারী। স্থানীয় সেবায় ও কল্যাণে এমন উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ যদি বাংলার প্রতি পল্লী ও নগরে থাকিত তাহা হইলে এদেশের ক্রী ফিরিয়া যাইতে পারিত। শান্তিপুর নব-বিদ্যালয়, রামনগর বালিকা বিদ্যালয়, করিকরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, শান্তিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ওরিয়েন্টল একাডেমী প্রভৃতির তিনি ছিলেন অমূল্য প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিপুরে নারীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। শান্তিপুরে মিস্ট্রেস ট্রেনিং স্কুল প্রবর্তন করিয়া বহু মহিলাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের জীবনকে উজ্জলতর করিয়াছেন। অক্ষ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে নারীশিক্ষা প্রসারে তিনি প্রথম উদ্যোক্তা। দরিদ্র

ছাত্রদিগের শিক্ষালাভের জন্ত তিনি নৈশবিদ্যালয় (নাইট স্কুল) স্থাপনা করিয়া তাহাদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের বহু ছাত্র তাঁর নাইট স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সেবার ক্ষেত্রে তাঁহার ভ্যাগের দৃষ্টান্ত শিক্ষণীয়। অনাথ বালক-বালিকাদের প্রতিপালনের জন্ত তিনি জীবনে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন। শান্তিপুর অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়া বহু অনাথ বালক-বালিকাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যের সেবায় তার জীবনের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল মাসিক ‘যুবক’ পত্রিকাটি পরিচালনা করিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। একসময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার শান্তিপুরস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলেন। বহু সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি আজীবন সংযুক্ত ছিলেন। গত বৎসর ১৯৬০ সালে তাহার প্রচেষ্টায় শান্তিপুর ব্রহ্মসম্মিলন প্রাঙ্গণে ‘দেবী অবতার কামিনী স্মৃতি পাঠাগার’ গৃহ নিৰ্মিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই উদ্দেশ্যে তাহার হস্তে ২০০০ টাকা প্রদান করেন।

কৈশোরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের মহান আদর্শে অমূল্য-প্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। শিক্ষা, সমাজসেবা ও ধর্মকে জীবনের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁর নিরলস পরিশ্রমে যে প্রাণশক্তি লাভ করিয়াছে তাহা স্মরণীয়। তিনি যৌবন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রহ্মসাধনা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মহাধন লাভ করিয়াছিলেন—যে ধন লাভ করিলে হৃদয়-পাত্র ভরিয়া যায়। তাইতো তাঁর প্রাণ মানব সেবার জন্ত ক্রন্দন করিয়া উঠিত। শান্তিপুরের আলোবাতাসের মধ্যে যে ধর্মপ্রাণতা রহিয়াছে সেই প্রেমের ধর্মে তিনি প্রথম হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিপুর শিক্ষক-সমাজ একজন সাহিত্যসেবী, সেবক-সমাজ, একজন নিরলস সেবক, ব্রাহ্মসমাজ একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাইলেন।

বাংলা ও বাঙ্গালীর নব জাগরণের ইতিহাসে ক্রীভারতীর সুদীর্ঘ জীবন প্রায় শতাব্দীর ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তান, পতন ও বিপর্যয়ের সক্রিয় সাক্ষ্য-বহন করিয়া চলমান ছিল। আদর্শনিষ্ঠ খাটি বাঙালীর সমুজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন যোগানন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হিসাবে প্রবর্তক পত্রিকাখানির প্রতিও তাব অকপট অমূল্যগ ছিল। দূর হইতেও আমরা তাঁর স্নেহস্পর্শে ধন্ত। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বাত্মকরণের অর্ঘ্য তর্পণ করিতেছি।

## ‘জালালাবাদের যুদ্ধ’\*

অনন্ত সিংহ

“হলদিঘাটের যুদ্ধ” প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর মনে রাণাপ্রতাপের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে; মহারাষ্ট্র-বীরকেশরী নব-ভারতবর্ষের প্রবর্তক শিবাজীর জীবন-সাধনাও অবিস্মরণীয়; অসীম সাহসী বীর হায়দার আলি এবং তাঁর বীর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজ বণিকের রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে যে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন তা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার দুই পরাক্রম-শালী সেনাপতির অধীনস্থ পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং আঠারো হাজার অশ্বরোহী দেশপ্রেমিক সৈন্য, রবার্ট ক্লাইভ এবং নৌ-সেনাপতি ওয়াটসনের পরিচালিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিল তা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি বৃটিশ বণিকতন্ত্রের ক্রমাধ্বনী বিধানঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার প্রকৃত জবাব।

“অবাধ-বাণিজ্য” ও “ধর্মের স্বাধীনতার” নামে বৃটিশ বণিক এবং মিশনারীরা চেয়েছিল ভারতকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের পদানত করতে। ক্ষমতার লোভে উন্নত দৃষ্ট্য বণিকেরা ভেবেছিল ‘ব্যারোমিটার’ ভেঙ্গে ফেলেই বুঝি ঝড় থামানো যায়। কিন্তু মূর্খেরা জানতো না ঝড়ের মেঘ দিনে দিনে গুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিলো এবং ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাহীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্ত বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বাংলা দেশে, ব্যারাকপুরে, প্রথম যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো, তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো মীরট, লক্ষ্মী, দিল্লী, কানপুর, বেরিলি এবং ঝাঁসিতে; বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এলেন তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই।

ভারতের এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামকে অমর করে রেখেছে কত দেশপ্রেমের কবিতা, কত বীরত্বব্যঞ্জক গাথা, কত আত্মত্যাগ ও অস্বার্থসর্গমূলক গীতি কবিতা।

কর্ণফুলী নদীর তীরে, জন্মভূমি চট্টগ্রামে বসে ভারতের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী কবি নবীন সেন রচনা করেছেন তাঁর অমর কাব্য “পলাশীর যুদ্ধ”।

সিপাহী বিদ্রোহের ৭৩ বছর পরে, চট্টগ্রামের অসম সাহসী বিপ্লবী তরুণেরা আবার বৃটিশের সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়েছিল, বৃটিশের সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে জালালাবাদের উচ্চ শিখরে তুলেছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ১৯৩০ সালের, ২২শে এপ্রিলের এই বীরত্বপূর্ণ জালালাবাদ যুদ্ধকে অবলম্বন করে কত কবি কত কবিতা, কাব্য, রচনা করেছেন, কত লেখক তাঁদের অমর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন এই হৃদয়গ্রাহী কাহিনী, কত বক্তা উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশের নরনারীদের এই বিপ্লবী তরুণদের আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে, কত সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা এদের বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের করেছেন অভিভূত। কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য জালালাবাদের এই অমর কাহিনীকে স্বদেশ-প্রীতির মহিমায় অঙ্কিত করেছেন। জালালাবাদ যুদ্ধের মহানায়ক মাষ্টারদা—সুর্ঘ্য সেন। ‘মাষ্টার ব্রেইনের’ জন্ত তাঁর মাষ্টারদা অভিধা। কবি মাষ্টারদার অমর জীবন মহাকাব্যে রূপ দিয়েছেন যা সাহিত্যশাস্ত্রের ভাষায় বলা চলে ধীরোদাত্ত। মাষ্টারদার স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টি এবং অনন্তসাধারণ ত্যাগের আদর্শকে মুর্ত্ত করেছেন সর্গে সর্গে। মাষ্টারদার জীবন সম্পূর্ণতঃ এবং সূচু-ভাবেই প্রত্যক্ষ করি কবির বর্ণিত মাষ্টারদার জীবন-চিত্রে—যুগপ্রতিনিধি এবং যুগজ্ঞা ও স্রষ্টারূপে। বাক্যশী তথা সর্বভারতীয় জাতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বা ও অহুত্ব এই মহাকাব্যে সুপরিচ্ছূট। কবি জালালাবাদের অবিস্মরণীয় সংগ্রামকে এক মহাকাব্যের মাধ্যমে অমর করে রাখবার জন্ত সমস্ত মনোপ্রাণ নিয়োজিত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমি আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মহাকাব্য “জালালাবাদের যুদ্ধ”

\* জালালাবাদের যুদ্ধ (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস্, ১৬ নং সৈয়দ আমীর আলী এভিনিউ, কলিকাতা-১৭, দামস্তিন টাকা।

মহাকাব্যে কবি 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির' ঐতিহ্য ও আদর্শকে তুলে ধরতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছেন।

মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন জালালাবাদের যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বলের নেতৃত্বে তরুণ বিপ্লবীদের সেই নির্ভীক সংগ্রামের যে অপূর্ণ বর্ণনা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কবি দিয়েছেন তা বাংলায়, প্রতিটি স্বদেশপ্রেমিককে উৎসাহিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শহীদদের আত্মোৎসর্গের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবির বলিষ্ঠ লেখনী থেকে তাঁর কাব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তা আমাদের দেশবাসীদের হৃদয়কে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে চিরকাল জাতীয়তাবোধের প্রেরণায়। কবি শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য যে নির্ভা, আন্তরিকতা, আদর্শবাদ ও সত্যমুসন্ধিৎসা নিয়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, যে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাককে বিজ্রপ করে 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির' সৈনিক বাংলার বিপ্লবী-তরুণেরা পতাকা উড়িয়েছিল, ভারতের বিজয় পতাকা, মহাকাব্যে সে কাহিনীর রূপায়ন কবির অন্তরের শ্রদ্ধা এবং স্বদেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে।

মহাকাব্যের বাস্তবী ভাষা ও সঙ্গীত-ছন্দ-ধ্বনি-লাবণ্য পরিস্ফুটনে, সর্গ-বিশ্বাস ও বর্ণনায় দেশপ্রীতি এবং মানবতাবোধ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি আদর্শবাদ সৃষ্টি করেছে—যা কবির স্বজনীপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। মহাকাব্যের রূপ ও প্রকৃতি বিচারের ভার সাহিত্য-সমালোচকগণের হাতে রেখেও, আমি এটুকু কেবল বলতে পারি যে, জাতীয় গরিমায় ঐতিহ্যের বাহক ও হৃদয়োন্মাদক মহাকাব্যরূপে “জালালাবাদের যুদ্ধ” মহাকাব্যখানিও মহাকাব্যের আদর্শ অমূল্যসারী আদর্শ ক্লাসিক জাতীয় মহাকাব্য।

শুনতে পাই মহাকাব্যের যুগ গত হয়েছে—কিন্তু “জালালাবাদের যুদ্ধ” পাঠ করে মনে হয় যে, বাদ্যলীর অলিখিত জাতীয় মহাকাব্যরূপে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে ভাবময় করে জাতীয় স্বাধীনতার মহাসঙ্গীতরূপে বক্ষ্যমান কাব্যগ্রন্থ সার্থক হয়েছে। স্বদেশপ্রেমের কালজয়ী সঙ্গীত “জালালাবাদের যুদ্ধ” মহাকাব্যে উদাত্ত

মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে বলে এ সঙ্গীত হৃদয়ানুভূতিকে স্বদেশানুভূতির অভিযুখীন করে।

আলোচ্য মহাকাব্যে একাদশটি সর্গে ‘জালালাবাদের যুদ্ধের’ বিজয়-কথা পরিবেশিত হয়েছে। আলোচিত সর্গ সমূহের মধ্যে “অন্তরাগ”, “জালালাবাদের অগ্নিকাণ্ড” “পারাবত দূত” ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি জেনে অভিভূত, মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি যে, কবি মোট ছাব্বিশটি সর্গ রচনা করেছেন। মোট পংক্তি সংখ্যা ষোল হাজারের উপর। প্রত্যেকটি সর্গ কাব্যপ্রতিভাদীপ্ত ও অপূর্ণ।

কবিকে ব্যক্তিগতভাবে জানার সৌভাগ্য আমার দীর্ঘকালের স্মৃতিজড়িত। “জালালাবাদ যুদ্ধের” মত দেশ-প্রেমমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে মহাকাব্য রচনা করতে হলে যে সত্যনিষ্ঠা এবং দেশানুরাগ থাকা প্রয়োজন তা কবির হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আমি প্রথমত: ‘ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির’ (অধুনা লুপ্ত) পক্ষ থেকে এবং বঙ্গভাষা অনুরাগী হিসাবে আশা করি তাঁর মহাকাব্য “জালালাবাদের যুদ্ধ” দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে। সবার উর্দ্ধে স্বদেশ ধর্ম এবং মানবতা—“জালালাবাদের যুদ্ধ” গ্রন্থে সুরে ও স্বরকারে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মহাকাব্যের বিশালতায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখি যে, এক-একটি যুগসন্ধিক্ষণে এক-একটি মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। যুগের বাণী বহন করে মহাকাব্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, অবশ্য আমি সাহিত্য-শাস্ত্রী নই, নিছক রাজনৈতিক পন্থের পথিক, তবুও সাহিত্য-রস-পিপাসু হিসেবে বলতে পারি যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপন্থের কথা ও কাহিনীকে ঘিরে বিপ্লবীদের যে স্বাধীনতা-মিশন, ‘জালালাবাদের যুদ্ধ’ মহাকাব্যে তারই গৌরব-সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার পথ নিয়ে যে মানস-বিপ্লব ঘটেছিল—কবি বিপ্লবীদের সেই জীবনাদর্শের অগ্নি-স্বাক্ষরকেই যুগসন্ধিক্ষণের বাণীবহুরূপে উপস্থিত করেছেন। ইতিহাস-চৈতন্যের অন্তঃসলিল-ধারা এই মহাকাব্যে প্রবাহিত বলেই জাতীয় বৈপ্লবিক যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছন্দে-ছন্দে উদাত্ত-অমূল্য-ভঙ্গীতে

তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। খণ্ড কবিতা নদীর মত। মহাকাব্য মহাসাগরের বিশালতা নিয়ে বিস্তৃত। আমি মনে করি যে, কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যের রচনা Narrative poem নয়, ইহা সম্পূর্ণতঃ Epic। এই মহাকাব্যের সুউচ্চ আদর্শ, মহতী অম্লপ্রেরণা, গভীর হৃদয়াবেগ ও বীরব্রতের কাহিনী এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। মানবতাবাদ হচ্ছে এই কাব্যগ্রন্থের মূলমন্ত্র, জাতীয়তাবাদ মানব-সমষ্টি চিন্তা অতিমুখী। জালালাবাদের যুদ্ধের পেছনে সম্রাসবাদের শুল্লিঙ্গ আলোর ঝলকানি যে সৌম্যবদ্ধ দেশ জাতির জীবনে উদ্ভেজনা সৃষ্টির স্তম্ভ নয়, তা যে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের দিকে—স্বাধীনতার অধিকারদীপ্ত একটা নতুন জাতি সৃষ্টির তপস্বী—সেই সত্যটুকুই এই মহাকাব্যকে গুরুত্ব দান করেছে, চিরদিনের সম্পদে পরিণত করেছে।

মহানায়ক সূর্য্য সেন পররাজ্যগ্রাসীদের লুণ্ঠন ও স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, মুক্ত ও উদার। জীবনভর কারাগারে ও বাইরে ব্রিটিশ-নিপীড়নেও তিনি মাছুষের

জয়গান গেয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ‘ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক পার্টি’র যে সমাবেশ হয়েছিল তাঁদের মধ্যেই এই মহান ভাববাদ প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে হিংসা ও অহিংসা পথের তর্ক আজ অতীতের ইতিহাসের পাতায়। “জালালাবাদের যুদ্ধে” কবি কালজয়ী জাতীয়তাবাদমূলক আদর্শের সঙ্গে মানবতাবাদের অভিন্ন যোগসূত্র রচনা করে মহানায়ক সূর্য্য সেনের ধীরোদাত্ত চরিত্রকে ব্যঞ্জনাময় করেছেন।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রাম-বিপ্লব তথা চট্টগ্রাম স্বাধীনতার লুণ্ঠন একটি খণ্ড ঘটনা নয়। জালালাবাদের যুদ্ধে ব্রিটিশের ঐতিহাসিক পরাজয় ব্রিটিশ-শাসনের নৈতিক মানদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনে ‘জালালাবাদের যুদ্ধ’ ও চট্টগ্রাম বিপ্লব প্রেরণা প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। এর আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মশক্তি মুক্তি-সাধনার পথে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই পূর্ণাঙ্গ রূপের কাব্যমূর্তি দোঁধি বক্ষ্যমান মহাকাব্যে।

“প্রতিদিন মানুষ ক্ষুজ দীন একাকী—

কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ ; সেদিন  
সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ,  
সেদিন সে সমস্ত মানুষের শক্তি অনুভব  
করিয়া মহৎ।”

—রবীন্দ্রনাথ

উৎসব—আনন্দের দিনে

জুংখ—বেদনার দিনে

বাজালীর নিত্যসঙ্গী

ঢাকেশ্বরীর বজ্রসম্ভার

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস—৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬

১নং ও ২নং মিল—পূর্ব পাকিস্তান,

৩নং—আসানসোল, পশ্চিম বাংলা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্টস্—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু



# সাহিত্যিক

## ঐতিহাসিক আবিষ্কার :

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক-অধিকার সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুরের রায়-পল্লের নিকটে এক ভগ্ন প্রস্তর খিলানের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিষ্ণুমূর্তির এক দক্ষিণ করে বরনমুদ্রা এবং অপর তিনটি হস্তে গদা, চক্র এবং শঙ্খ, উপরে এক প্রস্থটিত পদ্মের উপর উপবিষ্ট ঘৃণিন্দ্র দেবী বার—এই কথিকে ভৃগুরাম মার্কণ্ডের বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ১০ম—১১শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার প্রচলিত স্থাপত্যকলার নিদর্শন বলিয়া অনুমানিত হয়।

## পরলোকে খগেন্দ্রনাথ মিত্র :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'রাস্তাঘাট লাইব্রেরী'-অধ্যাপক 'কে.এল.টি. অফ. আর্টস'-এর ডীন, 'রবিবাসর'-এর সর্বাব্যাক্ষ, শ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র গত ১১ই অক্টোবর

৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে পর্বলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার ধূলিয়ান গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দর্শনে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের অত্যন্ত কর্মধার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সহিতও তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভায়ও তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গালার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার অগণিত প্রামাণ্য সম্বন্ধ ছড়াইয়া আছে, যাহা আজও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার রচিত 'পদ্যসূত্র-মাধুরী' 'কীর্তন' 'নীলাধরী' 'মল্লান্ধা' 'বিবি বউ' 'হৃৎ-চুঃ' ও অন্যান্য বহু পুস্তক বাঙ্গলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশিষ্ট আসন চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। রায়বাহাদুর মিত্র অসংখ্য সাধক পুস্তক ছিলেন। তাঁর হৃৎচুঃ কণ্ঠের পদ্যবলী কীর্তন প্রোত্মমগৌ মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করিয়াছে। 'প্রবর্তক' পত্রিকা তথা প্রবর্তক-সম্পাদকও তিনি ছিলেন গুণমুগ্ধ হৃদয়। তাঁহার তিরোবানে বাঙ্গালীজাতি এমন একজন বিশিষ্ট মনীষীকে হারাইল যাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

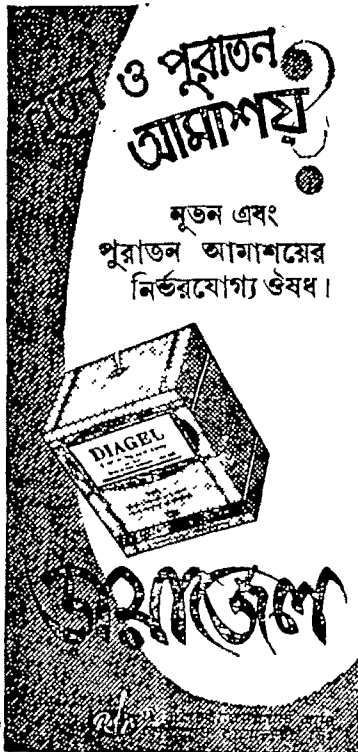
## ছান্দসিক কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ :

'প্রবর্তক'-এর নিয়মিত লেখক ও অমুদ্রাঙ্কিত হৃদয়, প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য গত মার্চ মাস হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে সরকারী ভাতা লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বর্তমান প্রচলিত কবিতা দ্বািত বাঙ্গলা-সাহিত্যে কবিতা লেখকের সংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে আবির্ভাব সত্ত্বেও হইয়া উঠিয়াছে তেমনি উজ্জ্বল। কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের বর্তমান বয়স ৭২ বৎসর; তিনি রবীন্দ্র-যুগের সামুদ্রিক-ছন্দাঙ্ক কবি। ভাষা ভাব ও ছন্দ বৈচিত্র্যে ইঁহার কবিতাগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করিত। ইঁহাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া সরকার যোগ্যের সমাদরই করিয়াছেন। কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘতরায় হইয়া জাতির কল্যাণে তাঁহার কাব্য-বীণার নব নব স্বর তুলিতে থাকুন, সর্বাস্তঃকরণে এই কামনা করি।

## উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী সম্মেলন :

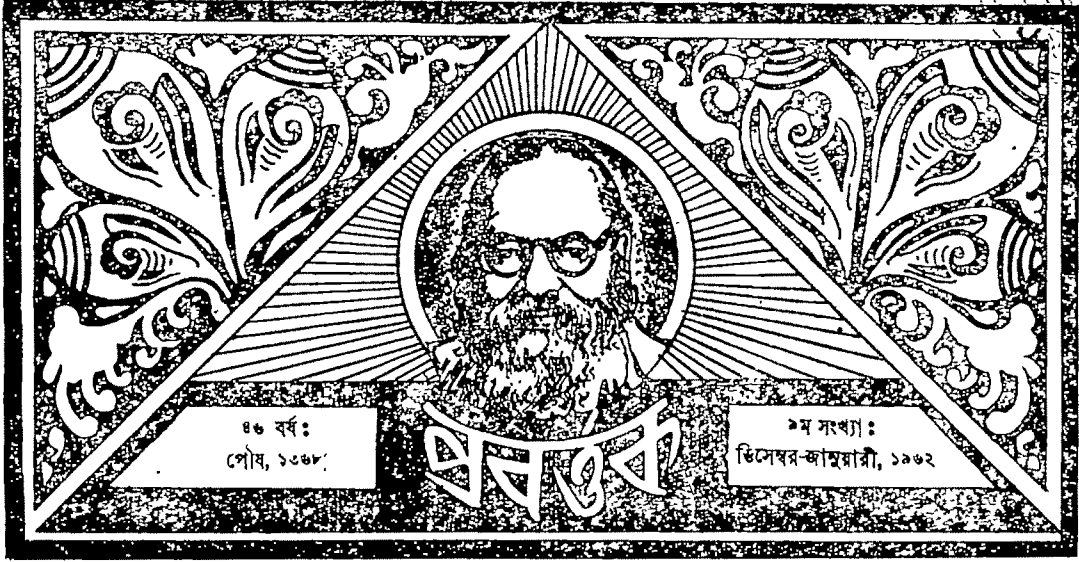
সম্প্রতি চুচুড়ার প্রসিদ্ধ 'ডাচ-ভিল' স্থানীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন দেশবন্ধু-স্মৃতি বিদ্যালয়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীচাক্রলাল মুখোপাধ্যায় এবং দেশবিশ্রুত শল্য-চিকিৎসক শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শ্রীমোক্ষচন্দ্র বোম্বাল খেরাল সঙ্গীতে ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সঙ্গিতে তাঁহাদের বিশেষ নৈপুণ্যের জন্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য



## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত  
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফস্টোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৬২১০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠকৃষ্ণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

‘আজ বর্ণাশ্রম নাই’, ‘আজ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় লোপ পেয়েছে’—এই সব বাহ্য দৃষ্টির কথা। মুখ্যতঃ এগুলি যাওয়ার নয়, কোন কারণেই যেতে পারে না। কেননা সত্য, অহিংসা, তপস্বী প্রভৃতি অন্তরের সাধনা—এইগুলি সন্দাচার—ইহা যাওয়ার বস্তু নহে। সন্দাচার পালনে আত্মচেতনা বিস্তৃত হয়, বর্ণবিশ্বাসকে জলন্ত বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন ক’রে তোলে, মনকে সংস্কারমুক্ত করে। তখন বাহ্যচার নিয়ে আর বন্দ থাকে না। তুমি ‘হরিজন’—তোমায় কে বাধা দেবে যদি তুমি ব্রাহ্ম মুহুর্তে শয্যা ত্যাগ ক’রে ভগবানের দিকে চেয়ে উদাস্ত কণ্ঠে উদ্গমন তোল ? কে তোমায় বাধা দেবে যদি তুমি হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন কর ? যদি শৌচ, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী হও ? কোন বিধান আছে কি, কোন শাসন আছে কি, যা তোমায় সং পথ হ’তে বিমুখ করতে পারে ? নাই। এই অগ্নিবিশ্বাস অন্তরে নিয়েই হিন্দু-ভারতকে জাগাতে হবে। বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু নহে—ইহা অভ্যাস করার বিষয়। অভ্যাসের দ্বারা দেহাত্ম-বোধ লোপ হ’লে এই সত্য উপলব্ধি হবে। দেহাত্মবোধ দূর করার উপায় তপস্বীকে নিত্য সঙ্গী করা। তপস্বীর আগুনে দেহচেতনা অগ্নিশুদ্ধ হ’লেই আত্মচেতন জাগ্রত হবে, বিশ্বাস মূর্তি নেবে। মূর্তিমান বিশ্বাসের মাঝেই প্রকৃত হিন্দুত্বের জাগরণ হবে। জাগরণের যুগে ভেদ নৈরাশ্রের হেতু নয়, কেননা স্বপ্ন হিন্দুত্ব অসংখ্য প্রকার ভেদদোষ-চুষ্ট। জাগ্রত জীবনে ভেদও মাথা তুলবে। ভেদের ভয়াল রূপ দেখে ভয় পেলে চলবে কেন ? তুমি বীর ! সহস্র সহস্র ভেদের মাঝেও তোমাকে ঐক্যের মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐক্যের পূজারী যারা তাদেরও একটা ভেদমূর্তি চক্ষের সম্মুখে রাখতে হবে। সাময়িকভাবে নয়, চিরদিন। কেন না, হিন্দুর পরম অভিযুক্তি একটা অথও ঐক্যবদ্ধ নিবিল হিন্দুকে নিজে কোন যুগে সম্ভব হবে না। একটা শক্তিশালী সংহতিই হিন্দুত্বকে শ্রেয়ঃ রূপ দেবে, হিন্দুর মহিমা রক্ষা করবে। সেই পরম দিনে যখন হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা উড়বে, তখন হিন্দুত্বের আবিষ্কার কর্তা কে—এ বন্দ থাকবে না। সেই জয়-পতাকাতলেই ভারতের নিখিল হিন্দুজাতি সমবেত হবে—এক সঙ্গে জয়মন্ত্র উচ্চারণ করবে। উষার নূতন আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে ‘দিন আগত ঐ’ ॥

(শ্রীশ্রীসত্যগুরুদেবের বাণী হ’তে সংকলিত)

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমঃ মণ্ডলঃ । ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং । ) দ্বিতীয়া ঋক্

( সম্ভবগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অঙ্কসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

জনাসো অগ্নিঃ দধিরে সহোবুধং হবিষ্যস্তো বিধেম তে ।

স স্বং নো অজ্ঞ স্মনা ইহাবিতা ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥ ২ ॥

অর্থ—“জনাসঃ” ( অহুষ্ঠাতৃজনসমূহ ) “সহোবুধং” ( বলবর্দ্ধনকারী ) “অগ্নিঃ” ( অগ্নিকে ) “দধিরে” ( ধারণ করিয়াছিলেন ) “হবিষ্যস্তঃ” ( হবিষ্যুক্ত ) [ আমরা ] “তে” ( সেই অগ্নিসমূহকে ) “বিধেম” ( পরিচরণ অর্থাৎ সেবা বা পূজা করিব ) “বাজেযু” ( অন্ন বিষয়ে ) “সন্ত্য” ( দানশীল ) “স স্বং” ( হে অগ্নিদেব আপনি ) “নঃ” ( আমাদের ) “অজ্ঞঃ” ( অজ্ঞ ) “ইহ” ( এই, যজ্ঞকর্মে ) “স্মনাঃ” ( স্মরণসমূহ হইয়া ) “অবিতা ভবাঃ” ( আমাদিগকে রক্ষা করুন ) ॥ ২

সরসার্থ—অহুষ্ঠাতৃজনসমূহ বলবর্দ্ধনকারী অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে অগ্নিদেব! আমরাও হবিষ্যুক্ত হইয়া আপনার পূজা করিব। অন্ন বিষয়ে দানশীল হে অগ্নিদেব আপনি আমাদের যজ্ঞকর্মে স্মরণসমূহ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিশদার্থ—বেদ মন্ত্ৰেই বেদের অনন্তর সৃষ্টি হয়। ঘোরগুরু কণ্ঠ ঋষি এই মন্ত্ৰের উদ্গাতা। তিনি বলিতেছেন, “জনাসো অগ্নিঃ দধিরে সহোবুধং হবিষ্যস্তো বিধেম তে”—অহুষ্ঠাতৃজনসমূহ যে অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন, আমরাও হবিষ্যুক্ত হইয়া সেই অগ্নিসমূহকেই অর্চনা করিব। সুতরাং যজ্ঞাগ্নি যে কবে এবং কাহাদের দ্বারা সর্বপ্রথম প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা শক্ত। দেবা যায়, যজ্ঞকর্মই ঋষিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম ছিল। এই কর্মের দ্বারা তাঁহারা নিজেরা যে শুধু ঐশ্বর্যবান হইতেন, তাহা নহে—তাঁহারা দেশকেও শস্ত্রশালিনী করিয়া তুলিতেন। তাই যজ্ঞকর্ম তাঁহাদের নিকট পরম পবিত্র কর্ম বলিয়া গণ্য হইত। এই কর্ম দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানও লাভ করিতেন। কর্ম অহুষ্ঠেয়, জ্ঞান কিন্তু অহুষ্ঠান নিরপেক্ষ। তথাপি বৈদিক ঋষিরা নিজের জীবনে একমাত্র যজ্ঞের মাধ্যমেই কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সমন্বয় সাধন করিয়া এক অভিনব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যজ্ঞের আরম্ভ কর্মে হইলেও পরিণতি কিন্তু জ্ঞানে। কর্ম যেমন ইহ ও অমৃত উভয়বিধ কর্মের ফল-দাতা, জ্ঞানও তদ্রূপ ঐহিক ও পারমার্থিক অথবা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়েরই জনক। জাগতিক জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যজ্ঞাগ্নিই “বাজেযু সন্ত্যঃ” অর্থাৎ অন্ন বিষয়ে দানশীল। যজ্ঞাগ্নি হইতেই ধূম উৎপন্ন হয়, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতেই ত্রীহি-যবাদি শস্ত্রের উৎপত্তি; সুতরাং অগ্নিই জীবের অন্নদাতা। অগ্নি আবার প্রাণের অভিমানী দেবতা। প্রাণ বিসৃজ্য না হইলে কর্মও দিব্য হয় না। দিব্য প্রাণের জাগরণেই দিব্য কর্মের সৃষ্টি। ভারতের ঋষি তত্ত্ববস্তুকে শুধু মস্তিষ্ককোষেই ধরিয়া রাখিতে চাহেন নাই—জীবনেও তাহা রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। ঋষি তাই এই অন্নদাতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রদাতা অগ্নিদেবতার স্তুতি করিতেছেন, তাঁর প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন ॥



# মহাভারতীয় যুগে দারিদ্র্য ভীতি

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., এইচ.-ডিপ্.-এড্. (ডাবলিন)

ত্যাগ, তিত্তিকা ও মহান আদর্শবাদের দেশ এই ভারতবর্ষ। এই দেশেই রাজার ছলল ভোগৈশ্বর্য ও জাগতিক সুখের মায়ী ত্যাগ করিয়া কৌণীনবস্ত্র হইয়া ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। যে অর্ধ আয়ে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, তাহাকে অনর্থ বলিয়া শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন প্রাজ্ঞেরা; কাজেই সাধারণের ধারণা হইতে পারে যে, দারিদ্র্যই এদেশের মহান আদর্শ, বিস্তার সহিত সমাজ-জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই এবং অর্থ অতি উপেক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু সত্যই তা নয়। পণ্ডিত বা আদর্শবাদীরা জীবনের চরম লক্ষ্যকে উপেক্ষা করিয়া, অর্থোপার্জনকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিতে বারণ করিয়াছেন— অর্থোপার্জনকে অবহেলা করিতে বা দারিদ্র্যকে বরণ করিতে কখনই বলেন নাই।

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মহাভারতের কথাই ধরা যাক; সেখানে আরণ্যক পর্বে দেখা যায়, একদা ধর্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্ঞান ও চরিত্রবল পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করেন, “মৃতঃ কথং জ্ঞাতং পুরুষঃ?”—কি করিয়া মানুষের মৃত্যু হয়! প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, “মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষঃ”—যে দরিদ্র সেই মৃত। এই একটিমাত্র বাক্যে সেই প্রাচীন কালে, মহাভারতের যুগেও যে দারিদ্র্যকে কত ভয়াবহ এবং সমাজ-জীবনে ইহাকে যে কতবড় অভিশাপ বলিয়া মনে করা হইত তাহার আভাস পাওয়া যায়।

আরণ্যক পর্বে আরও একটি গল্পে দেখা যায়, ইন্দ্র বক্রপী ধর্মকে একবার প্রশ্ন করেন—

শতং বর্ষসহস্রাণি যুনে জাতস্ত তেহনম

সমাখ্যাহি মম ব্রহ্মন্ কিং দুঃখং চিরজীবিনাম্ ॥

পৃথিবীতে যারা চিরজীবী, শত সহস্র বৎসর যারা বাঁচিয়া আছেন তাঁদের সব চেয়ে বড় দুঃখ কি?

উত্তরে বক বলেন,—

নাস্ত্যং দুঃখতরং কিঞ্চিৎ লোকেষু প্রতিভাতি মে।

অর্থবিহীন পুরুষঃ পঠৈঃ সম্পরিভূষতে ॥

আটো: দরিদ্রা: অবমতা কিং হু দুঃখতরং ততঃ।

লোকে বৈধর্ম্যমেতৎ তদুত্তরে বহু বিস্তরম্ ॥

হীনজ্ঞানাস্ত দৃষ্টান্তে ক্রিষ্টান্তে প্রাজ্ঞকোবিদাঃ ॥

বহুদুঃখ পরিক্রেশং মনুষ্যমিহ দৃষ্টতে ॥

অর্থহীন ব্যক্তি অগ্রকর্তৃক লাক্ষিত হয় ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ধনহীন ব্যক্তি ধনীর দ্বারা অপমানিত হয়, অজ্ঞ ব্যক্তির শ্রীবুদ্ধি লাভ করে, আর শুণী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কষ্ট পান ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই সমস্ত দুঃখ, পরিক্রেশং মনুষ্যমিহ বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতের অন্ত অংশে—উত্তরাংশ পর্বেও দারিদ্র্যের বিভীষিকাময় চিত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ দুর্ধোষনের রাজসভার শাস্তির প্রস্তাব লইয়া যখন আসেন, তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের একটি প্রধান সর্ভ ছিল যে, দারিদ্র্য ও অপমানসূচক কোন সর্ভে সন্ধি করিবেন না; কারণ দারিদ্র্যকে তিনি অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

ইতো দুঃখতরং কিম্ব যদহং মাতরং ততঃ।

সংবির্বাভুং ন শক্লামি মিত্রানাং বা জনান্দিন ॥

জনান্দিন, মাতা এবং বন্ধু-বান্ধবদের অশ্রের সংস্থান করিতে পারিতেছি না, ঐ অবস্থাতেও আমাকে সন্ধির বিষয় ভাবিতে হইবে। ঋষি সঙ্ঘেরও দারিদ্র্য সম্বন্ধে ঐ একই মত:

নাতঃ পাপীয়সীং কঙ্কিদবস্থাং শমরোহত্রবীং।

যত্র নৈবান্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃষ্টতে ॥

যে অবস্থায় মানুষের অন্ন-পরদিবসেও খাওয়ার সংস্থান থাকে না, সে অবস্থা অসহনীয়। তাই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

ধনমাহঃ পরং ধর্ম্য ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্

জীবন্তি ধনিনো লোকে মৃত্যুঃ যে স্বধনা নরাঃ ॥

অর্থই পরম ধর্ম বলিয়া খ্যাত, সমস্ত মানুষ ধনে প্রতিষ্ঠিত; পৃথিবীতে ধনী লোক জীবিত—সেই ধন বাদে নাই তারা মৃত। শুধু তাহাই নয়—

আপদেবাস্ত মরণং পুরুষস্ত গরীয়সী।

প্রিয়ো বিনাশস্ত্যাস্ত নিমিস্তং ধর্ম্যকাময়ো ॥

মানুষের হৃদয়গত অপেক্ষা মৃত্যু শেষঃ, কারণ মানুষ অর্থহীন হইলে জীবনও অর্থহীন হইয়া পড়ে।

দশম বা একাদশ শতাব্দীতে লিখিত ‘মহুক্তি কর্ণামৃত’ নামক কাব্য সংকলন গ্রন্থেও দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনার চিত্র কিছু কিছু দেখা যায়। এই সব কবিরা দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দশাকে দার্শনিক ঔদার্যের সহিত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এখানে এইরূপ একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া দারিদ্র্যের ধূসর চিত্র উদ্ঘাটন করিতেছি। শ্লোকটি করুণ, মর্মস্পর্শী অথচ কাব্যময় :

বৈরাগ্যক সমুদ্রতা তন্তুতন্তুঃ শীর্ণাশ্বরং বিজতি

ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কৃষ্ণভিষ্ণু শিশুভিত্তোক্তুং সেসভ্যার্থিতা

দীনা দুঃস্থকুটুম্বিনী পরিগলদবাস্পাঘু ধৌতাননা

প্যেকং তণ্ডুল মানকং দিন শতকং নেতুং সমাকাম্বতি।

অর্থাৎ বৈরাগ্যে (দারিদ্র্য হেতু) তাহার সমুদ্রত দেখে শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, ক্ষুধার শিশুদের চক্ষু কৃষ্ণগত এবং উদর বসিয়া গিয়াছে ; তাহারা আকুল হইয়া ধাত্ত

চাহিতেছে। দীনা দুঃস্থ গৃহিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এক মান তণ্ডুলে যেন তাহাদের একশত দিন চলিতে পারে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বর্তমান ভোগৈশ্বর্যময় যুগে অর্থের যেমন সমাদর, প্রাচীন মহাভারতের যুগেও অর্থের তেমনই সম্মান ছিল। সে যুগে কেহই

“হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান

দানিয়াছ তুমি মোরে ধুইয়ের সম্মান।”

এরূপ দুঃখ বিলাস করিতে পারে নাই। দারিদ্র্য কোন দিনই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতি সমস্ত সদগুণ দারিদ্র্যের কঠিন পাষাণে প্রতিহত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। তাই দারিদ্র্যের মহিমা কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অর্থ না থাকিলে সমাজে চিরদিনই মানুষকে—

“নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ

নহি আদর অহুবাঙ্গা।”

## মহাভারত

শ্রীঅনিলচন্দ্র চক্রবর্তী

আমার ভারতবর্ষ ধারে আমি যুগ হতে যুগ,—  
দেখিয়াছি বিশেষ বিশ্ব-রূপে।

অধ্যাত্ম সাধন দীপ্ত অলৌকিক শক্তি তপস্যার,—  
কোথায় সে প্রাণময়ী প্রজ্ঞাময়ী ভারত আমার ?

প্রভাত কুন্তল স্নিগ্ধ অরুণিত উদার গগণ,  
সাম স্তোত্র মন্ত্র উচ্চারণ,  
ওংকার মন্ত্রিত মুগ্ধ পবিত্র সে ভপোবন ঘিরে  
কোথা সে ভারতবর্ষ পুণ্যভোয়া সরস্বতী তীরে ?

সে মোর ভারতবর্ষ সভ্যতার দীপ্ত পূর্বাচল,  
বিকশিত দিক দিগঞ্চল।

প্রজ্ঞার প্রদীপ হাতে কল্যাণের দেখাইল পথ,  
মিলনের নাম গানে সে আমার গৈরিক ভারত।

কতশত অভ্যাসের অবিচার দুর্যোগ দুর্দিন,  
এ-ভারত বৃকে হলো লীন।  
নৃশংস উন্নত কত পশু শক্তি এ-ভারত বৃকে,  
নিঃশেষে মুছিয়া গেছে বিবেকের নির্মম চাবুকে।

ভুলি নাই শুল্কলিত ভারতের সংহত সংগ্রাম,  
কত যুদ্ধ কত আত্মদান।  
চণ্ড শক্তি নিষেধিয়া ভারতের অহিংস সংঘাত,  
লভিল বন্ধন মুক্তি,—জন্মগত জীবন আত্মদান।

আজ এ পুণ্য ভূমি কবন্ধের বর্বর নিগ্রহে,  
জীবনে তিলে তিলে দহে ;  
বেদনার গর্ভাশয়ে শত দেবকীর অশ্রুপাতে,  
জন্মিবে কি এ-ভারত অতীতের স্বপ্নের ভারতে ?

মোদের দৃষ্টির মাঝে হে ভারত দেখিতে কি পাও ?

চিন্ত কোথা হয়েছে উধাও ?

কোন সে অতীত স্বপ্নে ? চাকো চাকো আলোকে তোমার,  
অন্ধকারে যে ভারত আজো খোঁজে মুক্তির দুয়াব।



(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

স্বামীজী বললেন, আগে চাই পদ্ম নির্বাচন। পঞ্চটি হবে সুনির্বাচিত, সর্বজনগ্রাহ্য।

—আপনার আমার দেখান পথই যে সত্য পথ, তা প্রমাণ হবে কি করে?

—সেই প্রমাণ করাটাইতো নাশকত্ব। তাকেই বলে নেতৃত্ব। বাঙালীর প্রতি এদের শ্রদ্ধা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে অনেক উচু করে তুলেছে ভারতবাসীর কাছে, পৃথিবীর কাছে।

—আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতবর্ষ। ভারতীয় মনের এই ব্যাকগ্রাউণ্ডটিকে বুঝতে হবে। এখানে ফাঁকি চলবে না। সত্যিকারের আধ্যাত্মিক চেতনা যে না জাগাতে পেরেছে, জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর অখণ্ড বিশ্বাস, যার উপর স্থাপিত হয়নি, নেতৃত্ব তার ব্যর্থ হবে। তাইতো স্বামীজী দুদিনেই সারা দুনিয়াটাকে তোলপাড় করে তুলতে পেরেছিলেন। কম্যাণ্ড করতে কি সবাই পারে! আর এখানে তো শুধু একটা দল নয়, একটা মত নয়; কম্যাণ্ড করতে হবে একটা সম্পূর্ণ দেশকে, একটা জাগ্রত জাতিকে, যে জাতি অনেক দেখেছে, অনেক আঘাত খেয়ে সচেতন হয়েছে। এদের লিড করতে হলে শুধু বড় বড় কথাই চলবে না। মার্কস-মহাত্মার বাণী আওড়ালে ফল হবে না। এদের সামনে তুলে ধরতে হবে একটা মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ। তার জন্ত সাধনা চাই। চাই দেবতার অরূপণ রূপা। পণ্ডিতেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আজ সেই সাধনায় রত। মহাত্মার দক্ষিণ আফ্রিকা আন্দোলন থেকে সেই সুদৃশ্য সাধনার সূত্রপাত। হয়তো সূভাষচন্দ্রও আজ অজ্ঞাত-বাসে সেই সাধনাই করে চলেছেন। এমনি অসংখ্য মহাপ্রাণ মানব আজ বুঝতে পেরেছেন যে, শুধু অমুক বাদ

আর তমুক বাদের বুলি কপচে খবরের কাগজের কলেবর বাড়ান চগতে পারে, কিন্তু তাতে না আছে কল্যাণ, না আছে পরশাসন অবমানের কোন সূত্র সম্ভাবনা।

আবেগে উত্তেজনা স্বামীজীর চোখ দুটি চক্ চক্ করছে। মনে হচ্ছে এ চোখে যেন উনি প্রত্যক্ষ দর্শন করছেন ভারতেতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়।

নীরবতা ভঙ্গ করলুম আমি।

—যে পথের ইঙ্গিত আপনি দিচ্ছেন সেতো সাধারণের পথ নয়। ক্ষিপ্ত মাস্ আজ চায় বিপ্লব। আমাদের শক্তিটা তাদের কাছে দুর্বোধ্য। সহজে বোঝে তারা গায়ের জোর, অস্ত্রের জোর। তাই যুগান্তরের উল্লাসকর; কুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বারীন, বাবা যতীনের সাথে অরবিন্দ ঘোষকে এরা বোঝে। শ্রদ্ধাও করে। কিন্তু পণ্ডিতেরীর শ্রীঅরবিন্দ এদের কাছে দুর্বোধ্য। মহাত্মার কুইট ইণ্ডিয়া, লবণ আন্দোলনে এরা সাড়া দেয়, কিন্তু চরকার শক্তিটা ওদের বোঝান দায়। অসহযোগ এরা বোঝে, কিন্তু অহিংস-অসহযোগ অচল ওদের কাছে। বিপ্লবের ধ্বনি আর রক্তের মেশায় ওরা পাগল হতে পারে, কিন্তু প্রার্থনা সভায় ওরা স্তিমিত হয়ে আসে। দেশের এই অমিত প্রাণশক্তিকে অধ্যাত্মবাদের পথে মোড় ঘোরান কি সহজ হবে? সহজ হবে কি 'মা ফলেবু'র মর্মোপলব্ধি করান? আমাদেরতো মনে হয়, এই যে বহিমান বিপ্লব আজ সর্বত্র, একে উপেক্ষা করলে স্বরাজ লাভ বিলম্বিত হবে।

স্বামীজী দীর্ঘক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন—হ্যাঁ সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ আজ বহিমান। জেগেছে কৃষাণ, শ্রমিকের মনে বিদ্রোহ ধুমায়িত। সরকারী

কর্মচারীদের মনে অসন্তোষ। এমন কি পুলিশবাহিনীতেও অনেকের মধ্যে দেখেছি দেশাত্মবোধ।

—শুধু তাই নয়—আমি সংযোজন করলুম—অনেক বিদেশী শ্বেতচর্মীও আজ সমর্থন কবছেন এ আন্দোলন। বণিক-শাসন-সৌধের ভিত্তিতে আজ চিড় ধরেছে। সর্বোপরি চরম স্বযোগ, ওদেশের আকাশ আজ যুদ্ধের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন।

স্বামিজী সহাস্তে সমর্থন কবলেন। ই্যা, ঠিকই বলেছ। আজ হাওয়া বইছে অতুল। এইতো পাল তুলে দেবার শুভক্ষণ। কিন্তু দরিয়াতো উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল। চাই স্বদেশ কর্ণধার। তা না হলে মাঝ দরিয়ায় ঐ হাওয়াই প্রাতরগা করবে সবচেয়ে বেশী। এসময়ে উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে, বিচারে ভুল করে যদি এই স্বর্ণ স্বযোগ হারিয়ে ফেলি, অনন্তকাল আকসোষ করলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

থাক আজ এ প্রসঙ্গ। এসো আমার সাথে। দেখবে এতদিনে আমি কতটুকু করতে পেরেছি।

\* \* \*

আমাদের আবাসগৃহা থেকে প্রায় মাইল খানেক নানা ঝাঁক বাঁকা পথে ঘুরে পৌঁছলুম এসে আর একটি গৃহদ্বারে। আগাছা জঙ্গলে গৃহাশ্রয় প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। তবু দেখা যাচ্ছে একটি স্পষ্ট সূক্ষ্ম পদ-পথ। এ পথে অনেকে যাতায়াত করেছেন গৃহাভ্যন্তরে। কারা তারা? কী আছে এই গৃহায়?

কিহে বাঙালী বীর, ভয় পেলে না তো, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ঠিক ভয় না পেলেও, একটা উৎকণ্ঠিত কৌতুহল যে জ্বগেছিল মনে, তা সত্যি। যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে বল্লুম, এতদিনে এদিকটাতো বেধিনি।

শুধু চোখ থাকলেই সব কিছু দেখা যায় না। তীর্থদর্শন করতে হলে কত আয়োজন কত কৃচ্ছ সাধন করতে হয়। আর যদি দেখতে চাও সেই তীর্থদেবতাকে তাহলে ইহ বাহ্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

স্বামিজী হাসিটি রহস্যময়। উনি আদেশ করলেন অনুসরণ করতে, অথচ নিজের দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে।

আমি স্তব্ধাং লতাগুল্ম ঠেলে এগিয়ে পড়লুম। কয়েক পা এগিয়েই কিন্তু ধমকে দাঁড়াতে হ'ল। বিরাট এক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মত পথ আগলে আছে প্রকাণ্ড এক প্রস্তর খণ্ড।

স্বামিজী তখনও মুহূ হাসছেন। বুঝলুম কিছু রহস্য আছে নিশ্চয়। অনুসরণ না করে এগিয়ে যাওয়া অহুচিং হয়েছে।

—এ জানোয়ারটাকে সরাব কি করে! আমার মুখে অসহায় হাসি।

—যোগ বলে নয়, দেহের বলেই গুটা সরাতে হয়।

—সে কি!

সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। প্রকাণ্ড পাথরটার একটা বিশেষ কোণে পিঠ রেখে সামনের আর একটা পাথরে পা ঠেকিয়ে জোরে ধাক্কা দিতেই পিঠের পাথর সরে গিয়ে পথ দেখাল। এ যেন চিচিংফাকের ব্যাপার।

—শুধু দেহবল নয়। কক্ষিৎ কৌশলও রয়েছে দেখছি।

আমি কথা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করলুম।

—ই্যা কৌশলতো আছেই। 'কর্মযু কৌশলম্'।

পথতো দেখলুম, কিন্তু আগে আগে পা আর বাড়াচ্ছিলে।

সন্ন্যাসী অগ্রবর্তী, পশ্চাতে আমি। নীচের অন্ধকারটা যে একটা গা-ছম-ছম ভাব এনেছিল মনে তা অস্বীকার করব না। খানিক পরে অন্ধকারটা গা-সওয়া হয়ে এল। মনে হল, আরও কোন গাথে যেন আলো আসছে ভিতরে। ঘন হায়ে বসলে প্রায় শ'খানেক লোক বসতে পারে এমন একটা সমতল প্রাঙ্গণে পৌঁছে স্বামিজী দেশলাই জ্বাললেন। প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে একটা মশাল জ্বলে উঠল।

স্বামিজী তাকালেন আমার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে। আমি তাকালুম গুর হাত্তোজ্জ্বল মুখের দিকে।

—যে গুহা এতদিন দেখেছ তাকে বলি সাধন-মন্দির, এটাকে বলতে হয় কর্ম-মন্দির। এই আমার হেড কোয়ার্টারস্। যে প্রশ্ন এতদিন তোমার কৌতুহল জাগিয়েছে—আমি মাঝে মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাই—আজ তার উত্তর দেব। তার পূর্বে তাকাও ঐ

দেয়ালে। ঐ শপথ বাক্য পাঠ কর। আজ পর্যন্ত অদৃষ্ট নেতা কালিকিঙ্করের কাছে ঐ শপথ পাঠ করেছে প্রায় সত্তর হাজার ভারতীয় এবং ভারতের বাইরেও কয়েক হাজার। হাত রাখো আমার হাতে। ঐ মস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি আমি কালিকিঙ্করের প্রতিনিধি হয়ে এতদিন। আজ তোমার দীক্ষা।

এই হবে ছবর সিং-এর সেই সারা ভারতবাসী বিপ্লবীদল। কিন্তু স্বামীজী তো বিপ্লববাদী নন। শপথ বাক্যেও তো বিপ্লবনীতির কোন সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় সেই আগুন জ্বালার ইচ্ছিত। স্বামীজীর মুখে প্রথমদিন যে কথা শুনেছিলাম এতো তারই সংক্ষিপ্ত সার। কেন তবে বিপ্লবী বলা হয় এই সত্তর হাজারকে?

হাত রেখেছি স্বামিস্বির হাতে। মস্ত্রের মত এক একটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন স্বামীজী, আমিও পাঠ করছি সেই সাথে। শেষের কটি কথায় দেখলুম স্বামীজীর কণ্ঠে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা—“আজ থেকে আমার চিন্তা, আমার কর্ম, আমার প্রাণ সমর্পণ করলুম দেশমাতৃকার চরণে। আমি পবিত্র হলুম। আমি সেবক। আমি উৎসর্গীকৃত।”

আমার হাত কাঁপছে। কাঁপছে বুঝি আমার সর্বাঙ্গ। এ শপথ আমি রক্ষা করতে পারব কি? পারব কি আমি পবিত্র হতে? এতো বহির্বিপ্লব নয়, এ যে অন্তর্বিপ্লব। এ বিপ্লবের নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা আমার কোথায়!

আমি সভয়ে বল্লুম,—এ কাজ আমার নয়।

—ক্লীব স্ব পরিত্যাগ কর। স্বামীজীর কঠিন কণ্ঠ। এ কাজ তোমারই।

—আমি রাজনীতি বুঝি। রাজনৈতিক বিপ্লব বুঝি। কিন্তু এ যে...

—তাই বুঝি শপথ পাঠ করে নিরাশ হয়েছ। এতে নাই রক্তের কথা। নাই ধ্বংসের কথা।

—সত্যি তাই। পার্টির নাম বিপ্লবী সঙ্ঘ, অথচ ..

—বিপ্লব কথাটির মানে বুঝি শুধু রক্তের ছড়াছড়ি, অস্ত্রের বনবানি, আর নিষ্ঠুরতা। বিপ্লব মানে Riot নয়। বিপ্লব হল Revolution, আমূল পরিবর্তন সাধন। বর্তমান রাষ্ট্র-কাঠামোটা কি শুধু ভাঙতেই হবে? শুধু

ভাঙা? গড়ানয়? ভাঙতে হবে,—না না, নতুন করে গড়তে হবে সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমতা, সর্বোপরি খাঁটি মানুষ। পবিত্র দেশ সেবক। সেই মানুষ করাটাই শেষ কথা নয়, স্বাধীন রাষ্ট্রেও হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্বাধীনতা। তাই বিপ্লবাত্মক কর্মের আগে চাই বিপ্লব চিন্তার জগতে, মানসিক বিপ্লব। আগে আগুন জ্বলুক মনে। প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠুক চিন্তায় বিপ্লবী, কর্মে বিপ্লব তখন আপনিই দেখা দেবে। ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলে বৃষ্টিকে আর আহ্বান করে আনতে হয় না।

কিন্তু এতে তো সংশয় ঘোচেনা। প্রশ্ন থেকে যায়। তাই বল্লুম,—গীতার কুরুক্ষেত্রে যে বিপ্লবের ছবি পাই সেওতো রক্তের পথে বিনাশের ইচ্ছিত। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ বিপ্লবী। ‘বিনাশায় চ দুষ্কৃত্যম্’—দুষ্কৃত্যের বিনাশই তো বিপ্লবের নীতি, গীতার ধর্ম।

স্বামীজী হাসলেন। শুধু রক্তপাতই হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে! গীতার প্রথম স্লোকের প্রথম শব্দটাতে যে ইচ্ছিত রয়েছে তা ভেবে দেখেছ কোনদিন? কুরুক্ষেত্রে একটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়, ষাট ধর্মক্ষেত্র। কি সেই ধর্ম? যে ধর্ম অর্জুনের মানসিক প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতিই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। সে প্রস্তুতি যখন পূর্ণ হল, বিপ্লব সম্ভব হল তখনই। আগে কর্মের আদর্শটা ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া, তারপর বিচারবিহীন চিন্তে এগিয়ে যাওয়া। চিন্তায় অস্পষ্টতা থাকলে কর্মের ব্যর্থতা অনিবার্য।

—এই কর্মতত্ত্ব আজকের মানুষকে বোঝান সম্ভব হবে কি? যে সমাজ ব্যবস্থায়, যে পারিপার্শ্বিকে গীতা রচিত হয়েছিল তার আজ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সে যুগের নীতি এ যুগে প্রয়োগের প্রকাশে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশী। মহাত্মার ব্যর্থতাই তার প্রমাণ।

—গীতার উপদেশ অষ্টাদশ অঙ্কোহিণীর জন্ত নয়। শ্রোতা একা অর্জুন। কারণ নেতা দরকার একজনই। সেই একজনকেই জানতে হবে ঠিক পথটি। একজনকেই হতে হবে আদর্শ মানুষ। আদর্শের দেশ ভারতবর্ষ। একটা উচ্চ আদর্শ সামনে না থাকলে মানুষ আকুষ্ট হবে না। মানুষ তো চিরদিনই অন্ধ আবেগপ্রবণ। নেতার



চাই সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন ‘যার পেটে যা নয়’, অর্থাৎ যাকে দিয়ে যে কাজ হয় তাকে ঠিক সেই কাজে নিয়োগ। নেতার কাজ এই যথাযথ নিয়োগ। আজকের সংগ্রামে প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা আছে। নেতার কাজ Proper casting, যথাযথ ভূমিকা বণ্টন।

কে স্বামীজীর সেই স্বপ্নের নেতা জানিনা, কিন্তু আমি সহজকণ্ঠে বলি,—এই চল্লিশ কোটির কাষ্টিং প্রণালী করতেই যে একটা জীবন কেটে যাবে।

—তুমি কি সাহস পাচ্ছ না কালিকিঙ্কর।

—সাহসের কথা নয়, সম্ভাব্যতার কথা ভাবছি আমি।

—অসম্ভব কেন ভাবছ? দেশের মানুষগুলিকে ঠিক ঠিক চিনতে পারলে এ কাষ্টিং-এ সময় নেবেনা বেশী, ভুলও থাকবে কম। আমি অনেকটা করে কেলেছি।

—আপনি?

—হ্যাঁ। অনেক বৃহৎ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ঐ একটী মাত্র ভুলে। সে ভুল যাতে তোমারও না ঘটে। নেতা যে রাস্তাটি দেখে সেইটেকেই মনে করে সর্বজনীন। সবাইকে চালাতে চান সেই একই পথে। ফলে নেতার মতে যাদের মন নাড়া দিয়েছে তারাই এগিয়েছে। আর সব পিছন থেকে তাদের টেনে ধরেছে। “পশ্চাতে ফেলেছ যারে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে” কথাটা বৈজ্ঞানিক অর্থেই সত্য।

আমি সম্বোধ্যে বলি,—এদেশে যতটা মানুষ ততোটা মত। এতগুলি ভিন্নমুখী মনকে একমুখী প্রচেষ্টায় নিয়োগ করাতো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া সব মহৎ প্রচেষ্টায় দেখেছি একটা বিরোধী দল থাকে। তাদের বোঝাতে গেলে ভুল বোঝে বেশী। বিরোধ হয় তীব্রতর। সেক্ষেত্রে তাদের উপেক্ষা করা ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব। পিছুটানের ভয় করলে যে পিছিয়েই পড়তে হবে আমাদের।

—ভুল। স্বামীজির মুখে বেদনার ছায়া। একটু নীরব থেকে বহ্নেন—নেতার পরীক্ষা তো ঐখানেই। শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজন ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ, জ্ঞানকুটনৈতিক উপদেষ্টা। কেবল

ethical religion-এর বুলি আউড়ে আর gospel শুনিয়ে একটা জাতিকে চালনা করা যায় না। পাকা মাঝি উত্তরুরে হাওয়াতেও নোকো চালায় উত্তর দিকে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বলি—আমিতো তাই বলি, রাজনীতিতে কিঞ্চিৎ কুটনীতি, কিঞ্চিৎ ছলনা...

দৃঢ়কণ্ঠে স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন—ছলনা নয়, কৌশল। কর্মহু কৌশলম্। একটা সমাজে থাকে বিচিত্র মনের বিচিত্র মানুষ। একটা জাতিতে থাকে বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ। প্রতিটি শ্রেণীর আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেই শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তাদের কাজে লাগাতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা একটা ‘উটোপিয়া’। একটা বাতুলতা। ইতিহাস পাঠক মাত্রই স্বীকার করবে যে শ্রেণী মানুষে গড়ে না, শ্রেণী গড়ে ওঠে আপনিই মানুষের প্রয়োজনে।

—এ মহাসমুদ্রে আমি যে ক্রমেই দিশেহারা হয়ে পড়ছি। বুঝতে পারছি না আমার কর্মপন্থা।

—স্বাস্থ্যানং বিদ্ধি। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানো। সেই প্রজ্ঞার আলোই পথ দেখাবে। অপূর্ণ আত্মবোধ নিয়ে এগুতে গেলে পদে পদে বাধা দেবে সংশয়। তাইতো মহাত্মার জীবনটা একটা Tragedy নাটকের হিরোর মত। একটা প্রচণ্ড শক্তির মর্মান্তিক ভয়াবহ অপচয়। তিনি চেয়েছেন তাঁর আবিষ্কৃত সত্যকে পরীক্ষা করতে কখনও ‘মান্’-এর উপর দিয়ে, কখনও নিজের উপর দিয়ে। সর্ববে বলেছেন, ‘my life is an experiment with truth.’ তিনি চাচ্ছেন ধর্মনীতিকে রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে। একটা শাস্ত্র, আর একটা দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই দুই বিপরীতকে পিরীতি বন্ধনে মেলাবার চেষ্টায় experiment-এর কৌতুহল থাকতে পারে, কিন্তু সে experiment ব্যর্থ হবেই। ফল হবে শক্তির অমার্জনীয় অপচয়। নেতাকে জানতে হবে দুটোই পূর্ণভাবে, প্রয়োগ করতে হবে প্রয়োজনের মুহূর্তে যে কোন একটিকে। যেখানে যে-টি, যখন যে-টি, এই বিচারই নেতৃত্ব। আজকের লীগ নীতি কংগ্রেস নীতির চেয়ে অনেক স্পষ্ট। অনেক দৃঢ়। ওদের বাইরের আবরণটাই ধর্মের, কিন্তু ভিতরের আসল জিনিষটা নির্ভেজাল রাজনীতি। সেখানে ওরা অনমনীয়।

কংগ্রেসের ভিতরে বাইরে এথিক্স্ পলিটিক্স্—এ খিচুড়ী হয়ে আছে। এর না আছে একটা নির্দিষ্ট নীতি, না একজন চক্ষুমান নেতা। ধর্মের ধোঁয়ায় নেতার দৃষ্টি আজ আচ্ছন্ন। এর একটি অস্তরের, একটি বাইরের। অস্তরের জিনিষটাকে বাইরে আনাতেই যতো ভুল। মনে রেখো কালিকিষ্কর, ধর্ম-নেতার চেয়ে রাজনৈতিক-নেতার রাস্তা অনেক বেশী দুর্গম। নেতার আসনে বসে ধর্ম প্রচারটা হাঙ্গর। তাকে দেখাতে হবে কর্মের রাস্তা। ধর্মবীরের অভাব হবে না ভারতবর্ষে। অভাব আছে কর্মবীরের—কর্মযোগীর।

—আপনার এই কল্পলোকের কর্মবীর কবে অবতীর্ণ হবেন কে জানে। ততোদিন...

—যতোদিন না তাঁর আবির্ভাব হচ্ছে, ততোদিন লক্ষ্যে পৌছনও সম্ভব হবে না। তখনকো স্বাধীনতা হলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা একটা কল্পনার বস্তুর থেকে যাবে।

—কিন্তু ঘরের শত্রুই যে বিদেশী শত্রুকে ছাড়িয়ে চলেছে আজ। লীগের বিভেদ নীতি বিদেশী পোষকতায় পুষ্টতর হচ্ছে দিন দিন। তাতে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন সম্ভব হবে কবে?

স্বামীজি আমার কথা শুনেছেন বলেই মনে হল না। তিনি ঋষির গান্ধীর্ষ্য বলে চলেছেন—অথগু অবিতস্ত স্বাধীন ভারত। আকগানিস্থান থেকে বার্মা, হিমালয় থেকে কুমারীকা এক ভ্রশানালিটি। সকলের এক লক্ষ্য, এক প্রাণ। শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বাঙ্গীন। এই স্বাধীন ভারতই আমাদের end. তাবের কাহ্নসে চড়ে দীর্ঘযাত্রার শেষে যখন দেখা গেল ফল কিছুই হস্তগত হয়নি অথচ অপচয় হয়েছে অনেক শক্তি, তখন যদি কেউ খেদ করে বলেন, “The end cannot justify the means”—যে কৈফিয়তে আজ আর কেউ খুশি হবে না। আজকের নেতাকে তাই বুঝতে হবে অনেক, ভাবতে হবে তারও বেশী।

আজ ভাবছি সে যুগের সব্যসাচীর ছুই হাতে ছিল অজ্ঞান্কেপের সমান দক্ষতা। এ যুগের সব্যসাচীরও এক হাতে ধর্মনীতি, এক হাতে রাজনীতি নিয়ে সমান দক্ষতায় প্রয়োগের নির্দেশ শুনছি স্বামীজীর মুখে। তাছাড়াও এ সব্যসাচীর চাই সদাজাগ্রত মন, বুদ্ধি বিচার, বিবেক ও প্রাজ্ঞদৃষ্টি। কিন্তু কে সেই সব্যসাচী!

(ক্রমশঃ)

## এসো হে কেশব!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

মনের সবুজ রঙ ফিকে হ'য়ে আসে...  
খুঁজে নাহি মিলে আর জীবনের মিল;  
চোখে আজ সংশয়ের কালো ছায়া ভাসে,  
বাঁচার সরল-পন্থা হ'য়েছে জটিল।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনি দিকে দিকে,  
কালের ডঙ্কর বাজে ধরণীর বুকে;  
সর্বনাশা-প্রলয়ের বাণী যায় লিখে,  
কোন মহা-শিল্পী যেন প্রসন্ন-কোঁতুকে!

ঘরে ঘরে দ্রোপদীর রক্তনের স্থালী,  
অদ্ভাভাবে শুধু প'ড়ে রক্তন-শালায়;  
দুর্ভাগারা চোখে আজ ক্ষুধা-বহি আলি',  
দুয়ারে দাঁড়ায় এসে অন্ন-প্রত্যাশায়।

যতপতি কৃষ্ণ কোথা? দ্রোপদীর মিতা?  
দুর্ভাগার অভিষাপ কে করে মোচন?  
বুকে বুকে জ্বলে ধু ধু দারিদ্র্যের চিতা,  
কোথা সে চক্রধারী, কমল-লোচন?

দ্রোপদীরা করজোড়ে আঁধি মুদি' ডাকে,  
“কাঙালের হরি, কোথা? এসো ভগবান!  
ক্ষুধার্ত-দুর্ভাগা ঘারে, প'ড়েছি বিপাকে,  
এসো, এসো, নারায়ণ, রাখো, রাখো মান।”

কৃষ্ণের আসন আজ নাহি ট'লে আর,  
অগহায়া দ্রোপদীরা ভাসে আঁধি-নীরে;  
কংকাল-মিছিল তোলে দীর্ঘ-হাহাকার!  
স্বন্দর-জীবনে আজ মৃত্যু নামে ঘীরে।

পাপাচারী দুর্ধোদন হাসে ব্যাক হাসি,  
সর্বস্ব লুটিয়া নিল শকুনির পাশা;  
জড়সম গান্ধীবীর জৈব্য আজ নাশি',  
গীতা রচি' কে শুनावে তেজোময়ী ভাষা?

লোভাতুর দুর্ধোদন শুষে নিল সব,  
ধর্মোদয়ী চিতে আজ জেগে ওঠে ভয়;  
পাণ্ডব-সুহৃদ, কোথা? এসো, হে কেশব!  
পাণ্ডবেরা মাগে তব শুভ-অত্যাশয়।

# শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ  
(মাতৃকাক্ষম-প্রণব-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু)

সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম। মাতাঠাকুরাণী কত স্নেহ—দূরের সন্তানকে কাছে টানে। কালীপূজার দিন মায়ের ডাক আমার কানে পৌঁছলো। ভক্তিপ্রাণ মাতৃসন্তান, রাধারমণ (চৌধুরী) আশ্রমে এসে মায়ের ডাক শোনালেন—সঙ্ঘ জননীর বিরোভাব উৎসবে আমার চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রমে যেতে হবে। আমার শারীরিক দুর্বলতা ও বান্ধিকোর বাধা এসে মাঝে-মাঝে বিপত্তি ঘটানো। তাই তাঁকে ঠিক মতো কথা দিতে পারলুম না। মায়ের ওপর আত্মসমর্পণ করলুম। বললুম, মায়ের ইচ্ছে হ'লে হ'বে। রাধারমণের কাছ থেকে জবাব এলো, মায়ের ইচ্ছে হ'বেই।

পরে তারপ্রণব ব্রহ্মচারীর কাছে শুনলুম, পত্রও পেলুম—আমায় পৌরোহিত্য করতে হ'বে এলা পৌষ রবিবারে।

ডাক্তাররা মোটর কিংবা ট্রেনে যাওয়া নিষেধ করলেন। বক্তৃতা একেবারে বন্ধ। যাওয়া চলবে না। রাধারমণ ফের আশ্রমে এলেন। আবার অসুস্থরোধ। আবার আমার উত্তর, মায়ের ইচ্ছে হ'লে...। রাধারমণেরও জবাব—মায়ের ইচ্ছে হ'বেই।

সেই রাতে পূজায় বসে দেখলুম, মাতৃকাক্ষমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীদেবীশক্তিমা তা আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। পরমুহুর্তেই দেখলুম, সেই জাগরণ শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীও দাঁড়িয়ে।

পরের দিন সকাল।

আমি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়লুম। ডাক্তাররা দেখলেন। হাই প্রেসার। যাওয়া বিষ্ণি। তাঁরা আমাকে যেতে দিতে নারাজ। কিন্তু আমার ভেতরের বাণী খালি শোনাতে লাগলো—যেতে হ'বেই। আমি উঠে বসলুম। জোর গলায় বললুম, যাবোই—এ মায়ের ডাক।

আশ্রম উক্তবৃন্দের কতক উৎক্লম্ব হ'য়ে উঠলো। অপর কতক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীকে প্রবর্তক সঙ্ঘ গিয়ে আমার ভাষণ পাঠ করে আসতে রাজী করালো। আমায় অসুস্থরোধ করে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা করালো। কারণ, তাদের ইচ্ছে—আমি যাতে না যাই।

আশ্রমীদের পেড়াপিড়িতে আমি মাকে চিন্তা করতে লাগলুম—মা! তুমি এ সমস্তার সমাধান কর। আমি কিছু জানিনে।

মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান। তাই মা ছেলেদের সংগে খেলা করবার ক্ষমতা আমাকে বলাতে লাগলেন। আমি দেখলুম, আমি চলে গেছি প্রবর্তক সঙ্ঘে। সেখানে শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী আমায় কোলে ক'রে নিয়ে বসে আছেন। আমি যেন পরম নিশ্চিন্ত।

আমি কেন বলছি, কি বলছি তা' বুঝতে পারছি নে। সবই যেন অগোচরে হ'য়ে যাচ্ছে। অন্যায়সে যা আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে—মা যা বলাচ্ছেন—সবই শুনতে পাচ্ছি। আমার জীবনে এ এক অপূর্ব অমৃতভূতি! স্বর্গীয় ক্ষণ! মাতৃআশীর্বাদে ধন্য আমি।

জগজ্জননী আত্মশক্তি সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তাঁর মহিমা, তাঁর লীলা যুগে-যুগে মানুষের হৃদয়-রাজ্যকে তোলপাড় কোরে তোলে। পুরোণো সংস্কারের বাধ ভেঙে নতুন ক'রে গড়ে তোলে। শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী মাতাঠাকুরাণীর মাধ্যমে সেই বিশ্বমায়ের লীলা খেলে গেছলো। তিনি প্রকট হয়েছিলেন সঙ্ঘ-মাতারূপে। তাঁর মাতৃত্বশক্তি বিশ্ব-সন্তানের প্রাণে-প্রাণে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন ক'রে, সবপ্রাণে মাতৃত্বদ্বা ঢেলে দেবে।

ভগবদশক্তি ভগবান মতিলালের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিলো, তাই তিনি আত্মশক্তির প্রতীক শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীকে শক্তিরূপে পেয়েছিলেন। স্থলে দেহে—আকারে যিনি ছিলেন আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে, তিনিই স্থানে—দেহলয়ে—তিরোভাবে সর্বরূপিনী বিশ্বজননী হ'য়ে র'য়েছেন। চিরদিন হ'য়েও থাকবেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। তিনি তাঁর বিশ্বব্যাপী সন্তানদের প্রাণে প্রেমমিলন জাগিয়ে তুলুন। তাদের মধ্যে মহাশক্তিতে প্রকাশ হোন।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তন্যৈ নমস্তন্যৈ নমস্তন্যৈ নমোঃ নমঃ।

জয় ভগবতী রাধারাণী দেবীজী কী জয়।

জয় ভগবান মতিলালজী কী জয়।

# শ্রীশ্রীসম্ভজননী

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ

— মা তো নিত্যা—তঁার আবার আবির্ভাবই বা কি, তিরোভাবই বা কি? নিতৌব সা জগন্মূর্ত্তি—বিরাট এই মায়ের রূপ। আকাশের চন্দ্র-স্বর্ষ মায়ের অক্ষিগোলক; দিগ্‌বলয়ের সীমাহীন নীল-নীলিমা মায়ের গায়ের বর্ণ; মহোদধি মায়ের উদর। বিরাট বিশ্বের প্রকাশধর্মী বা? কিছু সবই মায়ের বিভূতি—যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা—সর্বভূতে আদিত্যতা মা-ই বিরাজমানা। তবে আধারাত্ম্যমায়ী মায়ের বিকাশের তারতম্য ঘটে। যেমন স্বর্ণ কলসে স্বর্ষ্য রশ্মির ঔজ্জ্বল্য আর মৃৎপাত্র—তেমনই এই মাতৃশক্তি প্রতিমার মধ্যে প্রকাশমানা হলেও, আধার অমুখ্যায়ীই তার তারতম্য। সম্ভজননী দেবী রাধারাণীও নিরাকারা বিশ্বমায়েই সাকারা মূর্ত্তি। সাধারণ জীবন কি ভাবে অসাধারণ জীবনে রূপান্তরিত হয়, সম্ভজননীর জীবনীতে তার দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

সম্ভজননী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবীর পিতামহ চন্দ্রনগরেরই অদূরে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, চুঁচুঁড়া নামক নগরীতে সর্বপ্রথম সপুত্রপরিবার নিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতামহের নাম ৬১বদ্যনাথ সিংহরায়। ইনি ময়ানপুরী ছেজী নামে পরিচিত! ইহার চৌহান ঠাকুর—ইহাদের আদিবাস উত্তর পশ্চিম প্রদেশে। কি কারণে যে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, ‘জীবন-সঙ্গিনী’ গ্রন্থ থেকে তা জানা যায় না। তবে তাঁর আগমন-কাল সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করা যায়। চুঁচুঁড়ায় “গোরাবারিক” (পুলিশ ব্যারাক) নির্মাণ ইংরাজদের এক প্রখ্যাত কীর্ত্তি—যে সময়ে এই ব্যারাকটি নির্মিত হচ্ছিল, সেই সময়েই ৬১বদ্যনাথ সিংহরায় চুঁচুঁড়ায় ঐ গোরাবারিকেরই সন্নিকটে গৃহনির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীর কর্মও গ্রহণ করেন। সে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের কথা। ৬১বদ্যনাথ সিংহরায় যে খাঁটি হিন্দুস্থানী ভাবাপন্ন ছিলেন, তা তাঁর পুত্রকল্যাণের নামের পরিচয়েই জানা যায়। পুত্রের নাম—চুনিলাল, মতিলাল, ব্রজলাল ও

হরিলাল এবং কল্যাণের নাম চুয়া, চন্দন, আতর, গোলাপ ও বলাকা।

৬১বদ্যনাথ সিংহরায়ের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হরিলাল। পুত্রবধু কামিনী দেবী। ইহাদেরই তিন পুত্রের পরে প্রথমা কল্যা সম্ভজননী—শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী। বাংলা ১২২৬ সালের ৬ই আষাঢ়, বুধবার, শুভ কল্যারানীতে, ধল লগ্নে সম্ভজননী জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার মাটিতে এই পশ্চিমা রমণীর জন্ম ভবিষ্যৎ বাংলার বাঙ্গালী জীবনে কি মহনীর সার্থকতা আনয়ন করবে, ভবিষ্যতের বাঙ্গালীই তা নির্ণয় করবে। আজ তার স্মৃচনা মাত্র।

পূজ্যপাদ সম্ভগুরুদেবের পূর্বপুরুষ অষোধ্যার অধিবাসী—শ্রীরাঘচন্দ্রের দেশের লোক। ইহার দেবী রাধার বংশধর—ইহারও চৌহান ঠাকুর। সম্ভজননী ও সম্ভগুরুদেবের গোত্র একই। তখন বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প—তাই সমগোত্রজ হলেও, সুপাত্র বিবেচনায় স্নেহময়ী মাতামহী-ই ৯ বৎসর বয়স্কা আদরিণী দৌহিত্রেয়ীকে ১৬ বৎসরের এক শ্রিয়দর্শন কিশোর কুমারের হস্তে সমর্পণ করেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী যেমন ভারতের আদর্শ রমণী, তেমনই বাংলার আদর্শ রমণী বলতে দক্ষিণেশ্বরের সারদা-মা, গৌরী-মা প্রভৃতির স্তায় মাতা রাধারাণী দেবীও অস্বতম। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, বৃন্দাবন যেমন ভারতের তীর্থ, তেমনই নাম্নুর, হালিসহর, কেন্দুবিষ, দক্ষিণেশ্বর বাংলার তীর্থ—চন্দ্রনগরও বাংলার অস্বতম তীর্থভূমি। প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্রোক, ভট্টপল্লীর পরম পূজ্য পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় সম্ভজননীর শ্রাদ্ধবাসরে যে বাণী ঘোষণা করেছিলেন, সেই বাণীরই অন্তর্ভুক্তি করে বলছি—যে মাটির বুকে মতীর মেহ অল্পপরমাণু হয়ে মিশে যায়, সে মাটির প্রতি ধূলিকণা হয় পরম পবিত্র—সে স্থান হয় তীর্থভূমি—তাই বলছি, নাম্নুর, কেন্দুবিষ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বরের মত চন্দ্রনগরও তীর্থক্ষেত্র—বাংলার নিজস্ব সাধনপীঠ—সিদ্ধভূমি।

# স্পিরিচুয়ালিজম্

শ্রীনিহারঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

আমার পিতৃদেব স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুরাতন লেখা খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে তাঁহার পুরাতন একখানি ডাইরী পাইলাম। তাঁহার উক্ত ডাইরীর ১৯০৪ সনের ৫ই ও ৬ই অক্টোবরের পাতা দুইটা বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উক্ত পাতা দুইটির বিষয় আমি সকলকে জানাইতে প্রলুব্ধ হইয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি প্রথমতঃ ৫ই অক্টোবরের ডাইরীর পাতাটির অবিকল নকল নিয়ে দিতেছি।

৫ই অক্টোবর ১৯০৪

“আজ সন্ধ্যার সময় আমি ও রবিবাবু জগদীশ বাবু (ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু) বাসায় উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার ওয়ালেসের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া কথা হইল। জগদীশ বসু বলিলেন, যাহা চক্ষে দেখা যায় না তেমন বস্তুরও ফটো উঠিতে পারে। তিনি বললেন, যদি কোন একটা জিনিষ অর্থাৎ তারি জিনিষ শূন্যে উঠে তবে আমি খুব আশ্চর্য্যাব্বিত হইব। আমি কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি গোবিন্দের হাত ছড়িয়া যাওয়ার কথা ও চিরুন্না না থাকার কথা বলিলাম। চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিংকার

ও গর্জনের কথা বলিলাম। অব্যোমনাথের অপস্মার, গোস্বামী মহাশয়ের চিঠির নীচে “তোমার সেই” সহি করার কথা বলিলাম। ডাক্তারবাবু এই কথা বলিলেন যে আমাদের কার্য্যেব সঙ্গে তাঁহার সহায়ভূতি আছে এবং প্রেততত্ত্ব যদি সত্যই ইউরোপে কিম্বা আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে তবে ভারতবর্ষে না হওয়ায় কোন কারণ নাই, বরঞ্চ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। তিনি আরও বলিলেন যে আমাদের কার্য্যে যখনই বিশেষ কিছু হইবে, তাহাই তিনি দেখিবেন ও পরীক্ষা করিবেন।”

উপরোক্ত লেখাটি এতই সংক্ষেপে লেখা আছে যে উহা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া না দিলে সাধারণের পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন হইবে তজ্জন্ম আমি বিশেষভাবে একটা একটা করিয়া বিষয় উল্লেখ করিতেছি যাহাতে সকলের সমস্ত বিষয়টি বুঝিতে একটুও অসুবিধা না হয়।

প্রথমতঃ লেখা আছে “আমি ও রবিবাবু জগদীশ বসু (ডাক্তার জগদীশ বসু) বাড়ী উপস্থিত হইলাম। ডাঃ ওয়ালেসের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া কথা হইল।”

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এই ভাগিরথীর উপকূলে, আশ্রমের তপোভূমিতে যে সতীমায়ের মহাসমাধিক্ষেত্র রচিত হল—তাঁর তপস্তার, তাঁর পুণ্যের, তাঁর ত্যাগের কি তুলনা আছে! ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে পশ্চিমা দম্পতি ভারতের বুক থেকে যে কোন কারণেই হোক উৎপাটিত হয়ে বাংলার বুক আসন পেতে বসেছিলেন, ঠিক এক শতাব্দী পরে আজ থেকে ৩২ বৎসর আগে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সেই পশ্চিমা বক্তৃদ্ধারী খাঁটি বাঙ্গালী রক্তে রূপান্তরিত হয়ে বাংলার বুক বে স্মৃতি-মৌধ রচনা করে গেল, তা বাংলার নিজস্ব সম্পদ, বাংলার নব তীর্থভূমি, মাতৃসাধক বাঙ্গালীর আদর্শ ও ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক, জীবন্ত বিগ্রহ। এই মাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলেও, মানস প্রত্যক্ষে এই মৃণ্ময়ী মাতৃমূর্তির চিন্ময়ী

মহিম মূর্তি আমার অন্তরে সদা জাগ্রত। কারণ আমিও মাতৃসাধক, মাতৃভক্ত সন্তান। সন্তানের শ্রদ্ধা নিয়ে পূজ্যপাদ সজ্জগুরুদেবের নিকটে অতি অল্প কালের জন্ম হ’লেও যখনই উপস্থিত হয়েছি, উপচিত স্নেহে তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন—তাঁর মধ্যে যুগপৎ মাতৃত্বের এবং পিতৃত্বের ঐক্যমূর্তি সন্দর্শন করেছি—গুরুমধ্যে স্থিতা মাতা, মাতৃমধ্যে স্থিত গুরুঃ:.....” মস্তের মূর্ত রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। মা যে নিত্য, তাঁর যে আবর্তিতাবও নেই, তিরোভাবও নেই—এ অম্লভূতিসিদ্ধ বাণী। আজ তিরোভাবোৎসব হ’লেও, আমি সেই শাশ্বতী সনাতনী, চিরন্তনী মাতৃপ্রতিমার চরণেই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

এখানে সকলের জানা দরকার ডাঃ ওয়ালেসকে এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাহার মতামতাদি? এ বিষয় একটু পরে জানাইতেছি।

প্রথমেই এই সম্পর্কে পিতৃদেব সম্বন্ধে একটু জানাইতেছি। আমার পিতৃদেব যৌবন কাল হইতেই প্রেত-চর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত প্রেততত্ত্ব লইয়া গবেষণা করেন।

যৌবনে বরিশালে তিনি কোনও ব্যক্তিকে মেস-মারাইজ্ করিয়া মিডিয়ম করেন। সেই মিডিয়ামের উপর প্রেত আত্মা আনয়নে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। বরিশালে মেসমেরিজম্ সম্বন্ধে যা অল্প ঘটনা হইয়াছিল তিনি তাহা “আশাপ্রদীপ” শীর্ষক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিদ্র ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে এই সব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। উপরোক্ত ডাইরীতে লিখিত সব ঘটনাই আশাপ্রদীপে প্রদত্ত ঘটনা।

ডাঃ ওয়ালেস একজন প্রধান প্রেততত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি ইউরোপবাসী কি আমেরিকাবাসী ঠিক মনে নাই। তিনি প্রেততত্ত্ব বিষয়ে বহু গবেষণা করেন। স্পিরিচুয়ালিজম্ (প্রেততত্ত্ব) সম্বন্ধে তাঁহার একখানি বড় বই আছে, উহা পিতৃদেব শেষ জীবনে সর্বদা পড়িতেন। বইখানার নাম বোধহয় “Life after death.” নামটা ঠিক মনে নাই। এবং কাহারও নিকট হইতে ঠিক সম্ভান পাইতেছি না। গ্রামাঞ্চাল লাইব্রেরীতে খোঁজ করিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, একজন জীবিত ব্যক্তির ফটো লওয়ার সময় তাঁহার মৃত আত্মীয়া জুলিয়ার ফটোও তাহার পার্শ্বে উঠিয়াছিল।

যাহাকে চর্খচক্ষে দেখা যায় না তাহার ফটো সম্ভব কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতেই পিতৃদেব রবিবাবুকে লইয়া ডাঃ বস্তু নিকট গিয়াছিলেন। কারণ ডাঃ বস্তুই আমাদের দেশে এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ অথরিটি (Authority)। ডাঃ বস্তু বলিয়াছিলেন যে, যাহা চ’খে দেখা যায় না তেমন বস্তুও ফটো উঠিতে পারে।

পিতৃদেবের মেসমারিজমের অদ্ভুত শক্তি হইয়াছিল।

তাহার উপর তাঁহার গুরুদেব, খ্রীষ্টীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির বিশেষ কৃপায় “ইচ্ছাশক্তি” লাভ করিয়াছিলেন। এবং এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি বহু কঠিন রোগী একমুহুর্তে নিরোগ করিয়াছেন। এমনকি হাজারিবাগের এক বিশিষ্ট তদ্রব্যক্তির গলিত কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল তাঁহাকেও তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা মুখ, চোখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তিনি একসময় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ন মহাশয়ের চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যতক্ষণ পিতৃদেব চোখ খুলিতে অস্বমতি না দিয়াছেন, ততক্ষণ তিনি শতচেষ্টা করিয়াও চোখ খুলিতে পারেন নাই।

জগদীশ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে পিতৃদেব কি কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ গোবিন্দের হাত ছড়িয়া যাওয়া এবং কিছু-মাত্র চিহ্ন না থাকার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দিলাম।—

একদিন এমন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, আমরা দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম। অনেকদিন পরে একদা আমরা গোবিন্দকে মেসমারাইজ্ করিয়া আত্মা আহ্বান করিলাম। কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ামের অভ্যন্তর যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং বহুঠকারের অবস্থায় কিছুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে চৌকী হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহাতে নানাস্থানে লাগিয়া হাতের উপরের প্রায় চারি আঙ্গুল দীর্ঘ এবং এক আঙ্গুল পরিসর স্থানে চামড়াটা উঠিয়া গিয়াছিল এবং একটা কাঁটা বা তদ্রূপ অল্প কিছুতে আঁচড় লাগিলে যেরূপ হয় মিডিয়ামের পেটের উপর অস্থান আঁচড় আঙ্গুল সেইরূপ দাগ হইয়াছিল। দাগটা লাল রক্তমুখ ছিল, এবং অজস্র রক্ত পড়িতেছিল। আমরা একটা শ্রাকড়া দিয়া উহা পুছিলাম কিন্তু শ্রাকড়াটা রক্তে ভিজিয়া গেল, উহা চৌকীর নীচে এক পার্শ্বে রাখা হইল। আমরা জানিতাম, আজি চৈতন্তের পর মিডিয়াম নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। বেচারীর জন্ত আমাদের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল এবং আত্মা গমন করিবার পূর্বে আমাদের সকলেই তাঁহার নিকট মিডিয়াম যে আঘাত পাইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া কষ্ট না হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, “ও সব কিছু থাকিবে না।” এই বলিয়া

আত্মা প্রশ্রয় করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে অত্রাঙ্ক দিনের মতন আজিও গোবিন্দের বেদনাবোধ থাকিবে না, কারণ পূর্বে একদিন কপালে ধুব আঘাত লাগিয়া কপাল ফুলিয়াছিল, তবুও ঐরূপ কথাব পব চৈতন্য হইলে গোবিন্দ কিছুই বেদনা অনুভব করিতে পারে নাই এবং সময়ান্তবে আয়নায় মুখ দেখিতে যাইয়া তাহার কপাল ফোলায় প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ যে ব্যাপার হইল তাহা অতি আশ্চর্য্য। ঐরূপ কথাবার্তার পর দশ কি পনের মিনিটের মধ্যেই মিডিয়ামের চৈতন্য হইল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া আমরা তাহার হাত ও পেটের দিকে চাহিলাম, কিন্তু সকলেই যুগপৎ বিশ্বয়েব সহিত দেখিলাম, তাহাব শরীরে চিরুমাত্র নাই, এমনকি কখনও যে ঐরূপ লাগিয়াছিল তাহার কোনরূপ অনুমান করাও উপায় ছিল না। অথচ সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, হাতের আঁচড় শুকাইতে ৩৪ দিন লাগিবে এবং শুকাইলেও ১০।১৫ দিন তাহার দাগ অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু এ কি ব্যাপার হইল! আমরা সেখানে ৭ জন লোক ছিলাম, আমাদের কেহই বালক বা বৃদ্ধ নহে। এমনত অবস্থায় আমাদের বিশেষ লক্ষ্য বিষয়ে ঐরূপ চক্ষুবিভ্রম জন্মিবে তাহা কখনই সম্ভবপন নয়। সেই বক্তৃতাখানো নেকডাটা তখনও বর্তমান।

দ্বিতীয় বিষয়—চন্দ্রনাথ সেন মণ্ডারের চিংকার ও গর্জনের কথা; উহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দিলাম—

আর একদিন আমরা এই প্রকার গোবিন্দকে যেস-মাবাইজ করিয়া তাহার উপর আত্মা আনয়ন করিয়াছি। পূর্বোক্ত আত্মা মহাশয়ের আবির্ভাব অনুভব কবিত্তেছি। সঙ্গীতাদি হইতেছে এবং তাহাতে যেরূপ লক্ষণাদি হয় তাহাও হইতেছে, কিন্তু কথা প্রায়ই কহিতেছেন না। এক একবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। এখানকারই একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, চন্দ্রনাথ সেন মহাশয় চরিত্রগুণে বরিশাল সর্বস্ব সমস্ত লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। আজ তিনি প্রথম দেখিতে আসিয়াছেন। সমস্ত ঘটনাস্থলিই তাঁহাব কেমন কেমন লাগিতেছে। আমাদেরিগকে অবিশ্বাস করেন না বলিয়া এখনও বলিয়া আছেন, নতুবা হয়ত জুয়াচুরি মনে

করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি বলিলেন, “মহাশয় যদি আমার উপর ভূত আনিতে পারেন তবে বিশ্বাস করিতে পারি।” আমি বলিলাম, “চেষ্টা করিতে পারি, আমি আপনাকে মুক্ত করিতে হয়ত পারিব, কিন্তু আত্মা আনয়নের আমাদের অধিকার এই পর্য্যন্ত যে সেজন্ত আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা মাত্র করিতে পারি।” তিনি পরীক্ষা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলে আমি তাহাকে লইয়া অল্প একটা পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমার সঙ্গে অনেকে সেখানে গেলেন, কেবল ২।১ জন পূর্বোক্ত মিডিয়ামের কাছে রহিলেন। কথা বলেন না বলিয়া আজ তাঁহার নিকট কাহারও থাকিবার ইচ্ছা ছিল না।

আমি উক্ত শিক্ষক মহাশয়কে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাঁহার চক্ষু প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পূর্বোক্ত মিডিয়াম আপনা আপনি “ভাল হবে না, ভাল হবে না” বলিয়া টেঁচাইয়া উঠিল। আমরা শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শত চেষ্টা করিয়াও যাহাকে কথা বলান যায় নাই সে আপনি চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছে। কারণ জানিবার জন্ত আমরা শিক্ষক মহাশয়কে এই অর্ধমুগ্ধ অবস্থায় রাখিয়া সকলেই উঠিয়া মিডিয়ামের নিকট গেলাম এক, জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কি বলিতেছেন?”

আবার মিডিয়াম বলিল, “ভাল হবে না।”

প্রশ্ন—কি হইবে? উঃ—অনিষ্ট হইবে। প্রশ্ন—কাহার অনিষ্ট হইবে? আপনাব কি আমাদের? উঃ—আমার কি অনিষ্ট!

প্রঃ—তবে কি আমাদের? উঃ—হইতে পারে।

এই সময় আমি একটু ভুল বুঝিলাম। আমি মনে করিলাম, ইহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আমরা সকলে চলিয়া গিয়াছি বোধহয় সেইজন্য রাগান্বিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া আমি বলিলাম “তবে কি আপনি যাইতে ইচ্ছা করেন?” উত্তর দিলেন—“আপনাদের যেমন ইচ্ছা।” আমি বলিলাম “তবে আপনি আজ আসুন, নমস্কার করি।” অমনি প্রতিনমস্কার করিয়া আত্মা মিডিয়াম ছাড়িয়া গেলেন। অবিলম্বে মিডিয়াম সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি বিপরীত দিকে ‘পাশ’ দিয়া তাহাকে চৈতন্য

করিলাম। শিক্ষক মহাশয় অর্ধমুগ্ধ অবস্থায়ই শুইয়া আছেন। আমরা তাহার নিকট আসিয়াছি (তুই একটা 'পাশ' দিলাম কিনা ঠিক মনে নাই) অমনি তিনি বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া ঘোর গর্জন ও আফালন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে থামাইবার ক্ষমতা কত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ক্রমেই তাঁহার অত্যাচার বাড়িতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় স্বাভাবিক ভাবে অতিশয় দুর্বল, কিন্তু তিনি অসাধারণ শক্তিশালীর ভায়ে কার্য্য করিতে লাগিলেন। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চৌকীর উপর ঘুসি, দেয়ালের উপর একরূপ সম্মোহে পদাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অত্যন্ত বলশালীর পক্ষেও সেরূপ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলতঃ সেই সময় তাঁহার মুঠাঘাত, পদাঘাত ও তর্জ্জন-গর্জ্জন এমনই ভয়ানক হইয়াছিল যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া অল্প ঘরে পলায়ন করিলেন। কেবল নেহাৎ কার্য্যের অহুরোধে অতি সাহসে ভর করিয়া আমি এবং ২১ জন সে ঘরে ছিলাম। আমরা দিগকে সরিয়া দূরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। আমরা দেখিতে লাগিলাম, যে-প্রকার কাণ্ড হইতেছে ইহাতে মিডিয়মের যোর অনিষ্টের সম্ভাবনা এমনকি তার প্রাণও নষ্ট হইতে পারে। আর উপায় কিছু না দেখিয়া আমরা অতি কাতরভাবে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বোধহয় এক মিনিটের মধ্যে শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চৌকীর উপরে বসিলেন। আমরা সঙ্গীত বন্ধ করিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিয়া সামনে সকলকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। গোলযোগ মিটিয়াছে দেখিয়া একে একে সকল বীর সেখানে উপস্থিত হইলে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “আপনারা শুনুন আমি এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি।” তিনি বলিলেন “সমস্ত সময়ই আমার জ্ঞান ছিল, আমি সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াছিলাম বা আমার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আপনারা কি বলেন, কি করেন আমি সমস্তই শুনিতে পাইতেছিলাম এবং আমার যে কিছুই হইবে না তাহাই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতেছিলাম। এসময় আপনারা অপর কোঠা

হইতে ঘাই আসিয়া আমার কাছে বসিলেন অমনি আমি অশ্রুভব করিতে পারিলাম তেজোময় কি একটা আসিয়া আমার মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করিল। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমার উপর আর আমার কিছু মাত্র অধিকার রহিল না। হাত পা সমস্তই আমার অনিচ্ছায় প্রবল বেগে চলিতে লাগিল এবং আমার মধ্যে আমি এমন একটা প্রবল শক্তি অশ্রুভব করিতে লাগিলাম যে, আমি যেন সমস্ত সংসার চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারি এবং সেইরূপ করিতেই আমার প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। ইহার পরিণাম যে কতদূর কি দাঁড়াইত বলিতে পারি না, কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনারা তপ্তবানের নামযুক্ত সঙ্গীত আমার কানে প্রবেশ করিতে না করিতে তৎক্ষণাৎ তেজোময় মহাশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিল। অমনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

আমি আজ অত্যন্ত উপকৃত হইলাম, এবং শতশত উপদেশ ও আলোচনায় আমার যে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না, আজ এই ঘটনার দ্বারা সেই বিশ্বাস লাভ করিলাম।

তৃতীয় বিষয়টী—ঘোর নাথের আত্মা গোস্বামী মহাশয়ে চিঠির নীচে “তোমার সেই” সহি। এবিষয়ও বিস্তৃতরূপে নিম্নে জানাইতেছি।

যিনি নিয়মিতরূপে আমাদের নিকট আসেন, যদিও তিনি অনেক উপদেশাদি দান করেন, কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার নিকট হইতে আমরা তাঁহার পরিচয় বাহির করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “তাহাতে আপনারা কি প্রয়োজন।” তথাপি আমরা জানিতে কোঁতুলী হইলে বলিয়াছিলেন “একদিন জানিবেন।” আমরা কিন্তু প্রতিদিনই ঐ কথাটী জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেক দিন, অনেক মাস গত হইলে পরে একদিন বলিলেন “শুক্রবার বলিব।”

শুক্রবার আসিল। আমরা বলিলাম “আজ্ঞা আপনার পরিচয় দেওয়াব কথা” কিন্তু তিনি বলিলেন “আর কি শুক্রবার নাই?” আমরা এ উত্তরে বড় সন্তুষ্ট হইলাম না, বাহা হউক অল্পপায় ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।



ইহার কিছুদিন পরে ব্রহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে (বরিশালে) আসিলেন। তাঁহার কাছে আমরা এই সমস্ত বিবরণ বলিলাম। তিনি একদিন দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আমাদের আত্মাটী ব্রহ্মসমাজের বলিয়া আমাদের বিশ্বাস স্মৃতিরাং গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্ত সম্ভব মনে করিয়াছিলাম। আমরা মনে করিলাম, গোস্বামী মহাশয়কে গোপনে আনিতে হইবে। এইজন্য তাঁহার আসার কথা, মিডিয়াম গোবিন্দ না জানিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা হইতেছিল। আমরা গোবিন্দকে অবিশ্বাস করিয়া এইরূপ করি নাই, কিন্তু অল্প সন্দেহে করিয়াছি তাহা স্থানান্তরে লিখিতে ইচ্ছা রহিল। গোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়া পরে গোস্বামী মহাশয়কে আনা হইল। তাঁহার সঙ্গে আরও চারিজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহারাও আসিলেন। ইতিপূর্বেই মিডিয়ামের মধ্যে আত্মার আগমন হইয়াছিল, একটা সঙ্গীত হইতেছিল এবং পূর্বের স্মার্য তাঁহার অশ্রু আবেশ প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ ইতিপূর্বে কখনও গোস্বামী মহাশয়কে দেখে নাই, তাঁহার সঙ্গীত হই জনেরও তাঁহার মত পরিচ্ছন্ন (গেক্সবাসন) পরিধানে ছিল। বিশেষতঃ মেসমেরাইজড অবস্থায় চক্ষু এমনি ভাবে থাকে যে, তাহাতে কিছু দেখিতে পাওয়ারই সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বাই গোস্বামী মহাশয় সেখানে গিয়াছেন অমনি তাঁহাকে মিডিয়াম জড়াইয়া ধরিল এবং কথা না বলিয়াও যেন কতই আদর করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে “তুমি” “তুমি” বলিয়া কতই আদরে তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কতকি করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবহার আমরা নূতন দেখিলাম। ষতদিন পর্যন্ত এই আত্মার আগমন হইতেছে তাহার মধ্যে কত লোকের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কখনও “তুমি” বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। ইহা পরে গোস্বামী মহাশয় কি দেখিলেন, আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার কথা দ্বারা বোধ হইল তিনি চিনিয়াছেন। গৌসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন আছ”, “সাধন-ভজন কেমন চলিতেছে”, “কেশববাবু কেমন আছেন” ইত্যাদি।

“আমি এক প্রকার আছি, সাধন-ভজন একপ্রকার

চলিতেছে, কেশববাবু ভাল আছেন”—এই প্রকার ভাবে সব উত্তর হইল। পরে তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, “তুমি ইহাদের নিকট আমার পরিচয় দেও, আমি শুক্রবার ইহাদিগকে পরিচয় দিব বলিয়াছিলাম (সেইদিন শুক্রবার ছিল)। তুমি আসিয়া আমার পরিচয় দিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলাম।” গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “তুমি পরলোকবাসী, তোমার পরিচয় তুমিই দিলে যেমন হইবে, আমি বলিলে লোকের তেমন প্রাণে লাগিবে না।” মিডিয়াম বলিল “তুমিই বল, তুমি তাহা পার।” ইহার পরে কীৰ্ত্তন হইল উভয়েই একত্র হইয়া নৃত্য করিলেন।

মিডিয়াম কর্তৃক অল্পকাল হইয়া গোস্বামী মহাশয় সকলকে একথা জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইনি সাধু অধোরনাথ গুপ্তের মুক্তাশ্রা।

পূর্বে আমরা যে প্রকার জ্ঞান-ভক্তির পরিচয় পাইয়াছি তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, তিনি যেই হউন না কেন, ব্রাহ্মসমাজের যে একজন বড়লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিকার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের কাহারও কাহারও অধোরবাবুকেই মনে পড়িয়াছিল। তুমিয়া সে বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল।

এই সময়ে আমরা নিয়ম করিয়া সপ্তাহে দুই দিন, সোম ও শুক্রবার এই কার্য করিতাম। গোস্বামী মহাশয় এখানে থাকিতেই সোমবার আবার কার্য আরম্ভ হইল। কিন্তু এইদিন আর গোস্বামী মহাশয়কে আনা হয় নাই। আত্মা আসিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন “গৌসাই আসেন নাই কেন?” একজন বলিলেন “তাহাকে খবর দেওয়া হয় নাই।”

“অহুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খবর দিন”—মিডিয়াম এইরূপ বলিলে এখানকার একজন উকীল বলিলেন, “তিনি আসিবেন কিনা জানি না, আপনি একটু চিঠি লিখিয়া দিন।” মিডিয়াম স্বীকৃত হইলে পেন্সিল ও কাগজ দেওয়া হইল। সংক্ষেপে গৌসাইকে আসিতে লিখিলেন এবং তাঁহার পত্রের নীচে দস্তখত করিলেন “তোমার সেই।” এই পত্র পাইয়া উকীল মহাশয় (ইনি বারের প্রধান উকীল এবং ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান) অঙ্গকারের মধ্যে দোতালার গৌসাইজীর নিকট ছুটিলেন। গৌসাই পত্র

পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিলেন। এবং সকলকে বলিলেন “এই সহি ঠিক অধোরের। আমার নিকট যত চিঠিপত্র সে লিখিত সব পত্রের নীচেই ‘তোমার সেই’ মাত্র সহি থাকিত।”

এই গোপনীয় কথা বাহিরের কোথায়ও প্রকাশ নাই। অগ্ধকার পূর্বে আমরা কখনও শুনি নাই এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও বোধহয় অনেকেই জানে না।

গেবিন্স একথা জানা দূরে থাকুক, সে অধোরবাবুকেও জানিত না, একে তো তাহার ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, তাহাতে অধোরবাবু যখন বরিশালে ছিলেন তখন সে বোধহয় জন্মগ্রহণও করে নাই।

আশাকরি এখন পাঠকগণ ডাইরীর সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিয়াছেন। আপনারা উক্ত ডাইরীতে ইহাও দেখিয়াছেন যে, ডাঃ বন্থ বলিয়াছিলেন যে পিতৃদেবের এ কার্যের সঙ্গে তাহার সহায়ভূতি আছে এবং প্রেততত্ত্ব যদি সত্যই ইউরোপে কিম্বা আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষে না হওয়ার কোন কারণ নাই, বরঞ্চ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পিতৃদেবের কার্যে যখন বিশেষ কিছু হইবে তখনই তিনি দেখিবেন এবং পরীক্ষা করিবেন।\*

৬ই অক্টোবরের ডাইরীর কোন ব্যাখ্যার দরকার নাই। ডাইরীর অবিকল নকল নিম্নে দিলাম।

৬ই অক্টোবর ১৯০৪

যথাসময়ে আমি ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৫টা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখানে দেখা হইল এবং প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কথা হইল। এ বিষয়ে তিনিও বেশ উৎসাহী। প্রায় ৬ টার সময়ে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিহারী ও ডক্টার চার্লস প্রানচেট্‌ নিয়া বসিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় দক্ষিণ দিকে এবং ডক্টার চার্লস মহাশয় উত্তর দিকে বসিলেন। প্রানচেট্‌টার মুখ ছিল পূর্ব দিকে। এ অবস্থায় জু'জনার চেয়ার কোনো একটা লেখা হইতে পারে না, একজনের উর্টা হইয়া পড়ে। যিনি দক্ষিণ দিকে বসিয়াছেন কিছু লেখা তাহার পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রানচেট্‌টা যেভাবে বসিয়াছিল তাহাতে যেরূপ লেখা হইতেছিল তাহা কাহারও ইচ্ছা-

মতে বলিয়া মনে হইল না। প্রথমে লিখিল, “ওঁ”। তাহার পরে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে উঠিল “জয়”, কিন্তু অস্পষ্ট। তাহার পরে উঠিল “জয় কালী”। আমাকে নির্দেশ করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কি ভাবিতেছেন?” উত্তর হইল “ছেলের বিষয়।” আমার চতুর্থ পুত্র যোগরত্নের দেহত্যাগের কথা বিদ্যারত্ন মহাশয় জানিতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন—“ছেলের বিষয় কি ভাবিতেছেন?” উত্তর—“এখন কোথায় আছে?” উপরোক্ত উভয় কথাই আমি ভাবিতেছিলাম। তৃতীয় প্রশ্ন—“সে কোথায় আছে?” উত্তর—“অগুতে”। প্রশ্ন—“অগুতে অর্থ কি?” উত্তর—“পরমাগুতে।” “পরমাগুতে অর্থ কি?” উত্তর—“স্বপ্ন শরীরে”। প্রশ্ন—“সে কি এখানে আছে?” উত্তর—“না”। প্রঃ—“সে কি এখানে আসিতে পারে?” উঃ—“না”। প্রঃ—“আপনি তাহাকে ডাকিয়া দিতে পারেন?” উঃ—“ঘাইতে পারিব না।” প্রঃ—“সে কেমন আছে?”

উঃ—“পরমানন্দে”। প্রঃ—“কর কাছে আছে?”

উঃ—“আপনার আপনি।” প্রঃ—“তাহাকে কিরূপে দেখিতে পাইব?” উঃ—“স্বপ্নে।”

প্রঃ—“প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া ঘাইবে কিনা?”

উঃ—“যে মুক্ত হইবে।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম আগামীকাল্য গিরিডি হইতে পরিবারস্থ সকলে নিরাপদে কলিকাতায় পৌছবেন কিনা। উত্তর—“অতি কষ্ট হবে।”

মনে মনে ভাবিলাম সাহেবদেব সঙ্গে আমাদের যে কণ্ট্রাক্ট হইবার কথা তাহা হইবে কিনা? উঃ—“সন্দেহ ছাড়।”

ইহার পরে প্রশ্ন হইল, আপনি স্ট্রাচার্ণের উপরে আবির্ভূত হইতে পারেন কি? উত্তর—পারি। প্রশ্ন—এখনই হইতে পারেন? উঃ—পরিশ্রমাস্তে। প্রঃ—কবে হতে ইচ্ছা করেন? উঃ—অমাবস্যা। প্রঃ—এ অমাবস্যাতো শনিবার ও রবিবার। আপনি কবে পর্যন্ত আসিবেন? উঃ—শনিবার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি মনে মনে প্রশ্ন করিলেন—উত্তরটা মনে নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন তাহার জীকে নিয়া দেশে গেলে আরোগ্যলাভ করিবেন কিনা? উঃ—সংশয়। প্রঃ—তবে কিরূপে সারিবে? উঃ—আমি দিব। প্রঃ—আপনি কি ঔষধ দিবেন? উত্তর মনে নাই। প্রঃ—কবে দিবেন? উঃ—সেইদিন অর্থাৎ সেই শনিবার।

# দর্শন ও বিজ্ঞান

মহর্ষি প্রেমানন্দজী

সম্প্রতি কটকে অনুষ্ঠিত সায়েন্স কংগ্রেসে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু মন্তব্য করেছেন যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞা সংযুক্ত না হলে, বিজ্ঞান মানবকল্যাণকর হতে পারে না। বস্তুতঃ দর্শনহীন বিজ্ঞান নিয়ে যে সকল বিজ্ঞানী আজ পথচলা শুরু করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি জীবন্ত ধ্বংসের মুক্তি। কালের বৃকে তাঁরা প্রত্যেকেই সঞ্চয় করে যাচ্ছেন প্রকৃতির অপরিমেয় অভিশাপ। জ্ঞানের নামে চলছে অজ্ঞানতা আর অশিব বিষয়ের অহুশীলন। কালধর্মের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হবেই, কিন্তু তা'তে প্রকাশ থাকা চাই শিবের, স্নহের। শিবত্ব ও সৌন্দর্য্যহীন জ্ঞান তো অজ্ঞানতারই তামস বিকাশ। ব্যক্তি চেতনায় স্নহের আড়াল পড়লে হয় শয়তানেরই প্রকাশ। দর্শনহীন বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানহীন দর্শন মানবসমাজের পক্ষে উভয়ই অকল্যাণকর। দর্শনহীন বিজ্ঞান আনে ধ্বংস, আর বিজ্ঞানহীন দর্শন আনে মাহুষে মাহুষে ভেদবুদ্ধি। মাহুষ হয় হিংসায় উন্মত্ত। প্রেমকে করে লাক্ষিত। বর্তমান জগৎ বিজ্ঞানের নামে পথ চলছে দর্শনকে বাদ দিয়ে, আবার দর্শনের নামেও পথ চলছে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে। এ দু'টোই ভুল পথ। তাইত আজ মানব জীবনে নেমে এসেছে দুঃখের বন্যা, অশান্তির বঙ্গ। দর্শন যে বিজ্ঞানেরই তত্ত্বরূপ এবং বিজ্ঞান যে দর্শনেরই ব্যক্ত রূপ—এ কথাটা আজকের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক উভয়ের স্মৃতি থেকেই হয়েছে লুপ্ত। বিজ্ঞান পথ চলছে গণিত নিয়ে, আর দর্শন চলছে ভাবালুতা নিয়ে—সমাস্তুরাল রেখার মতন পাশাপাশি ছুটে চলেছে যেন। ভাবালুতা এবং গণিতের মধ্যে যে একটা adjustment করবার মতন স্থানও রয়েছে, এ বিষয়ে না ভাবছে দার্শনিক, না ভাবছে বিজ্ঞানী। সবাই নিজেই ভাবছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একরূপ ভাবনাই ডেকে এনেছে সকল অকল্যাণ।

ধ্বংস যখন একান্তই অনিবার্যরূপে নেমে আসতে থাকে, তখন মাহুষের শিবচেতনা মুচ্ছিত হয়ে থাকে। মাত্র বিজ্ঞান বা কেবলমাত্র দর্শনের মাধ্যমে মাহুষের সেই শিব-চেতনার মুচ্ছা ভঙ্গ করা সম্ভব হবে না। দর্শন আর বিজ্ঞান উভয়কে পাশাপাশি রেখে জগতকে বুঝতে

হবে। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীকে কাজ কবতে হবে একই বেদীতে দাঁড়িয়ে। সেটা হচ্ছে না বলেই আজ বহু বিশ্ব-স্তম্ভাধ্বংসকারী মঙ্গল প্রচেষ্টা ও শুভ আন্দোলন সার্থক হচ্ছে না। বিশ্ব-জনহিতকামী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক যতক্ষণ পর্যন্ত সমবেত ভাবে “ধরি হাত দৌঁহাকার” না করছেন,—ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টা সার্থক হবে না।

মাহুষের সুখ, দুঃখ এবং দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কার্যই যে তার চিন্তা তরঙ্গেরই (Thought wave) প্রকাশ বা ব্যক্তরূপ তা' জ্ঞানী-মানসে যথাযথ প্রতীয়মান হচ্ছে না। মাহুষ যে তা'র অনিয়ন্ত্রিত ও স্ফূর্ত চিন্তা তরঙ্গের মাধ্যমে প্রকৃতির গতিকে কল্যাণকর পথে পরিচালিত করতে পারে তা'ত নিয়তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যাত্ম অহুশীলনের মধ্যে। সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি কল্যাণকর চিন্তা-তরঙ্গের (Thought wave) সৃষ্টি করে, অন্তর-প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিব ও স্নহের পথে। জীবন হয় মহান, মানব রূপান্তরিত হয় মহামানব। অশান্তি ছেড়ে প্রশান্ত জীবনবাহী হয় সে। ব্যক্তিগত জীবনে অন্তর প্রকৃতির গতিকে কল্যাণের পথে অভিলেখিত করবার এই সূত্র যদি সত্য হয়—তা'হলে সামগ্রিক জীবনে সমষ্টিগত কল্যাণী চিন্তা-তরঙ্গের প্রভাবে বহিঃপ্রকৃতির গতিকেও জগৎ কল্যাণে নিয়োজিত করা কেন সমর্থ হবে না? ব্যক্তিগত জীবনে যাহা সত্য, সামগ্রিক জীবনেও তাই সত্য হবে। দর্শনের মূল সূত্র সত্য, প্রেম পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সহায়তায় জলে ওঠে ধ্বংসের দাবানল। সে আগুনে শেষ পর্যন্ত নিজেই পুড়ে ছাই হয়। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতে রাবণ দুর্ধোধনাতিও ত সেই সাক্ষ্যই বহন করেন। ইদানীন্তন কালের হিটলারও।

আবার বিজ্ঞানহীন দর্শনের কি পরিণাম তার পরিচয় মিলে বর্তমানের শতধাছিন্ন মানবসমাজে। দর্শনের বৈজ্ঞানিক দিকটার আলোচনার ও অহুহুতির অভাবের কলেই আজ মানব সমাজে দান্য বেধে উঠেছে ধর্মীয়

ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। মানবের মহাশক্তি বিকাশের মূল সূত্র সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে ফেলেছে হারিয়ে। আত্মনিবেদিত হচ্ছে অহংকারের কাছে, অজ্ঞানতার কাছে। জীবন-সাধনার মহান পথ হয়েছে কর্দম লিপ্ত। সেই কর্দমে নিজেই যে হচ্ছে অভিলিপ্ত, সে চেতনাও যেন স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে। সর্বধর্ম মতবাদের চরম সিদ্ধান্ত, মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এবং সকল তত্ত্বই ভাগবতী তত্ত্ব। বিজ্ঞানহীন দর্শন আলোচনায় মানুষের সেই চরম

জ্ঞানটি তমিস্রাবৃত হয়েই রয়েছে। ফলে জেগে উঠেছে মানুষ-মানুষে হানাহানি। ধ্বংসের উদ্গাম গেয়ে গেয়ে, নিজেব ধ্বংসকেই যে আহ্বান জানাচ্ছে, সে কথাটি যেন মানুষ ভাবতেও পারছে না।

মানুষ যদি আজ দর্শন ও বিজ্ঞানকে পাশাপাশি রেখে ও দেখে পথ না চলে তা'হলে মরণ দৈত্যের যে মারণ হস্ত বিশ্বকে অতলে তলিষে দেবার জন্য এগিয়ে আসছে, তা'কে প্রতিরোধ করবে কে ?



## নীলকণ্ঠ\*

নীলকণ্ঠ। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর অমূল্য জীবন চরিত। নিছক জীবন চরিত নহে—জীবনবেদ। শুদ্ধ প্রজ্ঞা ও প্রেম, অনন্ত শক্তি ও ভক্তির অফুরন্ত উৎস। কঠোর সংগ্রাম ও সাধনা, মহাসিদ্ধি ও ঋদ্ধির অনবদ্য কথামৃত।

এই কথামূতের প্রধান সম্পদ, গোস্বামী প্রভু এখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মহিমোজ্জ্বল। অদ্বৈত প্রভুজীর প্রীতি-সংস্কৃত অভিমান-সজ্জাত অভিশাপে তাঁহারই দশম পুরুষে শ্রীমন্ মহাপ্রভু গোস্বামী প্রভুৰূপে আবির্ভূত—এই আবির্ভূত মধুব তত্ত্ব এখানে গভীর ভক্তি সহকারে পবি-বেশিত। স্বর্গীয় প্রেমভক্তির যে সনাতন ধাড়াটি অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া বিচিত্র রূপলাভ করে মহা-প্রভুর মধ্যে, বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেই আমরা দেখি তাহার সার্বিক রূপাধার। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ ও বৈদেশিক অপপ্রচারের ফলে সারা ভারতের প্রাণ যখন কঠাগত, সেই চরম যুগসন্ধিক্ষণে ধর্মরক্ষার প্রয়োজনেই আচার্য চিঞ্জয়কৃষ্ণ প্রথমে দুর্দম বেগে প্রচার করেন ব্রাহ্মধর্ম। পরে আবার সনাতন হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে আলিয়া মহামহর্ষিরূপে ঘরে ঘরে পরিবেশন করেন শক্তিসমম্বিত নামামৃত এবং আচার্য্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশে দেশে সদগুরুর সেবা ও পূজা। শ্রীমন্ নারায়ণ প্রবর্তিত মহাশক্তিমূর্তি ইষ্টনাম মাত্র সাড়ে তিনজনকে প্রদান করেন মহাপ্রভু, মুনি-ঋষিদের সেই কলিজার ধন এবার সহস্র সহস্র গৃহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাইয়া দেন গোস্বামী প্রভু।

সদগুরু অবতার রূপে তাঁহার মহিমা সুন্দরভাবে 'প্রাক-কথন' মুখবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন প্রবর্তক-

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী। 'সূচনা' প্রসঙ্গেও এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন ভূতপূর্ব অধ্যাপক দর্শনাচার্য অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরম শ্রদ্ধাভাজন এই মহোদয়গণের স্মৃতিস্তম্ভ নিবন্ধ এ গ্রন্থের গৌরব-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। মূল গ্রন্থেও নব গৌরান্দরূপে গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে অভিনব রূপে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর দিব্য জীবনদর্শন। ধর্মশাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি বক্ষার সহিত জীবের ক্রিতাপ জালা নিবারণের কল্যাণতত্ত্ব গ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ। সেই আরম্ভ তত-উদঘাপনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান তাঁহারই প্রিয়তম বন্ধুর ধন কুলদানন্দজীর উপর। আবির্ভাবের মাহেঞ্জকণ হইতে দেবতাস্থা কুলদানন্দের জীবনেও রূপান্তরিত হয় সেই স্তম্ভহান আদর্শ। আশৈশব তাঁহার বিরাট হৃদয় পরম করুণায় বিগলিত। সহজাত আন্তরিক্য বৃদ্ধিতে সদাঙ্গাগ্রত। বাল্যকাল হইতে তিনি সহজ প্রেরণায় অপরূপভাবে সংঘত, স্বার্থত্যাগী ও সত্যাহু-সন্ধিসংস্থ। কিশোরে তাঁহার সংশয়চ্ছন্ন জীবনবেলায় অবতীর্ণ হইলেন বিজয়কৃষ্ণ—হৃদয়বীণায় ঝংকার উঠিল প্রাণবন্ত স্বরে। এতদিনে জীবনগঙ্গা প্রবাহিত হইল ছন্দবৈচিত্র্যে—আঘাতেব পর আঘাতে উজ্জান বহিল প্রাণধুমুনা। প্রতিপদে অবিচল সংগ্রামের পথে সব্যসাচীর মত কুলদানন্দ শুনিলেন বিজয়কৃষ্ণের অমৃতবাণী : "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, তুমি তো শুধু গর্ভস্থ সন্তান, চাই শুধু শরণাগতি, আর প্রতি খাস-প্রশ্বাসে নাম আর নাম— নামে শক্তি, নামে ভক্তি, নামেই সর্বসিদ্ধি।" পরমানন্দে

\* নীলকণ্ঠ (জীবনী গ্রন্থ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর প্রণীত এবং সদগুরু সাধন সঙ্গ (৩০ সিংলা ক্রিট, কলিকাতা-৬) হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৬ টাকা।

## মায়ের ডাক

তারাশ্রব ব্রহ্মচারী

প্রবর্তক আশ্রমে শ্রীশ্রীদত্তজ্ঞাননীর তিবোভাবোৎসব।  
শ্রীশ্রীরাধারানী দেবীর স্মরণ-সভা। যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ  
স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ সভাপতি। বিকেল  
পাঁচটায় উৎসব সভা। তার পূর্বে অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক  
আগে রওনা না হলে, ঠিক সময়ে পৌঁছানো যাবে না।

বেলা দু'টোব সময় সজ্জের তবক্ষ থেকে বিনয় ব্রহ্ম  
পিতাজীকে নিতে এলেন। তখনো পূর্বনির্দিষ্ট মটরকার  
এসে পৌঁছায় নি। ভক্তদের মধ্যে বেশীরভাগ ছেলেরাই  
ট্রেনে চলে গেলো। স্টেশন ভ্যান ঠিক সময় মতো  
এসে পড়ায় তাতে মেয়েদের যাওয়া সাব্যস্ত হ'ল। এধারে  
পিতাজী অস্থস্থ। শুয়ে আছেন। পিতাজী যে মটরে  
যাবেন, সেই গাড়ী এখনো এলো না। সময় ব'বে যায়—  
দুই, তিন, সাড়ে তিন। সর্বনাশ! এখনও স্টার্ট করলে  
মিটিংয়ের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে। বিনয় ব্রহ্মের বুক  
দুঃখ দুঃখ। কিন্তু বুক দুঃখ দুঃখ করলেও অভূত ধৈর্য তাঁর।  
সহ্যাত্মক তাঁর। তিনি ধীর স্থির হ'য়ে বসে আছেন।  
তাঁর ঘাড়ের পিতাজীকে নিয়ে যাবাব সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

চমৎকার অমায়িক মাহুশ শ্রীব্রহ্ম। সুদর্শনও।

ওধাবে আশ্রম-ভক্তেরা পিতাজী যাবার আগে থেকে  
পৌঁছে গিয়ে, পিতাজীর জন্ত উৎকর্ষা নিয়ে ক্ষণ গুণছে—  
আসবেন, না, আসবেন না! অস্থস্থ হ'য়ে পড়েছেন বেশী  
বোধহয়। সজ্জের উদ্যোক্তাদেরও বুক ধড়াস ধড়াস—  
রাড় প্রেশার বৃদ্ধি। লোকের জবাবদিহি করতে করতে  
প্রাণ ওষ্ঠাগত। সভাপতি ৮৬ বছরের বৃদ্ধ—কথা এড়াতে  
না পেরে বললেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। ফোনে  
খবর পাওয়া গেছে তিনি পৌনে পাঁচটায় কারে  
উঠেছেন। আসতে সাতটার কম নয়।

সভা আরম্ভ হ'ল। অগুণতি জনসমাবেশ। কি  
শৃঙ্খলা, কি নিয়মানুবর্তিতা! না দেখলে বিশ্বাস করা যায়  
না। পৌষের দারুণ শীতে হি-হি করতে-করতে, লাঠি  
ঠুকে-ঠুকে অশীতিপর বৃদ্ধরাও এসেছেন সভামণ্ডপে—  
মহাপুরুষ পিতাজীর দর্শনে। বিশাল মণ্ডপে তিল ধরণের  
জায়গা নেই—একটু আওয়াজ নেই—একটু গোলমাল  
নেই—অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে সবাই।

শুরু হইল কুলদানন্দের নাম সাধন। সে পথে কত জালা  
ও আনন্দ, কত সংশয় ও অস্থপ্রেরণা।

সেই সঙ্গে আরম্ভ ব্রত পালনের জন্ত শুরু হইল  
প্রস্তুতি। গৌসাইজী প্রিয়তম সন্তানকে দান করিলেন  
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—প্রদান করিলেন শাস্ত্রসম্মত নীলকণ্ঠ  
বেশ। অমোঘ সাধনায় রচিত হইল অভিনব জীবননাট্য  
—সর্বাস্তঃকরণে গুরুপূজা ও একনিষ্ঠ গুরুসেবার মাধ্যমে  
প্রকাশিত হইল মহিমময় রূপজ্যোতিঃ। গৌসাইজীর  
তিরোধানের পর আকাশ-গদ্যায় স্বকণ্ঠের তপশ্চর্য্য লাভ  
করিলেন মহাসিদ্ধি। অতঃপর সদগুরুরূপে তাঁহার  
নীলকণ্ঠ লীলার সার্থক স্মৃতি। নখর দেহত্যাগের  
অন্তিমকাল পর্য্যন্ত বিতরণ করিলেন অপার স্নেহ, প্রেম  
ও নামামৃত—ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করিলেন সদগুরুর সেবা ও  
পূজা, প্রচার করিলেন শাস্ত্র, সদাচার ও প্রেমভক্তির  
বিপুল মহিমা।

এই স্বর্গীয় স্মরণীয় জীবনবেদ প্রকাশিত চারিটি  
প্রধান অধ্যায়ে। প্রবর্তক জীবন ও সাধক জীবন এই  
দুইটি অধ্যায়ে রচিত আলোচ্য মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড।  
আর, সিদ্ধ জীবন ও সদগুরু জীবন আলোচ্য রূপায়িত  
দ্বিতীয় খণ্ড।

এই অমূল্য কথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন নীলকণ্ঠেরই  
মানসপুত্র ঠাকুর শ্রীমৎ গদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ,  
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত-সাধনায় সিদ্ধ গ্রন্থাকার গৌসাইজী  
তথা ব্রহ্মচারীজীর ভাবসমুদ্র মন্বনের সুর্যোগ্য অধিকারী।  
তাঁহার স্নগভীর ধ্যান ও ধারণার প্রোজ্জল আলোকে  
উদ্ভাসিত গ্রন্থখানির রসমাধুর্য্য পাঠক মাত্রেই চিত্ত স্পর্শ  
করিবে। তাহার চমৎকারিষে ও তাবের গভীরতায়  
গ্রন্থখানি অধ্যায় সাহিত্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য  
ধাক্কাবে। ঘরে ঘরে এই অনবদ্য সার্থক স্মৃতির বহুল  
প্রচার কামনা করি।

শ্রীমৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মোটর এসে কালীঘাটে মাতৃকাশ্রমের দ্বারে পৌঁছুলো যখন, তখন বিকেল সাড়ে চারটে! পিতাজীকে বললুম, আপনার ষাওয়া থাক। আমি আপনার বাণী নিয়ে যাচ্ছি। তিনি উঠে বসলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—মায়ের আদেশ আমি ষাবো। ঠিক পৌনে পাঁচটা মোটর ছাড়লো।

পিতাজীকে ধরে-ধরে একতলায় নামানো হল। কাবে বসবার পর পিতাজীর মুখ-চোখের চেহারা পাণ্টে গেলো। একটা স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁর হাসিতে, চাউনিতে খেলে গেলো। গাড়ীতে শুভ্রা মার মাতৃস্বের প্রকাশ লক্ষ্য করলুম—তিনি তাঁর স্নেহদৃষ্টি দিয়ে পিতাজীকে ঘিরে রেখেছিলেন সুবিধা অসুবিধা কিছু হচ্ছে কিনা। রমা দেবী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, রমলা দেবী, মদনলাল সবার সম্মুখে দৃষ্টি পিতাজীর ওপর।

পথে নির্বিলম্ব কাটলো। পিতাজী যেন মায়ের কোলে শুয়ে আছেন। একবার-হাসতে হাসতে রহস্ত করে বললেন, এদিকে যতই দেবী হচ্ছে, ওদিকে উদ্ভিগ্ন অপেক্ষমান রাধারমণের ব্লাড প্রেসার ততই বাড়ছে।

ঠিক সন্ধ্যা ৬টা। গাড়ী প্রবর্তক আশ্রম ফটকের সামনে এসে থামলো। বিরাট মণ্ডপ থেকে ভেসে আগছে নারী-কণ্ঠের মাতৃ বন্দনা। দেবী দেখে সভা স্বরূপে উত্তোষ হয়েচে

পিতাজীকে আশ্রমে প্রবেশ করিয়ে ইজিচেয়ারে বসান হ'ল। তিনি চোখ বুঁজলেন। মনে হ'ল যেন আশ্রমজননীর স্নেহ পরশে তাঁর ঘুমের আবেশ এসে গেছে। আমরা সকলে নিস্তব্ধ পাথর মূর্তি। কি জানি, পিতাজী এতোখানি পথ আসায় দুর্বল হয়ে পড়লেন নাকি! অসুস্থ না সমাধিস্থ!

পিতাজী এসেছেন শুনেই শোলাসে অরুণবাবু, কৃষ্ণধনবাবু, রাধারমণবাবু প্রভৃতি কর্মকর্তাদের অনেকেই এলেন। প্রণাম করলেন। কৃষ্ণধনবাবু সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থরোধ

করলেন—পিতাজীকে দেখবার জন্তে সকলে অস্থির হয়ে পড়ছে, একবার দর্শন দিয়েই চলে আসবেন।

পিতাজী চোখ চাইলেন। উঠে দাঁড়ালেন। এক পাশে বিনয়বাবু অপর পাশে কৃষ্ণধনবাবু। পিতাজীকে ধরে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন। আমার আকুলি-বিকুলি দেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি বললেন কৃষ্ণধনবাবু, মায়ের ডাক।

ডায়াদে তোলা হইল পিতাজীকে। সে কি অপূর্ব জ্যোতি পিতাজীর মুখচোখ ঠিকরে উচ্ছ্বসিত! অরুণবাবু পিতাজীকে পাঁচ মিনিটের জন্তও একটু বলার জন্ত অসুস্থরোধ করলেন।

অসুস্থ পিতাজীর অস্ত্র-মূর্তি দেখলুম। ৮৬ বছরের বৃদ্ধ যেন যুবক হ'য়ে গেছেন। তাঁর মুখেচোখে দিব্যালোকের আনন্দ ঝরে পড়ছে। ৫ মিনিটের জায়গায় ৪০ মিনিট শত শত লোককে আপন করে, তাদের আপনার হ'য়ে, বজ্রতা দিলেন। অবাক বিশ্বস্বে চেয়ে রয়েছেন সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ। পিতাজী যে বলতে লাগলেন—মা-ই তাঁকে বলাচ্ছেন, তিনি মাকে স্পষ্ট দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন—তা সত্যিই। তাঁকে দেখে, তাঁর বজ্রতা শুনে, মায়ের অসুস্থ লীলা দেখেছিলুম তাঁর মধ্যে। পিতাজী বললেন, মা তাঁর পাশে বসে আছেন। আমাদেরও সেই অসুস্থ হ'য়েছিলো।

যে পিতাজীকে মধ্যে মধ্যে নিয়ে যেতে হয়েছিলো তিনি মঞ্চ থেকে স্বস্থ শরীরে নামলেন। বললেন—যে মাতৃ-আশীর্বাদ পেলাম, আমার সাধন জীবনের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইলো। তারপর যেন একেবারে অসুস্থ মাল্লব—কিছুই হয়নি যেন।

ফেরার পথে আবার মোটরে ছ' ঘণ্টা। কালীঘাটে আশ্রমে যখন ফিরলুম, তখন রাত ১০-৩০ মিঃ। পিতাজীর প্রেশার দেখা হ'ল। স্বাভাবিক। সবই মায়ের আশীর্বাদ! মায়ের ডাকই তাঁর রক্ষাকবচ। পুণ্য আশ্রম ভূমিতে সিদ্ধ মাতৃসাধকের অসুস্থবে সম্বন্ধননী প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দিয়েছেন, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

## একটি মৃত্যু

সুনীল চৌধুরী

ট্রেনটা হঠাৎ বিকট আর্জনাৎ করে থেমে গেল।

চাবদিকে হৈ-হৈ রব। কামরার ছাণ্ডেল, জানলার রড্‌ধরে ঝুলে-থাকা মাছুগুণ্ডো নেমে পড়ে স্টেশনে। দৌড়ম, যেখানে অনেকগুলো মাছু ইতিমধ্যে ভিড় করেছে।

প্লাটফর্ম ছেড়ে ক'য়েক পা গিয়ে হঠাৎ থেমে যাওয়ার অসংখ্য উৎসুক উৎকণ্ঠিত চোখ জানালা-দরজা দিয়ে প্রশ্ন করে—কী হল?

ভিড়ের চাপ বাড়ছে। ক্রমশঃই বাড়ছে। ট্রেনের শেষ কামরার মাছুগুণ্ডো এখনও ছুটে আসছে। ছুটে আসছে স্টেশনমাষ্টার আর টিকিট কলেক্টারবাবু। দূরে গার্ড সাহেবের সাদা পোষাক দেখা যাচ্ছে। গার্ড সাহেবও আসছে। ড্রাইভার আর ফায়ার-ম্যান নামল ইঞ্জিনের মঞ্চ ছাণ্ডেলটা ধরে। ওয়েষ্ট জুট দিয়ে হাত মুছতে মুছতে হুল্‌কী চালে এগিয়ে আসছে। তাবটা এমনই—অভিজ্ঞতার খাতায় অমন কত নাম আছে, না হয় আর একটাই বাড়ল।

—লোকটা মাঝা গেল গো! এক বৃদ্ধ দরুজী আধমণী এক বিরাট বোঁচকা কাঁধে তুলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—কী হল কত্‌তা? অনেকগুলো উৎসুক প্রশ্ন এলো ভিড়ের মধ্য থেকে।

—লোকটা মারা গেল। বৃদ্ধ তখনও ভিড় ঠেলেছে।

—একেবারে? কে যেন বলে ওঠে।

—তা একেবারে ছাড়া কেমনভাবে মরবে? বৃদ্ধ রাগত কণ্ঠে বলে।

—বেঁচে গেছে।

—বেঁচে গেছে? ভিড় ঠেলে আর একজন লোক এগিয়ে আসে।

—না, মানে মরে বেঁচে গেছে আর কি।

—সত্যি মরল তা হলে? আর একটি উৎসুক মুখ প্রশ্ন করে।

—দেখি-দেখি, একটু যেতে দিন কাইগুলা। গার্ড সাহেবের গলা শুনে জমাট ভিড় পথ করে দেয়।

এই ফাঁকে আমিও ঢুকে পড়ি। পায়ে পায়ে এগুচ্ছি, যেখানে অনেকগুলো মাছু জমে গিয়ে মৌচাকের মত দেখাচ্ছে, সেই দিকে। একটা মাছু কাটা পড়েছে। কোমর থেকে হু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। বসলে হয়ত দেখা যাবে। কিন্তু যা ভিড় বসার মত জায়গা কৈ।

গার্ড সাহেব তাঁর নোট বুক কী সব নোট করেন। স্টেশন মাষ্টার ততক্ষণে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছেন।

বসে পড়েছি উবু হয়ে। মুখটা কেমন চেনা-চেনা! বুকের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাং করে ওঠে। সেই পাগলাটা! সত্যি মরল তবে পাগলাটা!

বহুবার মরতে মরতে শুকে বেঁচে যেতে দেখেছে, বজ্রবজ্র লোকালের দশটা-পাঁচটার ডেলী-প্যাসেন্‌জারেরা। চলন্ত গাড়ীতে লাকিয়ে উঠতে গিয়ে কতবার ওর পা পিছলে গিয়েছিল। কামরার যাত্রীরা চিৎকার করে উঠেছিল—গেল গেল! হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে হেসে উঠত পাগলাটা হো-হো করে। বিজয়ী হাসি ঘোষণা করছে—মরেনি ও। প্যাসেন্‌জারদের মধ্যে বেশ একটা রাগভাব ছিল পাগলাটার ওপর।

শিয়ালদা থেকে ব্রেস্ট্রীজ। এই ক'মাইল পথ ও যাতায়াত করত দিনে বেশ ক'য়েকবার। অবশ্য বিনা টিকিটে।

মেয়েদের কামরার ছাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেত পাগলাটা। প্রথম প্রথম মেয়েরা ভয় পেত। ও হেসে বলত, ডব্‌ নেহি মাইজী। মেয়েরা ইদানিং যেন একটু সাহস পেয়েছিল।

একদিন সকালে গাড়ীটা শিয়ালদা থেকে এলো লেট করে। দারুণ বৃষ্টি। অসম্ভব ভিড় গাড়ী। কালীঘাট স্টেশনে গাড়ী ইন্‌ করভেই ছুড়দাড় করে ঠেলে উঠল অনেক যাত্রী। ভরে গেল লোকালের সব ক'টা কামরা।

হঠাৎ একটা জনশ্রুত কামরা দেখে অবাক হলাম। সাত-পাঁচ ভাবার সময় নেই, তাই ছুটে উঠতে গিয়ে শুনলাম, ও কামরায় উঠবেন না দাদা। ‘ডেড-বডি’ আছে।

প্রথমটা ধমকে দাঁড়ালাম। শেষে গাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে লাক্ষিয়ে উঠলাম কামরাটার। আমার দেখা-দেখি আর এক ভদ্রলোকও উঠলেন। মনে একটু হাস পেলাম।

কামরাটা কেমন ধুম্‌ধমে। এতবড় কামরায় আমরা তিনটি প্রাণী। একটা পুষ্টিগন্ধময় প্রাণহান দেহ আর দু’টি সজীব—তাজা মানুষ।

এগিয়ে গেলাম। শীর্ণ একটা মানুষ পড়ে আছে সীটের ওপর। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে বমি। সিটটার ওপর পায়খানা করেছে। সারা দেহ তার ক্লেশাক্ত। বিল্ডি গন্ধে কামরাটা গুমোট।

লোকটাকে পরিচিত বলে মনে হল। ইয়া, পাগলাটা! ভাবলাম, পাগলাটা তবে মরল এতদিন পরে? মনটা বুঝি একটু ভার হয়ে উঠেছিল। এভাবে যে ও মরবে, ভাবতে পারিনি। এ মৃত্যু যেন বড় বেমানান।

কতবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে বিজয়ীর হাসি হেসে বলেছিল—ম্যায় নেহি মর সক্তা। সেই মরল শেষ পর্যন্ত, তাও কলারায়। কালের অমোঘ আইনের কাছে ফাঁকি দিয়ে ক’দিন চলবে! তবু ওর এইভাবে মরার দৃশ্য আর দীপ্ত হাসিটা পাশাপাশি ভাবলে মনে হয় বুঝি ছন্দপতন।

পাগলের মৃতদেহটা কেমন কুঁচকে রয়েছে। গালের কষ বেয়ে সাদা গাঁজা এখনও টাটকা। মরার সময় বোধহয় খুব কষ্ট হয়েছিল।

মাছিগুলো ভিড় জমিয়েছে মৃতদেহটা ঘিরে। বমির ওপর জেঁকে বসে মহাভোজে মতে উঠেছে ওরা। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে এতটুকু ভয় নেই ওদের। ওরা জানে কেউ এই মহাভোজে বাধ সাধতে পারবে না।

এ দৃশ্য দেখে মায়া হয়। মরার সময় হয়তো জলতেষ্ঠা পেয়েছিল ওর। কলারায় পিপাসা নাকি ভয়ঙ্কর রকমের হয়। জল-জল করে হয়তো চীৎকারও করেছিল। কিন্তু

কে দেবে জল? ওর বুকফাটা কান্না বোধ হয় কেউই শুনতে পারনি।

সেদিনের ঘটনাটা আজও চোখের সামনে ভাসছে। ব্রেসব্রীজ স্টেশন। আশপাশের কলকারখানার আর রেলের বাবুদের ভিড়ে জমজমাট। বুঝিবা হাওড়া-শিয়ালদহকেও হার মানিয়েছে। অফিস, কলকারখানা-ফেরত মাছুষ দলে দলে বসে, দাঁড়িয়ে, ঘুরেফিরে গল্প করছে, হাসছে।

হঠাৎ এক বিকট অট্টহাসিতে চমকে উঠল ব্রেসব্রীজ স্টেশন। চমকে উঠল হাসি-মস্করা আর গল্পে মেতে-ওঠা মাছুষগুলো। জোড়া জোড়া কৌতুহলী দৃষ্টি এসে পড়ল বুকিং অফিসের সামনের একফালি চত্বরে।

—খাও বেটা খাও। মজেসে খাও। এক টুকরো কুঁচি আলতো করে ছুঁড়ে দিচ্ছে শূন্যে। একটা খোঁড়া কুকুর পিছনের ছ’পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে লুফে নিচ্ছেকুঁচির টুকরা। হাততালি দিয়ে ফেটে পড়ছে অট্টহাসিতে পরিচিত সেই পাগলাটা।

দেখছে সহস্র চোখ কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে।

কুঁচিটা শেষ হয়ে যেতে কুকুরটা তিন পায়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। পাগল সব আসে ‘টিউবওয়েলের’ দিকে। কুকুরটা লেংচে লেংচে তিন পায়ে এগিয়ে যায় ওর সামনে :

—আও বেটা। আন্তি পানী পিও। টিউবওয়েল পাম্প করতে করতে পাগলটা ডাকে কুকুরটাকে।

লেংড়া কুকুরটা কোন সাড়া দেয় না। তফাতে থেকে কেবলই লাজ নাড়ে।

—ক্যা, পানী নেহি পিওগী? পাগলাটা এগিয়ে আসে কুকুরটার দিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। কুকুরটা ছ’পায়ে ভর দিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লাজ নাড়ে।

হেসে ওঠে পাগল।—অব. রোটি মাংতা? পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—তুম উতলা খানেসে হাম ক্যায়সে তুমকো খিলায়গা! হামারা উতনা পয়সা কাঁহা ভাইয়া!

আশপাশের কৌতুহলী মাছুষ ভিড় জমায়। পাগল



তাকার লোকগুলোর মুখের দিকে। বলে ওঠে—বাবু-  
লোগকো পাশ মাঙ লালুয়া। বহুত রোটি মিলেগা।  
খানিক আদর করে বলে, এক কাম কর, বাবুলোগকো  
খোড়া খেল দেখা দো।

কুকুরটার ডান পা-টা ধরে বলে—হান্‌সিক্। কুকুরটা  
হুলো আধখানা বাঁ-পাটা এগিয়ে দেয়। হাওসেক্ করে  
পাগল। আবার বলে, দো পায়ের মে খাড়া হো।  
কুকুরটা হু'পায়ে মোজা দাঁড়ায়। ডান পা-টা এগিয়ে  
দেয়, পাগল আবার হাওসেক্ করে। বলে, বহৎ আচ্ছা  
লালুয়া।

ভিড় সবতে গুরু করছে। পাগলের চোখ এড়ায় না।  
বলে ওঠে—এ বাবু, ভাগতা হায়? মুকটমে খেলা দেখ্‌না  
বহৎ খারাব। লালুকো করিব এক বিহুটিভি তো দো?

অনেকেই সরে পড়ে এই তালে। হু'-একজন  
নির্লঙ্কের মত দাঁড়িয়ে দেখছে তখনও।

পাগলাটার চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে ওঠে।  
কুকুরটার দিকে তাকিয়ে ওর রাগ পড়ে যায়। চোখ ছল  
ছল করে আসে। কুকুরটার গলা জড়িয়ে আদর করে  
বলে, বাবুলোগ নেহি দিয়াতো ক্যা! হাম খিলায়গা।

পকেট হাতড়ে ক'টা পয়সা দিয়ে কুটি কিনে টুকরো  
টুকরো ছুঁড়ে দেয়। কুকুরটা লুফে নেয়। ল্যাজ নাড়ে।  
শেষ টুকরো কুটি ছুঁড়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে বলে, খেল  
খতম, পয়সা হজম।

পাগলাটাকে প্রায়ই কুকুরটাকে জল কুটি খাওয়াতে  
দেখেছি। মরার সময় হয়তো এক ফোটা জলও পায়নি!  
তবু হয়ে ভাবছি পাগলাটার কথা।

কামরার দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ডাকে সম্বিং ফেরে। ভদ্র-  
লোক বললেন—নিঃশ্বাস বইছে বলে মনে হচ্ছে না?

ভাল করে তাকালাম মৃতদেহটার দিকে। ভন্‌ ভন্‌  
করে মাছি উড়ে গেল। বুকটা কেমন যেন উঠছে নামছে।  
তবে কী—

—দেখুন, দেখুন, চোখ মিট মিট করছে। ভদ্রলোক  
আবার চোঁচিয়ে বলে, বটেইতো! তাক্কব ব্যাপার!

। ধীরে ধীরে চোখ খুলছে পাগলাটা। চমকে উঠলাম।  
তবে ও মরেনি! মনে মনে কেন জানি না বেশ খুসীই  
হলাম।

চোখ মেলে তাকাচ্ছে পাগলাটা। চোখে তার বোবা  
দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো নড়ছে। কিছু বলতে চায় কী? বোধ  
হয় তেঁটা পেয়েছে।

—জল খাবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

জবাব এলো না কিছুই। কেবল হান্‌কা হাসির রেখা  
খেলে গেল আবছা দৃষ্টিতে। পাশের ভদ্রলোক সিগারেট  
খাচ্ছিলেন। পাগলের দৃষ্টিটা যেন ঐদিকেই! কি  
চায় ও?

ভদ্রলোক রসিকতা করে প্রশ্ন করেন, সিগারেট খাবি?  
পাগল হাসে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ভদ্রলোক পাগলাটার মুখে আধ পোড়া সিগারেটটা  
গুঁজে দেন। অবাক ব্যাপার! মূমুর্ষু মাহুষ যে এভাবে  
সিগারেট টানতে পারে তা অস্বাভাবিক। ভর-ভর করে  
ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখের বোবা দৃষ্টিতে যেন ফিরে  
আসছে নহজ ভাব।

মরলো না পাগলাটা। তবে মরবেই। এ অবস্থায় ওর  
পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। ব্রেস ব্রীজে নেমে একথাটাই  
ভাবতে ভাবতে সেদিন অফিস গেছলাম।

মাসখানেক বাদে পাগলাটাকে আবার দেখে প্রথমটায়  
চমকে উঠি। ঠিক আগের মতই ঝুলতে ঝুলতে চলেছে।  
মাঝে মাঝে বিকট অট্টহাস্তে ফেটে পড়ছে। হতবাক  
হয়ে ভাবছি, ঐ দাক্ষণ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচল কেমন  
করে! মনে পড়ে গেল পাগলাটার কথা, হাম নেহি মর  
সক্‌তা।

এবার তা হলে সত্যি সত্যিই মরল পাগলাটা। কিন্তু  
তবু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। চোখ দুটো ড্যাব্‌ ড্যাব্‌  
করছে। যেন চেয়ে দেখছে প্লাটফর্মে দাঁড়ান মাহুষগুলোর  
দিকে। এবার হয়তো ঠোঁট নড়ে উঠবে। হাসবে।  
বোবা চাউনীতে ইংগিত করবে। এবারের ইংগিত হয়তো  
সিগারেটের বদলে জল। জল চাইবে পাগল। জল খেয়েই  
হয়তো চিংকার করে উঠবে—‘হাম্‌ নেহি মর সক্‌তা।’  
হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে ট্রেনের তলা থেকে।  
অট্টহাসি হেসে কাঁপিয়ে দেবে স্টেশন। কাঁপবে গাড়ীর  
হাজার হাজার মাহুষ।

গার্ড সাহেব নীল ফাগ নেড়ে গাড়ী ছাড়ার আদেশ  
দিলেন। ড্রাইভার হইনীল দিয়ে গাড়ী ছাড়ল।

অফিস ফেরতা বাবুদের নিয়ে ছুটল বজ্রবজ্র লোকাল  
পাগলাটার বুকের ওপর দিয়ে। এক সময় গাড়ীর নীল  
আলোটা দূরে বাকের মুখে মিলিয়ে গেল।

লেংড়া লালুয়া এলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিন পায়ে,  
পাগলের মৃত দেহটার কাছে। এতক্ষণ ভিড়ের চাপে  
আসতে পারেনি ও। চারদিক ঘুরে শুকলো মৃত দেহটা।  
বুঝিবা পরিচিতের গন্ধ পেয়ে মাথার কাছে বসে ডুকরে  
কঁদে উঠল—ঘেউ-ঘেউ-উ...।

# ক্রিকেটে জয়যাত্রা

শ্রীমুখীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এট-ল

যখন আমরা খেলাধুলার পশ্চন করি যুগযুগান্তর পূর্বে, তখন ভারত বিদেশী স্বৈরাচারের অধীন। তাহা হইলেও, রাজনীতির নোংরামিতে সৌভাগ্যক্রমে গা ডুবাই না আমরা, বালক-কিশোরেরা। খেলিতে খেলিতে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে আমরা পাই, খেলার মাঠই আমাদের একতাবন্ধনের তীর্থক্ষেত্র। এবং সেই মাঠ সাজাইবার মত সাজাইতে পারিলে, বিদেশীর অস্তরঙ্গতা লাভের আশ্রয় সহজে সফল হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার শোভাবাহার ক্লাবের, পরাক্রমশালী বিলাতী গোয়ার দল ইষ্টনারেকে খেলা উচ্চাঙ্গের ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করাতে। ইংলণ্ডের টনক তাহাতে যেভাবে নড়ে ভারতে ডামাডোল বাজাইয়া রাজনীতির দ্বারা তাহার ধারেই বাইতে পারে নাই। ইহার অনেক পরে, ভারতের অপূর্ণ হকি-কুশলতা, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের সীমা পরিসীমা রাখে না।

এদিকে কলিকাতায় হেয়ার স্পোর্টিং মুক্ত চিন্তাবাদী টাউনের, খেতাজ বনীবর্দদের আই-এফ-এ শীল্ডের গোড়া সজ্ঞারে নাড়া দেওয়াতে তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মোহনবাগানের শীল্ড জয় আন্তর্জাতিক অস্তরঙ্গতার পথ আরও সুগম করিয়া দেয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় ভারতের রাজনীতিকেরা কুটা দিয়াও ক্রীড়া সম্বাদিকে কখনও সাহায্য করে নাই। না করিলেও, ক্রীড়া সম্বাদির অপূর্ণ ক্রীড়াকুশলতায়, পর আপন হইয়া জগতের চক্ষে ভারতের মর্যাদা বুদ্ধির সাহায্য করে। ক্রমে আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা ও চ্যানেল সম্বরণে এবং গিরিশ জলবনে ভারতের কৃতিত্ব সোণায় মোহাগারূপে প্রতীয়মান হয় সর্বত্র।

খেলায় রাজা ক্রিকেট খেলা। বিশ্বস্ত ক্রীড়াবিদ এবং পাতিয়ালায় ভূতপূর্ব মহারাজ ও কুচবিহারের ভূতপূর্ব রাজার সক্রিয় সহায়তা না পাইলে, এ খেলা ভারতে দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইত না। বোম্বায়ের পার্শ্বাও ক্রিকেট খেলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহার অনেক আগে কলিকাতায় বিলাতী গোরা ও নাবিকের দল এবং

বর্মার ক্রিকেট দল আসায়, কলিকাতায় এ খেলার হাল-চালু হয় খুবই। ওদিকে প্রিন্স রণজী বিলাতে বসিয়া রণ জয় করিতে থাকে চমকপ্রদভাবে। শাদার মাটিতে বসিয়া রণজী শাদার মাথায় পা দিয়া খেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। রণজীর অপূর্ণ ক্রীড়া-কৃতিত্ব ভারতে ক্রিকেট খেলার সাময়িকভাবে উৎসাহ উদ্যোগ হয় বেশ। তাহার ফলে ইংলণ্ড হইতে সমাগতদের নাকানিচোবানি খাইতে হয় খুবই ভারতবর্ষে। খেলার উন্নতিকল্পে খাঁটি ভারতীয় দল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতে থাকে খেলা দেখিবার জন্ত।

ইহার পরিণতি দাঁড়ায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সৃষ্টি ও টেস্ট খেলার আয়োজন। মৃৎ সম্পাদিত ক্রিকেট সুভেনরে প্রায় পঁচিশ বৎসরের অধিক পূর্বে ইহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবর্তকেও ইহার বিশদ সমালোচনার অস্ত থাকে নাই। এ সকল ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথাসময়ে। এখন ক্রিকেট টেস্টের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি পরিবেশন করিতেছি।

ভারত বনাম ইংলণ্ড :

| প্রথম টেস্ট ইংলণ্ডে | জয়ী ইংলণ্ড | ১৯০২              | খেলা ১    |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------|
| দ্বিতীয়,, ভারতে    | ,,          | ১৯০৩-০৪           | ,, ৩ ড় ১ |
| তৃতীয়,, ইংলণ্ডে    | ,,          | ১৯০৬              | ,, ৩ ,, ১ |
| চতুর্থ,,            | ,,          | ১৯০৬              | ,, ৩ ,, ২ |
| পঞ্চম,,             | ,,          | ১৯১১-১২           | ,, ৫ ,, ৩ |
| ষষ্ঠ,,              | ,,          | ১৯১৩              | ,, ,, ৩   |
| সপ্তম,, ভারতে       |             | ১৯৬১-৬২ ভারত (২), | ৩         |

কয়টা খেলা একত্রিত করিয়া ব্যাটিং সাফল্য মঞ্চ-বেকারের এবার ৫৮৬ রান করায় তিনি সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। বল করার কুশলতায় নাদকানী সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রবার' জয়ী হইয়া ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিস বাইতেছে ৩১-এ জাহ্নমারী।

টেস্টে ভারতের জয় (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে) উপভোগ করিবার সৌভাগ্য সকলের সঙ্গে আমার হইল ৮৫ বৎসর বয়সে। খেলাধুলার এদেশে পশ্চনকারীর এই জয়ের আনন্দ কথায় প্রকাশ করার সাধ্য নাই। ক' বছর আগে

কানপুরে ভারতের হস্তে অষ্ট্রেলিয়ার পতন এই ‘রবার’ জয়ের সূচনা। টেটে পাকিস্থান ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ‘রবার’ লাভও ইহার পূর্বে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের ক্রিকেটে এই জয়যাত্রা ভারতকে ‘জাতে’ তুলিয়া দিল। হকিতে দিগ্বিজয়ী ভারতের দোসররূপে ক্রিকেটেও, সময়ে, ভারতের সমমর্যাদা লাভ করিবার সম্ভাবনার আশা সুদূরপর্যন্ত, এ কথা জোর করিয়া বলার উপায় আন্তর্জাতিক মহলেও বড় রহিল না। ভারতের বর্তমান টেটে জয়ে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রাদির মতামতও এই আভাস দেয়। কৌতূকের কথা এই, ইংলণ্ডে ইহার পূর্বে টেটে ইংলণ্ড বনাম ভারতের খেলার ফলাফলে সেখানকার সকলেই প্রায় এক স্বরে বলে, টেটে ভারতকে খেলিতে দেওয়া না-দেওয়া বিবেচনাযোগ্য।

ইহার মুখের মত জবাব ইংলণ্ড পাইল ভারতের বর্তমান ‘রবার’ জয়ে। চেতনা ইংলণ্ডের পূরা মাত্রায় ইহাতে হইল কিনা, ইংলণ্ডই জানে, কারণ বায়নাক্সা ইংলণ্ডের শক্তিশালী দল ভিন্ন ইংলণ্ডের সফররত হওয়া উচিত নহে।

যখন ইংলণ্ড মুকুবিয়ানা করিয়া বলে, ভারতের টেটে যোগদান করা না-করা বিবেচনাযোগ্য, তখন মুকুবি তুলিয়া

যায়, সেবার ভারতের শ্রেষ্ঠ কুশলীদের খেলায় আহতদের সংখ্যা—যার ফলে খেলা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রায়ই শেষ হইয়া যায়, তথাপি ৫টা খেলার মধ্যে তিনটা খেলা শেষ হয়, ফল সমান সমান হইয়া।

ভারত কর্তৃক পরাজিত ইংলণ্ড দল তত শক্তিশালী নহে, এই বলিয়া সাস্থনা লাভ করিতে ইংলণ্ড যদি চায়, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। সে স্থলে আমরা বলিব, দুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড ভারতে আবার আসুক অগ্নি পরীক্ষায় (টেটে) উত্তীর্ণ হইতে। দুই বৎসব বলিবার কারণ, ভারতীয় নবীন ক্রীড়াকুশলীদের কুশলতা এ দুই বৎসরের মধ্যে হ্রাস পাইবে না। ভারতবর্ষের মাটিতেই ইংলণ্ডের হার হইয়াছে স্বতরাং হেস্তনেস্ত সেই মাটিতেই হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের স্বরণে বোধ হয় নাই, ইংলণ্ডের অবস্থা এখন গ্রেন রঞ্জীর সময়ের অবস্থা নহে। ইংলণ্ডের খেলার মান উত্তরোত্তর অবনতির দিকেই ঝুঁকিতেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যথাসময়ে ইহা দেখাইয়া দিয়াছে। ভারত বনাম অষ্ট্রেলিয়ার খেলার ফলাফলও এ সম্পর্কে অসুসরণযোগ্য। ভারত অস্বীকার কখনই করিবে না, ক্রিকেটে ভারতের শিক্ষাগুরু ইংলণ্ড। গুরুকে শিষ্যের হারাইয়া দেওয়া গুরুর গৌরবেরই বিষয়।

## শ্রীমতিলাল স্মরণে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বহুবিধ সমস্তায় বাঙালীর মহাবিপর্ধ্যয়ে

আবার অখণ্ড বঙ্গে চাহি মোরা তব আবির্ভাব।

এ-যুগ সঙ্কটক্ষেপে মানবের একান্ত অভাব!

জঘন্ত লালসা লিপ্সা পাশবতা জাগে লোকালয়ে।

স্বার্থঘন্থে মস্ত নবে, হেরি সদা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে!

জীবন কাণ্ডারীহীন, অতি ঘৃণ্য নীচ মনোভাব!

দিবারাত্র লক্ষ্যক্ষম, খোঁজে কারু কিলে হবে লাভ,

নিম্নিতের পদে লোটে মহতের শির শঙ্ক-ভয়ে?

এসো ভাগ্যী ধর্মবীর, এসো কর্ম্মী হেথা বারম্বার!

জীবনদৃষ্টান্তে তব উজ্জীবিত রাখো বাঙালীরে!

আসমুদ্রে হিমাচলে কধুকণ্ঠ ধ্বনুক তোমার,

ত্যাগের মাধুরী মাঝে ভূজিবারে শিখাও গৃহীরে

“স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ” অতি—

জানায়ে প্রকৃত মর্ম্ম দূর করো আতির দুর্ম্মতি!

তোমাতে দেদীপ্যমান দেখিয়াছি বিরাট্ ভারত!

বৈদিক যুগের পুতঃ সত্যসঙ্ক ঋষিদের প্রাণ

তোমার প্রশস্ত বক্ষে রাক্ষসিদিব ছিল স্পন্দমান;

ধ্বনিত উদাত্ত কণ্ঠে রহি’ রহি’ ওম তৎ সৎ!

প্রাক্তন সংস্কৃতিশ্রোত উত্তরিয়া পাহাড় পর্বত

বিশাল সাগরপ্রান্তে বঙ্গভূমে তোলে ঐক্যতান!

ধর্ম্মে কর্ম্মে রাষ্ট্রতন্ত্রে অমৃতের পেয়েছ সন্ধান,

মহাতৃপ্তি লভি’ তাতে করিয়াছ পূর্ণ মনোরথ!

তুমি শুধু হিন্দু নহ, সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মী তুমি!

যাহা কিছু শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ তব বক্ষে বেঁধেছিল বাসা!

যেন তুমি চলমান সকল ধর্ম্মের জন্মভূমি!

প্রশান্ত হৃদয়ে ছিল অক্ষরস্ত পুণ্য ডালবাসা!

তোমার বিশিষ্ট শূন্য স্থান তুমি পূর্ণ করো এসে!

নতুবা র’বে তা শূন্য, স্বতি কেঁদে ফিরিবে এদেশে!

# সম্ব-সংবাদ

( আশ্রমী )

## মাতৃ-তিরোভাবোৎসব

কালচক্রের বিরামহীন গতিছন্দে দীর্ঘ বত্রিশটি বৎসর পার হয়ে গেল। বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ সাল, বত্রিশ-বর্ষীয় মাতৃ-তিরোভাবোৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। তিরোভাবোৎসব এত ঘটা করে আর কোথাও হয় কিনা জানা নেই। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত কোনও অবতার পুরুষের বা কোন মহামহিমাময়ী নারীর মৃত্যু উৎসব জাঁকিয়ে হ'তে দেখা যায় না, যদিও বা হয় অতি সংক্ষেপে হয় তিথি পালন। কারণ, ভারতবর্ষ মৃত্যুকে স্বীকার করে না—আত্মা যেমন অবিনাশী, অজ, বাণত-জীবনও তাই। কিন্তু আমাদের পরলোকগতা মায়ের—সম্বজ্ঞননী দেবী রাধারাণীর জন্মদিন অপেক্ষা তিরোভাব দিনেরই মাহাত্ম্য অধিক—সাদৃশ্যের জাঁকজমকেরও অধিক্য ততোধিক। যেহেতু তিরোভাবের মধ্য দিয়েই মায়ের সুবাস্ত পুনরা-বির্ভাব সম্বন্ধিত উপলব্ধি—যার উজ্জ্বল উন্মেষ দৃষ্ট হয় আশ্রমের মাতৃমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মায়ের মুন্ময়ী প্রতিমায। মাকে ঘিরে প্রতিবৎসর পক্ষকাল ধরে আনন্দের হাট বসে এই অবতরণ লগ্নে।

এবারও ২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় আমরা সমবেত হলাম মাতৃমন্দির অঙ্গনে। অঙ্কাদ্বন্দ্বজোড়া সুসজ্জিত মণ্ডপটি ধূপধূনা পুষ্পচন্দনের সৌরভে ভরপুর। তারই মধ্যে সকলে আসন করে বসলাম। সন্ধ্যার উপাসনার শব্দ বেজে উঠল, কুমারী কণ্ঠে মাতৃবন্দনা রক্তত হ'ল। তারপর সমবেত কণ্ঠে উপাসনার মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠল। উপাসনা শেষে পুনরায় কুমারীরা দেবী মহামায়ার স্তুতি করলেন, সম্বাচার্য্য শ্রীস্বর্নানারায়ণ তর্কতীর্থ অকুণ্ঠিত চিন্তে মায়ের মহিমা ঘোষণা করলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি। সকলে নিস্তব্ধভাবে মায়ের আবির্ভাবকে অন্তরে দৃঢ়তর করে নিলেন। ধ্যানভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এই উপলব্ধিরই ভাবধন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। সর্বশেষে সম্বকুমারীগণের মাতৃকীর্তনে মাতৃঅঙ্গন মুখরিত হয়।

তারপর দিন ২২শে অগ্রহায়ণ। এই দিনটি এত নিবিড় ভাবধন যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। প্রাতঃ

৪ ঘটিকা থেকে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নধারায মাতৃ-প্রবাহ বয়ে গেছে। হুঁচী অম্লযায়ী একের পর এক হয়ে চলেছে। প্রভাতী মন্দের পর সমবেত উপাসনা। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে প্রথমে ভজন ও উৎসব বাণী পাঠ। তারপর সমবেত কণ্ঠে উপাসনার মন্তোচ্চারণ, শেষে “জীবনসঙ্গিনী” গ্রন্থের অংশ বিশেষ পাঠ। তারপর একে একে গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ষোড়শোপচারে মাতৃপূজা ও ভোগারতি, সঙ্গে সঙ্গে চলে অবিরাম মাতৃনাম জপ এবং সূর্যাস্ত অবধি হোম। হোমাস্তে শ্রীশ্রীসম্বগুরুদেবের আলীষবাণী পাঠ, সমবেত সান্ধ্যোপাসনা এবং প্রায় হাজার নরনারীকে নবান্ন প্রসাদ বিতরণ। সম্বের সম্মান-সম্মতি এবং অম্লবাণী ভক্তবৃন্দ এইদিন উপবাস-ব্রত পালন করেন—নবান্ন-প্রসাদ গ্রহণে উপবাসের বিরতি হয়।

তারপর ছয় দিন ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমক্ষে সূখা কণ্ঠে শ্রীস্ববোধচন্দ্র মতিলাল মহাভারত গান করেন। তিনি ষষ্ঠাক্ষরে সমুদ্রমগ্নন, কচ ও দেবযানী, নল ও দময়ন্তী, তারপর অভিমহু, দ্রোণ ও কর্ণের অপসারণ পালা গান করেন। “মহাভারতের কথা অমৃত সমান”—ক্রমবর্দ্ধমান ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাগমে তা' প্রতীতি হল। তারপর চারদিন অমিয় কণ্ঠে অমিয়গোপাল অমিয় নিমাই চরিত ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ কীর্তন করেন। তিনি প্রথম তিনদিন চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা বাহা বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ, তাহাই মধুরকণ্ঠে ভক্তিভাবে আশ্রুত হ'য়ে বর্ণনা করেন। চতুর্থ দিনে নারদের মহাপ্রসাদ লাভ—সে এক অপূর্ব গাথা। অমিয়গোপাল সুনিপুণভাবে এই চিত্র অঙ্কন করেন। পরদিন শ্রীমদভাগবত কথকতা করেন পণ্ডিত শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ। তাঁর কথকতায় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রথমে সম্বজ্ঞননীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলিটি স্বতন্ত্র স্থানে প্রকাশিত হ'ল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ লীলা কীর্তন করেন। তাঁর কথকতার মধ্যে পূজ্যপাদ সম্বগুরুদেবের মর্ম্মকথাই প্রকাশ পাওয়ায় সম্ব মন চমৎকৃত হয়।

সর্বশেষে সমাপ্তি দিবসে মাতৃভক্ত বামা জ্যাপার জীবনী (গীতি আলেখ্য) রেণুশ্রী গীত-মন্দিরের প্রযোজনায় ও শ্রীঅলকেশ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পরিবেশিত হয়। ইহার দ্বারা উৎসব মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়।

মধ্যে রবিবার এলা পৌষ উৎসব সভা। সভায় কালিঘাট মাতৃকাশ্রম প্রণব-সম্মেলন প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু অশীতিপর বৃদ্ধ সম্মানীয় যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। ভাব-সমাধিমগ্ন তাঁব উপদেশবাণী অগণিত শ্রোতা চিত্রাপিতের মত শ্রবণ করেন। পিতাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রিয় শিষ্যশিষ্যা-

গণও সভায় উপস্থিত থাকেন। আশ্রমকন্যা শুভ্রা দেবী সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবপূর্ণ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। তারপর মাতৃকাশ্রমের ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দজী ও নীলিমা দেবী অপূর্ণ ভাবময় মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীকৃষ্ণদেব চট্টোপাধ্যায় পিতাজীকে সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদের পরিবর্তে সপ্রস্তুত প্রণতি নিবেদন করেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রক্সালু চিত্তে পিতাজীকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। প্রারম্ভে সজ্জকন্যারা মাতৃসঙ্গীত গান করেন।

মাতৃমন্ত্র জপান্তে পূর্ণমদঃ মস্ত্রে চৌদ্দদিনব্যাপী আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

### শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের আবির্ভাবোৎসব

কালিক নিয়মে ১৯৬৭ সালের ২২শে পৌষ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীসজ্জগুরুদেবের অশীতিতম আবির্ভাবোৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। গুরুভীর্থে শ্রীগুরুর দীক্ষিত সন্তান-সন্ততি ছাড়া ধারাই সমাগত হয়েছেন, তাঁরাই শ্রীগুরুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে গেছেন। অনেকেরই কণ্ঠে সবিস্ময় মন্তব্য শোনা গেল—“সজ্জগুরুদেব অপ্রকট হয়েছেন কোথা! তাঁকে তো অধিকতর প্রকট বলেই মনে নয়। সজ্জভীর্থে সজ্জগুরু প্রাণবন্ত হয়েই আছেন।” সভাই তাই। তাঁর সজ্জীব প্রাণের পবন নিত্য অতুভূত হলেও উৎসবদির মধ্যে অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠে।

এবারকার উৎসবেই দিন সংক্ষিপ্ত—মাত্র দু'টিদিন। কিন্তু এই দু'টি দিনই বড় জমাট ভাবধন রূপ পরিগ্রহ করেছিল! ২১শে পৌষ শনিবার অধিবাস। ঐ দিনই অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় আশ্রমে মহাযোগী ও ভক্ত সম্মেলন। সম্মেলনটি মাধুর্যপূর্ণ। স্ব-স্ব অভিব্যক্তিতে গুরুনিষ্ঠ অন্তরের সপ্রেম প্রস্কাই-ফুটে উঠে। সম্মেলন চলে অপরাহ্ন ৩টা হ'তে রাত্রি প্রায় ৭টা পর্যন্ত। সম্মেলন শেষে সমবেত উপাসনা—উপাসনা অন্তে প্রবর্তক বিস্তারিত ভবনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান বিদ্যনাথ ঘোষ স্তম্ভুর কণ্ঠে ভক্তভাবে কয়েকটি ভজন গান করেন, তাঁর সঙ্গীত, সমাগত সকলকেই অশেষ তৃপ্তি প্রদান করে। ইহার পর সজ্জগুরুদেবের সমাধিক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ও দীক্ষাক্ষেত্রে দীপ দান করার

পর আবার সজ্জিব অন্তরঙ্গ ও সহযোগী সভ্য-সভারী মাতৃ-অঙ্গনে সমবেত হন। এই অন্তরঙ্গ অধিবেশনের বিষয়বস্তু শ্রীগুরু মন্দির নির্মাণের সঙ্কল্পবর্তের অধ্যয়ন। এই বৎসরেরই ১১ই শ্রাবণ গুরুপূর্ণিমা তিথিতে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়; ব্রত পূর্ণ করার ক্ষমত শক্তি পছা-অবলম্বনের ক্ষমতা আলাপ আলোচনা হয়। উৎসবের অধিবাস দিবসের ইহাই ছিল বড় অঙ্গ।

পরদিন রবিবার ২২শে পৌষ। পূজ্যপাদ সজ্জগুরু দেবের পূণ্য আবির্ভাব দিবস আজ। এইদিন প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় সজ্জ-মন্দিরে সমবেত উপাসনা হয়। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে প্রথমে ভজন ও গুরু-বন্দনা তারপর উপাসনা। উপাসনা শেষে সজ্জগুরুদেবের বাণীপাঠ ও পুনরায় একটি ভজন সঙ্গীতের পর সজ্জগুরুদেবেরই বচিত সঙ্গীতে পল্লী-পথ মুখরিত করে সজ্জের আবালবৃদ্ধবনিতা সজ্জপরিক্রমা করেন। তারপর বেলা ৮ ঘটিকায় দীক্ষাকার্য আরম্ভ হয়। এবার দীক্ষার্থী ছিলেন মোট ৪ জন—শ্রীমতী হেমাস্বিনী সরকার, শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল, শ্রীগুরুপদ নন্দী ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী করুণা নন্দী। এই ৪ জনই সজ্জের সহযোগী সভ্য-সভ্যাপ্রার্থী ভূক্ত করেন। মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণার মন্দিরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। তারপর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় উৎসব সভা। সভাপতিত্ব করেন রিষড়ার প্রেম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতিসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমৎ স্বামী তারানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। ইনি শ্রীমৎ স্বামী বালানন্দ

# শ্রীমতিলাল ও তাঁর 'জীবন সঙ্গিনী'

ইন্দু গুপ্ত

১

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সজ্জগুরু স্বর্গত মতিলাল রায়কে আমরা কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করে রেখেছি। যেমন তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, আদর্শ দেশপ্রেমিক ছিলেন, যোগী, জ্ঞানী এবং কর্মী ছিলেন। গুরু হিসাবেও আমরা তাঁকে একান্ত আপনার করে পেয়েছি। কিন্তু তিনি যে একজন মস্তবড় সাহিত্যিক ছিলেন, এ খবর আমরা অনেকেই রাখি না। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ছিল অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর। কেননা তাঁর সমগ্র জীবন-সংবৃত্ত অধ্যাস-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর রচনাশৈলী বিশ্বয়কর সম্পূর্ণতালাভে সমর্থ হয়েছে। তিনি প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ধর্ম, দর্শন, জীবনচরিত, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি সবই আছে। এ ছাড়া তাঁর অল্পসংখ্য রচনা আজো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

রূপদক্ষ শ্রীমতিলালের ব্যক্তিগুরুষের স্পর্শে প্রাণদীপ্ত সাহিত্যের এতগুলি শাখা এবং মনোজ্ঞ চিত্র বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরবার এমন সাধার্থ্য আমার নেই।

তবু তাঁর অসাধারণ বিশিষ্টতার সামান্য কয়েকটি দিকের সঙ্গে পন্নিচয় সাধন করতে চেষ্টা করব।

তাঁর 'জীবন-সঙ্গিনী' একখানা উচ্চ শ্রেণীর জীবন উপন্যাস বা জীবন-মহাকাব্য। মাহুয়ের প্রবৃত্তি ও হৃদয়-ছন্দের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবন-সঙ্গিনীর আধ্যাত্মবস্ত্ত বিবর্তিত এবং সেই বিবর্তন নূতন একপ্রকার আদর্শবাদে রসপ্লুত হয়ে নবতন ধারার সূত্রপাত করেছে। সে ধারা নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক।

'জীবন-সঙ্গিনী' শ্রীমতিলালের নিজেই জীবন বাহিনী। এই কাহিনীর নায়ক তিনি নিজেই স্বয়ং। শ্রীরায় বাঙালী ছিলেন না। রাজপুতানার রক্ষ-কঠিন প্রান্তরের শোণিত-ধারার পুরুষ হয়েও, বাংলাদেশের হৃদয়ের অপূর্ণ স্পর্শে জীবের দাধ্যাদীয়া লজ্জন করে তন্ময় ভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে চারিদিক বিড়ম্বিত জীবনে হ্রাসপাক আর দুর্দিন, অল্পদিকে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে একটি সামঞ্জস্যের সূত্রে গেঁথে তোলার প্রদীপ্ত অঙ্গীকারই জীবন-সঙ্গিনীর নায়ক চরিত্রের বিকাশ ও পরিণামের ভিত্তি।

বাংলা প্রেমাহুভবের লীলাভূমি। ভক্তি ও জীবন-

ব্রহ্মচারীজীর সুযোগ্য শিষ্য—ইহারই গুরুভাই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সভার বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথি। মোবনাশারীর কর্মীবৃন্দ দ্বারা সজ্জিত সভামণ্ডপে সকলে সমবেত হইলে প্রবর্তক মহিলা সদনের কস্তারা উদ্বোধন সঙ্গীত করেন। তারপর প্রবর্তক নারীমন্দির বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী জ্যোৎস্না মল্লিক "সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে" সজ্জগুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করিলে পর মহিলাসদনের ছাত্রী কুমারী ছবি সরকার মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে মাল্য ভূষিত করেন। তারপর প্রদ্বৈয় ডক্টর অধ্যাপক মহোদয় স্মৃতিষ্ঠ কণ্ঠে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ভক্তিমূলক ভজন-সঙ্গীত, স্তব-স্ততি প্রভৃতি কীর্তন করেন। সঙ্গীতের মধুময় ছন্দে সভার আবহাওয়াও মধুময় হয়ে

উঠে। সেই মধুমাখা আবহাওয়ায় অভিপ্সাত হয়ে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রারম্ভিক ভাষণের দ্বারা সভাপতি বরণ করেন। সজ্জাচার্য শ্রীসূর্যনারায়ণ তর্কতীর্থ দেবভাষায় অঙ্কাজলি অর্পণ করেন। পরমপূজ্য সভাপতি মহোদয় অনতিদীর্ঘ এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে শ্রীমান বিশ্বনাথ ঘোষের ভজন গানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং সমাগত তত্ত্বমণ্ডলীর পক্ষ থেকেও পূজ্যপাদ সজ্জগুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সমবেত উপাসনা ও সমবেত ভজন গানের পর পূর্ণমদঃ মস্ত্রে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

রসের অর্ধিত সাযুজ্যে আত্মবিলোপী তন্ময়। এই  
বাংলার মর্মচ্ছেদী আত্মনাদ—

‘পিয়া বিনে পাঁজর

ঝাঁঝর ভেলা’

—শ্রীমতিলালের মনে কিভাবে গিয়ে পৌঁচেছিল  
জানিনা, তবে এইটুকু জানি ভাব সম্মিলনে যার শেষ, সেই  
শেষই অশেষ হয়ে তাঁর জীবনকে কবেছে মহিমময়।

ক্ষয়িষ্ণু ধর্মচক্র তন্ত্রের নাভিস্বাসের মধ্যে জীবনকে  
খুঁজে পাওয়ার আকৃতি নিয়ে নায়কের সংগ্রামমুখর  
দিনগুলির একটা ধারাহিক ইতিহাস শুধু একটি ব্যক্তি  
সত্তারই নয়, সমগ্র জাতির, নমগ্র যুগের।

নায়ক মনের দুই প্রতিকূল ওটকে স্পর্শ করে স্বন্দেব  
ঘূর্ণি জেগেছে, কিন্তু গতি রুদ্ধ হয়নি। জীবন-সঙ্গিনী  
সংহতির সেতু রচনা করে নায়ককে দেখিয়েছেন সমাজ-  
সচেতন চলার ছন্দটি, যে ছন্দের প্রতিটি ঝংকারে জীবনবেদ  
ঝংকৃত হবে উঠে। যে ঝংকার শুধু বলে :

ভাগবত চেতনার উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা।

ভাগবত চেতনায় প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে প্রেম ও  
ঐক্যের সংহতি গঠন।

এই সংহতিকে কেন্দ্র করে দেশ ও জাতির ধর্ম, সমাজ  
শিক্ষা ও অর্থনীতিমূলক সমস্তার সমাধান।

বিবর্ত প্রাণ চায় ব্যাপ্তি। ক্ষুদ্র সীমারেখার ভেতর  
তার ছুপ্তি নেই। দৈন্ত আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে।  
মানুষ ঈর্ষা, স্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে বড় করে দেখে। কিন্তু  
তবুও এসবকে সমর্পণ কবে দিতে হবে আমার সর্বস্ব যিনি  
তাঁর পাশে—আমার চিন্তা কর্তৃক দেহ মন প্রাণ আমার  
সব কিছু।

২

জীবন-সঙ্গিনীর নায়ক হুগলী জেলার চন্দননগরে  
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জাতিতে চৌহান বংশীয় ছেজী  
রাজপুত্র। জন্মকালে স্মৃতিকাগারে ছাইয়ের গাদায়  
গিয়ে পড়েছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি।

স্থানীয় ভোলা মাঠারের পাঠশালায় এঁর শিক্ষারম্ভ।  
ছ’বৎসর বয়সে কলকাতায় ক্রী চার্চ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি  
হন। এই সময় তাঁর টাইফয়েড হয়। বাচবার আশা

থাকে না। ৪১ দিন রোগভোগের পর এক আশ্চর্য  
ঘটনা ঘটে। তিনি স্বপ্নে শিবকে প্রত্যক্ষ করেন। শিব  
তাঁর মুখে অব তুলে দেন। এই ঘটনার পরই তিনি ভাল  
হয়ে উঠেন।

শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে অনাধারণ পাঠাচুরাগ  
ছিল। কিন্তু পড়াশুনা বেশীদূর করতে পারেননি।  
প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়।  
এবং এর পরই অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে অর্থ উপার্জনে ত্রতী  
হতে হয়।

কিশোর বয়সেই বিবাহের জন্ত ব্যাবুল হয়ে উঠেন।  
২৫ বৎসর বয়সে ৯ বৎসর বয়স্কা এক বালিকার সঙ্গে  
এঁর বিবাহ হয়। বালিকার নাম রাধারাণী।

বিবাহের ছয় বৎসর পর এক কস্তা জন্মগ্রহণ করে।  
নাম পিকলু। পরিবারের পরিবেশ অল্পকূল ছিল না।  
অনাদর আর উপেক্ষায় পিকলু দশমাস বয়সেই প্রাণত্যাগ  
করে। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জীবন বিষময় হয়ে উঠে।

এর পব থেকেই শ্রীমতিলাল রায় তন্ত্র, সহজিয়া,  
আউল, বাউল, সাঁই, সতীমা প্রভৃতি দলে মিশতে শুরু  
করে দেন। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হয় না।

পরে ত-দ্বিক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর নিবট সন্ন্যাস  
বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং সিদ্ধিলাভ করেন।  
কিছুদিন পুন তিনি স্বামী সচ্চিদানন্দজীর কাছে ব্রহ্মমন্ত্র  
লাভ করেন।

দশনামী সম্প্রদায়ের রামানন্দ গিরি তাঁকে প্রাণায়াম  
যোগ ও শ্বাস মালায় অঙ্গপা মন্ত্র দেন। এই অঙ্গপা মন্ত্রে  
তার মন কিছুটা স্থির হয় এবং অধ্যাপন রাজ্যে প্রবেশের  
দ্বার খুলে যায়।

১৯০৬ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুন অনামী সাধু রামজী তাঁকে  
ব্রহ্মচর্য ব্রতে ব্রতী করেন। এই সময় তাঁর বয়স ২৪ এবং  
বাধারাণীর বয়স ১৮।

শ্রীমতিলাল রায় শুধু অধ্যাপন সাধনাতেই রত ছিলেন  
না, ‘সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়’ নামে এক সেবা সমিতি  
গঠন করে তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় মন দিলেন।  
১৯০৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হোল। এবং  
তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিলেন।

বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করার জন্ত শ্রীমতিলাল রায় ও তাঁর সহকর্মীরা কানাইলালকে কারাগারে রিভলবার পাঠান। এবং চন্দননগরে এক বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন।

এই সময় ১৯১০ খৃঃ অব্দে ঋষি অরবিন্দ অজ্ঞাতবাসের জন্ত চন্দননগরে আসেন এবং শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বতঃ প্রেরণায় শ্রীমতিলালকে ত্রি-মন্ত্র (জ্ঞান-শক্তি-প্রেম) দান করেন। এবং তাঁরই অমুপ্রেরণায় ১৯১৫ খৃঃ অব্দে প্রবর্তক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে।

১৯১৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরায়ের পারিবারিক জীবন শেষ হয় এবং ১৯২১ খৃঃ অব্দে নতুন সঙ্কল্পের উপর ভিত্তি করে নতুন সংসারের সূচনা হয়। শুধু চন্দননগরে নয়, চট্টগ্রামেও অল্পরূপ আশ্রম গড়ে উঠে। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে।

১৯১০-১৯২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরায় চেয়েছিলেন অরবিন্দময় হয়ে উঠতে। কিন্তু তা শেষ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। ১৯২১ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাহ্যতঃ তাঁর বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠলো।

রাধারাণী দেবী সজ্জজননীরূপে সমগ্র জাতিকে ছন্দিত করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। শ্রীরায় ভাগবত চেতনার উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা দিতে প্রবর্তক সঙ্কল্প নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করলেন।

১৯২২ খৃঃ অব্দে রাধারাণী দেবীর দেহত্যাগ ঘটে। জীবন-সঙ্গিনী গ্রন্থের রচনা শুরু হয় সজ্জজননীর দেহ-ত্যাগের পর। এর পরেও তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন দীর্ঘদিন। সে ইতিহাস হয়ত কেউ লিখবে। ভবিষ্যৎ তার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯৫২ খৃঃ অব্দের ১০ এপ্রিল তিনি আমাদের মধ্য থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অক্ষুরক্ত মাধুর্যের উৎস যেখানে, যেখানে তাঁর জীবন সঙ্গিনী রসতীর্থ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেখানে যেন আজো গুনি বেদনার অঙ্ককারে নিরুদ্ধ ক্রন্দন “সাঁ তু অগ্নিন পরম প্রেমরূপা।”

৩

পরম প্রেমরূপা জীবন-সঙ্গিনী যখন জীবনে সমাসয়

হন, তখন অম্লভূতির বহু সহজ ভাবেই নেমে আসে। এবং কেবলমাত্র তখনই সেই অনবদ্য অম্লভূতি সর্ব-মানবের রসসুখ ও হৃদয়ানন্দের উৎস হয়ে উঠে। বিস্ময়কর হলেও, একথা সত্য শ্রীরায়ের জীবন শুধু একা শ্রীরায়েরই নয়, অধ্যাপন-গষ্ঠীর সারা ভারতবর্ষের জীবন। লেখক রহস্যময় জীবনবেগেব প্রতীক। এঁর নায়িকা এই প্রতীককে আশ্রয় করে প্রতীককেই আকর্ষণ করেছেন আনন্দ চৈতন্যময়লোকে। নীমার বেদনা ধাপে ধাপে গীমাহীন হয়ে উঠেছে। পথচলার সব চেয়ে বড় বাধা দেখা দিয়েছে, কিন্তু গতি থামেনি, পরিবর্তন এসেছে, সংগ্রাম জয়ী হয়ে উঠেছে। প্রাণের লীলা প্রেমের লীলায় পর্য্যবসিত হয়ে উঠেছে। জীবন ভাব-সংকেতপ্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। সংজ্ঞাবহ, আত্মসমর্পণ, দৃঢ় সংবদ্ধরূপ নিয়ে পাঠককে জীবননির্বাহের দিকটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় নায়কের নাটকীয় চরিত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদালাভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এর পটভূমি এবং এর পশ্চাদভূমি বাংলার ঐতিহ্য—সর্বস্বভূতির বিশেষ স্তরে নীমা অসীমার মিলনতত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ নায়ককে অভিভূত করেছে, কিন্তু আচ্ছন্ন করেনি। তাই প্রবাহমুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং প্রবর্তক সংঘ প্রতিষ্ঠার কৃতকার্যও হয়েছিলেন। কিন্তু সকলের মূলে তাঁর শক্তিরূপ মাতৃতত্ত্বের নিবিড়তম উপলব্ধি।

জীবন-সংকেত এবং সাহিত্য-সংকেত এক হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর ‘জীবন-সঙ্গিনী’ মহাকাব্যে। সাম্প্রতিক কালে চতুস্পার্শ্বের জগৎ প্রেম-জীবনের মাধুর্য হতে বঞ্চিত। এমনকি রোমান্টিক স্বপ্নালুতাকে স্বীকৃতি দিতেও অক্ষম। অথচ জীবন বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নয়। তার স্বপ্ন আছে। কেননা তার ভবিষ্যৎ আছে। রোমান্টিক স্বপ্ননালুতা ব্যতীত জীবন অর্থহীন। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের স্রষ্টা মানুষের ভাবালুতার মধ্যে একথা ভুললে চলবে না। সমাজ বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপ মানুষের স্বপ্ন-সম্ভাবনা। জীবন বিবর্ণ নয়, ধূসর নয়, অম্লবর্ণও নয়। কাজেই তাকে যত



ভেবে যান্ত্রিক আওয়াজ তোলার অর্থ হয় না। সাহিত্যে এই অর্থহীন অনর্থের বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ। জীবন-সঙ্গিনী গ্রন্থে এই বিদ্রোহের স্বর স্পষ্ট। নিখিল সৃষ্টির স্বার্থ স্বরূপটি কে না বুঝতে চায়? শিশু বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকেই ছুটেছে। এই বোঝার উদ্দেশ্যে, জীবনের, যৌবনের আব মাছুষের গানে মুগ্ধ ভ্রমণ। এ ভ্রমণে প্রত্যেকটি মাছুষ মুগ্ধ বিম্বিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। জীবন-সঙ্গিনীর নায়কও ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। অদমিত ভোগাশক্তি তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলিছে। তাঁর ক্ষাপামী বয়সকে পর্ধ্যস্ত বিচলিত করে তুলেছে। যে বয়সে মাছুষ হেসে খেলে বেড়ায়, ফুটবল খেলে, আর ইস্কুলে ঘাঘ সেই বয়সে বিয়ে করার জন্ত পাগল হয়ে এর নায়ক হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। শিব স্তম্ভের উপাসক মাছুষ বিচলিত হয়েছে। কিন্তু একটু গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখি, এই পাগলামীর মধ্যেও সৃষ্টির হাহাকার, মানবীয়তার স্তম্ভান সংকল্প। বধু হয়ে যিনি এলেন, তিনিও নিতাস্থই বলিক। কিন্তু তাতে কি! বেদনা যেখানে জগজীৱ, গতি যেখানে চির নূতনের অভিমুখী সেখানে যত কামনাই থাকুক তা স্তম্ভরই। পিকলুর জন্ম এবং মৃত্যু সান্ত্বের বৃক অনস্তের লীলা। পারিবারিক ঘূর্ণির মধ্যে হাবুডুবু খেয়েও, এয়েন 'সত্যের আনন্দরূপ নিয়েছে মূর্তি।'

রামজীর অমৃতস্পর্শে অশ্রু ঝরে পড়েছিল দু'চোখ বেয়ে। কেন, একথা যখন ভাবি তখন দেখি শ্রীঅরবিন্দের বন্ধন-ছেদের তাঁর যে বেদনা তা মরণবিজয়ী মানবাত্মার কান্না। দীক্ষা এইখানেই।

শ্রীরায়ের জীবন-গগনে শ্রীঅরবিন্দের অন্তগমনই নব-সূর্যোদয়। ত্যাগবিরোধিত মুক্ত জীবন প্রাদর্শ্যে কালীর পূজারী খুঁজে পেলেন মহাকালীকে—সংঘর্ষে। আর সংঘের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে। বিরূট এবং ব্যাপক যে জীবন সে জীবন চিরজীবী-তম্বু। সে তম্বুর রসাত্মাদের আগ্রহ যদি কারো থাকে 'জীবনসঙ্গিনী'র মধ্যেই সে তাকে পাবে।

পৃথিবীর যে কোন সংসাহিত্যের সঙ্গে 'জীবনসঙ্গিনী'র তুলনা করা চলে। জীবনসঙ্গিনী শুধু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই নয়, মহত্তম সাহিত্যও। শ্রীমতিলালের জীবনবেদ বেদনাজাত। যে বেদনা সৃষ্টির বেদনা, যে বেদনা জগৎ এবং জীবনকে সম্বন্ধের স্বর্ণস্থলে গাঁথে সে বেদনা জীবনসঙ্গিনীর মর্ম্মকোষে লুক্কায়িত—একথা অতিরঞ্জিত নয়। একটা বিরূট জীবনের আলেখ্য এই মহাগ্রন্থ বাঙালীর রামায়ণ মহাভারতের ছায়া নিত্যপাঠ্য। ইহা হেলায় হারালে চলবে না। এই বইয়ের বহুল প্রচারের দিকে প্রবর্তক সজ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি শুধু আর একটা কথা বলব যে, যে জীবন—জীবন দিয়ে জীবনবেদী নির্মাণ করে গেলেন তিনি শুধু কোন সম্প্রদায়ের ন'ন, সর্বসত্ত্বের সর্বমানস্বের। তাই সর্বমানবের হিতার্থে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা প্রবর্তক সজ্জের একান্ত কর্তব্য হোক।

প্রবর্তক সাংস্কৃতিক সাধন-চক্রের সাহিত্য শাখায় ৭ম অধিবেশনে প্রণীত।

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেটে ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত।

**কার্লসবার্গ**

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসম্ভবগুজর জীবন-পঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ (সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর) ॥ ১৩৫৬-৫৭ বঙ্গাব্দ ॥

২৭

শ্রীহিন্দুভূষণ রায়

১ সেপ্টেম্বর—চট্টগ্রাম আশ্রম-পরিদর্শনের জন্ম কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলা দেবী সহ সম্ভবগুর চট্টগ্রাম-যাত্রা।

৪ সেপ্টেম্বর—চট্টগ্রাম সম্ভবগুর 'জন্মষ্টমী'-বাণী।

৮ সেপ্টেম্বর—সম্ভবগুর উপস্থিতিতে দেশনেত্রী নেলা সেনগুপ্তার পৌরোহিত্যে চট্টগ্রাম মহরের নেতৃবৃন্দকে লইয়া সম্মেলন—পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্ভবগুর ভাষণ।

১০ সেপ্টেম্বর—চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আশ্রমের বালক-বালিকাগণ কর্তৃক সম্ভবগুরকে বিদায়াতিনন্দন। (১) (২)

২৪ সেপ্টেম্বর—ডক্টর শ্রীমাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে চুঁচুড়া ময়দানে হুগলী জেলা পূর্ববঙ্গ

বাস্তব্যাগী মহাসম্মেলন। সম্ভবগুর প্রধান অতিথি-রূপে যোগদান ও ভাষণ প্রদান।

২৫ সেপ্টেম্বর—চন্দ্রনগরে সম্ভবগুর শ্রীমন্দিরে চাতুর্মাস্ত্রের দ্বিতীয় পূর্ণিমা সম্মেলন—সম্ভবগুর বাণী প্রদান।

৩০ সেপ্টেম্বর—কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র দে ও নির্মলা দেবী সহ সম্ভবগুর উত্তর-বঙ্গে যাত্রা। জলপাইগুড়িতে সম্ভবগুর অমুরাগী নলিনীরাধন ঘোষের ও শিলিগুড়িতে সতীশচন্দ্র করের বাড়িতে অবস্থান। জলপাইগুড়ি, কাশিয়াং ও দার্জিলিং—প্রত্যেক স্থানে বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত ঘুরোয়া বৈঠক। জলপাইগুড়ি আনন্দ কলেজের অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে ছাত্রছাত্রীগণের নিকট সম্ভবগুর ভাষণ প্রদান। শিলিগুড়িবাসীর পক্ষ হইতে সম্ভবগুরকে অভ্যর্থনা। সভায় সম্ভবগুর ভাষণ। দার্জিলিং 'জুবিলি স্তানারটোরিয়ামে' এক বৃহত্তী সভায় ভারত-সংস্কৃতির অমুরাগে বাংলার বিশেষ সাধনেতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের অমুরোধে তাঁদের হোমযজ্ঞাহুষ্ঠানে যোগদান ও যজ্ঞের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীগণকে সদ্ভাবে জীবনযাপনের উপদেশ প্রদান।

২ অক্টোবর—সম্ভব মহাত্মা গান্ধীর একাধীতম জন্মতিথির অমুষ্ঠান।

১২ অক্টোবর—মহালয়া পর্বাহুষ্ঠান। বিগতাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধান্তর্পণ।

(১) চট্টগ্রাম আশ্রমস্থিত 'প্রবর্তক শিশু সদন'-এর বালকবৃন্দ কর্তৃক সম্ভবগুরকে বিদায়াতিনন্দন।

"হে গুরুদেব! আজ বিদায়ের দিনে আমরা চট্টগ্রামের আশ্রম-বালকগণ সিদ্ধু-মেথলা, শৈলকিরীটিনী চট্টলা মারের অঞ্চল-প্রান্তে দাঁড়াইয়া তোমার রাতুল-চরণে প্রণাম করিতেছি। রিক্ত আমরা, দীন আমরা, তোমার পূজার নৈবেদ্যের ডালি সাজাইবার মত প্রচুর জব্যসম্ভার আমাদের নাই। হে মহীয়ান! তাই তোমার পদপ্রান্তে রাশিবার ক্ষম্ত আনিয়াছি ভাব্য মারফতে অন্তরের হৃৎকণ্ড ও ভাব-পুষ্প-মাগিকা। হে সকল কলুব-তামস-হর! তুমি আমাদের অকপট ভক্তি-অর্থ্য গ্রহণ কর। আমাদের কৃতার্থ কর।

তুমি আমাদের জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে, হৃদয়ের পথে চালিত কর। তুমি আমাদের চঞ্চল চলার পথে সামরিকভাবে প্রত্যক্ষ হইলেও তোমার অতীত হৃদয় ব্যক্তিরে যে অমৃতময় পরশ দিয়া বাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জীবনের পতি-পথকে সুনির্ধারিত করে। আজ এই বিদায়ের লগ্নে আমাদের এই আশীর্বাদ কর। যদিও অন্তরে বাহিরে কাছে আছি, তবুও বহিস্থ চার তোমার বিদ্যা মুক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন, হৃদয় চার প্রত্যক্ষ অনুভূতি—তাই মাগি চট্টলাতে তোমার সহসা পুনরাগমন। ও শান্তি।

শিশুসদনের বালকবৃন্দ।"

(২) চট্টগ্রাম 'প্রবর্তক শিশু সদন'-এর বালিকাবৃন্দ কর্তৃক সম্ভবগুরকে বিদায়াতিনন্দন।

"পরম পূজাপাণ্ডুরদেব!

আজ বিদায়ের বেদনাযন ক্ষণে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাপূত প্রণাম গ্রহণ কর। এইখানে তোমার অকালীন অবস্থিতির সময়ে তোমার

রাজীব-চরণে প্রতিদিন অম্বার্থ্য নিবেদন করিবার যে সুযোগ পাইয়াছি, তাহার ক্ষম্ত আপনাদিগকে বৃত্ত মনে করিতেছি। হে প্রাচীন ভারতের সত্যবর্শী, তপোনিরত, ত্যাগী, ধর্ম্মবিশেষ যোগ্য উত্তরাধিকারী, তুমি আমাদের নম্র হৃদয়ের শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ কর।

হে 'গুরুদেব পরম ব্রহ্ম'! তোমার কাছে শুনিয়াছি—জীবনের চরম সার্থকতা দিয়া ও ভাগবত জীবনলাভে। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর—আমরা যেন ঐ মহোত্তম জীবনলাভের অধিকারিণী হই। এই করতল তোমার কাছে বৃত্ত কবা, বৃত্ত উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হইতেছে—যেন আমাদের হৃদয় সং-শক্তি জাগ্রিত হইতেছে। হে প্রভু, তোমার এসাথে যেন আমরা এই মুকুলিত অন্তরতম আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করিতে পারি—এই প্রার্থনাই আজ জানাই।

শিশুসদনের বালিকাবৃন্দ।"

১২ অক্টোবর—উত্তরবঙ্গ সফর হইতে সজ্জগুরুর প্রত্যাবর্তন।

১৭ অক্টোবর—২০ অক্টোবর—সজ্জ মহাপূজাহুষ্ঠান। বিভিন্ন দিবসে সজ্জগুরুর বাণী। অষ্টমীর রাত্রে এক গৃহস্থ ভক্তকে সজ্জীক দীক্ষা দান। সজ্জের সভ্য-সভা, অল্পরাগী জুহুদ্বর্গ প্রভৃতির নিকট সজ্জগুরুর ‘বিজ্ঞার বাণী’ প্রেরণ (৩)। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, মন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমাশ্রমাদ বর্ষণ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ, প্রাক্তন বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী অনিতকুমার হালদার প্রভৃতির বিজ্ঞাব শুভেচ্ছা পত্র প্রেরণ।

২৫ অক্টোবর—কোজাগরী পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী।

২৬ অক্টোবর—চন্দননগরে সতীশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে বাৎসরিক উপাসনোৎসবে সজ্জগুরুর যোগদান ও বাণী প্রদান।

৬ নভেম্বর—প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা ‘ভারত-সভা হল’-এ সম্বর্ধনা-সভায় সজ্জগুরুর পৌরোহিত্য ও ভাষণ দান।

২৪ নভেম্বর—রাস পূর্ণিমা। সজ্জের চাতুর্মাস্ত্র ত্রয়ের পরিসমাপ্তি। পূর্ণিমা-সম্মেলনে সজ্জগুরুর ভাষণ।

২৫ নভেম্বর—সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক ট্রাষ্ট-এর সমুদয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

৬ ডিসেম্বর—প্রাতে: রেডিও-যন্ত্রে শ্রীঅরবিন্দের মহা-প্রয়াণের সংবাদে সজ্জগুরুর মর্মস্পন্দ ব্যথা প্রকাশ। পণ্ডিতেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক নলিনী কান্ত গুপ্তের নিকট ‘তার’ প্রেরণ—“Sudden heart-rending news of Sri Aurobindo's departure overwhelms us—wire

(৩) শ্রীশ্রীসজ্জগুরুর বিজ্ঞার বাণী।

“ভারতের তপস্বী সর্বজনবিদিত। ভারত লাভ করিরাছে ব্রহ্মজ্ঞান। নিকাম কর্মেরও সে সন্ধান পাইরাছে। উৎসর্গের অস্তাবেই সে আজ বশিত, বিধাবশিত।

শক্তি পূজার শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া বিজ্ঞার প্রভাতে ভগবানের চরণে আশ্র-নিবেদনের শক্তি সে কি লাভ করিল? সে কি বলিতে পারিবে—যেখানে জীবের সহিত জগদীশ্বরের যোগ, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি, ধ্রুবা নীতি?

দেবী পূজা নাঙ্গ করিয়া এই উৎসর্গের মন্ত্র উচ্চারণের সাহস ও বিশ্বাস আমাদের চাই। বাক্সালীর প্রাণ আশ্রমসমর্পণের মন্ত্রে উষ্ম হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।”

details”। সজ্জ উপবাসপালন ও সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি। সজ্জায় সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে সজ্জ-সম্মেলনে বিগতাত্মা মহাপূজার স্মরণ-মনন ও তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে অধ্যাত্মদীক্ষার মহাপূজা শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের মহাভাব ও বাণী, সজ্জজীবন ও জ্ঞাতিজীবন সুসিদ্ধ করার অশরীরী প্রেরণা ও আশীর্বাদ-প্রার্থনা। সজ্জ-মন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাত বাসকক্ষে তাঁর তৈলচিত্র স্থাপন ও মর্ম্মরত্নকলিপি রক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ।

৬ ডিসেম্বর—শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণে চন্দননগর শাসন-পরিষদের সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ দাশের উত্তোগে পৌর-কক্ষে সজ্জগুরুর সভাপতিত্বে সম্মেলন। শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পূণ্য জীবনের অজ্ঞাত তথ্য ও বিশেষভাবে চন্দননগরের সহিত সম্পর্কিত অজ্ঞানিত অধ্যায় সজ্জগুরু কর্তৃক প্রকাশ।

৮ ডিসেম্বর, ২২ অগ্রহায়ণ—শ্রীশ্রীসজ্জজননীর একবিংশ তিরোভাবোৎসবের চারি দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। সমবেত উপাসনা, ভজন, উৎসব-বাণী পাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, ঘোড়শোপচারে পূজা, দিবসব্যাপী জপ-বস্ত্র, উপবাসপালন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত হোম-হোমাস্তে সজ্জগুরুর আশীর্বাদ প্রদান।

৯ ও ১০ ডিসেম্বর—শ্রীশ্রীশ্রী বিশ্বাত কীর্তনীয়া লীলাগীতি হৃদ্যকর শ্রীমদ্বিকশোর দাস কর্তৃক কীর্তন-গান। ১০ই তারিখে প্রাক্তন বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়ের পৌরোহিত্যে উৎসব-সভায় সজ্জগুরুর বাণী।

৯ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উত্তোগে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা ‘ভারত সভা হল’-এ বিরাট জনসভায় সজ্জগুরুর শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন। উপস্থিতি—পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ, মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, প্রফুল্ল সেন, দ্বৈনন্দিনী জালান প্রভৃতি।

১৮ ডিসেম্বর—চন্দননগর আশ্রমে পরলোকগত দেশনেতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সর্দার বরভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অন্ত সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে সভা।

২০ ডিসেম্বর—আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জগুরুর বাণী।

২২ ডিসেম্বর—সজ্জগুরুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা, চেতলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের আহুত সভায় শ্রীঅরবিন্দের প্রতি সজ্জগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(ক্রমশঃ)



# সম্মাদকীয়

## শ্রীশ্রীসজ্জগুরু স্বরূপ ও সাধ্য :

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল ছিলেন অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য। মনীষী সাহিত্য-সমালোচক অতুল গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : “সে-যুগ (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক) কিছু মানুষকে গড়েছে ধীরে অসামান্য, সকল দেশের অসামান্যদের মধ্যেই অসামান্য।...জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের কথা আমরা অতি সহজে বলি। কিন্তু সে সমন্বয় অতি অল্প মানুষের, এমন কি অল্প মহাপুরুষের জীবনেও প্রকৃত দেখা যায়। মতিলাল রায় ছিলেন সেই অল্প মানুষের একজন।”

সজ্জগুরু স্বরূপ ও সাধ্য বিষয়ে সম্যক ধারণা সমসাময়িক কাল করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জীবনবিকাশের এমন দিক ছিল না যার অঙ্গনে তাঁর পদচারণার চিহ্ন বিস্তারিত নাই। কিন্তু এও বাহ্য। এ সবই তাঁর অন্তরঙ্গ স্বজন রস-বিলাসের তরঙ্গ-রঙ্গ। সজ্জগুরু অসামান্যতা ছিল অস্বাভাবিক। নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন : “আমি আত্মহারা উন্মাদ। এখনও আশ্রয় পেলুম না—দিব্য আশ্রয়। নির্ধারিত প্রেরণা এসেছে। ...আমি একটা সিদ্ধ ক্ষেত্র খুঁজছি। বাড়ী ঘর নয়—হৃদয়। ব্যক্তির হৃদয়ে নয়—সমষ্টির হৃদয়ে চাই।”

সজ্জগুরু এখানে সজ্জ ও সজ্জঘের ইঙ্গিতই দিয়াছেন। ‘সজ্জবশক্তি কলৌ যুগে।’ তাঁর সাধ্য ছিল সজ্জ—দিব্য সজ্জ। সজ্জগুরু স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ে তাঁরই কথা : “পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান বিচারে আমার স্বরূপ পাওয়ার চেষ্টায় সমস্তা জটিলই হবে। মিলনের মধু আশ্বাদ মিলবে না। ব্যক্তি-বিশ্বাসের বন্ধ দিয়ে এই বস্ত্ততত্ত্ব প্রকটকে হত্যা করা হবে।” আত্মমুক্তি সাধনার উপদেশ তাঁর কণ্ঠে কখনও মুচ্ছনা তোলে নাই। তিনি ছিলেন এই সজ্জতত্ত্বেরই জীবন্ত উন্মেষ। সজ্জগুরু স্বষ্টির প্রেরণায় তিলে তিলে নিজেকে উৎসজ্জন করিয়া সৃষ্টি হইতে চাহিয়াছেন একটা গুরুমণ্ডলীর মধ্যে—ব্যাপ্তিতে নয়

—সংক্ষিপ্ত বীজাকারে। ইহাই তাঁর আবির্ভাব তাৎপর্য—সমগ্র অতীতের পরিপূরক যুগাবতরণের চমৎকারীত্ব। ইহা অমোঘ সত্য যে, পরম পুরুষের এই যুগ আবির্ভাবের অন্তর্নিহিত বীজ্যই স্বকীয় আত্মভাবটির পরিষ্করণ অব্যাহত করিয়া তুলিবে অনাগত কালে যাহা সাময়িকতার মাপকাঠিতে নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে।

বিগত ২২শে পৌষ হইতে সজ্জগুরু ৮০তম আবির্ভাবোৎসবের যে প্রবাহ চলিয়াছে তাহাতে তাঁর জন্ম ও জীবনের এই তাৎপর্য মহিমাটি স্মরণে না রাখিলে সজ্জগুরু স্বরূপ ও সাধ্য অধরাই রহিয়া যাইবে।

## শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ :

বিগত ২৭-এ পৌষ, শুক্রবার ব্রাহ্মমুহুর্তে বেলুর মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সজ্জানে ইষ্টধাম প্রাপ্ত হন। মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার মর্ত্য-আত্ম হইয়াছিল ৮২ বৎসর। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম সভাপতি। ১২৪৭ সালে তিনি সহস্রাবর্ত্তি এবং ইহার চার বৎসর পরে ১২৫১ সালে মভাপতি হন। ১২০৬ সালে তিনি সম্মান গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আত্মভাব ও ঐতিহ্যের সনিষ্ঠ ধারক ও বাহক ছিলেন স্বামীজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দীপ্তি ও গৌরব, ব্যাপ্তি ও মহিমার মূলে যে সব ইষ্টগত মহাপ্রাণের ত্যাগ, তপস্বী ও সিদ্ধি বর্জমান তাঁহাদের অন্ততম ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। অগণিত অহুরাগী, ভক্ত-শিষ্যের সমাগম-মুখর বেলুড় মঠের দক্ষিণ প্রান্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে স্বামীজীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

## ব্রহ্মচারী সুধীরভাই :

গত ২২-এ নভেম্বর ১৯৬১, মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচারী সুধীরভাই সাধনোচ্চৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন। তিনি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সভাপতি ও আদ্যাপীঠের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যৌবনেই সঙ্গগুরু শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুরের আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য তাঁর হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী সুধীরভাইয়ের মত শ্রীগুরু স্বপ্নকে রূপ দিবার এমন সনিষ্ঠ সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও সাধনা এ-যুগে বিরল দৃষ্টান্ত—যার ফল কেবলমাত্র দানের উপর আদ্যাপীঠের বর্ত্তমান ব্যাপ্তি ও শ্রী এবং এমন বিরাট মর্ম্মর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। প্রবর্ত্তক : সঙ্ঘের সহিতও তাঁর সাহচর্য্য সংযোগ ছিল।

# সাহিত্যিক

## চন্দ্রনগরে হস্তশিল্প প্রদর্শনী :

সম্প্রতি চন্দ্রনগর 'ক্ল্যাটেলিক মোসাইটি' কর্তৃক আয়োজিত হস্ত-শিল্পের তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী স্থানীয় 'হোগান হাউস' এ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৫ জন শিল্পীর বৈচিত্র্যমূলক ও অভিনব নানা প্রকারের শিল্পসম্ভার এই প্রদর্শনীতে প্রদেখা ছিল। ত্রিশ সহস্রেরও অধিক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। রক-বলের প্রদর্শনীতে এত অধিক সংখ্যক দর্শকের সমাগম অতিশয় বিরল। কলিকাতার ইউ-এস-আই-এস লাইব্রেরীর ডিরেক্টর মিস্ এরাইলি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গের প্রমুখ-মন্ত্রী আবদুল সাব্বার এই অনুষ্ঠানে জ্ঞাপন দেন।

## অধ্যাপক ধুর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সঙ্গীত-সমালোচক অধ্যাপক ধুর্জটীপ্রসাদ গত ৫ই ডিসেম্বর ৩৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহিত্যিক, বিশেষ করিয়া সঙ্গীত সমালোচকরূপে তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ছিল। সবুজ পত্রের যুগে

প্রথম চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন সর্বাধিক সহায়। তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে—'অন্তঃশীলা', 'আমরা ও তোমরা', 'আবর্ত', 'মোহনা', 'মনে এল' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধুর্জটীপ্রসাদ বর্তমান যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট ধারক ও বাহক ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের যে সকল বাঙ্গালী মনীষী বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর মনীষাকে উঠে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, অধ্যাপক ধুর্জটীপ্রসাদ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীজাতি যে নীপশিখা করটি লইয়া গরু ও ঘোড়া-শাখা অনুভব করিত তাহার প্রায় সকলগুলিই একে একে নির্বাহিত হইতেছে।

## ডাক্তার সুবোধ মিত্র :

বিলম্বিত হইলেও, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও ক্যান্সার রোগের দেশবিশ্রুত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহাদা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া হৃৎকৃত্তির ভিত্তিতে মৃত্যুর এক হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক, বিশেষ বাঙালীর নিকট। ডাক্তার মিত্রের মৃত এমন দরদী, উদ্যমশীল, কর্মঠ, অস্তিত্ব মানুষ কোন দেশেই রাতারাতি জন্মায় না। তাঁর শূন্য স্থান সহসা পূর্ণ হইবার নহে। চিকিৎসা হাসপাতালের সংযুক্ত ক্যান্সার বিভাগের প্রতিষ্ঠা ডাঃ মিত্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি। চিকিৎসা জগতে তাঁর উদ্ভাবিত 'মিড-অপারেশন' মৌলিক অবদান হিসাবে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

## প্রবীণ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ :

রবি-বাসরের সর্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোকগমন করায় বাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তিনি এই সম্মানের হৃদয়স্থিত যোগ্যতম পাত্র। প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে শিরোনাম করিয়া এই অভিজাত বাসরটির জন্ম হয়। সর্বজনপ্রিয় জলধর সেন ও তাঁর পরে জন্মের রায় বাহাদুর ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতার অভিজাত এই সাহিত্যিক সম্মিলনের সর্বাধ্যক্ষ হন। রবি-বাসরের জন্মের পঞ্চম বৎসর হইতে শ্রীহর ইহার সম্পাদক পদে বৃত্ত থাকিয়া বাসরটিকে প্রাপবন্ত ও চলমান রাখিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠা ঐকান্তিক নিষ্ঠারই পুরস্কার।

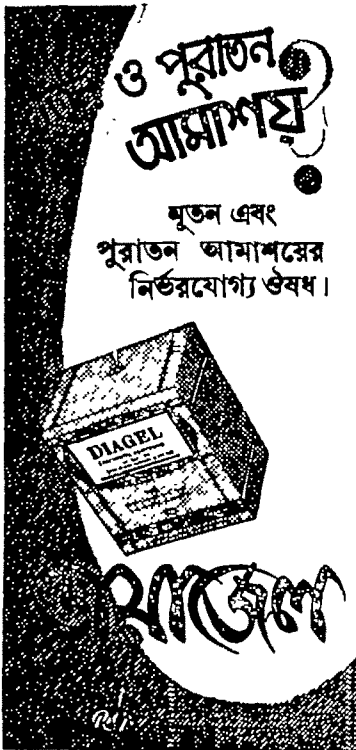
## মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পরে পুনরুজ্জীবন :

সম্প্রতি সোফিয়া মহারাজ অধ্যাপক শ্রী, কুস্তিনোভের নেতৃত্বে কয়েকজন বুলগেরীয় চিকিৎসক একজন যুবককে তাহার মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পরে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তড়িতাহত হইয়া যুবকটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বকের বাম অংশে চিরিয়া তাহার হৃদ-বিদী উন্মুক্ত করতঃ হৃদপিণ্ডে তালে তালে, মালিস ও বস্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা চিকিৎসকগণ যুবকটির পুনরুজ্জীবন স্থান করিয়াছেন।

## সততা ও বদাচার্য্যতার দৃষ্টান্ত :

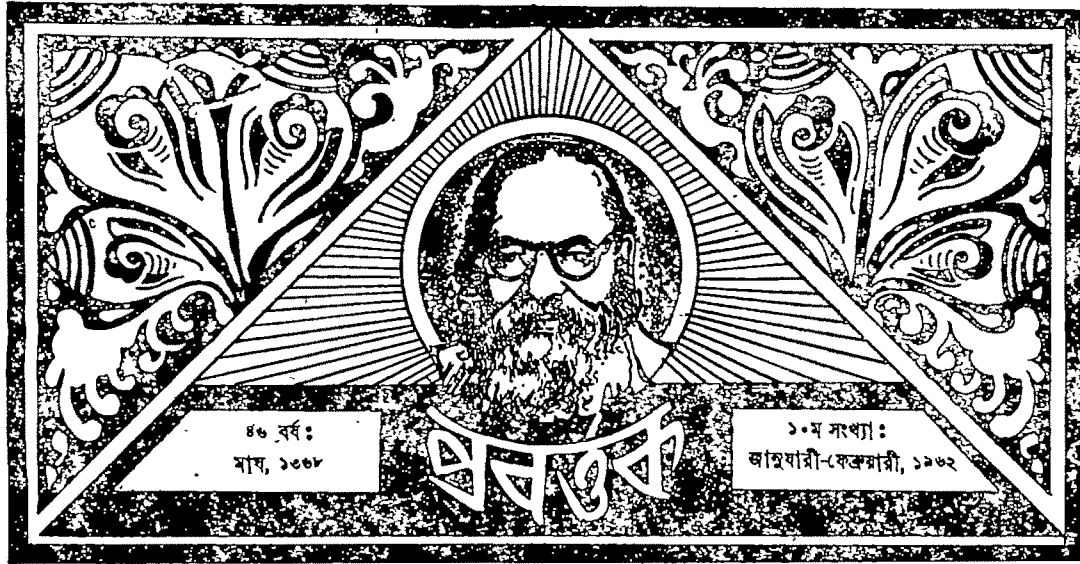
সম্প্রতি শ্রীপ্রকাশকুমার ভট্টাচার্য্য নামে কলিকাতার একজন ট্যাক্সি-চালক, আরোহীশূন্য তাঁহার ট্যাক্সির স্তিত্তর একটি 'ক্যামেরা' পান। অহুসস্থান করিয়া ক্যামেরার মালিককে তিনি উহা ফিরাইয়া দিলে, উক্ত মালিক তাঁহাকে কুড়ি (২০) টাকা পুরস্কার দেন। ট্যাক্সিচালক ঐ টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর 'জাপ-ভাণ্ডার'-এ দান করেন। মানুষের পক্ষে যাহা বাস্তবিক তাহাই এ যুগে বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য



## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত  
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড বুকস্টোম প্রাইভেট লিমিটেড, ৪২১৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণীকৃষ্ণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

উল্লেখ্য সত্য সৃষ্টি রচনায় অসমর্থ। অমিশ্র গুণের প্রকাশ নাই। দেবতার অনাহত ভাষা অন্তরীক্ষে বঙ্কিত হইলেও, মর্ত্যবাদীকে উহা উদ্ধৃত করিয়া তুলে না। মানবের কণ্ঠে অমর বাণী বেদিন হুরে, স্বরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, সেইদিনই বিশ্বের জীবনে অপূর্ণ স্পন্দন অনুভূত হয়। মানবের প্রাণ মন্ত্র-প্রভাবে অমোঘ শক্তি লাভ করে। মন্ত্রের শক্তি অপরিণীম। অধ্যাত্ম শক্তি জীবনে আত্মপ্রকাশ করে একটা কিছু উপলক্ষ, একটা কিছু উপকরণ অবলম্বন করিয়া। এইরূপ মন্ত্র একটি মন্ত্র আশ্রয়, মন্ত্র ব্রহ্মণ্য শক্তির বিদ্যা-মন্ত্র, মন্ত্র অধ্যাত্ম বহুস্তরের বীজকোষ। দীক্ষিত সাধকের অন্তরে মন্ত্রশক্তিই অব্যর্থক্রমে সমস্ত বিশ্ব বহুস্তর উন্মুক্ত করে। প্রাণের উদ্দাম সাধনা মনের ভিতর দিয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বিজ্ঞানময় স্তরে উন্নীত করিবার জ্ঞান গুরুশক্তি আজ জাতির হৃদয়ে নব ভাবের বীজ-মন্ত্র বপন করিয়াছেন। জ্ঞানের, প্রেমের, শক্তির দিব্য স্পর্শে দীপ্ত চরিত্র নব জাতি আজ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে যে তপোমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে, অচিরে তাহার তরঙ্গ হিল্লোল সারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিবে। সাধকের বিশ্বাস অগ্নিময় অক্ষরে জলিয়া উঠিবে। দেশের কলুষপূর্ণ বায়ুমণ্ডল দেখিতে দেখিতে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবে। এক একটি ভাবপুত মহামন্ত্র দূর দূরান্তরে বিক্ষুব্ধ হইয়া জাতির জীবনে কি বিলোড়ন উপস্থিত করিবে, আজ তাহা কবি-কল্পনারও দূরধিগম্য। মন্ত্রশক্তি হিল্লোলে হিল্লোলে চক্রায়ত হইয়া মাহুঘের অন্তর্জগতে যে বিপুল গতিবিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে, তাহার কলে জাতীয় চিন্তার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, সে শুভদিনের আর বিলম্ব নাই। হে নবীন! তোমরা উদ্ধৃত হও, সে মহাশক্তিকে ধারণ করার শক্তি অর্জন কর। তোমাদের প্রাণশক্তি হোক অক্ষয় অমর। ভাবই প্রাণশক্তিকে প্রেরণা দান করে। তোমরা সেই ভাবের ভাবুক হও—যে ভাব ব্রহ্মভাব। ব্রহ্মভাবের উদ্দীপন জাগাও। জাগাও আগে আপনার মধ্যে তারপর বিশ্বময় উহা ছড়াইয়া দাও। প্রেমের অবিনশ্বর সূত্রে বিশ্বকে একসূত্রে গ্রথিত কর। সত্যের, প্রেমের, কর্মের মঙ্গল প্রদীপ হস্তে ধারণ করিয়া জাতির দুয়ারে দুয়ারে উপনীত হও—তোমার অন্তরের জলন্ত বিশ্বাসের আলো অন্তরে অন্তরে জ্বলাইয়া দাও—মহত্ত্ব জন্ম সার্থক কর।

[ ১৩২৬-এর প্রবর্তক হইতে ]

সম্পাদক শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথমঃ অষ্টকং । ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং । ) তৃতীয়া ঋক্

( সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

প্র হা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং ।

মহন্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ

অর্থ—[ হে অগ্নি ! তুমি—আপনি ] “হোতারং” ( হোম নিষ্পাদক ) “বিশ্ববেদসং” ( সর্বজ্ঞ ) “দূতং” ( দেবতাদিগের দূত ) “হা” ( আপনাকে ) “প্রবৃণীমহে” ( প্রকৃষ্টরূপে বরণ করি ) “মহো” ( মহৎ ) “সতো” ( নিত্য বর্তমান ) “ভে” ( আপনার ) “অর্চয়ঃ” ( শিখাগুলি বা দীপ্তিসকল ) বিচরন্তি ( বিচরণ করে ) “দিবি” ( স্বর্গলোক ) “ভানবঃ” ( আদিত্যগণকে ) “স্পৃশন্তি” ( স্পর্শ করে ) ॥ ৩ ॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব ! আপনি হোম নিষ্পাদক, সর্বজ্ঞ এবং দেবতাদিগের দূতস্বরূপ, আপনাকে তাই প্রকৃষ্টরূপে বরণ করি। আপনার মহৎ এবং নিত্য বিদ্যমান শিখাগুলি বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া স্বর্গলোকে আদিত্যগণকে স্পর্শ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বিশদার্থ—অগ্নি প্রত্যক্ষ দেবতা। অনন্ত গুণাধার পরম ব্রহ্ম এবং অদ্বিতীয় দেবতাগণকে উপলব্ধি করিবার জন্ত এই প্রত্যক্ষ দেবতা একমাত্র অগ্নিই আশ্রয়ণীয়। ঋষি এই প্রত্যক্ষ দেবতার সম্মুখে শুচিস্নাত শুদ্ধ অন্তরে সমাসীন হইয়া করজোড়ে বলিতেছেন—“প্রহা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং”—হে অগ্নিদেব ! আপনি হোম নিষ্পাদক, সর্বজ্ঞ এবং দেবতাদের দূতস্বরূপ। আপনি না থাকিলে কোন দেবতার নিকটই আমাদের প্রার্থ্যা নিবেদনের উপায় থাকিত না। সেই জন্তই আপনাকে সর্বপ্রথমে প্রকৃষ্টরূপে বরণ করিতেছি। আরও, আপনি মর্ত্যবাসী, কিন্তু আপনার লেলিহান জিহবার উর্দ্ধগামী শিখাদম্বল স্বর্গলোকের ঐ আদিত্যগণকে স্পর্শ করিয়া উজ্জলতর করিয়া তুলিয়াছে। নিত্য উদয়োন্মুখ ও অস্তগামী সূর্য-রশ্মির রক্তাভ আভাষ আপনি নিত্য বিদ্যমান। আপনার মহৎ অস্তিত্ব তাই চিরস্থায়ী। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥



## বেদগান

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কর্মমুখর ইন্দ্রের লাগি' এই উপঢৌকমান

সত্যের প্রকাশন

আমাদের রস-স্বপ্ননে, সখে শুদ্ধ শক্তিমান

লয় অভিনন্দন ॥

বীর্ঘ্যে, সখে, আনন্দে তাঁকে চাই

দিক সে ইন্দ্র শক্তির দেবতাই

যোদেয়ে স্বভাব-ধন ॥

ইন্দ্রদত্ত উদার, অমল শ্রী ;

গোমতীর বাঁধ ভাঙে তুমি বজ্রী

হর্ষ কর স্বপ্নন ॥

ভূত্বর্লোক ছাড়ে তোমা গতিময়

স্বর্লোকে তুমি সরোবর কর জয়

গোমতীর ধারা আমাদের দিকে

ভুমিই কর প্রেরণ ॥

# কাব্য বনাম আধুনিক রুচি

অধ্যক্ষ শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস এম-এ

‘মজিই’ কাব্য সৃষ্টির ‘আজি’। অর্থাৎ বিশেষ একটা মেজাজ থেকেই কাব্যের জন্ম হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত। তা’ হ’লে কাল-চেতনায় কবির মেজাজ যেমন বদলায়, কাব্যিক চেহারারও তেমনি পরিবর্তন ঘটে। যুগের নিঃশ্বাস-বায়ুতে কাব্য-সত্তা স্পন্দিত হয়। এই প্রভাবের পিছনে দেশ-কাল-শিল্পও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আজকের কাব্য-সচেতনতার পিছনে কি বিপুল আত্ম-চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর মস্তব্যে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেছেন যে, চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মচেতনার ভয়ানক প্রগতি ক্রমেই সূচিত হ’চ্ছে। ঠিক এই ধরনের একটা বিপুল আত্ম-চেতনার চেষ্টা উঠেছে আধুনিক কাব্যকৃতির সর্বক্ষেত্রে।

কাব্যের এই আত্ম-চেতনার প্রগতি বলতে কি বুঝায়? কথাটা আলোচনা-সাপেক্ষ বিষয়। হঠাৎ একদিনে এই কাব্যিক প্রগতি স্বয়ং সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। এর পিছনে যুগ-প্রভাবের ক্রমসঞ্চারণ আছে। সেক্সপীয়ারের সমালোচনা, সংগ্যাসের রচনা ‘ফলস্টাফ্’, কোলরিজের সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বক্তৃতার মধ্যে এবং ডাইজেনের প্রস্তাবনায় এই আত্ম-সচেতনার উল্লেখ স্পষ্ট। কাব্যিক ক্রমবিকাশের এই ধারায় ইংরেজ কবির কাব্যিক মূল্যায়ন নির্ধারণ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। সমালোচনার সে পদ্ধতি নিছুল ও ধারাবাহিক। সেই নির্ধারিত নিরিখের মানে একটা নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা হয় কবিকর্মকে। সমালোচকরা সেই পদ্ধতিকে বলেছেন ‘consistent standard’, অথবা সেই বিচার বিশ্লেষণকে বলা হয়েছে ‘insight poetic activities’। এখানেই জ্ঞান-চেতনা কবি-কৃতিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে, মোটামুটি তার জরিপ করা যায়।

এখানে সমাজ-পরিবেশেরও প্রভাব বিদ্যমান। কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা ও কীটসের চিঠিতে কাব্যের এই সামাজিক কর্মকৃতির ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে শেলীর কাব্যের সপক্ষে জোরাল মতবাদের অবতারণাই বটে। আর্নল্ডের

রোমান্টিকতার নূতন ব্যাখ্যা যদিও ইংরেজী কাব্যে একটা আপাতঃমধুর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, তথাপি যুক্তিবাদী মনের কাছে তা’ সমর্থন পায়নি। প্রসিদ্ধ সমালোচক জনশনও এহেন রোমান্টিকতায় যে যুক্তি-পারস্পর্যের অভাব, তাকে বাস্তববিমুখতা বলে অভিহিত করেছেন।

কাব্য মানে কল্পনার স্বপ্ন দেখা নয়, মাটির সঙ্গেও তার একটা আঙ্গিক সম্পর্ক বিজড়িত। এই উপলব্ধির সঙ্গে পরিবর্তিত হল কাব্যিক অভিধা। এই যে কৃতিগত পরিবর্তন, এটাকেই বলা চলে যে, সাধারণ মানুষের মানসিক বিবর্তন। এরই ফলে যেমন রুচি-চাহিদার জগৎ বদলাল, তেমনি কাব্যিক চেতনায় সক্রিয় হ’ল নূতন জীবন-বোধ। এই প্রত্যয় যাতে সূদৃঢ় হয়, সে জন্ত আর্নল্ড বলেছেন, একটা নৈতিক মূল্যায়ন থাকা চাই মনের সামনে। এহেন নৈতিকতার পাশ কাটিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং কীটস্ কাব্যিক চেতনার একটা নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। কাব্য-চেতনায় তা’ নূতন আলোকসম্পাত করল। তাঁরা বললেন যে, কাব্যিক বিজ্ঞাসের অন্ত সর্বাগ্রেই প্রয়োজন একটা স্বল্প-মানসিক শৃঙ্খলার। যেখানে তার ব্যত্যয় ঘটবে, সেখানে কাব্য-স্রাবনিষ্ঠ অকৃত্রিম হ’তে পারে না। কাব্য-সাধনায় এই স্বার্থতাই ধারাবাহিকতায়, বচনে, চিন্তায়, সর্বদা লক্ষ্যণীয়। তা না হ’লে কথা এবং অর্থ, তাব ও বাচ্যার্থের মধ্যে যে অসঙ্গতি ঘটবে, তার ফলে কাব্য হ’বে অস্পষ্টতা দোষভূষ্ট।

গত ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত ম্যাথু আর্নল্ডের সেই কাব্যিক সংজ্ঞাটিই—কবিতা আদতে জীবনের সমা-লোচনা—ছিল অপ্রাস্ত। কাব্য ও জীবন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, এটাই লাভ করেছিল যুগযুগান্তের স্বীকৃতি। আজ মনোধর্মের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এহেন ঐক্য সংজ্ঞাটিও বিশ্লেষণধর্মী মনের কাছে সমর্থন পাচ্ছে না। কারণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম, সমাজ এবং মনোধর্মের যে সংযোগ আছে, তার সমন্বয়ে জীবন তথা কাব্যিক চেতনার যে বিশ্বাস ঘটবে, তার থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। তাতে কাব্যের সামগ্রিক রূপের



সার্থক ছবিটি কি পরিস্ফুট হ'বে? ওয়াল্টার প্যাটার্স, আর্থার সাইমন, ম্যাডিংটন প্রভৃতি এহেন বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছেন। 'সাহিত্যের ইতিহাসে' রিচার্ডসন কাব্য সৃষ্টির অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা বা cardinal importance-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কাব্য-কৃতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়োজন 'কাব্যিক জ্ঞান' ও 'অনুভূতি'র। তাই তিনি বলেছেন যে, কাব্যিক জ্ঞান ও অনুভূতি যার নেই, তার দ্বারা আর যা হোক, কাব্য সমালোচনা হয় না। এই ক্ষেত্রে সমাজ-জীবন-তত্ত্ব-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য-কৃতিকে বিশ্লেষণ ও যাচাই করে দেখতে হ'বে। এখানে অবশ্য কবি-কর্মের ভিতরে বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসা অনুপ্রবেশ করেছে।

কোলরিজ একদিন কাব্যে অতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের কল্পনা-বিলাস মনকে জালন করবে—এই কবিকৃত অতি প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য। এটা অবশ্য কাব্যের জীবনমুখীতার কথা নয়। জাগতিক তিস্ত পরিবেশ থেকে সরে দাঁড়ানোর অভিপ্রায়। স্বকপোলকল্পিত পরিবেশে আত্মগোপন করা। সিষ্টার ম্যারিটেইন্ কোলরিজের ঐ মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। ঐ কাব্যিক তত্ত্বকে তিনি বলেছেন, 'মারাত্মক ভুল বিচার'।\* তার উত্তরে এলিয়ট পাঁচটা জবাব দিয়েছেন। বলেছেন যে, ম্যারিটেইন্ যখন 'মারাত্মক ভুল' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তখন তিনি ভীষণভাবে 'মথার্থ-নিষ্ঠতার' উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তখনই তাঁর সমালোচনা পক্ষপাত-দোষ-ছুষ্ট হ'তে বাধ্য। সেখানে খোলা মনের বিচার-নিষ্ঠাও নিশ্চয় অনুপস্থিত।

এই প্রসঙ্গে মনটেগোমারির দু'খানি সমালোচনা গ্রন্থ—যথা, 'কলা ও সিষ্টার ম্যারিটেইন্' এবং 'সমা-লোচনা কি' উল্লেখযোগ্য। সেখানে কাব্যিক প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলা হয়েছে যে, অতীত বা বহুত্ব-বাদের মর্যাদাটন করাই কাব্যিক অস্তিত্বতার অভি-ব্যক্তি নয়। কবির মনের আনন্দ অভিব্যক্তির চিত্রায়নই

কাব্যিক শৈলীর প্রতিপাদ্য বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যিক ব্যঙ্গনার ঘটাই যাই হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত একটা বক্তব্যও আছে। সেটাই কবিতার স্বধর্ম, কবিমানসের আকুতি - উপলব্ধির আনন্দ-স্বপ্ন, প্রাণের বন্দনা। এ-এইচ ত্রেমণ্ড 'প্রার্থনা ও কবিতা' পুস্তকে কাব্যকে কবিকর্মের অন্তর্বেদনার প্রার্থনা বলে অভিহিত করেছেন। প্রার্থনা যেমন সমস্ত যুক্তির উদ্দেশ্য থেকে আকুতি-মুক্তির পবিত্র নিবেদনের নৈবেদ্যে চিত্তকে সঁপে দেয়, কাব্যও তেমনি ভাবমুক্তি আনন্দে যখন চিত্তকে অব্যবহিত করে দেয়, তখন হৃদয়ের উপলব্ধি প্রাণের মন্ত্র হয়ে উঠে। সেই জীবনমেবতার গান প্রার্থনা ছাড়া কি? এই প্রশ্নে তিনি আরও বলেছেন যে, সমস্ত কাব্যিক-বিশ্বাসের বাইরে কবি-মানসের যে নৈতিকতা সক্রিয়, সেই ধর্ম-চেতনা কবিকর্মের নিয়ন্তা।

অনেকে আবার কাব্যকে রূপকের মোড়কে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। তার ফলে কাব্যিক প্রকাশে ব্যাপক অথবা উপকথার বিস্তার ঘটেছে। একে সমালোচকেরা পয়েটিক ফ্যালিগরি (Poetic allegory) নামে অভিহিত করেছেন। দাস্তুর প্যারাডিসো এই পর্যায়ের কাব্য-কৃতির উদাহরণ। বেলজিয়াম দাস্তুর এই শিল্প-কর্মকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রিচার্ডসন তাঁর সমা-লোচনার নীতি পুস্তকে Purgatorio-এর মধ্যে পাশা-পাশি যৌনবোধ ও ধর্মচেতনার কথা আছে। এহেন নীতি দু'নীতির প্রশ্ন কাব্য-জগতে সৃষ্টি করেছে নানা সমস্যা। এমনতর সমস্যা বিশ্লেষণ কবির কাজ নয়, সে কাজ সমা-লোচকের, নৈতিক দর্শনের। যে কোন কবি-কর্ম বিচারের সময় দেখা উচিত, তা' প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্ত, সৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট কিনা। ও-ছুটোর নিরিখেই হ'বে কাব্যের জাত বিচার। ডাইডেনের কাব্যিক অবদান যাই থাক না কেন, তাঁর অভিমত সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন সমাদৃত হয়নি। এই কারণে এলিয়ট বলেছেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অবদানের কোন স্থায়ী মূল্য নেই।

প্রসিদ্ধ সমালোচক জনশন অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাব্য-সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। কাব্য-বিচারের ভিত্তি যে ঐতিহাসিক-চেতনা, তিনিই

\* "It is deadly error to expect poetry to provide supersubstantial nourishment of man."

ছিলেন এই মতবাদের প্রবক্তা। কাব্যের মধ্যে ধর্ম-চেতনার একটা আয়েজ টেনে আনতে কিছুটা সচেতন হয়েছিলেন ম্যাথু আর্পল্ড। তাঁর সে প্রচেষ্টার প্রভাব একদিন ইংরেজী সাহিত্যে যে অল্পপ্রবিষ্ট হয়নি, একথা বলা চলে না।

আর্পল্ডের ঐ কাব্য-রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সম-কালীন কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছিলেন যে, এই কাব্যিক-চেতনোন্মেষের মধ্যেই সমাজ বিবর্তনের ধারাতিকেও খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মব্রাজকের প্রাধান্তের পর কৃষ্ণ সাধন এবং তারই পরে যেমন মানবত্ববাদের উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি কাব্যেও অল্পপ্রবেশ করেছে তার সক্রিয় প্রভাব।

সপ্তদশ শতকে মলিয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ‘কেন লেখ’? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, পরিমার্জিত সৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য। এই সময় ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে রোমান্টিসিজিমের ঢেউ উঠে। ফলে এতদিনের কাব্য-রচনা-বীতি নূতনত্বের দিকে মোড় করে। কাব্যের নামে এই যে নিছক কল্পনার স্বপ্ন দেখা, এটাকে সমালোচকরা তেমন হনজরে দেখেননি। ঐ মনোভাবকে তাঁরা বলেছেন যে, ওটা স্বস্থতার লক্ষণ নয়, ওটাকে ঠিক স্বেচ্ছাকৃত মানসিক বিকার বলে অভিহিত করা যায়। তদানীন্তন সাহিত্যিকদের মধ্যেও ওর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। সমালোচকরা ওর উপর কোন গুরুত্ব দিতে চান নি, বরং তাচ্ছিল্য ভরে মন্তব্য করেছিলেন—a new literary disease called Romanticism. তথাপি, এর আপাতঃ রমনীয়তায় সহজেই লোকের মন হরণ করে নিল। তার ফলে দেখা যায় যে, বিগত দু’শ পঞ্চাশ বছরের সবকিছুকেই যেন রোমান্টিসিজিম আত্মসাৎ করেছিল। ইউরোপের অন্তর্গত ঐ প্রভাবের হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। আগেকার দিনে যে ব্যাপকতর অর্থে রোমান্টি-সিজিমের প্রয়োগ করা হ’ত, আজ কিন্তু রোমান্টিসিজিম বলতে তা’ বোঝায় না। এই বিরাট বিস্তৃতির ফলে, তা হ’য়ে উঠল নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত বিষয়। ক্রাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ’লো। এদের প্রবক্তা ছিলেন মোল্লিয়ার ও র্যাচিন।

এর ফলে কিন্তু উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কোন লক্ষণই সূচিত হয়নি। এইজন্ত এলিয়ট কাব্যান্দোলনের ধারা থেকে ‘রোমান্টিসিজিম’ এবং ‘ক্লাসিসিজিম’কে বাদ দিতে চেয়ে ছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, ঐ দুটি শব্দ আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে এমন ভাবোদ্দীপ্ত করেছিল যে, অনেক সময় তা’ আমাদের স্বাধীন মস্তব্যকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে যে না তুলেছিল, এমন নয়।

কাব্য-সাহিত্যে যে কবে থেকে আধুনিকতার সূত্রপাত সেই আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছেন যে, ‘কাব্যের করণীয় কি, অথবা কি তার করা উচিত, এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে বসে’ মনে হয় যে, আমরা এখনও যেন সেই আর্পল্ডের যুগেই আছি। তার চেয়ে খুব বেশী দূর কি অগ্রসর হ’তে পেরেছি? তিনি আরও বলেছেন যে, কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে রিচার্ডসন বিশেষজ্ঞ। তিনি কাব্যের নানাদিক দর্শনে পারংগম। যে দিকে তিনি তা’ নন, সেই দিকের কথা এই প্রসঙ্গে অবতারণা করবো। তিনি বলেছেন যে, ‘কাব্য-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকদের তাদের জানা পরিমণ্ডলের বাইরে নিয়ে যাওয়া, সেখানে ব্যক্তি-মনের প্রবৃত্তির উপর কাব্যিক প্রভাব কাজ করে। সেখানে কেবল কাব্যের রস-সম্ভোগ করি না, আমরা পাই সেই ব্যক্তিমনের আর কাব্য পরিবেশের নিতুল পরিচিতি। কবিকৃত সেই ভাবভ্রমৎ রহস্ত বিষয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করে দেয়। যে কবি প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রষ্টা, তিনিই আমাদের দৃষ্টি প্রদীপে নূতন অভিজ্ঞতার আলো জ্বলে দিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে, রিচার্ডসন যখন আমার ‘ওয়েস্ট ল্যান্ড’ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ‘complete severance between poetry and all belief’ সেখানে তিনি কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যিক পরি-মণ্ডলের এই ক্রমবিবর্তনের প্রদীপ উজ্জ্বল করেন নি। তখন তিনি অনেকটা ব্যক্তি প্রবণতার উপর নির্ভর করেই বর্তমান পরিস্থিতিকে যাচাই করে দেখতে চান; ফলে তিনি কি বলতে পারেন যে, কাব্যই আমাদের অনিবার্য অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে সমর্থ?’ এখানে কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। কাজেই কাব্যের মুক্তি



(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

স্বামীজীকে দেখাচ্ছে যেন বড় চিন্তাক্লিষ্ট। হঠাৎ বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বলেন,—এ যুগের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটল সেদিন বেঙ্গুড়ে। মহাত্মা এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাত করতে। স্বামীজী তখন অসুস্থ, কলকাতায়। সাক্ষাত হল না। সেদিন সেই মহা-সময় ঘটলে হয়তো আজকের ইতিহাস অন্তরকম হত।

নতুন যে কি হ'ত বুঝতে পারলুম না আমি। মহাত্মার আদর্শে তিনি অনমনীয়। যত্নকে নিয়ে অনেক খেলা খেলেছেন মহাত্মা, কিন্তু তাঁর ত্যাগ আর অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি কোনদিন।

কুঠাভরে প্রশ্ন করলুম,—সে সাক্ষাত হলে মহাত্মার নীতির কিছু পরিবর্তন হত বলে কি আপনার মনে হয়?

—যা হ'লনা তা নিয়ে গবেষণা বুধা। তবে স্বামীজী এটুকু নিশ্চয় শুঁকে বোঝাতে পারতেন যে তাঁর পথ অ-রাজনৈতিক অ-সময়োপযোগী।

—বর্তমান রাজনীতিতে মহাত্মার কি কোন দান নেই?

—কে বলছে সে কথা? অন্ততঃ একটা মহৎ সত্য উনি আবিষ্কার করেছেন যে, দেশের নেতাকে আত্ম-

গোপনের চোরাগলি পথে চলতে হবে না। চলতে হবে প্রকাশ্য রাজপথে দৃঢ় পদে। ঠিক ঠিক কর্মসম্মান আর নির্মল বৈরাগ্য সেই চলার শক্তি যোগাবে। শত্রুজয় করতে হবে আত্মার শক্তিতে। সেই শক্তির সন্ধানই মহাত্মার পথ ত্যাগের পথ, অহিংসার পথ। শক্তি তাঁর অপরিমেয়, কিন্তু তার অপ্রয়োগ হ'লনা ভারতের দুর্দৈব দোষে।

—কিন্তু একেবারে নিরামিশ অহিংস পথতো রাজনীতির পথ নয়। এখানে প্রয়োজনের মুহূর্তে রক্তপাত অনিবার্য।

স্বামীজী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

—একটা সস্তা বুলি পেয়েছ তোমরা। খালি রক্ত আর রক্ত। দাওনা রক্ত কত দেবে। আত্মরক্ষার্থে, দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে বরোনা অস্ত্র শক্ত হাতে। রক্ত, রক্ত, রক্ত। শোনো একটা রক্তাক্ত গল্প:

পাঞ্জাবের কয়েকটি কর্মী এল এই মন্ড্রে দীক্ষা নিতে। ঠিক এইখানেই আজ যেমন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, সেদিনও শপথ শেষ করে দাঁড়ালুম তাদের মুখোমুখী। প্রশ্ন করলুম,—দেশের জন্ত প্রাণ দিতে তোমরা প্রস্তুত?

বলতে রিচার্ডসন বলেছেন এক কথা, আর্গন্ডের কাছে তার অর্থ ছিল সম্পূর্ণ অস্ত্র। রিচার্ডসনের বিচার রস বা তত্ত্ব-গত নয়, তার সমালোচনা ছিল মূলতঃ ব্যবহারিক। তিনি বলতেন যে, একটা নির্দিষ্ট অহিংসতার কাঠামোই (in a frame of feeling) ঘটবে কাব্যের সামগ্রিক উপলব্ধি (full realisation)। এ কথা তত্ত্বের দিক থেকে সত্য

হ'লেও, উপলব্ধির দিক থেকে সমীচীন নয়। কারণ কাব্যের মধ্যে কবিমনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অহিংসতার যে নির্ধারিত থাকে, তাকে কোন নির্দিষ্ট রস-বোধের নিরিখে ছেঁকে নেওয়া কি সম্ভব? তা হ'লে কাব্য-বিচারের এত মত ও পন্থা উদ্ভাবনের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

—হ্যাঁ। সবাই সমস্বরে বলে।

একটি যুবক কিন্তু কোন কথা না বলে কোমরের ছোরাখানা সোজা বসিয়ে দিল বুকে। সে কি রক্ত! রক্ত আর ফুরোয় না। ক'দিন তাকে রাখতে হ'ল এখানে। হৃদয় হয়ে উঠল। কিন্তু বুকের ক্ষত রইল অক্ষত হয়ে। একি নিষ্ঠা, না উচ্ছাস! এতে বাহাছুরী হয়তো আছে, কিন্তু এই কি বীরত্ব! ঝোঁকের মাধ্যমে কোপ বসান—সে নিজের বুকেই হোক আর পরের বুকেই হোক,—তাতে উন্মাদনা আছে মানি, কিন্তু নেতাকে তো উন্মাদ হলে চলবে না, চলবে না অধীর হওয়া। নেতা হবে অচঞ্চল অবিচল। ছেলেটার নাম ছবর সিং।

গল্প শেষ করে স্বামীজী সোজা তাকালেন আমার চোখে। মুহূ একটু হাসির রেখা ঠুর ঠোঁটের কোণে।

আমি প্রায় চিংকার করে উঠলাম,—ছবর সিং!

—হ্যাঁ, সাহসী ছেলে, কাজের ছেলে। কিন্তু বড় আবেগগ্রবণ। ওদের রাসটা ধরতে হয় খুব কসে। হাতে কাজ না পেলে অকাজ করে বসতে পারে। ওদের এন্গেজড রাখতে হয় সব সময়। কাজ যেখানে যত দুঃসাহ্য উৎসাহ দেখানো ওদের তত বেশী।

সন্ন্যাসীর কোন কথাই আমার কাণে আসছে না। আমি ভাবছি এই কি সেই ছবর সিং। নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন করলুম,—কল্যাণীকে চেনেন আপনি?

—চিনি। রহস্যময় হাসি হাসলেন স্বামীজী।

—কল্যাণীর বর্তমান জীবন সম্বন্ধে জানান কিছ?

—ও ব্যবস্থা আমারই।

—আপনার ব্যবস্থায়ই কল্যাণী ধর্মান্তরিতা?

—কল্যাণী ধর্মান্তরিতা নয়।

—তবে? কি বলতে চান কল্যাণী ছবরের এই জীবনকে?

—ওদের বর্তমান জীবনের সম্বন্ধে কতটুকু জেনেছ তুমি? কতটুকু জেনেছ ছবর সম্বন্ধে?

—ছবরকে আপনি চেনেন না!

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু কল্যাণীকে তো চিনি।

স্বামীজীর হাসিটা রহস্যময়। তাই পুনরায় প্রশ্ন করলুম,—তবে কি ছবর ধর্মান্তরিত হয়েছে?

স্বামীজী আবার হাসলেন সেই গগনবিদারী হাসি। পরে অকস্মাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—কিন্তু ওদের সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন?

—ওরা যে একসময় আমার পার্টির মেম্বর ছিল।

—শুধু কি তাই? আর কিছু নয়?

একটা অস্বস্তিকর অসহিষ্ণুতায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। কতটুকু জানে এই সন্ন্যাসী?...কে সংবাদ-দাতা? কল্যাণী?

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সন্ন্যাসী। আমি নীরব।

পরে একসময় মুহূ হেসে বলেন,—কল্যাণী-কাহিনীর হিরো কালিকিঙ্করকে কল্যাণী অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করে আজও। এইটুকুই শুধু জানত না কালিকিঙ্কর। নেবারটুকু যেমন পরম শ্রদ্ধায় নিয়েছে, ফেলে দেবারটুকুও তেমনি পরম অবহেলায় ফেলে দিয়েছে কল্যাণী। কালী বিকশিত করে তুলেছে কালিকে। কালি তার মাধুর্যে আর সৌরভে ভরে দিয়েছে কালীকে, গড়ে তুলেছে আজকের কালিকিঙ্করকে। বেশ কাব্য করে বল্লুম, তাইনা?

হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যেও সরসতা আছে দেখছি।

—সন্ন্যাসী বৃদ্ধি নিরস। রসো বৈ সঃ। সেই রসোত্তমের সমুদ্রে সে ডুবুরী। তাই সে.....

কল্যাণীর তত্ত্বকথায় আর কাণ দিতে পারছি না। এইমাত্র যে কথা শুনলুম তাতে মনের এক অজ্ঞাত বাতায়ন পথে একটুখানিক মধুর দখিনা হাওয়া এসে অনেকখানি কালোমেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। অপসারিত হ'ল দীর্ঘদিনের জমানো অজ্ঞান। সেই ঝড়ের রাতের পরম লজ্জাকর পরাজয়ের পাষণ চাপটা বৃষ্টি নেমে গেল আজ দীর্ঘ সাত বছর পরে বুকের উপর থেকে।

স্বামীজী তদগত ভাবে বলে চলেছেন,—কল্যাণীর নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। নেতার প্রতি এই আস্থা, এই একনিষ্ঠ আত্মগত্য আদর্শ কর্মীর লক্ষণ। কল্যাণী আদর্শ কর্মী। এমন মেয়ে খুব বেশী নেই যে এদেশে। নিজের সম্মান বলে ওদের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলছি না যে।

—আপনার সম্মান! আমি বিশ্বাস করছি।

—হ্যাঁ, কল্যাণী আর ছবর আমার ছেলে মেয়ে।

কল্যাণীর মা বাঙালী, ছবরের মা পাঞ্জাবী। এর বেশী পরিচয় দেব না আজ। ওদের এ সম্পর্কটা জানে কল্যাণী, কিন্তু ছবর জানে না আজও। নেতা কালিকঙ্করকে জানবার জন্য আমিই ওদের পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে।

আমার সারা দেহ শির শির করে কেঁপে উঠল। কে এই সন্ন্যাসী! আমায় চোখে-মুখে হয়তো মনের প্রশ্নটা হুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসী সন্নেহে আমার পিঠে হাত রাখলেন। মুহূর্তে বজ্রেন, আমার পরিচয় হয়তো একদিন পাবে, কিন্তু তোমার পরিচয় ওদের কাছে যা পেয়েছিলাম, আর এই ছ'বছরে নিজে যা দেখলাম তাতে নিরাশ হইনি আমি।

কিসে সন্ন্যাসী আশা পেলেন সে গবেষণা করবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। এই মাত্র যা শুনলাম তার বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারছি না যে। হয়তো ওদের ছেলে ছুটির মধ্যেও আছে, আরও কোন বিশ্বাস। প্রশ্ন করলুম, ওরা যদি ভাই বোন' তবে ওদের সেই ছেলে ছুটি?

—হুঙ্কপোয়া ছুটি শিশু সম্বন্ধে নেতা কালিকঙ্করের এ কৌতূহল অসমীচীন। এতখানি জানবার পর বাকিটুকু একদিন আপনিই জেনে নিতে পারবে।

—কিন্তু সেই অনাগত দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যে আমি পারছি না স্বামীজি।

—ছিঃ কালিকঙ্কর! থাক ও সব এখন। তার পূর্বে এই সম্ভব হাজারকে তোমার জ্ঞান দরকার অবিলম্বে। এরা তোমার নির্দেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমান, আর ভূমি বিভোর হয়ে আছ তোমার কিশোর প্রেমের স্বপ্নে। ছিঃ ছিঃ, এতদিন তাহলে কি করলুম আমি। দীর্ঘ শত বৎসরের সাধনা কি এমনি করেই নিষ্ফল হবে! তবে কাকে নিয়ে আমার স্বপ্ন সৌধ রচনা? কার হাতে এই গুরুভার সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলুম? ভুল, ভুল, মহাভুল.....

স্বামীজির চোখে মুখে এক আশ্চর্য ব্যঙ্গনা। স্নেহ আর ঘৃণা, নিরাশা আর করুণায় ভরা সে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা প্রচণ্ড চাবকের আঘাতে আমার স্তম্ভ সত্তা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠল মুহূর্তে। স্বামীজির পদতলে বসে ক্ষমা চেয়েছিলুম সেদিন। তিনি

একটি কথাই শুধু বলেছিলেন, “ক্লৈব্যং মানস গমঃ পার্থ।” চোখ দুটি তাঁর আবার ছল ছল করে উঠেছিল আমার করুণায়। সে ক্ষমা ভুলিনি আজও।

সন্ন্যাসী সন্নেহে আমার হাত ধরে এগিয়ে চলেন গুহার এক কোণের দিকে। একটা মশাল জ্বাললেন।

মশালের আলোয় যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল তাকে এক কথায় বলা চলে রেকর্ড কম। মেঝের উপর স্তরে স্তরে সাজান ফাইলের উপর ফাইল। স্তূপীকৃত। কে কখন কোন পথে এসব এখানে জড়ো করল? কী আছে ওর মধ্যে? আরও একটু এগিয়ে দেখলুম, এক একটা স্তূপের উপর এক একটা প্রদেশের নাম। আসাম, বর্মা, বাঙলা, বিহার... আর একদিকে রয়েছে ভারতের বাইরের অনেক-গুলি দেশ, চীন, জাপান, ইন্দোনেশীয়া...। সবিস্ময়ে তাকালুম স্বামীজির মুখের দিকে।

—কী দেখলে?

দেখলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি না কিছুই।

—বুঝতে যে তোমাকেই হবে। বেশী সময় দিতে পারব না। পরবর্তী প্রোগ্রাম পাবে সাত দিন পরে। আজ থেকে শুরু হল তোমার কাজ নেওয়া। শেষ হল আমার কাজ এদেশে। এবার একটু বিশ্রাম...

স্বামীজির চোখে দেখলুম যেন একটা ক্লান্ত অবসন্নতা। সত্যিই বিশ্রাম তাঁর প্রয়োজন।

ফিরে চলেন স্বামীজি। আমিও অনুগমন করছিলুম।

—ভূমি চলে কোথায়? স্বামীজী ধমকে উঠলেন। তোমার আহাৰ্য এখানেই পাবে যথাসময়ে। কতো বিনীত রজনী আমার কেটে গেছে এই রুদ্ধ গুহার। এবার আমার ছুটি, তোমার শুরু।

শুরু হল কাজ নেওয়া।

তন্ময় হয়ে ফাইলগুলি দেখছি। দেখছি এক একটা প্রদেশের ফাইল, আর বিশ্বাস আমার উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। শুধু ভূগোল ইতিহাস পড়ে দেশকে এভাবে জানা যায় না, জানা যায় না শুধু চোখ দিয়ে দেখেও। হৃদয় দিয়ে দেখা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা বুঝি একেই বলে।

কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কি সুবিধা অসুবিধা, সাধারণ মানুষের কি প্রকৃতি, বৃত্তি, ধর্মবিশ্বাস

কার কেমন, কাদের কি কি সামাজিক সংস্কার, কোন আদর্শে কারা সহজে সাড়া দেয়, কোন দেশের ইতিহাসের কি ধারা, বহিরাগতের প্রভাব আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটেছে ইত্যাদি নানা তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান। এ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয় শুধু। এ এক মরমীর আবিষ্কার। আসল ভারতবর্ষের আবিষ্কার। শুধু ভারতবর্ষই বা বলি কেন, ভীষত, চীন, বর্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর জাপান, ইত্যাদি প্রায় সমস্ত এশীয় দেশগুলিরই পরিচয় রয়েছে এতে, এই মহান মহাভারতে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আমিও পড়েছিলাম। আমিও চেষ্টা করেছিলাম এদেশের মানুষকে বুঝতে। কিন্তু সে জ্ঞান যে কত অকিঞ্চিৎকর তা বুঝতে পারছি এষ্ট মহাভারত পাঠে। এ শুধু ইতিহাস নয়, এ দর্শন।

এই অংশটাকে বলা চলে উপক্রমণিকা। ফাইলের প্রথমাংশ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সেই দেশের রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস গত দু'শো বৎসরের। এই ইতিহাসও আমি জানতুম বলে আমার গর্ব ছিল। কিন্তু সে গর্ব আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেল অচিরেই। এ ইতিহাসের কতটুকু দেশ জানে।

কখন কোন্ দেশে কারা নেতৃত্ব করল, কি কারণে কারা ব্যর্থ হল, পর পর কোন্ কোন্ পার্টি প্রাধান্য লাভ করল, কোন পথে কারা কতটুকু অগ্রসর হল, কি ছিল কোন পার্টির রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি। সবশেষে রয়েছে প্রতিটি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি। কোন দেশের ক্ষেত্র আজ কতটুকু প্রস্তুত, বর্তমানে কোন পার্টি কোথায় নেতৃত্ব করছে, কোথায় কার ভুল, কোন পথে তার প্রতিকার...এমনি তথ্যের পর তথ্য দিয়ে প্রতিটি ফাইলকেই একটা ডকুমেন্টারী এনুসাইক্লোপিডিয়া করে তুলেছেন স্বামীজি।

দিন কেটে যাচ্ছে নেশার ঘোরে। দিনরাত্রির ব্যবধান এখানে বোঝা যায় না। বুঝবার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

সাতদিন পরে হয়তো আরও কোন কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন হতে হবে। হয়তো আছে আরও কোন তৃতীয় শুধা আরও কিছু অজ্ঞাত রহস্তে ভরা। সাতদিনের আর কদিন বাকী কে জানে। কিন্তু ফাইল যে এখনও অনেক বাকী।

এবার ফাইলের তৃতীয় পর্ব।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বকে যদি বলি collection, তৃতীয় পর্বকে বলতে হয় action.

“নিখিল ভারত বিপ্লবী সম্মেলন” (যে সম্মেলন পরিচালক কালিকিঙ্কর মজুমদার!) কোন দেশে কতোটা কাজ করেছে এই পর্বে আছে তার হিসাব নিকাশ। এখানে রয়েছে প্রতিটি দেশের রিক্রুটদের নাম, ধাম, বয়স, বৈশিষ্ট্য, শপথ গ্রহণের তারিখ, এমন কি প্রত্যেকের ফটোগ্রাফ পর্যন্ত। কী দুঃসাহস!! কোনক্রমে এ যিনিস পুলিশের হাতে পড়লে যে এ তাসের ঘর মুহূর্তে ধুলায় মিশে যাবে। নিবিড় অরণ্যের মাঝে এই নির্জন গিরি-শুহায় বসেও আমার সর্বাঙ্গ আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠল। কোথায় লুকোবো এ মহাসম্পদ? কবে দেশবাসী জানবে এই পূর্ণ ভারতকে? কী পরিচয় এই অক্লান্তকর্মী সন্ন্যাসীর? কেন তার এই আত্মগোপন? এতোখানি যিনি করেছেন বাকীটুকু কেন তিনি তুলে দিতে চাইছেন আমার হাতে। এই মহানটকের স্তম্ভাশ্রিত্তি কি সম্ভব হবে আমার মত এক অক্ষম অভিনেতার দ্বারা।

দ্বিধায় দুর্ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়ছি ক্রমে। এ ভূমিকা আমার নয়। এ নাটকের সূত্রধর যিনি তিনিই টাঙ্কন এর যবনিকা।

সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে উঠল কালিকিঙ্কর। খুলে ফেলতে হবে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ। জানাতে হবে তার মতাপরিচয় দেশকে। তাঁর একজন একনিষ্ঠ আত্মবাহু হয়েছেই সার্থক হতে চায় কালিকিঙ্কর। মণ্ডপুর ভূমিকাই তার যোগ্য ভূমিকা। মুছে যাক কালিকিঙ্কর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। ভারতের নব ইতিহাস রচয়িতা, নব মহাভারত রচয়িতা এই মহামানবকে চেনাতে হবে দেশবাসীকে।

(ক্রমশঃ)

## সরস্বতী ও সারস্বত

শ্রীবিষ্ণুচরণ গোস্বামী ( বিষ্ণুসম্পর্ভী ) বেদান্ত ভাগবতশাস্ত্রী

সুনির্দেশ সম্ভোশিনী, সূচির সংবিদ সঙ্কীর্ণনী, অজ্ঞান সংবৃতি সংহতির সংশোধিনী সর্বজনগণমন বিনোদিনী স্মৃতি, বাণীস্থিতি ভারতী—শাস্বতী দেবী শ্রীসরস্বতীকে প্রণাম জ্ঞাপন করি।

সরস্বতীর বন্দনা—বেদ, পুরাণ ও ঋষি মুখে বিভিন্ন প্রকার। ঋগ্বেদে পাওয়া যায় : “ওঁ পাবকা নঃ সরস্বতী, বাজ্জেতিবাজিনীবতী, যজ্ঞং বষ্টু যিয়া বহু ওঁ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি : “প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী”... ( ভা ২।৪।২২ )। যিনি কল্পারম্ভের সময় ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়িনীরূপে সরস্বতী নামে স্মৃতিশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহার প্রেরণায় সেই ব্রহ্মাবদন হইতে ভাগবৎ ধর্ম প্রদর্শিকা তেজস্বতী শিক্ষাদি লক্ষণযুক্তা বেদবাণী সরস্বতী প্রাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে :

আত্মাই আদিতে সম্ভ্রান্তরূপে একাকী ছিলেন, তিনিই রমণ উদ্দেশে নিজেকে দ্বিধাভিত্তক করিলেন স্ত্রী ও পুরুষ-রূপে। ইহাই আদি বাণী মিথুন তত্ত্ব। পরম সত্যের যে এক রূপ তাহাই মিথুনের অষ্টাবস্থা। এইভাবে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, প্রশ্নোপনিষদে সৃষ্টি প্রকরণে সৃষ্টিকাম প্রজাপতি দ্বারা নারী পুরুষের মিথুন তত্ত্বের উল্লেখ। এইভাবেই সরস্বতীর সৃষ্টি। যে কাল হইতে বাক্শক্তির প্রকাশ তখন হইতেই সরস্বতী পুজার প্রচলন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কেবল সরস্বতী কবচ ধারণের ব্যবস্থানা করিয়া সরস্বতী পুজায় সংঘম ও উপচারেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

ঋষি বাজবল্ক্যের উক্তি :

যয়া বিনা জগৎ সর্বং শশঙ্কীবন্মৃতং পরম্।

জ্ঞানাদিদেবী যা তস্মৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥

সব সময়েই ঋহির অস্তিত্ব বিনা জগতের সকল জীব মৃতবৎ জীবনধারণ করে, সেই পরম জ্ঞানাদিদেবী সরস্বতীকে বারংবার নমস্কার করি।

মহাভারতে সরস্বতীর বষ্ট নামের উল্লেখ দেখা যায় :

পুঙ্করে পিতামহ যজ্ঞে আহুতা ‘সুপ্রভা’। নৈমিষারণ্যে সজ্জাজি ঋষিগণের দ্বারা বন্দিতা ‘কাঞ্চনাক্ষী’। গয়দেশে “বিশালা”। উত্তর কোশলে ঔদালক মুনী যজ্ঞে সমাহুতা ‘ওধবতী’। হরিদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে ‘সুরেণু’। হিমালয় শিখরে ব্রহ্মণ পুনর্ধ্বজ্ঞে সমাহুতা ‘বিস্ফলান্দা’।

সরিংরূপা শ্রোতস্বতী সরস্বতীর উদ্দেশে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলিয়াছেন : “সরস্বতী সা বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণাস্তিকে। গঙ্গা শাপেন কলহা কলহাস্তারতে সরিং।” একদা নারায়ণের চিত্ত বিনোদনের সময় গঙ্গা, সরস্বতী কলহ করেন। ফলে গঙ্গার অভিশাপে এই বাণী সরস্বতীই এক অংশে নারায়ণ সন্নিধানে এবং অপরাংশে জলরূপে প্রবাহিতা।

সংবৎসর প্রদীপের উক্তি :

‘সরস্বতী মস্তাদারং লেখনীঞ্চ মাঘে মাসি মিত্র পক্ষে পঞ্চমী যা প্রিয় প্রিয়া।’

ব্রহ্ম পুরাণে ইনিই আবার ভদ্রকালৈ নমোনিত্যং “ভুবনেশ্বরী সংপুটোহয়ং মহাসারস্বতপ্রদা।”

গৌতমীয় তন্ত্রে ও সারদাতিলকে সরস্বতী মন্ত্রের পুরস্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ ও আহুতির উল্লেখ দেখা যায়। ইহার ফলে বিদ্যার্থীগণ দ্বারা বিদ্যাল্লাভ করেন। পারিজাত সারদা গ্রন্থে ও দক্ষিণামূর্তি সংহিতাতে এইরূপ তিন লক্ষ জপের উল্লেখ আছে। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে সরস্বতী নামের বাহুল্য বিকাশ, যেমন : জ্যোতিষ্মতী, ব্রাহ্মী, হংসলতা, শ্বেত কমলবাসিনী, হরহসিতহারেন্দু, কুন্দাবদাতা বাণী, মন্যাস্মিততরমুখী, মৌলিবন্ধেন্দুরেখা, শুভা, সমুদ্ভবা, বাক্প্রদা ব্রহ্মহুতা বেদাগ্রণী, পদ্মোক্ষিজাতা, বিশালা, কুটীলা ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে সরস্বতী নামের নদীর পরিচয় পাওয়া যায়। রঘুবংশে সরস্বতীকে ‘উচ্চারণরূপা’ বলিয়াছেন। মেদিনীতে বলিয়াছেন :

সরস্বতী 'দ্বীপত্ব' ও 'মহুপত্ব'। শব্দ চম্ভিকায় উল্লেখ আছে : সরস্বতী 'সোমলতা'। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্বয়ং সরস্বতীকৃত "রাসেশ্বরীস্বর" স্তোত্রের উল্লেখ আছে। ওদিকে গণেশখণ্ডে বলিয়াছেন : "স্বা চ শক্তি সৃষ্টিকালে পঞ্চশাচেশ্বরেচ্ছায়া। রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গাদেবী সরস্বতী" ইত্যাদি।

"যে বিদ্যে পরা চ অপরাচ" "স্বা বিদ্যা তন্মতির্বিদ্যা"—এইভাবে শ্রুতির প্রমাণে জ্ঞান যায়—যত রকমের বিদ্যা আছে তাহা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ভগবৎ তোষণ অশুশীলন মতি প্রদায়িকাই পরাবিদ্যা এবং ভগবৎ বিশ্বস্তি-দায়িনীই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। মুগ্ধক শ্রুতিতে পাওয়া যায়—যিনি অবিদ্যার সেবা করেন তিনি ঋদ্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। নবদীপে বিচারে পরাস্ত দ্বিধিজয়ী উদ্ধারে—কলিপাবনাবতার 'ত্রীগৌরাংগদেব বলিয়াছেন :

"শুন বিশ্রবর ভূমি মহাতাগ্যবান।

সরস্বতী তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥

দ্বিধিজয় করিব বিদ্যার কার্য নহে।

দৈশ্বর ভজিতে সে বিদ্যা সত্য কহে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।

কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত রয় ॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভগবদ্ব্যবহী বিদ্যাই পরা বিদ্যা। ইহাই মানব প্রজ্ঞার চরম পরিণতি।

ভাগবতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন : হে বিভো, চরম কল্যাণ স্বরূপ আপনাকে পাইতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেক্রপ জলাশয় হইতে নিব্বারসমূহ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান স্বতঃই আসে। যাহারা ততুল পাইবার আশায় ধাক্কা ছাড়িয়া স্থল ভূবে আঘাত করে তাহাদের যেমন ক্রেশই সার হয়, সেইরূপ ভক্তিহীন জ্ঞানের চেষ্টায় কষ্টলাভই হইয়া থাকে। ভগবানে ভক্তিমূলক জ্ঞান হইতেই সাহিত্যের উদ্ভব। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে সেতু সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সাহিত্য শাস্ত্র। সাহিত্যই মহদয় হৃদয়ের

সুসংবাদ। এই সংবাদই এক মনের সংগে আরেক মনের সহিতত্ব সৃষ্টি করে। একের ভাবনা অন্য সমব্যবহারী মনে তরংগ উত্তোলন করে। সাহিত্য শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিবেশনই নহে, তাহার সংগ সমাজের হিত সাধনাও। এই বিশ্বহিতের প্রয়োজনে সাহিত্যিকগণই প্রধান শিল্পী। সারস্বত সাহিত্যিকগণ কখনো স্বপ্রবিলাসী নহেন। পরস্তু জাগ্রত মনের অতন্ত্র স্বাক্ষরে তাঁহারা চিরজাগ্রত। যে বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান নিহিত সেই পরম বিজ্ঞান আনন্দময় তত্ত্বই সবার সেবা। সেই সেবা সেবকের তৃপ্তি ও বেদন মূলক রসবৈচিত্র্যই সারস্বতগণের শাস্ত্রত বাসস্থান।

শুদ্ধ সারস্বতগণ জ্ঞানেন, বিনশ্বর দেহ-মনের অভাব দূরীকরণ প্রয়াসই চরম নয়। পরস্তু অবিনাশী আত্ম-স্বরূপের বাহ্যাসুশীলনই সরস্বতী সেবকের চরম সার্থকতা। বিশ্বের সমস্ত মূল নীতিগুলি পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি। সর্ব-নিয়ন্তা দৈশ্বরকে বাদ দিয়া গণবাদ বা সাম্যবাদ রচিত হইলে তাহা শূন্যবাদে পরিণত হইবে। তাহাতে কাহারো মর্মভেদী আত্মনার প্রকাশিত হইবে না। জন্মধর্মের তাড়নায় মানুষ কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। চিদবাহিত্যবাদ বা চিন্মাত্রবাদের অস্তিত্বের ফল প্রায় একই। স্তবরাং তদুদ্দেশ্যে তুরীয় ভূমিকাতেই শুদ্ধ সারস্বত গণের চিংসাহিত্যে অবস্থান। জড়ীয় আহার নিব্বা-ভয় মৈথুন এগুলি শারীরিক ধর্মেরই তাড়না। ইহার সাহিত্যও ক্ষণভঙ্গুর। এ পথে সম্ভোগ-বৈচিত্র্যপটু মানুষের স্বচ্ছচেষ্টা প্রারম্ভঃ সাধারণ অর্থ কাম মোক্ষেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। যাহা নিজেদ্রিয় তৃপ্তি বাসনায় প্রলুব্ধ, তাহা কখনো ভগবৎ তোষণপর প্রেমধর্ম নহে। দার্শনিকের ভাষায় যাহা দৃশ্য-দর্শক-দর্শন। পারমার্থিক সারস্বতের পরিভাষায় তাহাই উপাস্ত-উপাসক-উপাসনা। যিনি পরম নিত্য আনন্দময়, তাঁহার উপাসনাও নিত্য। তাই নিত্যানন্দই শুদ্ধ সারস্বত সাহিত্যিকের জীবাত্ম।\*

\* কালীধামস্থিত মীরা বাণী প্রচার মন্দিরে অনুষ্ঠিত সারস্বত সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।



## মনুষ্যত্ব মহিমায় মহান যারা

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

নফরচন্দ্রকে সকলে বলিত নফরা মেথর। মিউনিসিপ্যালিটির কাজও সে করিত, বাড়ী বাড়ী কাজও করিত। উপার্জন করিত তখনকার কালে প্রায় একশত টাকা, প্রতি মাসে। কাজকর্মে তার এতটুকু কঁাকি নাই। গুছাইয়া সব কিছু করিবে নির্ধারিত সময়ে।

মাতৃদেবীর সে খুব প্রিয় হয় তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্ত। প্রতিদিন কাজকর্ম সারিয়া মায়ের হুকুম লইয়া তবে সে বাড়ী হইতে যাইবে।

বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম হইলে সর্বাগ্রে ডাক পড়িবে নফর চন্দ্রের। চব্যচন্দ্র লেহু পেয় দিয়া তাহার সেবা করাইয়া ও তাহার বাড়ীর জন্ত সব তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া, তবে মাতাদেবী স্বস্তিবোধ করিতেন।

মধ্যে মধ্যে নফরকে এমনি খাওয়ান, তাঁহার চাই। একদিন নফর যেখানকার যা কাজ সব সারিয়া বাটীর বাহিরের রোয়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোট। সেদিন রবিবার।

নফরকে ফিটফাট হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেজবাবু (কৃষ্ণপ্রসাদ) বলে, নফরবাবুর আজ এত সজ্জা যে! নফর কৃষ্ণপ্রসাদের মুখের দিকে না চাহিয়াই বলে, “যা যা দিক্ করিস নি।”

সেই সময়ে নফরের কাছে আসিয়া কে বলে, মা—

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া নফর বলে, “মা, চল চল। কৃষ্ণপ্রসাদ হাসিয়া বলে, ও তাই —

নফর—যা যা আমিও মায়ের বেটা রে। তুই কি-জানবি! জানে মা, জানি আমি।

নফরকে মা খাওয়াইল নিজে পরিবেশন করিয়া। নফরের স্পর্শ, “তুই কি জানবি! জানে মা, জানি আমি।” সুপ্তের মতই কথা। এতে জানাজানি, হাঁপাহাপি, মাও করেন না, বেটাও করে না।

নফর যে কি মাছুষ, মা জানিয়াছিলেন সব। নফর যা উপায় করে, তার মধ্যে খরচ করে নিজের জন্ত, মাত্র দশ টাকা। বাড়ীতে পাঠায় পঁয়ত্রিশ টাকা। বাকি খরচ করে নিত্য দরিদ্র ভোজন করাইয়া।

এই সেকালের নফরা মেথর।

সেই নফরচন্দ্রের মুখে আঘাত করিয়া একদিন আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র রক্তগঙ্গা বহাইয়া দেয়। নফরের কি অপরাধে ইহা ঘটে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

হবি ত’ হ। ঠিক সেই সময়ে স্বরেশপ্রসাদ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। আঘাতকারীর পলায়ন। নফর অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান।

নফরকে রক্তাক্ত দেখিয়া স্বরেশপ্রসাদ প্রশ্ন করিল, একি নফর? চূপ করে রইলি। বল কি হয়েছে? নৈলে—  
নফর বলিতে বাধ্য হইল, যা ঘটিয়াছে। ক্রোধে ঘৃণায় স্বরেশপ্রসাদের সর্বোচ্চ কাঁপিতেছে। চিৎকার করিয়া অপরাধীর নাম ধরিয়া স্বরেশপ্রসাদ ডাকিল। কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল অপরাধী নত মস্তকে।

স্বরেশপ্রসাদ—একি! শব্দর মাছের চাবুক মেয়ে তার...জানিন্ নফর কে? তোর বাপের ভাই। নফরের পায়ে ধ’রে মাপ চা—

পায়ে ধরিতে অগ্রসর অপরাধী, নফর সকাতরে বলিল, ন’ বাবু, ন’ বাবু—

ন’ বাবু (স্বরেশপ্রসাদ)—খাম নফর, নৈলে আমি তোকে—

অপরাধী পায়ে ধরিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিল। নফর কাঁদিতেছে। স্বরেশপ্রসাদের চক্ষু আর্দ্র। হুকুম হইল অপরাধীকে, যা সামনে থেকে।

স্বরেশপ্রসাদ থাকিতে পারিল না। স্থান ত্যাগ করিল।

বাটীর সম্মুখে লোকে লোকাণ্য। সকলেই নফরকে চেনে। বলিল তাহাদের মধ্যে অনেকে, “নফরা ন’বাবুকে কেন বলতে গেলি?”

নফর—আমি কি বলেছি। কোথা থেকে ন’বাবু এসে হাজির!

যাহারা জানিয়াছিল, তাহারা ছাড়া নফরা তুলিয়াও এ কথা কখনও মুখাণ্ডে আনে নাই। নফরাও আজ

নাই। মাও নাই। অরেশপ্রসাদও নাই। আছে যা—  
হে ভগবান!

পিতৃদেবের সংসারে সকালে দেড় শত ও রাত্রিতে  
দেড় শত পাত পড়া ছিল, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।  
রামফলের সাহায্যে-স্বচাক্ষুণ্যে তাহা সম্পন্ন করাইয়াছেন  
মাতৃদেবী।

অভিজ্ঞতা রামফলের এমন হইয়া যায়, যে মাতৃদেবীর  
বাক্যের ফর্দ (মুখে মুখে) না মিলিলেও রামফল স্বয়ং  
উপকরণাদি আনিবে নিখুঁতভাবে।

ক্রমে পাকা গৃহিণী বনিয়া যায় রামফল। মা  
ঠাকুবাবীর মাছ ভাগ করিয়া দিবার ক্রেশ হইতে বাঁচাইতে  
থাকে রামফল, পাচি কাকে কাকে কি মাছ দিতে হইবে  
বুঝাইয়া দিয়া।

বাটার এত কাজ করিয়াও রামফল যাইবে ইস্কুলে  
ছেলেদের লইয়া। টিফিন দিয়া আসিবে তাহাদের যথা-  
সময়ে। আবার ৪ টার সময়ে ছেলেদের ফিরাইয়া আনা।

এত কাজ ও স্থপাক আহার সারিয়া সহরের পাশে  
ফুটপাথে বসিয়া রামফলের সেলাই, ফোঁড়াই-এর বিরাম  
নাই। কবি হেম বাঁড়ুজ্যো, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম  
চন্দ্র প্রভৃতি যখন আসিয়াছেন, পাইয়াছেন রামফলের  
সহাস্ত অভ্যর্থনা। রামফলকে দেখিলে ভীম নাগ যাচিয়া  
তাহাকে বলিবে, বাড়ীতে সন্দেশ পছন্দ হুচ্ছে ত'।

রামফল সকলের এত প্রিয়! আর সংসারের সে ত'  
কেউ বিটু। বাবার গা-হাত-পা টেপবার সময়ে কর্তা-  
বাবুর সঙ্গে তার কত কথা।

পেটকা বাবু (মুণীন্দ্রপ্রসাদ) একটু দুর্বল। তবে  
তাকে শাসন করিবার উপায় কর্তাবাবুরও নাই,  
রামফলের জন্ত। শাসন করিলে রামফল ঝাঁপাইয়া  
পড়িয়া বলিবে, ওঃ ওঃ কর্তাবাবু! চল্ তাই চল।

রামফল একবার দেশে গিয়া বিদ্যা সাধি করিয়াছিল।  
সে কবে! আর দেশে যায় নাই। তার বৌ ক'বার  
আসিয়া তিন চার মাস ধরিয়া থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যায়।

এইভাবে চলিয়া, জীবনাতিপাত করে রামফল  
কলিকাতায়।

মা গেলেন। ছোট ছ' ভায়ের বিয়ে হয়। ছোট  
ভাইরা বিলাত গেল পড়িতে। রামফল যেখানকার  
সেখানেই রহিল। না রহিলে চলিবে কেমন করিয়া!  
মা নাই, সংসারের গোছগাছ করিয়া দেবে কে!

কর্তাবাবুর ষাবার পর হইতেই রামফল খুবই মনমরা।

ভায়ের প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতিয়াছে।  
সে থাকে কোথায়!

ধাকার ব্যবস্থা সে আপনি করিল। আজ এর  
সংসারে, কাল ওর সংসারে। বয়সে সে পার হইয়াছে  
তিন কুড়ি। এ-সংসার ও-সংসার করিতে করিতে রাস্তায়  
সে একদিন গাড়ীর ধাক্কায় পড়িয়া গেল!

আর যায় কোথা! তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হইল, রাসফল  
এখানে ওখানে যাইবে আসিবেও গাড়ীতে।

তাত' হইল। রামফল বয়সের জন্ত গাড়ীর ধাক্কা যে  
খাইয়াছিল, তাহা নহে। কর্তাবাবুর রাজার সংসার,  
কেমন যেন হইয়া যাইতেছে! সে আঘাত অল্পবিস্তর সে  
পাইয়াছে।

তাহার উপর লালাবাবু (বিনয়প্রসাদ) একদিকে  
চলিয়া গেল। সেজবাবু (কৃষ্ণপ্রসাদ) মা বাপের ছিল  
যে বড় স্নেহের, বড় আদরের, আর রামফলের ছিল যে  
প্রাণ-বিলাত হইতে ফিরিয়া বড় ভাইয়ের (মত্যা-  
প্রকাশেব) সঙ্গে কি সব আলাপ করিয়াছে, যাহার জন্ত  
রামফলের মন অন্তরের ভাবনায় মুহমান। সে কারণে  
রামফল চিন্তাভারে আচ্ছন্ন।

এই সময়ে রামফলের দেশে যাওয়ার কথা উঠিল।  
অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামফল যাইতে নিমরাজি হইল।

রামফলের ভাগ্যে সেই সময়ে রামফলকে লইতে  
আসাতে রামফল সম্মত হইল যাইতে।

রামফল বেলগাড়ী সওয়ার হইবার পরদিনেই থবর  
আসিল, রামফল ট্রেনে মারা গিয়াছে।  
সংবাদ মর্মান্তিক।

রামফলের সঙ্গে কয়েক সহস্র টাকা ছিল। সে টাকা  
লইয়া যাইতে চাহে নাই। অনেক করিয়া রাজী তাহাকে  
করাইতে হয় টাকা লইয়া যাইতে। সেই টাকাই হয়  
তাহার কাল। পুলিশ তল্লাসীতে তাহাই সপ্রমাণিত হয়।  
জীবনপাত করিয়া প্রভু সেবার অপূর্ণ পুরস্কার!

এই বয়সে আমার আজ বাবা নাই, মা নাই, ভায়েরা  
নাই, সতীরাণীও নাই। আছে মাত্র সকলের স্মৃতি।  
সেই সঙ্গে রামফল দাদা তোমার স্মৃতিও উজ্জ্বল হইয়া  
রহিয়াছে।

তোমার স্মৃতিকথা লিখে রেখে যেতে বাড়ীর কাউকে  
দেখিনি যদিও কতশত অন্ত কথা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন।  
তাদের তুলনায় নগণ্য আমি। সেই নগণ্যের আঁখিজলে  
ভরা এই স্মৃতিপূজা গ্রহণ কর আমার শ্রদ্ধের সহোদর—  
হ্যাঁ সহোদর আজ যেখানেই তুমি থাক।

## পূর্ব ও পশ্চিম

( চিত্রনাট্য )

বিনয় চৌধুরী

[ স্থান : ফ্রান্স। কাল : একটি বিকেল, ১৯৩০ সাল। পরিবেশ : কবিশৃঙ্খল রবীন্দ্রনাথ ভ্রম্যয় হয়ে গবাংক পথে আকাশের রঙ ফেরা দেখছিলেন। বসেছিলেন প্রকাণ্ড একখানা ঈজিচেয়ারে। পরণে তাঁর সেই বিশেষ সারা দেহ-ঢাকা মোকবা। পাশে দাঁড়িয়ে কবির মস্তশিষ্ট পিয়াসর্ন। এমন সময় বাইরে থেকে বেল বেজে উঠলো! পিয়াসর্ন ধীরে ধীরে গিয়ে দোর খুললেন। বাইরে মুখ বাড়িয়ে কে একজনের সঙ্গে কথা কয়ে ফিরে এলেন ]

পিয়াসর্ন—গুরুদেব।

রবীন্দ্র—ঐ!

পিয়াসর্ন—ফ্রান্সের খ্যাতনামী কবি শ্রীমতী কৌমতেস্‌ নোয়াই আপনার ছবিব প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রবীন্দ্র—সুঁকে আসতে বলো।

[ পিয়াসর্ন দোরে ফিরে গেলেন এবং কৌমতেস্‌ নোয়াইকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। রাজকীয় বসন-ভূষণে সজ্জিতা অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী তম্বলী কৌমতেস্‌কে দেখাচ্ছিল যেন অবিকল অপূর্ব শোভনা উর্বশী ]

কৌমতেস্‌—শুভ সন্ধ্যা।

রবীন্দ্র—শুভ সন্ধ্যা।

[ কবির হৃদিতে কৌমতেস্‌ আসন নিলেন ]

কৌমতেস্‌—আমি জানতুম তুমি মহৎ—কিন্তু তোমার ছবি না দেখলে কখনোই বুঝতে পারতুম না যে তুমি কতো বড়। তোমার ছবি তোমার কবিতা ও গানের মতোই আত্মার এক একটি অনির্বচনীয় উপলব্ধি।

রবীন্দ্র—আপনার দৃষ্টি ও উপলব্ধিকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

[ একটু মৌনতা ]

কৌমতেস্‌—কবিসম্রাট্‌। একটা কথা—

রবীন্দ্র—কি বলুন—অসঙ্কোচে বলুন!

কৌমতেস্‌—কবিবর, একটু নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই। কোনো আপত্তি আছে?

রবীন্দ্র—কিছুমাত্র না। পিয়াসর্ন—

[ ইঙ্গিত বুঝে পিয়াসর্ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—একটু মৌনতা ]

কৌমতেস্‌—একটা কথা কবি, যদিও আমাদের উভয়ের মাজেই প্রথম সাক্ষাৎকার, তথাপি অস্তুর মাঝে বছরদিন ধরেই তোমায় আমি জানি। তোমার এই দেবমূর্তি আমার স্বপ্নের ধ্যান, আমার ধ্যানের স্বপ্ন। জানিনা আমার কবিতা তুমি পড়েছ কিনা।

রবীন্দ্র—পড়েছি এবং ভালও লেগেছে। আপনি প্রতিভাময়ী সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কৌমতেস্‌—একিরকমধারা হোলো কবি—ভারত তথা জগতের শ্রেষ্ঠ কবি-মনীষী আর শিল্পী তুমি—আমিও ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ কবি—অস্তুর মাঝে আমি যে তোমার কত আপন সেতো তুমি জানো কবি-সম্রাট্‌—তবু কেন এই ছল কবি?

রবীন্দ্র—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝলুম না।

কৌমতেস্‌—তবু ছল! আমি তোমায় ‘তুমি’ সম্বোধন করলুম—আর তুমি বলছো আমায় ‘আপনি’—

রবীন্দ্র—সেটাই কি শোভন নয়—আমি পুরুষ আপনি নারী।

কৌমতেস্‌—কিন্তু নারীকে তোমার মতো এমন আর কে ভালবাসতে পেরেছে—এমন মর্যাদায় আর কে অভিসিক্ত করেছে!

রবীন্দ্র—কি জানেন, ভালবাসার সঙ্গে আরও একটা বস্তু জড়িয়ে আছে—সেটা কামনা নয়, শ্রদ্ধা। নারীকে মাতৃভাবে দেখাই প্রাচ্যের শিক্ষা।

[ একটু মৌনতা ]

কৌমতেস্‌—কবি, আমি তোমার কাছে সত্যিই হেরে গেলুম কবি। গ্যায়টে বলেছিলেন—“A great writer must first of all be a great man and after that a writer।” আর তোমার ভাষায়—“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ”—

রবীন্দ্র—মনে রাখবেন, আপনিও কবি—Let us not forget that we both are poets। কীর্তির চাইতে বড় কাব্যের চাইতে কবি।

কৌমতেস্—আমায় কমা করো কবি। তুমি শুধু কবি নও—তুমি কবি-ঋষি রবীন্দ্রনাথ। তোমাকে আজ আমি অকপটে সব বলবো। আমার রূপ, আমার ঘোবন, আমার রুচিবোধ নিয়ে আমি যথেষ্ট গর্ব বোধ করতুম। এ-সবের সঙ্গে কবি-প্রতিভা এসে যুক্ত হয়ে আমাকে করে তুলেছিল মাতাল। ফ্রান্সের এমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নেই যিনি আমার সাম্রিধ্য পাবার জন্য কাঙাল না হয়েছেন। সেই গৌরবের বড়াই নিয়ে আজ এসেছিলুম আমি তোমাকেও ছলনা করতে। [ হঠাৎ ভাবান্তর ] না গো কবিসম্রাট, শুধুমাত্র ছলনা নয়—সত্য বলতে কি, নিজেই আমি বিকিয়ে গিয়েছিলুম। তোমার ঐ কন্দর্প-কাস্তি, ঐ বিশ্ববিমোহন রূপ আমাকে বিচলিত, আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। উর্বশীর কামনা নিয়ে আমি ছুটে এসেছিলুম তোমার কাছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারলুম, অগতের পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমি। তুমি হেলার ছলে আমার পরম শিক্ষা দিলে। আজ হতে তুমি আমার

গুরু—তুমি আমার প্রভু। ওগো গুরুদেব, তুমি আমাকে আমার অহমিকা থেকে মুক্তি দিলে, আমার মনের পঙ্কিল কামনা খুচিয়ে দিলে, আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়ে সম্ভার রাজপথের বার্তা আমার কাণে পৌছে দিলে, তোমার চরণে আমার হাজার প্রণাম! আমাকে তুমি আশীর্বাদ করে গুরুদেব!

[ কবির চরণে প্রণত হলেন ]

রবীন্দ্র—কি জানো, অমৃত্যুতাপের বড় আশীর্বাদ নেই। অমৃত্যুতাপের আগুনে পুড়ে তুমি শুষ্ক হলে, পুত হলে, পবিত্র হলে। এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু, সখী—আমার অস্তরের অন্তরতম বান্ধবী।

[ কৌমতেস্কে দুই হাতে তুলে মুখোমুখী দাঁড় করালেন—কবির দিকে অভিজ্ঞত দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কৌমতেস্ স্ত নোরাই—কণপরে গান ধরলেন—কবির রচিত গান— ]

॥ গীত ॥

আমার মাথা নত করে দাও হে

তোমার চরণ ধুলার তলে—ইত্যাদি ॥

॥ পটক্ষেপ ॥

## পূর্ণতা মেলেনি

শ্রীদীপ্তোপল রায়

ভগবান বল্লেন 'আলো হ'ল—আলো হ'ল,  
ইচ্ছা হ'ল আঁধারকেও রাখতে হ'বে, আঁধার থাকল।  
তারপর মনে হ'ল পথ চাই, পথ হ'ল,  
সৃষ্টি হল ভূমির, সৃষ্টি হ'ল বিশ্বের।  
কিন্তু বিশ্বে হাঁটবে কে, কোন্ সে জীবন?  
ভগবান তাও দিলেন, জীবের আবির্ভাব হ'ল।  
মামুষ এলো।

ভগবান বল্লেন সত্য, শিব এবং স্নানরের প্রতিষ্ঠা হোক,  
কিন্তু তা হ'ল না; হ'ল না তার ইচ্ছার পূর্তি।  
মামুষ ভগবানের সৃষ্ট মনে করল না নিজেকে,  
সে আপন আকাশ ভরে তুলল নিজের গানে।

ভগবান কানে আঙ্গুল দিলেন,  
চোখ বন্ধ হ'ল তাঁর;  
সৃষ্টির কাছে তিনি রুঢ় আদ্যাত পেলেন।  
ভগবান বল্লেন 'আমি' থাকব, তোমাদের মধ্যে  
দেখব তোমাদিগকে।  
মামুষ হাসল, বলল তাই হবে, তুমি এখন ঘুমোও।  
ভগবান মুহূর্ত কাটালেন, দিন কাটালেন,  
যুগ যুগ চলে গেল;  
ভাবলেন এদের কি দেব, আর কিছু তো নেই।  
থাক এরা অন্ধকারে অহংকে আঁকড়ে।  
অপূর্ণতাকে নিয়ে।

# গৌড়বঙ্গের পালরাজগণ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

নয়পালদেব (২য়) ( ১০০৮—১০৫৫ খৃঃ )

মহাপালদেবের ( ১ম ) মৃত্যুর পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ঘটনা তীর্থিক ধর্মাবলম্বী কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণের ( সংক্ষেপে কর্ণ ) সহিত নয়পালদেবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। অল্পমান ১০৪১ খৃঃ গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর কর্ণ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন এবং পিতার পথানুসরণ করিয়া তিনিও মগধ আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে কর্ণ জয়ী হন, কিন্তু নগরচূর্ণ অধিকারে অসমর্থ হইয়া কতকগুলি বিহার ধ্বংস করেন। অতঃপর নয়পাল নূতন বল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কর্ণকে আক্রমণ করিলে কর্ণের সৈন্তগণ পলাইতে আরম্ভ করে। এই সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর স্রীজ্ঞান মগধে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয় এবং সন্ধিসূত্রে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অধিকৃত ভূভাগ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই সন্ধির পর ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে অতীশ দীপঙ্কর তীব্বতরাজ চান-চুবের আমন্ত্রণক্রমে তীব্বতে গমন করেন।

পাগ্-সাম্-জোন্ ছুঙ্-নানক্-তীব্বতীয় গ্রন্থের(১) মতে অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খৃঃ গৌড়দেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অতীশের স্বপ্রণীত “বোধিমার্গ প্রদীপ পঞ্জিকায়” লিখিত আছে যে, তিনি বাঙ্গালার রাজপরিবারে জন্মিয়া ছিলেন। বিক্রমণিপুর বোধহয় বাঙ্গালার ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। তাঁহার পিতার নাম কমলক্সী, মাতার নাম প্রভাবতী ও নিজের পূর্ব নাম চন্দ্রগর্ভ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে চন্দ্রগর্ভ জেতারি নামক গুরুর নিকট প্রেরিত হন। কথিত আছে জেতারির পিতা সনাতন নামক বারব্রহ্মের জর্নৈক সামন্ত রাজার সভাসদ ছিলেন। জেতারির

স্বপ্রণীত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে তাঁহার পিতার নাম গগন ঘোষ ও তিনি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। জেতারির পর কৃষ্ণগিরি বিহারের আচার্য্য রাহুল গুপ্ত তাঁহার আচার্য্য হন এবং অতীশকে সাধনমার্গে দীক্ষা দেন। উনিশ বৎসর বয়সে তদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য শীল রক্ষিত অতীশকে ভিক্ষু ব্রতে দীক্ষা দেন। এই সময় অতীশ ‘দীপঙ্কর স্রীজ্ঞান’ উপনাম প্রাপ্ত হন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সুবর্ণ দ্বীপে ( পেশুর স্বর্ধ্বপুর, বর্তমান খাটল ) মহাচার্য্য চন্দ্রকীর্তির নিকট গমন করিয়া তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থানের পর সিংহল ও কতিপয় বনময় দ্বীপ পরিদর্শনান্তে মগধে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। বজ্রাসনে ( বোধগয়া ) বাসকালে তিনি তিন-বার তাত্ত্বিকগণকে ধর্মবিষয়ের বিচারে পরাস্ত করেন। গৌড়েশ্বর মহাপাল ( ১ম ) ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পর কোন সময়ে তাঁহাকে বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য্য পদে বরণ করেন। তীব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্ত তীব্বত-রাজ লামা জে. সে. হোড্-তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তুর্কিস্থানের মুসলমান রাজার সহিত যুদ্ধে জে-সে-হোড বন্দী হইয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবার চারি বৎসর পর, জে-সে-হোডের ভ্রাতৃপুত্র চান-চুব তীব্বতের রাজা হইয়া নাগ্-ছো নামক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণপত্রসহ অতীশের নিকট দূত প্রেরণ করেন। নাগছো তিন বৎসর মগধে থাকিয়া অতীশকে সন্মত করাইয়া ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লইয়া তীব্বতে প্রত্যাগমন করেন। পতিমধ্যে নেপালরাজ অনন্তকীর্তি তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। নেপাল হইতে গৌড়েশ্বর নয়পালকে উপদেশ দিয়া এক পত্র লেখেন। তাহার নাম “বিমলরত্ন লেখ”। তীব্বতের উ-জে প্রদেশে পৌছিলে তীব্বতবাজ চান-চুবের প্রেরিত শ্বেত পরিচ্ছদধারী একশত অশ্বারোহী কুড়িটি সাটিনের ছত্র ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহ “ওঁ নমিগম্বে হু” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাজার নামে তাহাকে

(১) তীব্বতী-অমুবাদ, “কংডর ও তংডর”, নামক দুইখানি সংগ্রহ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কংডরে ৭০০ সংস্কৃত গ্রন্থের অমুবাদ আছে। তংডরে কংডরের অনেক গ্রন্থের টীকা ও দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যশাস্ত্র ও মন্ত্রের ও তন্ত্রের কয়েকশত গ্রন্থের অমুবাদ আছে।

অভ্যর্থনা করে। অতঃপর তাঁহাকে গুজের রাজধানী  
থে ডিং নগরে লইয়া যাওয়া হয়। পশ্চিমধ্যে তিনি সাত-  
দিন মানস সরোবরে অতিবাহিত করেন। গু-জে প্রদেশে  
নিরাভোগ বিহারে তিনি দুই বৎসর থাকিয়া “লোকাতীত  
সম্প্রদাযিবি” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি  
মধ্যতিব্বতে লাসা নগরে গমন করেন। লাসা হইতে  
কোন এক বৌদ্ধ বিহারে গমন কালে পশ্চিমধ্যে ৭৩ বৎসর  
বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতীশের সমাধি মন্দিরের নাম  
গ্লে-মো (Sgor-mo)। তীব্বতে ছে-মঙে তিনি  
একটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন (The Land of  
snow by david Mc Donald. P. 40)।

তীব্বত যাত্রার পূর্বে কোন সময়ে অতীশ কিছুকাল  
বারেন্দ্রভূমির সোমপুর বিহারে (১) থাকিয়া ‘ভাববিকের  
“মধ্যমক-রত্নগ্রন্থীপ” গ্রন্থখানির তীব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ  
করেন (Catalogue of Jemgur)। বজ্রযান ও  
কালচক্রধানের বহুসংখ্যক ও মহাযান সম্বন্ধে কয়েকখানি  
গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তীব্বতের ক-দং-প  
(Jka gdams-pa) নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তিনি  
প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধ দেবতা তিন মস্তক, চারি হস্ত ও  
চারিপদ বিশিষ্ট হয়গ্রীব ধর্মপালের মূর্তি অতীশের প্রাণনায়  
প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তীব্বতীয়গণ  
তাঁহাকে দেবতার জ্যেষ্ঠ ভক্তি করে।

চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতা চক্রপাণি  
দত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত নয়পালদেবের রক্ষনশালার  
অধ্যক্ষ ও তদগ্রন্থ ভানু দত্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন (চক্র  
দত্তের টীকাকার শিবদাস সেনের টীকার সমাপ্তি শ্লোক)।  
নয়পালদেবের ১৫শ রাজ্যাব্দের দুইখানি গয়ালিপিতে রাজা  
পরিতোষ, তৎপুত্র শূদ্রক ও তৎপুত্র বিশ্বদিত্য ও বিশ্বরূপের  
উল্লেখ আছে। আরও লিখিত আছে যে, রাজা শূদ্রকের  
বাহুবলে গয়া রাজ্য দীর্ঘকাল রক্ষিত হইয়াছে।

বিগ্রহপাল (৩য় : ১০৫৫—১০৭২ খ্রঃ)

তৃতীয় বিগ্রহপালের ১৭শ রাজ্যবর্ষে তিনি কাকনপুর

(১) সোমপুর মহাবিহারবাসী সামন্তটীক [ সমতটেশ্বর ] শ্রীবীর্ধোদ্র  
ভদ্র বোবিপয়্যর একটি বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করেন ও ঐ মূর্তির পাদপীঠে লিপি  
খোদিত করান। সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬১)।

জয়স্কন্দাবার হইতে তীরভুক্তির বসুকাগ্রামাংশ ক্রোড়ঞ্চ  
বিনির্গত ঘণ্টক শর্ম্মাকে দান করেন (প্রবাসী ১৩৫৮,  
ফাল্গুন) ও তাঁহার রাজ্যের ১১শ বর্ষে (বেলগুয়া লিপি,  
সাঃ পঃ পত্রিকা ৫৬ বর্ষ, পৃঃ ৬০) ও ১২শ বর্ষে (আমগাছি  
লিপি) পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তির যথাক্রমে কালিতবিধী বিষয়ে  
ও কোটিবর্ষ বিষয়ে) তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন।

নয়পালের সহিত সন্ধি করিয়া কলচুরী কর্ণ (১০৪১-  
১০৭৩ খ্রঃ) নিশ্চেষ্ঠ ছিলেন না। তিনি পরমার ও চন্দ্রেন্ন-  
গণের প্রভাব ধ্বংস করিয়া মহানদীর উত্তর উপত্যকা  
পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার এবং গৌড় ও বঙ্গ পুনরায়  
আক্রমণ করেন। কলচুরী খোদিত লিপিগুলিতে বলা  
হইয়াছে যে, কর্ণের ভয়ে বঙ্গ কস্পিত ও গৌড় আত্মসমর্পণ  
করিয়াছিল। বীরভূম জেলার পাইকড় গ্রামে কর্ণের  
একটি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি  
উত্তর রাঢ়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা অস্বাভাবিক  
নয়। কিন্তু অবশেষে তিনি বিগ্রহপালের হস্তে পরাজিত  
হইয়া কল্যাণী নদীতীরে বিগ্রহপালের হস্তে অর্পণ করিতে  
বাধ্য হইয়াছিলেন (রাম চরিতং ১১২)।

দ্বিতীয় গোপালদেবের (৯৪০-৯৬০ খ্রঃ) পূর্বে হইতেই  
বঙ্গের কতকাংশ (রোহিত গিরি বা কুমিল্লার লালমাই  
পাহাড়) চন্দ্রবংশীয়গণের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের  
পাঁচখানি তাম্রশাসন (১) পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে  
চতুর্থ ধুল্লাশাসন শ্রীচন্দ্রের ৩৫ রাজ্যাব্দে ও প্রথম  
মদনপুর শাসন তাঁহার ৪৪ রাজ্যাব্দে (ভারতবর্ষ, ১৩৫৩,  
অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫১৪) বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্দাবার  
হইতে প্রদত্ত হয়। এই শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে  
রোহিতাগিরি-ভোগী (“রোহিতা গিরি ভূজাং”) চন্দ্র-  
দিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র স্ববর্ণচন্দ্র জয়গ্রহণ করেন।

(১) কোন কোন মতে হিউয়েন-সঙ্গ বর্ণিত পল্লাবের অন্তর্গত  
Sang-ho-pu-lo এই সিংহপুর। লক্ষ সত্তল লেখ মতে জলন্ধর রাজ-  
মহিষী দ্বন্দ্বরীর পিতা সিংহপুরের বহু বংশীয় রাজা ছিলেন। এই লিপিতে  
সিংহপুরের বাদ্যব বংশীয় বর্দ্ধা উপাধিধারী দ্বাদশজন রাজার নাম উল্লিখিত  
হইয়াছে। কিন্তু Sten Konow কলিঙ্গ রাজ্যের অপর এক সিংহপুরের  
বর্দ্ধা উপাধিধারী কলিঙ্গরাজগণের উল্লেখ করিয়াছেন। কলিঙ্গপতি  
হইতে তাম্র শাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছেন।

স্ববর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রবীপের রাজা হন। তিনি হরিকেল-রাজ ককুদ-ছত্র-শিতাশ্রীর আধার (“হরিকেল-রাজ ককুদ শিতাগাং শ্রীয়াং আধারঃ”) ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীকাঞ্চনার গর্ভে পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ পরম সৌগত শ্রীচন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (১০২১-২৩ খৃঃ) অপর একজন চন্দ্রবংশীয় রাজার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্র। ইঁহাকে বঙ্গাল দেশের রাজা বলা হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের ১২ সম্বৎসরে করিমপুর জেলার কুলকুড়ি গ্রামে একটি প্রস্তরময় স্মৃতিমূর্তি ও ২৩ সম্বৎসরে ঢাকা জেলার কেতকা (টঙ্গীবাড়ী) গ্রামে একটি প্রস্তরময় বাস্তুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মূর্তিদ্বয়ের পাদপীঠের লিপি হইতে ইহা জানা যায়।

শ্রীচন্দ্রই বোধহয় বিক্রমপুর অধিকার করিয়া বঙ্গাল দেশের স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। গোবিন্দচন্দ্র বোধহয় শ্রীচন্দ্রের বংশধর ছিলেন। কর্ণের পৌত্র গয়কর্ণের পত্নী অহল্য দেবীর ভেড়াঘাট লিপিতে লিখিত আছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গরাজ কম্পিত থাকিতেন। কর্ণাটের চালুক্যরাজ সোমেশ্বরব (১ম) কেল্লাবাড়ী শাসন (১৮৫৩ খৃঃ) হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেনাপতি (ভোগদেববর্ষ) বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ের উড়িষ্যার সোম বংশীয় রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতির শোনপুর শাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি গোড় দেশকে প্রবল আক্রমণ করিয়াছিলেন ও বঙ্গের নির্মল আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের স্থায় উদ্ভিত হইয়াছিলেন। এইরূপ গোলযোগের মধ্যে চেদি কর্ণ (১০৪১—১০৭০ খৃঃ) কলিঙ্গের সিংহপুরের যদুবংশীয় রাজা বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মণের সহিত নিজ কন্যা বীরশ্রীর বিবাহ দিয়া জামাতা জাতবর্মাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়াভিধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। জাতবর্মার পৌত্র ভোজবর্মার বেলাব শাসন লিপিতে লিখিত আছে, “এই যদুবংশে বীরশ্রী ও হরি বহুবীর প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই হরির বান্ধব বর্মণগণ সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন “ভেজে সিংহপুরম্।” এই বংশে বজ্রবর্মার বান্ধবচম্বর “সমর-বিজয়-

যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্মার কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, অন্দের শ্রীকে প্রোধিত করিয়া, কামরূপের শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্যের ভূজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে শ্রীদলে করিয়া সার্বভৌম শ্রী বিস্তার করিয়া-ছিলেন।” এই সময় অঙ্গদেশে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট বংশীয় মহাদেব পালরাজদের সামন্তরাজ ছিলেন, কামরূপে রত্নপালের রাজত্ব চলিতেছিল (১)। কৈবর্ত নায়ক দিব্য গোড়েশ্বর বিগ্রহপালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন (রামচরিতং ১৩৮ শ্লোকের টীকা)। ভবদেব ভট্টের পিতামহ আদিত্য (চন্দ্রবংশীয়) বঙ্গপতির বিশ্রামসচিব সাক্ষিবিগ্রহিক ও মহাপাত্র এবং পিতা গোবর্দ্ধন বীরস্থলীতে ও রাজসভায় “বীরস্থলীষু চ সভাষু চ প্রসিদ্ধ” ছিলেন (ভবদেব ভট্টের শিলালিপি)। জাতবর্মার তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন। জাতবর্মার যে বঙ্গরাজ্যের সেনাপতি গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন সেই বঙ্গপতি বোধহয় গোবিন্দচন্দ্রের বংশধর ছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের পঞ্চম রাজ্যাক্ষের একখানি গয়া লিপিতে গয়্যার রাজা [ পরিতোষের পৌত্র ও শূদ্রকের পুত্র ] বিশ্বরূপকে শত্রু হস্তা বলা হইয়াছে। বিশ্বরূপের পুত্র যক্ষপালের একখানি শিলালিপিতে রাজা শূদ্রক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি শত্রুগণ অরণ্যে বিতাড়িত করিয়া-ছিলেন। এই লিপিতে আরও লিখিত হইয়াছে যে, “শ্রীশূদ্রকঃ (২) স্বয়ম পুত্রয়ং ইন্দ্রকল্লো গোড়েশ্বরেনুপতি তক্ষণ পুজায়াং” [ ইন্দ্রতুল্য গোড়েশ্বর নৃপতি তক্ষণ পুজায় শূদ্রককে সম্মানিত করিয়াছিলেন ]।

বিগ্রহপাল (৩য়) ও জাতবর্মার কর্ণের দুই কন্যা যৌবনশ্রী ও বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া যথাক্রমে গোড়-রাজ্য ও বঙ্গরাজ্যের অধিপতি থাকিয়া অল্পমান ১০৭২ খৃঃ উভয়ে পরলোকগমন করেন (মাঃ. পঃ. পত্রিকা, ৫২ ভাগ পৃঃ ১০৬)।

(১) রত্নপালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

# পাষণের ক্ষুধা

( কথাবার্তা )

( ২ )

ক্রীতনৈমিষারণ্যক

[ প্রমা ও প্রেমা দুটি মেয়ে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর ঘরে ফিরছে। পথে এক জীর্ণ পাষণ দেউল ; সেদিকে চেয়ে ]

প্রেমা—সেই যে কালীয় নাগের শত ফণার উপর নাচছে আমার মুরলীমোহনিনী...যার মঞ্জীর হুন্দে বিঘের কুপও হ'ল অমৃতের কুণ্ড...মৃতেরও হ'ল তাতে সঞ্জীবন... সে নুপুর কী ধুন সে মুরলী কী ধুন যেই স্তনল...যে ধুনে যমুনা বয় উজ্জান পাষণও যায় গলে...শৈলান বিজ্রাবয়ন...

প্রমা—তার কাছে তো সাপেরও সম্মোহন, বিঘেরও অমৃতায়ন ! কিন্তু কালসাপ তো প্রায়ই অমন ক'রে ক্ষণা তুলে ফোস ফোস ক'রে গর্জে তাড়া করে না...নোটিশ দিয়ে আসে না, আধারে অক্রান্তা এসে ভেতরে যে পেশী-লালস ক্ষুধিত পাষণ, তার ফাটলে লুকিয়ে থাকে...কিছু জানতে বুঝতে দেয় না যে...বুকের ভেতর কালসাপের বাসা নিয়ে ঘর করছি...মনে করছি হয়তো—ঐ যে ভাল লাগা সাধী, ওর সাধে আমার প্রায় সাধারণ মেলা-মেশাই...বেশী কিছু মনে হ'লে নিজেই মাথা নাড়ি, কেউ তা বলে রাগও করি...আমার ভেতর অভিমান বলে—বারে বাঃ, আমি কি এতই হীনকো ! নিজে সমুখে চলতে পারব না ! তুলে যাই—এসবই 'ওপর মনের হুঁসিয়ারী আর সাফাই...ভেতরে যেখানটায় গভীর ফাটল, দেখানে খোঁচা মেরে, টর্চ ফেলে দেখতে যাবে কে বলত'। ওপর মনটা আসল গোটা মনের কতটুকু...তার হিসেবই বা নেয় কে ! ওপরে যখন খাসা দিল্লীগী নাচগানের জলসা চগছে, ভেতরে তখন হয়ত' জুর নিয়তি গোপন 'বঘের' ফিউজে আগুন ধরাচ্ছে ! এই ওপর আর তলার গর-মিলেই তো জীবনের যত ট্রাজেডি ! অনেক কথা বল্লাম প্রেমা ; তোমার নিজের জন্তে নয়তো ...

প্রেমা—সেই যে 'ফেব্রার পথে'-র কটা লাইন মনে পড়ছে তোমার কথা শুনে...

'ওখানে কি করছ' তুমি বল ত' ?

'কৈচো খুঁড়ছি - মাছ মারবো...

'কৈচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরোয়...

'তখন দেখা যাবে'...

হায়রে চিরদিনের অভাগা যত কৈচো খোঁড়ার দল ! চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে কৈচোই খুঁড়ে চলে... গর্ভের সাপ ফোস ক'রে একবারে বুকটায় ছোবল না মারা পর্যন্ত কিছুতেই কিছু বিশ্বাস করবে না !

প্রমা—রূপসীর রাশী ক্লিপেট্রার বৃকে যেমনধারা ভাইপারের ছোবল ।

প্রেমা—ক্লিপেট্রা তো তোমার চোখে সাতপুরু কাপড় বাঁধা কৈচো খোঁড়ার দলে না ; সে সাপ নিয়েই খেলা ক'রেছে, সাপকে সে তার সম্মোহন দৃষ্টিতে কত না যাহুও ক'রেছে...

প্রমা—তা ক'রেছে, কিন্তু সাপের রোজা মরবে সাপের হাতেই এমনি বিশ্ববিধান ! যে কেউ মারাত্মক বিঘের জালা ঘোবনের রঙ্গীন মদির-পাত্রে রূপের শিখায় ছড়াতে যাবে, সে শিখা কোন্ ফাঁকে পার্টে গিয়ে তাকেই ক'রবে নিঃশেষ দহন ! নীল সরিতের স্নমন অপরূপ হেম-কমলিনী আপন বিঘেই নীল হ'য়ে স্নেহহীন অতল নীলিমায় মিলিয়ে গেল, ফুয়িয়ে গেল, তাই !

রূপের উপাসনা, যে সুন্দর পরম অপরূপ, তার উপাসনা ! সে উপাসনা যদি পেশী কামনায় নামিয়ে আনে, তবে ? ঘাসের আড়ালে ঐ যে সরম-গুপ্তিত, পরশ-কুপ্তিত ফুলবেরু, আর মুক্ত আকাশের ঐ যে জল-জল তারা বীথিকা...বিচিত্র বর্ণালি নাম-নেই ঐ ক্ষুদ্রে পাখীটার এক টুকরো মিষ্টি মিনতির গান, আর বিপুল সাগরের তটে অবিরাম মৌনোদাস্ত মহাসঙ্গীত...বিশ্বমন্দিরে বিশ্বনাথের দিনধামিনী অনির্বাণ ঐ দীপালী, আর আমার নিরালা ঘরের কোণে একটুখানি শুচিস্ত্র প্রভাত আলোকের মুহূ



চকিত চাহনি...শাওন নিশীথে বিশ্ববাউলের মাদলের  
তালে বর্ষারাগীর নৃপূরের রিমিরিমি নর্তন, আর আমার  
অস্তব নিকুৎসেই প্রতিটি ফুটি-ফুটিভাবের কোরকে তার  
দরদী বেদনাপুলক শিহরণ...এসবই যে সেই অপরূপ অরূপ  
অনন্দের—আপন স্বরে-ছন্দেই ঘাটে ঘাটে বাঁধা...‘ইন্  
টিউন্ উইথ্ দি, ও মাষ্টার। তু ষ্টারি ক্রিয়েশন্ ইজ্ বাই  
ওন্ লাগার, মাষ্টার। ইন্ টিউন্ ইয়ন্ নেমলেস্ ফ্লাওয়ার  
ইন্ মিক্লেস্ থ্রি ল্ন্স’...মনে আসে ?

প্রেমা—বাঁধা যতক্ষণ রয়েছে তার স্বরে ছন্দে ততক্ষণ  
মরতেব কোন বিষম বাধাই হবে না সত্যিকার বাধা...  
বীণার পাকা তার ছিঁড়ে গেল, কি পাকিয়ে গেল...  
পরদার ঘাটগুলো নেমে এলিয়ে গেল, কি খসে গেলতো...  
তার হাতে-দেয়া বীণা পড়ল গিয়ে তোমার সেই বেহুৱে  
বেতাল অম্বরটার হাতে...স্বক হ’ল তাতে হালকা চটুল  
যত সব গোলাপী নেশার ছন্দ...পেশীরক্ত চঞ্চল হ’য়ে উঠল  
...প্রেমের শাস্ত ও শুভ্র আরতি হ’ল, কামনার চোখ  
বল্‌দান’ রঙ্গীন রকমামি ফুলঝুরি!...আচ্ছা প্রমা, শুনে  
হাসবে নাতো! তোমার ঐ ক্ষুধিত পাষাণের ফাটল যদি  
ভরাট কবে দিই, কি তাতে যদি কার্কলিক ছিটিয়ে দিই,  
তবে সাপ আর থাকবে নাতো ?

প্রমা—পাগল! ফাটল কি একটা? বাইরে দেখছ  
একটা, ভেতরে গভীরে, সাব্ কন্সাসে, ওর নানান দিকে  
নানান ডাল ফাঙরা। শুধু দাবিয়ে রিপ্রেসন্-এ ও-চোরা  
সাপটা তাড়ান যাবে না, তলায় তলায় জোর ধরবে,  
বংশ ও বাড়বে যেগুলোকে সাইকোলজিতে বলে যত সব  
‘এবনরম্যাল কমপ্লেক্স’। এগুলো বড় বেয়াড়া...সারা  
জীবনটাকে নানান রকমে বিধিয়ে দেয়। ক্ষুধিত ব্রাক্সে  
পাষণ তার বলি খুঁজে নেয় বেশীর ভাগ এইসব  
অস্বাভাবিক নিউরেটিক্ বেচারীদের ভেতর থেকেই...  
শুধুই নিগ্রহে, দাবিয়ে রেখে, এটা থেকে রেহাই মেলে  
না। আর, কার্কলিক ছড়িয়ে দেবার কথা বলছিলে, নয় ?  
ওটাই বা কতক্ষণের জন্তে ? যেমন, বুক একটা বড়  
কাঁটা বিঁধে আছে...যাই সিনেমার, কি বন্ধুর বাড়ী হাসি  
ক্ষুণ্ণিতে সেটা ভুলতে...এক ফোঁটা সুমেব অমৃধ খাইয়ে  
তো ভাদ্রা কসিজের হাড় জোড়া দেয়া যাবে না, প্রেমা!

জমাট মোতাতের পর বুকের পর যেন মৈনাক পাহাড়-  
চাপন’ অবদান!

প্রেমা—চাই সাবলিমেশন কুশল-কল্যাণ ছন্দে...গর্ভের  
সাপ আর সে রইল না, ফণিভূষণের জটায় জড়ানো ফণী  
সে তখন হ’ল। ওর মুখ ফিরিয়ে দিতে। ওর রীত  
স্বভাব বদলে দিতে হবে। যে মেয়েটা ভালবাসত তার  
চপল লাভারকে সে দাগা পেয়ে ভালবাসল শ্রীকৃষ্ণকে,  
যীতুথুটকে, দেশকে...বড় কোন আদর্শ কি সেবাত্রত, উচ্চ  
গ্রামের কুষ্টি, বিজ্ঞান, শিল্পসাধনা...শেষীর ‘ভালবাসা হ’ল  
ঐশী। মরতেব টান হ’ল ডিভাইন। যে ডোবার জলে  
সাপ ঢালত বিষ, সে ডোবা হ’ল মানস সরোবর, যাতে  
বাজহংসী পারিজাত মন্দাব গন্ধ অমরার হাওয়ার স্বচ্ছন্দে  
খেলে বেড়ায়!

প্রেমা—তোমার ঐ ভুতুড়ে পাথরটার ফাটলে সাপ  
কি বিচ্ছু হয়তো লুকিয়ে আছে : তাই তোমার চলার পথে  
পাথরটা হাতছানি দিয়ে যখন তখন ডাকে—‘এস না ভাই,  
ব’স না আমার ধারে...আর যদি চাওতো আঁচলটা পেতে  
চোখ বুজে শুয়েই পড় না কিছুক্ষণ!’ যদি ওর হলুকলার  
ঘাও যাহ্ হ’য়ে, তবে হয়ত’ ঐ ফাটলের পরেই গা এলিয়ে  
শুয়ে পড়লে, আর...একটু পাশ ফিরেছ কি সাপে কাটল,  
কি বিচ্ছুতে...তখন হয় অস্তর ছুঁফটানি সারাক্ষণ, নয়তো  
আঁতে জ্বলম আর সঙ্গে সঙ্গে খতম!

প্রেমা—কোন সন্তকোটা কুঁড়ির সৌরভের টানে  
ব’সেছে এসে একজোড়া পাখা বললতার দোহুল ডালে...  
কি স্বন্দর জোড় বেঁধেছে তারা ছুটিতে। এমন সময় কোন  
দূর কান্তারে কে যেন ডাকল মুহু মঞ্জুল ইঙ্গিতভরা শিশি  
দিয়ে...কত মিনতি মোহাগ তাতে ঢালা...তাই শুনে  
মাধায় কৃষ্ণচূড়া খুঁটিওয়ালা পাখীটা তার সঙ্গিনীকে ফেলে  
গেল আচম্ভা উড়ে...সে রইল একলাটি...কোথাইবা  
যাবে...ছোট্ট সোণালি পশমের মতো ঘাড়টি একবার  
ফিরিয়ে কি দেখল...ভয়েই যে কাঁঠ হেঁপে গেল সে...ডালে  
জড়ানো, কিন্তু দেখতে কী স্বন্দর একটা সাপ তার দিকে  
দৃষ্টি দিয়ে তাকে যাহ্ ক’রে ফেলছে...একুনি তাকে এসে  
ধরবে, গিলে ফেলবে! কি হবে মাগো।

প্রেমা—ক্ষুধিত পাষাণের ঐ আর এক চেহারা!

উপায়? শিবের ললাটেনেত্র থেকে ‘আগুন’—যে আগুনে তিনি মদন ভস্ম ক’রেছিলেন—সেই আগুন চেয়েচিন্তে নিতে পার? আর—তাই দিয়ে ঐ ফাটল পাষণটার বুকে মল্লীবীধিকার সেই হবনটা ক্রুরতে পার? তা হ’লে ফাটলে যে! যেখানে আছে, সব পুড়বে, না তো পালাবে, ...আর সেই হোমের আগুন জ্বালিয়ে দাও না তোমার ঐ সাপ-জড়ানো মারালতাটার গোড়ায়...সাপটা নিজেই যাবে পুড়ে—যাহ-ভাঙ্গা পাখীটাও স্বচ্ছন্দে মুক্ত উদার আশ্রমানে যাবে উড়ে, মুক্তি স্বস্তি অভয় আনন্দের একটা কাকলি, কলসনের মতো।

প্রমা—কথাগুলো তো বেশ কবির ভাষায় রূপক ক’রে বলা হচ্ছে, কিন্তু সত্যিই জীবনের সব কিছুর গোড়ায় ঐ হোমের আগুন জ্বলাই তো চাই...ঋতু আর্দ্রার অব্ ডিভাইন্‌ এস্পিরেশন্‌! যে ডিভাইনকে ধারণায় আঙ্গণ পায় না, তারও ঐরকম একটা আগুন কিন্তু চাই—চণ্ডী-দাসের সেই যেমন...‘মাহুষ সবার বড়, মাহুষের বড় আর নাই।’ তবে, ইয়া, মাহুষ ‘মানুস’, পশু তো নয়। মাহুষের ভেতরেই ভগবান...সেই ‘ঘট ঘটমে রাম’। যে সত্যিকার মাহুষ, তাতে নৈমিষারণ্য আর মন্ডোতে মাথা ঠোকাঠুকি নেই, বৃকে বৃকে মিতালী। সে দেখে ছুটিতেই এক পরম ভরসার ঠাই...চলারই জীবন-মরণ শপথ সহপাছ...

প্রমা—রাক্ষসেওতো যজ্ঞ পণ্ড ক’রতে আসে।

প্রমা—আসে, কিন্তু ঐ আগের তিন গণ্ডী টেনে ব’সতে হবে...যে ভগবানকে ভেতর দিয়ে এখনও বুঝতে পারেনি, তারও চাই তিনটে গণ্ডী...যেমন ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সত্যং শরণং গচ্ছামি’; কিংবা, যেটি সত্য তাকে লঙ্ঘন ক’রব না, যেটি স্মরণ তাকেই ভালবাসব, যেটি শিব তাকেই চাইব...

প্রমা—কিংবা প্রাচীন ঋষি যেমনধারা চেয়েছিলেন—‘অসত্য থেকে সত্যে লও আমার, তম থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃততে...এ তিন গণ্ডী যেভাবেই ভেতরে টান...এ গোড়াকার সঙ্কল্প, শপথটা না নিলে তো আত্মপর সকাইকার শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন যজ্ঞের বেদী কোথাও সত্যিকার

রচা হবে না, যাতে অগ্নি বিশ্বমঙ্গল পূর্ণাহতি এবং পুণ্যারতির তরেই জ্বলতে থাকবে শাস্ত...

প্রমা—তাতেতো সংশয় নেই, প্রমা! তবু তো মরতের যত না যাগ, তাতে পূর্ণাহতি সমাপনের আগেই, ক্ষুধিত পাষণ তাতে ক’রতে চায় কামনাকলুষ রক্ত বৃষ্টি... মঙ্গলারতির দীপ জলবার আগেই পড়ে সেখানে রাক্ষসের পাপ-পঙ্কিল বিকট ছায়া...মঙ্গল শব্দটি বাজবার আগেই শোনা যায় কোন্‌ কপট সর্বনাশা কুচক্রীর নেপথ্যে বিকট ব্যঙ্গহাস্ত। মায়ের আমার বোধন হতে না হতেই কে হানা দিয়ে ভাদ্রে মায়ের মঙ্গল ঘট।

প্রমা—ই্যা...সেই যে ‘ধেয়ান কমলে বসি আমি পূজারিণী...ধ্যান শতদল হ’ল শত আততায়ী ফণী!’

প্রমা—তার উপায়। ধ্যানশতদলের মাঝখানেও পেশীভুজগীর অতৃপ্ত ক্ষুধা, তার জিঘাংসা...সেখানেও সে বলতে ছাড়বে না—‘মায় ভুখা ছ’...

প্রমা—সবুট তো ওখানেই! ওখানে নিজেকে বেশ জড়ো ক’রে, সোজা শক্ত ক’রে গুটিয়ে-সুটিয়ে নিয়ে বসতে হবে... নিজের হোমের আগুন ছটকে এসে নিজেরই আলু-খালু অগোছাল’ শাড়ীধানায়, উতল উড়ন্ত ওড়নাটায় লাগলে তো তাতেই দম্ভে মরব যে! হোমের আগুন তো অসামাল, ছটকে পড়তে দিতে নেই—সে আগুন নিয়ে খেলার মরজির মেজাজের খেলাও খেলতে নেই...সে আগুন ওপরের দিকেই শিখা মেলবে...স্বর্গের ছুয়ারে মরতের আকৃতি সে বয়ে নিয়ে যাবে...তার হবন গন্ধে স্বর্গের শুচিতাই সে মর্ন্তের মাটি-বাতাসে ছড়িয়ে দেবে...

প্রমা—ঠিক। এ পাষণটা তবু ওর কথা আমার বার বার না ভাবিয়ে ছাড়বে না...‘পাষণে দৈশান’—এ কথা সকাই বিশ্বাস না করলেও আমি করি...তবু আমাদের কাছে কোন্‌টা দেবতা কোন্‌টা রাক্ষস, এমন হয় কেন? আমার ভেতরে অহরূপ সাড়া দেবার একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে...আমার মধ্যে ‘পরশমাবিক’ জোগাড়টা হ’লে সবই ঝাঁটি সোণা, খাদ গলুতি কিছুতেই নেই, এও ঠিক...তবু পাষণে বা সবকিছুতেই, তার নিজের এক ভাব, এক একটা ভূমিকাও আছে, নয় কি? সে ভূমিকা আমিই যে তাতে চাপিয়ে দিচ্ছি; এমন না,

তাতেই স্বগত দেয়া আছে... অর্থাৎ, পিউরলি নাবজেক্টিভ নয়, অবজেক্টিভও...

প্রেমা—তাতে ঠিকই। পাথরটা বৈজ্ঞানিকের কাছে একরকম। পাথর দেখে বৈজ্ঞানিক বলতে পারবে, তলায় কয়লা না সোনা, আগ্নেয় গিবি বা ভুকম্পের কেন্দ্র, না আর কিছু... ওখানে কোন দিন গ্লোশিয়ার ছিল, না সাগর... এই সব। কিন্তু পাথরটার একটা সাইকোলজি থাকেও আশ্চর্য্য নয়। হয়তো আছেও... পাথরের রেগু-গুলোরও স্বতি আছে, তারা কিছু ভোলেনা... গ্রামোফোনের রেকর্ড যেমন, তেমনি পাথরটার কত ঘটনা, কত কাহিনী, কত ইতিহাস গোপনে ঝাঁক রয়েছে; সেগুলো মোছবারও নয়... সেইটে পাথরের প্রারম্ভ—

প্রেমা—সেই প্রারম্ভই তাকে দেয় দেবতার ভূমিকা, নয় তো রাক্ষসের... যাতে যে ভাব নিয়ে সজ্জ করি, তাতে সেই ভাবের ছাপটা বসে যায় সজ্জ আর নেই হয়ত? তবু ছাপটা অচিন্তিতভাবে তাতে রয়েই যায়... কাজেই তার—ফাটলের তলে সে যেমন জুর সাপ লুকিয়ে রাখতে পারে, তেননি আবার দেবতার হোমের পূতগন্ধি বিভূতিও। শয়তান তার তলে বিষয়ের কোঁটো লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা দেবতা রেখেছেন তাঁর নির্মালা, চরণামৃতের পঞ্চপাত্র।

প্রেমা—বহুদিনের সজ্জ কিংবা অল্প সময়ের গাঢ় সজ্জও ছাপ রেখে যায়... দেবতার সজ্জ কি ডেভিলের সজ্জ? তবে কি জ্ঞান? ইলেকট্রিসিটি তো আছে সর্বত্র, কিন্তু সব জায়গাতে শক্ত মাঝে না? যখন তখন তো মাথায় বাজও পড়েনা... গাছপালা মাটি পাথরের ঐ যে সাইকোলজি, ওটা উগ্র হয়ে অস্বাভাবিক আকারে, প্রায়ই থাকেনা, তাই রক্ষে! তাই ওদের সঙ্গে আমাদের সজ্জ হয় প্রায়ক্ষেত্রে মামুলি, আটপোরে... কবির, ঋষির, ভক্তের, ভাবুকের অন্তরকম...

প্রেমা—সেটাতো মিষ্টিক। ধর, আমি ঐ পাথরটা দেখে ভয় পাই...

প্রেমা—পাথরটাতে হয়ত ভয় দেখাবার সত্যি সত্যি কোন প্রারম্ভ আছে; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা... তোমার ভেতরে ও-থেকে ভয় পাবারও একটা অজানা প্রস্তুতি আছে। সেটাও প্রারম্ভ। যদি পাথরটাকে এড়াতেই না পার, তবে সেটাকে শোধরাও... যেমন, তাতে দেবতার যজ্ঞ কর, তাকে রাম নাম শোনাও... স্তম্ভ সংস্কার

দিয়ে তার অন্তঃস্থ সংস্কার কর দূর। তাতেও কিন্তু তোমার আপন আন্তর শুদ্ধি ভাবের যোগানটা চাই-ই... আপন আচ্ছাতো সব আচ্ছা... তাই বাহির নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে আপন নিরালা ঘরের কোণটাতেই বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়... পাষাণের ফাটলের সাপ কখন লুকিয়ে এসে তোমার ঘরের কোণের গর্তেই না ঢুকে বসে... বিপদ যা, তা তো ঘরেই... বাইরের ভয় ঘর পর্যন্ত তাড়া না করে, সেইটেই শুধু দেখতে হয়।

প্রেমা—‘ঘর’ মানে মনের অন্তঃপুর। সেই চিন্তামণির নাচ ছয়ার। সেখানটাতো আর কেউ দেখতে পায়না, নিজেই দেখতে হয়... ভয়, অভিমান, রাগ, লালসা... এসব নিজের ভেতরটা সত্য করে দেখতে দেয়ওনা... এদের আড়ালে তাঁর চরণধোয়া জলে চোখতুটে ধুয়ে নিয়ে তাঁর মঙ্গলারতির দীপে চেয়ে দেখতে হয়, চিনতে হয় আপনাকে... বলতে হয়... ‘হে আমার সত্য শিব স্তম্ভর দেবতা! তুমি যে কোন্ গোপনে লুকিয়ে রয়েছ এতদিন! নাও দেখি আমার তোমার আপন করে জালা ঐ দৃষ্টিদীপ... সেই যে গান ‘আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো...’ এ গৃহদীপ জ্বালাতে গিয়ে আগে আমার এই ‘আমি’-টাকেও পাকানো শল্যের মতন প্রাণের হবিত্তে জ্বলতে দিতে হয়... যেমন আবারও গানে—‘নিষ্ঠুর এই করেছ ভালো... এম্মি করে প্রাণে আমার তীব্রদহন জ্বালো... আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ কিছুই নাহি চালে... আমার এ দীপ না জ্বললে দেয়না কোনই আলো...’

প্রেমা—শ্রীমতীর মত জটিল কুটিল ঘর। এদের আড়াল করে যাই কি করে বলত সেই ময়ূরমিথুনের ললিতলাস্রমুখর সত্যকদমফোটা নিরালানকিঞ্জবনে... ‘নীলাশ্বরী শাড়ী পরি নীলঘমুনায় কে যায় কে যায়... যেমন জলে চলে স্থলকমলিনী, ভ্রমর নৃপুং হ’য়ে ধায় পায় পায়।’

প্রেমা—ঘরের কাজ হাতে করছ, কিন্তু শুধুই শুনছ তো মনমাঝ—

প্রেমা—না, মনমাঝ?

প্রেমা—সেই মন মনমাঝ যতক্ষণ পুরো মেলাতে না পারছ, ততক্ষণই জটিল কুটিলার ডর... কিন্তু, প্রেমা, আমরা পাষাণের সাইকোলজি ধরে কোথা এসে পড়লাম... এখানে যে সকল কথাই বলে—‘আমরা স্কুরিয়ে এলুম, আর, বায়না ধরোনা’।



## পক্ষীতীর্থ

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক

আবহমানকাল হইতে দুইটা পক্ষীরূপধারী শাপগ্রস্ত দেবতা বা মুনি প্রত্যহ একই সময় পৰ্ব্বতশিখরের এক মন্দিরে আসিয়া আহার করিয়া যান। ইহাদের দর্শনের জন্ত ভারতের সর্বস্থান হইতে বহু পুণ্যার্থী বারমাসই আসিয়া থাকেন। ১৩৬৬ সালে পূজার পর কুতুবাবুর স্পেশাল ট্রেনে ভারত প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া পক্ষীতীর্থ দর্শনের জন্ত মাদ্রাজ সহর হইতে ৩৫ মাইল দূরে চিঙ্গিলপুট ষ্টেশনে আসিলাম। চিঙ্গিলপুট পৰ্ব্বতবেষ্টিত একটি উপত্যকার মধ্যে ছোট সহর এবং সহরের মধ্যে বহু দেবদেবীর মন্দির রহিয়াছে। চিঙ্গিলপুট হইতে পক্ষীতীর্থ নয় মাইল দূরে এবং তথা হইতে আঠার মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতটে মহাবলীপুরম্। পূর্বে হইতে চিঙ্গিলপুট ষ্টেশনে পক্ষীতীর্থ হইয়া মহাবলীপুরম্ যাতায়াতের মোটর ঠিক করা ছিল। আমরা সকাল নয়টায় চিঙ্গিলপুট হইতে যাত্রা করিয়া বন ও পাহাড়ের গাভের রাস্তা দিয়া এক ঘণ্টায় পক্ষীতীর্থের পৰ্ব্বতের পাদদেশে পৌছিলাম।

পক্ষীতীর্থের পৰ্ব্বতের নাম ত্রিকুণ্ডলাকুণ্ডম্ অর্থাৎ পবিত্র পক্ষীদের পৰ্ব্বত। পৰ্ব্বতের পাদদেশে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রাচীন দেবদেবীর মন্দির, একটি ধর্মশালা ও কয়েকটি দোকান রহিয়াছে। পৰ্ব্বতোপরি উঠিবার জন্ত এইস্থানে ডুলি পাওয়া যায়। এক একজনের উঠানামার জন্ত পাঁচ টাকা করিয়া পারিশ্রমিক লাগে। উপরে উঠিবার জন্ত পৰ্ব্বতগাত্রে পাথর কাটিয়া ৫৩৮টা ধাপ করা রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের চাতাল ও দুইটা ফটকও দেখিলাম। কষ্ট করিয়া পদব্রজেই উপরে উঠিলাম। পৰ্ব্বতশিখরে একটি বড় চাতাল এবং পাশে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রহিয়াছে। প্রধান মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীমাতা ত্রিপুরাসুন্দরী এবং পাশের মন্দিরের মধ্যে হরপার্বতী, গণেশ প্রভৃতি কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি বিরাজমান। উচ্চ মন্দিরগুলির অল্প নিম্ন চাতালে একটি বড় টানের আচ্ছাদিত স্থান রহিয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ, চতুর্দিকে পৰ্ব্বতমালা এবং পৰ্ব্বতগাত্রের বনরাজির মধ্যে

দিয়া কয়েকটি ঝরণা উপর হইতে কলকলনাদে নীচে নামিয়া যাইতেছে।

আমরা প্রায় একশতজন তীর্থযাত্রী এই চাতালে নিস্তর্র ভাবে বসিয়া রহিলাম। বেলা এগারটার সময় এক পূজারি ব্রাহ্মণ একটি পিতলের ঘটিতে খিচুড়ি বা পায়সের মত ভোগ লইয়া আসিয়া আমাদের সম্মুখে একটি আসনে বসিলেন। আমরা সকলেই আকাশের চতুর্দিক দেখিতেছি। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় প্রথমে একটি খেতকায় কাকাতুয়া বা শকুনীর মত বড় পাখী আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া আসিয়া উক্ত পূজারি ঠাকুরের সম্মুখে পোবা পাখীর জায় বসিল এবং তিনি একটি পিতলের বাটীতে উক্ত ঘটিতে রক্ষিত প্রসাদ ঢালিয়া দিতে উক্ত পক্ষী মিনিট তিনচার মধ্যে আহার করিয়া উড়িয়া গেল। ইহার কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার আর একটি উক্তরূপ পক্ষী আসিয়া বসিয়া অল্প প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইল। উক্ত ভোগের অবশিষ্ট প্রসাদ যাত্রীদিগের মধ্য বিতরণ করিয়া প্রশামীও বেশ সংগ্রহ হইল।

বহু প্রাচীনকাল হইতে বারমাস প্রতিদিন ঠিক বেলা এগারটা হইতে বারটার মধ্যে উক্ত পক্ষীদ্বয় আসিয়া এইস্থানে আহার গ্রহণের বিবরণ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদিতেও উল্লেখ আছে। এই পক্ষীদ্বয় সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। কেহ বলে ইহারা দুই শাপগ্রস্ত দেবতা, আবার কেহ বলে ইহারা দুইজন শাপগ্রস্ত ঋষি। সঠিক বিবরণ কেহ অদ্যাবধি দিতে পারে নাই। উক্ত স্থানের পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে উক্ত পক্ষীদ্বয় কোন শাপগ্রস্ত দেবতা— বারানসীতে বসবাস করে। প্রত্যহ ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া, রামেশ্বরের মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন করিয়া এইস্থানে আহার করিয়া চলিয়া যান। চার যুগ হইতে ইহারা এই সময় প্রত্যহ আসিতেছে। বড়-বাদল-ভূয়োগ কিছুরই বাধা ইহাদের গতিরোধ করিতে পারে না। দক্ষিণাত্যের পথে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া অধিকাংশ তীর্থযাত্রী এই স্রুর পৰ্ব্বতোপরি উঠিয়া এই পক্ষীদ্বয়ের

আহার দর্শন করিয়া হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস মতে পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন।

পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এই স্থানকে দক্ষিণ-কৈলাস বলে এবং দেবগিরি নামক পর্বতমালার মধ্যে উর্দ্ধপাহাড়ের উপর এটি বহু প্রাচীন তীর্থস্থান। সপ্তম

শতাব্দীতে পল্লব বংশের রাজত্বকালে রাজা মহেন্দ্র-পল্লব এই শ্রীকৃষ্ণপুরাণস্থলী ও হরপার্বতীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

পক্ষীঘর চলিয়া বাইলে প্রায় বারোটার সময় আমরা দর্শনার্থীরাও রওনা হইলাম।



## ‘মিস’ ও ‘মা’

শ্রীমানিক সরকার

সেদিনকার মত মিস্ ইলা চ্যাটার্জীর অমন বিষয়, করুণ চেহারা আর দেখিনি। রুজ-লিপষ্টিক প্রসাধনচর্চিত ঝকঝকে মুখখানার কাল-বৈশাখীবিষবস্ত্র গাছগাছালীর করুণ ছন্নছাড়া চেহারার মত। মাত্র বছর পঁচিশেক হবে, কিন্তু এরই মধ্যে ভাটাঁপড়া ঘোবনের অবস্থিত ক্লাস্তি প্রসাধন আবরণ ছাপিয়ে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। তার চোখেমুখে সেদিনই প্রথম মনে হয়েছিল, ইলা চ্যাটার্জী প্রসাধনের চটক দেখিয়ে যতই নিজেকে সুখী বলে প্রচার করুক, শুভা তার অতৃপ্ত, বিতৃপ্তিত, বুভুক্ষু জীবনের মানি চাপা দেবার বাহ্যিক ছলাকলা।

নৈহাটী, কৃষ্ণনগর, কল্যাণীর রেশুলার দশটা পাঁচটার ডেলী প্যাসেঞ্জাররা সবাই প্রায় চেনে মিস্ ইলাদিকে।

ইলা চ্যাটার্জী টেলিফোন অপারেটর।

ঠিক ন’টা ন-এর গাড়ীতে ব্যারাকপুর থেকে ওঠেন। ফিরবার সময় একটু ম্লান লাগলেও, সকালের দিকে মনেই হয় না যে তার জীবন থেকে পঁচিশটা বসন্ত ঝরে গেছে।

প্রসাধন-চর্চায় ইলা চ্যাটার্জী নিপুণা শিল্পী। কবরী প্রসাধনের বৈচিত্র্যই বা কত। লাল, নীল, বেগুনী, ভায়লেট, হলুদে নিন্ত্য নতুন ইলা চ্যাটার্জী! আজ রক্তাধরা, কাল নীলাধরা। বিশ্বয়কর তার সঙ্গতিবোধ! লাল শাড়ী পরণে কাপের ইমিটেশন মুক্তোর তুল জোড়া থেকে স্লিপারের ঝুইপটি পর্যন্ত এমন ম্যাচ করে পরবেন যা দেখলে স্তম্ভরচিল্লীল লোকেরও তাক লেগে যাবে।

মোট কথা, মিস্ ইলা চ্যাটার্জী এমন একজন মাহলা যার চলা, বলা, হাসা, আদব-কায়দা সবকিছুর মধ্যেই

একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাই বুঝি এত পরিচিতের ভিড় ইলা চ্যাটার্জীর।

ওর গায়ে-পড়া আলাপে নতুন প্যাসেঞ্জারদের কেমন যেন লাগে। অনভ্যস্ত চোখে একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু ঐ রকম মিশ্রকে স্বভাবই ইলা চ্যাটার্জীর। আজ হয়ত আমার সাথে আসর জমালেন, পরের দিন দেখা গেল ক্যানেল সাউথ রোডের সিরামিক ইন্সটিটিউটের কেবানী বিত্ত বাবুজের সাথে কথা বলছেন। এমনি! বিশেষ কারুর প্রতি ঝুঁকতে এ পর্যন্ত দেখেনি কেউ ইলা চ্যাটার্জীকে। যারা জানে তারা তাকে সমীহই করে। অনেকেই মন্তব্য করে, চরিত্রে কালিমা থাকলে সবায়ের সাথে এমন সহজভাবে মিশতে পারে নাকি কেউ? আমারও প্রথম প্রথম মনে হত, এমন পটের বিবি হয়ে চলা মেয়ে কখনো ঘোড়া তুলসীপাতা হ’তে পারে! অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম, না—সেরকম নন কিছু ইলা চ্যাটার্জী।

একদিনের ঘটনা। জনকয়েক কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। তাদেরই একজন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা ইলাদি, আপনি লেডিজ-কম্পার্টমেন্টে চাপেন না কেন?”

একটুও না ভেবে-চিন্তে সহজভাবেই জবাব দেয় মিস চ্যাটার্জী : “ভালা লাগে না বলে।” এই তো ভোমাদেবর মধ্যে এসে বসলে এ-গল্প সে-গল্প করে সময়টা বেশ কেটে যায়। আর মেয়েদের কম্পার্টমেন্টে মুখে ছিপি এঁটে বসে থাকতে হয়। অধিকন্তু লাভ বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বিরক্তিকর চ্যা, ভ্যা। অসহ—হু’মিনিটেই প্রাণ-পালাই-পালাই হয়ে ওঠে।”

কথার আমেজে মনে হ’ল যেন মিস চ্যাটার্জির মনের ভাবখানা—মেয়েদের তার মত আজীবন কুমারী হয়েই কাটানো উচিত। ছেলেমেয়ের মা হওয়াটা যেন নোংরামি।

এহেন ইলা চ্যাটার্জীর বিস্ময়কর পরিবর্তন একদিন চোখে পড়ল। তার গর্ব, অহমিকা, ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস কোথায় নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল।

রাত ন’টা তেইসের গাড়ীতে বাড়ী ফিরছি।

মিস চ্যাটার্জীও ছিলেন ঐ গাড়ীতে। বস্তা-ঠাসাই বোঝাই গাড়ী। এমনিতেই অতিষ্ঠ ভীড়, তার উপর বছর দেড়েকের একটি শিশু একটানা এমন পরিজ্ঞাহি কান্না শুরু করল যা অসহ্য বিরক্তিকর। কোড়ুহলী হয়েই ইলা চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাকে কেমন যেন অন্তমনস্ক।

জিজ্ঞাসা করলাম, এ যে লেডিজ কম্পার্টমেন্টকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখানেও সেই ট্যা-ভ্যা।

—‘যার জন্তে এলাম কান্না এখানেও সেই মাসিপিসি’ : প্রত্যুত্তর করলে মিস চ্যাটার্জি।

শিশুটির মা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সম্ভানকে শাস্ত করতে। আঙ্গুর, বিস্কুট, লজ্জেল—কিছুতেই তার রুচি নেই। তার চাই ছু। মায়ের বুকের ছু।

শিশুর ছোট মুঠিতে ধরা মায়ের বুকের আঁচল। মাতৃস্বস্তি চাই তার। মাও সরাবে না বুকের কাপড়। শিশুও ছাড়বে না। কতইবা বয়েস! এর মধ্যেই মা! ফুটফুটে শিশুর মা! এ বয়সে অনেক মেয়েরা লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে স্কিপিং খেলে। মুখের আদল থেকে কৈশোরের চাপল্যাটুকু এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বড় বড় কাজল-টানা চোখ দু’টি মেয়েটির। যৌবনছোয়া দেহে স্মৃটোমুখ ফুলের লাংগ্য।

জীবননাট্যে মায়ের কৃমিকায় ও-যেন ঠিনিতাস্ত

বেমানান—কৈশোরের খেলাঘরের গুড়ুলের মত। আর এই জন্তই বুঝি এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ।

একেই রাজ্যের লোক গিলছে। তারপরে আবার—ছি-ছি।

ও হবে না। কান্না যত পার।

পাশেই চুপচাপ বসেছিলেন বৌটির স্বশুর। এবারে অসহ্য হয়েই বলতে বাধ্য হলেন, ‘দাও না বৌমা ওদিক ফিরে একটু ছু। কত আর কান্দাবে!’

লজ্জা আর সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে বৌটি স্বশুরের আদেশই মান্ত করলো।

রক্ষা—পাশে ইলাদি বসেছিলেন। আইবুড়ো হোক, মেয়েতো! তাই ওদিকে ঘুরে শিশুটিকে বুকে তুলে নিল বৌটি।

মুহূর্তে যেন বাত্ন মল্ল সর্ব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শিশুটি মায়ের বুকে মিশে রইল—নীরব নিশ্চল।

আশ্চর্য! ইলাদির মুখের চেহারাও যেন এর মধ্যেই কেমন বদলে গেছে। কেমন যেন কমনীয় মুখের ভাব—বিগলিত চিত্ত! ছোট্ট মা-টির দিকে লোভাতুরার মত তাকিয়ে আছে ইলাদি।

মিস্ ইলা চ্যাটার্জী!

চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছিল না।

মুখতো মনেরই দর্পণ। প্রসাধনের নিপুণ প্রলেপে বয়সের রেখা হয়ত চাপা কষ্ট নয়। কিন্তু এ ছবি চাপার প্রসাধন নেই। এ ছবি ফুটবেই। মিস্ ইলা চ্যাটার্জী বুঝিবা কান্দছিলেন। চোখে নয়—মনে। লোকচক্ষুকে এতদিন ফাঁকি দিয়ে এসে সেদিনই বুঝি প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নিজেকে। বুঝতে পেরেছিলেন নিজেকে নিজের ফাঁকি দিয়েছেন এতদিন।

মিস্ ইলা চ্যাটার্জীর ও-কান্না আত্মবঞ্চনার কান্না—পরিতাপ আর আপশোষের গান।

মিস্-এর বুকে মা-এর উন্মেষ বুঝিবা!



## সজ্জগুরুজী

শ্রীসমরসিঞ্চ কর

আজ থেকে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মহাকাশে আবির্ভূত হলেন এক সন্ন্যাসী। জীবন ছিল তাঁর গৃহীর, চেতনায় যোগী এবং ভাবে একজন পরমজ্যোতিষ্মান পুরুষ। জাতীয় জীবনে সে এক তমসাচ্ছন্ন যুগ। একদিকে বিদেশীদের অত্যাচার, আর একদিকে গণজীবনের মধ্যে ভ্রাস্তি। মহুর আশীর্বাদ নিয়ে যে জাতির জীবনের গৌরচন্দ্রিকা, বহু উত্থান-পতনের, বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম-শেষে তার জীবনের শেষ শিখাটি বৃষ্টি নিভে যাবে।

কিন্তু না। অমৃতের পুত্রের সমাপ্তি কখনই সম্ভব নয়। নিমজ্জিত দশা থেকে তাকে উদ্ধার করতেই হবে। সেই শিশুই উত্তরকালে মহামানবিক শক্তি নিয়ে বিকশিত হলেন। জাতির মুখে তুলে ধরলেন অমৃতের পানপাত্র— ইতিহাসে তাঁর আসন : তিনি মতিলাল রায়। আর লোকোত্তর পুরুষ হিসেবে তাঁর পরিচয়—তিনি সজ্জগুরু।

গত ২৪শে জানুয়ারী, কলিকাতার ‘ভারত-সভা হল’-এ সজ্জগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল রায়ের ৮০তম জন্মদিবস উদযাপিত হোল। এই অমৃতধানে পৌরোহিত্য করেন ষাটবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। এই উপলক্ষে সভাকক্ষ আলোকে এবং পুষ্পে সজ্জিত করা হয়। মঞ্চের উপর সজ্জগুরুর তৈলচিত্রটিতে প্রচুরভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। মঞ্চের একপাশে সজ্জগুরুর বাণীর কিছু কিছু অংশ সাদা কাপড়ের ওপর স্বন্দরভাবে লিখে রাখা হয়। বহু ডক্ত, স্ত্রী, প্রতিষ্ঠান এবং সাংবাদিক এই অমৃতধানে যোগ দেন।

অমৃতধানে উদ্বোধন সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম্’ গাইলেন শ্রীঅমলানন্দ ঘোষাল। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী বেদমন্ত্র উল্গান করেন।

সমাগত অতিথিবর্গের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, “গুরুর আবির্ভাব যেখানে হয় সে স্থান তীর্থ”। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “আমি আজ একথাটাই স্বীকার করতে চাই, তাঁর (সজ্জগুরুর) প্রাণের তাপে আমাদের

প্রাণ জ্বেগেছিল, তাঁর প্রেমে আমাদের জীবন প্রশস্ত হয়েছে। তিনি তনু-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন দেশের উদ্দেশ্যে।” সজ্জগুরুর অধ্যায় দিকটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, “সজ্জগুরু শিবময় পুরুষ, এক নতুন সাধনার প্রবর্তক।” বর্তমান সমস্তা-কণ্টকিত জাতির কথা উল্লেখ করে তিনি একথাও বলেন, সজ্জগুরুকে আমরা যেন বিশাল জাতীয় সম্ভার মধ্যে অমৃতভব করতে পারি। জাতীয় জীবনে আজ বড় দুর্দিন। এই দুর্দিনে প্রেম, শুভবুদ্ধি এবং ঐক্য-চেতনা—এই ত্রিবিধ ধারার অমৃতশীলন খুবই প্রয়োজন। সজ্জগুরু ছিলেন বিপ্লবী। সে বিপ্লব মাহুয়ের জড়বস্তুবাদী ধারণাকে দূরীভূত করার বিপ্লব। জড় এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান আজ যদি পাশাপাশি না চলে তাহলে ভারতীয় জাতীয়তা লোপ পাবে।” অতঃপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় সকলের স্তুতচ্ছা কামনা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে বরণ করেন।

প্রধান অতিথি ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মূল সংস্কৃত ভাষায় প্রায় পঁচিশ মিনিট বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, ডঃ চৌধুরী ভারতের রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত ভাষা করার ব্যাপারে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি বলেন, আমরা এসেছি গুরুর অনীতিতম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে ধর্মজীবনের সমন্বয় সাধনের মহাব্রত নিয়ে একদিন গুরুর আবির্ভাব ঘটেছিল। এবিষয়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থবাজি বাঙ্গলা তথা ভারতীয় চিন্তাকাশে এক অভিনব সংযোজন। ডঃ চৌধুরী সংক্ষেপে সজ্জগুরুর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অতি বাল্যকালেই তাঁর জীবন দেশের জন্তে উৎসর্গিত হয়। শিবের মহাবিভূতি নিয়ে তাঁর জন্ম। ঔদার্য এবং চরিত্রবলে সর্বদা মহানায়কের আসন তিনি পেয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর অবদান মহান; আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম-বর্তিকাকে তিনি রেখেছিলেন প্রজ্জ্বলিত।

ডঃ চৌধুরী অবশেষে সম্বৎসর স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আজ গুরুত্ব অসীমতম জন্মদিবসে আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই। আজ আমাদের প্রয়োজন তাঁর আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা। শুধু গুরুত্ব জ্ঞেই গুরু নয়—তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ সমস্ত কিছুকেই অমূল্য করা চাই। ডঃ চৌধুরী সর্বশেষে ভারতের জাতীয় ভাষা যাতে সংস্কৃত হয় তার জন্তে দৃঢ় মত পোষণ করে বলেন, যদি সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে সার্বজনীন ভাবে না গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভাবক্ষেে ভারতের মধ্যে কোন সংহতি স্থাপন করা অসম্ভব। শত-সহস্র বৎসর ধরে যে ভাষা সম্ভাবিত তাকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা উচিত। সম্বৎসরও দৃঢ় অভিমত ছিল এই।

প্রধান অতিথির ভাষণের অন্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, সচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশর শেঠ, খাণ্ড ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গের শুভেচ্ছা লিপি পাঠ করা হয়। পরে প্রবর্তক কন্ঠারা একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ও বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক সম্বৎসর তৈলচিত্রে মালা দান করা হয়।

সম্ভার মহাসভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সম্বৎসর জীবন-দর্শনের বাস্তব দিকটি খুব মনোহর এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর ভাষণ খুব দীর্ঘ না হলেও, উপস্থিত মণ্ডলী তাঁর বক্তৃতা খুবই উপভোগ করেন। সম্বৎসর বৈপ্লবিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, দেশ-সাধনার পবিত্র যজ্ঞে, মাতৃযজ্ঞে অগ্নিময়, উদ্বেজনাযুক্ত মুহূর্তগুলি একদিন জাতিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল, হ'য়েছিল আত্মাহুতি দিতে। রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্তিমূলে গিয়ে অধ্যাত্মমূলে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হয়েছিল, এই পূণ্যলগ্নে সেই কথাটি স্মরণ করা দরকার।

শ্রীদত্ত বলেন, জাতীয়তার পুরোহিত শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁর প্রেরণা। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সম্বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিল নিকটের। কিন্তু যে স্বাধীনতার পেছনে আমাদের আত্মাহুতি, সে স্বাধীনতা সত্যিই আমরা লাভ করতে পেরেছি কিনা, সে কথা একবার ভেবে দেখা দরকার।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু চৌদ্দ বৎসর পরেও বহু গুরুতর সমস্যা আজ তেমনই রয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হোল অর্থনৈতিক সমস্যা। সম্বৎসর এটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জাতিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাবলম্বনের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেন।

সভাপতির বক্তৃতা ছিল সহজ এবং সরল। ডঃ ত্রিগুণা সেন সম্বৎসর জীবনের স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং সচল দিকটিকে অনুকরণ করার জন্তে সকলকে আহ্বান জানান। বিশেষ করে বর্তমান ছাত্রসমাজকে তিনি সম্বৎসর জীবনাদর্শ অনুশীলনে ব্রতী হতে বলেন। তিনি বলেন, জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মুখে হঠ নতুন পথই একমাত্র স্বাধীন ভারতকে উজ্জ্বল সৌভাগ্যে উন্নীত করতে পারে—এ বিশ্বাস সম্বৎসর ছিল। এ বিশ্বাস জাতির পক্ষেও এক মস্ত অনুকরণের সামগ্রী।

“হুগলী জেলার ইতিহাস”—প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সম্বৎসর সমাজকল্যাণমূলক কর্মীবলীর কথা উল্লেখ করে তাঁর শ্রদ্ধা তর্পণ করেন।

শ্রীশীলপ্রসাদ সর্কাধিকারী বার-অ্যাট্ট-ল ‘সম্বৎসর স্মরণে’ শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সূক্ষ্মর শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনা পাঠ করেন। এই লিখিত ভাষণে শ্রীসর্কাধিকারী বলেন :

“মানবতার মান মর্যাদা মহতে মজ্জাগত করাইয়া তাহা মন্বন করাইতে, মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন অনন্তকাল হইতে কত মহামানব। তাঁহাদের আবির্ভাবে মর্ত্যধাম ধন হইয়াছে। পরিভ্রাণের আশায় পুলকিত হইয়াছে। প্রয়োজনানুযায়ী আবির্ভাবের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে মর্ত্যের মাধুর্য বিকশিত হইয়াছে নানারূপে, মর প্রাণে অমর জ্যোতিষ্কটা প্রাণ প্রফুল্লিত করিয়াছে। এমনি এক মহামানবের সন্ধান পাওয়া যায় মতিমান মতিলাল রায়ের আবির্ভাবে।

“দরিদ্রের ঘরে, দরিদ্রের দেশে বিধাতা নিষ্কেপ করেন এই মহারত্ন, দেশের ও দেশের অভাব মোচনের উপায় করাইতে। সন্ন্যাসীদের বিলম্ব হয় না বিধাতার সেই অমূল্য দান খুঁজিয়া বাহির করিতে। পরার্থপরতার ও প্রীতিপরায়ণতার আবেশে অভিভূত হইয়া রত্নটির মন্বন



কার্যে নিযুক্ত তাঁহারা হ'ন প্রাণপণ শক্তিতে। সুখা ও গরল তাহাতে দুই ই উঠিল। সুখা বিতরিত হইল জনে জনে অমরত্ব লাভের জন্য। গরল পান করিলেন মহাদেবের ত্যায় পুণ্যশ্লোক মতিলাল স্বয়ং।

“সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমাদের পুত্র পবিত্র হইবার বাসনা। হে মহামানব আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারই নিয়োজিত ধর্ম পালনে সক্ষম হই। তোমার শিকলিশৃঙ্খলে রাখুক তোমার ভক্তমণ্ডলীকে—বরণীয় অরণীয় তাহারা হউক। নমামি দেবং।”

এই সময়ে সভাপতি জরুরী কাজের জন্য সভা ত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণধনবাবুর প্রস্তাবে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সজ্জগুরু উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমোদক মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে সজ্জগুরু তথা প্রবর্তক সজ্জের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বলেন। সংভাবে আশ্রয় ও সংভাবে ব্যয়—সজ্জগুরুর জীবন-দৃষ্টান্ত থেকে এই শিক্ষাই তিনি সকলকে গ্রহণ করতে বলেন।

প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী সভাপতিত্ব ও সমাগত সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সজ্জগুরুর জীবনের অসামান্যতার দিকটি উদ্ঘাটিত করেন।

সজ্জকল্যাণের সুমিষ্ট কঠোর গুরুবন্দনামূলক প্রার্থনা-সম্বীতের পর উপসনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

## কেম্ব্রিজে একদিন

ডক্টর মতিলাল দাস

কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের দুইটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ ইংলণ্ডের সংস্কৃতিকে গড়েছে—দুইটির মধ্যে অবশ্য অক্সফোর্ড গৌরবে হেরোরাণী, অক্সফোর্ডের হাইস্ট্রিটের মত সুরম্য রাজপথ কেম্ব্রিজে নেই, সেন্ট জাইলেমের মত গির্জা নেই—তার মত ক্যাথিড্রাল নেই,—লোকে নিজেই অকস্মৎ বলতে যতখানি মর্যাদা অসুভব করে, কেম্ব্রিজে পাশ করা ছাত্রের ততখানি সমাদর নেই।

তাহলেও, অধ্যাপক বেলির আমন্ত্রণে কেম্ব্রিজে যাওয়া স্থির করলাম। সোমবার ২০শে ডিসেম্বর সকাল সাতটায় উঠলাম—রায়কৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত কেন্দ্রে গেলাম। ব্রহ্মচারী তারক ডেকেছিলেন। ৮-৩০ মিনিটে তৈরী হয়ে বাত্মার প্রাক্কালে চিঠি পেলাম। অধ্যাপক বেলি লিখেছেন, কলেজগুলি বন্ধ থাকবে, তথাপি আমি গেলে তিনি স্থগী হবেন।

কিংসক্রেস স্টেশনে গিয়ে থার্ডক্লাসে রিটার্ন টিকিট কাটলাম—লাগল ১৬ শিলিং ৪ পেন্স। গাড়ীর নাম Buffet Express. বৃষ্ণ কথাটি ফরাসী ভাষা। তার

অর্থ, যে গাড়ীতে জলযোগ এবং পানীয়ের সুব্যবস্থা আছে। দশটা ৪৫ মিনিট কেম্ব্রিজ স্টেশনে পৌঁছলাম। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আমাদের ১০১নং বাস ধরতে হবে। সেই বাসে করে সহরের মাঝখানে গেলাম। এ স্থানকে এরা city centre বলে। সেখান থেকে মার্কেট স্ট্রিট বেয়ে King's Harade Street ধরলাম—তারপর Queen's Lane বেয়ে Queen's Cottage-এ গেলাম। রাজা বর্চ হেনরী Windsor প্রাসাদের অপর পারে ইটন কলেজ স্থাপন করেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে। হারো আর ইটন ইংল্যান্ডের দুই বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষামন্দির। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কেমব্রিজে Kings College স্থাপন করেন। রাজার কলেজ যখন হ'ল, তখন রাণীর কলেজ চাই। এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে এনড্রু ডকেট নামে একজন শিক্ষোৎসাহী ব্যক্তি রাণী মার্গারেটের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে Queen's College স্থাপন করেন।

রাণীর কলেজ লাল ইটে তৈরী বাড়ী। সেটি পার হয়ে পিছনে বাগানের পাশে ছোট একটা ঘরে থাকেন অধ্যাপক বেলি। আমি যখন পৌঁছলাম, তখন তিনি

ছিলেন না—দরোয়ানটি ভদ্র ও চতুর—ঘর খুলে অধ্যাপকের ওখানে বসতে দিল। টেবিলে নানা ধরণের বই। তার একখানি সম্বন্ধে কাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। লেখক Bhasam. বইটির নাম The Land India That Was. একটু আধটু পড়লাম। বইটি খুবই ভাল লাগল।

অধ্যাপক এলেন—বেশে ও ভূষায় নেই কোনও মোহনত্ব। তবে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি জল জল করছে। মাঝারি বয়স, বিষে করেননি—শাস্ত্রকেই করেছেন জীবনের প্রিয়তমা। তিনি ভাষাবিদ—বর্তমানে মধ্য এশিয়ার খোঁটারি বর্ণমালা নিয়ে গবেষণা করছেন। আনাড়ি আমাকেও তার কাজের কিছু কিছু শোনালেন ও দেখালেন। দেখালেন রাশিয়ান পণ্ডিতদের বই—জ্ঞানের প্রসারের জন্ত তাদের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়।

এই সব কলেজে ছেলেরা যেখানে থাকে তাকে Dormitory বলে—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে লাগলেন। ক্যাম নদীর উপর অবস্থিত কুইনস কলেজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যচমৎকার—তারপর উদ্ভান ও ভূবীধি সেই স্বভাবজ মাধুর্য্যকে পূর্ণতর করেছে। একটা সূর্য্যঘড়ির পাশে ওদের পুরাতন চ্যাপেল দেখালেন। সেখানে বর্তমানে বস্তুতা দেওয়া হয়। কলেজের পাঠাগার দেখালেন।

তারপর King's College-এ গেলাম। এদের শিক্ষায়তন সংলগ্ন যে উপাসনামন্দির তাকে চ্যাপেল বলে। এই কলেজের চ্যাপেল খুব নাম-করা—তৈরী হতে লেগেছিল ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে থেকে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এর অভ্যন্তর ভাগ খুব সুন্দর। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৮৯ ফুট, আর প্রস্থে ৪০ ফুট এবং উচ্চতায় ৮০ ফুট। মন্দির বিনতিতে উপাসনামন্দির প্রদক্ষিণ করে পাঠাগারে গেলাম।

অধ্যাপক দেখানে পাঁচশত বৎসরের পুরাতন বই দেখালেন। পুরাতনের স্মৃতি মানুষের মনে জাগায় আশা। মানুষ বর্তমানে বাঁচে, তাই অতীত যখন যাহু নিয়ে দেখা দেয় তখন এ বিস্মিত ও পুলকিত হয়—ভবিষ্যতের পানেও এমনই ভাবে সে তাকায়।

তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত Faculty Hall-এ

নিয়ে গেলেন। সহকর্মী অন্যান্য অধ্যাপকেরা এসেছেন। তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নানা আলাপ আলোচনা হ'ল। একজন অধ্যাপক বললেন—“আমাদের ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা আদৌ কমেনি, বরং কিছু বেড়েছে।”

আমি উত্তর দিলাম “কমবে না—বরং বাড়বেই, কারণ স্বাধীন ভারতে স্বযোগ বাড়ছে।”

“রাজনৈতিক বিচ্ছেদ আমাদের হয়েছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক সূত্রীতি দৃঢ়তর হচ্ছে” : অন্ত একজন বললেন “বিচ্ছেদই বা বলছেন কেন, ভারতবর্ষ ত Common wealth-এর অঙ্গীকার।”

সে কথা সত্য। The British Common wealth of nations নামক সংস্থার সক্রিয় সভ্য ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের সহযোগী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান এবং সিংহল। এছাড়া বহু তাঁবেদারী রাষ্ট্র রয়েছে।

আহারে বিলাসের আয়োজন ছিল না—মোটামুটি বেশ ভাল খাওয়া হল। আহার শেষে অধ্যাপকের ঘরে ফিরলাম। অল্প একটু বিশ্রাম করে নিলাম। খানিক পরে এলেন ডক্টর লে—তরুণী অধ্যাপক বেলির নিকট গবেষণা করছেন। রূপলাবণ্যবতী মেয়েটি ইংরেজ নন, সুরোপ থেকে খুব সম্ভব প্রাচীন থেকে এসেছেন, যেমন মিষ্ট কথা তেমন মিষ্ট ব্যবহার।

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন তরুণী কেমব্রিজের দ্রষ্টব্য কিছু কিছু দেখাতে। অধ্যাপকের নিকট বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম প্রায় দুটার সময়। যথেষ্ট ভ্রমণের মাঝে একটা পরমানন্দ আছে, তার উপর সঙ্গী যখন সুস্বপ্না, সুশীলা, বিদূষী মহিলা।

ফিটজ উইলিয়াম মিউজিয়াম কেমব্রিজের পরম গৌরবের প্রতিষ্ঠান—যে বাড়ীতে আছে সেটি স্থপতি বাদেডির তৈরি—তার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেখান দিয়ে উঠবার সময় গোঁথে পড়ে কাঁচ ও চীনা মাটির বাসনপত্র। এক নম্বর গ্যালারিতে কিছু ভাল ভাল ছবি আছে—যেসব শিল্পীরা বৃটিশের নাম রেখেছেন—হগার্থ, বরগুন্স্ গেমনবরো। তাদের স্মরণ সংগ্রহ আছে। দুই নম্বর গ্যালারিও বৃটিশ চিত্রকরদের কৃতিত্ব সম্বন্ধ। তিন নম্বর গ্যালারিতে ভাট ও ফ্রেমিশ ছবি আছে। বিবার্ণ, টার্নার, ভ্যান্ডার হেলষ্ট

প্রভৃতির কতকগুলি অমূল্য ছবি এখানে আছে। চতুর্থ গ্যালারিতে জার্মান ও ফরাসী চিত্রকরদের ছবি অস্ত্রের মাথে মিলেমিশে দেখানো হয়েছে।

এইসব সংগ্রহে রেমব্রাণ্ড, ভ্যানডাইক, গোয়া প্রভৃতির কতকগুলি ছবি বেশ ভাল লাগল।

ডক্টর লে কিন্তু বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—মাস্তুর সংগ্রহের প্রতি। মাস্তুর পাটনার ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি নিজের বাড়ীতে অতি স্বন্দর এক শিল্পশালা গঠন করেন। মরবার আগে উইল করে তিনি তার সংগ্রহটি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী এক ইংরেজ ছহিতাকে দিয়ে যান।

সেই মহিলা আপন স্বার্থের চেয়ে জাতির গৌরবকে শ্রদ্ধা করেন অধিকতর। তাই তার পাণ্ডয়া সব জিনিষই তিনি এই মিউজিয়ামে দান করেছেন। ফিটজ উইলিয়ামের Miniature paintingগুলি নয়নশোভন। আমাদের দেশের নানা পাখীর ছবিগুলি আমার খুবই ভাল লাগছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই শিল্পসম্পদ ভারতেই থাকা উচিত কিনা, আমাদের কর্তাদের এসব বিষয়ে আদৌ অস্বরাগ নেই। তারপর ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে গেলেন।

গ্রান্টা নদীর উপরে কেমব্রিজ—গ্রান্টাব্রিজ কথাটি অপভ্রষ্ট হয়ে কেমব্রিজে পরিণত হয়েছে। কিংবদন্তী ঝুট জম্মের তিনশ বছর আগে ফ্রান্সিষ রাজপুত্র কার্টাবের এখানে একটি বিছাপীঠ স্থাপন করেন। কিন্তু সে গল্পের যুগের ইতিহাস নেই—দ্বাদশ শতাব্দীতেই এখানে বর্তমান বিস্তারিতগুলির সূত্রপাত হয়। তৃতীয় হেনরীর আমলের একটা অস্বশাসনে এর উল্লেখ আছে।

বর্তমানে কেমব্রিজে ১৭টি কলেজ আছে। সেসব কলেজ নাম-করা, কিংস কলেজ, কুইনস্ কলেজ, সেন্ট জন'স, ট্রিনিটি, জেনাস, ফিটারহাউস, ক্লেয়ার, মোডেনেস প্রভৃতি।

ইউনিভার্সিটি হলে গিয়ে আমরা বৈকালিক চা পান করলাম—চা আর কেক—ডক্টর লে পয়সা দিলেন—আমাকে দিতে দিলেন না। চায়ের টেবিলে বসে ডক্টর বললেন : “আমি ভারতবর্ষে যাব—ভারতের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর আকর্ষণ রয়েছে।”

বললাম, “যাবেন—ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি - শতাব্দীর সঞ্চিত তপশ্বা আজও তার আকাশে বাতাসে রয়েছে।”

ডক্টর লে বেশ সংস্কৃত পড়েছেন—তিনি বিষ্ণুপুরাণের কথা বললেন :

“হাঁ ডক্টর দাস, দেবতারা যে পুণ্যভূমিতে জন্মালে যান—সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা সকলেরই থাকা কর্তব্য।”

“আপনার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অস্বকরণীয়, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ নেবভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্ত মোটেই যত্ন নিচ্ছেন না...আমাদের পরিষৎ বেদপ্রচারে ত্রুটি— কিন্তু আমরা কোনই উৎসাহ পাচ্ছি না।”

তরুণীর প্রতিভাদীপ্ত মুখে ফুটল আলোর কমল। তিনি আবেগে বললেন : “নিরাশ হবেন না ডক্টর দাস! আপনারা সত্যই সৌভাগ্যবান—বিধাতা তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা হু'নিয়ীক্ষা উপায়ে সমাধান করেন, আসছে সন্ধ্যা...ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।”

তারপর ডক্টর লে আমাকে নিয়ে ট্রিনিটি কলেজের পাশ দিয়ে অত্যাচ্ছ কতকগুলি কলেজ দেখিয়ে মার্কেট স্ট্রীটে নিয়ে এলেন। হু'পাশে নানা দোকানের সারি—রাস্তায় তখন খুব ভিড়—আমাকে বাসে তুলে দিলেন—তারপর ‘নমস্তে’ বলে বিদায় নিলেন।

আমি বাস থেকে হাত জোড় করে নমস্কার জানালাম। বাস চলল, রক্তরাগ চন্দ্রমা যখন মেঘে ঢাকা পড়ে, তখন দর্শক যেমন দুঃখ অস্বভব করে, ভিড়ের মাঝে যখন ডক্টর লের স্নেহমধুর দীপ্তভাষার মুখখানি হারিয়ে গেল, তখন ততোধিক বেদনা জাগল। ভারতের বাইরে এই ধরপ্রেরণ হু'এক জনের সাক্ষাৎ পেয়েছি—যারা বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থায় জন্মেছেন, তথাপি তাদের হৃদয়ের সুর ভারতের বাঁধাধনিতাই নেচে ওঠে—এদের সহিত সাক্ষাৎ করা পরম সৌভাগ্যই বলে মনে করি।

ষ্টেশনে পৌঁছে খানিক পায়চারি করে বেডল্যাম—গাড়ীর কিছু দেবী ছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে গাড়ী এল। কিংসক্রস থেকে ৪০ মাইল—প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে—পথে পড়ল হিচিন—পুরাতন একটি ছোট নগর—এখানে ল্যাভেগার তৈরি হয়। হ্যাটকিঙ হয়ে গাড়ী এসে থামল Finusbury ষ্টেশনে—সেখানেই নেমে পড়লাম—কারণ Finusbury থেকে মাল্গুয়ে ছিল সন্নিকট।

ফিরলাম আশ্রম-ভবনে। বার বার মনে জাগছিল ডক্টর লের আনন্দপুলকিত স্নিগ্ধ আনন—তার অপূর্ণ ভাষণ—তার রমণীয় আচরণ—মনে জাগছিল তপস্বী বেলির স্নগতীর তপস্কার কথা।

কয়েক ঘণ্টার মধুরস আশ্বাদন—কিন্তু সে ত তুচ্ছ নয়—সেইত শাশ্বত স্মৃতি হয়ে রইবে—এত ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়—মাদকতা আপনাকে নিঃশেষ করে এখানে মদির করে তোলে নি—এখানে পেয়েছি অমৃতের পদ-স্পর্শ—পেয়েছি বৃহৎ মনের পুণ্য সঙ্গ। এই সঙ্গলাভে আমার অন্তর হল পুণ্য, আমার অন্তর হল ধর্ম।

# সম্মাদকায়

মনীষী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত :

বিগত ৮ই পৌষ ( ১৩৬৮ ) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পর-  
লোকগমন করিয়াছেন। পরিণত বয়সে (৮২) তাঁর এই  
লোকান্তর ঘটিলেও, আমরা বাঙালী যে গর্ব করিবার মত  
একজন মনীষী মহাপুরুষ হারাইলাম, ইহা নিঃসন্দেহ।  
ভূপেন্দ্রনাথ কি ছিলেন, তাঁর অবদান কত বিচিত্র, বিপুল ও  
গভীর তা ইতিহাস ও ঐতিহ্য-অবলম্বিত আঙ্কিত উন্নয়মান  
তরুণেরা বা নেতৃস্থানীয় অনেকেই আয়ত্ত না আনিলেও,  
ইহা কখনও অস্বীকৃত বা বিস্মৃত হইবার নয়। যে-দিন এ  
জাতির নিরপেক্ষ ও নিরভিসঙ্ক ইতিহাস লিখিত হইবে,  
সেইদিন সুনিশ্চিত সমুজ্জ্বল দীপ্ত মহিমা ভূপেন্দ্রনাথের  
স্বরূপটি অভিব্যক্ত হইবে। বিনা বিতর্কে বলা চলে যে,  
ডঃ দত্ত বর্তমানের প্রগতিশীলতার প্রথম সক্রিয় প্রবক্তা  
ছিলেন। অষ্ট শতাব্দী পূর্বে সাম্য ও সমাজতান্ত্রিকতার  
সম্ভাবনাকর্তা লইয়াই ভূপেন্দ্রনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর  
বিপ্লব-যুগে অসম্ভবতম অগ্রপুৰোহিতরূপে নিজেকে পরিপূর্ণ-  
ভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মুক্তিসাধনার সমস্ত পর্যায়ই  
সংগ্রামী ও সংগঠনী ভূপেন্দ্রনাথ শুধু ক্রমশঃ ও কারাবরণই  
করেননি, নিজের সর্বস্ব ঢালিয়া সর্বতোভাবে সনিষ্ঠায়  
স্বীয় স্বপ্ন ও আদর্শের রূপায়ন-সচেষ্ট ছিলেন। ডঃ দত্তের  
পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও বহুমুখী, দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী, মন  
ছিল সমাজ-সচেতন, যুক্তি ছিল ক্ষরধার বিশ্লেষণাত্মক এবং  
চিন্তা ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক। বস্তুবাদ ও সমাজ-  
বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি ভারতের ইতিহাসকে  
বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই বস্তুবাদী  
চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে ডঃ দত্ত অস্বীকার্য হইয়া  
থাকিবেন। তাঁর বহু গ্রন্থ ও রচনা, বিশেষ 'ভারতীয়  
'সমাজপদ্ধতি' ( তিন খণ্ড ) ও 'স্বামী বিবেকানন্দ দি  
সোসালিষ্ট' গ্রন্থদ্বয়ই ইহার সম্যক সাক্ষ্য বহন করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর পুঞ্জীভূত পুণ্য ও  
প্রতিভা মুষ্টিমেয় যে কয়টি পরিবারে উচ্ছলিত ও উদ্দীপ্ত

হইয়া বাঙালীকে বিশ্ববরেণ্য করিয়াছে তারই অন্ততম  
স্বমহিমাশ্রু হইতেছে কলিকাতা-সিমলার দত্ত পরিবার।  
নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ  
এই পরিবারেই ঈশ্বর-প্রেরিত সন্তান—তিনজনই চির  
কৌমাৰ্য্য-ব্রতধারী। একই দীপ্ত-প্রতিভা তিনজনের  
মাধ্যমে ত্রি-শ্রোতা হইয়া বিশ্বমানবচিত্ত প্রাবল্য করিয়াছে।  
পুঞ্জীয় মহেন্দ্রনাথ ও বরগীষ ভূপেন্দ্রনাথ উভয়েরই ভাব-  
গলোজী-ধারায় প্রবর্তক পত্রিকার পৃষ্ঠা অভিসিঞ্চিত।  
মহেন্দ্রনাথের 'লগুনে বিবেকানন্দ' ও ভূপেন্দ্রনাথের  
'বাংলার বৈষ্ণব সমাজ-দর্শন' প্রায় একই সময়ে প্রবর্তকে  
ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। প্রবর্তকের সৌভাগ্য-গর্ভে এই  
যে, ভূপেন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা 'উড়িষ্যার অপ্রকাশিত  
বৈষ্ণবিক ইতিহাস' এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই প্রভূত রহিল।  
উহা বিগত বর্ষের 'প্রবর্তকে' চারি কিস্তিতে প্রকাশিত  
হয়। সাম্যবাদী ভূপেন্দ্রনাথ কখনও পদদলিত প্রণাম গ্রহণ  
করেন নাই, প্রণাম করিলেও তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননা  
বলিয়া তিরস্কার করিতেন। আমরা তাই এই বিদেহী  
মহাত্মার উদ্দেশে আমাদের সর্বাত্মকরণের কৃতজ্ঞতা ও  
পরম শ্রদ্ধাই নিবেদন করিতেছি।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন :

এবারের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নানা  
দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ও অস্বীকার্য হইয়া রহিল। বোম্বাই  
নগরীতে সারা বিশ্বের রবীন্দ্র-ভক্তজনের আমন্ত্রণ ও  
সমাগমে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকল্পে যে সম্মেলনের  
সূচনা, তাহারই সমাপ্তি টানা হইল কলিকাতার রবীন্দ্র-  
ভারতী প্রাঙ্গণে—মহর্ষি ভবনে।

গত ২২, ২৩ ও ২৪শে ডিসেম্বর এই সম্মেলন অসুষ্ঠিত  
হয়। সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ ও তাহার শাখাসমূহে  
বাঙালী-সাহিত্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণই  
পুৰোহিত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রধান  
পুৰোহিত ছিলেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।  
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমঙ্গল রেড্ডি সম্মেলনের উদ্বোধন  
করেন। ভারতের সর্ব প্রান্ত হইতে প্রায় তিনশো  
প্রতিনিধিবর্গের সমাগমে সম্মেলন উচ্ছল ও প্রাণোচ্ছাল  
হইয়া উঠিয়াছিল। মূল হইতে শাখা পর্যন্ত প্রায়

সকল পুরোহিতের ভাষণ-মন্তব্যের মধ্যেই মননশীলতা ও বলদীপ্তির যে হীরকচ্যুতি ছিল তাহা জাতির দিগ্‌দর্শনের সহায়ক হইবে।

কথা-সাহিত্য শাখার পুরোহিত প্রধান ও প্রখ্যাত ব্রিটিশলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণে বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র এমনই উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ‘নববর্ষ’-এর ভাষণ ব্যতীত ইদানীন্তনকালে আর কোথাও শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। নিম্নে সেই ভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া আমরা পারিলাম না।

“মানুষের জীবন আর জীবনের রহস্য বড় অদ্ভুত। জীবনের বিচিত্র রসধারার সন্ধান করিতে গিয়ে জীবন-সন্ধানী শিল্পী যখন তা’র গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার বিশ্বয়ের আর সীমা থাকে না। জীবন-দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে তখনই বোধকরি সে জীবন সত্যের অন্তলম্পর্শী গভীরতার মারুখানে চিরজ্যোতিষ্মান এমন একটি আশ্চর্য্য বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করে—ভাষা দিয়ে যার কোনও সীমা টানা যায় না। কী সে অনির্বচনীয় বস্তু? কে তা’র সন্ধান দিতে পারে?

“সন্ধান দিতে পারে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অন্য কোথাও—কোনও জাতি, কোনও মানুষ, যে কথা কোনোদিন বলেনি—বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষের ধূলিশয্যার নগ্নদেহে কোপীনধারী কোন ব্রহ্মতপস্বী নিজের সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করে দুর্বলতম মানুষের সবলতম গৌরবের কথা—দৈববাণীর মত উচ্চারণ করে গেছেন—“বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তম আদিত্য বর্ষম্ তমসঃ পরস্তাৎ।” আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি যিনি জ্যোতির্গর্ভ, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

“পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে অনেক কিছু জানতে হয়। জানতে হয় কেমন করে কোথা থেকে সে খাদ্য আহরণ করবে, জানতে হয় কেমন করে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, জ্ঞান, বিজ্ঞান আয়ত্ত করে জগতের এই জীব-লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলে নিজের পরিচয় দেবে। কিন্তু

এই সমস্ত জীবনকে বহু দূর পশ্চাতে কেল, চিররহস্যাবৃত অন্ধকারের স্বে কোন পরপারে তিমিরাভীত জ্যোতির্গর্ভ মহান পুরুষকে জানবার ব্যাকুল আগ্রহে এই ভারতবর্ষের মানুষই একদিন, রাজশক্তির স্বতীত্ব মাদকতাকে বিসর্জন দিয়েছে, রাজসিংহাসন অবহেলায় পরিত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, ভূখিহীন ভোগকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। আবরণ, আচ্ছাদন, দস্ত, অহংকার, সব কিছু সমার হয়ে গেছে তা’র কাছে।

“এ আমাদের মনের বিলাস নয়, দারিদ্র্য গোপন করবার কৌশল নয়, জীবনকে একটা প্রগতিবিমুখ অপমানাধারী জড়পিণ্ডে পরিণত করবার ইচ্ছিতও নয়। এই আমাদের মনের ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটিতে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, এই তা’র জীবনের আদর্শ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে স্বর্গের প্রতিলিপীর্ষী ইউরোপের মদগর্ভী প্রতাপ, অপরিমিত ঔষধ্য, ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা এবং শিল্পসাহিত্যের অসম্প্রদ অক্ষয় অমুকরণ—আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু অন্তঃকরণকে স্পর্শ করেনি। কাংক্ষা, তিন্ন হাতুতে গড়া এদেশ, ভিন্ন স্বরে বাঁধা আমাদের মন। প্রতাপ এবং ঔষধের প্রতি-যোগিতায় ভবিষ্যতে আমরা যদি কোনোদিন ইউরোপের সমকক্ষ হয়ে উঠি, সমাজ-ব্যবস্থা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণের সার্থক অমুকরণে ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন আমাদের আর ভারতীয় বলে চিনতে নাও পারি, তেমন দিনেও যদি হঠাৎ দেখি, ত্যাগধর্ম্যে দীক্ষিত কোনও সাধক, তা’র সকল চাওয়া সকল পাওয়ার উর্দ্ধে কোন উচ্চ সুরে জীবনের যন্ত্রটি বেঁধে ফেলেছেন, তখন সেই পরধর্ম্যগ্রহণকারী ভারতীয়ের হৃদয়েও তৎক্ষণাত সুরটি প্রতিবন্ধিত হয়ে উঠবে। মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যাবে সেখানে। এমনি একটি বিচিত্র উপাদানে গড়া আমাদের ভারতীয় মানুষের মন।

“এই মানুষের মাঝেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই পরমা-চার্য্য মহাশক্তি—যা’ তাকে ক্রমাগত টানছে তা’র আবশ্যক সীমার বাইরে, যেখানে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দেনা-পাওনার কোন অভাবই তা’র মিটেবে না—সেই সমস্ত অভাববোধকে, পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশকে

অনায়াসে অতিক্রম ক'রে মহুয়াছের সেই পরিপূর্ণতার, আত্মসমর্পণের সেই অত্যাশ্চর্য আনন্দের সঙ্গে মিলিত হ'বার ক্ষমতা যে ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ব্যাকুল, আমি সেই ঐশ্টিক ভারতবর্ষের, সেই চির-রহস্যময় ভারতবর্ষের মানুষের জীবন-ধেমানী শিল্পী। যে পরমাশ্চর্য জ্ঞানের পৌরবে ভারতবর্ষ চিরকাল গর্ভিত, যে জ্ঞান মানুষকে তা'র সমস্ত ভেদবুদ্ধির, তা'র সমস্ত সঙ্কীর্ণতার, তা'র সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির দুর্ভাবনার পরপারে নিয়ে যায় তা'র মনের মুক্তির সে এক সীমাহীন আনন্দের মধ্যে, মানুষের মাঝে মহুয়াছের সেই তেজস্বী জ্ঞানকে—সেই জ্ঞানের অমিত-শক্তিকে স্পর্শ করাই হোক, আমাদের এই ভারতবর্ষের সাহিত্যের মূলমন্ত্র।”

বাঙালী কবি-সাহিত্যিকের মনের মূলে সাহিত্যের এই মূলমন্ত্রের সাধনা ও উন্মেষ যদি ঘটে, তবে অবধারিত আবার বাঙালী নিখিল ভারত তথা বিশ্বের আলোর দিশারী হইবে। এই প্রভাত-সূর্য্যের আলোর আভাস এবারকার সম্মেলনের একাধিক বক্তৃতায় পাইয়া আমরা আশাব্যস্ত হইলাম।

### গোয়া-মুক্তি প্রসঙ্গে :

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, অস্ত্রায়-কারী ও অস্ত্রায়সহকারী উভয়ই ঘৃণ্য। স্বাধীনতা লাভের পর অহিংসার মিথ্যামোহে ভারত রাষ্ট্র সর্বত্র অস্ত্রায় সহ করার বাহাদুর সাক্ষিয়া তামাম দুনিয়ার করতালির তালে-তালে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ‘গোয়া’-মুক্তির নগণ্য সংগ্রামে সেই মাদকতা-ষোর যে তাহার কাটিয়াছে একথা বলা না যাইলেও, তাহাতে ছন্দপতন-জনিত যে একটা সুস্পষ্ট তালভঙ্গ ঘটল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আজিকার হিংসায় উন্নত পৃথিবীতে একক ‘অহিংস’-প্রচারক নবজাত ভারত রাষ্ট্রকে, বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্র বক-ধার্মিক সাক্ষিয়া অহিংসার মাহাত্ম্য-প্রলেপিত উচ্চ-চুড় পাছে তুলিয়া দিয়া মজা দেখিতেছিল ও মজা লুটিতেছিল ; কিন্তু ‘গোয়া’র ব্যাপারে অহিংসার ‘ষ্ট্যাম্প’ মারা ভারত-রাষ্ট্রকর্ষধারণকে গাছ হইতে ভূমিতলে

নামিয়া দাঁড়াইয়া হাতের আস্ত্রিন গুটাইতে দেখিয়া, তাহারা শুধু বিস্মিতই নয়—কথকিত ভীত ও উদ্ভিগ্নও হইয়া পড়িয়াছে।

গোয়া আয়তনে ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহতই হউক—‘গোয়া’ জয় বড় কথা নহে। আপন রাষ্ট্রের সম্মান ও অত্যাচারিত প্রজাবর্গের রক্ষাকল্পে ভারত রাষ্ট্র যে আজ শুধু ‘বুলি’-ই নহে—‘গুলি’-ও ব্যবহার করিয়াছে, ইহাই বড় কথা।

ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, ভারত রাষ্ট্রের উৎপীড়কদের ‘লিষ্ট’ হইতে পর্তুগীজ বোম্বটেদের নাম আজ কাটা যাইলেও—ভারত বিপন্ন নহে। চীন, ভারতের উত্তর সীমান্তের হাজার হাজার মাইল গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে ও এখনও করিতেছে, পাকিস্তানী হানাদারেরা কাশ্মীরের বিস্তৃত ভূভাগ আপন কুক্কিগত করিয়া রাখিয়াছে, আসাম ও পশ্চিম-বঙ্গ সীমান্তে পূর্ব-পাকিস্তানের হামলা ও অকথ্য অত্যাচার লাগিয়াই আছে।

আজ আমাদের স্বাধীনতা-হস্তারক অত্যাচারীদের বলিষ্ঠভাবে জানাইয়া দিতে হইবে, শুধু গোয়াতেই মদে, ভারত-রাষ্ট্রের যেখানেই অত্যাচার হউক না কেন,—এই ‘গোয়া’-মুক্তি নীতি সর্বত্র অমূল্য হইবে ; জানাইয়া দিতে হইবে, আত্মরক্ষা ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা প্রকৃত-অহিংসার পরিপন্থী নহে, পরন্তু পরিপূরক—অহিংসা ক্লেব্য নহে। আসন্ন নির্বাচনের পূর্বাঙ্কে এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীর মুখ কিছুটা ফুটিয়াছেও দেখিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়িতেছে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কথা। অহিংস-অসহযোগের ‘করমলা’ লইয়া গান্ধীজি বাল গন্ধার তিলকের সমর্থন-প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিলক গান্ধীজিকে বলিয়াছিলেন—  
“Instead of relying on the maxim of conquering anger by love, as preached by Bnddha, I prefer to rely on the maxim of Sri-Krishna, “Do unto them what they do unto you.”

‘গোয়া’-র মুক্তি-সাধনে ভারত শ্রীকৃষ্ণের আদর্শই অমূল্য করিয়াছে। অশোক-চক্রের পার্শ্বে স্বদর্শন-

চক্রের আবির্ভাবে আমরা আশাব্যস্ত। ভারত-রাষ্ট্রকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। জয়তু ভারত।

### সংস্কৃতি প্রচারে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় :

বিগত দুই মাসে প্রাচ্যবাণীর 'সংস্কৃত-পালি-নাট্যাভিনয় সঙ্ঘ' ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করিয়া দেশী বিদেশী সহস্র সহস্র লোককে আনন্দিত ও উৎসুক করিয়া বঙ্গদেশের শুধু গৌরব বৃদ্ধি করে নাই, সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারের সহায়ক হইয়াছে।

মাদ্রাজের সত্যগৃহে অধিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা অভিনয় করেন বিগত ২৫শে ডিসেম্বর, পশ্চিমচেরী শ্রীঅরবিন্দাশ্রমের তত্ত্বাবধানে ২৭ ডিসেম্বর এবং ইউনেস্কো-ভারত সরকারের আত্মকূল্যে বৃন্দাবনে অর্গঠিত হয় East West Spiritual Values Symposium-এ ৬ই জানুয়ারী। দেশে ফিরিয়া পুনরায় তাঁহারা হাওড়া রামকৃষ্ণপুর সংসদের তত্ত্বাবধানে বিগত ২৩শে ও ২৪শে তারিখে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেন। বেদান্তচর্চা শ্রীল রামানুজচর্চের জীবনচরিত.

অবলম্বনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক সম্প্রতি বিরচিত "বিমল যতীন্দ্রম" নামক সংস্কৃত নাটক এবং "শক্তি-সারস্বত" নাটক—এই দুইটি জনপ্রিয় নাটক এই সঙ্ঘ অভিনয় করেন।

এই অভিনয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ও সংস্কৃত গানের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার অর্থেই ভারত সংস্কৃতির প্রসার। প্রাচ্য বাণী মন্দিরের এই মৌলিক উদ্দেশ্য এই নাট্যাভিনয়াদির মাধ্যমে আশাতীতভাবে সাকল্য লাভ করিতে দেখিয়া আমরা আশাব্যস্ত। প্রাচ্য বাণী মন্দিরের নাট্য-সঙ্ঘের অভিনয় নৈপুণ্য এবং অতি সহজ সরল প্রাণ-মাতানো সংস্কৃতভাষায় বিষয়বস্তুর ধাপন—ইহাই এই নাট্য সঙ্ঘের জনপ্রিয়তার কারণ। নাটক শুনিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই মন্তব্য করেন, এই যদি সংস্কৃতভাষা হয়, তবে তাহা রাষ্ট্রভাষা হয় না কেন? নিখিল ভারতের সকলেই একরূপ ভাষা বোঝে এবং সামান্য প্রচেষ্টায় এই ভাষার ব্যবহারের জ্ঞান অর্জনও সম্ভবপর। এই নাটকের জনপ্রিয়তা দেখিয়া মনে হয়, সরকারের শুভবুদ্ধি হইলে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই ভারতীয় এক্য সহজেই সংসিদ্ধ হইতে পারিত।

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কারিকাপেপটেল**

৬৬ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লি  
সালকিয়া, হাওড়া।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ শিক্ষায় অনন্তত্ব—৮-৮৭ (তথ্য সংযোজনা সম্পূর্ণ নূতন ও সংবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর. সাহিত্যিকী—২-৫০ L. M. Mitra ॥ The Danes In Bengal—2-50 অধ্যাপক স্বধীরচন্দ্ররায় ॥ বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি—২-৫০ ॥ শিক্ষার ইতিবৃত্ত (স্কুলের ইতিবৃত্ত সিরিজ, পশ্চিম খণ্ড)—৭-০০ Prof. S. Bhattacharjee M.A. ॥ Society & Education—2-50 সত্যনারায়ণ লাহিড়ীর ফ্রেড ও বর্তমান চিন্তাধারা—১, বার্নাড 'শ'—১১০ লালমোহন বিজ্ঞানিধির কাব্য-নির্ঘণ (১০ম সং)—৪, কাব্য-প্রদীপ—১, প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১ নং, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২।



অম্বৈদ ( প্রথম অষ্টক ) ডক্টর মতিলাল দাস । ভারত  
সংস্কৃতি পরিষৎ । আলোকতীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ  
আলিপুর, কলিকাতা-৩৩ । মূল্য ৫ টাকা মাত্র ।

বেদকে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বলা হয় । কিন্তু শাস্ত্রীয় শাসনে শত-  
করা একজনেরও বেদে অধিকারই ছিল না । বেদের গঠন-পাঠন বহু দিন  
হইল লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু বেদবিহিত বিবিধ শাস্ত্রের ধর্মমূলক শাসন,  
নানা লোকাচার, কুলাচার, দেশাচারের মধ্য দিয়া প্রচলিত থাকিয়া হিন্দু  
সমাজকে আজো নিষ্কিন্ধ হইতে দেয় নাই । বেদ পূর্বে মুদ্রিত আকারে  
ছিল না—এখন মুদ্রিত আকারে সকলের অধিগম্য হইয়াছে এবং এখন  
হিন্দুমাজেরই বেদে অধিকার লাভ ঘটয়াছে ।

কিন্তু তৎসম্বন্ধে বেদে কি বস্তু আছে তাহা জানিবার আগ্রহ কাহারও  
নাই । টোলের পণ্ডিতরা নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং করেন  
কিন্তু বেদের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই—আগেও ছিল না গ্রন্থের  
অভাব । বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রিত সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেহ  
কেহ পড়িতে বাধ্য হন । বিজ্ঞ বর্ণের গৃহস্থরা বিবিধ বৈদিক সংস্কারের  
অমুষ্ঠানে বেদের দুই একটি স্মৃতি অর্থবোধনা করিয়া শুক পাণ্ডুর মতো  
উচ্চারণ করিতে বাধ্য হন । কিন্তু তাহারা প্রত্যেক শব্দটি ভুল উচ্চারণ  
করেন, কারণ তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন 'মর' শব্দের রূপটি গর্ভস্থ  
জ্ঞানেন না, অথবা ভুলিয়া গিয়াছেন । আবার বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে কম  
লেখাপড়া জানে যে তাহাকেই নান্দীমুখ করিবার ভার দেওয়া হয় ।

এখনও বিবাহে কুশভিক্ষা দ্বিগু বর্ণের অনেক গৃহে হয়—ইহার পর  
তাহাও আর হইবে না । হিন্দুরা এক বর্ণে পরিণত হইতে চলিল এবং  
সে বর্ণ শূদ্র বর্ণ । আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা হিন্দুদের  
বিনিময়ে । কাজেই ধর্মের জন্য বেদপাঠ করিতে বলা বাতুলতা । নানা  
অনাচার ও স্বর্গ বিষয়ের মধ্য দিয়া একটা ঐতিহাসিক মন কতকগুলি  
শিক্ষিত লোকের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে । এই মন বাহাদের গড়িয়া  
উঠিয়াছে তাহারাও শ্রম স্বীকার করিয়া মূল বেদ পড়িতে উৎসাহিত  
হইবেন বলিয়া মনে হয় না—তবে আমরা যে 'বেদ বেদ' বলিয়া এত  
দোঁহাই দিই সেই বেদে কি আছে জানিবার জন্য তাহাদের কৌতুহল  
হইতে পারে । তাহারা মতিলাল দাস মহাশয়ের অনুদিত বহু স্মৃতিগুলি  
পড়িয়া বেদের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন । অনুবাদগুলি সরল সরল  
ভাষায় রচিত এবং লেখক অনুবাদে ব্যাঘাৎ রক্ষা করিয়াছেন ।  
অনুবাদের সঙ্গে লেখকের যে ব্যাখ্যামূলক পরিচয় আছে তাহা বুঝিবার  
সহায়তার পক্ষে যথেষ্ট । একটা বিরাট জাতির জীবনের ভিত্তিকে কি

উপাধানের দৃঢ়তা ও অসামান্যতা ছিল তাহা জানিবার কৌতুহল যদি  
না থাকে তবে, বুঝিতে হইবে সে জাতি এখনও সম্ভা হয় নাই । মতিলাল  
বেদবাণীকে প্রচারের ভার লইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন ।

—শ্রীকালিদাস রায় ( কবিশেখর )

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু—শ্রীনলিনীমোহন  
মুখোপাধ্যায় । প্রাপ্তিস্থান : প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১,  
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । মূল্য ৫  
টাকা ।

ভারতবর্ষের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যজ্ঞের অন্ততম হোতা, আজন্ম বিপ্লবী,  
মহান নেতা রাসবিহারী বসু কর্তব্যবল জীবনের এক বিশিষ্টাংশই জন-  
সাধারণের নিকট অজ্ঞাত । সে-যুগে চূড়ান্ত ব্রিটিশের স্তন্য দৃষ্টির অন্তরালে  
তাঁহার অজ্ঞাত ও নীরব বিপ্লবী জীবনের অমোঘ সংগঠন শক্তি এবং  
কর্তব্যহিমার বহল অংশই একান্তই প্রথিত করা একান্তই দুঃসাধ্য ।  
আলোচ্য গ্রন্থে ইহারই সন্মিল ও সমস্ত প্রদান লক্ষ্যে পড়ে । এই অবি-  
শ্রমীয় মহাপুরুষের অজ্ঞাত জীবনকাহিনীর উপর আলোচ্য গ্রন্থের লেখক  
আলোকপাত করিয়াছেন । শ্রীমুখোপাধ্যায় রাসবিহারীর একনিষ্ঠ সহকর্মী  
ছিলেন । তাঁহার রচনায় প্রতিটি ছন্দ অক্ষা-পরিশুদ্ধ । গ্রন্থের ভাষা ও  
বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক । প্রামাণ্য বিষয়বস্তু সম্মিলে গ্রন্থকার যথেষ্ট তৎপর  
হইয়াছেন । রাসবিহারীর অনুল অধ্যাপক বিজনবিহারী বসুর "কর্তব্য  
রাসবিহারী" ও বঙ্গমহান 'বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু'—এই দু'খানি  
গ্রন্থ মিলিয়া এই যুগান্তরী মহাপুরুষ সম্বন্ধে একটা প্রামাণ্য ভিত্তি রচিত  
হইয়াছে বলা যায় ।

দয়াল গাথা—মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার বিরচিত ।  
প্রকাশক—দীনবন্ধু ঘোষ । পোঃ মগুরা, ছগলী । ২৬ নং পঃ  
মহাত্মা রামদয়াল মজুমদারের শ্রীমন্তাগবদগীতা বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ও  
সমাদৃত । দয়াল মহারাজের বহু উপদেশও প্রবন্ধাকারে স্থান লাভ  
করিয়াছে । আলোচ্য পুস্তিকাখানি এমনি উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্ত  
সংস্করণ । দাম কম হইলেও পুস্তিকাখানি ভাবসম্পদে অনুল ।

ভারত তীর্থ—অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত ।  
বিচিত্রা, ৬ বক্স চার্টজ্জ ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে  
প্রকাশিত । মূল্য—২ টাকা ।

পন্ন. উপস্থাপ, কবিতা বইয়ের তুলনায় বাংলাভাষায় প্রকাশিত ভ্রমণ  
সাহিত্যে নিতান্ত মগা বলা চলে । অল্প হুলিখিত হইলে পন্ন ও  
উপস্থাপের চেয়ে ইহা কম উপভোগ্য নয় । আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উত্তর  
ও দক্ষিণ ভারতের কয়টা জটিল স্থানের বিষয় ঐতিহাসিক গুরুত্ব,  
কিবদন্তি ও বিভিন্ন ঘটনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সাবলীল ভঙ্গিমা  
প্রকাশ পাইয়াছে । ভারততীর্থ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে সার্থক সাংবাদিক  
একথা বলা চলে । গ্রন্থদ্রব্যণও মনোরম ।

—ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার



# আমেরিকা

## রাষ্ট্রীয় সম্মান :

এ বৎসরে প্রজাতন্ত্র দিবসে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর মুখোমুখিকারী যে কয়জন রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী গম্ভা নাইডু, দেশবিশ্রুত অর্থ-নীতিবিদ ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, দিল্লীর শল্য-চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার সেন, স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী শ্রীভারতীয় বন্যোপাধ্যায় ও জাতীয় বুক ট্রাষ্টের সভাপতি শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গণিজনকে সম্মানিত করা রাষ্ট্রের একটি অবশ্য প্রতীপালনীয় কর্তব্য। সম্মানিত ব্যক্তিগণের অধিকতর সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত।

## আমেরিকায় ভারতীয় লেখিকার পুরস্কার লাভ :

আমেরিকায় 'উইসেন্স ইন্টার ভিশুয়াল লীগ ফর গার্লস এন্ড বয়স্‌' নামে একটি বেসরকারী সংস্থা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের জন্য প্রতি

বৎসর জন অ্যাডম্‌-এর নামে একটি পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। এ বৎসরে 'হোয়াইট দেন রমন' নামক ইয়েরজী পুস্তকের রচয়িত্রী ভারতীয় লেখিকা শালি এল অরোরা উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

## পুস্তক প্রকাশনার পূর্ব জার্মানী :

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রতিবৎসর যে বিপুল সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহা আমাদের অকল্পনীয়। পূর্ব জার্মানীতে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে উপভাস, কবিতা, নাটক, গল্প, চর্চন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ৬,১০০ প্রকারের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসরে পূর্ব জার্মানীতে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মোট সংখ্যা হইতেছে ৯,১৮,০০০ (নয় কোটি আঠারো লক্ষ) কপি।

## একে একে নিভিছে দেউর্তি :

সাম্প্রতিক কালে 'ইণ্ডিয়া ট্রমেরা' পত্রিকার সম্পাদক ও নেতাজীর সহকর্মী ডঃ প্রমোদকুমার ঘোষাল, হিন্দী কবি স্বর্ধাকান্ত ত্রিগাঠি ও কম্যুনিষ্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষাল মুক্তি আন্দোলনে নেতাজীর সহকর্মী ছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়া ট্রমেরা'র জার্মান সম্পাদনা করেন। 'নিরালা' নামে পরিচিত হিন্দী কবি স্বর্ধাকান্ত মেনিনীপুর জেলার মহিষাধলে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-বোধের আদর্শে ও অমুদ্রণে তিনি হিন্দী কবিতার বহু নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেন। চন্দ ও গজ উভয় রচনাতেই হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বশবী ছিলেন। হিন্দী ভাষার তাঁহার রচিত মুদ্রিত-গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৬০ খানি।

মহাত্মাজীর সহকর্মীরূপে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অসহ-যোগ আন্দোলনে এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দেন। কম্যুনিষ্ট দলের উপর তাঁহার প্রভাব ও হস্তাক্ষর বালিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

বাঁহারা ব্যক্তিগত, জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনার স্ব-ব মনোবা ও কর্তৃপক্ষের বিরোধে আপনাপন ক্ষেত্রে জাতির মঙ্গল সাধন করেন, তাঁহাদের বিরোধ শুধু বেদনাদায়কই নহে—জাতির অগ্রগতিও তাহাতে বাধিত হয়। স্ব-ক্ষেত্রে বশবী ও প্রতিষ্ঠিত এই জয়ী অধ্যাত্মদের বিরোধে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

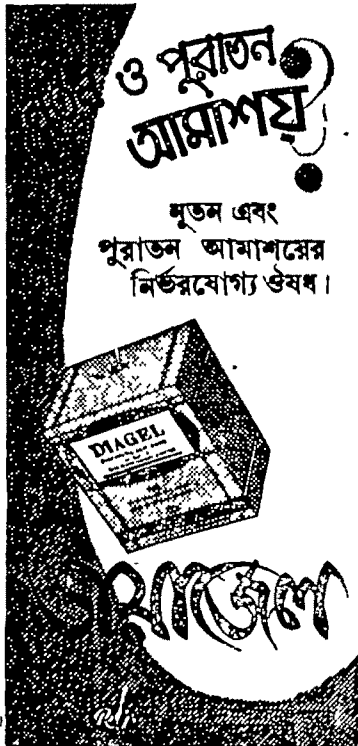
## বিহারে বাঙালী কবির সম্মান :

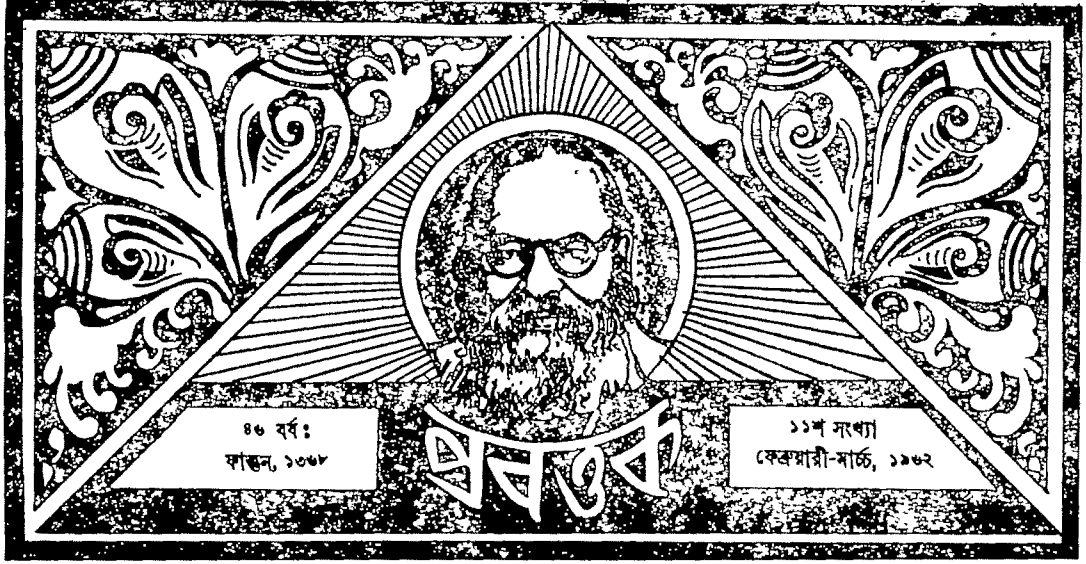
বিগত গৌরবাক্ষরিতে প্রবাসী স্বকবি ও সাহিত্যিক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহোদয়ের ৭৪তম জন্মতিথি তাঁরই ভাগলপুরস্থ শক্তি-কুটীরে সমিতি আবেহাওয়ার মধ্যে স্থানীয় অমুরাঙ্গী-স্বল্পজন কর্তৃক অনাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উপাসনা এবং কবিরই রচিত শক্তিহোত্র ও 'ভারত-জননী' সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। এই দিন পাটনাতেও কবির গুণপ্রাণীকরণ পদ্মশ্রী পত্রিত্রীবিজ্ঞানান্তি বা জ্যোতিবাচার্যের গৌরোহিত্যে অমুগ্ধিত এক বৈঠকে হরেন্দ্রচন্দ্রের জীবন ও সাধনার বিষয় আলোচনা করেন। এই সভায় গীতিত কপিলদেব শর্মা কবির রচিত 'ভারত-জননী' গীতিকবিতা ও তাঁর সঙ্গীতমুখার পাঠ করেন। এই রচনায় মুগ্ধ হইয়া সভাপতি মহাশয় নগর পণ্ডিত টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। চির-প্রবাসী হরেন্দ্রচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা হইলেও, বাঙালীর নিকট তিনি স্বীকৃতি বা সম্মানের লাভ করেন নাই। প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতি অ-বাঙালীর এই অকৃত্রিম অজ্ঞা ও ক্রীতি তাই উদ্‌বেগনীয় ও স্রবণীয়।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিশিণবিহারী গান্ধুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড বাকটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২৩, বিশিণবিহারী গান্ধুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক মুদ্রিত।





## আলোর পথ

শক্তির খেলা কখনও নিষ্ফল হয় না। সমস্ত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া ভগবানের মঙ্গল বিধানই জয়ী হইয়া চলিয়াছে। দৃশ্যমান জগৎ-তরঙ্গের পিছনে অদৃশ্য শক্তির কল্যাণময় হস্ত লক্ষ্য করিয়া যিনি চলিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ব্যর্থতা নাই। শক্তির গতি সকল সময়ে নিরূপণ করা যায় না। ক্রীড়াভঙ্গী বিচিত্র। কোন্ ঘটনা কোন্ পথে, কোন্ লক্ষ্যমুখে ছুটিয়াছে, তাহা অবধারণ করা মানুষের অধিকার বহির্ভূত। আজ যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া ধারণা করিতেছে, কাল তাহারই ভিতর হইতে কি শুভ সূচনা দৃষ্টিগোচর হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

এই অপূর্ব তত্ত্বটুকু উপলব্ধি করিবার জন্তই সাধনা, ভিতরে সিদ্ধ প্রতিভা কুণ্ডলিত। উৎসর্গ মন্ত্রের আঘাতে এই সুপ্ত প্রজ্ঞাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে নব ভাবের চোতনায় হৃদয় ভরিয়া যায়, প্রাণ পুলকোচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠে, বায়ু শরীর পর্যন্ত সেই প্রজ্ঞার আলোকরেখা অনুসরণ করিয়া যন্ত্র-পুস্তলিকার মত ধরাপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করে। এই চরম 'আনন্দযন্ত্র' একদিনেই সুসিদ্ধ হয় না। সাধক ভগবানের বিকাশোপযোগী পূর্ণ সামর্থ্য একদিনেই আয়ত্ত করে না। চাই অসাধারণ ধৃতি, অবিচ্ছেদ্য সঙ্কল্প, অটুট বিশ্বাস—এই সকল তপঃসম্পৎ জীবনে পরিশ্রুত হইলেই বৃষ্টিতে হইবে, মহাশক্তি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। এই সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম গুণগুলি অপূর্ব আলোকে মানব হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া তুলুক। শক্তিসাধনাই হোক মানুষের একমাত্র আশ্রয়। কারণ শক্তি স্বয়ং সাধিকা। ইহাই প্রতিজ্ঞনের মধ্যে ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবে। ইহাই সংসার ও সমাজকে রূপে রসে পুলকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে—ইহাই সত্যের, প্রেমের ও কর্মের মঙ্গল প্রদীপ হস্তে ধারণ করিয়া বিশ্বকে নূতন আলোর সন্ধান দিবে।

[ ১৩২৬-এর প্রবর্তক হইতে সংকলিত ]

সত্ত্বগুণ শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ( প্রথম অষ্টকং । ষট্টিংশং সূক্তং । ) চতুর্থী ঋক্

( সত্যশ্রুত শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অঙ্কসরণে )

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

দেবাসস্বা বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সং দূতং প্রতুমিহতে ।

বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি জয়া ধনং যন্তে দদাশ মর্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ—“অগ্নে” ( হে অগ্নিদেব ) “প্রতুম্” ( পুরাতন ) “দূতং” ( দূত ) “বরুণঃ মিত্রঃ অর্য্যমা” ( বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা—আদিত্যেরই তিন ভিন্ন নাম ) “দেবাসঃ” ( দেবতাজয় ) “জা” ( আপনাকে ) “সং ইহতে” ( সম্যক্ প্রকারে দীপ্তি দান করিতেছে ) “যঃ” ( যে ) “মর্ত্যঃ” ( মনুষ্য ) “তে” ( আপনাবে ) “দদাশ” ( হবি দান করে ) “সঃ” ( সেই মনুষ্য ) “জয়া” ( আপনা কর্তৃক ) “বিশ্বং” ( সর্ববিধ ) “ধনং” ( ধনকে ) “জয়তি” ( জয় করিয়া থাকে ) ॥ ৪ ॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব! আপনি পুরাতন দূত। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা—এই আদিত্যের আপনাকে সম্যক প্রকারে দীপ্তিদান করে। যে যজমান আপনাকে হবি দান করে, সে আপনার অহুগ্রহে সর্ববিধ ধন লাভ করে ॥ ৪ ॥

বিশদার্থ—পূর্ব ঋকে ঘোর পুত্র কথ ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—“মহন্তে সতো বিচরন্ত্যর্চয়ো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ”—এই ঋকে বলিতেছেন—“দেবাসস্বা বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সং দূতং প্রতুমিহতে”। একবার বলিলেন—অগ্নির মহৎ ও নিত্য শিখাসমূহ উর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গলোকে আদিত্যমণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া বিচরণ করে—আবার এই ঋকে বলিতেছেন—অগ্নি পুরাতন দূত। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা—দেবতাজয় অগ্নিকে সম্যক প্রকারে দীপ্তিদান করেন। ঋষিবাক্য মিথ্যা নহে—উভয়ই সত্য। অগ্নি আদিত্যমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে আবার আদিত্যমণ্ডল অগ্নিকে দীপ্তিমান করে। ঋষির দৃষ্টিতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের একটি অঙ্গাদী সম্বন্ধ ধরা পড়িয়াছে।

পুরাণে আছে—“সূর্য্য অন্তর্গত হইলে রাজিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে অহুপ্রবেশ করে, সেই নিমিত্ত দূর অগ্নি দৃষ্ট হয়। এইরূপে, দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অহুপ্রবিষ্ট হয়। এই অগ্নি সংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপ তেজ পরস্পর অহুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আশ্রয়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে।” বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রগ্রন্থই সমস্তরে বাধা। শাস্ত্রবাণী সব সময়েই আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়বিধ শিক্ষাই সমভাবে দান করে। অগ্নি-ইন্দ্র-বরুণ-সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধে বেদের ঋষি তাঁর জ্ঞতিমত্রে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাহাই বিশদীকৃত করা হইয়াছে! আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও শাস্ত্রবাণী প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রমাণ করা শক্ত হইবে। বর্তমানকালেও সৌরজগৎ সম্বন্ধে বাহারা আলোচনা করেন, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন মাসভেদে সূর্য্য কিরণের কত তারতম্য। ইহা হইতেই দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি। বৈশাখ মাসের অন্ততম আদিত্য অর্য্যমা, জ্যৈষ্ঠ মাসের মিত্র অন্ততম আদিত্য এবং আষাঢ় মাসের অন্ততম আদিত্যের নাম বরুণ। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ঋষি এই ঋক্সে তিনজন আদিত্যের জ্ঞতিমত্রে উচ্চারণ করিলেন কেন, তাহার সঙ্গত কারণ পরবর্তী মত্রে তিনিই বলিবেন ॥৪॥

# কাব্য বনাম আধুনিক রুচি

অধ্যক্ষ শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস এম-এ

২

এখানে এলিয়ট কাব্য বিচারের একটা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কাব্য জিজ্ঞাসার নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন না করে, তর্কযুগের ইতিহাসের পাতা না উল্টে, আমি কাব্য বনাম আধুনিক রুচি বলতে কি বুঝি, এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করবো। তার মধ্যে আসবে কাব্যের স্বরূপ-ধর্ম, কাব্য-মানসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা, সময় ও জীবনবোধের বিচিত্র তাৎপর্য। তাকে সংক্ষেপে তিনি কাব্যালোচনার পঞ্চমিক বলে অভিহিত করেছেন। যথা—

(১) মানবের মানসিক নির্জনতা (২) জন্ম-মৃত্যুর অপরিহার্যতা (the facts of birth and death in their inexplicable oddity) (৩) ধারণাতীত বিশ্ব-পরিধির বিপুলতা (The inconceivable immensity of the universe) (৪) সময়-পরিপ্রেক্ষণে মানুষের স্থান (Man's place in the perspective of time) (৫) এবং মানব অজ্ঞতার বিশালতা (The enormity of man's ignorance).

এখন দেখা যাক এই প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এলিয়ট কি ভাবে কাব্য বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন? আধুনিক কাব্যে আজ যে নিঃসঙ্গ মনের হাহাকার শোনা যায়, যে নির্জন দীপে ব্যক্তিস্বতন্ত্র-মন বন্দী, তারই অক্ষুট ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আধুনিক কাব্যে। সেই অস্পষ্টতার প্রতীক স্বরূপে এলিয়ট বেছে নিয়েছেন 'নীল' কথাটি। ওর মধ্যে অসীম এবং অস্পষ্টতা যেন ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। তা'হলে বুঝা গেল যে, নীল শব্দ রূপক নয়, প্রতীক। এখন প্রশ্ন উঠে কি অর্থে মানুষ নিঃসঙ্গ? আর কি থেকেই বা এই বিচ্ছেদ নির্জনতা? অথবা মানব অবস্থিতির পরিবেশই বা কি? মানব মনের এই বিচ্ছেদ-বেদনা, বা নিঃসঙ্গতার হেতু কি,—এ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উত্তর আছে প্রেটোর Diotima গ্রন্থে। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস মানুষের এই বিচ্ছেদ ভগবান থেকে। বৈষ্ণব রসতত্ত্বেও রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-

মিলনের যে রূপক লীলা, সেটা আর কিছুই নয়, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন আকৃতি। এই বিশ্বাস কয়েক শতাব্দী ধরেই কাব্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছিল।

এর পর যে জাগতিক বিশ্বয়ের মুখোমুখি হ'ন কবিরা, সেটা হচ্ছে এই সৌরমণ্ডল পরিবৃত্ত বিশ্ব-পরিবেশের সীমাহীন শূন্যতা আর দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত অনন্ত নীরবতা। আমাদের চারিদিকে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে ঐ ছুটি প্রশ্ন যেন মুখ্যবাদান করে আছে। আমরা যে যেমন বুঝি, সেই মত নিজ নিজ উপলব্ধি থেকে আমরা ঐ শূন্য নীরবতার একটা তথ্য বা অর্থ করে নিচ্ছি। কবিরাও কল্পনার আলোয় সেই শূন্যতাকে চমৎকারিত্বে মনোহর করে ভাষা দিয়ে নীরবতাকে মুখর করে তুলতে চাইছেন। কেউবা ধর্ম-বিশ্বাসের নজির খাড়া করে ঐ স্তব্ধ-শূন্যতার একটা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমাদের আধুনিক কাব্যে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা দেখা যাচ্ছে, এদেশ ও গুদেশের বহু কবির কাব্যে।

তৃতীয় প্রসঙ্গ হ'ল মানবিক অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা অবশ্য ব্যক্তি-সামর্থ্যভূমারী, কম বা বেশী হতে পারে। তা হ'লেও প্রশ্ন উঠে, 'অজ্ঞতা কিসের'? এই অজ্ঞতার পরিধি জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে। এককথায় জ্ঞানের, মনের ও অনভিজ্ঞতার অন্ধকারে আমরা বাস করছি। তা'ছাড়া আমাদের চারিদিকে সময়-নিয়তি আর জীবন-মৃত্যুর কি দুর্ভেদ্য-বহুশ্র প্রাচীর সমস্ত জিজ্ঞাসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি আমাদের আত্মগত যে মন, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। আমাদের মনের ন'ভাগই অবচেতন মনের অন্তর্গত, আর বাকী একভাগ যে সচেতন মন, তা দিয়ে কতটুকুই বা জানা সম্ভব? কাজেই এহেন অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের যে মন নিরন্তর পথ খুঁজে মরছে, সেই হৃদয়-মন থেকে আজকের কাব্যে যে, অস্পষ্টতার ছায়া প্রতিকলিত হবে, সেবিষয়ে সন্দেহ কি?

কাব্যের এই দুর্বোধ্যতাকে রাসেল বিক্রপ করেছিলেন।

বলেছিলেন যে, যে কাব্যের অর্থ করতে আমাদের গলদ-ধর্ম হতে হবে, সে কাব্য লেখার উদ্দেশ্য কি? কিসের তাগিদে বা কেইবা এই সব ছাইভস্ম লিখতে উদ্যত করে, তা আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। এগুলি কাব্যের নামে কতকগুলো বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে! কাব্য কি কোন নীতির শাসন মানবে না? কাব্য কি হবে সৃষ্টির নামে স্বেচ্ছাচারিতার কারখানা? যৌন-রুচির বিকার থেকে কাব্যকে মুক্ত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ট্রটস্কির ‘সাহিত্য ও বিপ্লব’ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্য-সৃষ্টির অল্পপ্রেরণার একটা ব্যাখ্যা কবেছেন। বলেছেন যে, Artistic creation is always a complicated turning inside out of forms, under the influence of new situation, which originates outside of art. In its largest sense of the word, art is a hand-maiden. It is not a disembodied element of feeling in itself, but a function of a social man indissolubly tied to his life and environment.

অর্থাৎ আর্ট হচ্ছে একটা জটিল সৃষ্টির পর্ব। মানুষের অন্তর্নিহিত অল্পভূতিকে কোন একটা আঙ্গিকের মারফতে প্রকাশ করা, যা একটা বহির্পরিবেশের বিশেষ প্রভাব-সম্প্রাপ্ত এবং আর্টের বহির্ভে যার অবস্থান। উদার অর্থে আর্ট হ'ল মানব পরিচাবিকা বিশেষ। তা' অদেহী বিক্ষিপ্ত অল্পভূতির টুকরো ছবি নয়; সমাজ-আশ্রয়ী মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে সেই শিল্পের সংযোগ এমনই নিগূঢ় যে, তাকে সমাজ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না।

সমালোচকেরা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে, শিল্প যদি মানুষের শিল্পীমনের পরিচাবিকা হয়, তবে সেই আত্মগত থেকে কাব্য বা শিল্প কি মুক্তির বার্তা আমাদের শোনাবে? ট্রটস্কি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আর্ট বা কাব্যের মধ্যে যে বক্তব্যই থাক না কেন, তার মধ্যে থাকবে সময় পরিবেশের নানা সমস্যা-বিপ্লবের পদচিহ্ন। সেটাই হবে তার প্রচারযোগ্য প্রধান বক্তব্য। তার ফলে রাশিয়ার কাব্যে নানা সমস্যার জটিলতা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ

করেছে যে, তার মধ্যে কাব্য-রসকে খুঁজে পাওয়াই হ্রস্ব। এই কারণে রুশীয় কাব্য একাধারে দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন হয়ে উঠেছে। তারফলে সেখানকার কাব্যে মতবান ও বিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাব্যিক প্রত্যয়ের স্তরে স্তরে ভাঙন ধবেছে।

কাব্যের এই আসন্ন অধঃগতি প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন কাব্যিক মান (criteria) উদ্ভাবিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, যে দুর্বোধ্য জটিলতার আবর্তে পড়ে আজকের কাব্য-রুচি যেভাবে ক্রমশঃই আবিল হয়ে উঠেছে, তাকে মানুষের আত্মগত নৈতিক বা ধর্ম-চেতনাই রক্ষা করতে পারে। আর একজন তখন বলেছেন যে, কাব্যিক সত্তাকে আবও পরিমার্জিত এবং অল্পধাবনযোগ্য কবে তুলতে হ'লে চাই নীতি ও শিক্ষাগত সংস্কারের পরিমার্জনা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনার আলোয় যতদিন না মানুষের সৃষ্ট কাব্য উদ্ভাসিত হবে, ততদিন কাব্য থেকে বেশী কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা যাবে কি? এখানে আর একদল বলেছেন যে, ‘রিয়েল’কে ‘আইডিয়েলাইজ’ করাই যখন কাব্যিক অল্প-শীলনের অঙ্গ, তখন কাব্যের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ আসাটাই স্বাভাবিক। সন্ধ্যার পরিবেশের কথা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অল্পভূতি, যখন কাব্যের অতিশয়োক্তির মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন সেই মরমীয়া অল্পভূতিকে অতীন্দ্রিয়বাদ ছাড়া কি বলা যাবে?

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ অবশ্য কাব্য সৃষ্টির অল্পপ্রেরণার কথা তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, কাব্য-বিচারের আগে প্রাথমিক বিচার বিষয় হচ্ছে: ‘কাব্য সৃষ্টির প্রয়োজন কি, আর কাব্য-রচনার অতিপ্রায় কি? অথবা এই আকাজক্ষাই বা কেন? এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা, কবি-মানসের ঐকান্তিক ইচ্ছার কথাও বিজড়িত। সাধারণতঃ আমরা মানি যে, পরিবেশের প্রভাব অর্থাৎ বাইরের জগৎ যখন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে অন্তর্লোকে এক অভিনব চেতনার সংবাদ পৌঁছে দেয়— আমাদের মন যখন আলোড়িত হয়, তারই অভিব্যক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করে কাব্যে, সাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে মানুষের মন আসে এই অনন্ত সময়-পরিপ্রেক্ষণের প্রশ্ন।

বার বার মনে হয়, অনিবার্ধ মৃত্যুর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আমরা কোন্টাকে গ্রহণ সত্য বলে গ্রহণ করবো? এই সামাজিক ভূমির আনন্দ কে? ক্ষুদ্র জীবনগঙ্গার মধ্যে থেকে বৃহত্তর সত্য, অবিনশ্বর আনন্দ-অমৃতের নাগাল আমরা পাবো কি করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রগতিশীল সমালোচকেরা বলেছেন যে, এহেন সংযোগ বা সংযোজন প্রসঙ্গ তুলে কাব্যকে বোঝা যাবে না, এমন কি কাব্যের অভিপ্রেত ব্যাখ্যাটিকেও জানা যাবে না। কারণ 'communication will not explain poetry.' অর্থাৎ কাব্যের যে ভাবটি কবি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে তিনি তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন, তখন কিন্তু পাঠকমহলে স্তব্ধ হ'লো অল্পধাবনের পালা। কবি-মনের যে ভাব-তরঙ্গ স্বনিরূপে আমাদের মর্মে প্রবেশ করে, কতখানি আমাদের মন-প্রাণকে আকুল করল, এটাই হ'ল কাব্য-বিচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এই কবিতার সবটুকুই যে ব্যাকরণ ও অর্থগতভাবে বুঝতে না পারলে কাব্যরস পাওয়া যাবে না, এমন নয়। হাউসম্যান ঠিক এই মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেছেন যে, Poetry gives most pleasure when, only, generally and not perfectly understood.

কাব্য দুর্বোধ্য বা তুরীয় হওয়ার প্রধান কারণ এই। প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্রেমণ্ড এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাই তিনি বলেছেন যে, কাব্য বিচার করতে বসে, এই কথাটাই বিচার্য যে, কি অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন? আর কবিতার অন্তর্নিহিত সত্যের বা রসের মর্মোদ্ধার করতে হ'লে, প্রথমেই দেখতে হবে কি স্বভাববৃত্ত নীতি বা সত্যের উপর কাব্যরস দানা বেধে উঠেছে। সেটা উদ্ঘাটিত না হ'লে কিন্তু কবিতার প্রকৃত কোন ব্যাখ্যা হ'তে পারে না।

এখানেই প্রশ্ন উঠেছে what is poetry? তা হ'লে কোন কবির কাব্যের সবটুকু কবিতা-পদবাচ্য নাও হ'তে পারে? কাব্য-বিচারে যা' রসোত্তীর্ণ, কেবল তাকেই কাব্য বলা যাবে। আর যা তা নয়, তাকে প্রকৃত

প্রস্তাবে কাব্য বলা যাবে কি? এখানে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কাব্যের পরিধি যত সীমাবদ্ধ হবে, যতই কাব্য বিভিন্ন অমুভূতির স্পর্শকে এড়িয়ে যাবে, কিংবা যতই বিষয় আতিশয্যে কাব্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, ততই কাব্য সঙ্গীর্ণতা বা অস্পষ্টতা দোষদুষ্ট হয়ে পড়বে।

উপসংহারে এলিয়ট বলেছেন যে, মানব অস্তিত্ব যে বিশালতা আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে, কাব্যিক ভাব বিনিময়ের সময় সেই সংশয়ের ছায়া আমাদের কাব্যিক ভাষাকে এমন দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট করে তোলে। যে কবি যতই ঐ পরিধির বাইরে আসতে পেরেছেন, তিনি প্রত্যক্ষ রূপকের সাহায্যে যে শব্দ-জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তার রূপক প্রতীককে স্পর্শ করার ভাষা সাধারণের জন্য নেই বলেই আজকের কাব্যের নূতন ভাবের তরঙ্গগুলো বোঝা সঙ্কটের মত স্থির হয়ে আছে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে তার স্রোত চলাচল করছেন। এখানে আর একটা অস্থিবিধা আছে, নানাবিধ সঙ্কটের আড়াল। যা কবি ইয়েটস্-এর মধ্যে ছিল না। তাঁর কাব্য সেই কারণে স্পষ্ট, সরল এবং সরাসরি।

শেষ কথা এই যে, কাব্য যুগপ্রভাব-মুক্ত নিরালস্য কোন বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। আমাদের যুগধর্মকে অস্বীকার করে কাব্য যদি পিছন ফিরে দাঁড়ায়, সমাজ সংঘাতের একটি তরঙ্গও যদি সেই যুগের কবির কাব্যে না শোনা যায়, তবে সে কাব্য যতই কল্পনার অলঙ্কারিত গজদন্ত মিনারে আশ্রয় নিক না কেন, সে কাব্যের কোন বক্তব্য এযুগের মানুষের দরবারে গিয়ে কি পৌঁছুবে? এই কারণে প্রগতিবাদী সমালোচকরা বলেছেন যে, কাব্যের যদি কোন 'মিশন' থাকে, তবে সেটি হবে এই যে, poetry will reflect things that the age demands. যুগ-চাহিদার সঙ্গে মানসিক অগ্রগতি এবং মননশীলতার সঙ্গে কাব্যের যদি রূপান্তর না ঘটে, তবে সে কাব্য কি কালের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে?

তথাপি কাব্য সম্পর্কে আজও কোন শেষ কথা বলা যায়নি। তার কারণ রুচি ও মননশীলতার বৈশিষ্ট্যে মানুষ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি ওগুলোর উপরই মানুষের আত্ম-সম্প্রাণ বা উপলব্ধিও নির্ভরশীল। সেই স্বতন্ত্রতা হেতু কোন হৃদয় মানুষ বা সমালোচকের কাব্য-বিচার এক নয়। এই কারণে কোন দেশের কোন যুগের কোন সমালোচকেই কাব্যের প্রকৃতি ও সর্বাঙ্গিক বিষয়কে কোন কাব্যিক সংজ্ঞার স্ত্রে বিধৃত করতে পারেন নি। আর তা' কোন কালে সম্ভবও নয়।



(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

দূর প্রতিজ্ঞায় ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়ানুম ফাইলের সুপ  
কেলে। গুহাধারে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলুম। একটি  
মেয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক প্রবেশপথে। হয়তো স্থানীয় কোন  
পাহাড়ী মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য দীপ্তি তার চোখে-মুখে।  
দুই বৎসর যাবৎ যেখানে স্বামীজি ব্যতীত আর কারও  
সাক্ষাৎ পাইনি—সেখানে অকস্মাৎ কে এই তৃতীয়া?  
পথভোলা পথিকের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে নয়। অত্যন্ত চেনা  
পথের যাত্রীর নিশ্চিন্তি এর চোখে। কালো মেয়ের  
নিটোল দেহে উজ্জল যৌবন-বজ্রার কুলভাঙ্গা ঢেউ।  
অপরূপ লাবণ্যময় এক মনোরম শিল্প-সৃষ্টি। মুগ্ধ না হয়ে  
উপায় নেই।

দীর্ঘদিনের উপবাসী কালীকিঙ্কর, মুগ্ধ লুক্ক কালীকিঙ্কর  
তাকিয়ে রইল শুক বিষ্ময়ে।

অকস্মাৎ মনে হল এও কি স্বামীজির পরীক্ষা?  
মুহূর্তে সতর্কতায় সচকিত হয়ে উঠল কালীকিঙ্কর। গর্জে  
উঠল অভিনেতা কালীকিঙ্কর, কে তুমি?

—ম্যায় পাহাড়ীয়া হ'।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন এসেছ এখানে?  
কে চেনাল পথ?

—আপকো চিঠি হায়। এক সাধুজীনে ভেজা।  
পথ ভী বাতা দেয়া। শাস্তকণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি।

হাত বাড়িয়ে দেখাল চিঠিখানা। একটানে ছিনিয়ে  
লিলুম। মেয়েটি যেন একটু অবাক হ'ল। একটু  
হাসলও বুঝি।

—এয়ারসি কাঁহে। উও তো আপকো পাস ভেজনে হী  
লিয়ে ম্যায় আয়া। লেकिन যুঝে তো বয়ঠনে নেহী বোলা  
আপ্। ম্যায় পরেশান হ'। বহুত প্যাস ভী লাগা।

একটু যেন ক্লান্তভাবেই ভিতরে এসে বসে পড়ল  
মেয়েটি।

পাশেই আমার খাবার ছিল। ইজিতে দেখিয়ে দিলুম।  
ও অবলীলক্রমে খেতে শুরু করল।

আমার দিকে পিছন ফিরে ও নীরবে খেয়ে চলেছে।  
আমি প্রশ্ন করলুম,—তুমি কি অনেক দূর থেকে এসেছ?

—এক রোজকা পথ : ও খেতে খেতে বসল।

—এখানে কি আগে এসেছ আর?

—নহী। খেতে খেতে ও এক একবার সকৌতুকে  
তাকাত্তে আমার দিকে। আমিও মাঝে-মাঝে দেখছি  
ওকে তীক্ষ্ণ চোখে।

—ক্য হ'য়া ব্যুজী। আপকো থানা ম্যায় থা লিয়া।  
হাঃ হাঃ হাঃ...

এক অপরিচিতা পাহাড়ী মেয়ের এতখানি সপ্রতিভতা  
দেখে কি যেন একটা সন্দেহের কাঁটা বিধছে মাঝে  
মাঝে। এক ধমকে ওকে ধামিয়ে দিলুম। চুপ রহো,  
বলো তে তুমি? এবার খিলখিল করে হেসে  
পড়ল মেয়েটি।

—ম্যায় তো পহলে বোলা। লেकिन আপ ইতনা  
ডরপোক আদাম। এক লড়কী সে ইতনা ডর,  
ঔর সারে হিন্দুস্থানকো আগা করনেকা মতলব হ'য়া।  
হাঃ হাঃ হাঃ...

কে এই নারী! এ যে আমাকে চেনে দেখছি।  
সাধুজীর চিঠি ষলাতেই অবশ্য বুঝছি কার চিঠি। কিন্তু  
ও যে বস একদিনের পথ থেকে আসছে। তবে?  
স্বামীজি কি নেই এখানে? কথাটা মনে হতেই যেন  
একটা ঝড় বয়ে গেল বুকের মধ্যে। কালকের খাবারের

পরিমাণটা একটু অতিরিক্তই ছিল। শেষ করতে পারিনি। অতিরিক্তটুকু আজ ও খেল। তবে কি স্বামীজি কাল আমার খাবার রেখেই...

এ কদিনে অবশ্য খাবার ঠিকই পেয়েছি, কিন্তু একটি দিনও লক্ষ্য করতে পারলুম না কখন কে এসে খাবার রেখে গেল। স্বামীজি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই একটি রহস্যময়তার আবরণ, একটা প্রচ্ছন্নতা রাখতে চাইছেন কেন? বিজোহী হয়ে উঠল মনটা। স্বামীজি যেন বড় বেশী খেলা করছেন আমাকে নিয়ে? এ অসম্ভব।

প্রশ্ন করলুম,—স্বামীজীকে তুমি চিনতে আগে?

—নহী বাবুজী।

—তিনি এখন কোথায়?

—ক্যাসে কহ'। लेकिन বাবুজী, উও চিঠি কাহে নহী দেখা। মুখে তো মালুম হায় কি চিঠিটিমে সবকুছ পতা মিলেগা।

সত্যই তো। এ কী ভ্রম! একটি নারীর আকস্মিক আবির্ভাব আমাকে এতখানি বিভ্রান্ত করে দিয়েছে? এত বৎসর ধরে কি এইটুকু শক্তি অর্জন করলুম! বার বার যিদ্ধার দিলুম নিজেকে। মেয়েটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেরিয়ে এলুম গুহা থেকে। বাইরে এসে কি মনে করে অভ্যস্ত কোঁশলে সেই পাথরখানা সরিয়ে গুহাঘার বন্ধ করে দিলুম। সেই মুহূর্তে এক ঝলক হাসি ভেসে এল গুহাভ্যন্তর থেকে। চমকে উঠলুম।

ধাক গুর কথা, পরেও ভাবা চলবে। ও ধাক বন্দী হয়ে।

চিঠি খুললুম।

হ্যা, স্বামীজিরই চিঠি:

“তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছ আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। তবুও তোমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার জন্য বলতে হচ্ছে এ চিঠি যখন তুমি পাবে ততক্ষণে আমি ভারতবর্ষের সীমান্ত পার হয়ে গেছি। এদেশে আমার শেষ রিক্রুট ঐ পাহাড়ী মেয়েটি, বার হাত দিয়ে এ চিঠি পাঠাচ্ছি। শুধু পাহাড়ী বন্ধে ওর পরিচয় অসম্পূর্ণ হবে। বেহুইনের বন্ধতা আর ওর জন্মভূমির স্নিগ্ধতার ও এক অপূর্ণ সমন্বয়। কাজে লাগাতে চেষ্টা করো ওকে। তোমার পরিচয় ওকে দিয়েছি।

“আগামী সোমবার বেলা সাড়ে বারটার সময় রাওয়ালপিণ্ডী ষ্টেশনে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সাধক স্বামী নির্মলানন্দের অত্যাধুনিক আয়োজন করে গেলুম। সেই সাথে শেষ হ'ল কালীকিঙ্করের অজ্ঞাতবাস। প্রয়োজনের মুহূর্তে নির্মলানন্দের ছদ্মবেশ খুলে নেতা কালীকিঙ্করের ভূমিকা গ্রহণ করতে বিধা করবে না আশা করি।

“ওখানে তুমি যা পেয়েছ আর যা জেনেছ তা আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ সময়ে ও জিনিষ তৃতীয় ব্যক্তির গোচরীভূত করা ঠিক হবে না। তেমন সবট উপস্থিত হলে বরং তন্নীভূত করো। ও আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। ভারতের নব ইতিহাসের উপকরণ।

“দেবতার অরূপণ আশীর্বাদ বর্ষিত হোক নব ভারতের জাগ্রত জনজীবনে। গড়ে উঠুক আদর্শ নেতা অভিনেতা কালীকিঙ্করের মাঝে; এই কামনা নিয়ে এক ভারতবাসীর হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম ভারতের ভবিষ্যৎ। শুভদিন অতি সন্নিকট। একটি মোহগ্রস্ত মুহূর্ত, একটি অসন্তর্ক পদক্ষেপও যেন সে দিনটিকে দূরে সরিয়ে না দেয়। আত্মশক্তি আর দৈবাহুকূল্য দুটাই প্রয়োজন। দুটিই হুচল সাধনার বস্তু। একথা ভুলো না যেন। ভারতবর্ষের কাছে আমি এইটুকুই শিখেছি। আমি অ-ভারতীয়। এই আমার পরিচয়।”

শেষ কথাটার যেন একটা বজ্রপাত হল।

অ-ভারতীয়!! তুমি যদি অ-ভারতীয় তবে সত্য ভারতীয় কে? ভারতের নব ইতিহাস রচয়িতা হে সর্বোত্তম-ভারতীয় তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ কর। গ্রহণ কর সমস্ত ভারতবাসীর প্রণাম।

ছুটে গেলুম স্বামীজির সাধন মন্দিরে। যেখি সেখানেও কিছু ইঙ্গিত রেখে গেছেন কিনা।

হ্যা, আছে। আছে তাঁর সেই প্রাচীন গ্রন্থগুলি আর যুগচর্মানখানি। স্বামী নির্মলানন্দের ভূমিকায় এগুলি অপরিহার্য। দ্বন্দ্বর্শী স্বামীজি। দীর্ঘক্ষণ তাঁর পরিত্যক্ত আসনে অশ্রুপাত করে উঠে দাঁড়ালুম। বুকের মধ্যের গভীর দ্রুততা বারে বারে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছে।

সীমান্ত পেরিয়ে আবার কোন দুর্গম পথে কোন মহত্তর



সম্পদের সম্মানে তুমি এগিয়ে চলেছ স্বামীজি, আমার অশ্রু-  
তেলে তোমার চলার পথ পঙ্কিল করব না; শুধু দুর্ফোটা  
অশ্রু-নৈবেদ্যে তোমার এই অক্ষয় পূজারীর মানস-পূজাটুকু  
তুমি গ্রহণ কর। যে পতাকা তুমি আমার হাতে তুলে  
দিয়ে গেলে তা আমি বইতে পারব কি? পারব কি সেই  
মহাসম্পদের সম্মান রাখতে।

কী সর্বনাশ! যকের ধনের মত যে সম্পদ এতদিন  
উনি আগলে রেখেছেন; “কোন ভৃত্যের গোচরীভূত  
না হয় যেন।” এইবার শেষ নির্দেশ; সেই সম্পদ যে  
প্রথম দিনেই আমি এক অজ্ঞাতকুলশীলা ভৃত্যীর হাতে  
ছেড়ে দিয়ে এলুম। হোক না স্বামীজির রিক্রুট, তবুতো  
সে ভৃত্যী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

মর্মান্বিত লজ্জায় ছুটে এলুম গুহায়।

মেয়েটি অসাড় নিদ্রিত। ঘুমের ডান নয়তো! তীক্ষ্ণ  
সন্ধানী চোখে পরীক্ষা করলুম। নাঃ ঠিকই ঘুমোচ্ছে।  
তাকিয়ে দেখলুম ফাইলগুলির দিকে। কোথাও কিছু  
বিচ্যুতি দেখছি না। তবুও নিঃসন্দেহ হতে হবে।

ডাকব ওকে? কি বলে ডাকব? কি নাম ওর?

হঠাৎ একটু নড়েচড়ে উঠল ও। পাশ ফিরে গেল।  
ঘুম কিন্তু ভাঙল না। পাশ ফিরতেই ওর একখানা হাত  
এসে পড়ল আমার পায়ের ওপর। উফ একটু স্পর্শ।  
আস্তে পাটা সরিয়ে নিলুম।

পাশ ফিরবার সময় ওর বুকের আঁচলটা একটু স্থানচ্যুত  
হয়ে গেছে। পিঠের উপর এলিখে পড়েছে খোঁপাটা।  
খোঁপায় গোঁজা ফুলের গুচ্ছটা খুলে পড়ে আছে অদূরে।  
হয়তো পথ চলতেই সংগ্রহ করেছিল। সারাদিনের  
রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে ফুলগুলি।...কী অপরূপ  
দেহের গঠন। কালো পাথরের উপর আর একখানা  
জীবন্ত পাথর। মসৃণ মনোরম!

আমার কাণের মধ্যে একটা শোঁশোঃ আওয়াজ।  
গভীর নিঃশ্বাসের শব্দটাই বুঝি ওর ঘুম ভাঙিয়ে  
দেবে। সরে দাঁড়ালুম। হাতের তালু ঘেমে উঠছে  
কেন? কেন গলা শুকিয়ে আসছে? এতদিনের ঘুমন্ত  
জানোয়ারটা কি আবার রক্তক্ষায় জাগ্রত হয়ে  
উঠল? সেই দুর্বোদ-নিশ্চেষ্টে যে জানোয়ারটার দেখা

পেয়েছিল কল্যাণী! এ কী অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে গেলেন  
আমার স্বামীজি!

মনস্থির করে ফেললুম। জেগে উঠলেই ওকে বিদায়  
দিতে হবে। স্বামীজির শেষ রিক্রুটকে তিনি কাজে  
লাগাতে বলেছেন। আজ যা করেছে এইতো ওর পক্ষে  
যথেষ্ট। আর নয়। ওর ভূমিকা এটুকুই।

মশাল জ্বাললুম। কিছু অর্ধও সংগ্রহ করলুম।  
আচমনাদি শেষ করে প্রাত্যহিক ধ্যানে বসেছি। কিন্তু  
একি! ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ওর জেগে উঠবার  
প্রতীক্ষাতেই বসে কাটালুম। “ধ্যানেনাশ্রয়ি পশুস্তি  
কেচিদান্নানমান্ননা...” ইত্যাদি শ্লোকগুলি কেবল  
আউড়ে গেছি। মনঃসংযোগ হয়নি তো।

মনের হুট কীটগুলি তাহলে তোমার বেশ স্বস্থভাবেই  
বঁচে আছে কালীকিঙ্কর। সাতবহরের সাধনাতেও  
তাদের বিনাশ করতে পারলে না! ওরা কি সত্যই  
হরণময়? কামকীট কি রক্তবীজের মতই অমর?

—বাহ্জি, আরে বাব্বা, কেতনা রাত হুঁয়া?

এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার জন্ত ও যেন লজ্জিত হল। ও  
জেগে উঠতেই আমিও সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে উঠলুম।

—এই রাত্রে যেতে পারবে তো? তোমাকে এক্ষণি  
যেতে হবে।

—খু-উব। কাঁহা জানা? কহিয়ে না। লেকিন  
অব টিটি উট্টি, তো দেখা দিজিয়ে। ম্যায় তুরন্ত আ যাউ।  
আপ ইন্তেজাম্ কর লিজিয়ে।

লজ্জা পেলুম নিজের রূঢ়তায়। মশালের ইজিতে  
নিকটবর্তী বর্ণাটার অবস্থান বুঝিয়ে দিয়ে মশালটা ওর  
হাতে দিতে যাচ্ছিলুম। ও খিল খিল করে হেসে উঠল।

—পাহাড়ীয়া আঁধিয়ার যে নহী ডবতা ছায়।  
লেকিন...হাঃ হাঃ হাঃ

বার বার ওর হাসিটা যেন আমার দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ  
করছে। ওকি আমার অতি-সতর্কতাটাকে ভীকৃত-  
ভাবছে। ওকি উপহাস করতে চাইছে বাঙালীর  
ভীকৃততাকে?

মিনিট দশেকের মধ্যে ও কিরে এল। কিরে এল  
যেন একটা হরিণ শিশুর মত নৃত্যপরা হয়ে। বেশ পরিচ্ছন্ন

প্রস্তুত হয়ে এসেছে। যেন এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়বার জন্ত তৈরী। চোখে মুখে একটা প্রদীপ্ত প্রফুল্লতা। একটা প্রশম স্বচ্ছতা। ইতিমধ্যে আবার খোঁশায় শুঁড়ে নিয়েছে কয়েকটা বস্ত্র ফুল পাতা।

—ঠিক হ্যাঁ। চলিয়ে বাবুজি।

—আমি কোথায় যাব? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

—রাওয়ালপিণ্ডী।

—কী বললে? আমি বজ্রমুষ্টিতে ওর হাত চেপে ধরলুম। তুমি স্বামীজির চিঠি পড়েছ?

হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ। ওর হাসি যেন আর ফুরোবে না।

—কেন চিঠি খুলেছ? তুমি বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাস-ঘাতককে ক্ষমা করেনা কালীকঙ্কর।

স্বামীজির অস্বাভাবিক দেখা মারণাজ্ঞগুলির কথা মনে পড়ল। তারও যে ব্যবহার করতে হবে আমাকে এমন-ভাবে এ আশা করিনি। স্বামীজির প্রেরিত সে মেয়েই হয়তো নয় এ। এ আর কেউ। নাকি এর মাঝেও আছে কোন বড়বন্দ। এ কোন গুপ্তচর? বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কি স্বামীজীর রিক্রুট? এতবড় ভুল করলেন শেষ মুহূর্তে অতবড় সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ!

কঠিন কণ্ঠে বললুম—কথা বলছ না কেন?

এইবার ওর চোখে দেখা দিল ভয়চকিত দৃষ্টি। পরম অপ্রস্তুতের মত বলল—ক্যা হ'য়া বাবুসাব? সাধু জানেতো বোলা কি আপকো সাধ পহলে রাওয়ালপিণ্ডী জানা। ম্যায়তো পটালিখা নহী জানাত। উও চিঠিটিমে কি আউর কুছ লিখা হায়? রাওয়ালপিণ্ডী নহী? তব কাহা? লেकिन...

—তুমি লেখাপড়া জান না?

কুণ্ঠিত লজ্জায় ও মাথা নীচু করল। সজল হয়ে এল চোখ দুটি। যেন এই অপরাধেই আমি ওকে চরম দণ্ড দিতে বাচ্ছিলাম।

—আপ শিখা লিজিয়ে।

আর একবার পরাক্রান্ত হলুম এই সরলা পাহাড়ী

মেয়ের কাছে। মনে মনে ক্ষমা চাইলুম স্বামীজির কাছে। স্বামীজির নির্বাচনে ভুল হয়নি। এ মেয়ের শক্তি আছে যে বারে বারে এমনি পরাস্ত করতে পারে কালীকঙ্করকে।

সন্নেহে ওর স্বাভাবিক হাত রেখে বললুম, এ বড় কঠিন কাজ। জীবনমরণ নিয়ে খেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। তাইতো নতুন কেউ এলে তাকে এমনি করে পরীক্ষা করে নিতে হয়। তুমি কেন এলে এই আশুনের মাঝে।

ওর ভয়টা বুঝি কেটে গেল আমার সন্নেহ স্পর্শে। পরমোৎসাহে বলছে, দেশ মাদি কি সেবা, আরে হিন্দু-স্থানকো আজাদী লিয়ে জান কবুল 'এতো সবসে বড়া ধরম হায়। ধরমদে ডর ক্যা? এয়সা তো সাধুজীনে কহী। পাহাড়ীয়া ডর নহী জানতা। আপ ঘ্যায়সা হুকুম করেগা...মায়...লেकिन মুঝে নহী ছোড় দিজিয়ে। ম্যায় ভী দেশমাতাকী সন্তান হ'।'

উৎসাহে আনন্দে বুক ভরে উঠল আমার। আশ্চর্য স্বামীজির প্রভাব। দেশ-সেবা আমার ধর্ম। আমিও যে দেশের একজন সন্তান। স্বর্ঘ্য পালনে আবার ভয় কি? পাহাড়ী ভয় জানে না। চমৎকার! এই প্রেরণা এর বৃকে জাগিয়ে দিয়েছেন স্বামীজি হয়তো একদিনেই।

—সাবাস! স্বতোৎসাহিত আবেগে বললুম।

ও ধূশ হয়ে প্রণাম করল আমার হাসিমুখে।

—কি নাম তোমার?

—তিতলী।

তিতলীই বটে। চঞ্চল প্রজাপতি।

—ও যা জবাব দিল তার অর্থ দাঁড়ায় ওর বাবা শিখিয়েছে ক্ষেতের কাজ, মা শিখিয়েছে ঘরের কাজ, কিন্তু লেখাপড়া ওকে শেখাবে কেন? ও যে মেয়েছেলে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তো খারাপ হয়ে যায়। এ কথা বলতেও ওর হাসি। আমারও হাসি পেল ওর সরল স্বীকারোক্তিতে।

(ক্রমশঃ)

# মহাবলীপুরম্

## শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

বিগত বৎসর পূজাস্তে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাই। প্রথমে গেলাম পক্ষীতীর্থে। পক্ষীতীর্থ হইতে পূর্বে, বঙ্গদেশের স্ত্রীয়া শস্ত্রশ্রামল বৃক্ষরাজিশোভিত পাকা রাস্তা দিয়া, ১৮ মাইল পথ মেড় ঘণ্টায় আসিয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে একটি পর্বতের পাদদেশে মোটর থামিল। অল্প কয়েক ধাপ পর্বতের উপরে উঠিয়া, সমুদ্র-সংলগ্ন পাহাড়ের গায়ে খোদিত নানা দেবদেবী, জন্তু ও নানাবিধ মূর্তি ও গুহাসকলের অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্পের কারুকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এক একটি হস্তী সিংহ বৃষ প্রভৃতির মূর্তি বিশাল যেন এক একটি পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। সমুখেই একটি পাহাড়ের গায়ে একটি বিশাল হস্তীমূর্তি এবং ইহার চতুর্দিকে নানা নরনারী ও জীবজন্তুর মূর্তিসমূহ স্তম্ভরভাবে খোদিত, প্রত্যেকটির যেমন স্তম্ভ গঠন তেমনি জীবন্ত প্রতিকৃতি।

সমুদ্রের তটে পাথরে খোদিত প্রকাণ্ড সাতটী পক্ষ পাণ্ডবের রথ বা 'সেভেন প্যাগোডা'। এক একটি রথ পয়ত্রিশ ফিট উচ্চ এবং পৃথক পৃথক নাম—ধর্ম্মরাজ রথ, শ্রীকৃষ্ণ রথ, ভীম রথ, দ্রৌপদী রথ, অর্জুন রথ প্রভৃতি। এক একটি কি বিশাল। প্রত্যেকটি রথের উপর নানা দেবদেবী ও জন্তুর মূর্তিসমূহ ও পুষ্প বৃক্ষলতা, পাথরে খোদিত অপূর্ণ কারুকার্য্যে চিত্রিত করা রহিয়াছে। একটি রথের মধ্যে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা-মূর্তি। তিনখানি রথ মাত্র ভাল ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ অপর রথগুলি ক্রমে ক্রমে সমুদ্র গ্রাস করিতেছে। পর্বত খোদাই করিয়া পর পর ত্রয়োদশটি বৃহৎ বৃহৎ গুহা এবং প্রতি গুহার মধ্যে নানা দেবদেবী ও সিংহ, হস্তী, বৃষ প্রভৃতি বৃহৎ আকারের মূর্তি সমূহ খোদিত করা রহিয়াছে। কোন গুহায় যুধিষ্ঠিরের রাজসভা, কোনটিতে পক্ষ পাণ্ডবের বাসভবন, কোনটিতে ধ্যানস্থ রাজমূর্তি প্রভৃতি খোদিত। একটি গুহার গায়ে বলি রাজার মাধায় পা দিয়া বামনরূপী ভগবান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পর্বতোপরি পাথরের উপর কারুকার্য্য-করা বলীরাজ, পাতালপুরের মন্দির, হরপার্বতী-মন্দির প্রভৃতি

বিভূমান। প্রাচীন দেবালয়গুলি হিন্দুযুগের ভাস্কর্য্যের সাক্ষ্য হিসাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সমুদ্র তটের উপর একটি পাথরের বড় মন্দির। ইহা মহিষাসুর নগপ নামে কথিত হয়। প্রবাদ যে মা তুর্গা দশ-ভুজা হইয়া এই স্থানে মহিষাসুর রাক্ষসকে বধ করেন। এই মন্দিরের পার্শ্বেই একটি স্তূপবৃহৎ 'লাইট হাউস' বিভূমান।

পর্বত গায়ে এবং বৃহৎ গুহাগুলির মধ্যে ও স্তম্ভসমূহে নিখুঁতভাবে খোদিত মূর্তিসমূহ দেখিলে বিশ্ময়ে নির্বাক হইতে হয়। প্রত্যেক নরনারী ও জীবজন্তুর মূর্তি যেন জীবন্ত ও প্রাণম্পর্শী। মহাবলীপুরমে ড্রাইড স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ণ নিদর্শন ভারতের মধ্যে মহা গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং এই স্থাপত্য-শিল্প যে মনোবীর্ষ দেখিয়াছেন ইহাকে অতুলনীয় বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শত শত শতাব্দী আগে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প কত নিখুঁত ও নিপুণ ছিল তাহা কতশত শতাব্দীর জল-ঝড় উপেক্ষা করিয়া আজও অমান হইয়া ভারতের মহিমা কীর্জন করিতেছে।

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে প্রবল প্রতাপ অশুর-রাজ বলি স্বর্গ হইতে কিরিয়া স্বর্গোপম এই মহাবলীপুরম্ সহর নির্মাণ করান। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজবংশ অল্প প্রদেশে প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পল্লব বংশীয় রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন (৬০০—৬২৫ খৃঃ) মহাবলীপুরমে সমুদ্রের উপর সপ্তরথ নির্মাণ করান এবং এই পল্লব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নরসিংহদেব বর্মন এই স্থানে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বৎ একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই সময়ে এই বন্দরে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সূদূর দেশসমূহ হইতে হাজার হাজার পোত আসিয়া নানারূপ পণ্য আদানপ্রদান করিত। কালের কবলে সবই ধ্বংস হইয়াছে। এখন ইহা সমুদ্রহীন জনহীন প্রাচীন ঐতিহাসিক সহর মাত্র।

পাহাড়ের উপর হইতে প্রাকৃতিক শোভা অপরূপ ও মনোমোহিনী, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশি অববরত

যেন দেবতার পদ স্পর্শ করিতেছে। এক দিবসে সকল স্থান ভালভাবে দেখা সম্ভব নহে। আমরা প্রায় চারি ঘণ্টা ধরিয়া অপূর্ব ভাস্করশিল্প-সৌন্দর্য্য দর্শনে ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বতের উপরের একটি পাথরে বসিয়া পড়িয়া প্রকৃতির শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম। বঙ্গোপসাগরের তুরন্ত হাওয়া হু-হু করিয়া বহিয়া আমাদের মন-প্রাণ মাতাইয়া দিয়া ভ্রমণক্লান্ত দেহকে পরম যত্নে যেন জুড়াইয়া দিল।

প্রাচীন নগরের অতুলনীয় স্থিতি মনে ধারণ করিয়া এবং প্রকৃতির শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে ফিরিতে বাধ্য হইলাম। মহাবলীপুরম্ বর্ত্তমানে মাস্ত্রাজ

প্রদেশের চিঙ্গলপুট জেলার মধ্যে একটি গ্রাম মাত্র। মাস্ত্রাজ সহর হইতে মহাবলীপুরম্ তিন্মাইল মাত্র দক্ষিণে। যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে। মাস্ত্রাজ হইতে অনেক ভ্রমলোক মোটরে দুই ঘণ্টায় আসিয়া এখানে চড়ুইভাতি করিয়া সন্ধ্যার সময় সহরে ফিরিয়া যান। শুনিলাম, রবিবার এবং ছুটির দিন মাস্ত্রাজ হইতে মহাবলীপুরমে সাধারণ বাস চলাচল করে। সত্যই ইহা বন-ভোজনের অপূর্ব্ব স্থান। কিন্তু বড়ই দুখের বিষয় এমন স্থানে কোন হোটেল, এমন কি একটা চা বা কফির দোকানও নাই। এ স্থানে ভ্রমণে যাইতে হইলে সঙ্গে ক্লাসে জল এবং আহাৰ্য্য সঙ্গে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।



### আলাপ ও আলোচনা

## কুশাসন ও কলাপাতা

স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

চিকিৎসক একটা সুন্দর নাড়ী ধরিয়া শরীরের অবস্থা বুঝিয়া থাকেন। সমাজ শরীরেও অনেক সুন্দর নাড়ী আছে যাহা টিপিয়া দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তির সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারেন। সে সমস্ত নাড়ীর নাম সামাজিক আচার ব্যবহার। নিমন্ত্রণে কুশাসন ও কলাপাতার ব্যবহার আমাদের সমাজে একটা সুন্দর নাড়ী। উহা টিপিয়া সমাজের মতিগতি অনেকটা বুঝা যাইতে পারে।

আমাদের নিমন্ত্রণ সভার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। একটা বিস্তৃত গৃহে কতকগুলি কুশাসন পাতা রহিয়াছে, সম্মুখে এক একখানি কলাপাতা। যদি কোন বিদেশী লোক আমাদের এই নিমন্ত্রণ সভা প্রত্যক্ষ করেন তিনি বুঝিবেন যে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র ও একান্ত অসভ্য! ভদ্র সম্ভ্রান্ত সভ্য সমাজের সাজসজ্জা কখনও এরূপ হইতে পারে না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অমুক নগরের মহারাজা একখানি কুশাসনে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার পাশে বসিলেন তাঁহার গোমস্তার পুত্র, তাঁহার পাশে স্ত্রীর রমেশচন্দ্র, তাঁহার পাশে তাহার কেরানীবাবু, এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মূল্যবান পরিচ্ছদের পার্শ্বে জীর্ণ কামিজ ও ছিন্ন উড়ানী। হে সভ্য জগৎ একবার চাহিয়া দেখ। এইরূপ মিলন, এইরূপ সাম্য ভূমি আর কোথায়ও দেখিয়াছ কি?



কেহ সিংহাসন, কেহ উচ্চ রাজাসন, আর কেহ বা সামান্য কাষ্ঠাসন ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে সকলের জুড়ই সেই একই কুশাসন। কেহ কাঞ্চন থালি, কেহ রৌপ্য থালি, কেহবা মলিন কাংস পাত্রে আহাৰ্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু এই নিমন্ত্রণ সভায় সকলের জুড়ই কুশাসন। অশান ক্ষেত্রে যেমন সকলের পার্থক্য ঘুচাইয়া দেয় আমাদের নিমন্ত্রণ সভাও সেইরূপ ধনী নির্ধন পণ্ডিত মুর্থ সকলের দর্প ও দৈহিক দূর করিয়া সমাজের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই আচরণটা—সমাজ শরীরের এই ক্ষুদ্র শিরাটা সমাজ-শরীরের অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যের পরিচয় প্রদান করে।

যদি ধনীগণ নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে রৌপ্য বাসনের ব্যবস্থা করিতেন, মধ্যবিত্তগণ আপন বাটীতে ধনীদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন না। যদি ধনী নির্ধন বিচার করিয়া এই ক্ষেত্রে স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংসপাত্র প্রদান করা হইত তবে সমাজ নরক হইয়া উঠিত। কুশাসন ও কলাপাতাকে মর্যাদা প্রদান করিয়া এই দুইটা সহজপ্রাপ্য নূতন বস্তুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিকগণ যেরূপ মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, সমাজ শরীরে যে অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা (‘বিজয়া’ আঘাট ১৩২১ হইতে)।

# পাষণের ক্ষুধা

( কথাবার্তা )

৩

## শ্রীনৈমিষারণ্যক

[ প্রেমা ও প্রমা দু'টি মেয়ে বাবীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর ঘরে ফিরছে। পক্ষে এক ঘোঁড়া দেউল ; সেদিকে চেয়ে— ]

প্রেমা—বেশ ফের তবে...ক্লিওপেট্রার কথা হ'চ্ছিল কিন্তু আর এক রূপসী রাণী ইরাণের ভাগ্যক্ষেয়ীর সাথে এসেছিল নয় ?...প্রথম বাংলায়...

প্রমা—হুস্রাওয়ান...তাতে পাষণের ক্ষুধার আর এক অভিনব বিচিত্ররূপ...সে রূপের আগুন শুধু পুরুষ পতঙ্গ বলি নেয় না...ওটা তার তেমন বড় কাজও নয়। সে চায় এই 'জাহান' বা পৃথিবীটাকেই আপন 'হুস্র' বা আলোর চারধারে পতঙ্গের মত প্রদক্ষিণ করাতে...যেমন সেদিন পুরুষ হিটলার করতে চেয়েছিল...ও আগুন ছিল বড় উচ্চাশা, আর তার রোশনীতে ছিল চমৎকার রাজনৈতিক প্রতিভা...শুধু হুস্রয়ের আবেগে ও আগুন জ্বলেনি...পেছনে ছিল মেধা আর উচ্চাশার বিরাট পরিকল্পনা, প্রভাবী প্রশাসন। এ আগুন চায় দুনিয়ার শক্তি সম্পদকে নতুন করে, আপনার মতন করে ঢালাই করতে...কিন্তু তাতো হবার নয়...এ আগুন তাঁরি আগুন, এ আলো তাঁরি আলো, এ না হ'লে তো, তা হবার নয়...দুদিনের দস্তুর, মর্পের অতিকায় গড়নগুলো সঙ্গে সঙ্গে তেজে চুরে পড়বে...অতীতের যত ব্যর্থ বিনষ্টির বিচূর্ণ ধূলিরাশিতে।

প্রেমা—এ একটা টাইপ বটে। এ টাইপের দুটো খুঁজে পাওয়াও দায়। তবে, ইতিহাসে, কাব্যে সাহিত্যে হয় তো আছে...এইবার পট বদলাও...চিতোদের সেই হুস্রা...পদ্মিনী। পাঠান বাদশার ক্ষুধিত পাষণে ক্ষুধার আগুন জ্বল...কত নিরীহ বীরের রক্ত সে নিল বলি, কিন্তু পদ্মিনী! তার শুচি স্রবডি কুস্তলদামের কৈ একটাও তো সে আগুনে দগ্ধ হ'ল না, যে আগুনে তার সোপার প্রতিমা দগ্ধ হ'ল সে তো উর্ধ্ব গরিমায় চিরভাস্বর ঐ অমরার আগুন সে আগুন মাটির ক্লিষ্ট রূপ মরকেও করে ছালোকের দীপ্তউজ্জল অমর জহরব্রত...সীতার

অগ্নিপরীক্ষার সেই আগুনেরই আত্মজ...এ আগুনে সর্বশুদ্ধি...ক্ষুধালোলুপ পাষণটারও এ আগুনে শুদ্ধি! স্বৈচ্ছাবরণের চিতায় সতীর আত্মবলি...দানে। দ্য কায়ার অব টোটাল ইনার পিউরিকিকেশন...

প্রমা—আবারও তোলা বদলাও...অহল্যা পাষণী...গৌতম মুনির ভাষ্য...তরুণী তপস্বিনী...তবু তার মাঝেও কোনখানে এতটুকু অতৃপ্ত সঙ্গ কামনা হয়ত' বা লুকিয়েছিল...তাতেই হ'ল সে মুনির শাপে পাষণী...কিন্তু কী অভূত সে পাষণের মৌন মহান প্রায়শ্চিত্ত, পরম প্রতীকার ভাবমগন সমাধি। শ্রীরামের চরণধূলি, যেদিন সে তার বক্ষে পেল...সেদিন পাষণের ভেতর থেকে যে জাগল, সে তো কেবল শাপমুক্তা মানবী না...দেবী...যার নাম প্রভাতে স্মরণ করলেও সর্বপাতক যায় দূরে...তুলসীদাসজী সে পাষণীর মুখে কি অপূর্ব বিনতি না শুনিয়েছেন সেটা তুলসী রামায়ণ থেকে বার বার সঝাই প'ড়ো...‘মুন্নি যে আমায় শাপ দিয়েছিলেন, সেতো তাঁর পরম অহুগ্রহ ব'লেই মানি নৈলে স্রবনরসিক ছল'ভ তোমার ঐ রাতুল চরণকমলের পূত পরাগ স্পর্শ আমার পতিত ভাগ্যে কি হ'ত।’

প্রেমা—সত্যিই অপূর্ব! অহল্যা পাষণকে স্মরণ ক'রলে যতসব ক্ষুধিত পাষণের ভয় কেটে যায়। কিন্তু মনে একটা খটকা লাগে প্রেমা...অহল্যার ভেতরেও লুকিয়ে ছিল গৃহ কামনার কালব্যাল...পূরণ কথায়ও শুনি বড় বড় মুনিঋষি মহাত্মাদেরও উর্ধ্বলী, মেনকা...এরা টলিয়ে দিচ্ছে...

প্রমা—সঙ্গ যে কি বস্তু—তাতেই অমৃত অভয়, আবার তাতেই বিষ, মহাভয়...এই সত্যটা মরতের জীবকে ভালমতে বোঝাবার জন্তে, যারা মরতের উর্ধ্ব, তাঁরাও মরতের ভূমিকা নিয়ে অভিনয় ক'রতে নেমে আসেন সময় সময়...কেউ বা নেন কামের পার্ট, কেউ নেন ক্রোধের, যেমন, ছুরীসা দিচ্ছেন স্বামীচিন্তামগনা শকুন্তলাকে শাপ

কিংবা মহাভাগবত রাজা অশ্বরীষকে...মরতের রক্তমঞ্চে তাঁদের ঐসব অভিনয় দেখে যেন না ভাবি—‘মাগো, কি বেহায়া কামুক ওটা, ওটা কি বিষম বদরাগী, ওটা কি বেহুদ সবেলোট্ লোভী!... যিনি মন্থধঞ্জরী মহাযোগী শঙ্কর, তিনিও বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দেখে কি বিস্ত্রী নির্লজ্জের পার্টিটাই না ক’রেছেন! মর্ত্যের প্রাণীকে তার সঙ্গ সম্বন্ধে হ’সিয়ার করার জন্তে এই সব...যেমন আবার সেই পঞ্চবটীতে সোণার মায়া হরিণ দেখে রাম গেলেন তাকে ধরতে...লক্ষ্মণ গেলেন ভাইকে খুঁজতে...রাক্ষস এল গেরুয়া-পরা সাধু স্তিখারী সেজে...নীতা তাঁর গণ্ডী লঙ্ঘন ক’রে পড়লেন রাক্ষসটার কবলে...এ সবই ত’ তোমার আমার একান্ত মরমী ঘরোয়া কথা, তাঁরা অভিনয় করে দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিচ্ছেন...নয় কি? বিশেষ করে রাক্ষসের ঐ সাধুর ছদ্মবেশ। আর ঐ তিনটে গণ্ডী...

প্রমা—আর একটা কথা, প্রমা। আমরা তো আর পাষাণের সাইকোলজি নিয়ে তার ভো’ল, টাইপগুলো ভাগ ক’রে দেখাচ্ছিলুম, বলতো’ তোমার ঐ উর্বশী মেনকা কোন্ টাইপে আসবে? আমার মনে হয় অভিনয় ক’রে দেখাবারও একটা আলাদা টাইপ আছে...

প্রমা—আছেই তো কেউ ছুরজাহান না হ’য়েও ছুরজাহানের ভূমিকাটা বেশ ফলিয়ে দেখাতে পারে... আবার ওথেলোয় ইয়োগো না হয়েও ইয়োগোর পার্টিটা... শকুনি...আচ্ছা প্রমা, মীরাবাদ্দের ছবি দেখেছো?

প্রমা—দেখেছি সেদিন একখানা বইএ। মীরাকেও কি ক্ষুধিত পাষাণের থাকে টেনে আনবে নাকি?

প্রমা—হ্যাঁ, ‘ক্ষুধিত’ বটেই, কিন্তু কার, কিসের জন্ত ক্ষুধা? মীরার সেই যে ‘গহন গভীর’ আকৃতি! আর ‘পাষাণ’ও বটে সে...মরতের লালসার কোন খর ফুরান ধরেই তো তাতে আঁচড়টুকুও পড়লো। রূপ গোস্বামী তখন বড়ো হয়েছেন বৃন্দাবনে মীরা গেল তাঁর কাছে, বল ‘গৌসাই আমার দীক্ষা দাও’ গৌসাই বলেন—‘তুমি যে প্রকৃতি, নারী’। মীরা বলে—‘গৌসাই তুমি কি আজও পুরুষের অতিমান রাখ’? পুরুষতো গিরিধারীলাল একই...আর সবাই তো নারী..তারই প্রাণবল্লভার বাগাছপাভাগ্য ভিখারিনী।’ অদ্ভুত এ ক্ষুধিত পাষাণ!

এ পাষাণে মর্ত্যলোক তার ঘোঁন-আকাঙ্ক্ষা আর দৃষ্টি নিয়ে তো একটুও দাপ কাটল না।

প্রমা—আরও একটা টাইপ মনে এল তোমার কথা শুনে প্রমা। অহল্যাবাদ্দের স্বামী। অহল্যা তো রামনাম না নিয়ে জলগ্রহণ করেনা...কিন্তু রাজা ভুলেও মুখে নেননা ও নাম! অহল্যার কি দুঃখ তাতে! একদিন সকালে উঠে অহল্যার মুখে হাসি আর ধরে না.. রাজা বলেন—‘কি হ’ল তোমার অহল্যা।’ ‘অহল্যা বলে.. কাল রাতে স্বপ্নে তুমি রামনাম নিয়েছ’। রাজা বলেন ‘কি বললে অহল্যা! বিস্ ধনকো এতনে রোজ মায় দিলমে ছিপায়া রাখ্খো থা ওহি ধন আজু মেরে নিকল আয়া,.. বললে বিশ্বাস হবে না—এই বলা আর, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বেরিয়ে আসা... ‘যব প্রাণ তনুসে নিকলে, তেরা নাম মুহসে নিকলে..এতনা তো কর স্বামী।’ রাম রতনকে নারীজীবন এন্নি করা গহন গভীরে ছিপায়ে রাখল’ যে, সে কেমনধারা আশ্চর্য্য বর্ণচোরা, ভাবচোরা পাষাণ, বলত প্রমা।

প্রমা—আচ্ছা, পাষাণের কথায় যে রকম টাইপ দেখলাম, তাদের একটুখানি বাছাই ক’রে নেয়া দরকার নয় কি? ক্ষুধা তো এক রকমের নয়! পেশী ক্ষুধা আর ঐশীক্ষুধা। পেশী ক্ষুধার যেটা সহজ স্বাভাবিক রূপ, সেটাকে কাম, বিরংসা যাই বল, সেটাতো সৃষ্টিধারাব মূলে সেটাকে মাহুঘের—সমাজ, ধর্ম, নীতি কোন না কোন ছন্দের বাঁধনে আনুতে গিয়েছে, কিন্তু বাঁধতে গেলেও সব সময় সে বাঁধন মানে না, বেয়াড়া হ’য়ে যায়... হ’লে তাকে নিয়ে ষথেষ্ট বিব্রত হ’তেই হয়...ব্যক্তির জীবনে, সমষ্টির জীবনেও। সমষ্টির জীবনে ওটা বেয়াড়া হ’লে জাতির কাঠামোটাই নরম, শিথিল, নড়ব’ড়ে হয়ে যায়...সে আর সোজা, শক্ত, বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে, চলতে পারেনা... সে জাতির ইতিহাস নিশ্চয় হ’তে হ’তেই ফুরিয়েই আসে; পক্ষান্তরে, ঐ পেশী প্রবৃত্তিতে ছন্দের শাসন আর সংঘম থাকলে হয় বীৰ্য্যলাভ...

প্রমা—জাতির কিংবা ব্যক্তির জীবনে যে সবের সব চাইতে সেরা দাম, সেগুলো তো বীৰ্য্যহীনতার লভ্য নয়

‘নায়মাস্ত্রা বলহীনেন লভ্যঃ’। আর আপন আত্মাই হ’ল পরম লভ্যধন।

প্রমা—কিন্তু ছন্দের বা ধর্মের শাসন মানে, দাবিয়ে রাখা নয়...

প্রমা—ছেঁটে বাদ দেয়াও নয়...রক্তবীজকে কেটে তো শেষ করা যায় না কোনদিন...হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রের ভূয় এবাভিবর্দ্ধিতে...

প্রমা—কেননা, ও ছুটোর কোনটাতে সেটাকে আপন বশে আনা হ’লনা...

প্রমা—‘সর্বং পরবশং হৃৎং সর্বমাত্মবশং সুখম্’...

প্রমা—ওর চাইতে হৃৎং বা সুখের খাঁটি লক্ষণ আর হ’তে পারেনা...ঐ পেশী প্রবৃত্তির সদর অন্তর ছুটো দিকুই দেখে তবে তার বলাবলের হিসেব নিতে হয়। বাইরে যেটা দাউ দাউ করে জলে উঠল, সেটা যদি সঙ্গে সঙ্গেই পুড়িয়ে না মারল’, তবে হয়ত সেটাকে চেষ্টা চরিত্রের ক’রে নেবাতেও পারা যায়...যেমন হাই-টেমপারেচারের অর...কিন্তু ভেতরে তুষের মতন দিকি দিকি জলে যে আগুন...সে আগুনের অনেক সব উদ্ভট, উৎকট, বেয়াড়া বিপরিনাম...এমন কি বুড়োবয়সের যে মারাত্মক ক্ষুধিত পাষণট—দৌর্মমস্ত...তারও গোড়া বেশীরভাগে যৌবনের অসংযম...তা ভোগেই হোক কি রোধেই হোক...ব্রেণসেন্সগুলোর মধ্যে হয়ত’ বা ‘বিফোরকগুলোর’...আধিক্য, নয়ত, ‘অবরোধক’ বা ‘অবষ্টক’ গুলোর...ফলে, অস্বাভাবিক ওয়াচি’, অকারণ উত্তেজনা, অস্বাভাবিক সংশয়, কিংবা, সঙ্গীন এক ক্ষুধিত ভরসাহীন অবসাদ...যৌবনে তাক্সা রক্তে ও ছুটোই ম্যালিসিন্ট আকারও নিয়ে থাকে অনেক সময়...উৎকট নানারকমের নিউরোসিস, সাইকোসিস, এইসব। যৌবনের ক্ষুধিত রাক্সে পাষণ...‘পেশী পাগল প্যাশন’ (Passion)। এর ক্ষুধা কখনও দাউ দাউ ক’রে জলে, কখনও তুষের মত দিকি দিকি, যেন ‘থাইসিসের’ অর...ছুটোর কেউ কম নয়...

প্রমা—তুমি গোড়া ক্রয়ডিটের কথাগুলো আওড়াচ্ছ...

প্রমা—না, প্রমা। ওদেশের ফ্রেড, জুল, এড্‌লারের

দল এই স্বপ্ন সংঘর্ষ, আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা বেদনাময় জীবনের যতটা তলার স্তরে—‘বোরিং’ করে থাকুন না কেন, তাতে হয়ত ঐ ভূকম্পের বা অগ্ন্যুৎপাতের কেন্দ্র-গুলোর কিছু কিছু সঠিক সাক্ষা খবর মিলছে বটে, আর, সে খবর যারা ওপরে ঘরদোর বেঁধে বসবাস করছে, তাদের—পক্ষে দরকারীও বটে...কিন্তু জীবনের স্তরগুলো উঠে পাঠে দেখলে শুধুই কি ভূকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের কেন্দ্রই দেখব?...শুধুই কি সাবকনসাস্‌ প্যাথোলজি? রকমারি সব জলন্ত চোরা রাক্সে পাষণই মিলবে গভীর অন্তঃস্তরে? পেশীসর্বস্ব মনের, রিরংসারই, যতসব বিদ্যুটে রকমারি ভোল? আমরা যে টাইপগুলো আগে দেখলাম, তাদের কয়টা ঐ ধরণের ‘সাইকোপ্যাথোলজি’ দিয়ে বোঝা যাবে? চিত্তের পদ্মিনী, তপোবনে অহল্যা, বৃন্দাবনে মীরা। আর আর কতনা ক্লেশ-কলুষ-পাবনী ঐশী ভালবাসার দেবীপ্রতিমা, নানান দেশের, নানা যুগের পুরাকথায় খুঁজে পাই...সে সবই ঐ পেশী রিরংসার দ্রাবকে গালিয়ে নিয়ে বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সিনিকের হাসিটি হেসে বলতে হবে...ও সবার যতই উচু তারিফ কর’না কেন, ওদের মূলবস্তু এই দেখ—উষ্ণ তাক্সা রক্ততরা পেপী, দেখছ ‘তো! তাক্সা চাইতে বড় বেশী কিছুই নয়। সাবলিমেশন ইত্যাদি নাম দিয়ে পেশীকে ঐশী বলে চালাতে গেলে সত্যিই চলবে কি?

প্রমা—ছুটো আলাদা বস্তু...

প্রমা—শুধু আলাদা নয়, ঐশীটাই চাই মূলে, মর্মে, স্বরূপে, স্বভাবে...সৃষ্টিধারার অবমপর্কে নেমে এলে, সে সৃষ্টির প্রয়োজনে, বাহা শুদ্ধস্বভাব, শোভন উত্তম, তাকেও নিতে হয় অবমের ভূমিকা...তাতে সুষমও হয় অনেকস্থলে বিধম, শোভনও হয় ভীষণ, সিংহু রিরংসা রূপ নেয় বুদ্ধু জিঘাংসার ব্যক্তির জীবনে এবং সমষ্টির জীবনে...যেমন, বর্তমানে যে হিংসার উন্মত্ত পৃথী আর তার সর্বনাশা জিঘাংসা তার মূলে ঐ পেশী-সর্বস্ব, পেশী-পরবশ জীবন।

প্রমা—কিন্তু সৃষ্টিধারা তো চলবে...

প্রমা—জিঘাংসা আর ধ্বংসের পথে নয়, মৈত্রী, মিলন, অভ্যুদয়ের দিকে...

প্রমা—পেশী বাদ দিয়ে তো নয় ..

প্রমা—ঐশীর ঘেটা স্বভাব-স্বচ্ছন্দ, তার অল্পশাসনে...

প্রমা—তবু ছনিয়াটাতো ভপোবন কোনদিনই হবে না...

প্রমা—কিন্তু ভপোবনটা হবে তার জুগুপ্সা, আর নৈমিষধারণ্য যেখানে স্থিরা স্তম্ভে মহাভারত স্তনছেন, ভাগবত স্তনছেন, সেইটে হবে তার মস্তিষ্ক; হৃদয় দেবে প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনে সুষম কুশল ছন্দঃ, আর মস্তিষ্ক দেবে প্রাণের সকল সঞ্চার পথে শুচি/শুদ্ধ অভ্রাস্ত আলো...

প্রমা—মস্তো, ওয়াশিংটন এসবের পানে চাইব না ?

প্রমা—খুব চাইবো...তবে আপন হৃদয়স্পন্দনে আর আপন ঘরের আলোতে দেউলিয়া হ'য়ে নয়...সর্বং বধিৎ ব্রহ্ম...আত্মবেদং সর্বং...এই আমার আপন দৃষ্টি লোপ ক'রে চাইব না...আর, আত্মাকেও খুঁজবোনা তাক্সা গরম পেশীর ডিসেকশন রুমে...সাইকোএনালিষ্টের ক্লিনিকে...

প্রমা—এক উঁচু অবাস্তব কল্পলোকের কথা বলছ' না তুমি ? যাকে বলে একটা অবজ্ঞাকটিভ্ রিয়ালিষ্টিক এপ্রোচ, সেটা তো চাই...

প্রমা—চাই বৈ কি ! পেশীক্ষুধা নিছক বিবেরি ক্ষুধাতো নয়...ও ক্ষুধা মানুষের জীবনকে নানা শোভন সার্থকরূপেও রূপায়িত ক'রেছে ; ঐ আদিরসটাকে বাদ দিয়ে তো ইলিয়াড, রামায়ণ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা, গীতগোবিন্দ, কোমলকান্ত পদাবলী, কিছুই হ'তনা...কত কাব্য, কত শিল্প, কত কৃষ্টি এটেকে নিয়ে গজিয়ে উঠেছে সমাজধর্মের অবয়বের পরিপুষ্টি পূর্ণতা স্থায়ী স্পৃষ্ট পেশীকে বাদ দিয়ে তো হবেনা...তবু ঐশীকে ভুলে, তার বিষ-পরিণামও হ'য়েছে, হ'চ্ছে ভয়ানকভাবেই ; এ বিপরিণামগুলো অবশ্য উড়িয়ে দেবারও নয়, আবার মেনে নেবারও নয়...যেমন শরীরে নানারকমের ব্যাধি... অথবা দেশে পরাধীনতা, জীবনমানবৈষম্য, গ্লানি, ব্যাপক দুঃখকষ্ট...

প্রমা—যে বনে সাপখোপ, বাঘভালুকের ভয়, সে বনে অন্ধকারে চলতে হলে টর্চ ফেলে যতদূর পারি দেখে নিতে হয় পথের পাশে অলিগলি, ঝোঁপঝাঁপগুলো...

কিন্তু বনে চলছি বলে বনের জানোয়ারই মিছেদের হ'তে হবেনা নিশ্চয়ই...এটমিক এজের মিডিয়াইজড্ স্কাভেজ্ আর তার ইন্টারন্যাশনাল ল' অব দ্য জঙ্গল...কিংবা ম্যাস জুইসাইড্ প্যাক্ট...এসব ..

প্রমা—বাহ্য প্রকৃতির ধারা আর মানুষের সমাজ ধর্ম-নীতির ধারাতো একরকম নয়...ধর তোমার ফুলবাগিচায় কি সবজির ক্ষেতে কত যত্নে, যত সব আগাছা বেছে ফেলে, কত সার জল ঢেলে, সেটাকে তৈরী ক'রলে তুমি...সে তৈরী মাটিতে ফুলফসল ফলছেও ভাল...কিন্তু অযতনে অবহেলায় ? বাইরের প্রকৃতি আবার তার আগাছায় তোমার জমি ছেয়ে ফেলবে...তোমার ফুল, তোমার সবজি আর পাত্তা পাবেনা...তাদের আওতা... তাই না 'Pledge Me, My Master' কবিতার লাইন কটা মনে পড়ছে..., 'When you sow me as a seed ... Pledge me your care...' মনে পড়ছে তো সবটা ?

প্রমা—ওটা কি ভোলবার কবিতা, প্রমা ?

প্রমা—হেননা, কিংবা শুনে চমকেও উঠনা...রিয়ালি-জম্ মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে, বাস্তবের নয় ছবি দেখতে যেয়ে আমাদের হ্যাডিষ্ট ক্লাবে ভর্তি হ'তে হবে...ছবিগুলো তো শ্রেষ্ঠ শিল্পের সেরা নমুনা নয়...প্রায়শঃ মরবিড্ এবং প্যাথোলজিকাল...পাগলা গারদের কোন কোন স্পেশাল ওয়ার্ডের তোলা ছবি...সত্যিকার অস্ববলিষ্ট অকুসার সংস্কারে, সহজস্বচ্ছন্দ শ্রীমৌষ্ঠববোধে যা-ই লাগে...আর ঐসব ছবিরই তো ছড়াছড়ি...যেখানে যাও...

প্রমা—মনের মুকুরটা বেশীরভাগ এটে চাইছে বলে...

প্রমা—যেন কোন সস্তা হালকা নেশার ট্যাবলেট... আমেরিকার যেগুলো নাকি বিলিয়ন বিলিয়ন বিক্রী হ'চ্ছে...স্নায়ুগুলো মাতালের উদ্ভেজনা নৈলে যেন থাকতেই পারেনা...চল সিনেমায়, চল পার্টিতে, ক্লাবে... একটার পর একটা ষ্টিমিউলাস, একসাইটমেন্ট চাই-ই চাই...ব্যালাস, রিপোজ্ বলে কোন বালাই নেই যেন ...মাইক বন্ধ হ'ল কি দমই বন্ধ হ'ল...ঘরের রেডিওতে 'অব' করাই থাকবে রাতদিন...

প্রমা—সমুদ্রের ধারে স্তাটার ঢেউ কি চমৎকার



রজনী ফেনার মালা বিছিয়ে রেখে গেছে শিখিল সৈকতে  
...সে গুলোর মধ্যে বসে খুঁসিখেয়ালের রকমারি রজনী  
ঝিঝুক বুড়িয়েই যাচ্ছি...এদিকে জমাট সাজান' ঐ  
ফেনারশির ভেতরে লুকান' অকুটোপাস্ আমায় অজান্তায়  
জড়িয়ে ধরেছে কখন নাগরে জোয়ার গর্জ্জে এল - নির্মম  
উত্তাল তার আততায়ী অভিযান!

প্রমা—অন্যর ক'রে বল্লে, কিন্তু কী সর্বনাশা ভীষণ  
বলত'...কুখিত রাক্ষসের ঐ একটা খুব সাধারণ রূপ।  
নাগর্য পৃথক্স ধাওয়া ক'রতে হবেনা, তাসের, গল্পের  
আড্ডায়, পাশাপাশি ব'সে সিনেমা দেখতে গিয়ে, নাচে  
গানে, ছবি তোলায়...কত না তুচ্ছ কিসের ভেতর দিয়ে  
ঐ অজান্তায় অকুটোপাস্টা বেমালুম জড়িয়ে ধরেছে, আর  
উদ্ধাম উন্মত্ত তার ক্ষুধার অধী কুক্ষিতে টেনে নিয়ে  
যাচ্ছে...সাধারণ 'ভাইটাল্' ছেলেমেয়েদের তাই একটা  
নীতি খুব হ'শিয়ার হ'য়েই মেনে চলতে হয়—ডোন্ট  
টেন্সট্ দ্য ডেভিল...শয়তানকে প্রলুব্ধ ক'রোনা...দেখো

এটা অলিগলির আস্তাকুঁড় কুড়ানো নোংরা গল্প নয়...  
অয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিবেশন করা ছোটগল্প...সেই  
যে...একান্তে ব'সে তাস খেলছিল তারা ছুটিতে...নির্জন  
কক্ষ...মুক্ত বাতায়ন পথে ফাল্গুনের উত্তল দখিণা হাওয়া  
ঘন ঘন সদ্যফোটা যতনা মুকুলের মত্তবাস ব'য়ে আনছিল  
...আর অজান্তায় দ্বায়ুগুলোতে ঢেলে দিচ্ছিল ফেনিল  
ভরল মুহু মাধবী, জুরা..কোয়েল পাপিয়া আলসভয়া  
জুরে তখনও দু'একবার বুঝি ডাকছিল..নিশুতি রাত?  
কে জানে!..আচম্বিতে দম্কা বাতাসে ঘরের বাতিটা  
গেল নিবে...নিশীথিনী তার মাধবী শীকরসিক্ত পেলব  
পরশ অসিতাঞ্চলটি দিয়ে সবই তো ঢাকল'..কিন্তু  
আকাশের ঐ স্থিরজ্যোতি তারা..আর আঁধারেও সব  
দেখতে পার সর্বতোদৃক যে চক্ষু..? কুখিত পাবাণ  
'ম্যায় ভুখা হু' ব'লে নিল মুহূর্তে দুটি অসহায়ের অতর্কিত  
বলি..তারপর? তারপর আর শুনতে নেই..এমন কি  
অয়ং রবীন্দ্রনাথের মূখেও না..

## কালো হাত

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জীবনের দবজায় বার বার কড়া নাড়ে  
একখানি কালো হাত।  
এসে এসে ফিরে গেছে অসহু গুমটের  
ঘামঝরা কত রাত।  
তুমি আর আমি যতই না করে যাই  
সোহাগের অভিনয়:  
জানি ওরা ঐক্কে-জুকে রাখুক না যাই টুকে—  
ওরা ঠিক কবি নয়।  
একদিন আমাদের এই ঘরদোর থেকে  
ফেরাবে যে উৎখাত—  
বারে বারে কড়া নেড়ে তাই তো জানায় দেখি  
নিষ্ঠুর কালো হাত!  
ওই যে আতুর বুড়ী ঘুঁটের কবিতা গাঁথে  
দেওয়ালের ভাঙা গায়,  
বাদল দিনের শেষে পিঁপড়ের আকাশেতে  
গুড়বার পাখা পায়,—  
ওরা কি সবাই মিলে শুনেছিল ঐ ডাক,  
শুনেছেও জুঁই ফুল?

জোয়ারের উদ্ধাম নদীটারও ভাঁটাতে কি  
শোকাকুল ছুই কুল?  
পাহাড়ের চূড়া জুড়ে আলোকিত ঐ বাড়ি  
নাচঘর—নির্ধাত!  
বেহালায় ছড়টানা সেখানেও ধামাবে যে  
নিষ্ঠুর কালো হাত!  
শীতের জুপারিসৌকা মান রন্ধুরে ভাসে  
এ কিসের সঙ্কেত?  
দীর্ঘশ্বাসে ওই ভরে ওঠে লাল মাটি  
অবসিত গম ক্ষেত।  
কখন জাগবে ঝড়, হুঁসবে বর্ষাসাপ  
না জানার কেন ভান?  
বগীরা এল বলে, পাখির মতন উড়ে  
ছুটবেও এ জুফান।  
সেদিনের হুঁধোঁগে ঘেরা ছাদও ধরবে না  
সারি সারি কলাপাত,  
জীবনের দবজায় বার বার কড়া নাড়ে  
একখানি কালো হাত।

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসম্ভবগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

( পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) ॥ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ : ( জানুয়ারী—জুন ) ॥ ১৩৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দ ॥

২৮

শ্রীহিন্দুভূষণ রায়

- ৭ জানুয়ারী, ২২ পৌষ, ১৩৫৭ বঃ—শ্রীশ্রীসম্ভবগুরু ৬৯তম আবির্ভাবোৎসব। আশ্রমে উদ্বোধন, উপাসনা, ধ্যান, দীক্ষাক্ষেত্রে দীপদান, উৎসব-বাগী পাঠ। উপাসনান্তে সম্ভবগুর আশীর্বাণী। দীক্ষাক্ষেত্রে সম্ভবগুরু কর্তৃক কয়েকজন পুরুষ ও নারীকে দীক্ষাদান ও দীক্ষান্তে তাদের প্রতি অধ্যাত্ম জীবনের উপদেশ-বাগী। উদ্বোধন সম্মেলনে সম্ভাচার্য বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্যাকাব্যতীর্থ কর্তৃক স্ব-রচিত সংস্কৃত ভাষার স্তুতিমন্ত্রে গুরু-বন্দনা। শুভ আবির্ভাব দিবসে সম্ভবগুর প্রতি শুভ-বাগী ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রাতঃ ১১ ঘটিকায় পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ( গভর্নর ) ডক্টর কৈলাস নাথ কাটজুর চন্দননগর আশ্রমে আগমন ও জন-সভায় পৌরোহিত্য গ্রহণ। সম্ভব পক্ষ হইতে প্রদেশ-পালকে মানপত্র প্রদান। ডাঃ কাটজুর সম্ভব মাতৃ-মন্দির, শ্রীমন্দির, শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের কক্ষ ও অস্ত্রাশ্রয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্ভবগুরুকে মাল্যদান। সম্ভবগুর ভাষণ প্রদান। ৭ই জানুয়ারী তারিখে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী ষাদবেল্ল নাথ পাক্সার পৌরোহিত্যে উৎসব সভায় সম্ভবগুর আশীর্বাণী।
- ১০ জানুয়ারী—শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিতর্পণোদ্দেশ্যে বার্ষপূর ভারতী ভবনে শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণসভায় শ্রীঅরবিন্দের জীবন কাহিনী, যোগ ও সাধনসম্বন্ধে সম্ভবগুর ভাষণ।
- ১৫ জানুয়ারী—শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণে বালী ( হাওড়া জিলা ) কংগ্রেস কর্মীর উদ্যোগে জ্যোৎস্নাহুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীঅরবিন্দের প্রতি সম্ভবগুর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।
- ২১—জানুয়ারী—কলিকাতা ২৬ বি, নলিন সরকার ষ্ট্রীটস্থ

- ভবনে ডাঃ সম্ভাষ কুমার চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, সি, এস, কর্তৃক সম্ভবগুর টনুদিল অঙ্গোপচার।
- ৪ ফেব্রুয়ারী—সম্ভবগুর পৌরোহিত্যে সম্ভব গভর্নিং বডির অধিবেশন।
- ১১ ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্র সম্ভব বাগী পূজা। সম্ভবগুর বাগী প্রদান।
- ১৭ ফেব্রুয়ারী—কামারহাটি প্রবর্তক জুট মিলস্ লিঃ-এর প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্ভব সভাপতি ও 'যুগান্তর'-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রবর্তক সম্ভব কর্তৃক ভারতীয় সাংবাদিক-সেবী সম্ভব (Indian Journalist Association) সদস্যদের প্রীতি-সম্মেলনে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন। ৭০ জন সাংবাদিক সহ প্রায় ১৭৫ জনের সম্মেলনে যোগদান। সম্ভবগুর কর্তৃক সাংবাদিকদের অভিযর্থনা প্রসঙ্গে স্বাগত ভাষণ।
- ২১ ফেব্রুয়ারী—মাঘী-পূর্ণিমা সম্মেলন—সম্ভবগুর বাগী।
- ২৫ ফেব্রুয়ারী—সম্ভবগুর সভাপতিত্বে নিখিল প্রবর্তক সম্ভব তৃতীয় বার্ষিক ( সমিতি আইনভুক্ত হওয়ার পর ) অধিবেশন—সম্ভবগুর মর্মবাণী।
- ৪ মার্চ—সম্ভবগুর সভাপতিত্বে অষ্টাবিংশ বার্ষিক প্রবর্তক সম্ভব অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী পরামর্শ ও কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন।
- ৬ মার্চ—শিব চতুর্দশী উপলক্ষে সম্ভব উপবাসব্রত পালন, পূজা, জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান—সম্ভবগুর বাগী।
- ২৩ মার্চ—সম্ভব দোলপূর্ণিমা উৎসব ও সম্মেলনে সম্ভবগুর বাগী।
- ২৪ মার্চ—অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে সম্ভবগুর কর্তৃক আগামী উৎসবের পরিকল্পনা প্রদান।
- ২৫ মার্চ—সম্ভব গভর্নিং বডির অধিবেশনে সম্ভবগুর ভাষণ।

৩০ মার্চ—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে (Eye Infirmary) বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পি, এন্, চৌধুরী কর্তৃক সজ্জগুরুর বামচক্ষে অস্ত্রোপচার। ৫ এপ্রিল হাসপাতাল হইতে প্রত্যাবর্তন।

১৪ এপ্রিল, ১ বৈশাখ ১৩৫৮ বঃ—সন্ধ্যে নববর্ষোৎসবে সজ্জগুরুর বাণী। জ্যোতিষের দৃষ্টিতে তাঁর “বর্ষ বিচার” নিবন্ধ পাঠ ও আলোচনা। সজ্জ-স্বহৃদগণের নিকট নববর্ষের শুভবাণী প্রেরণ। (১)

কামারহাটি প্রবর্তক জুট মিলে প্রবর্তক সজ্জ কর্তৃক নববর্ষোৎসবাহুষ্ঠান। প্রাতে ধ্যান, উপাসনা, গীতাপাঠ, বর্ষবোধন—সাক্ষ্যোপাসনার পর প্রীতি-সম্মেলনে জুট মিলের কর্মিবৃন্দ ও আমন্ত্রিত শুভাভ্যায়ীদের প্রতি সজ্জের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন।

২১ এপ্রিল - পূর্ণিমা সম্মেলন—আগামী অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের সূচনা। যৌগিক-সাধন সম্বন্ধে সজ্জগুরুর বিস্তৃত আলোচনা।

২২ এপ্রিল—সজ্জগুরুর একান্ত ভক্ত ও অমুগত শিষ্য সজ্জাচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাংখ্য কাব্যতীর্থের ২০শে এপ্রিল পরলোকগমনে আশ্রমে প্রাতঃরূপাসনান্তে তাঁর স্মৃতিতর্পণ। সজ্জ-সভ্যসভ্যাগণের

(১) ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীসজ্জগুরুর শুভবাণী।

“মনের একাশে চিত্ত। অজ্ঞ অংশে বুদ্ধি—এই ত্রয়ী আশ্রয় করিয়া অহংকারের রাজ্য। মন সরল করে। চিত্তে জগৎ সংস্কার ও স্মৃতি। বুদ্ধিতে অধ্যবসায়। অহংকারের এইসব লইয়া অভিমান। মনের আত্মসমর্পণের সজ্জ চিত্তের পূর্ব সংস্কার ও স্মৃতি মুছিয়া দেয়। সমর্পণের অধ্যবসায় বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করে। ‘অভিমান’ ও ‘আমি-আমার’ বোধ ছাড়িয়া জীবাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ হয়।

সজ্জ কর আত্মসমর্পণের। গুরু—আশ্রয়। ইহাতে বার দুট বিধাস তাহারই ভাগবত বিধাস দুট হয়। গুরুকে যে ধরিয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরকে অবধারণ করার ধৃতি লাভ করে। গুরুর কর্ণে বার উৎসাহ ও সাহস, সেই ভাগবত কর্ণে উজ্জ্বল হয়। শুভ নব বর্ষে ইহাই আমার বাণী।

নববর্ষে ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা—যাধীন ভারতে বাদামী জাতি এই সঙ্কল্পে আবার তাহার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করুক। ও হরি ও।”

শ্রদ্ধা নিবেদন। শিষ্য ও সন্তান প্রতিম বিজয়কৃষ্ণের অতুলনীয় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ভক্তির কথা ব্যক্ত করিয়া সজ্জগুরু তাঁর আত্মার তৃপ্ত্যর্থ আশীর্বাদী উচ্চারণ ও উর্দ্ধগতি প্রার্থনা করেন।

২ মে—উনত্রিংশ বর্ষীয় প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—মেলা ও প্রদর্শনী। সূচনাকালে ২৩শে এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পর্যন্ত যথারীতি ভাগবৎ পাঠ ও ৫ই মে হইতে চারি দিবস মন্ত্রের পুরস্চরণ। এতদুপলক্ষে সজ্জের শ্রীমন্নিবে সমবেতোপাসনা, সাংস্কৃতিক পতাকাভোজন, নগর পরিক্রমণ, ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহপূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ। সজ্জায় দেশনেতা ডক্টর শ্রীশ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উৎসবের উদ্বোধন। জ্যোতিষ দিবসব্যাপী উৎসবের বিভিন্ন দিবসে সভাপতি ও বক্তাগণ—সুসাহিত্যিক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের পরিচালক দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ, স্থলেখিকা অন্নপূর্ণা গোস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের স্ববক্তা সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, এডভোকেট রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অপূর্বকুমার চন্দ আই, সি, এস, হরিহর শেঠ, নিখিল ভারত কংগ্রেসের বৈদেশিক সেক্রেটারী ডক্টর এন্, ভি, রাজকুমার প্রভৃতি। ২১ শে মে সমাপ্তি দিবস ও পণ্ডিত শ্রীজীব ত্রায়তীর্থের পৌরোহিত্যে পূর্ণিমা সম্মেলন। প্রভাতে সজ্জগুরুর উপস্থিতিতে আশ্রম-সংলগ্ন ভাগীরথী সলিলে সকলে মিলিয়া অবতৃৎ-স্নান। বিভিন্ন দিবসে সজ্জগুরুর বাণী। ১৯শে মে ‘চণ্ডীসজ্জ’ কর্তৃক সজ্জগুরুর রচিত “সতীহার” নাট্যাভিনয়। উৎসবের প্রদর্শনী বিভাগে সজ্জগুরুর পরিকল্পনামুযায়ী চন্দননগর প্রবর্তক সজ্জ শুভাগত মহামানব শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতি, ভারতের শাশ্বত জীবন-

বাণী ও স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারতের তথা বাংলার তথ্যময় ইতিহাস ও পরিস্থিতি, ভারত-খণ্ডের বিষয় পরিণামে উদ্ভূত জটিল সমস্যা ও নেতৃগণের তৎসমাধানচিন্তা, দুই-জাতি তত্ত্ব, কান্স্ট্রাক্টিভ, দিল্লীর চুক্তি ও পাক-ভারত বাণিজ্যে ফলাফল প্রভৃতি বিষয় যুক্তি, চিত্র এবং লিপিসহযোগে প্রদর্শিত। উৎসবের সাক্ষ্য কামনা করিয়া ভারতরাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাণী প্রেরণ। (২)

(২) ২২শ বর্ষীয় প্রবর্তক সজ্জ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবোপলক্ষে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'তার'-বাণী।

"Government House  
New Delhi, 5th May, 1951

The Prabartak Samgha has for many years been engaged in constructive work with a spiritual background. The holy Akshaya Tertiya Utsav is going to be celebrated this year as usual. India needs nothing more than constructive work amongst the people, which will contribute towards general uplift—moral,

২১ জুন, ৬ আষাঢ়—শ্রীশ্রীসজ্জজননীর ৬১তম আবির্ভাবোৎসব। তিন দিবসব্যাপী অমুঠান। এতদুপলক্ষে সমবেতোপাসনা, অষ্টোত্তর সহস্র মাতৃনাম জপ, সজ্জগুরু লিখিত বাণী পাঠ, মায়ের স্মৃতিকথা-লোচনা, সজ্জজননীর পূজা, হোম, ভোগারতি ও প্রসাদ গ্রহণ। অপরাহ্নে প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পৌরোহিত্যে উৎসব-সভা। সজ্জগুরু ভাষণ।

২২ জুন—সজ্জ-সম্পাদক কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলা দেবীসহ সজ্জগুরু বিমানযোগে চট্টগ্রাম আশ্রম পরিদর্শনে যাত্রা।

৩০ জুন—সজ্জগুরু পৌরোহিত্যে চট্টগ্রাম প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ-গৃহে অমুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় কেন্দ্রে ১০ম বার্ষিক সম্মেলনে সজ্জগুরু ভাষণ।

(ক্রমশঃ)

spiritual and economic and I wish success to every effort that is made in that direction by the Samgha.

Rajendra Prasad  
President of India "

## ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কৃতভাগ্য সিরাজ যখন মানবতার বিচারকক্ষ মাঝে,  
জায়বিচারের প্রত্যাশাতে এক-শো বছর

রায় বেরুলো—নবাব খালাস, মীরজাফরের

শত্রুতা ঘোর রাজে!—

ছিলেন অপেক্ষাতে,

বাকুল হোলাম উকিল দেখার ঘোবনোচিত ব্যগ্রবাসনাতে;

চল্ছিল খুব সওয়াল-জবাব, বিশেষভাবে সারাটা বাংলাতে,  
তথ্যপূর্ণ নজীর নিম্নে মৈত্র হাজির মিত্রস্বরূপ কাজে।

খুব সাদা চুল, বর্ণ কালো, গম্ভীরতা তাঁহার চেহারাতে,

আলাপ করার অযোগ ছিল-ই, বাইনি কাছে সন্মুখিত লাজে!

রাজসাহীর এই ব্যক্তি মহান, সত্যসন্ধ, গুণগ্রাহী লোক!

বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক, কীর্তিসম্ভ, চিরস্মরণীয়!

ঢের বারেন্দ্র কীর্তিকলাপ আবিষ্কৃত করেন পুণ্যলোক।

'কাস্তকবি' উৎসাহে ধীর হলেন শেষে কবি দেশপ্রিয় ॥

অখণ্ড দেশ খণ্ডিত হয়, বাজ্য-রাজ্য লুপ্ত হচ্ছে তবে;

অক্ষয়ের ধন ক্ষয় হবার নয়, কীর্তি তাঁহার চিরস্থায়ী রবে।

# গৌড়বঙ্গে পালরাজগণ

( ১০৭২—১১২০ )

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

মহীপাল ( ২য় ) ( ১০৭২-১০৭৫ খৃঃ )

শূরপাল ( ২য় ) ( ১০৭৫-৭৭ খৃঃ )

রামপাল ( ১০৭৭—১১২০ খৃঃ )

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল—(১) মহীপাল ২য়, (২) শূরপাল ২য়, (৩) রামপাল। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপাল রাজা হন। রাজা হইবার পর তাঁহাকে খল-স্বভাব ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল, এই রামপাল ক্ষমতাশালী, সুযোগ্য ও সর্বসম্মত, সুতরাং মহারাজের রাজ্য গ্রহণ করিবে। এই কথা শুনিয়া মহীপাল, রামপাল তাঁহাকে হত্যা করিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, যে কনিষ্ঠ রামপাল বিপদকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত সেই রামপালকে বহুতর শঠতা প্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল (রাম চরিতম্ ১।৩৭)। “সত্য ও জ্ঞানের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী অনীতিক রাজা মহীপাল, রামপাল আমার লক্ষী হরণ করিবে এইরূপ অলীক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, রামপালকে ভুগুর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন” (রামচরিতং ১।৩৬)।

মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া [ এই প্রকার ] অনীতিক কার্যে রত হইলে অনন্ত সামন্ত চক্র বিদ্রোহী হইয়া রণচতুর চতুরঙ্গ সেনাদল লইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহিত বহু সুশিক্ষিত মদমত্ত হস্তী, তুরঙ্গ, রণতরী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। ষড়্গুণশালী মন্ত্রীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ক্রতগামী সৈন্তদল হইতে কিছু সৈন্ত লইয়া মহীপাল বিদ্রোহীগণের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার সৈন্তগণ অতিশয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে অসুচ্যুত, ভীত ও মুক্তকণ্ঠল অবস্থায় পলায়ন করিল। এইরূপে বলবিপর্যায় ঘটায় তিনি কষ্টকর সময় সাগরে ডুবিয়া গেলেন (রামচরিতং ১।৩১)। যুদ্ধের সময় শূরপাল ও রামপাল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কারাগারে ছিলেন। যুদ্ধের পর দেখা গেল, রাজ্যপাল, কুমারপাল, মদনপাল ও বিস্তপাল—এই পুত্রগণসহ রামপাল মাতুল অঙ্গাধিপতি মহনদেবের আশ্রয়ে রহিয়াছেন এবং শূরপাল

রাজ্যোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ যুদ্ধের গোলযোগের সুযোগে তাঁহারা পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর [ পালরাজাদের ] জনকভূমি চাষ-বাসে অলঙ্ঘ্যতা কমনীয়া বারেন্দ্র ভূমি পালরাজলক্ষীর অংশভোগী অতিশয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ [ মিত্রের ] ছদ্মবেশধারী শত্রু দিব্যক কর্তৃক গৃহীতা হইল (রা, চ, ১।৩৭)। এইরূপে গৃহীতা ভীতা বরেন্দ্রী ক্রমান্বয়ে দিব্যক [ সম্ভবতঃ তদীয় ভ্রাতা রুদ্রক ] ও রুদ্রকের পুত্র রুদ্রপ্রহারী, কর্ণদক্ষ ভীমের রক্ষণীয়া হইল (রা, চ, ১।৩৯)। জনকভূ বরেন্দ্রী শত্রু কর্তৃক গৃহীতা ও ভুজ্যমানা হওয়ায় [ এবং সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূরপালের মৃত্যু হওয়ায় ] রামপালের নিকট তাঁহার মহামারক ভূজয় বিফল ও মাতৃবন্ধুগণকে প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রগণসহ নিজ শৌর্য মিথ্যা মনে হইতে লাগিল (রা, চ, ১।৪০)। অবশেষে তিনি অমাত্য এবং পুত্রগণসহ বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে কর্তব্য চিন্তা করিয়া রাজ্যোদ্ধারে লক্কোদ্যম হইলেন (রা, চ, ১।৪২)। অনন্তর মিত্রকল্প সামন্তগণের সাহায্য লাভার্থে তাঁহাদের রাজ্যে ভ্রমণ করতঃ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক (রা, চ ১।৪৫)। প্রত্যস্তবাসী সামন্তগণকে তিনি বিপুল ভূমি ও ধন বিতরণে অহুকুলিত করিলেন (রা, চ ১।৪৬)। প্রভু রামপালের আদেশে মাতুল মহনদেবের ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গ রাজ্যের মহাপ্রতীহার শিবরাজ স্বীয় বিখ্যাত গজ ও তুরঙ্গ সৈন্তসহ দ্রুতর “মহা-তটিনী” [ বড় গঙ্গা ] উত্তীর্ণ হইয়া বরেন্দ্রীতে পদার্পণ করিলেন (রা, চ ১।৪৭)। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বরেন্দ্রীর ভীম-ব্যূহ শিবরাজ কর্তৃক পরাজিত হইল এবং সর্বত্র ভীমের রক্ষাসমূহ ভগ্ন হইল (রা, চ ১।৪৯)। অতঃপর শিবরাজ প্রভু রামপালের নিকট বরেন্দ্রীর অবস্থা গোপনে নিবেদন করিলেন (রা, চ ১।৫০)। মাতুল অঙ্গাধিপ মহনদেব ও তাঁহার দুই পুত্র মহা-মাণ্ডলিক কাহুরদেব ও স্ববর্ণদেব ও ভ্রাতৃপুত্র মহা

প্রতীহার শিবরাজকে রামপাল তাঁহার উভয় ভ্রাতৃদ্বয়রূপে  
 গ্রাপ্ত হইলেন। কান্তকুজরাজের অশ্ববাহিনীর পরাভব-  
 কারী মগধ-পীঠিপতি [ সম্ভবতঃ দেবরক্ষিতের উত্তরা-  
 ধিকারী ] বন্দ্যনীয় ভীমশঃ, নানারত্নশোভিত ভয়ঙ্কর  
 কোটাটবীর ( উড়িষ্যার সরকার কটকের অন্তর্গত কোট  
 মহল ) দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী বীরভূষণ, উৎকলের  
 অধিরাজ কর্ণকেশরীর পরাভবকারী দণ্ডভূক্তিপতি জয়-  
 সিংহ, সম্মিহিত দিকচক্রবাল সদৃশ বালবলভীর তরঙ্গবলয়  
 স্থিত নৌবহর দ্বারা শত্রুকে গলহস্ত প্রদানে সমর্থ  
 দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, সমস্ত আরণ্য সামন্তচক্রচূড়ামণি  
 অপরমন্দার-মধুশূল [ হুগলী জেলার গড় মন্দারগ ] লক্ষ্মী-  
 শূর, করি-গর্ক-চূর্ণকারী কেশরীভূলা প্রতিপক্ষ দর্পচূর্ণকারী  
 কুজবটীপতি শূরপাল, বনবিধ্বংসী অনলবৎ পার্বত্য  
 রাজ্যাবিগণের দর্পচূর্ণকারী তিলকম্প কল্পতরু রত্নশেখর,  
 পরতর বারিধারার ছায় বৈরীবাহিনীর ঋষির দ্বারা  
 লোহিতার্ণব সৃষ্টিকারী উচ্ছালপতি ময়গল সিংহ, প্রতি-  
 পক্ষের কক্ষনিহিত সৈন্য বিমর্দনকারী দারুণগতি ও ভয়ঙ্কর  
 ঢকারবে লণ-বিভ্রংশী ঢেকরীয়রাজ প্রতাপ সিংহ,  
 কয়দিলের মণ্ডলাধিপতি নরসিংহাচ্ছুন, সঙ্কট গ্রামের  
 চণ্ডাচ্ছুন, নিজাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাধীপতি ঘোর-  
 পবর্দন ( গোবর্দন ), পদুবা ( পদ্মা পাবনা ) মণ্ডলের  
 একচ্ছত্রাধিপতি সোমপ্রমুখ সামন্তগণ রামপাল পক্ষে  
 মিলিত হইলেন। রামপাল এই মহাসৈন্যদল চালিত  
 করিতে করিতে নৈকামেলক দ্বারা “মহাবাহিনী” [ বড়গঙ্গা ]  
 উত্তীর্ণ হইয়া “উত্তর কুলং” উত্তর পারের সর্বত্র আচ্ছন্ন  
 করিলেন ( রা. চ. ২।৫-৬ )।

অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।  
 বিড়ম্বনাবশতঃ গজপৃষ্ঠাকৃৎ ভীম জীবিতাবস্থায় বলপূর্বক  
 ধৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ উৎসাহশীল রহিল  
 ( বা. চ ২।১৭-২০ )। অতঃপর ভীমের গজ-অশ্ব-মহিষ  
 ও পদাতিক সেনা পরাভূত হইলে রামপাল ভীমকে  
 নিজপুত্র বিস্তপালের নিকট প্রেরণ করিলেন ( রা. চ ২।৩৭ )।  
 ইতিমধ্যে ভীমের শক্তিশালী সহৃদ হরি অমিতবলশালী  
 ভীম সৈন্য একত্রিত করিলেন ( রা. চ ২।৩৮ )। কিন্তু  
 কাঙ্কুর দেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও মূর্ছিত হইলেন

( রা. চ ২।৪৩-৪৪ )। অতঃপর অল্পগত সামন্তগণসহ  
 ভীম রামপালের সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া মনপুত্র  
 কাঙ্কুর দেবকে সংহার করেন ( রা. চ ২।৪৬ )। [ এই  
 ঘটনার পর ] রামপাল যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার  
 সহিত যুদ্ধে ভীম পরাজিত হইয়া বধ্যভূমিতে নীত হইলেন  
 ( রা. চ ২।৪৫-৪৬ )। ভীমের সম্মুখে একে একে তাঁহার  
 পরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করা হইল ( রা. চ ২।৪৭ )।  
 কৈবর্তরাজ [ “কা-রাজ” ভীম ] কে বাণসমূহে বিদ্ধ করিয়া  
 বধ করা হইল ( রা. চ ২।৪৮ )।

বহুকালপর প্রিয়তমা বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধন করিয়া  
 রামপাল ভীমের অপরিপুষ্ট ধনরাশির অধিকারী হইলেন  
 ( রা. চ ৩।১ )। এই বরেন্দ্রী হেতুশ্বর ( ব্রহ্ম ), চণ্ডেশ্বর  
 নামক ক্ষেমেশ্বর ( শিব )। লোকেশ্বর, মহন্তারা, বিনায়ক,  
 সক্ষেত্র দ্বাদশাদিত্য, দিকপাল ও বহুগণ প্রভৃতি দেব-  
 প্রতিমা, অবিরত শাস্ত্রপাঠ-মন্ত্রিত জগদল মহাবিহার (১),  
 [ মহাস্থান গড়ের নিকটস্থ ] স্বন্দনগায়, শোণিতপুর  
 [ প্রসিদ্ধ বার্ণগড় ] ও একদিকে করতোয়া অপরদিকে  
 গঙ্গা, মধ্যে অপূর্ন বা [ পশ্চিম দিনাজপুরের বার্ণগড়ের  
 নিকটস্থ পূর্ণভবা নদী ] তীর্থ দ্বারা পবিত্রীকৃত। এই  
 অপরিমিত পুণ্যভূমি সাদ্ধবেদে বিচক্ষণ ভগবন্তক বিপ্রকুল  
 ও সম্ভজন অধিবাসীতে পূর্ণ। এং বরেন্দ্রী বিপুলতটা  
 বলভী ( বড়ল নদী ) ও কুলতরা কালী ( ঘুমুনা ) নদীর  
 উৎপত্তিস্থান, ও পলাশ ও অশোক বনে আবৃতা  
 ( রা. চ ৩।২০ )। ইহা কলকণ্ঠ-কুজনমুখর কমল-লতুচ  
 শ্রীফল-লবলী ( ডেছরা )-নাগরজা-করুন-পিরাল-কানন,  
 শ্রেষ্ঠ ধাতুক্ষেত্র, বেঙ্গবন ও ইক্ষুক্ষেত্র দ্বারা শোভিত।  
 ( রা. চ ৩।১৬-১৭ )। এখানে প্রিয়ঙ্গু ( পিপুল ), এলা  
 লতা, ধাত্ত গোলা, আদন বৃক্ষ, পুগ ( গুবাক ) ও নারিকেল  
 কুঞ্জ ( রা. চ. ৩।১৮-১৯ ), মালতী, নাগকেশর, কেশর  
 ( বকুল ), মধু ( অশোক ), পারিজাত, লবঙ্গলতা, কনক  
 ( চম্পক ), কেতক আছে ( ৩।২০-২১ )। অরবিন্দেন্দ্রীবর-  
 জুরভিশীতল সলিলময় এই স্থান ( ৩।২২ )। যেখানে

(১) কথিত আছে রামপালদেব জগদল মহাবিহার স্থাপন করেন।  
 প্রসিদ্ধ গুরুদ্বন্দ্ব হইতে ৩ মাইল দূরে জগদলা নামক গ্রামে চিরি নদীর  
 তীরে এই মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ধ্বলধাম ও লক্ষ্মীভারে অভিরাম পুরসমূহ ও কণক-কলস-মেলকার পৌর জলধরসমূহ বর্তমান (৩২৩), যাহার শিল্পকলা কুন্তলদেশের খ্যাতিকে স্মান, যাহা লাটদেশের কাঙ্ক্ষিকে আবিল, অঙ্গদেশকে বশীভূত, কর্ণাটের জ্বর দৃষ্টিকে অবনমিত। মধ্যদেশের (কান্তকূজ) ভূমিকাকে ধৃত (সীমাবদ্ধ) করিয়াছে (৩২৪), দেবী উমার পূজোৎসবে ধুমায়িতা, অখণ্ডিত রাজবংশেব ধাত্রী, অতি বিপুল উচ্চতা ও বিস্তৃতিসম্পন্ন এই বরেন্দ্রী (৩২৫)। এখানে বিশালা পুষ্করিণী, প্রিয়-গতি বৃহৎ-জলবর্ষী মেঘমালা দৃষ্ট হয়, এখানে রাজগণ আহত আর্ভগণকে উৎসব দান করে ও কটাক্ষ দ্বারা ভূমণ্ডল জয় করে (৩২৬)। অতিরিক্ত করভারে পীড়িত প্রজাগণের কর লাঘব, শত্রু কর্তৃক হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিপ্রদানজনিত কষ্ট অপনয়ন ও কৃষিকার্যের উৎকর্ষতা দ্বারা [এই রাজ্যে] রামপালের সময়] বরেন্দ্রী স্থখী হইয়াছিল (৩২৭), স্বদেশের সজ্জনগণ অচিরে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল (৩২৮); [রামপাল] পুণ্যজনের বাসভূমি, অষ্টাদশ বিবাদশূন্য, ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ দ্বারা অভয়প্রাপ্ত, উচ্চ দেবমন্দিরসমূহ সমৃদ্ধিতা, অমরাবতী তুল্য হরজধরনি মুখরিতা, অবাধ বিদ্যা ও অর্ধশালী রামাবতী নগরী নিশ্চিত করিয়াছিলেন (৩২৮-২৯) এবং তথায় হরিহর [“হরীশ”] মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও মেরু-শিখর তুল্য কনকময় প্রাসাদশ্রেণী নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩৩২)। এখানে শিল্পীগণ নিশ্চিত কাঞ্চনখচিত মন্দিরে বহু-সজ্জত অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল (৩৩২-৪০)। রাজা রামপাল তথায় অসুখিতুল্য তল ও বিশাল শৈলমালা সমৃদ্ধিত পুষ্করিণী খনন ও শৈলো-পরি পশুতগণের জন্ত তিনটি শিব মন্দির স্থাপন করিয়া-ছিলেন (৩৪২)। তিনি নাগরাজ্য (১) অধিকার করিয়া-ছিলেন (৩৪৩)। পূর্বদেশীয় (বঙ্গের) বর্ষণ নৃপতি [হারবন্দী (১০৭২-১১১২ খৃঃ)] আত্ম পরিত্রাণের জন্ত নিজ শ্রেষ্ঠ গজ ও রথ দ্বারা তাঁহাকে ক্রীত করিয়াছিলেন (৩৪৪)। তিনি পরাজিত উৎকলপতি ভবভূষণ সপ্ততি [চন্দ্র বংশীয় কেশরীরাজ কর্ণকে শবীর বংশধর স্ববর্ণ-

কেশরী (১) কে অগ্নুগ্রহ, কলিজের নিশাচর [চোড় বা চৌর]-ভীতি বিনষ্ট (২) ও সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন (৩৪৪)। [তৎপ্রেমিত সেনাপতি অমব্য সামন্ত রাজ্য] কামরূপাদি (৩) বিষয় জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন (৩৪৭)। অতঃপর [বরেন্দ্রীর] রাজ-রাজভোগ্যা অগকা সদৃশ “বিবিধ শোরবিভর” সমৃদ্ধা হরক্ষিতা রামাবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন (৩৪৮)।

বৈদ্যদেবের (কর্মোপী) শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যদেবের পিতা বোধিদেব রামপালের মন্ত্রী ছিলেন। কবি সঙ্ঘ্যাকর নন্দীব পিতা প্রজাপতি নন্দী তাঁহার সন্ধি বিগ্রহিক ছিলেন। রামপাল বিষয় সমূহের সুব্যবস্থা করিয়া পুত্র রাজ্যপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ত্রীক রামাবতী নগরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন (৪৬)। চণ্ডীমৌ মৃতিলিপি তাঁহার রাজত্বের ৪২ বৎসরে খোদিত হইয়াছিল।

যথাকালে যাতুল মহনদেব গঙ্গাজলে দেহ রক্ষা করিলেন। রামপাল সেই সময় মুঙ্গাগিরিতে (মুঙ্গের) অবস্থান করিতেছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ঐ সংবাদ শুনিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে গঙ্গাতীরে ঘাইয়া বহু ধন বিতরণ করিয়া তিনি গঙ্গায় অবগাহন করতঃ দেহত্যাগ করিলেন (৪৯-১১)।

(১) মদলাপঞ্জীর মতে চোড়গঙ্গ ১১০৫ খৃঃ কেশরী বংশীয় শেখ রাজা হুর্পকেশরীকে পরাস্ত করেন।

(২) চোলরাজ কুলোত্তম (১০৭০-১১১৮ খৃঃ) তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে (ব্রাহ্মণের লিপি—E. I, XII p. 138) কলিজ রাজ্য ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। রামপাল বোধহয় এই চোলরাজকে সংযত করিয়াছিলেন।

(৩) এই সামন্ত বা সেনাপতিই যৌবন হইয়া কসৌলী লিপির উল্লিখিত কামরূপরাজ তিম্মদেব। রামপাল বোধ হয় ইহাকেই কামরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কর্ণাটরাজ [চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য (৪ষ্ঠ)] এই সময় গৌড়দেশের প্রতি কুর দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন এবং কর্ণাটক সেনবংশ দৌড়ে ও কর্ণাটক কান্তদেব মিথিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১১০২ খৃষ্টাব্দের রাহন শাসন হইতে জানা যায় যে, কন্দলীরা গহক বালমবনপালের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র গৌড়রাজ [রামপালের] সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কামরূপে ধর্মপাল অথবা তৎপুত্র (জয়পাল) রাজত্ব করিতেছিলেন। তিম্মদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিলিমপুর প্রস্তরলিপিতে কামরূপ-রাজ জয়পালের উল্লেখ আছে।

(১) মধ্য প্রদেশের বস্তাব রাজ্যে খৃঃ একাদশ শতকে একটা নাগ বংশ রাজত্ব করিত। “নাগ বংশোদ্ভব ভোগপুত্র বরেন্দ্র”।

## বাহিত আশ্রয়

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

অবশেষে সাত দিনের কথায় মাধবীর বিবাহ হইয়া গেল।

যে-বিবাহের স্তম্ভ বিধবা জননীর চক্ষে নিভ্রা ছিল না, দাদাদের চিন্তার না ছিল অস্ত, পাড়া-প্রতিবেশীদিগের ছিল অকারণ অস্তহীন উদ্বেগ; সেই বিবাহ এত সহজে, এত অল্পে সমাধা হইয়া গেল! জননী ইন্দুমতী আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন।

প্রোফেসর-বধূ হইয়া মাধবী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিল। অপরিচিত স্বামীর সহিত বিবাহের পরদিন মাধবী যখন তাহার পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া নূতন গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল তখন আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতার অশ্রুনিষিক্ত বিদায়-অভিনন্দনে নব-বিবাহিত তরুণ পুলকেশ প্রিয়দর্শনা নবোঢ়া বধূর জন-প্রিয়তায় পুলকিত না হইয়া পারে নাই। উচ্চ শিক্ষিতা মাধবীর প্রতি অজ্ঞাতসারে তাহার সমস্ত প্রীতি, স্নেহ, মমতা উৎসারিত হইয়াছিল। মাধবীর বিবাহ হইল শিয়াখালায়—হগলী জেলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন গ্রামে। দাদা দেবকুমার চাহিয়াছিলেন তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীটিকে কলিকাতার কাছে কোন একটি সহরে বিবাহ দিতে। কিন্তু মাহুয়ের আশার সাফল্য তাহার আয়ত্তে নাই। অবশেষে অধ্যাপক পুলকেশকেই বাহিত পাত্র দেখিয়া, পল্লীগ্রামের শত অল্পবিধা না মানিয় ভগিনীকে সমর্পণ করিলেন। মাধবী সহকারকে আশ্রয় করিল।

মাধবীর জীবনের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাটিয়াছে দাদাদের, বৌদিদিদের, মাতার স্নেহচ্ছায়ায়। স্কুল, কলেজ, বাড়ী—বাড়ী হইতে কলেজ, কলেজ হইতে বাড়ী—এই ছিল তাহার গণ্ডী। সংরক্ষণশীল বাড়ীর আবহাওয়ায় সে মাহুয। মাধবীও তাই পছন্দ করিত। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যায় নাই। ছাপোষা দাদাদের আশ্রয় তাহার অজানা নয়, তাই তাহার উপর আর চাপ দেওয়া পছন্দ করে নাই।

মার্টিনের ছোট রেলের বরবধু চলিল। লাইন খুব সর। পাড়ীর গতিও স্বহর। লোকালয়ের প্রায় উঠান

দিয়া, আম-সজিনা-বেলগাছের তলা দিয়া, দোকানের পাশ দিয়া, গৃহস্থ বধুর পুকুর-ঘাটের গা ঘেঁষিয়া এই রেল-লাইন বহিয়া পরিহাস-রসিক পরিচিত আত্মীয়ের মত বাঁশী বাজাইয়া মন্ডাক্রান্তা তালে ট্রেন ছুটিল।

একখানি আপার ক্লাশ কামরায় মাধবীরা চারিটি প্রাণী। মাধবী, পুলকেশ, কমলেশ ও লক্ষ্মী। মাধবী উৎসুক নয়নে, নির্বাক আনন্দে, বিপুল উৎসাহে গাড়ীর একটি জানালার ধারে বসিয়া হাট-মাঠ-বাটের শোভা দেখিতেছিল। কোথাও এক পুকুরঘাটে এক পল্লীবধু বাসন মাজিতে-মাজিতে ঘোমটা ফাঁক করিয়া ট্রেন দেখিতেছে, কোথাও কোন বধু স্নান করিতে আসিয়া দুই হাতে সিক্ত বসন তুলিয়া ধরিয়া ট্রেন-যাত্রীর চক্ষু হইতে আপনার অনাবৃত বক্ষ আড়াল করিতেছে, কোথাও লাইন-পার্শ্বে পল্লীপথে ছোট ছোট বালক-বালিকা দ্বি-বাহির করিয়া ট্রেনযাত্রীদের লোকদিগকে ডেঙু চাইতেছে। কোথাও মাঠে ছাগলের পিঠে বসিয়া ফিড়ে পাখী লেজ হুলাইতেছে। মাধবীর ভারী ভাল লাগিতেছে। গাড়ীর দুইধায়ে সমস্ত গাছপালা যেন পিছু হাঁটিয়া ছুটিতেছে।

কি দেখছ অমন আগ্রহে? পুলকেশ জিজ্ঞাসা করে।

ভারী ভালো লাগছে, কী সুন্দর মাঠ-ঘাটগুলো! কতো গাছ, কতো ক্ষেত! এমনটি কখনও দেখিনি।

আবেগপ্রবণ মাধবীর কোন সংকোচ নাই। সে চিরকালই এমনি। আবেগ আসিলে তার নিকট পরিচিত-অপরিচিত নাই। তাহার মুখ খুলিয়া যায়।

“এখন ত শীতকাল। ধানের ক্ষেতগুলো শূন্য। শরতের ধানের ক্ষেত দেখলেত তুমি আর বাড়ী ফিরতে চাইবে না”—মন্তব্য করে পুলকেশ।

পুলকেশ অপলক নয়নে চাহিয়া থাকে মাধবীর মুখের দিকে। কী সুন্দর মাধবীর চোখদুটি! মুখখানি কী লাভণ্যে ভরা!

হঠাৎ চোখ পড়তেই মাধবী নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—

কী দেখছ অমন করে আমার মুখে?

পুলকেশ নিম্নকণ্ঠে জবাব দেয়—



মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে  
এই ইচ্ছাই সফল করো প্রাণে।

মাধবীর মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠে। দেবর কমলেশ কামরার অন্ত্রপাশে জানালার ফাঁকে চাহিয়া আনমনা বসিয়া আছে।

ট্রেন মশাট স্টেশনে আসিয়া থামিল। মশাট।—এ আবার কী নাম? তোমাদের এখানে খুব মশা বৃষ্টি? রহস্যকণ্ঠে বলে মাধবী।

আর তোমাদের সালকেতে বৃষ্টি মশা নেই!—জবাব দেয় পুলকেশ।

ট্রেন চলতে লাগল।

হঠাৎ একসময়ে মাধবীর মনে পড়িল, কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল! কত মাইল তফাৎ! তাহার মনে পড়িতেছে দাদা-বৌদিদের, বাবলু, পিকলু, ডলি, রেবাকে। সবচেয়ে মনে পড়িতেছে তাহার শমুকে। শমু যে তাহাকে ছাড়া থাকেনা। সে যখন রাত্রে পিসী-পিসী বলিয়া কানিবে! মাধবীর ছুঁচোখ ছাপাইয়া জল আসিল তাহার মা'র কথা মনে পড়িতেই। মা'কে কে দেখিবে! মা'র আর যত্ন কে করিবে! পানটি খেঁতো করিয়া কে দিবে রাত্রে খাইবার পর! একাদশীর দিন পায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কে! দিনের মধ্যে শতবার 'মাধু' 'মাধু' আর কে তাহাকে ডাকিবে!

মাধবীর গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পুলকেশ বিহ্বল হইয়া পড়ে—মাধবী কাদে কেন!

শিয়াখালার ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। পুলকেশের বাড়ী হইতে বহু ছেলেমেয়ে স্টেশনে আসিয়াছিল নব-দম্পতিকে প্রত্যাগমন করিবার আগ্রহে। একখানি রিক্সায় উঠিয়া পুলকেশের সহিত শশুরালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিল মাধবী।

শিয়াখালা হাইস্কুলের সম্মুখের পথ দিয়া, পঞ্চবটী দক্ষিণে রাখিয়া শিয়াখালার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহিমাষিতা ভগবতী উত্তর বাহিনীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া মাধবী শশুরালয়ের সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। বিপুল শঙ্করনি ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে প্রাথমিক বধূবরণের পর মাধবী পুলকেশের সহিত রিক্সা হইতে নামিয়া অন্ধরের দিকে

যাত্রা করিল। সদর ও কালীবাড়ী—দুইটি মহল পার হইয়া তৃতীয় মহল অন্দরে মাধবী পৌঁছিল। মাধবী মাঝে মাঝে ভাবী শশুরালয় সম্বন্ধে যে স্বপ্ন রচনা করিত তাহার সহিত যেন একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। সেই বিরাট সৌধ, সেই প্রশস্ত অঙ্গন, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ—ঘেরা শাস্ত্র, সমাহিত জনবিরল ভবনটি। স্ফুট কক্ষে কক্ষে জমিদারীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন, বনিয়াদী সংসারের প্রাচীন আসবাব ও সাজসজ্জার সৌষ্ঠব আর অতীতের প্রাচুর্য্যের শেষ সাক্ষ্যের একটি থম্‌থমে অভিজ্ঞাত গান্ধীর্ঘ্য। বেশ লাগে মাধবীর। একটি রোমান্টিক আবহাওয়া। মাধবীর মনে পড়ল অধ্যাপক চঞ্চল মুখোপাধ্যায়কে। রোমান্টিক আবহাওয়ার উদাহরণ দিতে তিনি প্রায়ই ভগ্নাবশেষ দুর্গ বা জমিদার বাড়ীর উল্লেখ করিতেন। তাই মাধবী রোমান্টিসিজম বুঝে, রোমান্টিক আবহাওয়া বুঝে।

মাধবীর বেশ লাগিতেছে এই পল্লীর শাস্ত্র, সিন্ধু আবহাওয়া। শহরের কোলাহল নাই, গাড়ীঘোড়ার বিরক্তিকর মুরতা নাই, কাকের কর্কশ ডাক নাই, বাতাসে ধূলা-ধোঁয়ার নিঃসারোধকারী অন্তরণ নাই। তার পরিবর্তে আছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। আছে নীলাকাশের অসীম নীলিমা, নারিকেল অশথ বকুলের স্নেহরতা, বেণু-কুঞ্জের সুরেলা অব্যক্ত উচ্ছ্বাস, টুনটুনি-দোয়েল পাগিয়া-শালিক-টিয়া-চন্দনার মিষ্ট মধুর কলকাকলী, রাত্রে রজনীর কৃষ্ণবসনে জোনাকীর স্বর্ণলিখন। বেশ লাগে মাধবীর। এর সঙ্গে শান্তুড়ী ও ননদিনীর অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রীতি। মাধবী যেমনটি চাহিয়াছিল, ঠিক তাই। বাংলাদেশের বোর্কাটকী শান্তুড়ীদের সম্বন্ধে যাহা তাহার ধারণা ছিল এ যেন তাহার বিপরীত। নিজের মা'র সহিত শ্রদ্ধামাতার কোন তফাৎ নাই। ননদিনী বাঘিনী নহে—নন্দিনী, শ্রীতিময়ী, স্নেহময়ী।

মাধবীর শয়নকক্ষের পাশেই একটি পত্রবহুল সহকারী বৃক্ষটি মুকুলিত শাখাপ্রশাখায় যেন মাধবীরও ঘরটিকে সোহাগে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। প্রভাতের সূর্যালোক পত্রাবলীর ফাঁক দিয়া আসিয়া মাধবীর ঘরখানিকে আলো-ছায়ার আলপানায় সাজাইয়া দেয়। মাধবী মুগ্ধ নয়নে

সেই আলো ঝিলমিল দেখে। সদরের সিংহদরজার মাধ্যম  
মালতি বিতান হইতে মালতির স্বাস ভাসিয়া আসে।  
আশেপাশের আশ্রিতরাজির মুকুল-গন্ধে মাধবী এক  
অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ অহুভব করে। আশ্রপল্লবের  
ঘনান্তরাল হইতে কোকিলের কুহুমনি মাধবীকে মনে  
করাইয়া দেয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই—

No bird but an invisible thing,  
A voice, a mystery.

হৃৎস্পর্শ মাধবীর আরও ভাল লাগে। পুলকেশ  
অধ্যাপনায় ও কমলেশ কলেজে কোন্ সকালে বাহির  
হইয়া যায়। শান্তডী জগন্তারিণী ও ননদিনী স্বর্ণলতা  
আহারের পর মাধবীর সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিয়া নিদ্রা  
যান। রেডিওটা খুলিয়া দিয়া মাধবী দ্বি-প্রাহরিক অহুষ্ঠান  
শোনে। রেডিওর প্রোগ্রাম শেষ হইলে মাধবী দ্বিতলের  
বাতায়নে বসিয়া থাকে। বাড়ীর পিছনে বেগুনকুণ্ডের  
মধ্য হইতে ঘুরুর কুন্ডন হৃৎস্পর্শের নীরবতাকে আরও  
ঘনাইয়া তোলে। শীতের উত্তরে বাতাস তাহার চোখে  
মুখে বুক বহিয়া যায়। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব নীরবতা,  
একটা শান্ত আনন্দ, একটি বাহিত নির্জনতা মাধবীকে  
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মাধবী যেন শহরের আবহতা  
কাটাইয়া মুক্তির নিশাস ফেলে।

মাধবীর ঘরের বাতায়ন হইতে সদরের উঠানের কুন্দ  
ফুলের স্তম্ভম গাছটিকে দেখা যায়। কী রাশি রাশি ফুল  
ফুটিয়াছে! সমস্ত গাছটি একেবারে শ্বেত অগ্নি ছাইয়া  
গিয়াছে। মাধবীর, কবিশঙ্কর 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর  
কথা মনে পড়ে: "কুন্দ ফুলের মালা গঁথে পদ্ম পাতায়  
ঢেকে এনেছি।"

মাধবী একদিন কুন্দ ফুলের মালা গঁথে পুলকেশকে  
দেবে।

পুলকেশ সন্ধ্যায় বাড়ী করে। মাধবী সামনে আসিয়া  
দাঁড়ায়। কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে তারি প্রতীক্ষায়  
বারান্দায়। ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করিতে করিতে  
প্রসাধিত মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে পুলকেশ—কেমন  
লাগছে মাধু? খুব অস্ববিধে হচ্ছে? এখানে না আছে  
ইলেকট্রিক আলো, না আছে পাখা।

—“যত সব বাজে কথা। খুব ভাল লাগছে। “কার ক্রম  
দি ম্যাডিং ক্রাউড।” কোন ব্যস্ততা নেই, কোলাহল নেই।  
বেশ মন্থর মনাক্রান্তা তালে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।  
পুলকেশ মাধবীকে সোহাগে অহুস্তরজিত করে।

বিবাহের এক মাস পরে মাধবী প্রথম শিশুর ঘর করিতে  
আসিয়াছে। আড়াই বিঘা জমির উপর বিরাট বাড়ীখানি  
তাহাকে এখন এক বিরাট শূন্যতার নিঃসঙ্গ আবহাওয়ায়  
ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বিবাহের সময় সমাগত নানা পরিজন  
আত্মীয়ের সমাবেশে বাড়ীখানি মুখর ছিল। যে-কয়দিন  
সে থাকিয়া গিয়াছে সেই কয়দিন ক্রমসংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু  
আত্মীয়দের সহিতই কাটাইয়াছে। কিন্তু এখন শুধু পাঁচটি  
প্রাণী ছাড়া আর কেহ নাই। এতবড় অট্টালিকায় পাঁচটি  
প্রাণী কোথায় হারাইয়া যায়।

মাধবীর বড় নির্জন মনে হয়। উপরে নিজের ঘরে  
শুইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে পড়ে পিতৃ-ভবনটি—  
সরব, কোলাহলমুখর, ছেলেদের ক্রীড়া-স্পন্দিত—  
সেখানে ধমকাইয়া, প্রহার করিয়া ছেলেদের চপলতা  
থামাইতে হয়। বেলা একটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া শেষ  
হয়। আবার বেলা চারিটায় চায়ের আসর। সেখানে  
মাধবীকেই চা করিয়া বৌদিদির ছেলেদের দিতে হইত।  
আর আজ একেবারে অবসর, অটল অবকাশ। বারোটার  
মধ্যেই মাধবী উপরে চলিয়া আসে। শান্তডী ও ননদিনীর  
সহিত কিছুক্ষণ সাংসারিক গল্প করে। তারপর তাহার  
ঘুমাইয়া পড়েন। মাধবীও রেডিওটা খুলিয়া দেয়। রেডিও  
শুনিতে শুনিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়ে, জানে না। যখন  
জাগে তখন তিনটা, সাড়ে তিনটা। অশ্রু পড়ে রেডিওটা  
অন্ধ করিতে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা অকারণ ব্যাটারী  
পুড়িয়া গিয়াছে। মাধবীর লজ্জার সীমা থাকে না।

ঘুম হইতে জাগিয়া মাধবী বাতায়নে বসিয়া খিড়িকির  
পুকুরের দিকে উদাস মনে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। বড়  
নির্জন, বড় নিঃসঙ্গ। তাদের ঘরের পাশের আম গাছটার  
একটি শাখা জানালার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। দমকা  
হাওয়ায় সেটি হুলিয়া উঠে। মাধবী সেই শাখার মর্ষরতায়  
চমকিয়া উঠে। সেই পারাবত-গুঞ্জন, সেই ঘুরুর কুন্ডন,

সেই বেণু বনে বাতাসের সরসরাপি—কিন্তু মাধবীর ভাল লাগে না। একটানা নির্জনতা, নীরবতা তাহার বুকে যেন চাপিয়া বসিয়া থাকে। কোন সমবয়সী মেয়ে নাই, প্রতিবেশিনী কোন শিক্ষিতা বধু নাই, যাহারা আছে তাহারা কৃষকবধু—দৈনন্দিন জীবনের নেহাৎ ঘরোয়া কথা তাহাদের সহিত কহিতে হয়। কোন মার্জিত পরিহাস তাহারা বোঝে না, তাহারা বোঝে শুধু দাম্পত্য জীবনের গ্রাম্য অশালীন হাসি-তামাসা। মাধবীর সে-সব ভাল লাগে না। মাধবীর প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। একাট ছোট ননদও যদি থাকিত!

রাত্রে পূজার দালানের পার্শ্বে কামিনী-শিউলী, সদর বাড়ীর সম্মুখে পামগাছগুলো, উঠানের লিচু গাছটাকে মনে হয় যেন অন্ধকারের বিচ্ছিন্ন স্তূপ। সমস্ত নিরুন্ম গ্রামটাকে যেন তার মনে হয় প্রেতপুরী। প্রতিবেশীর কোন গৃহে আলো জ্বলে না।

মাধবীর কলেজের সহপাঠিনী বাম্ববীয়া চিঠি দেয়। সে চিঠি পাইলে মাধবীর যেন আনন্দের সীমা থাকে না। চিঠির মাধ্যমে তবু মন উজাড় করিয়া বন্ধুর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এমনি এক বন্ধু স্মৃতির চিঠি পায় মাধবী। স্মৃতি জানিতে চাহিয়াছে কেমন তাহার লাগিতেছে নূতন জীবন, নূতন গৃহ ও পরিবেশ। মাধবী লেখে :

“তাই স্মৃতি, ঈশ্বর আছেন, যেমটি চাহিয়াছিলাম তেমনটিই পাইয়াছি। এখানকার সব ভাল, দেওর, শান্তডী, ননদ এদের আশ্রয় প্রতি প্রীতির অন্ত নাই। আর প্রোফেসরের কথা না-বললাম। কিন্তু বাড়ীখানি বড় নির্জন। আমি বড়ই নিঃসঙ্গ। তোমাদের চিঠি পেলে আমার আনন্দ দু’কূল উপছে যায়। তাই তাড়াতাড়ি চিঠি দেবে। একদিন এলে খুব খুসী হবো।”

স্মৃতি ছুটির দিন দেখে একদিন আসে। ভারী ভালো লাগে তার বাড়ীখানি, তার পরিজন, তার পরিবেশ। কিন্তু নির্জনতা তার চোখ এড়ায় না। পুলকেশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে—আপনি একটু কাজ কমান। ছুটির দিনেও ত বাড়ী থাকেন না। কোথায় সত্যি, কোথায় প্রজিকা লেখা—এই সব নিয়েই আছেন। আর মাধবী যে একা একা থেকে হাঁকিয়ে ওঠে। এতবড় বাড়ীর নিঃসঙ্গতা—

মনের মাছব চাই মনের কথা বলিবার। দেখছেন না মাধু কত রোগা হয়ে গেছে!

পুলকেশ উচ্চহাস্ত করিয়া উঠে, পরক্ষণেই মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে—সত্যিইত, মাধু রোগা হয়ে গেছে। পুলকেশ যেন নতুন ক’রে দেখল মাধবীকে। মাধুর মুখে যেন মেঘলাদিনের অহুজ্জলতা। রোজকের দেখায় এটা ধরা পড়ে না। স্মৃতি ঠিকই বলেছে।

পুলকেশ মাধবীকে বৈশাখ মাসের প্রথমেই মায়ের মত করাইয়া সালিখায় পাঠাইয়া দিবে বলিয়া স্থির করিল।

মাধবী দুই মাস হইল বাপের বাড়ী আসিয়াছে। বৈশাখে আসিয়াছে, আষাঢ় পড়িয়াছে। দিনের পর দিন একই ছন্দে কাটিয়া গিয়া দুই মাস অতীত হইয়া গেল।

ছপুর বেলাটি মাধবীকে বিশেষ করিয়া মনে করাইয়া দেয় শব্দর বাড়ীর শান্ত স্নিগ্ধ নীরবতাকে। মাধবীদের বাড়ীর পাশেই একটি লোহার ঢালাই কারখানা : আগে আগে তাদের এই কারখানার মেশিনের কঠিন, কৰ্কশ আওয়াজ কানে বাজিত না। কতদিনই ত সে এই কৰ্কশ ধ্বনির মধ্যে নিদ্রা গিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার ঘুম আসিতেছে না। লোহার মৃগুর দিয়া কয়েকটি শ্রমিক লোহার রড ভাঙিতেছে। তাহার সেই খনখনে দমাস্-দমাস্ আওয়াজ যেন মাধবীর মগজে আঘাত হানিতেছে। মাধবীর চক্ষে ঘুম আসিতেছে না। যতই তাহার ঘুম আসিতেছে না, ততই তাহার শব্দর বাড়ীর শয়ন কক্ষটির কথা মনে পড়িতেছে। অবশেষে বিরক্ত হইয়া স্বগতই বলিয়া উঠে—না বাবা, আমার শিয়াখালাই ভালো, এমন ক’রে মাখার মগজে, বুকের মধ্যে ঢেকির পাড় পড়বার স্মরণ সেখানে নেই। শান্তিতে ছপুরটা কাটে। কেউ কোথাও নেই। বেশ ছিলুম।

বড় বৌদি পাশের ঘর থেকে ছোট জ্বাক্ উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—“মালা শুনছ, মাধুর কথা। তাইত বলি, আর কি ভাল লাগে আমাদের এই সহর! এখন ভাল লাগছে পাড়ারগাঁ, তার সকাল, সন্ধ্যা, ছপুর। এখন আর সহরের গাড়ীঘোড়া ভাল লাগে না।”

পাশের ঘর থেকে মাধবী জবাব দেয়—কখনও ত আর

পাড়াগাঁয়ে থাকলে না, কী বুঝবে তার মর্ম। পাড়াগাঁ  
বলতে বোঝ শুধু মশা, মাছি, জেঁক, শুয়াপোকা,  
বেঙ, সাপ, ম্যালেরিয়া। কখনও ত দেখলে না তার শরৎ,  
সূর্য, বসন্ত। দেখলে না তার চাঁদনী রাত। পল্লীর সবুজ  
পরিবেশে পুর্ণিমার চাঁদের আলোর স্বপ্ন-মায়া।

“তা’ কবির কাছে কবি হবে বৈকি”—বড় জা’  
পুর্ণিমা জবাব দেয়।

“তা কবে যাচ্ছ মাধু?” বড় বৌদি জিজ্ঞাসা করে।

“যেদিন নিয়ে যাবে”—মাধবী জবাব দেয়।

সন্ধ্যায় ভাইপো ভাইবিরদের লইয়া মাধবী পড়াইতে  
বসে। সেদিনও বসিয়াছে। কিন্তু মাধবী একবার উঠিয়া  
যাইতে একটা পয়সা লইয়া বাবলু, পিকলু আর শমুতে এমন  
বগড়া লাগিয়া গেল যে, তাহাদের থামান দায়।  
কিলোকিলি মারামারি হইতে যখন কান্নার তুমুল  
কোলাহল উদ্ভিত হইল তখন মাধবীও জ্বালাতন হইয়া  
পাশের ঘরে গিয়া মা’র বিছানায় শুইয়া পড়িল।  
স্বগতই বলিল—না বাবা এত গোলমাল আর ভাল  
লাগে না! খালি হুড়াহুড়ি, কান্না, মারামারি, কী যেন!  
ছেলেগুলো এই ক’দিনে কী রকম যেন হয়েছে!

থামের আড়ালে অন্ধকারে বড় দাদা বসিয়াছিল,  
মাধবী তাহা দেখে নাই। বড় দাদা জবাব দিলেন—তা’  
হবেই বোন, ছেলেগুলো কি রকম হয়নি, কী রকম  
হয়েছে তুমি! তোমাকে এখন ডাকছে সেই নির্জন  
পল্লী-প্রাসাদ।

মাধবী লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল—ওমা তুমি  
এখানে, আমি ভ দেখিনি।

—দেখলে কি আর বলতে বোন? ধর্মের কল বাতাসে  
নড়ে। যাক্ কালকেই পুলকেশকে বলে পাঠাচ্ছি।

মাধবী লজ্জায় মরিয়া গিয়া জন্তপদে ঘর হইতে  
উঠিয়া আসিয়া ভাইপো ভাইবিরদের বকিয়া বকিয়া  
পড়াইতে বলিল।

শ্রাবণের এক ঝিরি ঝিরি বর্ষণমুখর অপরাহ্নে মাধবী  
কমলেশের সহিত শিয়াখালায় চলিয়া আসিল। বাড়ীতে  
প্রবেশ করিতে পূজার দালানের পার্শ্বে পত্রবহল ঘনশ্রাম  
কামিনী গাছটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে আর চোখ  
ফিরাইতে পারিল না। গাছটি ফুলে একেবারে ভাঙিয়া  
পড়িয়াছে। আর তাহার মন-কেমন-করা স্মৃতিময়র উদাস  
গন্ধে সারা বাড়ীটা মাতিয়া উঠিয়াছে। মাধবীর সর্বদেহ  
পুলকে রোমাঙ্কিত হইল।

শান্তভী ননদিকে প্রণাম করিয়া উপরে আপনার ঘরে  
গিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল পুলকেশ ডেকচেয়ারে শুইয়া  
‘শেষের কবিতা’ পড়িতেছে। মাধবী ধীরে ধীরে  
পুলকেশের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলকেশ চাহিয়া রহিল স্মিতমুখী মাধবীর দিকে। সে  
দৃষ্টি হইতে ববিয়া পড়িল শত অহুরাগ, অজস্র প্রীতি, আর  
স্নেহ। মাধবীও সহাস্ত চটুল দৃষ্টিতে পুলকেশের দিকে  
চাহিয়া রহিল। পুলকেশ আশ্তে আশ্তে আবৃত্তি করিল—  
বহুদিন হল কোন ফালগুনে ছিছ আমি তব ভরসায়

এলে তুমি ঘন বরষায়।

তারপর পুলকেশের বকে মাধবীর মুখখানি বাহিত্র  
আশ্রয় লাভ করিল।

**অজীর্ণ রোগে...**

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়ার পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

**কারিকাপেপটল**



দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

## মনীষী হেমেন্দ্রপ্রসাদ

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এট-ল

অতবড় সাহিত্যিক, অতবড় সাংবাদিক একালে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতবড় হেমেন্দ্রপ্রসাদ হয়েছিলেন। তার ভেতরের কথা খুবই কিছু আছে। তার একটু যা জানি বলবার চেষ্টা করি।

ঘসেমেন্দ্রে চাকচিক্য কিছু বাড়তে পারে। তা করিয়ে কিছু সোণা হয় না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিল জাত সোণা। সেই সোণা দেখেই চেনে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং তার কথাযোগ্য কদরও করে। তাই ভারতের বাহিরেও সাংবাদিক গোষ্ঠীর একজাই যখন হ'ল সুরেন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন তাতে হেমেন্দ্রপ্রসাদকে। যাচাই-এর মান কানায় কানায় রাখে কিছুদিন। জাত-সোণার কর্ম চেষ্টা করেও চাপা রাখতে পারা যায় না যে।

পলিটিক্সে ঝাঁক হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাল্যকাল হইতে। আমি যখন হেয়ার স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ তখন সেই স্কুলের উঁচু ক্লাসে। লেখাপড়ায় আহামরি দুজনের কারোরই ছিল না। আহামরি আমার ছিল খেলাধুলায়, আর হেমেন্দ্রপ্রসাদের ছিল ভাবুকতায়। ভাবুকতার ঠেলা তাকে করায় গল্প-পত্ন, মাথায়ুও কত কি। তখনই, দৃষ্টি যার ছিল, সে দেখেছিল, যা কিছু হেমেন্দ্র করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ সে রাখে। তাই ফুটে ফুটে দাঁড়ায় এমন যে, সাংবাদিক হেমেন্দ্র-প্রসাদের দপ্তর উত্তরোত্তর আকারে বাড়তে থাকে, এলো-মেলোভাবে নয়, দপ্তরমত গোছাল হ'য়ে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমন যে, যে যত বড় সাংবাদিকই হ'ক না কেন, ধরা প্রায় তাকে দিতে হয়েছে হেমেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা মান-এর জন্ম।

দুঃসাহসের কথা যে হেমেন্দ্রপ্রসাদের পুঁথির পর পুঁথি মোতায়েন থাকতেও কংগ্রেস ইচ্ছামত ইতিহাস রচনার প্রয়াস পায়। গায়ে পড়িয়া হাতে হাঁড়ি ভাঙিবার অভ্যাস হেমেন্দ্রপ্রসাদের ছিল না, তাই উৎসাহীদের কাটা কাণ

জোড়া লাগাইয়া রাখিবার সুযোগ ঘটে।

এই সূত্রে বক্তব্য হেমেন্দ্রপ্রসাদের সেই অমূল্য দপ্তরের তিলমাত্র ক্ষতি না ঘটে, তাহার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিব যে, সেই দপ্তরাদির উপর গভর্ণমেন্টের নেক নজর যেন না পড়ে। যদি পড়ে তাহা হইলে তাহা চুপকাম হইয়া জগাখিচুড়িতে পরিণত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সাধু সাবধান।

ইংরাজি ও বাংলা রচনাশক্তি হেমেন্দ্রপ্রসাদের ছিল সমান। তাই অবহেলে উভয় প্রকারের সংবাদ পরি-চালনায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। ইহা করিতে হইয়াছে বলিয়া সাহিত্যের আঙ্গিনায় বেশ কিছুটা মাথা গলাইতে হইয়াছে তাঁহাকে। যেখানে যা সাজে তাই দিয়া তাহা সাজাইয়াছেনও তিনি। সাজানর শুণে বাহবা পড়িয়াছে সব সময়ে। এক ডিলে দুই পাখী মারিয়াছেন তিনি। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চলিয়াছে জোর কলমে। কর, খল, ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য বা বি-এল্-এ ব্লের ধার দিয়াও তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। তাহার মনীষা বিকশিত হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রয়োজনমত তিনি হইয়াছেন নরমপন্থী, মধ্যপন্থী বা গরমপন্থী। সকল সময়েই উদ্দেশ্য এক, দেশ ও দেশের মঙ্গলসাধন।

ভুলচুক সকলেরই হয়। তাঁহারও কোথাও কোথাও হইয়াছে। ভুল ধরা পড়িলে, ক্ষেদের বশে তাহা আঁকড়াইয়া থাকার অভ্যাস তাঁহার ছিল না।

মনেপ্রাণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন স্বদেশের আদর্শে আবাসান। যাইবার কিছু পূর্বে তাহার বিশেষ পরিচয় তিনি দিয়াছেন 'সতীরাবী'র পরিচয় দানে। এই রচনাই ইহজগত ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে তাঁহার শেষ রচনা।

জাত সোণা ধোয়া গেল বাংলার। জানিনা কি করিয়া তাহার পূরণ হইবে!

# কবি ও মানুষ সজ্ঞানীকান্ত

বীরেন্দ্র মল্লিক

শরৎচন্দ্র বলেছেন, “বড় প্রেম কাছে টানে না, দূরে ঠেলে দেয়।” বড় হৃৎখণ্ড বোধহয় এই জাতের। সে হৃদয়টাকে পাষণ করে দেয়। মানুষ কিছু ভাবতে পারে না, কিছু বলতে পারে না, কিছু লিখতেও পারে না। সমস্ত অশ্রু জমে বরফ হয়ে যায়। তারপর দিন কাটতে থাকে। ধীরে ধীরে সে পাষণ দ্রব হয়। সে-অশ্রুর বরফও গলতে থাকে। তখন মনটা ভাবতে পারে একজন নেই, বলতে চায় তার সম্বন্ধে হুটো কথা, লেখবার বাসনায় আপনিই হাতখানা কলমটা তুলে নেয়।

এক বছরও সজ্ঞানীদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তবু কী স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছেন! ঘন ঘন যেতাম। আমাকে দেখেই হেসে উঠতেন। বলতেন, এসেছ, বস। গল্প করি। গল্প চলত। সাহিত্যই ছিল সে-গল্পের প্রাণকেন্দ্র। অনেক কথা, অনেক মন্তব্য, তিনি করেছেন অনেকের সম্বন্ধে। সে-গুলো প্রকাশ করা আমার অসুচিং।

শনিবারের চিঠির গ্রাহক ছিলাম। সংবাদ-সাহিত্যটাই সর্বাগ্রে পড়তাম। কখনো এমন হয়েছে, মাস কাবার, অথচ বই পাই নি। ফোন করলাম। আমি ফোন করছি শুনে নিজেই ফোনে বললেন, ইচ্ছে করেই পাঠাই নি। তোমার ওপর ভীষণ রাগ করেছি। কতদিন আস নি, আজই এসে বই নিয়ে যাও। সেদিন হাতে জরুরী একটা কাজ ছিল। কিন্তু অস্ত্রের সর্বসাক্ষী বলে উঠলেন, সবচেয়ে জরুরী-কাজ আজই এখুনিই ওখানে যাওয়া। গেলাম সেখানে। তেতলায় গিয়ে সামনের সোফায় বসলাম। বললেন, সুধা (বৌদির নাম) বীরেনের জন্মে এক কাপ চা কর। তারপর এল শনিবারের চিঠি। বললেন, সংবাদ-সাহিত্য পড়, শুনি। পড়তে লাগলাম।

এইরকম টুকরো টুকরো ইতিহাস, মাত্র দশটা মাসের। কারণ, গত বৈশাখ থেকে তার সঙ্গে বিশেষ একটা কারণে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে। এর পূর্বে আমি ত তাঁকে জানতামই। তিনিও দেখতাম আমাকে জানেন ভাল ভাবেই। গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি যখন আমার কথা আমাকেই শোনাতেন, রহস্যচ্ছলে, তখন অবাক হয়ে

যেতাম। একদিন বলেই ফেললাম, আমার এ-সব খবর পেলেন কোথা থেকে? তিনি উত্তর দেন নি, হেসেছিলেন মাত্র। একদিন বললেন, একটি ছদ্মনামে অমুক পত্রিকায় সিনেমা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তুমি আমাকে আক্রমণ করলে, কারণ আমি সেন্সার বোর্ডের সভ্য ছিলাম। সামনেই তিনি বসে। অথচ নির্মমভাবে একদা তাঁকেই আক্রমণ করেছি। মাথা নিচু করে বসে রইলাম। তিনি বললেন, বেশ ত লিখছিলে। লেখনি থায়েলে কেন? আমি তোমার সিনেমা-সমালোচনা মন দিয়েই পড়তুম। অনেক কিছু করেছি তারপর। আমি তখনো কথা বলতে পারছি না দেখে বললেন, তোমার অস্ত্রের সভ্য প্রকাশ করেছ নির্ভীকভাবে, এতে আমি ত আনন্দিতই হয়েছি। দোদগড়প্রতাপ শনিবারের চিঠির সম্পাদকই এই কথা বলতে পারেন। যিনি নির্ভীক, তিনি অপরকে নির্ভীক হতে শিক্ষা দেবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে! আবার হেসে বললেন, দেখ বীরেন, এ-যুগে নির্ভীক সমালোচনার বড় অভাব। তাই তোমার সত্যবাদীতা আমাকে মুগ্ধ করত। আমি মুখ খুললাম এবার। বললাম, ও-সব ছাই ভস্ম পড়তেন আপনি? তিনি বললেন, আমি ত পড়ি বেশি। চারদিকে যত বই দেখছ সবই পড়া। একদিন যাব, তোমারও লাইব্রেরী দেখে আসব।

অকস্মাৎ একদিন বিকেলে এসে হাজির। ঘরে স্লিপ এল। পড়ে থতমত খেয়ে গেলাম। বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে আসেন নি। ছুটলাম। কাছে গিয়ে বললাম, দাদা, একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। বললেন, তোমরা এ-যুগের ছেলে। ও-সব তোমরা করবে। আমি যাকে ভালবাসি তার বাড়ি না-বলেই চলে যাই। বললাম, যদি না থাকতুম? অগ্নানবদনে বললেন, ফিরে যেতুম। আর আমি এসে ফিরে গেছি শুনে, তুমি হয়ত কালই আসতে। হৃৎভাবে হৃৎঘণ্টা গল্প করতুম। সসন্মানে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলাম। আমার ঘরে ঢুকেই বললেন, ওদিকে নয়। চাবি আন। আলমারী-গুলো খোল। খুললাম আলমারী-গুলো। হৃৎঘণ্টা ধরে অনেক বই দেখলেন। অল্পপ্রশংসা বর্জন করাই

শ্রেষ্ট, তাই তাঁর উক্তিগুলো বাদ দিচ্ছি। যাবার সময় শুধু বললেন, বই-এর পেছনে নোট না-করলে পড়া হয় না। রেফারেন্সও সময়মত দিতে পারা যায় না। তোমাকে এ-ভাবে পড়তে শেখালে কে? উত্তরে বলে-ছিলাম, মজনীদা, ভালবাসতে কি কেউ কাউকে শেখায়? না কি মাতৃস্নেহ-সম্বন্ধে বই পড়ে' তবে সন্তানকে স্নেহ করতে শেখে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে একদিন আসবে। আমিও কিভাবে পড়ি তোমাকে দেখাব।

পরদিনই পাঁচটা নাগাদ গেলাম ঠর কাছে। লাইব্রেরী ঘরে তিনি বসে। আমাকে দেখে বললেন, কি রাজকুমার! ফোন না-করে যে! ছেলে ফোন করবে। বলবে, বাবা যাবেন অমুক সময়ে, ঠিক থাকবেন, নিচে খবর দিবে রাখবেন। হেসে বললাম। তারপরই আসতে আরম্ভ করল বই। বই আর বই। ছুটো লোক নিয়ে আসছে। তিনি দেখাচ্ছেন আমাকে। বলছেন, দেখ, সব নোট করা রয়েছে পেছনে। তাই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, এ-ভাবে পড়তে শেখালে কে? তুমি যে উত্তর দিয়েছ, তাতে তোমার দাদা হয়েও হেরে গেছি। একটা সচল বিশ্বকোষ বলে যাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর মুখে এই কথা! বললাম, কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা? বললেন, তোমার নাড়ীনক্ষত্র জানি বলেই, তোমাকে এতটা স্নেহ করি। তবে একটা কথা কি জান বীরেন, জীবনের বড় শেষ সময় এসে পড়লে। কতকগুলো কাজ বোধহয় আর করা হল না। তোমার ঘারাই হয়ত সম্ভব হত। সেদিন উনি কি বলতে চেয়েছিলেন, আজ তা না-বলাই রয়ে গেল। তবে আঁচে বুঝতে পেরেছি। চেষ্টা করব তা করবার।

একদিন গেছি। হেসে বললেন, দেখ, বাটের পর আর বাঁচা উচিত নয়। যারা বাঁচে, তারা ভাল লোক নয়। বললাম, তাহলে রবীন্দ্রনাথ? উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র। তারপর কি একটা কথা থেকে “স্বিতপ্রজ্ঞার” কথাটা উঠল। বললেন, ঐ কথাটা নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখি। প্রায় দু'শো চিঠি পাই। বললাম, চিঠি-ছাপিয়ে রাখলে ত পারতেন। উত্তরে যা তিনি বলে-

ছিলেন, সেইটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত। বলেছিলেন, আমার দৃষ্টিটা সর্বদা জানবে একশো বছর এগিয়ে গিয়ে পড়ে। বর্তমানটাকে বেশি মূল্য দিই না। তাই ছাপিনি। সেদিন বুঝেছিলাম, মজনীকান্ত কত বড় শিল্পী! গল্প করতে করতে হঠাৎ বললেন, আমার কবিতা পড়েছ? বললাম, আপনার ব্যঙ্গ কবিতা পড়েছি। বললেন, অল্প কবিতা? জবাব দিলাম, না। হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, পড়নি? তুমি বলছ? তোমার মুখে এ-কথা শোভা পায়? উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। আনলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো। ‘মানস-সরোবর’ খুলে বললেন, পড় ‘আমি’ কবিতাটি। পড়তে লাগলাম। শুরুতেই বলেছেন,

“প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি ব্যর্থতা,  
মাটির আঁধার হতে বিষবাস্প দিয়াছে উত্তর।”

...

...

...

বুহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা।  
অলচুসী চুড়া মোর নিম্নেযে করেছে ধূলিসাৎ।”

পরে আরো বলেছেন,

“দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে। ভুল-ভ্রান্তি, অলস-পতন—  
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিৎ,  
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার বারে অশ্রুজল।

...

...

...

ঘরের কপাট রুদ্ধ, বাহিরের রুদ্ধি বাতাস  
আপনাব বিষ-বাপে আচম্বিতে হাঁকাইয়া উঠি,  
মর্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,  
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধু-জনে—

বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—  
আপনি শিহরি উঠি নিজেই প্রত্যক্ষ করি

মনের মুকুরে।

এরপর জুঃখ করে বলেছেন,

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,  
মোর মুষ্টি সত্য এতো নহে—  
সে ত নহি আমি।

পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা

জাগি আমি।

একা গাহি গান।

কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—  
অর্থ তার গুপ্ত রহে জ্বর আর ছন্দের আঁধারে,  
আমি—মোর নামের আড়ালে।”

আত্মস্থলনের এমন উদাত্ত স্বীকৃতির নমুনা বাংলার কাব্যোতিহাসে বিরল। তবু সজ্ঞনীকান্ত বলেছেন,

“যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যতবার ব্যর্থ হই, বৃহতে  
বিরাটে নমস্কার।”

পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবিতার পাশেই এর স্থান নয় কি?

কবিতাটি পড়া শেষ করে তাঁর দিকে তাকালাম। চোখ ছলছল করছে তাঁর। সমস্ত মুখে তারই ছায়া। বহুকণ তিনি চূপ করে বইলেন। আর আমি? আমি দেখতে লাগলাম অল্প এক সজ্ঞনীকান্তকে, যিনি কবি, যিনি শিল্পী, সংবাদ-সাহিত্য-লেখক সজ্ঞনীকান্ত ষাঁর কাছে অনেক ছোট। ঠিক এই কথাটাই বললেন কিছুক্ষণ পর, সকলে জানে আমি শুধু সংবাদ-সাহিত্যই লিখি, আর লিখি ব্যঙ্গ কবিতা। তারপর একে একে পড়লাম, “রবীন্দ্রনাথ”, “গোপীনাথ ঙ্গেই”, “শ্রীচরণেশ্বর”, “কে জাগো?”, “মর্ত্ত হইতে বিদায়” (রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে), “বিরহ”, “স্নেহের লেখা” প্রভৃতি। সবিস্ময়ে বললাম, এত বড় ক্লাসিক কবি আপনি?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অনেক উল্লেখযোগ্য তাঁর উক্তিকে বাদ দিচ্ছি। একেবারে চলে আসছি ৩রা ফেব্রুয়ারী। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার দিন। মহাশূন্যে অষ্টগ্রহ সম্মেলন। পৃথিবীর নাকি অস্তিত্বই থাকবে না। গেলাম সেখানে। বললেন, তুমি কি এসব মান না? বললাম, না। বারো বছর মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে ফিরে এসেছি। তাই, ভয় পাই না। দেখলাম, টেবিলের ওপর সাদানো রয়েছে তাঁর বইগুলো। বললেন, তোমার জন্মে এ-গুলো রেখেছি। যদি আর দেখা না হয়? বললাম, কি যে বলেন! বললেন, তুমি কি বুঝবে কত দুশ্চিন্তায় আছি। তারপর হাটু ও ঝাড়াপ। হয়ত একহস্তা বাদ শুনবে আমি নেই। হঠাৎ বেগে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এ-সব শোনবার জন্মে আসি নি। চললুম। হেসে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আর ও-সব বলব না। কবিতা পড়া। পুরো তিন ঘণ্টা তাঁরই কবিতা তাঁকেই শুনিয়েছিলাম।

তারপর এল ১১ই ফেব্রুয়ারি। ঠিক এক হস্তা বাদই শুনলাম সেই সর্বনাশা মর্মঘাতী দুঃসংবাদ, সজ্ঞনীনা নেই। ছুটলাম গাড়ি নিয়ে তাঁর বাড়ি। অনেকে এসেছেন দেখলাম। বিদ্যুৎগতিতে উঠে গেলাম তেতালায়। দেখলাম, একটা বিরাট মহীঝর সমূলে উৎপাটিত হয়ে যেন শুয়ে রয়েছে খাটের ওপর। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় একটা চিরন্তন শিশু থাকে, যার বয়েস বাড়েনা। সেই শিশুটারই অসহায় আর্ত কান্না যেন শুনেতে পেলাম আমার মধ্যে। প্রোট আমি, তবু কিছুতেই তাকে সংযত করতে পারলাম না। বরং সেই যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। খাটের ওপর বৌদি বসেছিলেন। আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। বুঝলাম, আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। কারণ, তাঁর সামনের পৃথিবীটা তখন ঝাপসা, শুধু অন্ধকার। দ্রুত নীচে নেমে এলাম। ভাবতে লাগলাম, জ্বর অন্ধ নিয়তির এ কী পরিহাস!! সেদিন যে এই নির্মম নির্ভর সত্যটা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম!

গ্রহবিহাদের গণনা ভুল হয় নি। বাংলাদেশের ও বাংলাসাহিত্যের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল তাঁর নির্ণয় করবে আজ কে?

আমার শেষ কথা। শেষদিন তাঁকে মারাত্মক প্রশ্ন করেছিলাম, সংবাদ-সাহিত্যের সজ্ঞনীকান্ত এত বড় ক্লাসিক কবি সজ্ঞনীকান্তকে নীরব করে দিলেন কেন? ডীযণ উত্তেজিত হয়ে সেদিন বলেছিলেন, এর জন্যে দায়ী কে? তোমরা নয়? আমাকে দুমুখ তোমরাই করেছ। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা আজো পড়ি। তাই সকলের প্রশংসা করতে পারি না। বাংলাদেশকে ভালবাসি, বাঙালী জাতকে ভালবাসি, আর সবচেয়ে ভালবাসি তাঁর ভাষাকে। তাই, দুমুখ মেজেছি বীরেন, কিন্তু আসলে আমি দুমুখ নই। আমি সকলকে বড় ভালবাসি।\*

\* গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হুকাবি ডাঃ কালীকিষর সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধক সাংস্কৃতিক সাধনচক্রের সাহিত্য শাখার ১৮তম অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত।



# সংগ্রহ

সাধনসুগম গ্রন্থাবলী—স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী (পারোহিল) প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান : প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। যোগশ্রী নিকেতন, ৫৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(১) সনাতন ধর্ম ও মানবজীবন (৫ম সংস্করণ)—২৯,  
(২) শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (৪র্থ সং)—২০, (৩) শ্রীশ্রীচতুষ্টয় ও সাধন-  
রহস্য—১ম খণ্ড (২য় সং)—২৯; ২য় খণ্ড (২য় সং)—২৯; উত্তর  
খণ্ড—৩; (৪) যোগানন্দ-লহরী (৪র্থ সং)—১০; (৫) ছেলেদের দেব-  
দর্শন (২য় সং)—১০; (৬) অরুণ কীর্তনমালা (২য় সং)—১০;  
(৭) কীর্তন পদ্যসংগ্রহ (১ম খণ্ড)—১৯; (৮) অতীন্দ্রিয় দর্শন ও  
অলৌকিক রহস্য—১০; (৯) শ্রীরাধার মান ও নিমাই সন্ন্যাস (কীর্তন  
সংগ্রহ)—২য় খণ্ড—১৯; (১০) গুরু-শিষ্য সংবাদ—১৯।

ভারতের জীবন ও সাধনার ভিত্তি—সনাতন ধর্ম। এই ধর্মের আলোকে এ জাতির জীবনবেদী সংগঠন করিয়া গিয়াছেন অমর আৰ্য্য বহিঃগণ। যুগে-যুগে অবতার, বিকৃতি ও আচাৰ্য্যগণ আসিয়া এই জীবন-সাধনার ইমারৎ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর বিশাল হইতে বিশালতর এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া নির্মাণ করিয়া চলিয়াছেন। যখন কাল-ধর্ম অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন তাঁহার নূতন অমৃতবরের আলোক বিকীর্ণ করিয়া সে অন্ধকার দূর করেন—সনাতন ধর্মের সাধ্য ও সাধন-ধারা অব্যাহত রাখেন।

পারোহিল যোগাশ্রমের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও যোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ এমনই একজন সনাতন ধর্মেরই আলোক-ধারক পতাকা-বাহী—তাঁহার জীবন ও লেখনী সমুদ্র তপস্তার এই ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন প্রচারে ব্রতী হইয়াছে। লোককল্যাণ লক্ষ্যে এই ক্রমবর্ধমান সাধন সূত্রম গ্রন্থাবলীই তাঁহার অজুতম প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ।

বাহ্য অপৌরুষেয়, ত্রৈকালিক নিত্য সত্য, তাহাই সনাতন ধর্ম। তাই হুবিজ গ্রন্থকার “হিন্দুধর্ম” বা বলিয়া তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানির নাম ও আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন “সনাতন ধর্ম ও মানব জীবন”। সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ব্যাক্রমে মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ। বমনিরমাদি পালনে চতুরাশ্রম-সিদ্ধ জীবনে মনুষ্যত্ব হুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্বই দেবত্ব। দেবত্বের সাধন—শুদ্ধভক্তি। আত্মকৃপা, ঈশ্বর কৃপা, গুরু কৃপার শুদ্ধ-ভক্তি মিলে। দেবত্বের পরিণতি—ঈশ্বরত্ব। জীব অষ্টপাশ মুক্ত হইয়া শিবকল্প হয়। আবার সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের পরম পূর্ণতাই ব্রহ্মত্ব। জ্ঞানের সপ্তভূমিকার শেষ সীমাই এই ব্রহ্মত্ব। তত্ত্ব ও সাধনশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার প্রথম গ্রন্থে সরল ভাষায় ও হৃদয়তরঙ্গের সজ্জিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—মহামানব কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতময়ী জীবনকথা। লেখক শ্রীকৃষ্ণের যুবাবন-লীলা, যুগ্ম-লীলা, দ্বাদশ-লীলা ও কুরুক্ষেত্র-লীলার নিগূঢ়-সত্ত্ব-ক্রমে ত্রয়ো-কারণ-মূল্যবাহার প্রকাশিত,

শুদ্ধীকৃত ও বিবর্তিত একটি মহাজীবন বিকাশের ধারা দর্শন করিয়াছেন ও তাহারই বিশ্লেষণক্রমে জীবাস্ত্রারও উদ্ভাবনোপায়ের দিশদর্শন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ইহা অভিনব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাখ্যান-প্রয়াস। তাঁহার আলোচনা আগাগোড়া তথ্যনিষ্ঠ ও ভাবব্যঞ্জনাগুণী।

শ্রীশ্রীচতুষ্টয় ও সাধনরহস্য—ত্রিধণ্ডে প্রকাশিত

বিরাট, সাধনগ্রন্থ। লেখকের অমুপ্রেরণালব্ধ এই মৌলিক রচনা তত্ত্ব-সাধকসমাজের নিগূঢ় অধ্যাত্ম দৃষ্টির উন্মোচনে সহায়তা করিবে। শক্তি-সাধনার ইহা আত্মবিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বপ্রকাশ—প্রত্যেক বাঙালীই ইহা পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীচতুষ্টয় গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিলে বৃনপং আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

স্বামীজি মহারাজ সাধক এবং স্তম্ভাকও। তাঁহার ভাবগম্যতার স্বরচিত সঙ্গীত তাঁর স্বকণ্ঠে যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই বিশিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছেন। কি গুরুসঙ্গীত, কি ব্রহ্মসঙ্গীত, কি কৃষ্ণসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত, গৌরসঙ্গীত বা নাত্য-সঙ্গীত—প্রত্যেকটিই ভাববৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ।

“যোগানন্দ লহরী” ও “জয়গুরু কীর্তনমালা” :

উপাসকের ভাবপূর্ণ গানের সমষ্টি। “কীর্তন পদ-সংগ্রহাবলী”

১ম খণ্ডে ও বিশেষভাবে ২য় খণ্ডে (শ্রীরাধার মান ও নিমাই সন্ন্যাস)। নাটকমূলে কীর্তন সঙ্গীতের পরিবেশন করা হইয়াছে। এ সকলই সঙ্গীতমুগ্ধগণ ভক্তজনের আবাছ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

“ছেলেদের দেবদর্শন”—কবিতার দেবদেবীর পরিচয় ও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। বালকবালিকাদের পক্ষে কিছু গুরু-পাক হইলেও, চেষ্টা শুভময়ী।

গুরু-শিষ্য সংবাদ—তত্ত্ব বিচারের উৎকৃষ্ট সমগ্রন্থ।

ইহাতে গুরু ও শিষ্য-জ্ঞানবাহী ও জ্ঞানগ্রহীতার প্রয়োজনীয় নানা আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার উত্থাপন ও সমাধান করার সাধু চেষ্টা। ধর্মমূলক বহু জিজ্ঞাসার শঙ্করসম্মত স্বামীমাসার সন্ধান ইহাতে মিলিবে।

“অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অলৌকিক রহস্য” :

গ্রন্থখানি স্বামী যোগানন্দ মহারাজের বিদ্যুতী কল্পা শ্রীমতী ব্রহ্মলতা মল্লমবার চৌধুরী নিজ আগ্রহে প্রকাশ করিয়াছেন—( তাঁর পিতৃদেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ) এইগ্রন্থ তিনি আমাদের ধন্যবাদার্থ। স্বামীজীর নিজের অধ্যাত্ম জীবনে উপলব্ধ অতীন্দ্রিয় দর্শন অথবা তাঁর ভক্তসমগণের মধ্যে অভিব্যক্ত অলৌকিক ঘটনার মধ্যে যে দিব্য শক্তি ও রহস্যের প্রকাশ, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য সাধনজীবনে অগ্রসর নব-সারী উপলব্ধি করিলে শ্রীভগবানের অগার করুণার স্পর্শই নিজেরা পাইবেন বা উহা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইবে। ঘটনাজলি অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বলা হইলেও, তাই বলিয়া তাহা অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না। অধ্যাত্ম-জগতের হৃদয়তর বিধান—বাহ্য এক্ষণে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বা চেতনার অপরিস্ফুট—তাহাই উপযুক্ত কালে পরিস্ফুট ও প্রকট হইয়া ছুটিয়া উঠিয়া চিহ্নিত সাধক-সাধিকাকে সাধন পথে সমধিক আগাইয়া ধিতে পারে। তাই এই পঞ্চদ্বিগুণের নিদর্শন রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। আমরা এই সত্যকাহিনীগুলি পাঠ করিয়া স্বামী মহারাজের অন্তর্জীবনেরই নিত্য কল্পে কিংবা প্রবেশাধিকারলাভে ধন্য হইলাম।

“সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী” বাংলা সাহিত্যে যে ভাব-সম্প্রদায়িক বহিঃকার জগৎ সূচিত হইয়াছে, যথাবোধ্য প্রচারে ও সমাধানে তাহা উত্তমোত্তম সাংকল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

# সম্মানসূচক

সজ্জনীকান্ত দাস :

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক সজ্জনীকান্ত দাসের আকস্মিক লোকান্তর-গমনের সংবাদ সত্যিই বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শক। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই সজ্জনীকান্তের মৃত্যুসংবাদ আমাদের বিহ্বল বিমূঢ় করিয়াছে। দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, যে-সময়ে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের সমুন্নয়নের জন্ত সজ্জনীকান্তের সঙ্গাগ সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, সেই সময়েই তাঁর জীবনের আলো নিভিল। জাপানে মার্শাল স্ত্রত মুখার্জির অপমৃত্যু হইতে স্বল্প করিয়া এ পর্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যে বাংলায় জীবন-বিকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিরামহীন একের পর এক মনীষী ও অভিজ্ঞের লোকান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে, যার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। অকালে এই অনভিপ্রেত মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইতেছে তা রাতারাতি পূর্ণ হইবার নয়—পরন্তু সেই পূরণ সাধনা ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকা সম্পর্কিত বলিয়া এষ্ট মরণ শোভাযাত্রায় সজ্জনীকান্তের অকাল অন্তগমন আমাদের বিশেষ ব্যথিত করিয়াছে।

সজ্জনীকান্তের মৃত্যুতে 'বাংলা সাহিত্যের অন্ততম দিকপালের অন্তর্ধান হইল' বলিয়া প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, 'বঙ্গসাহিত্যাকাশে ইন্দ্রপাত হইল'। 'এ যুগের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সজ্জনীকান্ত ছিলেন সব্যসাচী'—এমন মন্তব্যও কেহ কেহ করিয়াছেন। সজ্জনীকান্ত সম্পর্কে এ সব উক্তি উচ্ছ্বাস নহে—বাহুল্যও নহে, ইহা বিনা বিতর্কে বলা চলে। নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র-কর্মী পুরুষ ছিলেন সজ্জনীকান্ত। কবি, কথাশিল্পী, গবেষক, বাকপটু পরিচালক রসিক ছিলেন তিনি। সর্বোপরি সজ্জনীকান্ত ছিলেন অকৃত্রিম স্বরধার সমালোচক। সমালোচনায় সজ্জনীকান্ত ছিলেন নির্মম, কিন্তু ব্যক্তিগত-

ভাবে নিষ্ঠুর ছিলেন না। ভালমাহুষ সাজিবার লোভে চাটুকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর ধাতুতে ছিল না। না ছিল অপ্রিয় সত্য প্রকাশের কোনরূপ কুণী, দ্বিধা-সন্দেহ। প্রয়োজন মত পরিচিত-অপরিচিত, প্রজ্ঞেয়-সম্মানীয় নির্বিশেষের প্রতি তিনি বিজ্ঞপবাণ বর্ষণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে মাত্রাও ছাড়াইয়াছেন। সাহিত্য-জীবনে তাই সুখ্যাতি-কুখ্যাতি দুই-ই তাঁকে কুড়াইতে হইয়াছে।

'প্রবর্তক'-এর সহিত তাঁর সম্পর্ক একদা অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১৫) ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক পত্রিকা 'প্রবর্তক'-এর প্রতিষ্ঠা। সম্ভবতঃ এ শতকের তৃতীয় দশকে 'শনিবারের চিঠি'র আবির্ভাব। এই সময়েই 'কল্লোল' 'কালিকলম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল ইংরেজী শিক্ষিত উগ্র প্রগতিপন্থী উদীয়মান সাহিত্যিক-গোষ্ঠির কল-কলরোলে বাংলার সাহিত্য-আসর সরগরম হইয়া উঠে। এই বিভ্রান্ত প্রাণচঞ্চল নবীন কবি-সাহিত্যিকদের সাম্যবাদের স্বপ্ন ও ফ্রেডের মনস্তত্ত্বের বদহজমের চূর্ণক বাংলার রক্ষণশীল সমাজমানসকে সচকিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলে। 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে শনিচক্রের সাহিত্যিক গোষ্ঠি, বিশেষভাবে সজ্জনীকান্ত কঠিন-কঠোর ক্ষমাহীন সমালোচক-রূপে এই নবীন সাহিত্য-সাধকদের জৈবী আতিশয্যের বিরুদ্ধে কথিয়া দাঁড়ান। শীঘ্রই 'কল্লোল'-এর কলরব থামিয়া যায়। 'কালিকলম'-এর কালীও শুকাইয়া আসে। কাল-ধর্ম্মে এই নবীন লেখকদের যৌবনের উন্মাদনাও থিতাইয়া আসে। সে-দিনের এই অপাংক্তেয় ছিন্ন-ভিন্ন কবি-সাহিত্যসেবীদের সেবা গ্রহণ করিবার সাহস তখনকার কালের মুষ্টিমেয় যে ক'খানি সাহিত্য পত্রিকা ছিল তাদের হয়নি। 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ'-এরও নয়। প্রবর্তক কিন্তু এই সৃষ্টিধর্ম্মী শক্তিধর লেখকদের পরম সমাকরে কোলে তুলিয়া লয় এবং লওয়াটা যে তুল হয়নি তা তাঁদের আজকের সুপরিণতিই সাক্ষ্য দিবে। 'কল্লোল'-এর অচিন্ত্যকুমার, আর পরমপুরুষের অচিন্ত্যকুমার—সেদিন অচিন্ত্যনীয়ই ছিল। আজকের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রেমন আর সে-যুগের প্রেমনের পার্থক্য অপরিমেয়। এই সময়েই শনিবারের চিঠির অত্যাগ্র আক্রোশ গিয়া

পড়ে প্রবর্তকের উপর। উভয় পত্রিকার মধ্যে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের যে ঝড় বহিয়া যায় তার সাক্ষ্য সে-যুগের পত্রিকাষয়ের পৃষ্ঠা আজও বহন করিয়া চলিয়াছে।

তথাপি ব্যক্তিগত সম্পর্কে সপ্রেম মৌহান্দের কোনদিন অভাব হয়নি। সজ্ঞনীকান্তের বন্ধুবাংসল্য ছিল বিশ্বদ্রকর। সমালোচক সজ্ঞনীকান্তের আড়ালে মাহুস সজ্ঞনীকান্ত ছিল সংগোপিত। যারা এই ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সামিকট্য লাভের সৌভাগ্য-সুযোগ লাভ করিয়াছিল তারাই তাঁর মাধুর্য্য মহিমায় পরিপ্লুত হইয়াছে। চলমান নাম-রূপময় জীবনের দাপটে সত্যকার মাহুসের পরিচরটি প্রায়শই ঢাকা পড়ে, মৃত্যু এই আবরণটি সরাইয়া স্বরূপ সত্তাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। অনতিদূর অনাগতে সজ্ঞনীকান্তের সম্যক সত্য পরিচয় পাইয়া বাঙালী বুঝিবে সে কি হারাইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছিলাম তাঁর জীবিতকালেই এবং বুঝিয়া মুগ্ধ ও প্রভাষিত হইয়াছিলাম। প্রবর্তক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সজ্ঞগুরু বিদেহী হইলে তাঁরই স্মৃতি-সংখ্যা প্রবর্তকে সজ্ঞনীবাবু একটি কবিতায় স্মৃতি-অর্থ্য দিয়াছিলেন। সর্বাস্তঃকরণের প্রভাষপনে কবিতাটি ছিল অল্পময়। প্রবর্তক-সজ্ঞ ও সজ্ঞগুরুর সপ্রভ মর্ম্ম-পরিচয় এমন অল্প কথায় দেওয়ার শিল্পশৈলীর তুলনা মিলে কমই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, সজ্ঞগুরুর গীতা ও বেদাস্তদর্শন বাংলার সাহিত্য ও ভাবনার জগতে নূতন স্রষ্টি। কতবার তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, এই একখানি গ্রন্থই (গীতার জীবনভাষ্য) তাঁকে অমর করিয়া রাখিবে। গবেষক হিসাবে পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নেশা ছিল সজ্ঞনীকান্তের। মৃত্যুর দিন কুড়িক আগের একটি ঘটনা। একদিন, খুব সম্ভব ২২-এ জাহ্নুমারী, হঠাৎ আদিয়া উপস্থিত। হাবভাবে মনে হইল কি যেন সর্বনাশ ঘটয়া গিয়াছে। বলিলাম, অপ্রত্যাশিত আগমন—কি ব্যাপার? বলিলেন, বাড়ী চূর্ণকাম করিতে অনেকগুলি গ্রন্থ হারানো গিয়াছে। তার মধ্যে সজ্ঞগুরুর বেদাস্তদর্শন ও গীতাও ছিল। সজ্ঞ প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড ও প্রথম খণ্ড গীতা দিলাম। বেদাস্তদর্শন পাঠাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। তারপর সজ্ঞের মুখপত্র নবসজ্ঞ পত্রিকার বিশেষ সজ্ঞগুরু-সংখ্যা একখানি দিলাম। পত্রিকায় তাঁর সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রবর্তকের

স্মৃতি-সংখ্যা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। খুব খুশী হইলেন। বলিলেন, ‘কবিতাটি তাহলে আপনাদের ভাল লেগেছে?’ পুনশ্চ অহরোধ করিলাম ২৪-এ জাহ্নুমারী সজ্ঞগুরুর স্মৃতি সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত। বলিলেন, ‘নিশ্চয়ই আসতাম, কিন্তু আগামী কল্যাই শান্তিনিকেতনে রওনা হয়ে যাচ্ছি। কবিশ্রুর সঙ্ক্ষে বক্তৃতা দিতে হবে।’ প্রসঙ্গক্রমে তাঁর গ্রন্থাগারের কথা উঠিল। বলিলাম, ‘জীবন-মরণের কথা কিছু বলা যায় না। সময় থাকিতে সাহিত্য পরিষদ অথবা জ্ঞানলাল লাইব্রেরীতে দান করিয়া এই অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। উত্তরাধিকারী ইহার মূল্য ও মর্যাদা প্রায়ই দিতে পারে না।’ অনেকটা স্বগতভাবেই সজ্ঞনীবাবু বলিলেন, ‘একটা সুব্যবস্থার কথা আগিও ভাবছি।’ তারপর উঠিলেন। বলিলাম, ‘চা আনিয়ে দি’। বলিলেন, ‘সুনীতিবাবুর ওখানেই হবে—পরিষদের মিটিং আছে।’

সজ্ঞনীবাবুর সঙ্গে এই শেষ দেখা। শেষ আলাপও। তাঁর ব্যক্তিগত মাধুর্য্যের ছোঁয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের অকপট প্রভাষ কারণ অজ্ঞ—যে হেতুটির জন্ত তিনি সারা বাঙালীরই কৃতজ্ঞতা, প্রভা ও সম্মানের পাত্র। সজ্ঞনীবাবু ছিলেন খাটি বাঙালী—মরমী বাংলার উত্তরাধিকারী। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালীজাতির শ্রীবৃদ্ধিই ছিল তাঁর কাম্য—জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য। অথচ বাংলা ও বাঙালী-জাতীয়তার স্বপ্রবিভোর ছিলেন তিনি। উনিশ শতকের বাঙালীর ধ্যান-ধারণার অমিশ্র অধিকার লইয়া তাঁর জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যু। সমালোচক সজ্ঞনীকান্তের সমালোচনা সমসাময়িক কালে যত তীব্র ও মর্ম্মপীড়াদায়কই হইয়া থাকুক না কেন, তা বাঙালীর কল্যাণ ও অভ্যুত্থানের একাগ্র লক্ষ্যেই পরিচালিত হইয়াছিল। বাঙালীর সাংস্কৃতিক অন্দের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে অতঃপ্রহারী গুরু দায়ীত্ব তিনি আমৃত্যু পালন করিয়া গিয়াছেন। সমাজপতি, মোহিতলাল, সজ্ঞনীকান্ত বাঙালীর মর্ম্ম-প্রবাহের একই ধারা। সজ্ঞনীকান্তের পরলোকগমনে এই প্রবাহের যে গতিবিরতি হইল তাহাই ভাবনার ও বেদনার।

### হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ হৃদরোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিণত ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁর লোকান্তর অপ্রত্যাশিত বা শোকের না হইলেও, বাঙালীর বিশ্বস্ততার হেতু এই যে, বাংলা ও বাঙালীর কথা তাঁর মত স্ব-নিষ্ঠ দরদ দিয়া আর বলিবার তেমন বলিষ্ঠ মানুষ রহিল না। ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর দুর্ভাগ্য। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাংবাদিকতার অসামান্যতা সর্বজনস্বীকৃত। বিগত অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে নিখিল ভারতে নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ তো দূরের কথা, নিকটবর্তী হইবার মত যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকও খুবই কম ছিলেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রায় সর্ব বিভাগই হেমেন্দ্রপ্রসাদের দান-সমৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও পরিচিতি সাংবাদিক হিসাবেই। সর্বাভিমুখী পাণ্ডিত্যে, অনমনীয় সত্যনিষ্ঠায়, অনাপোষী মনোভাবে, নির্ভীক সমালোচনায়, অপ্রিয় সত্যের অকুণ্ঠ অভিব্যক্তিতে তাঁর তুলনা তিনিই ছিলেন। স্ব-স্বাভাব্য ও প্রতিভায় তিনি ছিলেন অনন্তসাধারণ। সংবাদ-স্বত্তিতে তিনি ছিলেন সচল ‘বিশ্বকোষ’ এবং সংবাদ ও তথ্য সংগ্রাহক হিসাবে ছিলেন অল্পপম। তাঁর সংগ্রহশালার বিপুলতাও তেমনি বিন্ময়কর। এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেশাত্মবোধসম্পন্ন সাংবাদিক বর্তমানের পেশাগত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জন্মানো সম্ভবপর নহে। জন্মগত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ সুস্থ দেহ-মনে আমৃত্যু সাংবাদিকতারই সেবা করিয়া গিয়াছেন। মতবাদে তিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী, স্বভাবে ছিলেন খাটি বাঙালী—বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-মেতাজীর ঐতিহ্য-বাহী। মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগকে যেমন তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই, তেমনি গণতন্ত্রী মার্ক্স সমাজ-তত্ত্ববাদকেও আমল দেন নাই। বাংলার স্বদেশী যুগের ধ্যান-ধারণা কল্পিত পূর্ণ জীবন, ব্যক্তি ও সমষ্টির, হেমেন্দ্র-প্রসাদের রাষ্ট্র ও সমাজ সাধনার ছিল আদর্শ। অথও

ভারত—চিন্ময় ভারতবর্ষের তিনি ছিলেন পূজারী। খণ্ডিত ভারত—বিচ্ছিন্ন বাংলার ব্যথার অভিব্যক্তি তাঁর লেখন্য ও রচনায় বরাবরই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর ধ্যান ও মনীষার এবং বর্তমান শতকের প্রারম্ভিক দুই দশকের জ্ঞান, শ্রেম ও শক্তিসাধনার লীলাভূমি বাংলার ঐতিহ্য ও স্মৃতিবাহী পিতামহ ভীষ্মভূত্য হেমেন্দ্রপ্রসাদের পরলোকগমনে বাঙালীর মাথার উপর হইতে বৃহৎ বনশ্রুতির অভয়-ছায়া অপসারিত হইল, ইহাই ভাবিয়া আমরা আকুল হইতেছি। ভূনতশির হইয়া এই মহানের বিদেহী আশ্রয় উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম জানাই।

### মহামহোপাধ্যায় হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ :

বিলম্বিত হইলেও, স্বনামধন্য পণ্ডিত হরিন্দাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ সম্পর্কে আমাদের সম্পাদকীয় বিচ্যুতির এখানে সংশোধন করিতেছি। সর্বজন প্রচেষ্টা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের লোকান্তরগমনের (২৬-এ ডিসেম্বর ১৯৬১) সঙ্গে ভারতবর্ষ এমন একজন সত্যকার সংস্কৃতিনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী হারাইল যার স্থান অপরিপূরণীয়ই বলা চলে। পরিণত ৮৬ বৎসর বয়সে (জন্ম ১৮৭৬, ফরিদপুর-কোটালিপাড়া) তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধন-জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটে। ‘মহামহোপাধ্যায়’, ‘পদ্মভূষণ’ ‘রবীন্দ্র-পুরস্কার’রূপ বিশিষ্ট সরকারী সম্মান ও স্বীকৃতির সৌভাগ্য তাঁর হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও তাঁর গৌণ পরিচয় মাত্র। মাতৃভাষায় মহাভারতের মহান ভাষ্যকাররূপে তিনি যুত্যাঞ্জয়ী হইয়া থাকিবেন। দারিদ্র্যের নির্মম পেষণের মধ্যে এই নীরব তপস্বী যে তপস্বী করিয়া গিয়াছেন তার তুলনা বিরল। সেই সাধনারই স্বফল ১৯৯ খণ্ডে সমগ্র মহাভারতের বাংলা ভাষ্য। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের একক তপস্কর্য্যায় যে মহোত্তম ও বিশালতম গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। সহস্র সহস্র রংসর ধরিয়া যে মহাগ্রন্থ ভারতবর্ষকে পোষণ ও পুষ্ট করিয়া আসিতেছে তাহাই সত্য ব্রাহ্মবাদ করিবা মহামহোপাধ্যায় বাঙ্গালী-জাতিকে স্ববি-স্বপ্নে দায়াবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা প্রার্থনা করিব, বাঙালী যেন এই পূর্ণ অমৃত ভাণ্ড হইতে জীবন-স্বধা পান করিয়া বীর্ঘ্য-বলিষ্ঠ হইয়া তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

# সাময়িক

## ভারতের হস্তশিল্প :

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্তও ভারতের হস্তশিল্প সারা বিশ্বে সমাদৃত। বহু-সভ্যতার সহিত প্রচণ্ড সংঘাতের মধ্যেও এই শিল্প এখনও বাঁচিয়া আছে। বর্তমান ভাংতে বশ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এই হস্ত-শিল্প রূপায়নে নিজেদের নিয়োজিত রাখিয়াছে। চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, সোণা, রূপা ও বিভিন্ন মূল ধাতুর উপর সুন্দর কারকলার ভারতের হস্তশিল্প পৃথিবীর সর্বত্র সর্বাধিক আদৃত। ১০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের জব্যাদি প্রতি বৎসর ভারতের হস্তশিল্প হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মোটামুটি বশ কোটি টাকা মূল্যের জব্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

## পুল্লিয়ায় সৈনিক বিদ্যালয় :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুল্লিয়া ভেলায় একটি সৈনিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে মামোদর উপত্যকা করপোরেশনের প্রয়োজনান্তরিত ২৪২'২০

একর জমি একি পাক্কেট হাউ এলাকার ৩০২'১০ একর জমি আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই সমর-শিক্ষা বিষয়ক বিভাগটি স্থানান্তরিত হইবে। অধিকৃত জমিতে নতুন গৃহ নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত, পুল্লিয়ায় নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজে এই সৈনিক বিদ্যালয়ের কার্য ১০৭ জন শিক্ষার্থী লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। কাশিডাঙেও অনুরূপ আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব হইয়াছে।

## পরলোকে যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় :

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই ডিসেম্বর তাঁর কলিকাতা-কর্ণফিল্ড রোডের গৃহে পরিণত বয়সে সম্রাণে পরলোকগমন করিয়াছেন। অসুতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ, কমান্ড প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়া ১৯৩৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনেও বহু পত্র পত্রিকার তিনি বর্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন। 'মোহমুজি' (উপভাস), 'জীবনরহস্য', 'ভারতের রাষ্ট্র বিবর্তন' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা। 'বিশাল ভারতের বিশুল পরিবর্তন' শীর্ষক গ্রন্থখানি বহু ধাক্কাধাক্কানি তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রন্থের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত অমারিক, ভায়নিষ্ট ও স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রবর্তক পত্রিকাখানিকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁর বহু রচনা প্রবর্তক বৃকে ধরিয়া থল হইয়াছে। এই বিগতাক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

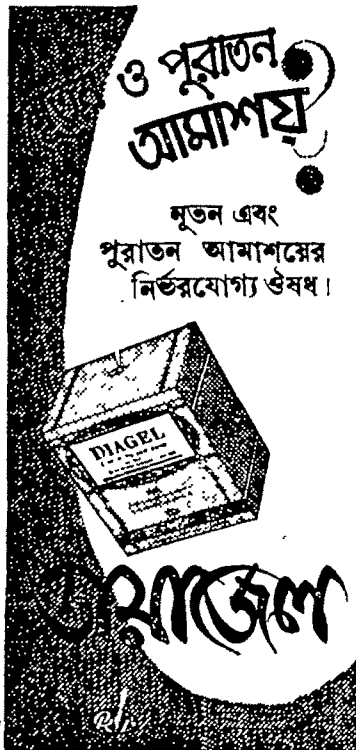
## কৃষি সংবাদ :

বিহারের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, এক একর ইঞ্চি ক্ষেতে সাড়ে চারি সের ধনিয়া বীজ রোপণের ফলে যে ফসল ফলিবাছে তাহার মূল্য আশি'র বীজ ও সাড়ে মূল্যের সমান পাঁড়াইয়াছে। অক্টোবর মাসে জমিতে লাঙ্গল ও আখ-চারা লাগাইবার পর মারির মধ্যকার তিন ফুট প্রশস্ত স্থানে ধনিয়া বীজ বপন করিতে হয়। কেক্রাদারী মাসে ধনিয়া ফসল সাড়ে কয়ার পর জমিতে সেচ দিতে হইবে। বাংলায়ও ইচ্ছা ক্ষেতে এই পরীক্ষা করিয়া দেখা বাইতে পারে।

## ইংরেজ মহিলার হিন্দুধর্ম গ্রহণ :

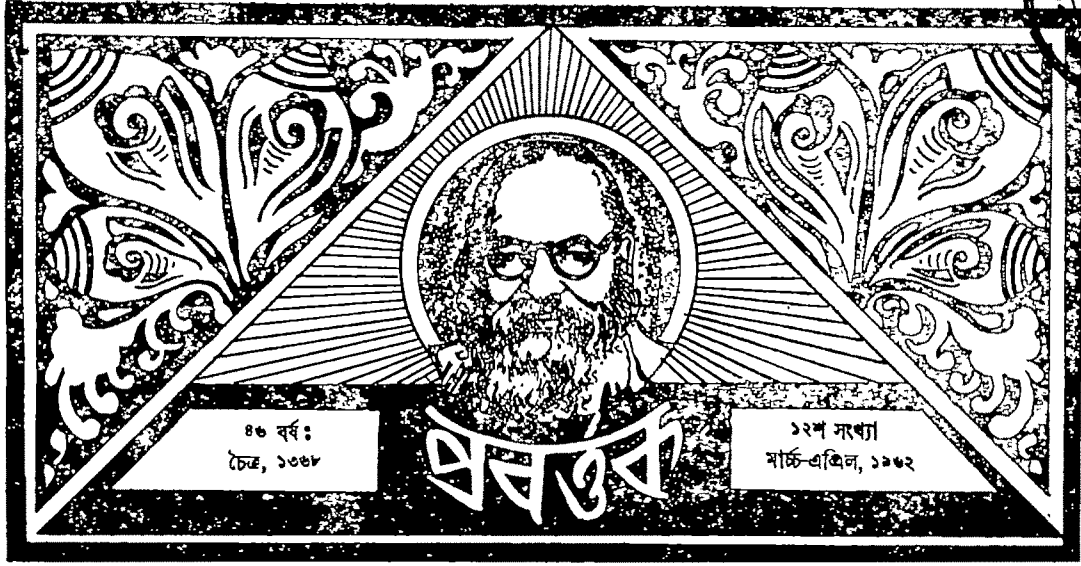
কলিকাতা ভারত দেবপ্রসন্ন সঙ্কর প্রধান কার্যালয়ে স্বামী নির্দ্বন্দ্বানন্দজীর পোরোহিতো গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১, এক শুদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। উচ্চাতে মার্ক্সারী নামী জনৈক ইংরেজ মহিলা সনাতন হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শুদ্ধি অস্ত্রে তাঁহার নামকরণ হয় 'মিতা'। ১০১ সি, জইন হো স্ট্রীট (কলিকাতা) নিবাসী জীসরোজকুমার মজুমদারের সহিত জীমতী মিতা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য



## সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪২/৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীত্বিকৃষ্ণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



## আলোর পথ

ভাব, ভাষা, প্রাণ, কার্য, প্রজ্ঞা, প্রেম—এই সবই মানুষের অপরিহার্য; কিন্তু ভাবই অস্ত্র সমস্ত গুণের উৎস। সিন্ধু ভাবের বার্তাবাহ সিন্ধু ভাষা, ভাবেরই প্রকাশ ক্ষুরধার বাণীমন্ত্রে। ভাব গতিশীল প্রাণের তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রজ্ঞা ভাবের চক্ষুরূপ, প্রেম ভাবেরই হৃৎপিণ্ড—উহার মূল রক্তাধার। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ, ভাবই মহনীয়—উহাই মানুষের সবগানি, অস্ত্র সব উহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মাত্র। জীবনকে পরিবর্তন করিতে হইলে অস্ত্র চেষ্টা অবাস্তব। ভাবকে ধরিয়াই কার্য আরম্ভ কর। অগ্রে অস্ত্র পরিবর্তন, তারপর বহির্জীবন। অগ্রে ভাব, তারপর ভাষা। অগ্রে প্রাণ, তারপর কর্ম। অগ্রে অস্ত্র, তারপর বাহির। ইহার বিপরীত পদ্ধতি সত্যের, প্রকৃতির বিরুদ্ধক্রম। তাহাতে সাক্ষ্য লাভ স্বদূরপর্যাহত। উহা বাম মার্গ, উহা ভ্রান্ত পথ। ও-পথে পরমোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ অসম্ভব। অস্ত্রের পথই সত্য পথ। অস্ত্র দিয়া যাহা না পাই, তাহাকে পাওয়াই হয় না। অস্ত্রের বল যেখানে নাই, সেখানে সকল বলই নিষ্ফল। সত্য ও পূর্ণ মানুষটি অস্ত্রেরই নিত্যকাল বিদ্যমান। অস্ত্রদেবতাকে আবিষ্কার করিতে হইলে, অস্ত্রেরই সর্বপ্রথমে তাঁহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রাণ পাইবে অস্ত্রের, সেই অতলস্পর্শ প্রাণ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াই কলসে কলসে অমৃত রস উত্তোলন করিতে পারিবে। বাহিরে তাহার আহরণপরায়ণ হইলে শুধু উচ্ছিষ্ট ও অশুচি পানীয়ই মিলিবে। উহা উল্লেখ্য, উহা বর্জনীয়। যে অমৃত পানে মানুষ অমর হইবে, তাহা অস্ত্রদেবতারই করকমল হইতে গ্রহণ কর। জীবন সার্থক হইবে। জীবনের ঘটনাপুঞ্জ যত সরল, অনিন্দ্য, মঙ্গলাবহ হইবে, রূপে, রসে, বর্ণে, ছন্দে ততই অস্ত্র-পুরুষ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবেন। এই অস্ত্র সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও, নূতন কর্মক্ষেত্র তোমারই অস্ত্রের শুভেচ্ছামণ্ডিত হইয়াই তোমার পুরোভাগে প্রকাশ পাইবে। তোমার জীবন প্রকাশ সত্য, বিরাট ও মহিমা-সমুচ্ছল হইবে। তাই বলি, হে আগামী কালের বাঙ্গালী—আপনার মাঝে অস্ত্র দেবতাকে জাগাইয়া তোল। সেই অস্ত্রদেবতার চরণতলে আপনাকে বিকাইয়া দাও। জীবনে তোমার সাক্ষ্যের স্বর্ণরশ্মি ঝিলিক দিয়া উঠিবে।

( ১৩২৬-এর প্রবর্তক হইতে )

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

## ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং ।) পঞ্চমী ঋক্

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অহুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

মজ্জো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি ।

হে বিশ্বা সঙ্গতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকুণ্ঠত ॥ ৫ ॥

অর্থ—“অগ্নে” (হে অগ্নিদেবতা) “মঙ্গঃ” (হর্ষযুক্ত) “হোতা” (দেবতাগণের আহ্বাতা) “বিশাং” (প্রজা সকলের) “গৃহপতি” (গৃহের পতি) “দূতং” (দেবতাদের দূতস্বরূপ) “অসি” (হন) “ধ্বে” (আপনাকে) “বিশা” (সকল) “ব্রতা” (কর্ম) “সঙ্গতানি” (লিগ্ন) “দেবা” (পৃথিব্যাदि দেবতাজন) “যানি” (যে-সকল কর্ম) “ধ্রুবা” (নিশ্চিত) “অকুণ্ঠত” (পল্লিচালন করেন) ॥ ৫ ॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব! আপনি আনন্দদায়ক, আপনি প্রজাসকলের গৃহপতি এবং দেবতাদের আহ্বানকারী দূতস্বরূপ। আপনাতেই সকল কর্ম লিগ্ন। পৃথিব্যাदि দেবতাগণ যে সকল নিশ্চিত কর্ম সম্পাদন করেন তাহাও আপনাতেই সংস্থিত।

বিশদার্থ—শুধু আত্মপুষ্টির জন্তই ঋষিজীবন নহে। দেশ ও জাতি উভয়ই তাঁর কাছে সমান। পৃথিব্যাদি দেবতাগণ নিশ্চিত যে-সকল কর্ম করেন—যেমন, পৃথিবী ধারণরূপ কার্য করেন, তিনি সকল কিছুর আধার বিশেষতঃ জলাধার। কারণ পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। এই বিশাল জলরাশিকে পৃথিবী আপন বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। সূর্য প্রকাশশীল—তাঁহার কর্ম প্রকাশ করা। তিনি তাঁর খর কিরণ দ্বারা বিশ্বকে উজ্জাসিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বক্ষ হইতে জলরাশিকে বাষ্পাকারে আকর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষে স্থাপন করেন। পঙ্কজ তাহাকেই আবার বারিধারারূপে পৃথিবীর বক্ষে ঢালিয়া দেন। বাহার ফলে পৃথিবী শস্তশালিনী হইয়া উঠে। এই তিন দেবতার কার্যই যথাক্রমে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসেই সম্পাদিত হয়। ঋষি অগ্নির মাধ্যমেই পৃথিবী ও সূর্যের সম্বন্ধ অক্ষুর রাখিতেন—এই জন্তই দেশে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ছিল না। ঋষির নিত্য সাধননিষ্ঠ জীবনে ইহাই প্রধান কর্ম। আর্য ঋষিরা সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন, নিত্য অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাই অগ্নি গৃহপতি, তাই অগ্নি হোতা, দেবতাদের আহ্বাতা। অগ্নির লেলিহান শিখা দেখিয়া ঋষি অমূভব করিতেন—প্রজাসকল অগ্নে বজ্রে সূর্যী জীবন যাপন করুক—এই উদ্দেশ্যে যজমান যে নিত্য হোমকিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহার জন্ত অগ্নি যেন মঙ্গঃ—আনন্দিত, হর্ষযুক্ত। ঋষিজীবনে অগ্নিচরন, অগ্নি সংরক্ষণ, এবং অগ্নির পোষণ এক মহা পুণ্য-কর্ম। ইহার দ্বারাই ঋষি সিদ্ধি এবং ধন্য হই-ই লাভ করিতেন ॥ ৫ ॥



# কিবাণ কবি রবার্ট বার্নস্

খলিল আহমেদ

মানব হৃদয়ের অবচেতন স্তরে যে স্বপ্ন আবেগ কেবলি প্রহেলিকা রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারই নিগূঢ় রূপকে লইয়া ছন্দাকারে মালিকা পাঁথিয়া যাহারা বিশ্ব-বরেণ্য হইয়া গিয়াছেন, কিবাণ কবি রবার্ট বার্নস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

২৫শে জামুয়ারী (১৮শতকে) তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেশবাসী পরম শ্রদ্ধার সহিত আঞ্জিও ঐ পূণ্য দিবসের স্মৃতি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

কবি বার্নস কিবাণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, নিতান্ত কম বিদ্যা অর্জন করেন নাই।

ইংরাজ কবিদের সংগে পরিচিত হইবার সংগে সংগেই তাঁহার সারা চিন্তিতল জুড়িয়া কবিতার মুকুল ফুটিতে শুরু করে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্ত অর্থের অনিবার্য প্রয়োজন থাকায় তিনি আশাতুরূপভাবে লেখা-পড়া করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কবি-জ্ঞানোচিত মনোভাব এবং আচার আচরণ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে যখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, তখন মনে হইত, চির রহস্যময়ী প্রকৃতির একি অকরণ লীলা।

বার্নস একদিকে যেমন বজ্রমুষ্টি দিয়া লাঙ্গলের সাহায্যে জমি কর্ষণ করিতেন, তেমনি আবার অবসর সময়ে সেই হাতেই কবিতা লিখিতে বসিয়া যাইতেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। ইহার ঠিক এক বৎসর পবে 'দি হলী বেগার্স' এবং 'দি কটার্স স্টার্টারতে লাইট' দুইটি কবিতা রচনা করিয়া স্মৃতি সমাজে নিজেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহার রচিত এই প্রসিদ্ধ কবিতা দুইটিতে গৃহস্থ জীবনের বেদনার ছবি, উল্লাস, কৌতূহল, মানবতা এবং সৌভাগ্যের এমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পাঠক-পাঠিকা পড়িতে পড়িতে আনন্দ এবং বিষয়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

আপনার বহিমুখী মনটাকে কবি যেন আর কিছুতেই বাগে আনিতে পারিতেছিলেন না; সে কেবলি যেন

নিরুদ্ধেশের পানে দিশাহারা হইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। তাই একদিন শীতের নিশীথ রাত্রে তিনি এডিনবার্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তরুণীরা দলে দলে আসিয়া মদ্যপানের জন্ত তাঁহাকে আকুলভাবে আমন্ত্রণ জানাইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তাঁহার সামিধ্য লাভের জন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন।

এখনকার জালজিল নামে তাঁহার গুণমুগ্ধ এক বন্ধু অপর এক বন্ধুকে কবির সম্বন্ধে লিখিতেছেন : সহরের মধ্যে আমরা এমন একজন কবিকে পাইয়াছি তিনি কিবাণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি স্নানজরে পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না অর্থাৎ এই দিক দিয়া তাঁহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। তবু আমার মনে হয় সব রকমের ব্যক্তিদের সহিত নির্বিচারে মিশিবার ঝুঁকি লইয়া তিনি যেন আপনাকে নষ্ট করিতে চলিয়াছেন। একটি রাত্রে তাঁহাকে আমি একটি বৈঠকে দেখিলাম। এই বৈঠকে গর্ভনের ডাচেস এবং অন্যান্য বহু স্ত্রীরা তরুণীর নজরে তাঁহাকে পড়িতে দেখিলাম। তিনি যে তাঁহাদের সহিত কিরূপ স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া যাইতেছেন, সেই সংগে আবার তাহাও লক্ষ্য করিলাম। তবু কিন্তু, তাঁহাকে বেশ মিস্তক বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কবিতাবলী পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় তাঁহার আর্থিক দুর্গতি খানিকটা লাঘব হয়। ইহার পর বৎসরে জীন আর্থার নামে একটি লাভণ্যময়ী তরুণীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। জীন দুইবার যমজ সন্তান প্রসব করেন।

অতিরিক্ত পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং দুঃখজনক, এই উভয়-বিধ অবস্থার সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্র ও প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রেমঘটিত ব্যাপারে তাঁহাকে কখনো অমনোযোগী, কখনো আবার একান্ত স্বার্থপর বলিয়া মনে হইত।



খেয়ালী মনের যে স্বেচ্ছাচারিতা তিনি দেখাইয়াছেন, অকোমল শব্দ সম্বন্ধে রচিত চিন্তাজয়ী তাঁহার রচিত প্রেমের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সে-বিষয়ে তাঁহাকে কমা করা যায় কিনা, তাহা পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

বার্নাসের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে গতানুগতিক অদ্ভুত বিতর্কের অবতারণা করা হয়। তাঁহার নিজের পত্রিকায় স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই আত্মপ্রাণের উৎকট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, এই মনোভাব হঠাৎ যে পরিবর্তন হইয়াছিল, নিম্নলিখিত তাঁহারই প্রকাশিত অভিমত হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অভিমতে প্রকাশ :—‘আমার স্ত্রীকে আমি একবার ভালোবাসিয়াছিলাম।—এখনো বাসি। একজন সর্ব-গুণসম্পন্ন মহিলার অন্তঃকরণ যেমন কোমল হয়, আমার প্রতি তাঁহার এইভাবে দ্বিগুণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতের মাসের মধ্যে দুইবারে ‘যমজ সন্তান প্রসব করিয়া চারিটি সন্তানের পিতা হইবার সৌভাগ্য তিনি আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু, এমনি মন্দভাগ্য যে, মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বাঁচিয়া আছে। যমজ পুত্র প্রসব করিতেন বলিয়া তাঁহাকে আমি সখের যে একটি পদবী দিয়াছিলাম সে-কথা আজ বিশ্বের স্তম্ভে আমি স্বীকার করিতেছি। আমার নিজের আচরণ সম্বন্ধে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট এবং আমার পছন্দ সম্পর্কে আমি অধিকতর আনন্দিত।’

ইহার ঠিক পরের দিন তিনি আবার লিখিতেছেন : ‘এক্ষণে আমি একটি প্রেম-সংগীত রচনা শেষ করিলাম ; সংগীতটি সম্বন্ধে আমি কুণ্ঠাহীন চিন্তে স্তম্ভ এই কথাই বলিতে পারি যে, যে-ধরণের কবিতা বা প্রেম-সংগীত রচনায় আমি অভ্যস্ত, সেই দিক থেকে সংগীতটিকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।’

এই প্রেম সংগীতটি লীলাময়ী জীবনের উদ্দেশ্যে রচিত হয় : ‘ভরা বসন্তকাল : গগো আমার প্রাণের জীন। তুমি যেন সবে ফোটা অ-চরিত্র একটি রাঙা গোলাপ, তুমি

যেন বিষাদপূর্ণ সুরের মুচ্ছনা। জীন আমার! তুমি এতো জ্বলন্ত যে, প্রেমের অঙ্কলি দিতে, আমি যেন আত্মহারা হইয়া পড়ি। যে-পর্যন্ত না মাগর শুকাইয়া যায়, প্রিয়া আমার, সে-পর্যন্ত, তোমাকে আমি এমনি করিয়াই নিবিড় ভাবে ভালোবাসিয়া যাইব। সূর্য্যতাপে স্বতষ্কণ পর্যন্ত না পাহাড় দ্রবীভূত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ আর প্রেম তাহা তেমনি অনড় থাকিবে। দশ হাজার মাইল তফাতে থাকিলেও, আমি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তোমার বাহুভায়ে নিজেকে ধরা দিব।’

ঠিক এই তারিখেই তাহার অল্প এক বন্ধুকে তিনি যে চিঠি দেন, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তথাকথিত নৈতিক চরিত্রের প্রশ্ন ব্যতীত তাঁহার হৃদয় কতখানি উদারতায় পরিষ্কৃত ছিল। লিখিত চিঠিখানি এইরূপ :—‘প্রিয় বন্ধু, এখানে যে কিরূপ বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়াছি, সে-কথা আগেকার চিঠিতে তোমায় সব জানাইয়াছি। কিন্তু সেই আনন্দকে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি পরিচারিকা যুবতীর সতর্ক চিঠির মর্ম্মভর কাহিনী। সে আবেদনে জানাইয়াছে যে, তাহার চাকরী ষাওয়ায় বর্তমানে সে বেকার এবং গর্ভবতী, তাই আমি যেন তাহাকে পুরাতপকে সাহায্য করি। আমার সাধ্যমতো সাহায্য করিতে আমি কৃতসংকল্প। কিন্তু সেই সংগে তোমাকেও বলি বন্ধু, পারতো দশ থেকে বারো শিলিং তাহাকে দিতে নারাজ হইও না। তাহার অপরাধের কল্লিত বোঝাটাকে ঠাই দিতে যাইয়া তাহার জীবনটাকে আমরা যেন দুর্ব্বিসহ করিয়া না তুলি।’

তোমারই রবার্ট

লুকোচুরির প্রবৃত্তিটা রবার্ট বার্নাসের অন্তরে কোনো দিনের জগ্গ ও স্থান পায় নাই। নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে তিনি অকপটে স্বীকার করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সাইত্রিশ বৎসর বয়সে রবার্ট বার্নাসের প্রতিভানীল জীবনের অবসান হয়।

# স্বামীজি

১২৫

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

নির্ধারিত দিনে রাওয়ানপিণ্ডী পৌছিতে হলে আরও তিন দিন এখানে থাকা চলে। এ তিনটি দিন এখানে অপচয়ের সুযোগ কেন দিলেন স্বামীজি? নাকি দুই বৎসর কঠোর শ্রমের পরে এ তিন দিন ছুটি? নাকি তিতলীকে ট্রেন-আপ করবার ব্যবস্থা? কিন্তু ট্রেইনিঙে যেটুকু স্বামীজি ওকে দিয়েছেন, তাতে তো মনে হয় পূর্ণ হয়েছে ওর পাঠ গ্রহণ। ও প্রস্তুত। কায়েন মনসা বাচা দেশ সেবায় উৎসর্গীকৃত।

কিন্তু মুঞ্চিল হল ওকে নিদ্রাই। এ পথ ওর চেনা হয়ে গেল। স্বামীজি বলেছেন আর সব রিজুটসদের এখানে আনা হয়েছে চোখ বেঁধে। ও এসেছে পথ চিনে। সজ্ঞানে বিশ্বাসঘাতকতা হয়তো ও করবে না, কিন্তু ঐ সরলা বালিকাকে প্রভাবিত করতেও তো পারে কেউ। না না, এখানে আর নয়। কিন্তু কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রাখব এ মহাসম্পদ? অজ্ঞাগারটার কথাও কি বলেছেন ওকে স্বামীজী? এ পর্যন্ত এলে অবশ্য ওটুকু খুঁজে বের করা কঠিন হবে না পুলিশের। ও-ই একমাত্র জানল এর সন্ধান। হাতের মুঠোটা একবার শক্ত হয়ে এল। একটা প্রাণের বিনিময়ে সমস্ত হাজার প্রাণের নিরাপত্তা। কিন্তু তাই বলে একটা নিরপরাধ প্রাণ! শিথিল হয়ে এল আবার লৌহ-কঠিন সংকল্প।

অক্লান্ত পরিশ্রমে লিষ্ট করে কেবলুম সেই সমস্ত হাজারের। তার মধ্যে শুধু কল্যাণী ছবরই নয়, সন্ধান পেলাম আমার পূর্ব পরিচিত অনেক সহকর্মীর। কেন যে তিন দিন ছুটি দিয়েছিলেন স্বামীজি এবার বুঝলুম। এ তিন দিন আমার আর আহাৰ নিদ্রারই অবকাশ হত না

যদি না তিতলী যথাসময়ে খাদ্য সংগ্রহ করে পাশে এসে দাঁড়াত।

রাত্রে ও ঘুমোতো 'সাধন মন্দিরে', আমি থাকতুম 'কর্ম মন্দিরে'। এ ব্যবস্থায় তল্লি গুটোবার কাজ স্বরাস্থিত হল। নিম্নম নিম্নীথে নিজর্ন গিরিগুহায় এক সুখোবনা নারীর উপস্থিতি, হোক না সে পাহাড়ী, হোক না অশিক্ষিতা, মনে চাক্ষু্য আনে বৈকি; কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে বৈকি। তাই এ আশ্রয়স্থার প্রস্তুতি। কালীকিঙ্করকে দেশবাসী অন্ধ শ্রদ্ধায় উপস্থাসের নায়ক করে তুলেও, আসল কালীকিঙ্করকে তো আমি চিনি। নেতা কালীকিঙ্কর মাঝম কালীকিঙ্করকে দিয়ে তাই বারে বারে এমনি অভিনয়ই করিয়েছে। কিন্তু তিতলীর তীক্ষ্ণ হাসিটাও অভিনয় নয় তো?

অস্বীকার করব না কালীকিঙ্কর অভিনয়ে তুমি সুদক্ষ। কোন কোন রাতে দেখেছি তোমাকে একটা অসহজ জৈব ক্ষুধায় পীড়িত হতে। তিতলীর দেহখানার প্রতি লোভে লালসায় অস্থির হয়ে উঠেছ তুমি। কিন্তু ভোর হতেই তুমি একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছ। তিতলী ভেবেছে তোমাকে দেবতা। পাবাণ দেবতা। তাইতো তিতলীর সে প্রথম দিনের হাসিটা আর নেই।

যতটুকু বা নোট নেবার নিয়ে নিলুম অতি দ্রুত। এ বোঝাও ত কম হল না। এগুলি সাথে নিয়ে চলা যানেও যে মৃত্যু নিয়ে খেলা। তবু এটুকুতো নিতেই হবে, তা না হলে স্বামীজি যে কাজের তার দিয়ে গেলেন তা উদ্ঘাপিত হবে কি করে? অকস্মাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ চমকে দেখতে পেলাম স্বামীজির ইঙ্গিত। স্বামীজির শেখান সেই মঙলুর

ভূমিকা। সে অভিনয় ভুলিনি। সেই ভূমিকাটা এবার দেওয়া যায় না তিতলীকে? স্বামীজীর শেষ রিক্রুটের শেষ অগ্নি পরীক্ষা।

শিখিয়ে ফেল্লুম।

আশ্চর্য দক্ষতা তিতলীর। এ যেন একটা মজার খেলা। মুক বধির একটা জুঙলী। সাধুর শরণাগত। একদিন রূপালাভের আশায় সারাক্ষণ ভক্তি-সিক্ত হয়ে পড়ে আছে চরণতলে। তনু-মন-প্রাণ সাধু সেবার উৎসর্গীকৃত।

রিহার্সাল শেষ হল। তিতলী কথা বলতেও পারে না, স্তনতেও পায় না। শুধু কয়েকটা ইঙ্গিত আর ইসারায় বোঝাতে হয় কথা। আর বুঝতে হয় ওর ইসারার অর্থ!

যাত্রার মুহূর্ত থেকে শুরু হবে ওর অভিনয়;

তারি খুশি হয়েছে ও। এই ভূমিকাই যেন ছিল ওর বাঞ্ছিত।

দিবারাত্রি ডুবে আছি ফাইলগুলির মধ্যে। ওর আর কোতূহলের অন্ত নেই। একদিন জিজ্ঞাসাই করে বসল, উও কিতাব মে ক্যা লিখা হায় বাবুজী?

—ওতে আছে আমার মৃত্যুর মন্ত্র।

ও চমকে উঠেছিল। সভয়ে বলেছিল, আরে বাব্বা, তব উসে আঁগ লাগা দিজিয়ে।

আমি গম্ভীরভাবে বলেছিলাম, কিন্তু ওতে যে কোটি কোটি মানুষের বাঁচার মন্ত্রও আছে। আমি মরে গেলে কিন্তু সে মন্ত্র আর কেউ কাছে লাগাতে পারবে না। মারা পড়বে আমার সমস্ত দেশবাসী।

—তব ক্যা করোগা?

—এ মন্ত্র আর কেউ জানলে কিন্তু আমি মরে যাব তক্ষুণি।

—আরে বাব্বাঃ!! ওর চোখ জুটো যেন কপাল থেকে খসে পড়তে চায়।

—ভয় নেইরে। যদিও কেউ না জানবে তব্বিন তো মরছি না। আর জানবেই বা কি করে? তুই বলে না দিলে?

এতবড় আঘাত সহ্যে পারেনি ও। কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

—নহী, নহী। কভী নহী!। যুবো কভী নহী।  
কিসিকো বোলেগা। আপকা জান। আরে বাব্বা!!

পরীক্ষা শুকে নানাভাবেই করে দেখেছি। অবিকলিত ওর নিষ্ঠা। বিশ্বাসে অটুট।

কিন্তু মানুষ কালীকঙ্কর যে মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়ছে, সেটুকু কি বুঝতে পারছে নেতা কালীকঙ্কর? এ কালীকঙ্করের পরীক্ষা নেবে কে?

শপথ পাঠ করানুম শুকে চোখ না বেঁধেই। চোখ বেঁধে সেই সত্তর হাজারের কাছে যে সম্পদ গোপন রাখতে চেয়েছেন স্বামীজি তা তো প্রথম দিনই ওর চোখে দেখা হয়ে গেছে। তারা দেখত শুধু ভারতের ইতিহাস, ও দেখল কোটি কোটি মানুষের প্রাণ-বীজ। জাতির জীবন-কাঠি। তাই ওর কাছে এ সম্পদের মূল্য অনেক বেশী। এই মূল্য যদি দিতে পারত সেই সত্তর হাজার? দিতে পারত সমস্ত ভারতবাসী?

শপথ পাঠ করতে বেশ বেগ পেতে হল। বাঙলা শব্দগুলি ওর ঠিক উচ্চারণ হয় না, অর্থও বোঝে না। অনেক ব্যাখ্যা করে বোঝাই, ও বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। এতবড় একটা বিরাট কর্মে ওর যে একটা অংশ আছে, ওর একটু ভুলে একটা মহাঘটন যে একেবারে পণ্ড হয়ে যেতে পারে, এসব যতোই ওকে বোঝাই, ততোই ও ভ্রিয়মান হয়ে পড়ে।

ও এত কথা বুঝতে চায় না। সতেজ কণ্ঠে বলে, যো কুছ আপ বোলেগা, ম্যায় ঠিকসে করুঁগা। ব্যাস্। ম্যায় আপকো এক গুঁগা বহরা সেবিকা। ব্যাস্। আউর কুছ নহী।

সন্মুখে পিঠ চাপড়ে বলেছিলুম, সাবাস।

কাগজপত্র যেটুকু সঙ্গে নেবার ওর কাছেই দিলুম।

যাবার সময় গুহামুখে পাথরখানা বসিয়ে দিয়েই যাচ্ছিলুম।

ও হেসে বস, ঠাহরিয়ে বাবুজী।

কয়েকটা বছর গাছপালার চারা এনে লাগিয়ে দিল গুহা মুখে। ঝরপা থেকে এনে জল সিঁকন করতেও ভুলল

না। একদিন হয়তো ঐ চারাগুলিই মহীকহ হয়ে পাড়াবে  
প্রহরীকপে শুধা ছারে। বিস্মিত হলুম। মুগ্ধ হলুম।

বাকুদখানাকা মুহূপর ভী এয়ায়নী বানা দিয়া। হু  
চার মহীনা মে ঠিক হো যারগা। পানশত বরষ বাদতো  
একদম...হিঃ হিঃ হিঃ...

বাকুদখানা। ও সব খবরই রাখে দেখছি। স্বামীজি  
সব সন্ধানই দিয়েছেন ওকে। কিন্তু আমার এ কী ভ্রম  
হল আজ। এ ক'দিনের কাকের চাপে অজ্ঞানতার কথা  
যে একেবারেই ভুলে গেছিলুম। এ সময়ে তিতলীর  
অপরিহার্যতা বুঝেই হয়তো স্বামীজি যথাযথ নির্দেশ  
দিয়েই পাঠিয়েছেন ওকে। দূরদর্শী স্বামীজি।

নব ইতিহাসের মত অজ্ঞানগারও স্বামীজির এক  
আশ্চর্য সৃষ্টি। এ যুগের সবগুলি মারণাজেরই নমুনা রয়েছে  
এখানে। কোথা থেকে কিতাবে যে এগুলি এখানে  
আমদানী হল সে কাহিনী একমাত্র স্বামীজিই জানেন।  
সপথ গ্রহণের পর যোগ্যতা বুঝে কোন কোন কর্মীকে  
এখানে এনে শিখিয়েছেন প্রতিটি অস্ত্রের ব্যবহার।  
আমাকেও নিতে হয়েছে সে ট্রেনিং। আমি অবশ্য  
চিনতুম এর অনেকগুলিই পূর্বে। তবু মার্কিন, রাশিয়া,  
জাপান থেকে সংগৃহীত কয়েকটি নতুন অস্ত্রের সাথেও  
পরিচয় হল এখানে।

কী সর্বনাশ, এই অজ্ঞানগার অরক্ষিত রেখেই যাত্রা  
করেছিলুম। তিতলীর প্রতি অপরিণীম কৃতজ্ঞতার বুক  
ভরে উঠল। দিক্কার দিলুম আমার এই অমার্জনীয় আত্ম-  
বিশ্বাসিকে।

এইটুকু প্রস্তুতি নিয়ে ভূমি চলেছ এক মহাযজ্ঞের  
হোতা হতে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই কালীকিঙ্করের উপরেই  
কি স্বামীজি অতবড় দায়িত্ব সঁপে দিয়ে গেলেন?

স্বামীজির অভাবে বুদ্ধের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতমুখে  
ক্ষণে ক্ষণে কত যে রক্ত ক্ষরিত হল, আজও শেষ হল না  
সে অভিশপ্ত রক্তধারা। বুদ্ধ শেষ হবে না যত্নমুহুর্ত  
পর্যন্ত। অযোগ্য কালীকিঙ্কর তোমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে  
দিয়েছে। ধূলিসাৎ করে দিয়েছে তোমার সমস্ত রচিত  
স্বপ্নসৌধ। তুমি কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে কোন  
দিন? ব্যর্থ কালীকিঙ্করের চিতাভস্মের উপর পারবে না  
কি তুমি আবার গড়ে তুলতে তোমার পরিকল্পিত মহা-  
ভারত। অবিভক্ত, অখণ্ড, স্বাধীন, সার্বভৌম ভারত।

ধাক সে কথা। সেতো ইতিহাস। মসীকৃষ্ণ কলঙ্কিত  
ইতিহাস।

পহেলগাঁওএর এই আরণ্য গিরিগুহায় জীবনে আশ্চর্য  
দুটি বংশরকে পরম বেদনায় কবরস্থ করে এগিয়ে চলেম  
রাওয়ালপিণ্ডীর পথে। জানি না, অতীতের কোন প্রহ-  
বিত এই কবর খুঁড়ে কোন রক্তধনির সন্ধান পাবে কিনা।

বিদায় পহেলগাঁও। বিদায় স্বামীজি।

কিন্তু আত্মত্যাগিক বিদায় নেওয়া তো হয়নি তোমার  
কাছে স্বামীজি। তাই বিদায় স্বামীজি। মুখে  
বলেও বুক তোমাকে বহন করেই 'চলুম তোমারই  
নির্দেশিত পথে।

(ক্রমণঃ)

## যৌবন

ধীরেন্দ্রকুমার সরকার

দেহ ভূমিস্তে যৌবন রক্তের তেজোময় সার।  
বায়ুকোষ ভরা দক্ষিণ বাতাস অল্পকূল।  
মনের আকাশে অহর্নিশ নৈসর্গিক তারার ফুল  
ফোটে আর ঝরে অনিবার।

উর্বশীর নৃত্য তালে তালে ইন্দ্রকানন ঘিরে  
শুঙ্করে ভ্রমর স্বপ্নের হৃদে;  
আঁচর ছুঁয়ে যায় উন্মাদনা গঞ্জে  
পদ্মপলাশ পল্লব তীরে।

শিহর জাগানো স্বর্পরেণু ছড়িয়ে দেয় নুপুর নিকন,  
ছলে ওঠে শ্রামল গালিচার রঙীন চূড়া

মনের উপত্যকায়—

কল্পনার অধিত্যকায়

যৌবন পেয়েছে তার হংস-সিংহাসন।

অমৃত মদিরা ভরা শিরা-উপশিরাগুলি

হৃদয় সায়রে মুহূর্ত মেঘ আলোড়ন,

স্বপ্নের শৈবালে কামনা প্রবালদীপে অল্পধন

চঞ্চল রক্তের গর্বে যৌবনের বক্ষ ওঠে হলি।

# পাষণের ক্ষুধা

(কথাবার্তা)

৪

শ্রীনৈমিষারণ্যক

[প্রমা ও প্রমা দু'টি মেয়ে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের পর ঘরে ফিরছে। পথে এক জীর্ণ বেইল; সেদিকে চেয়ে—]

প্রমা—তোমার চোখ ছলছল করল প্রমা!...তবু আরও একটা কাজের কথা বলি এই সঙ্গে...তাজা পেঙ্গু দিয়ে গড়া হ'লেও ছেলেমেয়েদের ভেতর যেটা 'ভদ্র', যেটা 'মধুর', যেটা 'সুকুমার', সেটা নিজেকে এক সহজ বিন্দু লক্ষ্যে সমস্ত শালীনতার শুক্তিকোষে নথর কোমল নব যুক্তাটির মতই রক্ষা আর পোষণ করছে...জোর করে এ শুক্তিকোষ ভাঙতে নেই...“তুমি তো দেখছি বেজায় মুখচোরা লাঞ্ছক হে...কোন মাকাতার যুগের বৃদ্ধি!”... এই সব চড়াও স্মার্টের বুলির আচমকা বেয়াড়া আঘাত করে...ভেতরে যুক্তোদানা বাঁধলে শুক্তিকোষ আপনাই তাকে যুক্তি দেবে সত্যিকার স্মশোভন মণি-বীধিকার মাঝখানে...যে কমল ফুটছে তার বহির্দলের সযত্ন আবেষ্টনে, তাকে ভাল করে ফুটতেই দাও...ফুটলে বহির্দল বাইরেই থমে পড়বে...পেশীমানসের নিকট মেলামেশার লিপ্সা তো রয়েছেই...তবু তার স্বচ্ছ সহজ ব্রীড়া সরমের আচ্ছাদনটা জোর করে টুটতে দিতে নেই...টুটল কি, সে যেন একটা তাকারক্তের গছ পেল...সে উপলক্ষ্য হ'ল, সে হয়তো 'এই আসছি' বলে গেল স'রে...কিন্তু সরমের সোণালী তন্তুকোষের ভিতর থেকে যে রঙীন প্রজাপতিটা বেরুল, সে দেখল আর তো সরমের বালাই নেই...মেলি এইবার স্তম্ভ লোলুপ লালসার জিবটা চারধারে...বসন্তের নব নব পুষ্পকলির গন্ধভরা হাওয়ার মত কিরে কিরে ঠিকই আসবে সে...বার বার, ক্ষণে ক্ষণে শব্দে, গন্ধে, ছন্দে...রূপে রসে স্পর্শে...আর কতনা অহিলেয় আসে কিরে...ছুপুট্টা একা একা বড্ড বিস্ত্রী লাগে, আসছ তো তাস খেলতে? ও সিনেমায় ভাল শো আন সন্দেহ, যাচ্ছে তো ঠিক? রেডিওতে রাত সাড়ে দশটার বেয়ার প্রোগ্রাম আছে, একসঙ্গে শুনেলে আরও ভাল লাগবে'... তুমি হাসছ, প্রমা? অহিলেগুলো প্রায়ই নিরীহ ভাল

মামুষটি সেজেই আসে...অহিলে হয়তো? নিজেই জানে না তার আড়ালে কে তার সর্কনাশ ধনুতে ছিলে পরিয়ে ওং পেতে আছে...আবার কখনও বা অহিলা শূর্ণনশা, পুতনা সেজেও আসে...অহিলায় ছিপিয়ে বেড়ায় স্বচতুরা কলাকুশলিনী ছলনা...

প্রমা—পাতকী চক্র—ভিসাস্ সারকেল! স্নায়ু ক্ষুধা চায় উত্তেজনা! উত্তেজনা বলে...‘বেশ, তোমার ঐ ক্ষুধাটা হোক না রাক্ষসী!’ যারা আর্ট বা কলাশিল্পের দোহাই দিয়ে ঐ রাক্ষসীর খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছে তারা নিজেরাও সব ঐ রাক্ষসীর বাছা-বাছা খোরাক—আমি তো আছিই, আর যত চাও ফুটিয়ে দিচ্ছি!’ ছিপই ফেল—কি জালই টানো, দিব্য লকলকে সব তাজা পোনার বাঁক বেয়ে আসবে...দেখইনা...কী জমাট মৌতাতের ‘চার’ ছড়িয়ে দিয়েছি চারধারে...

প্রমা—দেখ প্রমা, এ প্রসঙ্গও যেন চোরাবালি... নেপথ্যে কে যেন ডাকে—‘আরে, কিছু খাবে আর নাই খাবে...রেন্ডারায় ব'সে থানাপিনার ‘কনোয়াওমোরের’ ভূমিকাটা নিলেও তো লাভ আছে...জিবে জল সরবে... গরহজমের চৌয়া ঢেকুরগুলো বন্ধ হবে...হাসছ প্রমা! সত্যি, বাস্তবতার—দোহাই দিয়ে পেশীচর্চায় আর্টের ও-সব রেন্ডারায় না ঢোকাই ভাল...কবির সেই ‘মদির-শীকর সিন্ধু বাতাস ঘন হ'য়ে যেন ঘিরিয়া আসে’... ওটা ঘৃণঘৃণে মারাত্মক এক কমপ্লেক্স। ভ্রাণে বলে, অর্ধ ভোজনং... ভাষণে?—ভুক্তস্ত রোমহৃণম্। সেই মূলোর ঢেকুর!

প্রমা—সাজানো অকুটোপাসটাও আবসোলের চাইতে বড় কম সঙ্গীন চিহ্ন নয়...তাই তাঁদের সেই শাস্তি পাঠ ‘...ভদ্রং কর্ণেভিঃ’ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চম...’। ‘ভদ্র’-কেই বরণ কর, শুধু মনে নয়, বাক্যে, আচরণেও। আমাদের এই সব কথাবার্তায় এইটেই বুঝছি যে... আমাদের ভিতরে তাঁরির বেরী রয়েছে পাতা, আর সে

বেদীতে তাঁরি হবনই হ'ল সত্যিকার সুন্দর সার্থকজীবন, কিন্তু রাক্ষসের ভয় আর উপদ্রবও আছে, যাতে ক'রে হবন হয়ে যাবে কলুষিত...সে রাক্ষসের নাম কি জানো ? —‘অভদ্র’। মিষ্টি মোলায়েম সঙ্গের অছিল। নিয়ে সে আসে...সঙ্গের আড়ালে থাকে ক্ষুধা, কামনা...যেটা প্রায়ই ধরা যায় না সুরভিতে...সেই যে রাক্ষসী কনক মায়াহরিণীটি সেজে রামকেও নিয়ে গেল ভুলিয়ে..... ছন্দ সর্পিল যত সব রঙ্গিন রোমাঙ্গ আর এড্‌ভেন্‌চার.....

প্রমা—তাই ‘সঙ্গাং সঙ্গায়তে কামঃ’, কাম তখন মুখোস ফেলে বেরিয়ে এল তার লোললোলুপ রসনা নিয়ে...‘কামাং ক্রোধোহভিজায়তে’...কামনা বাধা পেল কি, কৌস ক'রে রুখে উঠল! অভিমান-এর এক অতি সাধারণ রূপ...সে বিবেককে অন্ধ করে দেয়, মান্তে দেয় না যে—হ্যাঁ সত্যিই তো কামনার টানে গড়ান পাখে গড়িয়েই যাচ্ছি...হয়ত’ রুখেই বলে ‘আমি কচি খুঁকীটি নই, কী আছে বাজে বল যে তোমরা সব!’ ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ’। ঐ রোকে কোন আপাত প্রেরঃ বিষয়ের ধ্যান থেকে একান্ত সর্বনাশ পর্যন্ত ক্ষুধারাক্ষসীর সকল সর্বনাশা পাটপুটোই পরপর দেখান আছে...পক্ষান্তরে, সংসদ, ভদ্রসঙ্গের মঙ্গল মহিমা ব'লে তো শেষ করা যায় না...আপাতঃ ভাল লাগে যে সব সঙ্গ, সেটাকে সত্যিকার প্রেরের কষ্টপাথরে পরখ ক'রে নিতে হয়...সুধু ভাল লাগলেই হ'ল না, সত্যিই কি ভাল, ‘ভদ্রম্ ? সংঘম, ত্যাগ, কল্যাণধান এবং কল্যাণ প্রচেষ্টা...এ কয়টা খাঁটি আরকে পরখ ক'রে দেখবে তোমার ঐ ভালো-লাগাটা ভূয়ো না খাঁটি...নকল না সাজ।

প্রমা—ভেতরে যে সত্য শিব সুন্দরকেই ভালবাসার বস্তু, কি কোন বড় আদর্শ বা ভাবরূপে পেয়েছে, তার তো সত্যিকার ভালকেই ভাল লাগবে, তার কাছে প্রেরঃ আর প্রেরের দ্বন্দ্ব নেই.....

প্রমা—যেমন তোমার...কিন্তু মরতের যত সব সাধারণ মাছুষ, তাদের জন্ত লক্ষণের সেই তিনটে গুণী এই চন্দ্ৰতি চলার পথের সাধারণ ধুলোতেই এঁকে নিতে হবে...যেমন ধর, সাধারণ ‘ভাইটাল’ ছেয়েমেয়েরা যারা চলার পথে নানানুভাবে মেলামেশা করছে...তাদের জন্তে

এই তিনটে সাধারণ গুণী...শরীরের পেশীগুলোরও ভালমন্দ এক একটা পরিবেশ, ‘পরিমণ্ডল’ আছে, এইদ্রুত নিকট পেশী সংস্পর্শে...অছিলায় ইচ্ছিতেও, না আসা ভাল ; ঐ কারণে, নিভৃত একান্ত আলাপন...যেটাকে এদেশে বলা হ'য়েছে ‘গুহুভাষণম্’...সেটাও ভাল নয়...এসি ভাললাগা কারকে নিয়ে নিরালায় কামনার স্বপ্নজাল বুনে তাতেই জড়িয়ে পড়াও ভাল নয়...যেমন, ধর, ঘরের দোর বন্ধ ক'রে ফোনের চোঙে মুখকান শুঁজেও নয়...এ-রকমের সঙ্গের অনেক ‘চোরা’ চেহারা আছে...ভাল লাগালাগির ভালবাসাবাসির নাম ভাঁড়িয়ে তারা একেবারে নির্ধাত যায়গায় এসে হানা দেয়—

প্রমা—ভেতরে ভালবাসার আসল চেহারাটা, যেমন ধর ব্রজের, যে দেখ'ল, তার ? সেই যে—‘আত্মেক্সিয় তর্পণেচ্ছা তারে বলি কাম। আর, কৃষ্ণেক্সিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।’

প্রমা—সে তো কখন ভালবাসাবাসির চোরা কালো কারবারে পা বাড়াবে না...

প্রমা—অতীত অনাগত এই যে সব জীবনপারাবারে ‘ভাইটালের’ তরঙ্গ...তরঙ্গের পর তরঙ্গ...অবিরাম, অগণিত, অশাসিত...এ ‘যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে’ ?

প্রমা—‘হরে মুরারে’। চাই সে জন্তে ধর্ম আর নীতির বলিষ্ঠ অঙ্গশাসন...বেদের সেই হোমোপাথীর মত যারা আকাশেই ডিম ভেঙ্গে বেরিয়ে নীচে না প'ড়ে আবার উর্দ্ধময় পানেই উড়ে যায়, তাদের ভয় কি ? কিন্তু ক'জন তারা ? তাই, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতন ‘টু টু ছ কিন্ড্রেড্ পয়েন্টস্ অব্ হেভেন্ এণ্ড হোম...’ এইটেই হবে মর্ত্যে জীবননীতি...আর যারা অগুণতি কাদাখোচার দলে ভিড়ে গোলাপী ফেনা আর রক্তরাঙা কাদার মাঝেই চোখমুখ শুঁজে সাধের সেব্য ‘শাসাল শামুকটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদেরও তো চোরাবালিতে, তলতলে পলিমাটিতে বেমালাম গেড়ে পড়বার ভয়টা বেশী...

প্রমা—‘কাম এষ ক্রোধ এষ রজোশুণ সমুত্তবঃ। মহাশনো মহাপাপা বিদ্যেনমিহ বৈরিণম্।’ বৈরী আর কেউ নেই এ দুটো বই।

প্রমা—ও ছোটোর লাগে ‘লোভ’...তা হ’লে সর্বনাশের  
তিনটে দ্বারই খোলা রৈল—উপায় ?

প্রমা—উপায়, মল্লীবীথিকার সেই ‘হবন’...নয় কি ?  
“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং স্বাং  
সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”

প্রমা—যারা সব আধুনিকের বায়ুগ্রস্ত, তারা এসব  
বাতিল অবাস্তব মনস্তত্ত্ব বলে বলুক...যারা বলে, চোকে  
কানে ঠুলি বাঁধা, নাকে কৃত্রিম স্বাসের নল লাগান’ ডুবুরীর  
সাঙ্গে সাগরের প্রশান্ত গভীর তলে অজানা কোন্  
রহস্যপূর্ণের সন্ধান সত্যিকারের জীবন নয়, কিংবা সাগরের  
সীমাহীন উদার বিস্তারে অনিশ্চিত সুদূর কোন কল্পদ্বীপের  
উদ্দেশ্যে বেপরোয়া পাড়ি দেওয়াও জীবন নয়...সাগরের  
তটে এসব গোলাপী ফেনা আর রক্তরাঙ্গা কর্দমে লুটো-  
পুটি করাই জীবন...ঐগুলো না ঘাঁটলে, চোরাবালিতে  
ধনতান্ত্রিকতা না ক’রে তো সাগরের প্রচণ্ড উর্মির আত্মানে  
ঝাঁপিয়ে পড়াই যাবে না কোন দিন...যারা একথা বলে  
তাদের ওসব কথার উত্তর সাগর নিজেই বার বার দিয়ে  
যাচ্ছে তার মঙ্গল-ভৈরব সৌম্য শান্ত গভীর নির্দোষে...  
ফেনা আর কর্দমে বিহ্বল, বিভ্রান্ত অসহায় কীটগুলোকে  
বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত, নিশ্চিহ্ন ক’রে দিয়ে...যাক্, আমাদের  
ও-মোহ তো টুভেকে গেছে...মল্লী-বীথিকার সাগরের  
ঐ ছোটো কবিতায় ধ্যান দিয়ে বিশেষ ক’রে...মনে  
আছে তো ?

প্রমা—আজ স্বাধীনতা দিবস গেল...দেশের পতাকা  
অভিনন্দন করে আমরা ঘরে ফিরছি...কিন্তু প্রমা, সত্যিই  
কি আপন ঘরে ? ঐ যে রাক্ষুসে ক্ষুধিত পাষণট...ও  
আজ আমাদের তার সর্বগ্রাসী বিনাশের রূপটাই দেখাল  
না কি ? ঘরের আমার হবনবেদীও রাক্ষস যে আজ  
তার কলুষ-ক্লিম উগ্রস্ত কর-এ ভেঙ্গে দিচ্ছে...যুগ যুগের  
প্রত্যয়সিদ্ধ ভাব-বিশ্বাস, কত কত পুণ্যলোক সাধকের,  
সিদ্ধের সুপরীক্ষিত সাধন সংস্কার, আর, আপন স্বভাব  
ক্ষুণ্ণ স্বচ্ছন্দকুশল মতিগতি, এই আমার আপন ঘরটাই  
যদি ভাঙল’ তো জাতীয় পতাকা কি মহার্ঘ সমাচার বয়ে

এনে দিল আজ...সকল শেকল ভাঙো, সকল গভী  
তোড়ো...সকল বাধা ঠেলো...মুক্তির সমাচার।...কিন্তু  
মুক্তি কি সত্যিই বাইরে সওয়া ক’রে, ফরমাস দিয়ে পাবার  
বস্তু ? গৃহলক্ষ্মীকে ভেঙ্গে, তার ভগ্নপ্রীতি প্রতিমা টেনে  
বাহির ক’রে নয়, বাহিরটাকেই ঘরের লক্ষ্মীর বেদীর চারি  
ধারে সত্য স্নান ক’রে সাজিয়ে জড়ো ক’রে, আপন ঘরের  
নিত্য হবনের পুত মঙ্গল শান্ত শতোপচার ক’রে জীবনের  
সকল সেবা উপকরণগুলো মেলানতেই মুক্তি ! দেবতার  
যা পূজা উপচার, তাকে অহরের কাম অপচার থেকে  
বাঁচানয় মুক্তি ! সারা ধরিত্রীই আজ ক্ষুধিত পাষণ...এ  
পাষণে দয়ামায়া নেই, তবু ব’লেও কিছু নেই...এর তলায়  
হিংসা, জিঘাংসা আজ উন্মাদ রাক্ষসের মতো গুম্বরে গর্জ  
যাচ্ছে...মায় ভুখাহ...আমাকে বলি দাও...তোমার  
পেশীপরায়ণ মনের কাম-ক্রোধ, তোমার প্রভুতা-প্রমত্ত  
আত্মার লোভ মোহ থেকে। তোমার এই বিজ্ঞানের,  
তোমার এই সভ্যতার যে ময়দানবীষ বিশাল সৃষ্টি, সে  
সবটাই আজ দিতে হবে বলি, আর ভীতিবিহ্বল, পরম্পর  
আততায়ী তোমার বিশ্ব নররূপটাই হবে সে বলির একান্ত  
নিরুপায় সর্বস্বাস্তদক্ষিণা...শুষ্কগভীর নির্দোষ আগ্নেয়  
গিরির ক্ষুধিতপাষণের ওপর তোমার সভ্যতার বিরাট  
সৌধ...তার ভিতর্টা বেজায় টলছে আজ...হাইড্রোজেন  
বম্বের জ্বল কান খাড়া ক’রে আছে সন্ধ্যা...তবু নিরালায়  
শুনবে কি কান পেতে...কোন পুণ্য-স্মরণ-সম্ভার সুদূরের  
বেদগীতি...ঐ যে ভেসে আসছে—শৃঙ্খল বিশেষ অমৃতত  
পূজা...“অপাম সোমমমৃত্য অজম, অগম জ্যোতিরবিদ্যম  
দেবান্। কিং নুনমেনং কৃণবদরাতিঃ, কিম্ ধৃষ্টিরমৃতং  
মর্তস্য ॥”

অমৃতের পুত্র ভূমি নর ! শোন অমৃতের বাণী  
“শিব ভালে করিত যে সোম, সে সোম করেছে পান,  
পান করি হ’লাম অমৃত । খুলি তমসার দ্বার  
পশিলাম জ্যোতিঃ অনির্কণ । জানিলাম আপনারে,  
বলি দেব ছাতিমান্ । এ অমৃতে কেমনে হানিবে বল  
তমসায় বাস যার, সেই ক্রুর বৈরী ধৃষ্টি মরতের ।”

# মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীবীর

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি মূল্যে যে এই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব অধিকাংশই স্মরণে রাখে না। রাখিলে মুষ্টিমেয় ষাঁহাদের ত্যাগ-তপস্বী, সংকল্প-সংগ্রাম আর অকথ্য নির্যাতনের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আসিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার অঙ্ক থাকিত না। এই বিশাল দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে এমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য। ভাবিলে আশ্চর্য্যই হইতে হয় যে, ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনের ইচ্ছা যেন মূর্ত্ত হইয়াছে স্বল্প কয়েকজন বীর বোদ্ধার মধ্যে। তাঁদের আপন বলিতে, আত্মস্বার্থ বলিতে, গৃহ-পরিজন বলিতে কোন কিছুই ছিল না। তাঁদের জীবন ছিল দেশের জন্য। দেশের কল্যাণকল্পেই তাঁদের প্রাণ-প্রদীপ নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অনির্বাক্ত জলিয়া জলিয়া চরিতার্থ হইয়াছে। এমনি একজন আত্মভোলা দেশ-পাগল ছিলেন বিপ্লবীবীর অধিকা চক্রবর্তী।

বিপ্লবী অধিকা চক্রবর্তীর জীবনকাহিনী রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি অধুনা পূর্ব্ণ প্রাকিস্থানের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার দেওয়ানপুর-কোয়েপাড়া নামক এক অখ্যাত গ্রামে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য জীবন পিতা নন্দকুমার চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গ্রাম্য পাঠশালায় অতিবাহিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্তের প্রেরণায় তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে দামোদর বস্তুয় শ্বেচ্ছাসেবকের কাজে তৎকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঐচক্রবর্তী স্বগ্রাম হইতে এণ্ট্রেন্স পাঠ সমাপন করিয়া রেলওয়েতে এক চাকুরীতে যোগ দেন। চাকুরীতে থাকাকালেই ১৯২১-২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি পদে বৃত্ত হন। এই সময়েই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হন। চাকুরীতে অবস্থান কালেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট হন এবং চট্টগ্রামের

বিপ্লবীদের গুপ্ত বাঁটিতে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ঐ সময় তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের নিকট বিপ্লব মস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণের জন্য নিজেকে রাজনৈতিক কার্যে নিয়োজিত করেন।

১৯২৩ সালে সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অহিংস আন্দোলনের প্রবাহ বহিতে থাকে। সেই সময়ে চট্টগ্রামের অনতিদূরে নাগরা পাহাড়ের নিকট চলন্ত ট্রেন হইতে প্রায় ২০ হাজার টাকা লুট সম্পর্কিত অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি সঙ্গীগণ সহ কিছুকাল আশ্রয়গোপন করেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পর সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাদিগকে বিরিয়া ফেলে। সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে পুলিশের গুলিতে মাষ্টারদা ও ঐচক্রবর্তী আহত অবস্থায় 'সাইনেট অব পটাশ' খান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের জীবন রক্ষা পায়। পুলিশ তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। প্রায় ৯ মাস ঐ মামলা চলার পর, তাঁহারা সকলেই মুক্তি পান। মুক্তি পাইলেও, পুনরায় ঐচক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া ৪ বৎসর কারাবাস ভোগ করেন। কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম নগরে অজ্ঞাগার লুণ্ঠনে যোগদান করেন।

চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবীগণ চট্টগ্রাম জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয়গোপন করেন। সেই সময় মিলিটারী ফোর্সের সংঘর্ষে ঐঅধিকা চক্রবর্তী আহত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হন। সঙ্গীরা তাহাকে মৃত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন। সংজ্ঞা লাভের পর পাহাড় হইতে হামাগুড়ি দিয়া বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিকটস্থ জনৈক কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একজন চিকিৎসকের চিকিৎসায় থাকিয়া অস্থূল হওয়ার পর কিছুকালের জন্য আশ্রয়গোপন করেন। অতঃপর ঐচক্রবর্তী পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন এবং ১৯৩০ সালের ৩রা জানুয়ারী চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইব্যুন্সালের বিচারে ফাঁসীর হুকুম হয়। এই বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে



আপীল করা হয়। হাইকোর্টের বিচারে প্রাথমিকের হুকুম নাকচ হয় এবং যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

তৎকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসকে বিধা বিভক্ত করিবার জন্য জেলের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে মার্কসবাদের ও রাশিয়া হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি রাজনৈতিক কয়েদিগণের মধ্যে প্রচার করিত। সেই সময়ে অন্তান্ত অনেক ডেটিনিউয়ের মত শ্রীঅধিকা চক্রবর্তীও এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন।

১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

দেশ বিভাগের পরই তিনি উদ্বাস্ত পুনর্বাসন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাহারই চেষ্টায় সম্মিলিত বাস্তবহার্য পরিষদ গঠিত হয়। তিনি ব্যারাকপুর অধিকা কলোনির অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৫২ সালে শ্রীচক্রবর্তী পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্রে শ্রীতরুণ কান্তির সহিত ভোটদ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি উদ্বাস্ত পুনর্বাসন অভিজ্ঞতার জন্য রাশিয়া এবং ইউরোপের অন্তান্ত দেশও ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

অধিকা চক্রবর্তী, মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের পরামর্শ দাতা ছিলেন। তাঁহার ক্ষরধার বুদ্ধির জন্য দেশবাসী তাঁহাকে চাপকা বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। ভাগ্যের পরিহাসই বটে! ‘জীবন-মরণ পায়ের ভূত্য’ করিয়া যিনি অগ্নি-নালিকার সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছেন অনায়াসে, সেই বীরপুরুষ কলেজ স্কোয়ারের নিকট মটরের ধাক্কায় অপ্রত্যাশিতভাবেই আহত হন এবং কারাগারী হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস (৬ই মার্চ, ’৬২) ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

## জাতীয় পোষাক

শ্রীউমাপদ নাথ এম. এ.

মেয়ে-মেলা দেখে ফিরলাম।

ইনডাস্ট্রিয়াল শহর তো বটেই, ইনটারনেশনাল শহরও বলা চলে। শুধু ইস্পাত নয়, হরেক দেশের মুখপাত পাবেন এখানে। নানাদেশের মেয়েদের যে লাইন দেখলাম, তাতেই চিনে ফেললাম এর নাড়িকে। কারণ, নারীর মধ্যেই নাড়ির নড়ানড়ি। গৃহিণী দিয়ে গৃহ, আর সেই গৃহের মধ্যেই গৃহকর্তা।

হ্যাঁ, যা দেখলাম। সে মেয়েদের মেলা তো নয়, প্রজাপতির পাখার মালা। হরেক রং আর হরেক ঢং। শাড়ি, সালোয়ার, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ব্লাউজ, গাউন, পেটিকোট, কোট, ওড়না সব পাবেন। শাড়িও বহু-বিচিত্র। পাবেন বোম্বাই প্রিন্ট, পার্শি জর্জেট, চণ্ডা-পাড় শান্তিপুত্রী, ত্রিমাণ কলেজ-পাড়, রঙিন ধান, মণিপুরী হাণ্ডলুম। পায়ে পাবেন চপ্পল, হাইহীল, নাগরা। আবার খালিপায়ে মলও। কারও বেগী, কারও খোঁপা, কারও বব্। খচাখচে, মচামচে আর বনৎকারে বিশ্ববীণার বাংকার। আমাদের মতো মামুলি লোকের কথায়— ঢংকার। হাজার দেশের হাজার মেয়ে দেখে ধত্ত হলাম।

গিন্নীকে বললাম, দেখলে, এখানে কত জায়গার লোকের বাস। এখানে বসেই অধেক পৃথিবীর খাদ পেতে পার তুমি।

বললে, তাইতো, চীন থেকে আমেরিকা-তক একটা

লইনের নমুনা পাওয়া গেল। সত্যিই, ইনটারনেশনাল শহরই বটে!

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় বাসায় বেড়াতে এলেন এলা চ্যাটার্জি। এই নগরী-বিখ্যাত ই. সি-ই ছিলেন ঐ সব এলাহি কাণ্ডের স্বাভাবিকতা। তাঁকে একখানা ধুম্রবাদ না দিয়ে পারলাম না। বললাম, আপনাদের এখানে তাবৎ ছুনিয়ার মেয়েদের দেখার ভাগ্য হ’ল আমাদের।

কী করয়। হাসি-হাসি নেত্রযুগল গোলাকার করলেন ই. সি।

বললাম, কেন, কত দেশের মেয়েদের ফাইল দেখলাম মেলায়। সেটা কি কম কথা?

এলাদি হেসে ফেটে পড়লেন এবার। খুব জব্ব হয়েছেন তা’হলে আপনারা।

মানে?

মানে, দেখলেন কাদের? কেবল শিশু-পোষাকের মধ্যে একজন ছিলেন শিশু-মহিলা আর কাছা-দিয়ে শাড়ি পরার মধ্যে একজন ছিলেন সন্ধ্যাপুত্রের। বাকী প্রত্যেকটা খাস বাড়ালী-মেয়ে।

আমি তো ৭ মেয়ে গিয়েছি। গিন্নী নিখাস নিলেন অনেকক্ষণ পরে।

বলা হয়নি, মেলার ঐ দৃষ্টটি ছিল ‘কাম ইন ইণ্ডর ওন্‌ ড্রেস’-এর সম্মানে।

## আমার মা

শ্রীমুন্সীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

স্বর্গাদপি গরীয়সী মা আমার। এ মহীমণ্ডলে তোমার তুলনা তুমিই। মা! মা! মা! কত কত কাল আমি তোমার কোল ছাড়া। উনিশ বৎসরের তোমার 'খোকার' তোমার কোল ছেড়ে শোয়নি। পাঁচ বছরের মরা ছেলেকে বাপ ধ্বস্তরীরূপে বাঁচিয়ে দিলেন তাকে তোমার কোলে। মাতার অতুলনীয় সেবাস্বত্ব পরিশ্রমে 'খোকার' বাড়বাড়ন্ত হ'ল অভাবনীয়রূপে। ধস্তা ধস্ত করিল মেডিকেল কলেজের খেতাব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরাও। যথার্থ মাতৃরূপের অকৃত্রিম চিত্র তাদের মনেপ্রাণে আঁকা হ'য়ে গেল।

তোমার সেই উনিশ বছরের খোকা আজ ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ। লোকে বলাবলি করেছে অষ্ট বছর গর্ভধারিণী তুমি। সব বহু গেছে, বাকি আছি মাত্র আমি। কি জুধাই পান করিয়েছিলে মা! সংসার গরল আঠেপুষ্টে আমার স্বক ভেদ ক'রতে উদ্যত এখন। 'জাহি জাহি মে পরমেশ্বরী!'

তোমার আশীর্বাদে মা, বাবা আমাকে দেন লক্ষ্মী-রূপিণী সহধর্মিণী। সে দান মাতৃহারা তোমার খোকার পক্ষে হয় স্বর্গের পারিজাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মরধামের লীলা অবদান ক'রে সেও আমাকে একা ফেলে চ'লে গেল।

মাগো তোমারই আশীর্বাদে লক্ষ্মীবস্ত হয়েছিলাম। এখন আমি লক্ষ্মীহারা, মাতৃহারা। দাঁড়বার স্থান আমার কোথায়। মা! মা! মা!

তুমি ছিলে মা বড় জমিদারের আদরের কন্যা। তোমায় নবম বৎসরে গৌরী দান করান তোমার ধর্মপ্রাণ পিতা। 'অষ্ট বছর জননী তুমি হও মা। বিবাহের পূর্বে পিতার কোড় আলোকিত ক'রে জমিদারী কাচারিতে তুমি দেখা দিলে প্রজামণ্ডলী তোমাকে দেখে পুলকিত হয়। আরও পুলকিত তুমি তাদের কর—তাদের অনেকের থাজানা তোমার বাবাকে দিয়ে মকুব করিয়ে। আমার সেই মার কাছে তাঁর আদরের 'খোকার' ঝটিতি আয়ু হরণের প্রস্তাব পরম পিতার দরবারে পেশ করিয়ে তা' মঞ্জুর করিয়ে নিতে—আমার সকাতর প্রার্থনা, ভিক্ষা।

মা! আবার তোমার কোলছোড়া হ'য়ে তোমার 'খোকার' বৌ-এর হাত ধরে দিব্য আদিনায় গড়াগড়ি দিতে পারি পায়ের ধূলা তোমার মাথায় নিয়ে।

ইহজগতে প্রত্যক্ষ করেছি মা তোমার অপরিমিত শক্তি। কানাকানি শুনেছি, যে তুমি দৈববলে বলীয়ান। অনেক ঘটনায় বিশেষতঃ একটীতে সে বল প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে আপামর সকলের। ধর্মকর্ম করণ কালে, বার-ব্রতাদি সম্পাদন সময়ে শুদ্ধাচার সৌম্য ব্রাহ্মণের মুখ নিঃসৃত হইয়াছে এ দেবীর দেবী আরাধনা।

চতুর্দশ বর্ষব্যাপী সাবিত্রী ব্রত। ত্রয়োদশ বর্ষ ব্রত সম্পাদিত হইয়াছে। চতুর্দশ বৎসরে ব্রত উদ্ঘাপনের জন্ত ব্রতচারিণী প্রস্তুত। ব্রত উদ্ঘাপনের ঠিক তিন মাস পূর্বে স্বামী শয্যা লইলেন তীব্র অসুস্থ হইয়া। এখন ষায়, তখন ষায় এই অবস্থা।

স্বামীর সেই নিদারুণ অবস্থাকালে স্বাক্ষরী প্রথম হইতে স্বামীর কক্ষের এক কোণে এক বস্ত্রে যুক্তিপারি শায়িত হইলেন। পূজার্চনার নামগন্ধ নাই। দিনের পর দিন মলমূত্র ত্যাগের প্রকোপ তাঁর নাই কিছুমাত্র। কাহারও সহিত এমন কি স্বামীর সহিতও কোনও বাক্যালাপ নাই কয়দিন ধরিয়া। কয়দিন পূর্বে সেই যে যুক্তিকা শয্যা তিনি লইয়াছিলেন, সেইখানেই নীরব নীথর হইয়া তিনি পড়িয়া আছেন।

সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা স্বামীর চিকিৎসায় নিযুক্ত। তাঁহারা আসিতেছেন, ঘাইতেছেন। পুত্রেরা ভাহাদের করণীয় কর্তব্য করিতেছে। কোনও কিছুতে স্বাক্ষরী দৃকপাত নাই; একদিন প্রাতে মহাত্মকের কথা শুনা গেল। "আজকের দিন কাটে কিনা কাটে"—চিকিৎসকেরা স্তব্ধমান। চিকিৎসকদের পরামর্শে জুরেশপ্রসাদ স্বয়ং ঔষধাদি আনিতে গেল।

কিছু পরেই বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া এক ফকির চিমটা বাজাইয়া বলিয়া ঘাইতেছে, 'দুওয়া সের আটা দেলায় দে রাম'—শুনা গেল। কয়দিন ধাবৎ যুক্তিকানুষ্ঠিত স্বাক্ষরী সেই ধ্বনি শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া ফকিরকে

আত্মান করাইলেন এবং তিনি আসিলে অনতিবিলম্বে ভোজ্যাদি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণত হইলেন।

ফকির বলিলেন, ‘তেরা ভগবান ভাল ক’রে’। ভোজ্যাদি লইয়া ফকির চলিয়া গেলেন। এই ফকির আমার পিতৃদেবের খুবই সুপরিচিত। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া কত আধ্যাত্মিক কথা কতদিন দুইজনের মধ্যে হইয়াছে। ফকির কিন্তু পিতৃদেব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না এখন।

ফকিরকে সম্বোধন করিয়া মাতৃদেবী কয়দিন বাদে স্নান শৌচাদি করিলেন। পূজায় বসিলেন। চরণামৃত লইয়া আসিয়া স্বামীর মাথায় ছোয়াইলেন। তাহার পরে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন তিনি।

সুরেশপ্রসাদ চিকিৎসকসহ ঔষধ লইয়া ফিরিলে চিকিৎসকদের পরীক্ষায় দেখা গেল, রোগীর নাড়ী ও হৃদগতির স্পন্দন স্বাভাবিক। সাধারণ অবস্থা রোগীর আশাতীতভাবে উন্নত। ডাক্তারেরা সহর্ষে বলিল, টাল কাটিয়া গিয়াছে, আর কোনও ভাবনা নাই।

টাল কাটিল কিসে? বিন্দুমাত্র ঔষধও পড়ে নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত। সাবিত্রীসহ ধর্মপত্নী তাঁহার তখন ইষ্ট পূজায় বিস্তার।

ইহার তিন মাস পরে মাতৃদেবী সাবিত্রী ব্রত উল্লাসন করেন ষাণ্মাষ্যে এবং তিন মাস পরে মাত্র সপ্তাহকালের অসুস্থতায় স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন এই আমার মা।

আমার জীবনগঠিত হয় মাতৃ প্রভাবে। গন্ধাজলের স্নায় স্বচ্ছ তাঁহার হৃদয়। দেব-বিজগত প্রাণ। তীর্থ দরশনের আগ্রহ তাঁহার বড় দেখি নাই। কালীঘাটে কালী মর্শনে যান তিনি মাত্র দুইবার তাঁহার কলিকাতার সুদীর্ঘ জীবনে। যোগেশ্বরেও গন্ধান্নান করিবার নামও তিনি কখন করেন নাই। অথচ এই মহীয়সীর সমুদীন হইয়া ভিন্ন ধর্মীয় মহিলারাও সশ্রদ্ধায় নত মস্তক হইয়াছেন। তাঁহারা অভ্যর্থিত হইয়াছেন পরম সমাদরে। সেই কালে হিন্দুমুসলমান, খ্রিস্টানের এই অবাধ মিলন নিশ্চয়ই স্বর্গীয়। হিন্দু মহিলার উদারতাও লক্ষ্যীয়।

মাতৃদেবীর উদারতা, একপ্রাণতা, একাত্মবর্জিতা ও পবিত্রতা পাথের করিয়াই সংসার অর্গবে তেলা আমি ভাসাই। অর্দ্ধাদিনী আমার এ গুরুভার বহনে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেন। চিরন্তন লক্ষ্য থাকে আমার উচ্চাশ্রয়ের প্রতি। ইহার মূল ইহাদের দুইজনের স্বর্গীয় প্রভাব।

খেলা খেলিতে হইয়াছে জীবনে অনেক। মাতৃদেবীর আশীর্বাদে পরাজিত হইতে হয় নাই কখনও। এফ-এ পরীক্ষার ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকে পড়ি, Influence of Mother, মাতৃ অঙ্ক হইতে এ Influence ওতপ্রোতভাবে আমার উপর বিস্তারিত হয় অতি সহজে। মাকে চিনিবার মত অমন চেনা আমার বাল্যে-কৈশোরে আর কাহাকেও চিনি না।

মা ছিলেন নামজালা জমিদারের মেয়ে। হলেন তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ধনুত্তরীসহ ভীষকপ্রবরের সহধর্মিণী—বঙ্গ তথা ভারতের কুলে, শীলে, জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের ধর্মাত্মা পণ্ডিতপ্রবর যত্নাথের পুত্রবধূ। রত্নপ্রসবিনী হইয়া বিবিধ রত্নে বঙ্গের মুখ সমুজ্জ্বল করাইলেন।

এতবড় হইয়াও দান্তিকতার ছায়া কখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সমদৃষ্টি তাঁহার সকলের প্রতি। তাঁহার স্নেহ-ভক্তিতে ধনী, নিধন, উচ্চ-নীচের তারতম্য কখনও কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। অল্প-পরে কা কথা, দেড়শত ব্যক্তিকে প্রত্যহ স্বর্গহে আহ্বার দুইবেলা করাইয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। পুত্র কন্তার আহাধ্য যা, সেই আহাধ্যই সকলকে প্রদত্ত হইয়াছে। একচুল পার্থক্য ইহাতে ঘটাইবার কাহারও মাথো কুলায় নাই। পূজায় নব বস্ত্রাদি প্রদত্ত হইয়াছে সকলকে একরকমের। আর অসংখ্য বহুমূল্য বস্ত্রাদি নিজের থাকিলেও, মাতৃ অঙ্ক অশোভিত হইয়াছে চিরদিন লালপাড় সাধারণ সাড়ীতে।

রত্ননে মাতৃদেবী ছিলেন জ্যোতী, অন্ন বিতরণে ছিলেন অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সদাই উজ্জ্বল থাকিয়াছে। ভাণ্ডারের কি রূপ, কি লী। লক্ষী স্বয়ং যেন সেখানে বিরাজ করিতেছেন। এত ব্যয়, কিন্তু কোনও কিছু অপচয় হইবার কোথাও উপায় নাই—মাতৃদেবীর অগৃহীণনায়।

বিতরণের সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু আহাৰ্য্য পাত্র বা অজাবরণে তিলমাত্র অপব্যবহার হইতে দিবেন না তিনি কিছুতে। তাঁর ‘অষ্ট বস্তু’কেও এ নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে হইয়াছে তাঁহার গৃহিণীপনার আওতায়।

কলের মত কাজ চলিতে দেখিয়াছে সকলে মাতৃ-দেবীর গৃহিণীপনায়। প্রত্যহ প্রাতে ভাণ্ডার খোলা হইত একবার মাত্র। সেই সময়েই সারা সংসারের সারা দিন রাতের সকল ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। কোনও অনটন কখনও ঘটে নাই। সারাদিন ভাণ্ডার খোলার কোনও প্রয়োজন কখনও পড়ে নাই।

মাতৃদেবী ব্যঞ্জনাদি কুটিতেন স্বহস্তে। অন্ন বাহারী তাঁহাকে সাহায্য করিত তাহার মাতৃদেবীর অহঙ্কা মতই কার্য্য করিত। পান সাজিবেন মা নিজে। সহস্রাধিক পান বাটীতে প্রত্যহ সাজা হইত। আহাৰ্য্যাদির তত্ত্বাবধান মা ছাড়া আর কে করিবে! ছেলেনের আপিদ-ইষ্টুলের ভাতের উপর মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাদের পড়াশুনার দিকেও তার কড়া নজর।

এক এক করিয়া ঘরে যখন ‘বৌ’ আসিতে লাগিল, মায়ের গৃহিণীপনার রূপ তিলমাত্র পরিবর্তিত হইল না। কাহারও হাতে ‘সেবা’ লইতে ইতস্ততঃ ভাব মায়ের

চিরদিন দেখা গিয়াছে। সুসংস্কৃত, সুপরিচ্ছন্ন তাঁহার চিরদিনের জীবনযাত্রার ক্রটি বিচ্যুতি পরের হাতে ঘটবার আশঙ্কাতেই তাঁর ইতস্ততঃ ভাব। তার উপর অলসতা, আন্তরিকতার অভাব বা অনিয়মালুর্বৃত্তিতা চ’খে পড়িলেত’ কথাই নাই। প্রকৃতপক্ষে সেবার মত সেবা না লইয়া মা চলিয়া যান, সগর্বে স্বধামে সকলের সেবা করিয়া ও ভগবৎ পদে অটুট মতি রাখিয়া।

মনে পড়ে ছয়দিনের অল্পস্বতায় মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। যে রাত্রিতে তিনি চলিয়া যাইবেন, সেই দিন প্রাতের আহাৰ্য্য তিনি আমাকে খাওয়ান সামনে বসাইয়া। আমার মুখরোচক আহাৰ্য্যাদি পাতে পড়িয়াছে কিনা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খোঁজ করেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন, তখনও পুত্রের আহাৰ্য্য কচির নিখুঁত হিসাব তাঁর নখদর্পণে। এই ছিলেন আমার মা। এই ছিলেন বাঙালী হিন্দুর মা জননী।

রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে বাবার কোলে মাথা রাখিয়া সজ্ঞানে মা আমার ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। বাবা সহর্ষে বলিলেন, আমার কর্তব্য শেষ, এখন তোমাদের কর্তব্য তোমরা কর।

আমাদের কর্তব্য-আমরা করিয়াছি কিনা বিদেহী আত্মা পিতা-মাতার অজানা নাই।

## ছেড়ে আসা বাড়ীকে

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

আর বহুদূর থেকে আমরা টেনো না বারবার  
সে তোমার আম জাম কাঁঠালের সম্পন্ন স্মৃতিতে;  
সেই পুকুরের আলো-ঝলমল বিস্তৃত রীতিতে  
আমার মনের কাছে রচোনাকো শিল্পের সংসার।

সে হারানো শৈশবের, যৌবনের প্রভাতী-আশার  
মুহুর তরঙ্গ খেলা হৃদয়ের এ-বেলাভূমিতে  
আবার জাগাবে কেন? কুটিলের শাপিত কব্রাতে  
কেটেছে নাড়ীর গ্রন্থি—বেদনার আর্তি অলুচ্যার।

অনেক উদ্বেগে-ভরা আমার এ-রাত্রির শিয়রে  
দীঘির জলের স্বচ্ছ আলো নিয়ে জাগবে না চাঁদ;  
সেই বুড়ো বটগাছ, অশ্বখ ও হিজলের ভিড়ে  
বুথাই ইচ্ছার পাখী নীড় বাঁধে, আনে অবসাদ।  
জন্মের নাড়ীর সাথে তোমার মাটির মধুস্বাদ  
যদিও জড়িয়ে আছে—সে তো আজ দূরের সংবাদ।

# পরামাণিক

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্বার

বিমানবাবু সত্যই একজন অসামান্য ব্যক্তি, নয় তো ছ'-সাত দিনের ভেতরেই নতুন ভাড়াটে এসে নিজেকে খেঁচাবে প্রকাশিত করেছেন তা অবর্ণনীয়। ছোট একটা একতলা বাড়ী, আর এই বাড়ী ভাড়া নিয়েই থাকেন তিনি। সকাল সাতটার মধ্যে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আর ফেরেন সাতটা আটটায়। তাঁর চাকর ভজ্জাও বেরিয়ে যায়, আর ফেরে প্রভু ফেরবার এক আধ ঘণ্টা আগে। সারাদিন ঘরে তালো নাগানোই থাকে।

তাকে এ রকম পরিশ্রম করতে দেখে পাড়ার লোকেরা তাঁকে কম পরিশ্রম করতে অহুরোধ করলে প্রত্যুত্তরে বিমানবাবু 'স্বিঙ্ক হাসি হেসে উত্তর দেন,—“দে'খুন মাহুষের জীবনটাই হ'ল কাজের জন্ত—শুয়ে বসে ঘুমোবার জন্ত নয়’।

লজ্জিত হয়ে সরে পড়েন প্রহরকর্তারা।

এরকম অহুরোধের অন্তরালে নাটকীয় ঘটনাও জড়িত। কেননা, এহেন বিমানবাবুর কথা পাড়ার গৃহিণীরা জানতেন না তা কি করে সম্ভব হতে পারে? ছ'একজন ছাড়া ধারা কেরাণীকুলের গৃহিণী তাঁরা তাঁদের স্বামীকে উঠতে বসতে বলেন—“এ বিমানবাবুর পরিশ্রম দেখে শেখো! ভজ্জলোক কত পরিশ্রমী। আর তোমরা দশটা পাঁচটা আপিস করেই যেন আমাদের মাথা কিনে ফেলো। শুধু চা আর সাদা কাঠি জালিয়ে কি করে আড্ডা মেয়ে সময় নষ্ট করা যায় তারই কল্পনা করো। লজ্জাও করে না। ছিঃ!”

তার পরেই বিমানবাবুকে চলে অহুরোধের পালা। কিন্তু সবই বুধা। দিনকয়েক পরে এই পাড়ারই ভজ্জহরি-বাবু—থাকে তাঁর বন্ধুরা বলেন যে তাঁর স্ত্রী নাকি তাঁকে মাহুষ করেছেন—অবশ্য একথা তিনিও অস্বীকার করে ঝামেলা বাড়াতে না—সেই ভজ্জহরি সামস্তই একদিন সহ্য করতে না পেরে বিমানবাবুর বাড়ীতে এসে তাঁর যথেষ্ট সময় নষ্ট করলেন আজ্ঞে-বাজ্ঞে কথা বকে-বকে। পরে অবশ্য ক্ষমাও চাইলেন অথবা সময় নষ্ট করার জন্ত। বিমানবাবু অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিতে আপ্যায়িত করে বিদায় দিলেন তাঁকে।

ভজ্জহরি বাড়ী ফিরে গৃহিনীকে ডেকে বললেন আরে যা ভেবেছিলাম তা একটুও নয়, বিমানবাবুও আমাদেরই মতন। এই দেশ না প্রায় ঘণ্টাখানেক (আসলে দশ পনেরো মিনিট মাত্র) গল্প করে এলাম ওর সাথে।

কিছু প্রত্যুত্তর না দিয়ে আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঢাকার জ্বালার মতন দেহটা নিয়ে রাস্তা ঘরে চলে-যান। ভজ্জহরিবাবু ক্যাকাশে মেয়ে যান। ভাবেন, শুধু ঘরে এই অশান্তির মূল ঐ হতভাগা বিমান ডাক্তারটাই।

এরপর পেশকার নগেনবাবু গিয়ে একদিন হাজির বিমানবাবুর বাড়ী।

নানা প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি স্ত্র, করেন থেকে ছৈনিং নিয়ে এসেছেন?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে উত্তর দেন বিমানবাবু, আজ্ঞে না।

দেখুন, কিছু মনে করবেন না—আপনার মাসিক আয় কত?

অনিচ্ছায়ই বিমানবাবু বললেন, খুব কমও নয়, খুব বেশীও নয়, চলে যায় এইমাত্র। আজ্ঞা নমস্কার—আমার একটু বাইরে কাজ আছে, ক্ষমা করবেন।

বাধ্য হয়েই নগেন ঘোষালকে উঠতে হলো প্রতি নমস্কারের বিনিময়ে।

ঐ পাড়াতে আমিও থাকি। সে দিন রাতে হঠাৎ ছোট ভাইয়ের বমির ঘটা দেখে ভয় পেয়ে ছুটলাম বিমানবাবুর বাড়ীতে। দরজায় কয়েক ঘা মারতেই দোর খুলে গেলো এবং স্বয়ং বিমানবাবুই দোর খুলে দিলেন।

—একটু দয়া করে এক্ষণি আসুন বিমানবাবু ছোট ভাইটার কিরকম বমি হচ্ছে...ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি করে বলি আমি।

—কাকে? আমাকে বলছেন? আমি তো ডাক্তার নইঃ হেসে জবাব দেন বিমানবাবু।

—কি বললেন? তবে আপনি কি! সে দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম যখন তখন যে বললেন—“এখন কথা বলবার সময় নেই, বিকালে আসবেন, একটা “কল” এসেছে।” বিশ্বয় প্রকাশ করি আমি।

জ্ঞান হেসে বিমানবাবু বললেন—আমি? আমি বাংলাদেশের একজন হতভাগ্য পরামাণিক।

## ভাবনার কথা

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

অপ্রিয় সত্য প্রকাশে আমাদের শাস্ত্রীয় বা লোক-চারের বাধা রয়েছে বলেই বোধকরি আজ মানুষের মহতী মর্যাদা ঐষ্ট হয়ে দেশের অগণিত নরনারী ক্রত পদে পশুত্বের ধাপে নেমে গেলেও, তার প্রতিকারের জন্ত কেউ বড় একটা এগিয়ে আসছেন না—আর যার নিজের চরিত্র সর্বাংশে নিষ্কলুষ নয়, তাঁর কথা শুনবেই বা কে, ফলই বা হবে কতটুকু? আমাদের ছেলেবেলায় যেসব আদর্শ পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি আজ সারা দেশ টুঁড়লেও তাঁদের মত একজনেরও সাক্ষাৎ মেলে না। সময় যে সত্যই বড় ইতর হয়ে পড়ছে।

আগে পাড়ারগায়ের নিরক্ষর লোকদের মুখে প্রায়ই শোনা যেত—“অমকের কালির অক্ষর ধড়ে আছে—ওর বুদ্ধি-জ্ঞানের কাছে আমরা মুখখুঁখু লোক দাঁড়াব কি করে?” কিন্তু আজ অক্ষরহীন কালির অক্ষর ধড়ে থাকা সত্ত্বেও, আমরা ক্রমশই যে চরম কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ছি। দুই ক্ষতের মত সমাজের সর্বস্তর আজ বিধিয়ে গেছে। উচ্ছৃঙ্খল ইওয়াটাই যেন যুগধর্ম দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বাপমায়ের কথা শুনছে না—স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হচ্ছে, ছাত্র শিক্ষককে বৃদ্ধান্ত দেখাচ্ছে, ভৃত্য মনিবকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করছে—বিনয়, নম্রতা ভব্যতা নব্য বাংলার অভিধান থেকে যেন একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে। চির নমস্ত জাতির জনকের আইন অমান্যের ইহা ফল কিনা, কে জানে? হয়ত বা সাহসীকতার সঙ্গে সম্মুখ সমরে ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে লড়ে প্রচুর রক্তমোক্ষণের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করলে জাতির চরিত্র নির্মলতর হবার ও জাতীয় জীবন ক্রত উন্নততর হওয়ার সম্ভাবনা থাকত বেশী। বর্তমান সময়ে ক্ষীণ আশার আলোও ত চোখে পড়ছে না। পরম আশাবাদীরাও যে আজ হতাশ হয়ে পড়ছেন।

হেঁচকি হট্টগোল আজ সর্বত্রই এত বেশী হতে আরম্ভ করেছে যে, কেউ ধীর চিন্তে কোনও বিষয় তলিয়ে দেখবার চুরসং পাচ্ছে না। সিনেমা রেডিওর সং বা শিক্ষণীয়

বিষয় ফেলে উহাদের ধারণটাই ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করে জাহান্নামে যাচ্ছে। মূর্খণ যন্ত্রণা ছেলেমেয়েদের চরিত্র ভ্রংশের এবং ক্রীবদ্ধ উৎপাদনের কম রসদ যোগাচ্ছে না।

ফলতঃ শিক্ষার মাধ্যম যেগুলি সেগুলি, ছাত্রকামি ও ভণ্ডামিই বেশী শেখাচ্ছে, অকালপকতা ঘটিয়ে ছেলেমেয়েদের বাকসর্বস্ব করে ফেলেছে, কাজকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করছে। তারপর আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চিরন্তন ধারাই হ'ল হাতের কাজকে সর্বতোভাবে চরম ঘৃণার চক্ষে দেখতে শেখানো। যিনি কোনও প্রকার হাতের কাজ না করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই বরণ্য। এমন কি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যারা যজ্ঞ-যাজন করেন বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা করেন, তাঁরা নিছক ‘থিওরেটিক্যাল’ (গুরু-গিরি পেশাদারী) ব্রাহ্মণদের তুলনায় অবজ্ঞার পাত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সুতরাং ইহাই যখন এদেশের সনাতন নীতি, তখন যারা চাষ করেন, মাছ ধরেন, কাপড় বোনেন, করাত চালান, দা-বাঁটি বা কাণ্ডে-কোদাল তৈরি করেন, এক কথায় যাদের অবনানের উপর জাতি ও সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তাঁদেরকে যে বাঙালী সমাজ চরম উপেক্ষার চোখে দেখবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা কথায় কথায় রাজর্ষি জনকের হল চালনার কথা উল্লেখ করি, “সবার উপরে মানুষ সত্য” প্রভৃতি গালভরা বুলি আওড়াই, কিন্তু কাজের বেলায় ঘৃণার ভাব বোল আনা পোষণ করতে কহর করি না, অন্ততঃ কিছুদিন আগেও।

ইংরেজরা কোনও কাজকেই ঘৃণ্য মনে করেন না—তাই তাঁদের মধ্যে মুচির ছেলেও প্রতিভাবান হলে প্রধান মন্ত্রী হতে পারে, সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভও তার কাছে কঠিন নয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা এই কথা পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও, এবং ইংরেজের অধীনে দুইশত বৎসর থেকে তাদের আদবকায়দা, ভাষা প্রভৃতি যথেষ্ট আয়ত্ত করেও, আমাদের মনের পরিবর্তন হ'ল কই?

তারপর দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ  
বাঙালীর মন যেন আরও সঙ্কীর্ণতর হতে শুরু করেছে।

অপর পক্ষে সারা দেশ হৈছলোড়ে ছেয়ে গেছে। এমন  
দিন নাই যেদিন কোনও না কোনও মিছিল কলকাতার  
রাজপথে বেরিয়ে ধানবাহন চলাচলের বাধা সৃষ্টি না করছে।  
ধারা নির্ধ্যাতিত মানবতার দুঃখদুর্দশায় বিগলিতাশ্র হয়ে  
নগ্ন পদে রাজপথ পরিক্রমা করছেন, তাঁদের কয়জন নিজের  
দুঃখ ভাইবোন বা বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্ত  
ব্যাকুল হচ্ছেন বা সাহায্য করছেন? সত্যিকারের দেশ-  
সেবার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা যে বর্তমানে  
পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।  
অধিকাংশ স্থলেই দেশসেবার নামে অকথ্য গলাবাজি  
আর জনসাধারণের মনের মধ্যে অসুন্দরকে জাগিয়ে  
তোলার আশ্রয় চেষ্টা চলছে। প্রথিতযশা জার্মান  
কবি শিলার (১৭৫২-১৮০৬) বলেছেন—‘স্বপ্ন সিংহকে  
জাগিয়ে তোলায় চাইতে মানুষের দুঃখবৃত্তি জাগিয়ে  
তোলা অধিকতর ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক।’ কিন্তু নিতান্ত  
দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে বর্তমানে যে কোনও  
ওজুহাতে সাধারণ নিরীহ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলাই  
যেন মন্ত বড় কাজ বলে লোকে মনে করতে আরম্ভ  
করেছে। ফলে দেশের কাজের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস  
পাচ্ছে। আশু এর প্রতিকার না হলে কঠোর জীবন  
সংগ্রামের দিনে বাঙালীর অস্তিত্ব বজায় রাখাই দায়  
হয়ে উঠবে।

সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাণ্ড উৎপাদনের সম্বন্ধের কথা  
বলা দরকার। হাতের কাজ করলে যেখানে ঘণার পাত্র  
হতে হয়, সেখানে গাঁয়ের নিরক্ষর সচ্ছল চাষী মহেশ  
মাইতি তাঁর ছেলে রমেশকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাষ বর্জন  
করে বাবু করে তোলার স্বপ্ন দেখবেন এবং রমেশও  
ষৎসামান্য লেখাপড়া শিখে সামান্য মাইনের কেরানীর  
পদ দখল করবার বা শহরের কারখানায় ঢোকবার চেষ্টা  
করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? ফলে চাষের কাজ গিয়ে  
পড়ছে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অল্পধী ও কম শক্তিশালী  
লোকের উপর। আর এর পরিণাম যে কোথায় গিয়ে  
পাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। পল্লীর চাষী শ্রেণীর ক্রমশঃ

দুর্বল ও সংখ্যালঘু হওয়ার অপর কারণও উল্লেখযোগ্য।  
কঠোর শারীরিক শ্রমকারীদের মধ্যে কতটা জন্মে কম।  
একারণ চাষী যুবকদের—বিশেষ দুঃখ যারা—তাদের পক্ষে  
পাত্রী সংগ্রহ করাই দুর্ঘট। আবশ্যিক অর্থ সংগ্রহ করে  
বিবাহ করতে অনেক বয়স পার হয়ে যায়—পাত্রীও বেশী  
বয়সের মেলে না। বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত থাকায়  
পল্লী যুবকদের মধ্যে যৌনব্যাদির প্রসার দেখা যায় এবং  
এর ফলে তাদের অনেকেই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে  
অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রামের স্বাস্থ্যসম্মত জলহাওয়ার  
অভাবে ম্যালেরিয়া বা কলেরা বসন্ত অনেকসময় সংক্রামক  
আকারে প্রকাশ পায় এবং যৌনব্যাদিতে দুর্বলীকৃত  
স্বাস্থ্য যুবকরাই এ সব ব্যারামে বেশী প্রাণ হারায়।  
সাধারণতঃ ৩৫।৪০ বৎসরে এরা ১৫।১৬ বৎসরের স্ত্রী  
রেখে মারা যায়। এদিকে সমাজের উচ্চস্তরের অনুকরণে  
বিধবাবিবাহ এদের মধ্যে নিম্ননীয় বলে মনে হওয়াতে  
নানাপ্রকার ব্যভিচার সহজেই সমাজমেহে প্রবেশ করে  
উহার নৈতিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিয়ে থাকে।  
অতৃপ্ত যৌন জীবন যে সব যুবকের তারা স্বতঃই কাজকর্মে  
আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারে না—ফলে চাষ  
আবাদের অবস্থাও অবনতির দিকে যেতে থাকে।  
হুতরাং হাতের কাজকে উচ্চবর্ণের লোকেরা ঘণার চক্ষে  
দেখাতে এবং তাদের আচার ব্যবহার সারা সমাজের  
আদর্শ ও অনুকরণীয় হওয়াতে, গ্রামের চাষীদের ও অপর  
তার হাতের কাজের লোকদের উপর তার পরোক্ষ প্রভাব  
কিছুপা বিঘ্ন হলে, তা গভীরভাবে অনুধাবন করবার ও  
তার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় এসেছে—বিলম্বে  
সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য।

শিক্ষা ত আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘থিওরেটিক্যাল’।  
জানিনা বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু হলে  
কিছু স্বরাহা হ’বে কিনা। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে অধিকাংশ  
স্থলেই শিক্ষার্থীর বয়স অনুপাতে উচ্চতর দর্শন ও চিন্তা-  
মূলক প্রবন্ধাদির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। জার্মানি  
প্রভৃতি দেশে কিন্তু ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে অসামান্য  
প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজ, কামারের কাজ,  
ছুতারের, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির কাজের উপর সুন্দর সুন্দর

প্রবন্ধ দেখা যায়। সেই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভিজ্ঞতা যেমন বাড়িয়ে দেয় তেমনি সমাজ সংরক্ষণে ঐ সব কাজের মূল্য এবং ঐ সব কাজ ধারা করেন তাঁদের প্রতি একটা সজ্জ্ব আত্মীয়স্বজন মনোভাব জাগিয়ে তোলাও হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষা অধিকর্তাদের এদিকে কবে দৃষ্টি পড়বে জানি না। যে শিক্ষা মানুষের মনে প্রতিবেশী ও জগৎবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে না পারে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব ক্ষেত্রে বিজয় অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে, সে শিক্ষা জাতিকে বেশীদূর এগিয়ে নিতে পারবে না। শিক্ষার মধ্যে ধর্ম এবং রাজনীতি ঢোকানোও অতিশয় গর্হিত কর্ম। ধর্মের অতি প্রসঙ্গ দেওয়াতে এবং শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েই দেশ বিভাগ হয়েছে—যার বিষময় ফল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভুগতে হবে। কাজেই এখনও যদি অতীতের ঐ মারাত্মক ভুলের সংশোধন না হয়, মানুষকে মানুষ হিসাবে rational করে গড়ে তোলা না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন গণ্ডীর মধ্যেই বিভেদ এত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যে, তাতে করে দেশের প্রগতি অধোগতিতে পর্যাবসিত হবে। কোমলমতি বালক বালিকাদের জীবিত রাজনীতিবিদদের জীবনী কণ্ঠস্থ করানো অশুচিত। কালের কষ্টিপাথরে যাদের দান ও মনীষার যাত্রাই হয়ে না গেছে, তাদের কথা আগামীকালের শিক্ষার্থীদের জন্তই মূলতবী রাখা উচিত। আর একটি কথা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। ডিমোক্রাসি নামে যে ‘ডিমনের’ রাজত্ব শুরু হয়েছে—বিধান সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত (বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসংসদের নির্বাচন ব্যাপার অবধি) যে

পশুবলের প্রাধান্য লক্ষিত হচ্ছে—লাঠির মুখে সর্বত্র ভোট আদায় হচ্ছে—(জগৎ বিখ্যাত মনীষী ডক্টর রাধাবিনোদ পাল পর্যন্ত অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন) সেখানে মনে হয়, এই নীতি (ভোটাভুটির কদর্য ব্যাপার) আমাদের দেশে এখনও প্রযোজ্য হবার সময় বা অবস্থা আসে নি। একজন সার আশুতোষ একপাল্লায় আর হাজার জন ভোটের জোরে ‘নীট’ দখলকারী ‘সিনেটর’ অপর পাল্লায় দিলে কোন্ দিকে পাল্লা ঝুঁকে পড়বে, তা কি প্রকাশ করার দরকার ক’রে? শূন্য এক হাজার কেন, এক লক্ষ বা লক্ষ লক্ষ একত্র যোগ করলেও উহা যে শূন্যই (০) থাকে—সে ত গণিতের প্রাথমিক নিয়মের মধ্যে!

পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধির অতীত, পঠনপাঠন প্রভৃতির নিভৃত সাধনায় ধারা তন্ময়, তদ্বদর্শী সর্বদর্শী দেশকালের ক্ষুদ্রগণ্ডীর ধারা বাইরে, এরূপ প্রতিভাবান মনীষীরা শিক্ষার বিধায়ক না হলে কোনও দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ অগ্রগতি লাভ করতে বা শিক্ষার স্বফল পেতে পারে না। প্রকাশ্য বাঁধ, যেমন সিনেটের গলতির দোষে সহসা ধ্বসে গিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ ও ধনধান্যের বিপুল ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ, শিক্ষা-নীতির মধ্যে অগুমাত্র স্বার্থের সংশ্রব থাকলে সেই শিক্ষাও লোকের কল্যাণপ্রদ না হয়ে মহৎ দুঃখের আকরস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।—তারপর যে শিক্ষা মানুষকে কর্ম-বিমুখ না ক’রে তার মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তের বিকাশ সমভাবে করতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। যেদিন এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে নরনারী—সেদিনই দেশের সত্যকার কল্যাণ আশা করা যেতে পারে।

## সার্থকতা

সুখমা মৈত্র

হয়ে নারী এমনি করেই তোমায়  
ভালবাসার খেদারত দিতে হয়।  
নির্বোধ তুমি কত না আপন জানে সবই  
নিশ্চিন্তে বিলিয়ে দাও কত কিয়রে,  
যে শুধু নির্মম অভিনয়ে

সরঞ্জাম ভরে অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত রচনায়।  
নারীর শ্রেষ্ঠ ধন, ভালবাসা গুমরে মরে গৃধিনী কান্নায়।  
তবুও তোমায় ভালবাসা দিয়ে যেতে হয়  
হোক সে কিন্নর কিবা প্রেমিক হায়,  
সার্থক হয় ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে।



## ‘অধ্যাত্ম জীবন’

ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের একটা ক্রম বিকাশের ধারা ঠিক যেন নাটকীয় বলে মনে হয়। যাবতীয় ভাব ও ভাবনার মূলে রয়েছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-প্রবাহ। একেই আশ্রয় করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রগতির নিশ্চয়তা সুদীর্ঘ জীবনের চৈতন্য সম্ভার অন্বেষণ হয়, ইহা অনস্বীকার্য। তবুও ভবিষ্যতের পরিণতির পরিশ্রেক্ষিতে মানুষের যে অভাবনীয় অধ্যাত্ম চেতনার অস্তিত্ব, তাকে অপরিহার্য-রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেই। আধ্যাত্মিক জীবনপ্রবাহের যে বাস্তব ঘটনা, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে চাই মনে অদম্য উৎসাহ ও অমিত তেজঃশক্তি—যাকে আশ্রয় করলে আমাদের আত্মোপলব্ধির সহজ পন্থার আবিষ্কার হয়ে পড়ে। মানুষ প্রায়ই অনভিব্যক্ত সম্ভার উপলব্ধি করে সর্বশূন্যতার আনন্দ পেতে চায়, এটা তার সাংসারিক পরিণতি বলতে হবে, কিন্তু কামনা বাসনার প্ররোচনায় এই অনভিব্যক্ত সম্ভাকে অন্বেষণ করতে সক্ষম হয় না, কারণ মানবজীবনের বিকাশ ও উন্নতির পথে নিয়মিত তপশ্চর্যার প্রয়োজন ত আছেই, তাছাড়া যোগ-জীবনের আধ্যাত্মিক স্তরে উঠতে হলে জীবনকে কর্মময় করে তুলতে হবে।

প্রাণপুরুষ (Vital Being) যখন এই অনন্ত বৈচিত্র্য-শালিনী জীব-জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্ত অবতীর্ণ হন, তখনই সেই চৈতন্যশক্তি জ্যোতিঃ ও স্বীয় শক্তির মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির মধ্যে অন্বেষণে হয়ে মানুষকে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তুলেন, এটা তাঁর জড় চেতনার উপর প্রভুত্ব করাই বলতে হবে। মিথ্যা ভাবনার মোহজালে জীবের যে সং ও চিং সম্ভার সঙ্কীর্ণতা বোধ, তাহাতে শুদ্ধ মন ও প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাবেই আমূল পরিবর্তন (Radical Change) ঘটে থাকে। কেননা, একমাত্র চিংশক্তির জ্যোতিঃতেই আত্মিক জীবন পরিষ্কৃত হতে পারে। নতুবা সম্ভব নয়। যে হেতু ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানব চেতনার উর্দ্ধারন বিশিষ্ট মানব শরীরে ধীরে ধীরে উজ্জলভাবে প্রকাশ পায়। তারই ফলে সাধক

পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করেন। সাধকের অন্তর্জগতে যে একটা অনতিক্রমণীয় চৈতন্য উপাদানের সৃষ্টি হয়, তাহাই চলমান কর্মের দোতক। এই সচেতন শক্তিতে জৈবিক অধ্যাত্ম চেতনার প্রতিষ্ঠায় জীবন ও জগৎ-সমূহের ক্রমোন্মেষ হতে থাকে—যা থেকে পর্যায়ক্রমে মহাচেতনার আবির্ভাব হয়। ফলে, মানুষের জীবনপ্রবাহ এক মহামানবতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অবশ্য যাদের মধ্যে আকুলতা ব্যাকুলতার আবাহন না থাকে, তাঁদের মধ্যে নিখুঁত আত্মার প্রকাশ সম্ভব নহে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ আত্মার চেতনার সন্ধান না পায়, ততদিন পর্যন্ত তাহার অন্তরে সেই বিশ্বাতীত পরমাত্মার অবতরণ সম্ভব হবে না। জীবনকে মধুময় করে তুলতে হলে অকপট চিন্তে ঝাঁটি প্রেরণার প্রয়োজন। শুধু দৃঢ়নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাহায্যেই আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হ’তে পারে। নতুবা শুধু পাণ্ডিত্যের তর্ককাল বিস্তারে কখন প্রভুতি ও সিদ্ধিলাভ ঘটতে পারে না।

যখন অন্তরের চৈতন্যপুরুষ (Psychic Being) তাঁর নিজস্ব সত্তাটিকে আড়ালে রেখে বিশ্বের সামনে নিজেকে তমিপ্রাচ্ছন্ন করে পল্লিচয় দেন, তখন মনে হয়, এও তাঁর ভাগবতী শক্তির আর এক অধ্যায়, অধ্যাত্ম চেতনার এ এক নতুন বিচিত্র ভঙ্গী। আমরা স্বভাবতঃই দেখতে পাই, এই জগতে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তির চিরন্তন অভিধান চলে আসছে। এই আবর্তন হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ত আমাদের গভীর অন্তরতলে ডুবে যেতে হবে, একটা দিব্য চেতনার লক্ষ্যে। তখনই সাধক বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রসারশীল আত্মচৈতন্তের জ্যোতিঃর অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃতে রয়েছেন, এখানেই তাঁর দিব্যচেতনার অন্বেষণ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ আত্মাই ব্যক্তি সম্ভার একমাত্র প্রতিভূ। তিনি যেখানে পরমাপুর ত্রায় অবস্থান করেন সেখানের আসল নাম হোল-কুটস্থ চৈতন্য। এই কুটস্থের সঙ্গে সাধক স্বকীয় আত্মচৈতন্তের ঐক্য লক্ষ্য করেন এবং অস্তিমানস নামক দেবদান্য মার্গে আরোহণ করেন।

# অথ কবি কথা

ইন্দু গুপ্ত

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিয়ে এলেম।

হ্যালো—কে—

আমি আমি।

কি খবর?

কবি রুদ্রকান্ত রায় এই মাত্র মারা গেলেন। আপনি আসছেন তো?

নিশ্চয়ই। তুমি ধেকো। আমি এখুনি যাচ্ছি।

কবি রুদ্রকান্ত রায়, সত্যিকারের কবি, বাংলার গৌরব। অবিচল ধৈর্যের ভূমিকায় যিনি ছিলেন প্রচণ্ড একটা দুর্দান্ত শক্তি, তিনি এই একটু আগেও ছিলেন সময় ধারার ধারকরূপে। কাল সংক্ষেপ হয়ে এল হঠাৎই।

মর্যাদাস্তিক বেদনা অসহ্য করলাম। তার প্রতিভার প্রকাশ হয়েছিল। দিয়েছিল নিত্য নতুন সংকেত। কিন্তু কতটুকু! অপ্রকাশের দাহ প্রকাশকেও ছাপিয়ে গেছে অনেক—অনেকখানি। শাশ্বত কালের একটি মাত্র ক্ষণ ধমকে দাড়িয়েছিল শুধু পথপ্রান্তে। সে পথ প্রান্তে অসংখ্য তারকাখচিত্র আকাশের তলে অখণ্ড নিশ্চিন্ততা। যেন প্রাণহীন শূন্যে বিশ্বের করাল ছায়া ছলছে। অদূর দিগন্তে টিম টিম করে জলছে প্রতিপদের চাঁদ।

বড় রাস্তার চৌমাথায় এসে একটা ফুলের মালা ও একটা স্তবক কিনে নিলাম। কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের এই-ই রীতি।

শবাহুগমনের মিছিল বের হয়েছে।

পিছনে একটি ছোটখাট জনতা। কবির অহরাগী বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা এ-গলি সে-গলি ঘুরে জনতা এগিয়ে চলেছে। সারা দক্ষিণ কলকাতা প্রদক্ষিণ করে শব বয়ে নিয়ে আসা হোল কেওড়াতলার শ্মশানে।

শুয়ে আছেন কবি। আপাদমস্তক ফুলে, মালায় এবং স্তবকে ঢাকা। শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যে ভরে গেছে তাঁর দেহ। দেহী উর্দ্ধে বসে সম্ভবতঃ দেখছেন এই সমারোহ এবং মনে মনে হাসছেন।

ছুটো টাকা দিতে পার?

মনিব্যাগটা বের করে ছুটো টাকা কবিকে দিলাম। কবির মুখে মুচু হাসি ফুটে উঠলো।

বল্লেন—হবে, তোমার হবে। আমি তোমার লেখা দেখেছি। বেশ হাত আছে। কিন্তু দেখ, কবিতা লিখো না। গল্প লিখো।

গল্প?

অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হয়ে গেল। সেই আলাপের সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে কবির ব্যক্তিগত ঘরোয়া আবর্তে গিয়ে পড়লাম।

বাংলায় এমন কোন পত্র-পত্রিকা নেই, যাতে তিনি লেখেন নি। শুধু তাই নয়, পত্র-পত্রিকা যার লেখা বৃকে ধরে নিজেদের ধন্যই মনে করেছেন। এমন একজন লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ সৌভাগ্যই—তবু দুর্ভাগ্য—

প্রায়ই তাঁর টাকার দরকার হয়। ধার চাইতে ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু তবু তাঁর মর্যাদা বোধ এত অসাধারণ যে, আমি তার মুখ থেকে কখনো শুনি নি কত নিদারুণ অভাবের মধ্যে তিনি রয়েছেন।

একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে অবাক হলাম—জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইলাম।

ইনি?

তোমার বৌদি।

এতদিন জানতাম কবি রুদ্রকান্ত অবিবাহিত। হঠাৎ এই আবিষ্কার আমাকে বিস্মিত করে তুললো। বাক্যরোধ হয়ে এল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্.....

জোরে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে বাইরের দরজায়।

সেয়েটি আর দ্বিধা করলো না। একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সম্ভাবনায় পড়ে আমি অধীর হয়ে পড়লাম।

আমার হাতছুটো ধরে বলে উঠলো আমাদের বাঁচান।

ব্যাপার কি!

কবি রুদ্রকান্ত এবার যেন দেখতে পেয়েছেন কুলহীন সমুদ্রে ডালমান একটুকরো খড়।

বাড়ীওয়ালা।

ধার খুলে দিন।

তুমি বলছ।

কল্পণভাবে চাইলেন কবি। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন দরজা খুলে দিতে।

এই যে... বাড়ীর মালিক চৌকাট ডিঙ্গিছেই এক হংকার ছাড়লেন: বলি পালিয়ে পালিয়ে আর কদিন বেড়াবেন। আজই এখুনি বাড়ী ছেড়ে দিন বলছি।

বৌদি ভয়ে কাঁপছেন।

কবি পাথরের মত স্থির। বলেন আর দু'টো দিন... চের হয়েছে।

একটা স্লটকেশ ছিল— সেটাকে ধরে বাড়ীর মালিক টান মেরে ফেলে দিলেন।

আমার এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল।

আস্তিন গুটিয়ে সোজা গিয়ে বাড়ীর মালিক ঘিনি তাঁর কলারটা চেপে ধরলাম। ভদ্রলোক এর জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না।

বললাম, এটা কি মগের মুহুক পেয়েছেন!

ভদ্রলোক এবার রীতিমত ভড়কে গেলেন। বলেন "দেখুন, আমরা ছা-পোষা মানুষ। বাড়ী ভাড়ার উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হয়। উনি আজ চার মাস বাড়ী ভাড়া দেন নি।"

তার জন্ত আইন আছে। আপনি কত বড় বে-আইনী কাজ করেছেন, জানেন-তা। এখুনি আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি—যা করার তাঁরাই এসে করবেন।

ভদ্রলোক আমার হাতছুঁতে জড়িয়ে ধরলেন। বলেন, হাদ্যামে হুজুতে যেতে চাই না মশায়। ভাড়াটা পেলেই হোল।

কত টাকা পাবেন?

চার কুড়ি—আশী টাকা।

বেশ কাল আপনি পাবেন। তবে কিস্তি ৪০ টাকায় রফা করতে হবে এবং আগামী মাস থেকে নিয়মিত ভাবেই টাকা পাবেন আপনি।

দেখুন আপনি স্বখন বলছেন.....

আর দাঁড়ালুম না। পথে এসে ভাবতে লাগলুম। কবি রুদ্রকান্ত রায় বাংলার আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদের অগ্রতম। অথচ তাঁর দৈনন্দিন জীবনের যান—

সেদিন বড় বাঁচিয়েছ তুমি। নইলে সুনন্দাকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হোত।

পথই তো আপনাদের ঘর।

তা যা বলেছ।

কিন্তু এ ভাবে কি করে চলবে?

সেই কথাই তো ভাবছি। কবিতায় কেউ টাকা দেয় না। দিলেও বড় জোর টাকা পাঁচেক।

তাই ভাবছি এবার থেকে গল্প লিখব। কিন্তু—

কবি হঠাৎ চুপ করে যান।

কবির সঙ্গে তারপর আর অনেকদিন দেখা হয়নি।

অমিয় আমার বহুদিনের বন্ধু। সে একদিন এসে ধরলো একখানি মাসিক পত্র বের করবে। আধুনিক কবিতা এবং কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাই এ পত্রিকার একমাত্র উপজীব্য।

হঠাৎ মনে হোল কবিকে। অমিয়কে বললাম, কবির কথা। সে বেশ নিশ্চিন্ত হোল এ প্রস্তাবে। খোঁজ নিয়ে এলাম। কিন্তু...

রোজই জ্বর হয় কবির। অনাহারে অর্জাহারে দিন কাটছে। বৌদির সে হাসি আর নেই।

বলেন ভালই হোল—এতদিনে তবু যা হোক মাসে মাসে কিছু পাওয়া যাবে। কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু প্রায়ই আসতে পারেন না তিনি।

অমিয় এর জন্ত কম অল্পযোগ করে নি।

ফুলের স্তবকে মাথাটা ঢাকা পড়েছে, সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হোল। ফটো নিতে হবে। কবির মুখে যেন হাসি লেগে রয়েছে।

কাঠ পনের টাকা, পাখাটি টাকা তিনেক, চন্দন ও তিল ৩ টাকা, শ্রাণ খরচ ইত্যাদি করে প্রায় ৩১ টাকার মত খরচ হোল। টাকাটা যে কোথা থেকে কেমন করে এলো তা কেউ জানলো না।

শব চিতায় শুইয়ে দেওয়া হল। দাঁউ দাঁউ করে জলে উঠল লেলিহান বহ্নি। ছাই হয়ে গেল রুদ্রকান্তের রুদ্র রূপ।

মৃতের স্তূপে যে ফুল জমেছে তার দামই কি কম! কমসে কম ৮০১০ টাকার মত তো হবেই।

সুনন্দা দেখছে। দশটা টাকার প্রেসক্রিপশনটা এখনো রয়েছে কবির পায়াভাঙা টেবিলের দেওয়ালে। টাকার অভাবে ঔষধটা আনতে পারেনি সুনন্দা। তাতে কি!

শব দেহের প্রতি শ্রদ্ধার মূল্য দেহীর প্রতি সম্মানের অনেক উর্দে।

# শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরুজীর জীবন-পঞ্জী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) ॥ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ : ( জুলাই—ডিসেম্বর ) ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ॥

২৯

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

১ জুলাই—চট্টগ্রাম প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের পুরস্কার-বিতরণোৎসবে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

৬ জুলাই—চট্টল সঙ্ঘে প্রাতঃপাশনার পর সঙ্ঘগুরুর বিদ্যাকালীন ভাষণ। বিদায় গ্রহণের পূর্বে প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সঙ্ঘ-গুরুকে বিদয়াভিনন্দন প্রদান (১)। ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধন করিয়া সঙ্ঘগুরুর উপদেশ-বাণী।

৭ জুলাই—সঙ্ঘগুরুর পৌরোহিত্যে কলিকাতায় প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক জুট মিলস্ লিঃ-এর একবিংশ সাধারণ সভা।

১৫ জুলাই—সঙ্ঘের অমুরাণী ও ভক্ত অরুণচন্দ্র সোমের বাটিতে উপাসনা বার্ষিকী উৎসবে সঙ্ঘগুরুর আশীর্বাদী প্রদান।

১৮ জুলাই—শ্রীমন্দিরে গুরু-পূর্ণিমা-সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

১৯ জুলাই—সঙ্ঘগুরুর নির্দেশে সঙ্ঘে চাতুর্মাস্য ত্রতারস্ত্র। সঙ্ঘ-সভ্যসভ্যাগণকে গুরু-পূর্ণিমা হইতে রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত চারি মাস কাল মন্ত্র-জপ, সংযম ও নিয়ম পালনের নির্দেশ প্রদান (২)। চাতুর্মাস্য মহা-ত্রতাপলক্ষে সঙ্ঘের শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত স্বর্ধ্যনারায়ণ তর্কতীর্থ কর্তৃক প্রতিদিন সাক্ষোপাসনাতে মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা।

৪ আগষ্ট—সঙ্ঘের অমুরাণী ও প্রবর্তক বিদ্যার্থীভবনের শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ কাব্যসাংখ্যাতীর্থের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ছাত্রগণের সম্মেলনে সঙ্ঘগুরুর ভাষণ।

৭ আগষ্ট—‘প্রাশানাল চেম্বার অব ইণ্ডাস্ট্রিজ’-এর পক্ষে জ্ঞানাজন নিয়োগীর উত্তোগে স্বরেজনাথ, রবীন্দ্রনাথ

(১) চট্টগ্রাম বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সঙ্ঘ-গুরুকে বিদয়াভিনন্দন।

“হে গুরুদেব! তুমি কলকাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমার আনন্দময় মূর্তিকে, তেজোময় রূপকে, প্রজ্ঞানময় অস্তিত্বকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া আজ বিদায় লইতেছ, তাহাতে আমাদের হৃদয় আসন্ন বিরহ-ব্যথায় অভিভূত হইলেও, তোমার মূর্তি আমাদের স্মৃতির রাজ্যে অব্যবহিতভাবে বিরাজ করিবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে রাখিয়া আজ বিদায়ের ক্ষণে আমরা চট্টল বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা তোমার রাতুল চরণে প্রাণের স্নেহ নমস্কার জানাইতেছি। তোমার ঘোষণা পূজার নৈবেদ্য সাজাইবার মত প্রচুর ত্রব্য সন্ধান আমাদের নাই। আমাদের অকপট অন্তরে এই ভক্তি-পুষ্প-মালিকা তুমি গ্রহণ কর।

হে তপোধন! তুমি উদাস্ত কণ্ঠে বলিতেছ—“যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ”, সে ভগবান্ লাভ করিতে পারিবে না, সনাতন ভারতকে বৃষ্টিবে না, তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। আমরা বৃষ্টিতেছি, আজও আমাদের অন্তর কামনা বাগনার জর্জরিত। তুমি আমাদের জ্ঞানের পথে, আলোকের পথে, স্নেহের পথে পরিচালিত কর, আমাদের আশ্রয়-বিশ্বাস ফিরাইয়া আন, আমরা তোমার আশ্রিত।

পরিশেষে, আজ এই বিদায়ের ক্ষণে আমাদের আশীর্বাদ কর। আমাদের চঞ্চল চলার পথে সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ হইলেও তোমার প্রচণ্ড মনোহর ব্যক্তিত্বের অমৃতস্রব পরশে যেন আমাদের জীবনের গতি-পথ নির্ধারিত হয়। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার পথে চলার সাহস যেন না হারায়ে।

হে দেবতা! আনি তুমি অন্তরে-বাহিরে কাছে-কাছে আছ, তবুও বহিস্কৃত-সতত চার তোমার দিব্য-মূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শন, হৃদয় চার প্রত্যক্ষ অনুভূতি—তাই মাসি চট্টলাতে তোমার সহসা পুনরাগমন।

ও শান্তি। ও শান্তি ॥ ও শান্তি ॥”

(২) চাতুর্মাস্য ত্রতারস্ত্রের পূর্বে সঙ্ঘ-সভ্যসভ্যা-গণের প্রতি সঙ্ঘগুরুর নির্দেশ বাণী :

“চাতুর্মাস্য ত্রত। ১৩৫৮ সাল। আগামী ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃষাব্দ গুরু-পূর্ণিমায় মহাসম্মেলন। তার পরদিন হইতে প্রাতঃ ও সাক্ষোপাসনায় ৫০০+৫০৮=১০০৮ মন্ত্র জপ। ২৬শে কার্তিক রাস পূর্ণিমায় ত্রত উদ্-বাপিত হইবে। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ২৯শে ভাদ্র ও ২৮শে আশ্বিন সর্বত্র পূর্ণিমা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। চাতুর্মাস্য-ত্রত সম্পূর্ণ হইবে ২৬শে কার্তিক। ঐদিন সর্বত্র বাহাতে সম্মেলনে প্রত্যেকে প্রসাদ গ্রহণ করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে ছক ও কার্তিক মাসে মৎস্য মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ থাকিবে। গুরু-পূর্ণিমা হইতে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সংযম ও বর্জ-নীতি পালনীয়।

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতি কেন্দ্রের সভ্যসভ্যাগণ এবং দীক্ষিত গৃহস্থ ভক্ত-সন্তলী ইহা পালন করিবে। গৃহী সন্তানগণের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ—এই চারি মাসকাল তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিবে। শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হিসাবে প্রত্যেকের অবস্থান ভাগবৎ-জীবন লাভের সাহায্য করিবে। আমার আশীর্বাদে সকলেই জয়যুক্ত হউক—শ্রীশ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা প্রতিদিন উপাসনা মন্দিরে করিবে। প্রতি সঙ্ঘকে কেন্দ্রে এই চারি মাসকাল প্রাতঃপাশনাতে প্রবর্তক হইতে সংপ্রণীত চতী রহস্ত পাঠ, মধ্যাহ্নে উপাসনাতে সীতার এক অধ্যায় করিয়া আবৃত্তি ও সাক্ষো-পাশনার পর মৎ প্রণীত সীতাভাষ্য পাঠ করা হইবে। প্রত্যহ রাত্রিতে গটা হইতে ৮টা পর্যন্ত সঙ্ঘ-কেন্দ্রের শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীস্বর্ধ্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় মহাভারত পাঠ করিবেন।”

প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দ্রমনগর } শ্রীমতিলাল রায়।

ও স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় দিবসোদ্‌যাপন উপলক্ষে সজ্জগুরু পৌরোহিত্যে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সিনেট হলে মহতী সভার অনুষ্ঠান। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খৃঃ ৭ই আগস্টে কলিকাতা টাউন হলের বিখ্যাত প্রতিবাদ-সভা, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, লোকমাতা তিলক, রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্র নাথ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বাদেশিকতা ও স্বদেশীযুগের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বদেশী ব্রত ও জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য সজ্জগুরু আহ্বান। উপস্থিতি—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মাখনলাল সেন, ডক্টর কালিদাস নাগ, সত্যপ্রসন্ন সেন, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জ্ঞানাজ্ঞান নিয়োগী প্রভৃতি।

- ১৫ আগস্ট—স্বাধীনতাদিবসোপলক্ষে সজ্জগুরু কর্তৃক সজ্জের সাংস্কৃতিক পতাকা ও জাতীয় পতাকোত্তলন, সহীদ বেদীতে মাল্য প্রদান এবং জাতীয় পতাকার প্রতি প্রজ্ঞাশীল হওয়ার জন্য ছাত্রগণের প্রতি নির্দেশ দান।

এই দিবসে ‘প্রবর্তক কলেজ অব্ কালচার’-এর নূতন সেশনারম্ভ। পণ্ডিত স্বর্ধনারায়ণ তর্কতীর্থের পৌরোহিত্যে ছাত্রগণের সারস্বত হোম-ক্রিয়া সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক শিক্ষালাভের সহজ-সস্ত্র গ্রহণ। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আভাস দিয়া ছাত্রগণের প্রতি সজ্জগুরু সাধন-সঙ্কেত প্রদান। রাত্রি ৮ ঘটিকায় সজ্জ শ্রীঅরবিন্দের ৮০ তম আবির্ভাবোৎসবের সভাধিবেশনে সজ্জগুরু প্রজ্ঞাঞ্জলি জ্ঞাপন।

- ১৫ আগস্ট—চন্দ্রনগর কংগ্রেস কার্যালয়ে সম্মুখ ছয়টায় সজ্জগুরু পৌরোহিত্যে শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাবোৎসব। সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান।

- ২৪ আগস্ট—সজ্জগুরু নির্দেশে সজ্জের সভ্যসভ্যাগণের জন্মোষ্টী-ব্রত পালন। ভারতের মহামানব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার জন্য রাত্রি ১২ টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত স্ব-স্ব স্থানে ধ্যান-নিরত থাকার নির্দেশ প্রদান।

- ২৭ আগস্ট—কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে সজ্জের চিদানন্দজীর ষোড়শ বার্ষিক অরণামুষ্ঠা। সজ্জগুরু বাণী প্রেরণ।

- ১ সেপ্টেম্বর—ডক্টর শ্রীমাদ্রামোদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হুগলী জেলার কেওটা শাহগঞ্জ এলাকায় ভারতী জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবোৎসব-সভায় সজ্জগুরু ভাষণ প্রদান।

- ১৫ সেপ্টেম্বর—চাতুর্মাস্য ব্রতের দ্বিতীয় মাস উদ্‌যাপন—পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জগুরু বাণী।

- ১৬ সেপ্টেম্বর—সজ্জগুরু নির্দেশে শ্রীমন্দিরের দ্বিতলকক্ষে অন্তরঙ্গ সভ্যসভ্যার উপস্থিতিতে সজ্জের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা।

- ৩০ সেপ্টেম্বর—মহালয়া-পর্ব—এতদুপলক্ষে সজ্জের অতীত ও ভারতের প্রাচীন পুরুষগণের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাতর্পণ।

- ২ অক্টোবর—সজ্জ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-দিবস পালন।

- ৬-১০ অক্টোবর—সজ্জ শারদীয়া মহাপূজা। এতদুপলক্ষে চণ্ডীপাঠ, দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণ, দীক্ষাভীর্থে দীপদান, হোম, পূজা, সজ্জগুরু বাণীপাঠ। বিভিন্ন দিবসে সজ্জগুরু বাণীপ্রদান। বিজয়ার দিনের সজ্জগুরু আলীকর্গী। সজ্জের সকল প্রকার সভ্য সভ্যা ও অমুরাগী সুহৃদবর্গের নিকট সজ্জগুরু লিখিত বিজয়ার বাণী প্রেরণ (৩)। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর কৈলাসনাথ কাটজ, শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীমা-

- (৩) সজ্জের সভ্যসভ্যা ও অমুরাগী সুহৃদবর্গের নিকট সজ্জগুরু বিজয়ার বাণী :

“শারদীয়া মহাপূজা সমাপ্ত হইল। দশমী ব্রহ্মভাতে মাতৃপঞ্জি চরণতলে বসিয়া যে বাণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয়, আমি সেই কথাই প্রবর্তক সজ্জের দীক্ষিত সম্মানদের, সহযোগী ভক্ত, সভ্য ও আমার সকল সুহৃদবর্গকে একপাটে জানাইতেছি।

বাঙ্গালী বাচিবে, কিন্তু তাহাকে আত্মরক্ষার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে গভীর ও একনিষ্ট সজ্জের তপস্তায়। নিষ্কাম, নিরহঙ্কার ও নিরলস সমষ্টি জীবনেই এই সজ্জের অবতরণ অবজ্ঞাব্যবী।

জাতির মধ্যে সজ্জগুরুর অধ্যাপন—মায়ের করণায়। তমু, প্রাণ, মন একত্র করিয়া দেবীর আরাধনা যে করিয়াছে, তাহার সংঘমপ্ত বিশুদ্ধ

প্রসাদ বর্ষণ, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি স্বহৃদ্বর্গের সম্ভবগুরু নিকট বিজয়ার শুভেচ্ছা লিপি প্রেরণ।

১৪ অক্টোবর—শ্রীশ্রীসম্ভবী পূজা ও কোজাগর পূর্ণিমা সম্মেলন—এতদুপলক্ষে সম্ভবগুরু বাণী।

১৪ অক্টোবর—নওপাড়া (হুগলী জিলা) পল্লী সংস্কার সমিতির অধিবেশনে সম্ভবগুরু ভাষণ।

২১ অক্টোবর—শ্রীশ্রীসম্ভবজননীর বার্ষিক তিরোভাবোৎসব সম্ভবগুরু সম্মেলন আলোচনা-সভায় সম্ভবগুরু মর্ম্মকথা।

২২ অক্টোবর—সম্ভবগুরু পৌরোহিত্যে সম্ভবগুরু গভর্ণিং বডির সভা।

৩ নভেম্বর—কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে সম্ভবগুরু পৌরোহিত্যে প্রবর্তক ট্রাষ্টের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রবর্তক কমার্শিয়াল করপোরেশন লিঃ-এ নবম বার্ষিক সাধারণ সভা—সম্ভবগুরু ভাষণ।

৪ নভেম্বর—চুঁচুড়া, বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ভবনে সম্ভবগুরু পৌরোহিত্যে হুগলী সংস্কৃত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে সম্ভবগুরু ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে ভাষণ।

১০ নভেম্বর—প্রবর্তক আশ্রমে ভারতের অমর শহীদ কানাইলাল দত্তের ৪৩ বর্ষীয় মৃত্যুবরণদিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য চন্দননগরের প্রাক্তন বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অধিবেশন। বিপ্লব-ষড়ষষ্ঠের প্রসঙ্গে আলীপুর জেলে গোপনে কানাইলালকে রিভলভার সর-বরাহের ব্যাপারে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও সম্ভবগুরু সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করেন বলিয়া সভাপতি নরেন্দ্রনাথের ভাষণে প্রকাশ পায়।

১৩ নভেম্বর—রাস-পূর্ণিমা। চাতুষ্পাঠ্য ত্রতের উদ্‌যাপনো-পলক্ষে হুগলী বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ পণ্ডিত সতীনাথ পঞ্চভীর্ষের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দিরে পূর্ণিমা সম্মেলনে সম্ভবগুরু বাণী প্রদান।

১৮ নভেম্বর—চন্দননগর, গোস্বামী ঘাটে সম্ভবগুরু সভা-পতিত্বে শ্রীশ্রীবাধাবল্লভজীর মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্ম্ম-সভাভাট্টানে সম্ভবগুরু ভাষণ প্রদান।

৮ ডিসেম্বর—শ্রীশ্রীসম্ভবজননীর দ্বাবিংশ বর্ষীয় সাধারণিক তিরোভাবোৎসবোপলক্ষে আশ্রমে ত্রি-দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে দিবস ব্যাপী উপবাস-ত্রত পালন, সমবেত উপাসনা, সম্ভববাণী পাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, জপমন্ত্র, হোম, সম্ভবগুরু বাণী। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বিপ্লব যুগের অন্যতম ঋদ্ধিক, 'যুগান্তর' দলের হোতা অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত উৎসব-সভায় সম্ভবগুরু ভাষণ প্রদান প্রদান। সম্ভবগুরু কলিকাতা বাগবাজারের বিশ্বনাথ কালীকীর্ত্তন সমিতি কর্তৃক "কালীকীর্ত্তন" গান।

১২ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ৬৭তম জন্ম-দিনোপলক্ষে সম্ভবগুরু শুভেচ্ছা-বাণী প্রেরণ। সম্ভবগুরু নিকট রাষ্ট্রপতির 'তার'-যোগে উত্তর লিপি প্রেরণ। (৪)

১২ ডিসেম্বর—আশ্রমে পূর্ণিমা সম্মেলনে সম্ভবগুরু উপদেশ বাণী।

১৬ ডিসেম্বর—সম্ভবগুরু আশ্রানে আশ্রমে 'রবীন্দ্র হল'-এ সন্ত্যগণের অধিবেশন—সম্ভবগুরু বর্ষমান পরি-স্থিতি ও সাধন বিষয়ক আলোচনা। (ক্রমশঃ)

চেতনার দিব্য প্রতিভা স্বলসিয়া উঠিবে—জন্মে বহিবে প্রেমের মল্যাকিনী, সকল অভিমান, রাগ-যেব মুছিয়া, ভাসাইয়া নিরাময় করিবে—প্রাণে অগাধিবে শক্তির উদ্বাস অশ্রু মুছিয়া তুলিবে—হিরাজ দেহের প্রতি পর্ক, প্রতি কেন্দ্র দেবহিত দিয়া আয়ুঃ ধারণ করিবে।

এই দেবীপূজার বিজয়ার আশীর্বাদী তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ কর।" শ্রীমতিলাল রায়।

(৪) সম্ভবগুরু নিকট রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের তার-বার্তা :

"Dear Sri Motilal Roy

Please accept my thanks for your message of greetings and good wishes on the occasion of my birth-day.

Yours  
Rajendra Prasad"

# মনুষ্যত্ব মহিমায় মহান যারা

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

সোমর কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কাজে ঢোকে কেদার। স্ত্রতরাং ঘড়ি ধরিয়া কাজ করার তাহার আদত হইয়া যায়। এরপরে সে কাজে ঢোকে তাঃ কেদারনাথ দাসের বাটীতে।

এ বাটীতে অনেক ঝি-চাকর। কাজেই গুণগোল সদাসর্বদা। তাতে সোমরের কান কিছুমাত্র নাই। নিজের 'ডিউটি' (Duty) সোমর কবাবে কোন দিকে কোনও কারণে অন্তমনস্ক না হইয়া। তার কাজে অল্প কাহাকেও একবার হাত দিতে দিবে না।

কাজকর্ম সারিয়া সোমর খাড়া হাজিরা দিবে। আত্মন গুনিবামাত্র হাজিরা দিবে সে তৎক্ষণাৎ, ছকুম তামিল করিতে। Duty-র সময় উত্তীর্ণ হইলেই সে অবসর গ্রহণ করিবে। Duty করিতে হাজিরা দিবে সে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।

লক্ষ্য করিয়াছি সোমরকে গৃহস্থের অসময়ে ছকুম না করার। তার কাজ ফাঁকির ধার দিয়া না গিয়া পুরাদস্তুর ভাবে সর্বদা সে করে, তার দৃষ্টান্তেও নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করা গৃহস্থের সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এহেন সোমরকে আমার বড় ছেলে বিমানের দাপট নাঞ্জেহাল করিয়া দেয়। শিশুর দুঃস্থপান্না থামাইতে সোমর তাহাকে কাঁধে করিয়া চরকিপাক দিবে। শিশু

তাহাকে কামড়াইবে, আঁচড়াইবে, চুল ধরিয়া তার টানিবে, বাগিয়া কাঁদিয়া সোমরের গা মলমুত্রে ভাসাইয়া দিবে। সোমর নির্বিকার। হাসিয়া সোমর বলে "আঁওর যো কুছ করনে মাংতা করো ভাই, বাকি হামু ছোড়বে না।"

'ভাই'কেই শেষবেশ শাস্ত হইতে হয়, কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ে। সবতনে কাঁধ হইতে নামাইয়া স্নেহভরে সোমর বলে, "ভাইয়া, মুস্ গিয়া।" কঠিনে কোমলের সে অপকল্প চিত্র!

কত্থা ঘর করিতে যাইবার কালে তাঁহার পূজনীয় মাতাঠাকুরাণী কত্থা ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের সোমরের জিন্মা করিয়া দিয়া কত্থাকে ঘর করিতে পাঠান। সে জিন্মাদারী পালন করে সোমর সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া। তার মিলিটারী ডিউটির কাল-অকাল ধ্যান সব বানচাল হইয়া যায়। স্নেহপ্রবণ সে সোমরের মুষ্টি তখন দেখিবার ও দেখাইবার।

আর মৌসী বিজলী যেদিন সোমরের দয়াপদ বাধু-মস্তকের জায় এক নিমেষে শাস্ত করিয়া দেয়, সেদিন হইতে মৌসীকে সে মানকী জ্ঞান করে না, দেবী জ্ঞান করে।

কাজ ছাড়িয়া সোমর স্বদেশে যায় তার বার্কাক্যহেতু, নিজে কাঁদিয়া ও আমাদের কাঁদাইয়া।



## সেকালের বালবিধবা : 'উত্তরা'

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

স্বামী বিধে নাই, বাতনায় তাই, বয়ে সদা আধি-লোর ;  
পূর্ণ এ-ঘোবন, বুধাই সৃজন করিয়াছে বিধি মোর।  
আদরের সাধী—"যুই-চাপা-যুধী", যুচে গেছে গোঁজা কানে,  
কবরীর 'সটা',—সিঁ ছরের ফোঁটা ভেসে গেছে অক্ষ-বাণে ;  
পুড়ে গেছে আজ, যা-ছিল স্ফাজ, হইয়াছে বিধি বাম,  
বিধির আশুন—জলিছে দ্বিগুণ, মোর মাখে অবিরাম।  
শূণ্য কক্ষ-পাশে নিরাশায় বসে শেল সম বাজে বৃকে,  
তুধু হা-হতাশ—বহে দীর্ঘশ্বাস, বুক কাটে তীব্র দুঃখে ;  
একাদশী দিনে—আজি অনশনে, কত কথা পড়ে মনে,—

"দিয়ে নিছ প্রাণ—ক্ষতকুলমান রেখে গেলো

'স্বামী' রণে।"

পুরুষের তরে যাই যাব ম'রে, এই ছিল তা'র জ্ঞানে ;

তাইত' সে-বীর—হইয়া অধীর, সময় সহিল প্রাণে।

গেছে সে গোলক, তবু-ও পূজক জাগে প্রাণে পুনঃ ধন ;

"হোক পরাজয়—কাপুরুষ নয়" ; গাহিছে সফল জন।

ও গো ও-বিধাতা ! এস তুমি হেথা, তুঘিতে

তোমাকে চাই ;—

চলে যাব সেথা—যেথা নাই ব্যথা ; চিরতরে ল'ব ঠাই !

## কবি কুমুদরঞ্জন : যেমন দেখে এলাম

শ্রীললিতীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর কবিকে (কবি কুমুদরঞ্জন) দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর পল্লী নিবাস কোগ্রামে (উজ্জানী)। সঙ্গে ছিলেন সাহিত্যিক দাদা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাণা বসু ও অসীমকৃষ্ণ দত্ত, কবিবন্ধু শুদ্ধসত্ত্ব বসু, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; আর ছিল শ্রীমান্ তীর্থঙ্কর (ওরফে বাবুয়া)—আমার ৮ বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কবিকে আগে থেকে জানানো হয়েছিল আমাদের যাবার কথা, আর প্রত্যুত্তরে কবিও জানিয়েছিলেন তাঁর সানন্দ অভিনন্দন। বর্ধমান থেকে লাইট-রেল চড়ে বলগাণা, আর সেখান থেকে মোটরবাসে নতুনহাট; তারপর সামান্য পায়ে-হাঁটা মোঠা পথ পেরিয়ে কুহুর নদীর ওপারে অজয়ের তীরে কবির নিজস্ব পল্লী-আবাস—‘মধুকর’।

কবি প্রেরিত ছ’জন তল্লিবাঁহক বিষ্ণু আর পটলের প্রদর্শিত পথ অচুসরণ করে যখন আমরা কবিতীর্থে এসে পৌঁছুলাম তখন বেলা প্রায় ৩টা আন্দাজ হবে। গায়ে একটা টিলা জামা, আর মুখে শিশুসুলভ হাসি,—কবি স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন বাটার বাইরের দিককার উঠানে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাতে : এই-যে তোমরা সবাই এলে; তা’, বেশ-বেশ! পবিত্র এসেছ?—ভালই হ’ল। তোমাকে কদিন দেখিনি যে। কই, শুদ্ধসত্ত্ব এসেছ? খুব ভাল করেছ হে—খুব ভাল। নারায়ণ কই?—রাণা?—নলিনী? আর, ইনি—আমানসোলের অসীমকৃষ্ণ? তোমরা সবাই এলে;—ভালই হয়েছে, কত আনন্দ আমার! ওমা,—এ কে? এঁয়া,—বাবুয়া? দাছ’ভাই? আমাদের দেখতে এসেছে? ওরে, কী আনন্দ আমার আজ, কী আনন্দ!—আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন কবি কুমুদরঞ্জন। কী অপূর্ব লাগল প্রায় ৮ বছরের এক শিশুর সঙ্গে প্রায় ৮০ বছরের আর এক “চিরশিশুর” এই মহা-মিলনের দৃশ্য! তারপর কী আদর আপ্যায়ন! নিজেই সবাইকে নিয়ে গিয়ে বসালেন বাড়ীর ভিতর দিককার বারান্দায়।

বলতে লাগলেন : তোমাদের কত কষ্ট হল! আহা, একি কম দূর! কোন্ সকালে বেরিয়েছ সবাই।...

হঠাৎ গুঁর চোখ দু’টো একটু ছল্‌ছল কোরে এল। একটু যেন আশ্রয় হ’য়ে গেলেন,—নিজের মনেই বলতে লাগলেন : রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ ইচ্ছে ছিল একবার এখানে পায়ের ধুলো দেন। যা দূর!—তা আর হয়ে ওঠেনি।

ইতিমধ্যে প্রত্যেকের জন্ম প্রচুর জনযোগের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কবি নিজেও সবায়ের সঙ্গে চা খেতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন : জান? এ-সব আমার ঘরের তৈরী জিনিস,—একটুও ভয় পেও না খেতে। তোমরা সবগুলো খেয়ে নাও।

একটু খেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন : ছুতো বাবুকে ব’লে রেখেছিলাম;—তোমাদের মোটর বাসে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?

আমরা জানালাম—না, খুবই যত্ন করে নিয়ে এসেছেন মোটর বাসের মালিক।

এরি ফাঁকে কথা পাড়লে শুদ্ধসত্ত্ব : আচ্ছা দাদা, আপনি ৩৪ দিনের মধ্যে কোলকাতায় গিয়েছিলেন?

কবি চমকে উঠলেন কি যেন এক অজানা আশঙ্কায়। বিস্মিত হয়ে বললেন : ওমা, ওরা সব কথা ব’লে দিয়েছে তা’ হলে। আমি যে ওদের বার বার বারণ কোরে দিয়েছি যেন ওরা শুদ্ধসত্ত্বকে না বলে যে আমি এখন কোলকাতায় আছি। তা’ হ’লে ওরা আর রোববারে কোগ্রামে যাবে না। এর চেয়ে কম শাস্তি আর কী আছে বল?

আলোচনায় মোড় কিরিয়ে দিয়ে বললাম : কিন্তু এখন তো আর আপনার সে ভাবনার কোন কারণ নেই? একেবারে সদল-বলে আমরা ক’জন এসে হাজির হয়েছি।

কবি নিশ্চিত হ’য়ে বললেন : তা’ বটে। জানো, ছ’রাত্রি জেগে বসে আছি? তোমরা সকলে আসবে,—এক সঙ্গে ক’জনের পায়ের ধুলো পড়বে এখানে! একি কম ভাগ্যের কথা? অতিথি যে নারায়ণ,—আমার কী ভাগ্য! আর একটা মজার কথা শুনেবে? ভাবলাম, গুহুর থেকে মাছ ধরিয়ে তোমাদের খাওয়াব। প্রথম জালে



হুঁটো, আর তারপরে তিনটে রুই মাছ উঠল। আমার এ-বাসনা কি বিফলে যেতে পারে ?

কবির সারা মুখখানা খুশীতে ভ'রে গেল।

শ্রীমান্ তীর্থঙ্কর এক ফাঁকে উঠে গিয়ে কবিকে এক হাড়ি “জয়নগরের মোয়া” উপহার দিলে। মোয়ার হাড়িটা হাতে নিয়ে কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব'লে উঠলেন : ওরে, এ-যে খাঁটি দেশী জিনিস। এ ‘মা’কে দেব, এ আমি নিজে খাব, গাঁয়ের লোকদেরও কিছু কিছু দেব।

পল্লীর বুকে সন্ধ্যার স্নান ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল। কবির নির্দেশমত আমরা ৬মা মঙ্গলচণ্ডীর সেবাইত সত্য-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম-পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম।

দেখলাম, কবি কুমুদরঞ্জনর ছায়াঘেরা কোণ্ঠামের স্নিগ্ধ জ্বালিমা; দেখলাম ৬মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির; দেখলাম বিস্তীর্ণ বালুর চাদরে পাশ ফিরে শুয়ে আছে অজয়, যেন দামাল শিশু ক্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ আগে; আর দেখলাম পল্লী-কবির মমতায়-পড়া পথ-ঘাট, মাঠ-বন, গাছ-পালা, পশু-পাখী আর কয়েকটি প্রাণধোলা সহজ সরল গাঁয়ের মানুষ—যাদের নিয়ে কবি কুমুদরঞ্জন রচনা করেছেন তাঁর একান্ত নিজস্ব পল্লী-সংসার। সাধ্য কী যে অজয়-কুহুরের বস্তায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পথ চলতে চলতে সত্যবাবু গ্রামের একপ্রান্তে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিয়ে বললেন : এই যে মাঠ দেখছেন এইখানেই ১লা মাঘ বিরাট মেলা ব'লে থাকে, দূর-দূরান্ত থেকে কত লোকই না আসবে এখানে সওদা করতে। এটা শ্রীমন্ত সদাগরের দেশ কিনা, ঐ দিনেই শ্রীমন্ত সদাগর এখান থেকে তাঁর ‘সপ্তডিঙা’ ভাসিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। আর, ঐ যে দেখছেন একতলা কোঠা, গত বস্তায় কবি গ্রামবাসীকে নিয়ে ওরই ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কত লোকই না কবিকে অহরোধ জানালে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে, নইলে অজয়ের বস্তায় সব ভেসে যাবে, তবু কবি গ্রাম ছেড়ে এক-পা নড়লেন না।

“অজয়ে তো জানো দুর্দাম তার গতি

যত ভালোবাসা তত বেশী তার রাগ,

বরষ বরষ করে সে আমার কতি,

তবু ভালোবাসি তাহার সেই সোহাগ।”

সন্ধ্যাবেলা কবিকে নিয়ে আবার আমাদের আলোচনা-আলোচনার আগর বসল। কবির নিত্যকার অভ্যাস সন্ধ্যার কিছু পরে শয্যা গ্রহণ করা, কিন্তু কবি বললেন : আজ আমার চোখে ঘুম আসছে না। তোমাদের নিয়ে গল্প শুদ্ধব করব।

কবি বলে চললেন : এ আমার মাতুলবাড়ী, এই-ই আমার সব। এ-ভিটে শ্রীমন্তের স্মৃতিমাথা। এখানে আমার মাটির ঘর ছিল তা' গত কয়েক বছরে দু'বার অজয়ের বস্তায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার এ-পাকাঘর কবে হল ?

কবি একটু হেসে বললেন : তা' যদি স্তন্যে চাও তো বলি,—যদি এটা ‘লিজেগারী যুগ’ হত তবে লোকে একে নিয়ে বেশ একটা গ্রাম্যরচনা করত। ব'লত, এখানে একজন থাকত সে শুণু পদ-রচনা করত। অজয় বারবার তার ঘর-বাড়ী কেড়ে নিলে, কিন্তু তবুও কবি সেখান থেকে নড়ে না। শেষে একদিন সেই কবি ৬মা মঙ্গলচণ্ডীকে গিয়ে বললে, এ-গাঁয়ের সব ঘর-বাড়ী তো ভেসে গেল, মা! এখন বিশ্বকর্মা'কে দিয়ে একটা বাড়ী করিয়ে দাও :—অমনি যেন আমার বাড়ী হয়ে গেল! তখন সে কবি বললে : মা কমলেকামিনী, কমলের মধ্যে দিয়ে, মঙ্গলের মধ্য দিয়েই যেন এ আসে, মা।

এই কথা বলেই কবি সকলের দিকে চেয়ে বললেন : তোমারা আমার ‘প্রবাসী’র লেখাগুলো পোড়ো;—ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। আমি পল্লীগ্রামের মধ্যে মানুষ হয়েছি, আমি ভক্তি ছাড়া কিছুই জানি না। আমার কাছে ‘হেগেল’ তো দর্শন! ভগবান সন্ধ্যা আমার কোন সন্দেহই হয় না।

এই সময় রাণা বহু কবিকে অহরোধ জানালে তাঁর ছাত্রজীবনের কাহিনী শোনাতে।

কবির চোখে মুখে সলজ্জ হাসির রেখা ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে ব'লে চললেন : নতুন কথা কি আর শোনাব বল ? লেখাপড়া শুরু হয় আমার গ্রামের ইস্কুলে। পল্লীগ্রামের ছেলে, বড় লাজুক ছিলাম। তাই প্রথম

। কোলকাতার মত শহরে এসে বহুবাজার অঞ্চলের 'ডি, এম, দাশ সেকুন্স ইন্সট্রু' ভর্তি হলাম, তখন আমাকে বেশ খানিকটা মুজিলে পড়তে হয়েছিল। মাথায় ছিল লম্বা লম্বা কৌকড়া কৌকড়া চুল,—প্রথমটা হয়ত সখ কোরেই রেখেছিলাম, কিন্তু পরে আপনা থেকেই ওরকম হ'য়ে গেল। ছাত্র হিসাবে এমন কিছু ছিলাম না, তবে "বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক" পেয়েছিলাম এই যা। এর বেশী আর কি বলতে পারি ?

একটু থেমে আবার বললেন : এই সময়কার একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা বলি। একদিন বুড়ির সময় বগলে ছাতা নিয়ে হারিসন রোড ধ'রে চলেছি, দেখাল নেই যে বগলে ছাতা আছে। এমন সময় আমার অঙ্কের অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পেছন দিক থেকে এসে কাণ ধ'রে বললেন,—“ছাতাটা ধোল, মাথায় দাও। এতে কবি হওয়া যায় বটে, কিন্তু হাসপাতালে যাবার যে খুব সম্ভাবনা আছে”। আমি একেবারে অপ্রস্তুত। তাড়া-তাড়ি বগল থেকে ছাতাটা নিয়ে ধুলে মাথায় দিলাম।

ঘটনাটি ব'লে কবি হেসে ফেটে পড়লেন। আমরাও এতে যোগ দিলাম। এই সময় কবিকে প্রশ্ন করা গেল : আচ্ছা, কবে থেকে আপনি লিখতে আরম্ভ করলেন, আর কবিতা লেখাই পছন্দ করলেন কেন ?

কবি জবাব দিলেন : সে অনেক দিনের কথা, তখন, আমার বয়স ১৪ বৎসর হবে, সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি। ‘নব্যভারতে’ একটা কবিতা লিখেছিলাম,—বোধহয় তার নাম ছিল “হেমচন্দ্রের প্রতি।” আর, গল্প যে আমি একেবারে লিখিনি তা' নয়, তবে গল্পে লিখি খুব কম। বোধহয়, পঞ্চ লিখতে দোজা ব'লেই তাই লিখি। আমার “মুকোশের দোকান”, “হরে মাঝি”, “আমাদের গ্রাম”, “পশুপক্ষী” এ-গুলো তো গদ্যেই লেখা !

এরপর প্রশ্ন করলাম : আপনি কি রোজই লেখেন ?

কবি সরাসরি জবাব দিলেন : যত দুঃখ, কষ্ট পাইনা কেন, লেখা আমার কোন দিনই বন্ধ হয় না। আমি সব সময়ই লিখি। কবিতা না লিখলে মনে হয় যেন জীবনটা ব্যর্থ হ'ল,—যেন ভগবান থেকে অনেকটা সরে এসেছি। তাঁর সঙ্গে যদি এতটুকু যোগাযোগ থাকে, তা' হ'লে

লেখা ব্যর্থ হবে না;—কবিতা যেন আমার পল্লীগ্রামের ওপর ভগবানের পূজা,—এ যেন আমার পূজা-আহ্নিক।

একটু থেমে আবার বললেন : ইদানীং কিছু কম লিখছি, কারণ কিছু কাজ করছি পূজা, মন্দির ইত্যাদি নিয়ে ; তাবুক হওয়া ভাল, কিন্তু কর্মী হওয়া আরও ভাল।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার কি কবিতা লেখবার কোন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা আছে ?

কবি একটু হেসে বললেন : না, সময় ঠিক করা থাকে না। যখন ইচ্ছে যায় তখন লিখি। লিখব ব'লে লিখিনা, তা' সকালেই হোক, দুপুরেই হোক, আর রাত্রেই হোক। ‘সোমনাথ’ নিয়ে যখন লিখতাম, তখন মনটা যেন কেমন হ'ত ; তাই তখন প্রায় সারারাত ধরে লিখতাম।

আমাদের আলোচনার ফাঁকে তীর্থঙ্কর কবিকে তাঁর “কৃষ্ণা রঞ্জনী” আবৃত্তি কোরে শোনালে। কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

রাত গড়িয়ে গেল। সেদিনকার মত আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ হ'ল।

তারপর আমাদের রাজকালীন ভোজন-পর্ব। প্রত্যেকটি আহাৰ্য বস্তুর মধ্যে কবির আন্তরিকতার ও অতিথিপরায়ণতার ছাপ স্পষ্ট। আঙ্কালকার দিনে এ-ধরণের আয়োজন তেমন একটা চোখে পড়ে না।

বেশ সুচারু পরিবেশে একটি নির্দিষ্ট ঘরে আমরা সকলে শয্যা গ্রহণ করলাম। ভাবলাম কবির সাহচর্যলাভ আঙ্গকের মত এখানেই শেষ। কিন্তু, এক সময় হঠাৎ ভেতর দিককার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম, আর সেই সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর : পবিত্র...ও পবিত্র...তোমার দরজাটা একবার খোল দেখি।

ব্যস্ত হ'য়ে দরজাটা খুলে দিয়ে দেখি, একটা বিরাট লেপ কাঁধে নিয়ে স্বয়ং কবি দাঁড়িয়ে আছেন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে আমরা সবাই ব'লে উঠলাম : একী কাণ্ড করেছেন আপনি !

মমতা-মাথা কণ্ঠে কবি বললেন : তাই কি হয় ? আমি শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখলাম এই শীতে তোমরা কত কষ্ট পাচ্ছে। তাই এই লেপটা নিয়ে এলাম।

তাড়াতাড়ি কবির হাত থেকে লেপটা নামিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ঠুঁর দিকে। তেবে ঠিক করতে পারলাম না, যাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি তিনি কবি কুমুদরঞ্জন, না ঋষি কুমুদরঞ্জন!

সকালের দিকে কবিকে ঘিরে আমাদের আবার আলাপ-আলোচনা শুরু হ'ল। কথায় কথায় কবি জানানলেন, যে সত্যেন দত্তের চেয়ে উনি বয়সে এক মাসের ছোট;—সত্যেন দত্ত মাঘ মাসে, আর উনি ফাল্গুন মাসে।

এই সময় আমরা কবিকে অহুরোধ জানালাম তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ কোরে শোনাতে। কবি মুহু হেসে বললেন : তোমরা শুনবে? ভাল লাগবে তো?

নারায়ণ বলে উঠল : আপনার 'শ্রীধর' আমাদের কত ভাল লাগত ছাত্রজীবনে;—আজও ভুলিনি—

“সম্যাসী সাক্ষি শ্রীধর যেতেছে বজ্রীনাথের পথে”

কবি হাসতে হাসতে পাদপূরণ করলেন—“তোমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোন মতে।”...

আমরা কবিকণ্ঠের স্বরচিত কবিতা পাঠ শুনতে লাগলাম। পাঠ শেষ করে কবি বললেন : ‘শ্রীধর’ আমার নিছক কল্পনা। আমি তীর্থ ভ্রমণ করেছি বটে, তা’ দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত। একটু থেমে বললেন : কোন্ কবিতা কখন কার ভাল লাগবে, কেউ বলতে পারে?

কথা উঠল কবির “তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাজে” গানটির রচনাকাল ও উৎপত্তি সম্বন্ধে। কবি বিনা বিধায় আহুর্পূর্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত কোরে গেলেন।

পবিত্রদা তখন কবিকে জানানলেন, তাঁর “চলমান জীবনে” ও-গানটির রচনা সম্বন্ধে ঠিক এই ঘটনাই তিনি লিখেছেন।

কবি বললেন : তাই নাকি? কৈ জানাও নি তো?

পবিত্রদা একটু সপ্রতিভ হলেন।

আমাদের মধ্যে কে একজন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে : আচ্ছা, আপনি কোন কবিতা লিখে পরে তার আবার অদল-বদল করেন নাকি?

কবি সোজাসুজি এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন : না, আমি কবিতার কাটাকাটি একেবারেই পছন্দ করিনে। যা, হাতে আসে তাইই লিখে যাই। ফুলের কি আবার রঙ

ধরাণো যায়? আজকাল এই বুড়ো বয়সে একটু-উ-সংশোধন করছি।

এই সময় রাণা বহু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়ের ঘটনা ব্যক্ত করতে অহুরোধ জানালেন।

এ-কথার জবাবে কবি বললেন : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন চারুদাস। “পরিচারিকা অফিসে”। নিরুপমা দেবী ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদিকা। ঘটনার কিছুদিন আগে পত্রিকাটিতে আমার একটা কবিতা বেরিয়ে ছিল। আমার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন,—কে, কবি কুমুদ রঞ্জন? তুমি তো সত্যিকারের কবি হে! বিভিন্ন পত্রিকায় তোমার যখন কবিতা পড়ি তখন আনন্দ পাই। তোমার কবিতা চিরকাল অম্লান হ'য়ে থাকবে।

কবি ব'লে চললেন : যখন শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ আমার কবিতা পড়েন, এবং তা' ঠুঁর ভাল লাগে, তখন আমি কেমন যেন অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। ছোট হরিণের শিশু যেমন হিমালয়ের দিকে চেয়ে থাকে, আমি সেইভাবে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথাও কবি উল্লেখ করলেন। চিঠিখানি কবির ‘শতদল’ কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে লেখা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—“তোমার শতদলের একশত দলই আত্মাণ করিয়াছি। ছোট ছোট কবিতাগুলি মধুক্রমের স্তায় রসপূর্ণ। স্থানে স্থানে, মৌমাছির হলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।”

কথায় কথায় কবি বললেন : রবীন্দ্রনাথের পর পাঁচা আমার তেমন ভাল লাগে না। আর মহাকাব্য? যদি তেমন প্রতিভাবান পুরুষ আসেন, তবে চলবে, নইলে না।

কথা প্রসঙ্গে, প্রবীণ ও নবীন নানান কবির রচনা সম্বন্ধেও কবি আলোচনা করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কথা উঠতে বললেন : মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রকে খুব বেশী ভাল বাসতেন, যদিও আজকাল কেউ কেউ ঠুঁকে কবি ব'লে মানতেই রাজী নন।

কল্পনাধিকারের উদারতার একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন পবিত্রদা। শুনে কবি বললেন : কল্পণাদার লেখা

আমার খুব ভাল লাগে। উনি আমাদের মধ্যে শুধু জ্যেষ্ঠ কবি নন, শ্রেষ্ঠ কবিও বটে।

আমাদের মধ্যে কে একজন প্রশ্ন করলে : কার লেখা আপনি সবচেয়ে বেশী পড়েছেন ?

এ প্রশ্নের জবাবে কবি সলজ্জ ভাবে বললেন : কি আর বলব তোমাদের ? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সব লেখা আজও পড়ে শেষ করতে পারিনি। তবে, দেবেন সেনের লেখা আমি খুব পড়েছি।

কথা উঠল আজকালকার সমালোচকদের সম্বন্ধে,—কেউ করেন অকারণে নিন্দা, আবার কেউ কেউ বা করেন অযাচিত স্তুতিবাদ।

এ-প্রসঙ্গে কবি বললেন : আমি পদ চাই, পদক চাই

না। কি হবে আমার এতে ? তারপর পাঠ করলেন—

“কথাতে আর গরল নাহি—কথার ভয়ে হইনে ভীত

সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।

নিন্দা যারা করেন আমার—করেন না তা’ বন্ধু বিনে,

ধূলায় ধূসর যে জন তারে ধূলা দেওয়া স্নেহের স্বপ্নে।

যারা করেন হুখ্যাতি মোব লই না কারণ বিফল নেওয়া

ছাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে অকারণে বসন দেওয়া।

গৌরব আমি রাখবো কোথা ? ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিকে,

রে তাই মঘর পুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।”

বেলা বেড়ে গেল। কবির নির্দেশমত আমরা গাঁয়ের হাট দেখতে গেলাম, শ্রীমান্ তীর্থঙ্কর ( ওরফে বাবুয়া ) রয়ে গেল কবির কাছে। আমরা ফিরে এসে দেখি কবি ইতিমধ্যে শ্রীমান্ তীর্থঙ্করকে একটি আশীর্বাণী লিখে দিয়েছেন—

“দেখতে এলে ? হে ‘বাবুয়া’ তাই

করছি আশীষ—করবো আলাপ কি ?

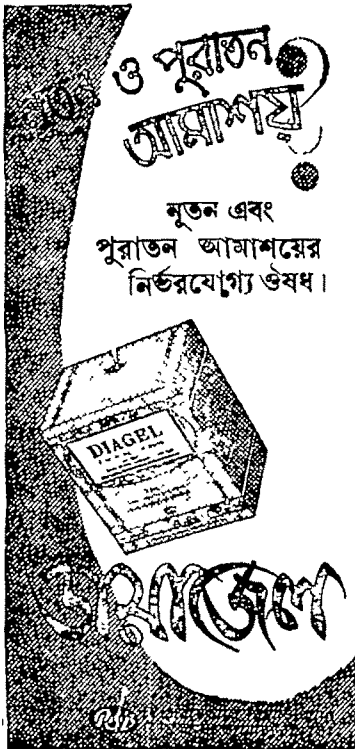
আজকে কোরক—রও ফুটে স্বপ্নান—

চিবদিনের শোভার গোলাপটি।”

মধ্যাহ্নে ভুরিভোজ হল। তারপর বিদায়ের পালা।

কবি ছলছল চোখে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। একবার অশ্রুট স্বরে বললেন : এবার তা’ হ’লে কেমন কোরে থাকব,—সবই যে শূন্য হয়ে গেল !

ভারাক্রান্ত মনে একপা-একপা কোরে এগুতে লাগলাম ; আর ভাবতে লাগলাম,—পিছনে যে-মাহুষটি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর কৃষ্টি ও ভাবধারা বহন কোরে তখনও অপলক নেত্রে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন,—তার মাহুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও উচ্চ জীবনাধর্শের কাছে—বর্তমানকালের স্থলবুদ্ধি, জড়বাদী মাহুষের প্রাণ চাকল্য ও জীবনধারণের তফাৎ কতখানি !



# স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রামাদাস দে

যাঁর উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বর করেছেন, বলেছেন, আমার যা কিছু ছিল সব তোকে সমর্পণ করে দিয়ে আজ আমি ককির হয়ে গেলুম; সমাধি অবস্থায় সপ্তর্ষির এক ঋষিরূপে সপ্তর্ষির মহ্যমণিরূপে থাকে তিনি দেখেছিলেন; থাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ব নির্বাচিত সর্বোত্তম পার্শ্বদরূপে চিনে নিতে এতটুকুও অল্পবিধা হয়নি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, হয়নি বিন্দুযাত্রা বিধা, সেই মহামানব মহাঋষিই স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বলেছেন, ওরে তোকে যে আমি চিনি, আমি যে দেখেছি তোকে আগে, তাইতো তোরই আশায় পথ চেয়ে কতো কাল, কতো যুগ ধরে আমি বসে আছি। ভগবান বৃকে জড়িয়ে ধরলেন অষ্টাদশ বর্ষীয় কলেজের পড়ুয়া তেজস্বী তরুণ নরেন্দ্রনাথকে। নয়নে তাঁর আনন্দাশ্রয় ধারা বিগলিত। অপার্থিব দ্যুতিতে উজ্জ্বল ছুটি স্নেহমাখা চোখ তাকিয়ে আছে প্রদীপ্ত সূর্যের মত ভাস্বর ছুটি জিজ্ঞাসু চোখের পানে। ‘জবাকুস্থম সঙ্কশং মহাদ্যুতিমান’ নবীন এক সূর্যের পানে।

এই নরেন্দ্রনাথ। এই স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রচলিত অর্থে মঠের সব সন্ন্যাসীই তো স্বামীজী। অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ককেও সন্ন্যাসার্থে স্বামীজী বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আজকের গোটা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে সমস্ত স্থানীয় স্বামীজী বলতে একজনকেই মাত্র বোঝেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ নরেন। ত্রেতা যুগের নরনারায়ণ যেমন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন—এ যুগের নরনারায়ণ তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, একাত্মা নরেন্দ্র-গঙ্গাধর।

স্বয়ং সরস্বতী যাঁর কণ্ঠে, জটিল বেদবেদান্ত যাঁর শ্রীমুখ থেকে শিশুবোধ্য সরল ভাষায় অহরহঃ নিশ্চিত হয়েছে, সেই অদ্বিতীয় ভাষার যাত্রাকর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নরেনের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। একের পর এক তুলনা দ্বারাও যেন সাধ মেটেনি। বলেছেন, মহাভারতের যুগে ছিল নরনারায়ণ, এবার নয় নয় শুধু,

নরেন ইন্দ্র। বলেছেন—ও খানা ভোবা নয়, ও একেবারে হালদার পুকুর, মাছের মধ্যে ও লাল-চক্কু পাকা কই, অস্ত্রান্ত ভক্তরা কেউ বড়দল পদ্ম, কেউ শতদল পদ্ম, নরেন একেবারে সহস্র দল, মাদী পায়রা নয়, ও পুরুষ পায়রা। অস্ত্রান্ত ভক্তদের খাওয়াদাওয়া আচার আচরণে কতো বাধানিষেধ, শাসন অস্থশাসন, নরেনের কোন বাধানিষেধ নেই, নেই কোন অখাদ্য কুখাদ্য বিচার। ও সব খেতে পারে, ওর কোন পাপ হবে না। পাপ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না, ও মুক্ত পুরুষ। এমনি কতেভোবে উপমা উদাহরণ দ্বারা ঠাকুর নরেনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন সকল ভক্তদের কাছে। নরেনের প্রতি ঠাকুরের এই অহৈতুকী কৃপা, অপরিণীম স্নেহাতিশয্য দেখে হয়তো অস্ত্রান্ত ভক্তদের মনে ঈর্ষা জেগেছে, কিন্তু নরেন নির্বিকার। তুল্য নিন্দাসুত্তি মৌনী। গীতার সেই স্থিতপ্রজ্ঞ, সেই পুরুষোত্তম যেন। মাঝে মাঝে সহাস্ত উপেক্ষায় ঠাকুরের এইসব উচ্ছৃঙ্খিত মন্তব্যকে স্বামীজী বলেছেন, পাগলের প্রলাপ। হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন সব কথা, কিন্তু হাসতে পারেননি শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

স্বয়ং ভগবান যাঁকে এতখানি উচ্চাসন দিয়েছেন, যিনি নিজের তাঁর স্বরূপটি জানতে পারলে আর দেহ রাখবেন না—এই আশঙ্কায় স্বয়ং ভগবান নিজ হস্তে যাঁর স্বরূপবোধের চাবি-কাঠিটি লুলিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের কতটুকু আমরা জেনেছি। কি ছিল তাঁর স্ব-রূপ বা একমাত্র ভগবানই জেনেছিলেন?

১৮৬২-র ১২ই জ্যাম্বারী থেকে একশ বছর পার হয়ে গেল। বর্তমান ১৯৬২ স্বামীজীর জন্ম শতবার্ষিকী বর্ষ। সারা বিশ্বে বর্ষব্যাপী উৎসবাহুষ্ঠান চলবে। এই উৎসবের ডামাডোলে স্বামীজীর সত্য রূপটি, তাঁর স্ব-রূপটি আবিষ্কারের একনিষ্ঠ প্রয়াস থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। বিকৃত না হয় যেন তাঁর বিরাট স্বয়ং দেখলুম রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে কোন কোন ক্ষেত্রে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী হ’ল দেহরক্ষা করেছেন স্বামীজী। এইটুকু সময় যদিও অতবড় একটা জীবনকে পরিপূর্ণ

সব নানা  
সম্ভব হইল এত-

স্বাধীনতার আত্মীয়তা বোধের পথিকৃত,  
সংগ্রামের অগ্রদূত, শুধু কি দেশের তারুণ্যকে  
বাধর্মে আর পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেই সমাপ্ত  
হইলেন তাঁর গুরুপ্রদত্ত দায়িত্ব? শুধু কি চতুর্দিকে  
গুলি মঠ-মিশন স্থাপন করে সকাল সন্ধ্যায় ভজনাত্তির  
হা দ্বারা একদল সন্ন্যাসী পোষণের আয়োজন করে  
লন? তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে যে কাজ তিনি করে  
ছেন, তা বার থেকে বিচার করতে গেলে হয়তো  
‘ফটা ঐরকমই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু ওতো শুধু বহিরঙ্গ  
। ওরও উর্ধ্বে আছে আর একটা অন্তরঙ্গ রূপ। শুধু  
নয়, কর্মের পশ্চাতে যে আদর্শ, শুধু action নয়,  
ion-এর প্রেরণাদাতা যে heart, স্বামীজীর সেই  
দর্শকে বুঝতে হবে; উপলব্ধি করতে হবে কর্মপ্রেরণার  
সেই হৃদয়কে। সেই হবে স্বামীজীর স্বরূপ দর্শন।

স্বামীজী Political leader নন, নন তিনি religi-  
ous preacher, যদিও চিকাগো মহাসম্মেলনে স্বামীজীর  
কাটিকে অনেকে শুধু preacher, শুধু ধর্মপ্রচারক বলে  
খ্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু চিকাগো সম্মেলনে  
স্বামীজীর সত্য ভূমিকাটি ছিল ভারতাত্মার বাণীরূপ। শুধু  
দুর্ধর্মের প্রতিিনিধি নন, তিনি ছিলেন বৈদিক ঐতিহ্যময়  
ধর্ম ভারতের আদর্শ প্রতিভূ। কিন্তু এ-ও স্বামীজীর  
রূপ নয়।

মহাত্মাকে বলা হয় ‘Father of Indian nation-

alism’, অনেকে আবার স্বামীজীকে এক ভিত্তি উচুতে  
তুলতে গিয়ে বলেন, ‘He was the grand father of  
Indian Nationalism’, কিন্তু এতে তাঁকে কতোটা  
বড় করা হল বোঝা যায়। কারণ তিনিতো শুধু ভারতের  
নন, তিনি যে সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের প্রতিটি জীবের  
‘পিতা চ মাতা চ বন্ধুচ সখা’।

স্বামীজীর একমাত্র সত্য পরিচয় তিনি মানবসেবক—  
না না তাও নয়, তিনি সমস্ত জীবের সেবক—এতেও ঠিক  
বলা হল না। ইহ বাহ্য, তিনি শিব জ্ঞানে জীবসেবক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামনে ‘দয়্য’ প্রসঙ্গে একদিন  
আলোচনা করেছিলেন ভক্তেরা। নরেন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন  
সেখানে। ভাবমুখে হঠাৎ এক সময় ঠাকুর চিংকার করে  
উঠলেন—জীবে দয়্য কিরে শালা, তুই দয়্য করবার কে?  
শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

কথাটি অনেকের কানেই পৌঁছেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রের  
শুধু কানে নয়, পৌঁছেছিল “কানের ভিতর দিয়ে মরমে।”  
তাই জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত চিন্তায় কর্মে যা কিছু  
তিনি করেছেন, দয়্য করার অহমিকা নিয়ে নয়, করেছেন  
সেবা করার বিনতি নিয়ে। স্বামীজীর কর্মের এইখানেই  
বৈশিষ্ট্য। স্বামীজী আদর্শ কর্মযোগী।

দেশের তারুণ্য, দেশের যুবশক্তি স্বামীজীর এই  
কর্মাঙ্গদর্শটিকে যদি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারে, গ্রহণ  
করতে পারে, বরণ করতে পারে, তবেই সার্থক হবে  
শতবার্ষিকী উৎসব।\*

\* বিগত ৭ই এপ্রিল কলিকাতায় প্রবর্তক ভবনে অনুষ্ঠিত প্রবর্তক  
সাংস্কৃতিক সাধনচক্রের সাহিত্য শাখার বিশিষ্টতম অধিবেশনে গঠিত।

## অজীর্ণ রোগে...

অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, খাওয়াব পর পেটে বেদনা,  
পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত

# কারিকাপেপটল

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড  
কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ  
সালকিয়া, হাওড়া।

## মন্দিরের চাবি ও মন্ত্র

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

মন্দিরের চাবিকাঠি রূপা নয় এ সোনার কাঠি  
এক মস্ত্রে শুধু খোলে দক্ষিণে ঘোরালে কুক্কাটি।  
সেই মস্ত্র সিদ্ধি লাগি লাগে মূল্য আত্মসমর্পণ  
জনে জনে প্রাণেমনে সাধনার সংকল্প গ্রহণ।  
তাহ'লে খুলিবে তালো খুলে যাবে যক্ষের ভাণ্ডার  
প্রাচুর্য মাধুর্য শাস্তি স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা সদাচার।  
কুবেরের রূপণতা সঙ্কয়ের সঙ্কীর্ণ প্রয়াস  
দূর হবে অংশ ভাগ দায়াদের হীন অবিশ্বাস।

ইষ্টনিষ্ঠা হবে স্থির ইষ্টগোষ্ঠী ধ্রুব-আদর্শের  
সীতা দময়ন্তী সতী রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ ভরতের।  
মহেশ্বরী মহেশ্বর সর্বত্যাগী শ্মশান আশ্রয়  
মৃত্যুর বিহুতি বিনা প্রাণশক্তি শুদ্ধ নাহি হয়।  
তীহাদের পাদপীঠ স্বদেশের ধন্থ ধূলি কণা  
সংখ্যাহীন পুত্রকন্ডা সীমাহীন ভারী সম্ভাবনা।  
আশা ও বিশ্বাস ধরি নরনারী চলে উচ্চমুখে  
পেশল কুশল কর্মে ধৈর্যের ঐশ্বর্য়ে দুঃখে সুখে।

প্রাণ শুধু বায়ুমাত্র, আত্ম যেন পদ্মপত্র  
অপরের দুঃখ দূর না করিলে একান্ত নিখল।  
ছাগবলি নহে বন্ধু, ত্যাগ খড়্গো বলি দাও ভোগ  
সেই ভুক্তভোগ লহ সে-প্রসাদে সাধো রাজযোগ।  
নাক টিপে হঠযোগ, চোখ টিপে প্রত্যাহার নহে  
প্রত্যক্ষ দুর্গত দীন তার মাঝে নারায়ণ রহে।  
এই যুগে তারি পূজা, কর সেবা নর-নারায়ণ  
মহাভারতের মস্ত্র জনে জনে কর বিতরণ।

স্নানমুখে হরিজনে রাশিওনা নিরবসিঁতেরে—  
পাত্র শুদ্ধ নহে খেলে, যাত্রা শুভ নহে চক্ষে হেরে  
মুখ'ও দরিল নীচ অজ্ঞেরে অবজ্ঞা নাহি কর  
সর্বদা জ্ঞান করি সমাজেরে উচ্ছে তুলে ধর।  
তোমার বক্ষের রক্ত আত্মার আত্মীয় তারা সবে,  
অগ্নির ফুলিজ অগ্নি সে কেন অস্পৃশ্য কতু হবে ?  
তারাই জ্ঞাতির ঋণ, ধনী ও শিক্ষিত সবে ঋণী  
উত্তমর্গ তাহারাই, ফিরে দিন যা পারেন যিনি।

সগর্বে সকলে বল তাহারা সকলে ভয়ী ভাই  
এ-প্রত্যয় নাহি হলে এ-জ্ঞাতির ভবিষ্যৎ নাই।  
সবজ্ঞ নির্যোধে বল ভারতের ব্রাহ্মী রীতিনীতি  
অথবা বুদ্ধের শীল, কিম্বা নিত্যানন্দের প্রতীতি।  
বক্ষে বক্ষে এক জীব, সর্বজীবের এক নারায়ণ,  
জন্ম বাল্য যৌব জরা মৃত্যু নদী তরঙ্গ যেমন।  
সর্বনদী একমুখী সর্ব জল চলে সিন্ধুজলে  
নরোত্তম নরতত্ত্ব নারায়ণ ভারতেই বলে।

## স্বামীজী তোমার পুণ্য পরশে

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ

গো এসেছিলে হে বীর সন্ন্যাসি ! বঙ্গজননীর কোড়াশ্রমে তোমারি ভাবের দ্যোতনায় হিয়া  
মিত প্রতিভায় সঞ্চারি' গেলে কর্মযোগের প্রেরণা দিয়ে । আজো নেয় সাড়া বিজলী প্রায়  
বহু আবার সংগ্রামীরূপে স্বপ্নজীবন বিরামবিহীন ভুলেরই পথচলা মিথ্যা স্বাধীনতায়  
তেরে তুমি দলেছ চরণে সমাধিগ্ন রাত্রি দিন । সত্যশ্রয়ের প্রেরণা চায় ।  
নি বাধা সে তিমির রাতের পর্বত সম বিহ্বরাশি যত সাধুজন হতেছে মৃতপ্রায় শয়তানেরি রথচক্রতলে  
বারে হেরিলে নারায়ণরূপে অশেষ তোমার করুণারশি । পার্শ্বসারথীর গদাঘাত হানি' স্তব্ধ কর সে ছুইদলে ।  
তীর্থাগ্রে তুমি প্রথম শুনালে প্রাচীনাদর্শের কীর্ত্তিগাথা জানিগো জানি তুমি চিরজাগ্রত তথাপি তোমার স্মরণ করি  
মীজী তোমার পুণ্য পরশে ধন্ত হয়েছে ভারত মাতা । মহুশ্বতের প্রেরণা যোগাও প্রার্থনা মোর হৃদয় ভরি ॥

## একটি বিদেহী আত্মার উদ্দেশে

শ্রীসমরজিৎ কর

একথা কেউ শোনে নি, কেউ জানে না ।

এলো অন্ধকার—

ফুলফুলির মধ্যে থেকে—

প্রথমে তন্দ্রা ।

তার পরিচয়—

জানেন ।

যেবে অনন্ত স্তব্ধতা ।

ককাল থেকে—

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

গেলে ॥

দিনের আলোর শেষে যারা,

বিশ্বের গভীর গহনতা, আর স্তব্ধতা ঘিরে

একে একে নীরবে, এগিয়ে চলেছে

আমি জানি, তোমার আত্মা সেখানেই শেষে

ঠাই বেঁধে নেবে ।

পৃথিবীর এখানে সেখানে শত চিহ্ন আঁকা ।

সবাই অথের স্বপ্ন রচনা করেছিল—

জানেন নি—তার সবই ছিল ফাঁকা—

সেটা বৃদ্ধ বৃদ্ধ, সবটাই সামগ্রী নয়—

সামগ্রীর খোল শুধু ।

আজ তুমি ব্যাপকতা ঘিরে অথের স্বপ্ন দেখছ

যদিও জানি, স্থখী তুমি নও ।

আত্মার সার্থক প্রকাশ দেহে,

কারণ, বাস্তব প্রকাশেই শক্তি গর্ভ ।



# সংগ্রহ

চন্দননগরে বিশ্বকবি—

রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ—

শ্রীমৃণাল ঘোষ প্রণীত। গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী। মূল্য প্রত্যেকটি ১/-।

গ্রন্থকার-পরিকল্পিত “রবীন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থমালায়” যথাক্রমে ১ম ও ২য় গ্রন্থ উপরোক্ত দুইখানি নিবন্ধ পুস্তিকা।

চন্দননগরে বিশ্বকবির আগমন ও অবস্থিতি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর বর্ণিত গ্রন্থে উল্লিখিত ও সমুখে একাধিক জনসভায় বীকৃত চন্দননগরের প্রভাব ও শ্রুতি হলেখক মৃণালবাবু গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়াছেন ও তাহাই তাঁহার প্রথমোক্ত বইখানিতে স্মৃতিপুণ্ড্রাবে পরিবেশন করিয়াছেন।

“এই পদাতিরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন”—এই মর্মে বিভিন্ন সময়ে লেখা ও বলা কবি-কথাস্তলি সমস্তই একত্র সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়া মৃণালবাবু চন্দননগরবাসীর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

“চন্দননগরের আকাশ-বাতাসে রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের অনেক শ্রুতি ছড়াইয়া আছে।...চন্দননগর শুধু বিপ্লবতীর্থ নহে, চন্দননগর রক্ততীর্থ।”—লেখকের এই কথাই আসার পূর্ণ সানন্দ সমর্থন করি।

রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববীকৃত। কবি রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড তুষ্টি প্রতিভারই দুইখানি স্বতন্ত্র-মুখের বিগ্রহ। কবি স্বয়ং তাঁর চিত্রকলামুখীলন প্রেরণাকে তাঁর জীবনগ্রন্থের শেষ অধ্যায় নয়, এক প্রকার পবিশিষ্ট বচনার আয়োজন বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ আয়োজন তাঁর জীবনদেবতারই।

“আমার যা ইচ্ছা তাই”—“মনের সঙ্গে মন-তুলি নিয়ে খেলা”—“কি সরেছি, কি বলতে চেয়েছি, তা’ আমি জানি-নে”—এই হইতেছে কবিশিল্পীর নিজেরই দেওয়া নিজ কলামুখীলনের মর্মে পরিচয়। আর তুষ্টিধর মৌলিক প্রতিভাশক্তির ক্রিয়া রহস্য সম্বন্ধে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সঠিক সংজ্ঞা বা স্বরূপ বর্ণনা সম্ভবতঃ আর কেহই দিতে পারিবেন না।

কবির ভাষায় ইহা কবির অস্তিত্বের যথাকথা। মৃণালবাবু মনোজ্ঞ সঙ্কলন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভঙ্গী রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোতুলী পাঠক পাঠিকার আরও কোতুল হৃদয়ই করিবে—আর ইহাইতো বইখানির বর্ষাধিকার্য।

—শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত

দয়াল-গাথা—মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার বিরচিত, প্রকাশক—ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ। পোঃ মগরা, হুগলী হইতে প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা।

একদা মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের শ্রীমন্তগাথগীতা ভাষ্য-সম্পাদে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে সমাদৃত হইয়াছিল। দয়াল মহাশয়ের

অমূল্য উপদেশাবলী বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাকারে স্থান লাভ করি আলোচ্য গ্রন্থখানিও দয়াল মহাশয়ের অমূল্য উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য পুস্তিকা হইলেও, অমূল্য উপদেশাবলী ও পুস্তিকাখানির মূল্যের চেয়েও বেশী গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আশা এই অমূল্য উপদেশাবলী সংসারী জনসমাজের যথেষ্ট উপকার হই পুস্তিকাখানার বহল প্রচার কামনা করি।

—ডাঃ তারা প্রসন্ন সরকার

মধুকুমার—কাব্যগ্রন্থ; কবি শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদত্ত কুমার পাঠক। রাঃ বেড়, চুঁচুড়া। মূল্য—দশ আনা।

‘মধুকুমার’-এর রচয়িতা ‘চুঁচুড়া বার্তাবহ’-এর সম্পাদক। পুস্তিকাখানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত, ছোট ও বড় তেইশটি, বিভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতার সমষ্টি।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত ও প্রতিপত্তি পরিবর্তনে বাস্তবীকৃতি আজ মূহুর্ত। গ্রন্থকার বর্তমান বাস্তব জীবনের সর্বব্যাপী বিবর্ততার মাঝে কবিতার মাধ্যমে যে অনাবিল হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহাই কবিতাগুলির সার্থকতার ‘সাক্ষ্য’। গ্রন্থখানি বাস্তবী পাঠক চিত্তে আনন্দ ও হাস্যরস পরিবেশ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

—শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আলিম্পন (লোকশিল্প)—প্রতিভাবালী বঙ্গীয় শিল্পী কর্তৃক ৬৬ বি আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.৫০ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২।

বাস্তবায়ন পুস্তিকা, ব্রজ-অমৃতান, বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি ও নৃত্য আঙ্গিক হিন্দুধর্মের আলোচনা এদেশে প্রচলিত থেকে। এই শিল্পকাণ্ডে নর্তকদেরই প্রধানতঃ দেখা যায়। শিল্পী হুগলী রায়েব ‘আলোচনা শিক্ষা’ ও অজ্ঞান ছাড়া এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অমূল্যলোপযোগী দৃষ্ট হয় না। আলোচ্য বইখানি এই অমূল্য দৃষ্টান্ত এবং এই লুপ্তপ্রায় শিল্পটির সংরক্ষণের সহায়ক।

শিল্পের অলঙ্কার আর সজ্জা মনোহর পনার যে একটা আপন মধ্যাদা ছিল, এ বইতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্রিভাবে চিত্রিত হয়ে থেকে গিয়েছে। হুটিয়ে তুলেছেন এ বইয়ে। করেছেন। বইটির পাতা সমস্ত অসাধারণ। তিনি উহার ব্যবহার-বিধি—কোতুল তায়ও হৃদয় ব্যাখ্যা এ পরিবেশকে ফি.বিরে আলো জ্বলে বইখানি পাঠ্য হবে।

# সম্মানসূচক

## ১৯৫২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন:

সম্প্রতি (১৬ই হইতে ২৫-এ ফেব্রুয়ারী) বিশ্বের ষষ্ঠ (অবশ্য গুণগত নয়—সংখ্যাগত) গণতান্ত্রিক নির্বাচন ভারতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। স্বাধীনতার পর ভারতে ইহাই তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার তৃতীয় নির্বাচনে একুশ অথবা ততোধিক ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় মাড়ে একুশ কোটি। ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ও ১২ কোটি ৩০ লক্ষ। এবারকার নির্বাচনে সর্বভারতে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি অর্থাৎ মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় নির্বাচনে এই মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল ২, ১৪১, ৫৯৭।

### লোকসভা

লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ৫০৭। এই সদস্যদের মধ্যে ৭ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত, ৬ জন জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা কর্তৃক মনোনীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। বরফাক্ষম হিমাচল প্রদেশের ৪ জন সদস্যের নির্বাচন বর্তমান এপ্রিল মাসে হইবার কথা। এবারকার লোকসভায় নির্বাচনে সর্বমোট ভোটারের অর্ধেক (১০ কোটি ৩০ লক্ষের কাছাকাছি) ভোটার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মোট প্রদত্ত ভোটের কংগ্রেস পাইয়াছে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ (৪৫.২৪%) পুন্ড্র প্রায় এক কোটি (১০.৬৭%), স্বতন্ত্র পার্টি ৮৪

লক্ষ, পি-এস-পি ৭০ লক্ষ, জনসংঘ ৬১ লক্ষ, সমাজতন্ত্রীদল ২৭ লক্ষ, ডি-এম-কে ২৩ লক্ষ, এবং বাতিল ভোট বাদে বাকী অংশ পাইয়াছে দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ। এবার বাতিল ভোটের সংখ্যাও প্রায় ৩৯ লক্ষ (৩.৮%)।

লোকসভার মোট আসনের জয় সর্বভারতে মোট প্রার্থী ছিলেন ১৯৮০ জন, তন্মধ্যে দল হিসাবে প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে কংগ্রেস ৪৮৮, জনসংঘ ১২৮, স্বতন্ত্র দল ১৭২, পি-এস-পি ১৬৬, সি-পি-আই ১৩৭, সোশালিষ্ট ১০৭, রিপাবলিকান ৮০, হিন্দু মহাসভা ৪২, রামরাজ্য পরিষদ ৪১, ডি-কে-এম (দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঙ্গাগাম) ১৮, বাদুগুণ্ড পাটি (বিহার) ১১, গণতন্ত্র পরিষদ (উড়িষ্যা) ১০ এবং বাকী অজ্ঞাত।

লোকসভায় দলগতভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে কংগ্রেস ৩৫৬, কমুনিষ্ট ২৯, স্বতন্ত্র ১৮, জনসংঘ ১৪, পি-এস-পি ১২, ডি-কে-এম ৭, সমাজতন্ত্রী ৬, গণতন্ত্র পরিষদ ৪, আকালী ৩ এবং বাকী ৩৮টি আসন নির্দলীয় ও অবশিষ্ট দলগুলি মিলিয়া পাইয়াছে। সর্বদল মিলাইয়া এবার মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৬ জন। তৃতীয় নির্বাচনের অগ্রতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার লোকসভায় প্রতিনিধিদের মধ্যে আনকোরা নূতন নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী (২৮৩)।

### বিধানসভা

সর্ব ভারতীয় বিধান সভার মোট আসন সংখ্যা ৩,১৭৫; তন্মধ্যে এবারকার তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে ২,৮৩৫টি আসনের জয় নির্বাচন হইয়াছে। কেরালা (১২৬) ও উড়িষ্যার (১৪০) নির্বাচন ইতিপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। এক রাজস্থান ব্যতীত সর্ব রাজ্যেই কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ট হইয়াছে। সর্ব সাবুল্যে দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় এবার কংগ্রেসের শক্তিস্থান হইয়াছে ১০%। পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় দলগতভাবে গত তিনটি নির্বাচনের তুলনামূলক চিত্রটি এইরূপ:

| মোট আসন             |      |      | ভোটার সংখ্যা |              |      | প্রদত্ত ভোট সংখ্যা          |           |           |                     |      |       |       |
|---------------------|------|------|--------------|--------------|------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|------|-------|-------|
| ১৯৫২                | ...  | ২৩৮  | ...          | ১২, ৪১৫, ১০৭ | ...  | ৭, ৫৩৭, ৮২৭                 |           |           |                     |      |       |       |
| ১৯৫৭                | ...  | ২৫২  | ...          | ১৫, ২১৬, ৫৩২ | ...  | ১০, ৪৬৯, ৮০৩                |           |           |                     |      |       |       |
| ১৯৬২                | ...  | ২৫২  | ...          | ১৭, ২৭০, ০০০ | ...  | ২, ২৪১, ৫৮২                 |           |           |                     |      |       |       |
| প্রার্থী            |      |      | জয়          |              |      | আনুসূচ্য প্রদত্ত ভোট-সংখ্যা |           |           | প্রদত্ত ভোটের শতকরা |      |       |       |
| ১৯৫২                | ১৯৫৭ | ১৯৬২ | ১৯৫২         | ১৯৫৭         | ১৯৬২ | ১৯৫২                        | ১৯৫৭      | ১৯৬২      | ১৯৫২                | ১৯৫৭ | ১৯৬২  |       |
| কংগ্রেস—            | ২৩৮  | ২৫২  | ২৫২          | ১৫১          | ১৫২  | ১৫৭                         | ২,৮৮৬,৫৩৮ | ৪,৮৩০,৯৯৮ | ৪,৭৪৮৮,৫১৫          | ৩৮'২ | ৪৬'১৪ | ৪৫'১  |
| পি.আই—              | ৮২   | ১০৩  | ১৪৬          | ২৮           | ৪৬   | ৫০                          | ৭৩২,৩০৪   | ১,৮৮৫,১০৬ | ২,৩৭৯,৯৫৩           | ২'৭১ | ১২'৪২ | ২৪'০০ |
| সি.পি—              | ১২১  | ৬৭   | ৮৭           | ১৫           | ২১   | ৫                           | ৬৩১,০০২   | ১,০৩১,৩২২ | ৪৭৭,৪০৯             | ৮'৬  | ৯'৮৫  | ৪'৮   |
| স্বা. দল—           | ৩১২  | ১৬৮  | ১৪৭          | ৩৪           | ২২   | ২৮                          | ১,৫৭৮,০১২ | ১,২২২,৯০০ | ৯৮৮,৮১০             | ২০'২ | ১১'৭  | ৯'৭   |
| স্বতন্ত্র প্রার্থী— | ৬০২  | ৩৪৬  | ৩২৪          | ১০           | ১১   | ১৪                          | ১,৪৮১,৭৪৪ | ১,৪৮৫,৫৫০ | ১,১২৬,৬১৩           | ১৯'৭ | ১৪'১  | ১২'০০ |

বিগত তিনটি নির্বাচনের দলগত এই তুলনামূলক অবস্থা হইতেই পশ্চিম বঙ্গে তৃতীয় নির্বাচনের গতি ও প্রকৃতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

### হেমপ্রভা মজুমদার :

সম্প্রতি (১৮ই মাঘ) সে-যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্ভীক নেত্রী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া হেমপ্রভা মজুমদার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীমতী মজুমদারের মৃত্যুতে অসহযোগ আন্দোলন যুগের একটা উজ্জ্বল ঐতিহ্য ও স্মৃতির স্মৃতি ছিন্ন হইল। নারী-সমাজে দেশসাধনার অগ্রগামিনী হিসাবে হেমপ্রভা মজুমদার আদর্শস্থানীয় ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। আজকালকার দেশসাধনা একটা অর্থকরী বৃত্তির পর্যায়ে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সাধনা আছে, কিন্তু প্রেম নাই। এ সাধনার প্রেরণা আত্মস্বার্থ সিদ্ধি। কিন্তু হেমপ্রভা মজুমদার সচ্ছল পারিবারিক জীবনের স্বস্তি ও শান্তি বিসর্জন দিয়া প্রাণের উত্তাপে ও দেশ-মাতৃকার দরদেই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। এ জন্ত তিনি অকথ্য নির্ধাতন ও অমানবদনে সহ্য করিয়াছেন। তাঁর ত্যাগ ও আত্মরিক্ততাব তুলনা এ-যুগে মিলিবে না। প্রায় দশ বৎসর কাল অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন এবং বহুদিন কলিকাতা কবপো-রেশনের ‘অগারম্যান’ ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে তিনি অল্পপ্রাণিতা ছিলেন। শ্রীমতী মজুমদার নোয়াখালি খিলপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশের কন্যা ও কুমিল্লার স্বনামখ্য নেতা বসন্তকুমার মজুমদারের স্নযোগ্যা সহধর্মিনী ছিলেন। প্রবর্তক সত্য তথা সত্যগুরুর সাহিত্যও শ্রদ্ধেয়া মজুমদারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এ জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে হেমপ্রভা মজুমদারের নাম অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

### শিল্পপতি প্রকাশচন্দ্র শেঠ :

একটা জাতির মেরুদণ্ড গড়িয়া উঠে এবং তাকে স্বন্দ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পৃথিবীর বুকে মাথা খাড়া করিয়া সগর্বে

দাঁড়াবার সামর্থ দেয় তার অর্থনৈতিক সাধনা ও সাংস্কৃতিক বিগত ও বর্তমান শতকে বাঙালীর বহুমুখী বিচিত্র সাংস্কৃতিক-চমৎকারী অভ্যুজ্জ্বল আলো সত্ত্বেও, আজিকার বাঙালী নিম্ন বাসভূমে প্রবাসী হইয়া একটা অসহায় দাস জাতি পরিণত হইতে চলিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য ইহার কারণ বাঙালী জীবন-বুদ্ধি ও বাঁচার কৌশল সংগ্রামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সাধনার ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে নাই। তাই অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাংলার ধ্বংসের পরে যে মুষ্টিমেয় দূরদর্শী নির্মাণতন্ত্রে আত্মপ্রতিফলিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম—করাই গিয়াছে শেষ করা যায়। এই স্বল্প সংখ্যকের মধ্যেই শেঠ বাতৃঘর—প্রতাপচন্দ্র ও বিনয়কৃষ্ণ। তাঁহারা নিজেদের এ জাতির স্মরণীয় ও বরণীয়। বাংলায় প্রাথমিক সংগঠনের তাঁরা অন্যতম অগ্রণীপুরুষ। লিলি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের অবিমরগীয় কীর্তি। ইহাঁতে স্নযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রকাশচন্দ্র শেঠ। এভাবে ক্রমে ৩৬ বৎসর লিলি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিয়া স্নদক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী প্রসার ও জীবন্ত প্রকাশচন্দ্র গিয়াছেন। লিলি-শিল্পের আজিকার প্রতিষ্ঠা ও স্নদক্ষ মূলে প্রকাশচন্দ্রের শিল্পসংগঠনী প্রতিভা, নৈপুণ্য ও অধ্যবসায় অনেকখানি দায়ী। নব নব বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনীর দিক দিয়া লিলিশিল্পের মৌলিক প্রাণ-প্রশংসার্হ। ভারতে ‘প্রেসেড্ ফুড্’-এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রাচীনতম বলা চলে। মাত্র ৫৭ বৎসর প্রকাশচন্দ্রের অকাল প্রয়াণ (২১-এ জ্যৈষ্ঠ) সত্যিই বেদনাদায়ক। বহু সম্ভাবনাগর্ভ এই বাঙালীর জীবনাবসান বাঙালীর দুর্ভাগ্যই বলিতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, পরায়ণ, সদাশয় ও দানশীল। বাংলার বহু প্রাণ সহিত প্রকাশচন্দ্রের ছিল সক্রিয় সহযোগ।



# সামগ্রিক

## ক সজ্জের সাধারণ অধিবেশন :

১১ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় প্রবর্তক সজ্জের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন সজ্জের মূল কেন্দ্রে চন্দ্রনগরস্থ প্রবর্তক সজ্জ-সভাপতি শ্রীমলিনচন্দ্র দত্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সজ্জের সর্বশ্রেণীর সভ্য-সভ্যাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ই উপস্থিত সভ্য-সভ্যাপণ সমাহিত চিত্রে মৌন থাকিয়া বিদেহী য় অনুধান করেন। সজ্জের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণন দ্যায় ১৩৬৭ সনের বিদ্যুত কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত আয়বায়ের সভার উপস্থাপিত করেন এবং উহা পঠিত হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে হয়। অতঃপর সজ্জের গভর্নিং, বডির সভ্যসভা গঠনবারে বীরা তাঁরা এবং নূতন সভ্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাল সর্বসম্মতিক্রমে িত হয়। এন চৌধুরী এও কোং আঁগামী ১৩৬৮ সালের জন্ম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। অতঃপর উপস্থিত সভ্যপণের মধ্যে রণচন্দ্র দত্ত, শ্রীমধুসূদন দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীরাধারমণ ি, শ্রীকৃষ্ণন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সভ্যজীবনের সমস্তার মিক গইয়া আলোচনা করেন। সভ্যপতি মহোদয় তাঁর সামিষ্ট সজ্জপত্র ও সভ্যজনদীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সজ্জের জরঞ্জী করেন।

## ভারতী মিশন :

২৭-এ মাঘ হইতে ৩রা ফাল্গুন এই ছয় দিন হাতীয়ার খালী) গীতাভারতী মিশনের বোদ্ধ বার্ষিক উৎসব নিবিড় নিষ্ঠা ক সমাহিত আবহাওয়ায় মধ্যে সুসঙ্গম হইয়াছে। চট্টগ্রাম, ি প্রভৃতি দূর দূরান্তর হইতে মিশনের বহু অনুরাগী ভক্ত, শিষ্য ি এই উৎসবে যোগদান করেন। মিশন-প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু মহর্ষি িজী ও মিশন-জননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী এবার উৎসবে শারীরিক হইতে না পারিলেও, তাঁদের অশরীরি আঙ্গিক উপস্থিতি সমাগত ি প্রাণে-প্রাণে অনুভব করেন। 'চিদ্যর' ও 'জ্ঞানসুহি' ধ্বনির মিশন-পতাকা উত্তোলন ও সঙ্গর গ্রহণের সঙ্গে উৎসবের উদ্বোধন উৎসবের প্রধান আঙ্গিক সিদ্ধ প্রণব-প্রত্যেকের সামনে 'ও হরি ও' । উপস্থিত অনেকের মধ্যেই এই সময় দিবা ভাবের প্রকাশ হয়। জনৈক নিরঙ্কর ভক্তের বিভিন্ন ভাবায় বাণী ও ভাব-সমাধি গবে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিদিনই ভক্তদের মধ্যে

তথ্যালোচনা পরিবেশকে ভাবগভীর করিয়া তুলে। শেষ দিন গীতাযজ্ঞের সঙ্গে উৎসব সমাপ্ত হয়।

## শিক্ষায় ভারতের অগ্রগতি :

১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮২ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪ কোটি ৩৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাখাতের ব্যয়ও ৭৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা হইতে ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩২০ কোটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংবিধানে শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও, অর্থান্ধাবে আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। তবে, 'তৃতীয় পরিকল্পনার' শেষাংশে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের শিশুদের শতকরা ৮০ জনের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া সরকার আশা করেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য-সরবরাহের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

## ভেদীয়ার 'রাজার চিবি'তে খনন কার্য :

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার শ্রীমতী বর্দ্ধমান জেলার ভেদিয়া রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী 'রাজার চিবি'-তে এক পরীক্ষামূলক খনন কার্য চালাইবেন। এই স্থানটি নাকি তাত্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন-পরিচীর্ণ। পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কয়েকবার খনন কার্যের দ্বারা মুণ্ডলিাদির বহু প্রাচীন নিদর্শন এখানে পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ অনুমিত হয় যে, রাজার চিবি একদা পূর্বে ভারতে হরপ্পা সভ্যতার অত্যন্ত গীত্বরূপ ছিল।

## শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য :

বিগত ৭ই ফাল্গুন সোমবার মাঘী-পূর্ণিমায় পরমহংস পরিত্রাঙ্কক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজের ৭৩তম জন্মোৎসব এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্য সজ্জের' পঞ্চবিশতিতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হাওয়া 'সমাধি মঠে' নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে সুসঙ্গম হইয়া গিয়াছে। পূর্বে ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে স্বামীজী মহারাজের বহু শিষ্য ও ভক্তগণ এই উৎসবে যোগ দেন। এই উপলক্ষে ৬ই ফাল্গুন সন্ধ্যার অধিবাস ও ৭ই ফাল্গুন প্রত্যুষে প্রভাত ফেরী, মধ্যাহ্নে গুরুপূজা ও মৈত্রিক পতাকা উত্তোলনের পর প্রায় দুই হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে দুই দিন আশ্রমে স্তোত্র পাঠ ও ভগবত সঙ্গীতাদিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ আনন্দমুখরিত ছিল। স্বামীজী মহারাজ সকলের কল্যাণের জন্ম ধর্মোপদেশ ও শান্তিবাণী দান করেন।

## কলিকাতায় আমেরিকার থিয়েটার দল :

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনার আমেরিকার মেইন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত 'মেইন মাক থিয়েটার'

দল গত ১১শে ও ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় কলিকাতায় হিন্দী হাই স্কুলের নাটমঞ্চে “আঃ উইলভারনেস” নাটকখানি অভিনয় করেন। এই দলটি মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া গঠিত। ১১শে হইতে ২২শে মার্চের মধ্যে ইঁহারা আরও তিনখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্ট কল্লেজের জীবনী অবলম্বনে রচিত “দান রাইজ এ্যাট ক্যাপেবেলো” নামক নাটকখানি অত্যন্ত স।

### রেলওয়ের জম্মা সাড়ে তিন কোটি ডলার :

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জন কেনেথ গ্যালব্রেথ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ১২৫টি ডিজেল ইঞ্জিন কিনিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ভারত সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা) ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা লইয়া ভারতে রেলপথের বিস্তার সাধন ও আধুনিকীকরণের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণস্বরূপ প্রাপ্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ ষাঁড়াইল ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৯০ কোটি টাকা।

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

### প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার বার্ষিক কার্যবিবরণ

- ১। প্রকাশের স্থান : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা।
- ২। প্রকাশকাল : মাসিক
- ৩। মূল্যাকর : ঐকগণিত্ময় রায়  
জাতীয়তা : ভারতীয়  
ঠিকানা : ২২।৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী  
কলিকাতা-১২
- ৪। প্রকাশক : রাধারমণ চৌধুরী  
জাতীয়তা : ভারতীয়  
ঠিকানা : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলি,
- ৫। সম্পাদক : অরুণচন্দ্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী  
জাতীয়তা : ভারতীয়  
ঠিকানা : প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দ্রনগর, হুগলী
- ৬। সত্বাধিকারী : প্রবর্তক ট্রাষ্ট, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী  
কলিকাতা-১২  
আমি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে  
আমার স্বাক্ষর ও বিধানমতে সত্য।

৩০।৩।৬২

রাধারমণ  
প্রকাশক :

### নিবেদন

- বর্তমান চৈত্রে ‘প্রবর্তক’-এর ৪৬তম বর্ষ-প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হ’ল এবং বৈশাখ, ১৩৬১ হ’তে ৪৭তম বর্ষ-পরিক্রমা হবে। সুপ্রাচীন ভারতে যুগে-যুগে মূনি-ঋষি-মনীষী জীবন-সমস্যা সমাধানের যে অমূল্য দীপ জালিয়ে গেছেন সেই প্রজ্ঞালোকে যুগোপযোগী ব্যষ্টি, সমষ্টি ও জাতির জীবন ও চরিত্রগঠনই পত্রিকাখানির মূল প্রেম্যৈক্য-প্রতিষ্ঠার এই আদর্শমুগ যে সব অমুরাগী গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও স্বহৃদবৃন্দের সপ্রেম সহযোগিতা পত্রিকাখানির এই সুদীর্ঘ পথ-চলার আনুকূল্য করেছে, আমবা প্রত্যয় করব, প্রবর্তক তার লক্ষ্য ও সিদ্ধির প আগামী কালেও তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হবে না।
- গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া টাকা ও বর্তমান বর্ষের দক্ষিণা যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করবে। অপরিহার্য কারণে পত্রিকা বন্ধ করলে তাহাও এই সংখ্যা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিবেন।
- গ্রাহক নম্বর ও পুরো ঠিকানা অথবা ‘নূতন’ কথাটি দিতে ভুলবেন না।
- পত্রিকার নীতি ও উন্নতিকল্পে অমুরাগী ও গ্রাহকগণের পরামর্শ প্রার্থনীয়।
- বর্তমান বর্ষে আনুকূল্যাপেক্ষ প্রবর্তকের শ্রী, সমৃদ্ধি ও রচনা-বৈচিত্র্য বৃদ্ধির আশা পোষণ করি।
- এই সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশের জন্য আমরা দুঃখিত এবং একান্ত গ্রাহকগণের অসুবিধা ও বিরক্তি তার জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত। অনেক অপরিহার্য কারণ থাকিলেও, আমরা পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখব।
- পাকিস্তানে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা : শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রবর্তক সঙ্ঘ, চট্টগ্রাম।

পরিচালক—প্রবর্তক

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।  
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাক্সটোন প্রাইভেট লিমিটেড, ২২।৩, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে ঐকগণিত্ময় রায় কর্তৃক মুদ্রিত।